শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান

অরুণ ঘোষ এম্‌-এ (দর্শন ও শিক্ষা), স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত
বি-এড্‌ (বিশ্বভারতী)
অধ্যাপক : শিবনাথ শাস্ত্রী কলেজ, কলিকাতা-১৯

নাল এন্টারপ্রাইজার্স : : ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

সমীর ঘোষ কর্তৃক
শানাল এণ্টারপ্রাইজার্সের
পক্ষ থেকে প্রকাশিত

একাদশ সংস্করণ জুলাই ১৯৬৫

সারদা প্রেস, ১৫, ক্রুকেড লেন, কলিকাতা-১
থেকে এস দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

ব্যক্তিগত পরিমাপ ও মানসিক স্বাস্থ্যবিধি

শিক্ষাশ্রয়ী পরিসংখ্যান

এক

মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ (Nature of Psychology)

মনোবিজ্ঞান কথাটির সঙ্গে সকলেই অল্পবিস্তর পরিচিত থাকলেও মনোবিজ্ঞানের প্রকৃতি এবং কর্মধারা সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা অত্যন্ত অস্পষ্ট ও ত্রুটিপূর্ণ। এই কারণে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত ও হাস্যকর মন্তব্য প্রায়ই শোনা যায়। সাধারণ লোকের কথা ছেড়ে দিলেও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিও মনোবিজ্ঞানের কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে বেশ একটি সন্দিগ্ধপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেন এবং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে তা প্রকাশও করে থাকেন। কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে এ ধরনের মনোভাবের মূলে আছে মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে সত্যকার জ্ঞানের অভাব বা বড় জোর মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে অতি প্রাচীন বা কোন সখের লেখকের লেখা থেকে আহরিত অসম্পূর্ণ বিদ্যা। তবে সান্ত্বনার কথা, এ ধরনের অবাঞ্ছিত মনোভাব দ্রুত বিলুপ্তির পথে।

সত্য কথা বলতে কি, বর্তমানে মনোবিজ্ঞান ক্রমোন্নতির এমন একটা স্তরে এসে পৌঁছেছে যে বিশেষজ্ঞের শ্রদ্ধালব্ধ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি ছাড়া এ শাস্ত্রটি এখন ভাল করে বোঝা শক্ত। গভীরতা এবং বিস্তৃতি উভয় দিক দিয়েই এর কার্যক্ষেত্র এত সুবিপুল হয়ে পড়েছে এবং এর পদ্ধতি ও বিষয়বস্তু দুইই এত জটিল হয়ে উঠেছে যে অগভীর ভাসা ভাসা জ্ঞান নিয়ে এর প্রকৃত স্বরূপ জানা সত্যই দুষ্কর।

মনোবিজ্ঞানের ক্রমবিবর্তন

প্রচলিত অনেক শব্দের মতই মনোবিজ্ঞান শব্দটিও তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। তবে মনোবিজ্ঞানের স্বরূপের ঐতিহাসিক বিবর্তনের একটি কাহিনী পাওয়া যাবে এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ক্রমপরিবর্তনে। ইংরাজী সাইকোলজি (Psychology) কথাটির ব্যুৎপত্তি হল সাইকি (Psyche) এবং লজি (Logy) এই দুটি পদের সমন্বয়ে। সাইকি কথাটির অর্থ হল আত্মা। আর লজি কথাটির অর্থ হল বিজ্ঞান বা শাস্ত্র। অর্থাৎ সাইকোলজি কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল আত্মার শাস্ত্র বা বিজ্ঞান। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে মনোবিজ্ঞানের জন্ম দর্শনশাস্ত্রের সূতিকাগারে। দার্শনিকদের বিশ্বরহস্য সমাধান প্রচেষ্টার সহায়করূপে মনোবিজ্ঞানের জন্ম

হয়। দর্শনের প্রধান সমস্যা হল দৃশ্যমান জগতের মূলতত্ত্বটি নির্ণয় করা। তার জন্য তাকে সব কিছুরই বাহ্যিক অস্তিত্ব ভেদ করে পৌঁছতে হয় তার মূলগত সত্তায়। দার্শনিকদের মতে প্রাণীর, বিশেষ করে মানুষের, মৌলিক সত্তাটি হল আত্মা। অতএব দৃশ্যমান জগতের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ যে মানুষ, তাকে জানতে হলে জানতে হবে আত্মার স্বরূপকে। দ্বিতীয়ত, সকল সমস্যার মূলে হচ্ছে আমাদের অর্জিত জ্ঞান, অর্থাৎ বাহিরের জগৎকে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানা। এই 'জানা' বস্তুটির স্বরূপ কি, কতটুকু তার যাথার্থ্য এবং কোথায়ই বা তার সীমা—এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দর্শনের সমস্যা সমাধানের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ফলে দার্শনিকেরা অনুভব করলেন যে আত্মার জন্য একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের প্রয়োজন এবং তার ফলেই সৃষ্ট হল সাইকোলজি বা আত্মার বিজ্ঞান।

এই দর্শন-ভিত্তিক মনোবিজ্ঞানের প্রথম সৃষ্টি বহু প্রাচীনকালে। ভারতীয় দর্শনে আত্মা ও মন সম্বন্ধে বহু আলোচনা ও তত্ত্ব পাওয়া যায়। সাংখ্য দর্শনে, গীতায়, ন্যায়বৈশেষিকে মন, জ্ঞান, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি নিয়ে বিশদ গবেষণা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, অগাষ্টাইন, আকুইনাস, ডেকার্ট, হব্‌স, লক্, বার্ক্‌লে, হিউম প্রভৃতি বিখ্যাত দার্শনিকেরা মনোবিজ্ঞানের বহু সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে গেছেন। কিন্তু বিজ্ঞান কখনও অবাস্তব কোন কিছুর উপরে গড়ে উঠতে পারে না। আত্মাকে চিরকাল কল্পনা করা হয়েছে অগ্নিশিখার মত—চেতনারূপী সর্বশক্তির আধার অথচ ইন্দ্রিয়াতীত। এ বস্তু নিয়ে যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা চলতে পারে কিন্তু সত্যকারের বিজ্ঞান গড়ে তোলা যায় না। বিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর মধ্যে সর্বজনীন সূত্র বা আইন খুঁজে বার করা এবং তার পদ্ধতি হল সুপরিকল্পিত নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণ। কিন্তু আত্মা সর্বপ্রকার নিরীক্ষণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, পরীক্ষণের কথা ত দূরে থাকুক। অতএব 'আত্মার বিজ্ঞান' কথাটিই আত্মবিরোধী।

পরবর্তী সুধীরা সাইকোলজির এই অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করলেন এবং আত্মার পরিবর্তে তাঁরা সাইকোলজির বিষয়বস্তু করে তুললেন 'মন'কে। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, কিন্তু মন যে আছে সে সম্পর্কে কেউ দ্বিমত নন। তা ছাড়া মনকে আমরা চিনি, জানি, তার কার্যাবলীর সঙ্গে আমরা সাক্ষাৎভাবে পরিচিত আছি। অতএব মনকে সাইকোলজির প্রকৃত বিষয়বস্তু করা উচিত।

কোন কোন মনোবিজ্ঞানী আবার মনের পরিবর্তে 'চেতনা' কথাটির

ব্যবহার করলেন। তাঁদের মতে মনের চেয়ে চেতনার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অনেক সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট। অতএব এই সব চিন্তাবিদ্ আত্মাকে সাইকোলজির রাজ্য থেকে নির্বাসিত করলেন এবং 'মন' বা 'চেতনার' উপরই এই নতুন বিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হলেন। তখন থেকেই সাইকোলজি আত্মার বিজ্ঞানের পরিবর্তে হল মন বা চেতনার বিজ্ঞান।

সাইকোলজি যখন আত্মার বিজ্ঞান ছিল তখন গবেষণার পদ্ধতি ছিল জল্পনা-কল্পনা, কেবলমাত্র অনুমান। কিন্তু এখন এই নতুন বিজ্ঞানের নতুন পদ্ধতি হল অন্তর্নিরীক্ষণ (Introspection)[১]। নিজের মনের প্রক্রিয়াগুলিকে গবেষকের দৃষ্টি নিয়ে নিজে নিরীক্ষণ করার নামই অন্তর্নিরীক্ষণ।

মূলত এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘকাল ধরে বহু মনোবিজ্ঞানী মনের প্রকৃতি, কার্যাবলী প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা চালান। বহু চিত্তাকর্ষক তথ্যে ভরা গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচিত হল। নব নব তত্ত্ব ও সূত্র স্তূপীকৃত হল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে একদল নতুন মনোবিজ্ঞানী দেখা দিলেন। তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানের সকল আবিষ্কারগুলিকে অপ্রমাণিত ও অনুমানপ্রসূত বলে উড়িয়ে দিলেন। তাঁদের প্রতিবাদের মূল বিষয় হল যে মন বা চেতনাও আত্মার মতই সকল প্রকার নিরীক্ষণ ও পরীক্ষণের গণ্ডীর বাইরে। তবে তাকে নিয়ে সত্যকারের বিজ্ঞান কেমন করে গড়ে তোলা যায়? মনের মধ্যে যে সব প্রক্রিয়া ঘটে তার কোনটাই ত বাইরে থেকে নিরীক্ষণ করা যায় না। তাদের সম্বন্ধে সব কিছু তথ্যই অনুমান করে নিতে হয়। এই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে অন্তর্নিরীক্ষণ পদ্ধতিরূপে গ্রহণযোগ্যই নয় এবং তা থেকে লব্ধ তথ্যাদির উপর নির্ভর করে কোন মতেই বিজ্ঞানসম্মত কোন সিদ্ধান্ত গঠন করা যায় না।

অন্তর্নিরীক্ষণকে নিরীক্ষণ বলা হলেও আসলে এটি নিরীক্ষণ নয়। কেননা যে সময়ে কোন মানসিক প্রক্রিয়া ঘটে ঠিক সে সময়ে সেটিকে নিরীক্ষণ করা সম্ভব হয় না। অন্তর্নিরীক্ষণ প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয় ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পরে। অতএব অন্তর্নিরীক্ষণের মধ্যে কল্পনার প্রভাব, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, অনুমান প্রভৃতি যে থাকবেই সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এ ধরনের একটি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপর নির্ভর করে কোন পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান গড়ে তোলা যায় না।

এই নতুন মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানের একটি নতুন সংজ্ঞা দিলেন।

১। পৃঃ ২৯

তাঁদের মতে মনোবিজ্ঞান হল প্রাণীর আচরণের বিজ্ঞান। স্থূলই হোক আর সূক্ষ্মই হোক, সব আচরণই আমাদের নিরীক্ষণের অধীন। অতএব মনোবিজ্ঞানকে যদি সত্য সত্যই একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করতে হয়, তবে আত্মা, মন, চেতনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুগুলিকে বাদ দিয়ে প্রাণীর আচরণকে করতে হবে তার নিরীক্ষণের বিষয়বস্তু।

ধরা যাক, একজনের খুব রাগ হয়েছে। যদি নিছক তার মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে রাগ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, তবে ঐ ব্যক্তির অন্তর্নিরীক্ষণের সাহায্য নেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় থাকবে না। কেননা তার মনের ভিতর কি ধরনের পরিবর্তন ঘটছে সেটা অন্য কোন উপায়েই জানা যাবে না। কিন্তু যদি ব্যক্তির আচরণকে মনোবিজ্ঞানের গবেষণার বিষয়বস্তু বলে গ্রহণ করা হয়, তবে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তথ্য সংগ্রহের প্রচুর সুযোগ পাওয়া যাবে। লোকটির রক্তচক্ষু, চীৎকার, আস্ফালন, মুষ্টিউত্তোলন প্রভৃতি বাহ্যিক আচরণ নিরীক্ষণ করে রেগে যাওয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রচুর নির্ভরযোগ্য জ্ঞান লাভ করতে পারা যাবে। আর এই নিরীক্ষণ প্রক্রিয়াটি যদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে আরও উন্নত করে তুলতে পারা যায় তবে 'রেগে যাওয়া' সম্বন্ধে বহু সূক্ষ্ম তথ্য আমাদের হাতে এসে পৌঁছবে। ঐ ব্যক্তির নানা অভ্যন্তরীণ দৈহিক পরিবর্তন—যেগুলিও এক ধরনের আচরণ—যেমন, মাংসপেশীর সংকোচন, গ্রন্থির রস নিঃসরণ, শ্বাস প্রশ্বাস, রক্তচলাচল, হৃদ্‌স্পন্দন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার বৈষম্য লক্ষ্য করে রেগে যাওয়া সম্বন্ধে বহু অতি-মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠবে।

একদল চরমবাদী মনোবিজ্ঞানী স্বয়ং মনকেই মনোবিজ্ঞান থেকে নির্বাসিত করে দিয়েছেন। তাঁরা হলেন আচরণবাদী (Behaviourist)। আচরণবাদীদের মতে সমস্ত আচরণই দেহের বিভিন্ন যন্ত্রপাতির কার্যকলাপের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। মন বা চেতনাকে তার মধ্যে আনা নিষ্প্রয়োজন। এই চরমবাদীদের মতবাদ অবশ্য অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই গ্রহণ করেন না। কিন্তু বর্তমানে যে প্রায় সকল মনোবিজ্ঞানীই প্রাণীর আচরণ পর্যবেক্ষণ করাকেই মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ বলে মেনে নিয়েছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে সাইকোলজির স্বরূপ বার বার বদলে গেছে। সাইকোলজি প্রথমে ছিল আত্মার বিজ্ঞান, পরে হল মন বা চেতনার বিজ্ঞান এবং আধুনিক কালে হয়ে দাঁড়িয়েছে আচরণের বিজ্ঞান।

সাইকোলজির এই বার বার রূপ পরিবর্তন সম্বন্ধে উডওয়ার্থের একটি চমৎকার উক্তি আছে। সেটি হল— .

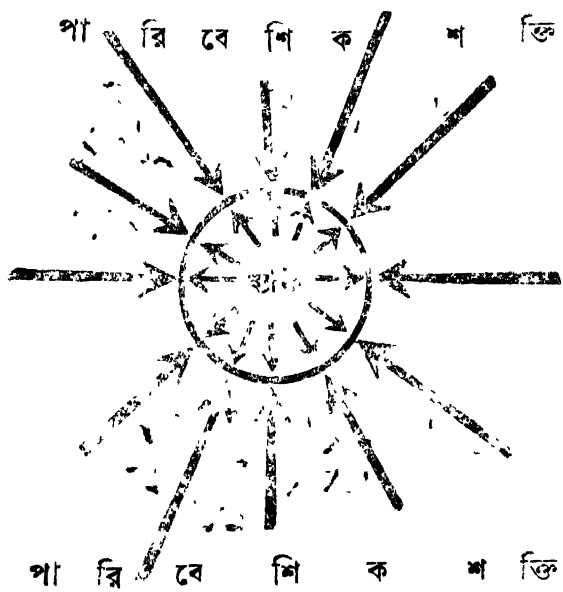
First Psychology lost its soul, and then it lost its mind, then it lost consciousness. It still has behaviour of a kind.

আচরণ কথাটি নিতান্ত ছোট হলেও, অর্থের দিক দিয়ে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই কথাটির যথার্থ স্বরূপ বুঝতে না পারলে মনোবিজ্ঞানের কাজের গুরুত্ব এবং বিশালতা উপলব্ধি করা যাবে না। অতএব আমাদের পরবর্তী প্রয়াস হল প্রাণীর আচরণ বলতে আমরা কি বুঝি তা দেখা।

প্রাণীর আচরণের স্বরূপ (Nature of Behaviour)

প্রাণীর আচরণের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আমরা বলতে পারি, যে আচরণ হল সেই সব প্রচেষ্টা যা প্রাণী নিজেকে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান (Adjustment) বা খাপ খাইয়ে নেবার তাগাদায় সম্পাদন করে।

প্রাণীমাত্রেই কোন না কোন পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে। বিনা পরিবেশে কোন প্রকার অস্তিত্ব সম্ভবপর নয়। মানুষের ক্ষেত্রে এই পরিবেশ



ব্যক্তির উপর প্রতিনিয়ত অসংখ্য পারিবেশিক শক্তি কাজ করে চলেছে এবং ব্যক্তিকেও তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সেগুলির সঙ্গে প্রতিনিয়ত সঙ্গতিবিধান করে যেতে হচ্ছে। পরিবেশের সংগে ব্যক্তির সংগতিবিধানের এই প্রচেষ্টার নামই আচরণ]

আবার অতি জটিল এবং বৈচিত্র্যময়। আলো, হাওয়া, উত্তাপ, ঋতুর প্রভাব প্রভৃতি ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য থেকে সুরু করে সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, রাষ্ট্রীয় কর্তব্য, বংশমর্যাদা, আধ্যাত্মিক চিন্তা, আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা, স্নেহ ভালবাসার দান প্রভৃতি অগণিত বিষয় আছে যা আধুনিক মানুষের পরিবেশের অঙ্গীভূত হয়ে আছে এবং এই প্রত্যেকটি শক্তির সঙ্গে তাকে সন্তোষজনকভাবে খাপ খাইয়ে চলতে হবে, নইলে কোন না কোন প্রকারের বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। এই ত গেল পরিবেশের কথা। আবার খাপ খাইয়ে নেবে যে প্রাণী সেও স্বয়ং একটি জটিলতার প্রতিমূর্তি। একমাত্র প্রাণীর দেহেই আছে বহু বিচিত্র যন্ত্রপাতি এবং সেগুলির প্রত্যেকটির ক্রিয়া-কলাপ এত বিভিন্ন ও এত জটিল যে আজও বিজ্ঞানীরা সেগুলিকে ভাল করে ব্যাখ্যা করতে পারেন নি—যেমন হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, মেরুদণ্ড, পেশী, গ্রন্থি, চক্ষু-কর্ণ ইন্দ্রিয়াদি, রক্তশিরা, মূত্রাশয় ইত্যাদি। প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের কাজে এদের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব ভূমিকা আছে এবং তার ফলে সঙ্গতিবিধানের কাজটিও হয়ে ওঠে অত্যন্ত জটিল একটি প্রক্রিয়া। ঘরের ভিতরে গরম হাওয়া থেকে হঠাৎ বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় এসে দাঁড়ানর মত সামান্য একটি কাজে আমাদের দেহকে নতুন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি-বিধানের জন্য এতগুলি বিভিন্ন প্রকৃতির অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সম্পন্ন করতে হয় যা আমরা সহজে কল্পনা করতে পারব না। বিমান আক্রমণ, ভূমিকম্প, দুর্ঘটনা প্রভৃতি জটিল পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়াগুলি যে আরও জটিল হয়ে ওঠে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

প্রাণীর এই সঙ্গতিবিধানের প্রয়াসকেই আমরা সাধারণ ভাষায় আচরণ নাম দিয়ে থাকি। বলা বাহুল্য প্রাণীর আচরণ হল একটি জীবব্যাপী প্রক্রিয়া। জন্মের মুহূর্ত থেকে, এমনকি গর্ভকালীন অবস্থা থেকেই এই সঙ্গতিবিধানের প্রয়াস সুরু হয় এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই প্রয়াস অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। বলতে গেলে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি-বিধানে দেহ-যন্ত্রের চরম অক্ষমতার নামই মৃত্যু। অতএব দেখা যাচ্ছে যে মনোবিজ্ঞানের কাজ হল প্রাণীর এই সঙ্গতিবিধান প্রচেষ্টার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া। সুসংহত ও সুপরিকল্পিত নিরীক্ষণের সাহায্যে প্রাণীর বহুবিধ আচরণের স্বরূপ নির্ণয় করা এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের সাহায্যে সেগুলির অন্তর্নিহিত সূত্র আবিষ্কার করা—এক কথায় এই হল মনোবিজ্ঞানের কর্মসূচী।

শিক্ষার স্বরূপ (Nature of Education)

মনোবিজ্ঞান বলতে কি বুঝি এবং তার কাজই বা কি তা আমরা মোটামুটি জেনেছি। এখন শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক জানতে হলে শিক্ষারও স্বরূপ জানা দরকার। সাধারণ মানুষ শিক্ষার যে অর্থের সঙ্গে পরিচিত সেটা হল শিক্ষার একটি অতি সঙ্কীর্ণ অর্থ। স্কুল, কলেজ প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থলব্ধ বিদ্যাকেই আমরা সাধারণত শিক্ষা বলে থাকি। শিক্ষিত অশিক্ষিতের ভেদ আমরা করি গ্রন্থগত জ্ঞানের তারতম্যের উপর। যে লোক লিখতে পড়তে জানে না তাকে আমরা অশিক্ষিত বলি। কিন্তু এভাবে কেবলমাত্র বিশেষধর্মী কোন জ্ঞানের অর্জনকে শিক্ষা বলার অর্থই শিক্ষাকে একটি অতি সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা।

এই সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা হয়ে দাঁড়ায় বিশেষ কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যের জন্য ব্যক্তির প্রস্তুতীকরণ। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার পরিসীমা আরও অনেক বড়—সারা জীবনব্যাপী। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে আমরা বুঝি যে কোনও নতুন অভিজ্ঞতা যা প্রাণীর বর্তমান আচরণকে পরিবর্তন করে নতুন আচরণের সৃষ্টি করে। কাঁটা-চামচের সাহায্যে ভোজনে অনভ্যস্ত কোন ভদ্রলোকের বিসদৃশ আচরণ তার এক বিলাতফেরৎ বন্ধুর ডিনার টেবিলে প্রথম দিন সমবেত অতিথিগণের হাস্যকৌতুকের বস্তু হয়ে উঠল। কিন্তু দ্বিতীয় দিন দেখা গেল যে সেই ভদ্রলোকই নিপুণভাবে কাঁটা-চামচ চালাচ্ছেন এবং সেদিন তাঁর আচরণ আর কারও হাস্যোদ্রেক করল না। এই যে দ্বিতীয় দিনে ভদ্রলোকের আচরণের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল এটা হল শিক্ষা-প্রসূত এবং পূর্বদিনের ডিনার-টেবলের অভিজ্ঞতাই হল ভদ্রলোকের ক্ষেত্রে শিক্ষা। এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা কোনও ব্যক্তিবিশেষ বা ঘটনাবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রতিটি প্রাণীর জীবনে এই শিক্ষা চলেছে নিরন্তর ছেদহীন ধারায়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সে প্রতিনিয়তই শিক্ষা গ্রহণ করে চলেছে—প্রকৃতির সর্বজনীন পাঠশালায়। এক কথায় প্রাণীর জীবন-বিকাশের সঙ্গে এ শিক্ষা হয়ে দাঁড়াচ্ছে সমার্থক। এ অর্থে কেউ নিরক্ষর থাকতে পারে, কিন্তু সত্যকারের শিক্ষা-বর্জিত কেউই থাকতে পারে না।

মানুষ মাত্রেই কোন না কোন সমাজে বাস করে। তার প্রত্যেকটি আচরণ তার নিজের সমাজের সংগঠনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রত্যেক সমাজের সংরক্ষণের জন্য সেই সমাজের প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই বিশেষ কতকগুলি আচরণ সম্পাদন করতে শেখা অবশ্য প্রয়োজন। বিশেষ কোন

সমাজের বেঁচে থাকা নির্ভর করছে সমাজের অপরিণত নাগরিকদের বিশেষ কতকগুলি আচরণ শেখার উপর। সমাজের সংরক্ষণ ছাড়া সমাজের উন্নয়নের জন্যও শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। পূর্বপুরুষদের অনুসৃত আচরণগুলি ছাড়াও প্রতি যুগে কিছু কিছু নতুন আচরণের প্রবর্তন হচ্ছে এবং কিছু কিছু পুরাতন আচরণ অচল বলে পরিত্যক্ত হচ্ছে। এই নতুন আচরণগুলির প্রবর্তন করেন সমাজ-সংস্কারকেরা, নতুন আদর্শ এবং চিন্তাধারার জনকেরা। অতএব সমাজের অস্তিত্ব এবং অগ্রগতি এই দু'য়ের প্রয়োজনেই কতকগুলি সুনির্বাচিত, সুনির্দিষ্ট এবং সমাজ-স্বীকৃত আচরণ প্রত্যেক সমাজের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের আয়ত্ত করতে সাহায্য করা হয় এবং তারই নাম শিক্ষা। এর জন্য প্রত্যেক সমাজেই আছে কতকগুলি অনুমোদিত সংস্থা, যেমন পরিবার, স্কুল-কলেজ, ধর্মায়তন এবং বহু ছোটখাট সামাজিক সংগঠন। এগুলিরই মাধ্যমে অপরিণত নাগরিকদের শেখান হয় বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামাজিক আচরণগুলি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষা বলতে আমরা সেই সব আচরণ আয়ত্ত করা বুঝি যেগুলি ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েরই সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য এবং যে আচরণগুলি সমাজ অনুমোদিত কতকগুলি বিশেষ সংস্থার মাধ্যমে সমাজের অপরিণত নাগরিকদের আয়ত্ত করতে সাহায্য করা হয়ে থাকে।

মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্ক
(Relation Between Psychology and Education)

মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে এ দুটি বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় ও গভীর। মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান এবং এই বিজ্ঞানটির সাহায্যে আমরা প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা করে থাকি। কেমন করে বিশেষ বিশেষ আচরণ সংঘটিত হয়, কোন্ বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন্ বিশেষ আচরণ সৃষ্ট হয় এবং বিভিন্ন আচরণগুলির পেছনে কোনও সর্বজনীন সূত্র পাওয়া যায় কিনা—এই সব নির্ণয় করাই হল মনোবিজ্ঞানের কাজ। আর সেই আচরণের প্রয়োগমূলক দিকটি হল শিক্ষাবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। অর্থাৎ ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের দিক দিয়ে অতি প্রয়োজনীয় কতকগুলি বিশেষ আচরণ অপরিণত নাগরিকদের শেখানোই হলো শিক্ষাবিজ্ঞানের প্রকৃত কাজ। সেদিক দিয়ে শিক্ষাতত্ত্বকে আচরণের প্রয়োগ শাস্ত্র বলা চলে।

অতএব মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষাবিজ্ঞানের সম্পর্কটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, এমন কি অবিচ্ছেদ্য বলা চলে। কোন বিশেষ আচরণ শেখাতে হলে সেই আচরণটির স্বরূপ এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা যে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কেবল সহায়ক তাই নয়, অপরিহার্যও যে, সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। সেই বিশেষ আচরণটি প্রাণী কিভাবে শিখতে পারে এবং কোন্ কোন্ পরিস্থিতি এই শেখার পক্ষে অনুকূল, কিসে স্বল্পতম প্রচেষ্টায় সর্বাধিক ফল পাওয়া যাবে ইত্যাদি মূল্যবান তথ্যগুলি জানা থাকলে শেখার কাজটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের পক্ষে নিঃসন্দেহে সহজ হয়ে উঠবে। আর এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে শিক্ষার্থীকে কোন কিছু শেখাবার প্রচেষ্টা যে সর্বদাই কষ্টকর এবং প্রায়ই ক্ষতিকর হয়ে থাকে তার প্রমাণ সব দেশেরই শিক্ষার ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে।

মনে করা যাক কোন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা মুখস্থ করাতে চান বা বীজগণিতের সমীকরণ শেখাতে চান। এখন কবিতা মুখস্থ করতে হলে বা সমীকরণ শিখতে হলে কি ধরনের মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয় এবং কোন্ কোন্ বাহ্যিক ও মানসিক পরিস্থিতি এই সব প্রক্রিয়ার অনুকূল বা প্রতিকূল এই তথ্যগুলি জানা থাকলেই শিক্ষকের প্রচেষ্টা সার্থক হতে পারে, নইলে নয়।

প্রাচীন শিক্ষাদান পদ্ধতির সবচেয়ে বড় ত্রুটি ছিল যে তার পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানভিত্তিক ছিল না। প্রায় ক্ষেত্রেই শিক্ষণ পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত হত কতকগুলি ভিত্তিহীন বিশ্বাস এবং কল্পিত ধারণার দ্বারা এবং তার ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়ে উঠত। সত্য বলতে কি, আধুনিক মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফল শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা পরিবর্তন এনেছে ততটা অন্য কোন ক্ষেত্রে আনতে পারে নি। শিখন-প্রক্রিয়ার স্বরূপ, মুখস্থ করার উপকারিতা, শাস্তিদানের সার্থকতা, শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা প্রভৃতি শিক্ষাঘটিত বহু সমস্যা সম্বন্ধে প্রাচীন শিক্ষাবিদেরা যে সব ধারণা পোষণ করতেন আজ মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে সেগুলি সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। সেই জন্য আজ মনোবিজ্ঞানসম্মত ও সুপ্রমাণিত তথ্যের উপর বর্তমান শিক্ষণ পদ্ধতিকে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সব দেশেই দেখা দিয়েছে।

সাধারণভাবে শিক্ষার তিনটি প্রধান দিক আছে—লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি। শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এই সমস্যার সমাধান করবে দর্শনশাস্ত্র। আমরা দেখেছি শিক্ষা জীবনবিকাশের সঙ্গে সমার্থক। অতএব

মানুষের বেঁচে থাকার লক্ষ্যের সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্যও ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। আবার ব্যক্তিমাত্রেরই বেঁচে থাকার লক্ষ্য নির্ভর করে সৃষ্টির বিভিন্ন রহস্য সম্বন্ধে তার জীবন-দর্শন কি ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে তার উপর। সেই রকম শিক্ষার বিষয়বস্তু মোটামুটি নির্ভর করে শিক্ষার লক্ষ্যের উপর অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্রের অনুশাসনের উপর।

শিক্ষার পদ্ধতি ও মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার পদ্ধতিটি সর্বাংশে নির্ভর করে মনোবিজ্ঞানের উপর। 'শিক্ষার' অর্থ কোন বিশেষ আচরণ আয়ত্ত করা। অতএব শিখন-প্রক্রিয়া অপরিহার্য-রূপে রয়েছে সব শিক্ষার মূলে। ফলে শিক্ষার সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করছে শিখন-প্রক্রিয়ার কার্যকারিতার উপর এবং সেইজন্য মনোবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া শিক্ষাদানের কোন কার্যকর পদ্ধতি গড়ে তোলা সম্ভবই নয়।

শিক্ষার লক্ষ্য ও মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়েও মনোবিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রভাব আছে। যেমন, যদি কোনও শিক্ষাবিদ্ বলেন যে মানুষের প্রকৃতিদত্ত বাসনাগুলির সম্পূর্ণ নিরোধ বা বাইরের জগৎ থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে সম্পূর্ণ সরিয়ে এনে সেগুলিকে অন্তর্মুখী করা হল শিক্ষার লক্ষ্য, তাহলে মনোবিজ্ঞান প্রতিবাদ জানিয়ে বলবে যে এ ধরনের লক্ষ্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে একান্ত অবাস্তব এবং কখনই তাকে বাস্তবে পরিণত করা যাবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার লক্ষ্য ও বিষয়বস্তু যদিও শিক্ষাশ্রয়ী দর্শনশাস্ত্রের (Educational Philosophy) উপর নির্ভর করে, তবুও এগুলি মনোবিজ্ঞানের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। শিক্ষাশ্রয়ী দর্শন শিক্ষার লক্ষ্য স্থিরীকৃত করে দিলেও দেখতে হবে যে সেই লক্ষ্য শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতার আয়ত্তাধীন কিনা এবং তা বিচারের ভার শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের। লক্ষ্য যতই কাম্য এবং দর্শনশাস্ত্রের অনুমোদিত হোক্ না কেন যদি সেটি শিক্ষার্থীর আয়ত্তের বাইরে হয় তবে সে শিক্ষা যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে এ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না।

শিক্ষার পরিমাপ ও মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা যতটা না থাক, সে লক্ষ্যের কতটুকু কাযে পরিণত হল এই প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু নির্ণয় করতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞানই। শিক্ষার ফলে শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠনের অভীপ্সিত পরিবর্তন ঘটল কিনা, ঘটলে কতটুকু ঘটল এবং সেই পরিবর্তন স্থায়ী কিনা ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞান-

মূলক পরিমাপের সাহায্যেই। শিক্ষার ফল অবশ্য অনেকাংশে উপলব্ধি করা যায় আচরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করে। কিন্তু এই পরিবর্তনের সত্যকারের নির্ভরযোগ্য ও নিখুঁত পরিমাপ পেতে হলে মনোবিজ্ঞানসম্মত পরিমাপের প্রয়োজন।

শিক্ষার বিষয়বস্তু ও মনোবিজ্ঞান

সাধারণত শিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারিত করে শিক্ষার লক্ষ্য এবং শিক্ষার লক্ষ্য বহুলাংশে নির্ভর করে দর্শনশাস্ত্রের উপর। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষায় বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব অবহেলনীয় নয়। শিক্ষার বিষয়বস্তু যে কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর শিখন ক্ষমতার আয়ত্তাধীন হবে তাই নয়, শিক্ষার্থীর বিভিন্ন বয়স অনুযায়ী তা সুবিভক্ত হবে। বিভিন্ন বয়সে শিক্ষার্থীর মানসিক যোগ্যতা বিভিন্ন। তাছাড়া রুচি, আগ্রহ, শিখনশক্তি প্রভৃতির দিক দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য থাকায় শিক্ষার বিষয়বস্তুটিকে সেভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কোন্ বয়সের পক্ষে কোন্ শ্রেণীর বিষয়বস্তু উপযুক্ত হবে এবং শিক্ষার্থীর ক্রমবিকাশমান দেহমনের বৃদ্ধির সঙ্গে কি করে বিষয়বস্তুটিকে সুসংহত করা যাবে এই অতি প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে একমাত্র মনোবিজ্ঞানই।

শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের অবদান

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান নানা দিক দিয়ে মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। কোন্ কোন্ দিক দিয়ে বর্তমানে শিক্ষাবিজ্ঞান মনোবিজ্ঞানের গবেষণার উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হল।

১। ব্যক্তিগত বৈষম্য

সব মানুষ সমান নয়। দৈহিক, মানসিক ও অন্যান্য অনেক দিক দিয়ে মানুষে মানুষে প্রচুর প্রভেদ, ফলে শিক্ষাগ্রহণের ক্ষমতাও অসমান—ব্যক্তিগত বৈষম্যের এই তত্ত্বটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবদান। গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এই মূল্যবান মনোবৈজ্ঞানিক তথ্যটির কোন স্থান ছিল না। কিন্তু আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে শিক্ষার্থীদের প্রকৃতিগত বৈষম্যের এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতিকে পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় করা হয়ে থাকে।

২। শিখনপ্রক্রিয়ার নিয়মাবলী

মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে শিখন-প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। জানা গেছে যে সাধারণত

আমরা সব বস্তু একই প্রক্রিয়ায় শিখি না বরং বিভিন্ন শিক্ষণীয় বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলি বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিখি। যেমন, জ্যামিতির উপপাদ্য শেখা ও টাইপ করতে শেখা, দুটিই শিখন কার্য হলেও শিখনের পদ্ধতি উভয়ক্ষেত্রে বিভিন্ন। এখন শিক্ষক যদি এই শিখন পদ্ধতির বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির সঙ্গে পরিচিত থাকেন তবেই তাঁর শিক্ষণ সফল হতে পারে। নতুবা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই শ্রমের মিথ্যা অপচয় হতে বাধ্য।

৩। ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকের ক্রমবিকাশের নিয়মাবলী

শিক্ষা ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সমার্থক। নবজাতকের দেহ, মন, বুদ্ধি, অনুভূতি, সামাজিক চেতনা প্রভৃতি থাকে নিতান্ত অপরিণত অবস্থায়। কিন্তু সময়ের অতিক্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে এর প্রত্যেকটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং যথাসময়ে পূর্ণতালাভ করে। মনোবিজ্ঞানের গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকের বিকাশের ধারা ও গতি এক ত নয়ই বরং এদের প্রত্যেকটির একটি নিজস্ব ভঙ্গী এবং পথ আছে। শিশুর শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে এই বিভিন্ন বিকাশভঙ্গীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

৪। বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ

শিক্ষা গ্রহণের দ্রুততা এবং সার্থকতা দুইই বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির উপর। দেখা গেছে যে সব কিছু শেখা, বিশেষ করে চিন্তামূলক কোন কিছু শেখা নির্ভর করে শিক্ষার্থীর বুদ্ধির মাত্রা বা পরিমাণের উপর। মনোবিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা থেকে বুদ্ধির প্রকৃতি সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে বর্তমানে এই বুদ্ধি পরিমাপ করার নির্ভরযোগ্য পন্থা ও আবিষ্কৃত হয়েছে। ফলে শিক্ষাদানের অনেক জটিল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করা এখন সম্ভব হয়ে উঠেছে।

৫। মনোযোগ দেওয়া, মনে রাখা, ভুলে যাওয়া ইত্যাদি

মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক গবেষণার ফলে মনোযোগ দেওয়া, মনে রাখা, ভুলে যাওয়া ইত্যাদি ব্যক্তির বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এই তথ্যগুলি বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিকে বিজ্ঞান-সম্মত করে তুলতে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে।

৬। সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের গুরুত্ব

ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের সঙ্গে শিক্ষার একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। শিক্ষার্থীর বহু আচরণের উপর তার বিভিন্ন প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণক্ষমতা

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রবৃত্তিগুলির স্বরূপ ও প্রভাব সম্বন্ধে শিক্ষকের যথাযথ জ্ঞান না থাকলে শিক্ষণকার্য অপচয়বহুল হতে বাধ্য। তেমনই শিক্ষার সুষ্ঠু সম্পাদন শিক্ষার্থীর অনুকূল প্রক্ষোভের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। আধুনিক মনোবিজ্ঞান ব্যক্তির প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ সম্বন্ধে নানা নতুন তথ্য আবিষ্কার করে শিক্ষাকে অধিকতর সার্থক ও সফল করে তুলেছে।

৭। গণ-মনোবিজ্ঞান

গণ-মনোবিজ্ঞানের নানা সূত্র আজকাল শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে। দেখা গেছে যে এককভাবে ব্যক্তির আচরণের সঙ্গে তার দলগত আচরণের নানা দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। আধুনিক শিক্ষাদান প্রথা দলমূলক, ব্যক্তিমূলক নয়। ফলে স্বভাবতই দলগত মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ শিক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

৮। সঙ্গতিবিধানঘটিত সমস্যা

সঙ্গতিবিধানমূলক সমস্যাদির সমাধান করা সুষ্ঠু শিক্ষণ-কার্যের প্রথম সোপান। সঙ্গতিবিধানের সমস্যা প্রধানত দেখা দেয় যখন শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে কোন কারণে খাপ খাইয়ে নিতে অসমর্থ হয়। এই ধরনের শিশুকে অপসঙ্গতিসম্পন্ন (Maladjusted) বলা হয়। যে সব শিক্ষার্থী তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে পারে না তাদের শিক্ষাদান করা সব দিক দিয়ে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এই ধরনের সঙ্গতিবিধানমূলক সমস্যাদি সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে।

৯। মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পরিমাপ যন্ত্র

মনোবিজ্ঞানভিত্তিক পরিমাপ যন্ত্রগুলি হল সাম্প্রতিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। দীর্ঘ গবেষণার ফলে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপ করার বহু নির্ভরযোগ্য যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে। তার ফলে আজকাল বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নানা সহজাত ও অর্জিত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। গতানুগতিক ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষা পদ্ধতির স্থানে বিজ্ঞানসম্মত নানা প্রকৃতির শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা (Educational Tests) গঠিত হয়েছে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ (Personality Traits), আগ্রহ (Interest), মনোভাব (Attitude) প্রভৃতি পরিমাপ করারও যন্ত্র আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির যথাযথ ব্যবহার যে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে যথেষ্ট উন্নত করে তুলেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

দুই

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ

(Nature of Educational Psychology)

শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষা হল নতুন জ্ঞান ও আচরণের আয়ত্তীকরণ। মনোবিজ্ঞান হল আচরণের প্রকৃতি, গতি ও সংঘটনের বিশ্লেষণ ও সংব্যাখ্যান। শিক্ষার বিষয়বস্তু হল কেমন করে নতুন আচরণ সম্পাদন করা যায় তা দেখা আর মনোবিজ্ঞানের কাজ হল সেই আচরণটির প্রকৃতি কি এবং কি ভাবে সেটি ঘটে তা দেখা। অতএব সার্থক শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য অপরিহার্যই।

তাছাড়া শিক্ষা নির্ভর করছে শিখন প্রক্রিয়ার উপর। কোন কিছু শিখন (Learning) ছাড়া শিক্ষা হয় না। আর সে শিখন হতে পারে দু'রকম বস্তুর, জ্ঞান (Knowledge) এবং দক্ষতার (Skill)। এ দু'রকম শিখনই নির্ভর করে প্রাণীর মানসিক শক্তির উপর। প্রাণী শিখতে পারে অথচ জড় বস্তু পারে না, তার কারণ হল প্রাণীর শিখন-ক্ষমতা আছে, জড় বস্তুর নেই। শিখনের মাত্রা, উৎকর্ষ ও কার্যকারিতা সবই নির্ভর করে এই মানসিক শক্তির প্রকৃতি ও সংগঠনের উপর। এই মানসিক শক্তির স্বরূপ ও কর্মদক্ষতা জানতে হলে আমাদের মনোবিজ্ঞানের সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। তাছাড়া শিখন বিশেষ-ভাবে প্রত্যক্ষণ (Perception), সংবোধন (Comprehension), চিন্তন (Thinking), বিচারকরণ (Reasoning), মনে রাখা (Remembering) ইত্যাদি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উপর নির্ভরশীল। এগুলি কি ভাবে সংঘটিত হয় এবং এগুলির বৈশিষ্ট্য কি তা জানা সার্থক শিখনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এছাড়াও শিক্ষার্থীর কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেও শিখন নিবিড়ভাবে জড়িত। যেমন প্রবৃত্তি (Instinct), প্রক্ষোভ (Emotion), আগ্রহ (Interest) মনোভাব (Attitude) ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিও শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। অতএব এগুলি সম্পর্কেও শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ এক কথায় শিক্ষার্থীকে তার শক্তি, চাহিদা, পছন্দ, অভিরুচি এ সমস্ত নিয়ে সমগ্রভাবে জানা দরকার। বলা বাহুল্য যে এর জন্য প্রয়োজন মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ। এই কারণেই

বলা হয়েছে যে শিক্ষার পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।

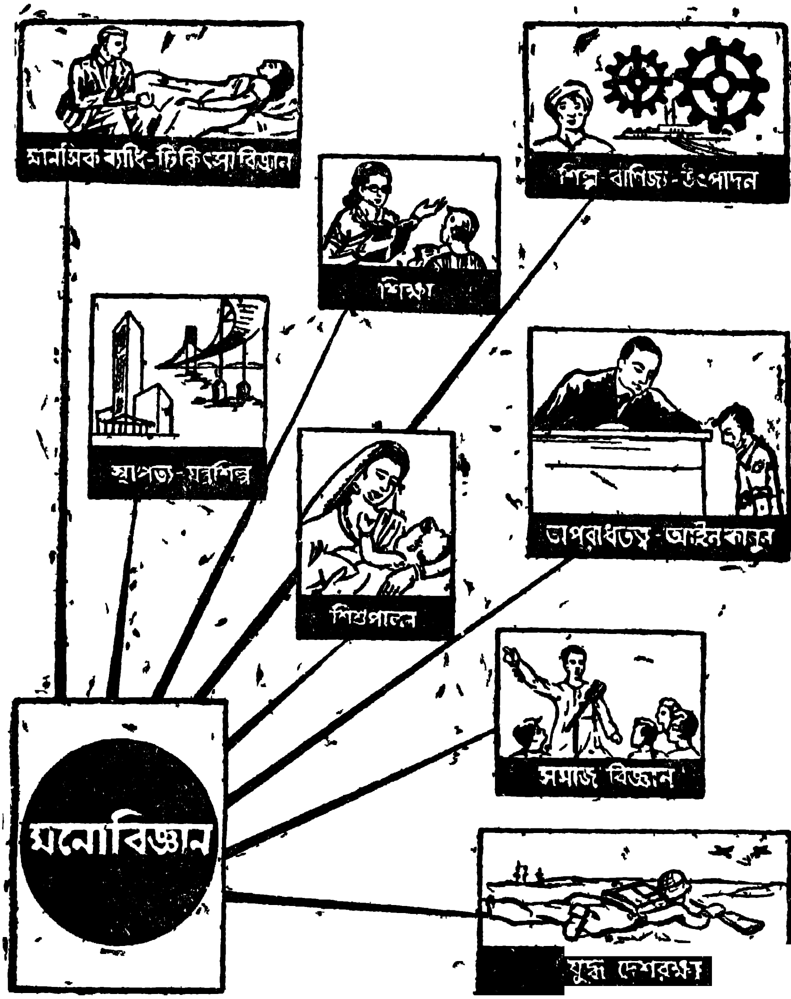
এই সব কারণে বিংশ শতাব্দীর সুরু থেকেই মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষার মধ্যে বিভেদের দূরত্বটা ক্রমশ কমতে সুরু হয়। শিক্ষাবিদেরা শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, শিক্ষার উৎকর্ষ, কার্যকারিতা ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সুরু করলেন। তাঁদের সেই প্রচেষ্টা থেকে জন্ম নিল মনোবিজ্ঞানের নতুন একটি শাখা। এরই নাম হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology) অর্থাৎ শিক্ষাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে যে মনোবিজ্ঞান।

এরই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এই পরিবর্তন কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রেই দেখা দেয় নি। এই সময় মানব অস্তিত্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতেও মনোবিজ্ঞানের এই অনুপ্রবেশ ঘটে। সর্বত্রই গবেষকরা মনোবিজ্ঞানমূলক বিশ্লেষণ ও সংব্যাখ্যানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে লাগলেন। কালক্রমে ব্যাপকভাবে মনোবিজ্ঞানের নানা নতুন প্রয়োগমূলক শাখা গড়ে উঠতে লাগল, যেমন শিশু মনোবিজ্ঞান, ব্যক্তিগত মনোবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান, মনোবিকারমূলক মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। এক কথায় মানব আচরণের সমস্ত অলিগলিতেই মনোবিজ্ঞানের সন্ধানী আলোর সম্প্রপাত ঘটল। এভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ থেকে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানও গড়ে ওঠে।

মনোবিজ্ঞানের এই নতুন শাখাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি মূলত প্রয়োগমূলক। সাধারণ মনোবিজ্ঞান হল প্রধানত তত্ত্বমূলক, অর্থাৎ মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি আবিষ্কার ও সপ্রমাণ করাই তার কাজ। কিন্তু সেগুলিকে নিজের নিজের বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কোনও বিশেষধর্মী সমস্যার সমাধান করা এবং সেগুলির প্রকৃত ব্যবহারিক মূল্য আবিষ্কার করাই হল এই নতুন নতুন শাখাগুলির লক্ষ্য। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানও এই ধরনের প্রয়োগমূলক ও ব্যবহারিক মূল্যসম্পন্ন মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বিকাশ

শিক্ষার সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক যখন এতই ঘনিষ্ঠ, তখন শিক্ষার সমস্যাগুলির সমাধানে প্রাচীন কাল থেকেই যে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের



[বিংশ শতাব্দীর একটি বড উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মানব অস্তিত্বের প্রায় সর্ব ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের অনুপ্রবেশ। শিল্প, বাণিজ্য, স্থাপত্য, সমাজ-বিজ্ঞাম, যুদ্ধ, দেশরক্ষা, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, শিশুপালন, অপরাধতত্ত্ব, শিক্ষা প্রভৃতি মানবজীবনের সর্বপ্রদেশেই মনোবিজ্ঞানের আধিপত্য দ্বিধাহীনভাবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে গড়ে উঠেছে মনোবিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখা। যেমন,—সমাজ-বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে সামাজিক মনোবিজ্ঞান (Social Psychology)। শিশুপালনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শিশু-মনোবিজ্ঞান (Child Psychology)। শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে শিল্পাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (Industrial Psychology)। সেই রকম শিক্ষাকে আশ্রয় করে যে বিশেষ মনোবিজ্ঞানটি গড়ে উঠেছে তার নাম শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (Educational Psychology)।]

চেষ্টা হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বর্তমান শতাব্দীর সূত্রপাত থেকেই পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল দেশগুলিতে শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করার ব্যাপক প্রচেষ্টা সুরু হয়েছে এবং বর্তমানে সেই সব প্রচেষ্টাকে আশ্রয় করে এই নতুন পূর্ণাঙ্গ মনোবিজ্ঞানটি গড়ে উঠেছে।

সুসংহত শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের জন্ম অতি সাম্প্রতিক হলেও এর পরিকল্পনা ও সূচনা খুবই প্রাচীন। শিক্ষার পদ্ধতি যে মনোবিজ্ঞান অনুমোদিত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে একথা প্রায় সমস্ত শিক্ষাবিদ্‌ই স্বীকার করে এসেছেন। প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টটল সঙ্গীতকে পাঠ্যবিষয়ের একটি প্রধান অঙ্গ করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার প্রধান কারণ হল যে তাঁর মতে সঙ্গীত মনের সঞ্চিত আবেগের বোঝাকে লাঘব করে দিয়ে মানসিক সাম্য ফিরিয়ে আনে এবং পাঠগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে। এ পদ্ধতির তিনি নাম দিয়েছেন ক্যাথারসিস (Catharsis) বা বিরেচন-প্রক্রিয়া। আধুনিক ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণে যাকে এ্যাব্রিকসান (Abreaction) পদ্ধতি বলা হয় তার সঙ্গে অ্যারিষ্টটলের এই পদ্ধতির প্রচুর মিল আছে। অ্যারিষ্টটলের এই নির্দেশকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রাচীনতম প্রয়োগ বলা যেতে পারে।

রোমান শিক্ষাবিদ্‌ কুইন্টিলিয়ান শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের আরও ব্যাপক ও সুনির্দিষ্ট প্রয়োগের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর অনুশাসনগুলির আধুনিকতা সময় সময় আমাদের বিস্মিত করে তোলে। তাঁর মতে শিশুকে কোনও কিছু শেখানোর আগে দেখতে হবে যে তার কি ধরনের মানসিক দক্ষতা ও সহজাত ক্ষমতা আছে। শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা সুরু হবে খেলার মধ্যে দিয়ে। দৈহিক শাস্তিকে শিক্ষা-পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে হবে, শিশুর নিজস্ব ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির উপর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ইত্যাদি মনোবিজ্ঞানের বহু অধুনা-স্বীকৃত তত্ত্বের উল্লেখ কুইন্টিলিয়ানের শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যায়।

ব্রিটিশ শিক্ষাবিদ্‌ কমেনিয়াসও শিক্ষণের পদ্ধতিকে কেমন করে মনোবিজ্ঞান-সম্মত করা যায় তা নিয়ে বিশদ আলোচনা করে গেছেন। তিনিই প্রথম 'ছবির বই'র সাহায্যে শিশুদের অক্ষর পরিচয় দানের প্রথার প্রচলন করেন।

প্রসিদ্ধ ফরাসী মনীষী রুশো তাঁর 'এমিল' বইতে সেই সময়ের শিক্ষা-পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং শিক্ষার নানা সমস্যা সম্বন্ধে নিজের মতামত দিয়ে গেছেন। যদিও তাঁর সিদ্ধান্ত বহুক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী,

অবাস্তব ও আবেগধর্মী তবুও বিস্ময়ের কথা এই যে শিক্ষার অনেক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর অভিমত ও সিদ্ধান্ত বর্তমান মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকেও প্রগতিশীলতায় দিক দিয়ে ছাড়িয়ে যায়। যখন তিনি বলছেন, যে "তোমার ছাত্রদের ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে তবে তোমার কাজ সুরু কর। কেননা একথা পরিষ্কার যে তুমি তাদের সম্বন্ধে কিছুই জান না।" বা "কথা কথা কথা.......নিজেদের অক্ষমতা ঢাকার জন্যই শিক্ষকেরা প্রাণহীন ভাষাকে শিক্ষার জন্য বেছে নিয়েছেন" কিংবা "প্রকৃতি চান যে শিশুরা পূর্ণবয়স্ক হবার আগে যেন শিশুই থাকে," তখন তিনি যে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আধুনিকতম সূত্রগুলির ভিত্তি রচনা করেছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানকে গড়ে তুলতে যাঁরা সাহায্য করে গেছেন তাঁদের মধ্যে পেষ্টালৎসির নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। তিনিই প্রথম শিক্ষাকে মনোবিজ্ঞানসম্মত করে তোলার জন্য আন্দোলন সুরু করেন এবং বাস্তবে সেই আন্দোলনকে রূপ দেবার চেষ্টা করেন।) মুনষ্টারবার্জের ভাষায় পেষ্টালৎসি মনোবিজ্ঞানের একজন বড় সমর্থক হলেও মনোবিজ্ঞানের 'অ-আ-ক-খ'ও তিনি জানতেন না। ফলে সত্যকারের মনোবিজ্ঞানসম্মত কোন শিক্ষাপ্রণালী তিনি উদ্ভাবন করে যেতে পারেন নি। তবুও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্রষ্টাদের একজন রূপে তাঁর নাম যে শিক্ষার ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মনোবিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে প্রথম শিক্ষণ-পদ্ধতি গড়ে তোলেন জার্মানীর জোয়ান হার্বার্ট। তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষাদানের পাঁচটি সোপান শিক্ষক সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে এবং বহু দেশে বহুদিন আদর্শ শিক্ষণ পদ্ধতি রূপে সমাদর লাভ করে এসেছে। অবশ্য আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বিচারে হার্বার্টের অনেক সিদ্ধান্তই বর্জিত হয়েছে।

জার্মানীর আর একজন শিক্ষাবিদ্ ফ্রেডরিক ফ্রয়েবেলের উদ্ভাবিত কিণ্ডার-গার্টেন শিক্ষাপদ্ধতিতে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের ব্যাপক প্রয়োগ দেখা যায়। যদিও ফ্রয়েবেল প্রধানত দার্শনিকই ছিলেন তবু তাঁর উদ্ভাবিত শিক্ষাব্যবস্থাটি মুখ্যত মনোবিজ্ঞানভিত্তিকই ছিল।

বিংশ শতাব্দীর সূত্রপাত হতে বহু শিক্ষাবিদ্ শিক্ষার সমস্যাগুলি মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাধান করতে সুরু করেন। এঁদের মধ্যে ফ্রান্সিস পার্কার, ষ্টানলি হল, জন ডিউই, মারিয়া মণ্টেসরী, কিলপ্যাট্রিক

প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের এবং আরও অনেকের সম্মিলিত অবদানে আজ শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়ে উঠেছে।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান কি একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান?

(শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে কোন বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র শাস্ত্র নয়) এটি সাধারণ মনোবিজ্ঞানেরই একটি শাখা-বিশেষ। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের যে সব গবেষণালব্ধ সূত্র সরাসরি শিক্ষার সমস্যা সমাধানে সক্ষম, সেগুলিই এই নতুন মনোবিজ্ঞানের মূলভিত্তি। সেগুলিকে আশ্রয় করে এবং শিক্ষার সমস্যাগুলি সামনে রেখে গবেষণা চালানোর ফলে যে সব নতুন সূত্র ও তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বর্তমান সুসমৃদ্ধ অবয়বটি সংগঠন করেছে। শিক্ষাকে সার্থক আয়াসহীন ও কার্যকর করে তুলতে হলে যে সব তথ্যের প্রয়োজন সেগুলি আবিষ্কার করাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ। ফলে এর গবেষণার ক্ষেত্র ও লক্ষ্য সাধারণ মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্র ও লক্ষ্য অপেক্ষা অনেকাংশে সীমাবদ্ধ ও বিশেষধর্মী হয়ে উঠেছে।

(শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান কেবলমাত্র সাধারণ মনোবিজ্ঞানের ফলিতরূপ নয় যদিও সাধারণ মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ থেকেই এর জন্ম। কেননা সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সূত্রগুলিকে কেবলমাত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেই এর কাজ শেষ হয় নি। বরং সেখানেই হয়েছে এর কাজের সুরু। সেই সূত্রগুলিকে ভিত্তি করে শিক্ষার সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপক গবেষণা চালানোই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই গবেষণালব্ধ নতুন তথ্যরাশির উপরই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের বর্তমান সৌধটি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে।

বস্তুত গবেষণাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রাণ। এর বর্তমান রূপ এবং ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ সবই নির্ভর করে গবেষণার সাফল্যের উপর। শিক্ষার সমস্যাগুলি সমাধান করে শিক্ষাকে সহজ ও সার্থক করে তুলতে হলে বহু বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার প্রয়োজন। কেমন করে শিক্ষার লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, কি পদ্ধতিতে শিক্ষাদান আয়াসহীন ও আনন্দদায়ক হতে পারে, কোন্ পরিস্থিতিতে শিক্ষা-প্রক্রিয়া সহজ ও কার্যকর হয়, কোন্ কোন্ সর্ত স্মৃতির সহায়ক হয় ইত্যাদি শিক্ষাঘটিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়াই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কাজ।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধি
(Scope of Educational Psychology)

শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তির সমস্ত আচরণই জড়িত। অতএব শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মসূচী মানব আচরণের সকল সমস্যার ক্ষেত্রেই বিস্তৃত। নীচে আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

১। শিখন প্রক্রিয়া

বলা বাহুল্য শিখন-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে গবেষণা চালানোই হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। প্রাণী কি পন্থায় শেখে, শিক্ষার বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও পরিমাপের সঙ্গে শেখার কার্যকারিতার কি সম্বন্ধ, মানসিক প্রক্ষোভ ও প্রেষণার উপর শিক্ষা কতটুকু নির্ভরশীল, কোন্ কোন্ পরিস্থিতি শিক্ষার অনুকূল বা প্রতিকূল ইত্যাদি শিক্ষাঘটিত সমস্যাগুলির সমাধান করাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান কাজ।

২। ব্যক্তিসত্তার বিকাশ

ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষার বিষয়বস্তু সুনির্বাচিত ও সুবিভক্ত করা হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আর একটি কাজ। সেই কারণে ব্যক্তিসত্তার বিকাশের বিভিন্ন দিকগুলি পর্যবেক্ষণ করাও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধির অন্তর্ভুক্ত।

৩। মানবসত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ

যদিও শিখন-প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট সমস্যাদি সমাধান করাই শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সর্বপ্রধান কাজ, তবুও শিক্ষার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আরও কতকগুলি বিষয়বস্তু আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের গবেষণার অন্তর্গত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন, শিশুর প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভের স্বরূপ, তার চাহিদা, আগ্রহের বৈশিষ্ট্য, মনোনিবেশের নিয়মাবলী, জন্মগত উত্তরাধিকারের প্রভাব, শাস্তি ও পুরস্কারের কার্যকারিতা ইত্যাদি মানবসত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির স্বরূপ নির্ণয়ও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মপরিধির অন্তর্গত।

৪। বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক শক্তি

শিক্ষার সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত হল শিক্ষার্থীর প্রকৃতিপ্রদত্ত বুদ্ধি এবং অন্যান্য মানসিক শক্তি। দেখা গেছে শিখনের উৎকর্ষ এবং দ্রুততা দুইই প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। বুদ্ধিমান ছেলে তাড়াতাড়ি শেখে, স্বল্পবুদ্ধির শিখতে দেরী হয়। তাছাড়া বিভিন্ন প্রকৃতির শিক্ষার সাফল্য

নির্ভর করে বিভিন্নধর্মী মানসিক শক্তির উপর। অতএব বুদ্ধি এবং অন্যান্য মানসিক শক্তির স্বরূপ পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কার্যসূচীর অন্তর্গত হয়েছে।

৫। পরীক্ষাগ্রহণ ও পরিমাপ

শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। শিক্ষার্থী কি পরিমাণে সে শিক্ষা গ্রহণ করল তা পরিমাপ করাও শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় অঙ্গ। স্কুল-কলেজে গতানুগতিক পরীক্ষা-গ্রহণের পদ্ধতি যে নানাদিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ, এমন কি বহুক্ষেত্রে ক্ষতিকরও এ সিদ্ধান্ত এখন সর্বজনস্বীকৃত। আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের একটি বড় কাজ হল বিজ্ঞানসম্মত সার্থক পরীক্ষা-ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা। দীর্ঘ গবেষণার ফলে আজকাল স্কুল-কলেজের পাঠ্যবিষয়গুলির উপর কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা (Educational Test) গঠন করা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বুদ্ধি, ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য, আগ্রহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগুলি পরিমাপ করার উপযোগী আধুনিক অভীক্ষাও আবিষ্কৃত হয়েছে।

৬। সামাজিক মনোবিজ্ঞান

শিক্ষার সঙ্গে সমাজের নিবিড় সম্পর্ক এতদিন শোচনীয়ভাবে অবহেলিত হয়ে এসেছিল। ফলে শিক্ষা হয়ে উঠেছিল পুরোপুরি অবাস্তব, নিছক তথ্য আহরণে সীমাবদ্ধ। সামাজিক মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং সামাজিক সমস্যাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

৭। সুপরিচালনা

ব্যক্তিকে তার ভবিষ্যৎ জীবনের শিক্ষা ও বৃত্তি সম্বন্ধে যথাযথ পরিচালনা দান করাও শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে ব্যক্তি তার যোগ্যতা ও পছন্দ অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু ও বৃত্তি বেছে নিতে পারে।

তিন

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি

(Methods of Educational Psychology)

যদিও স্বতন্ত্র শাস্ত্ররূপে মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে বহু বৎসর আগে তবুও এতদিন যে মনোবিজ্ঞান সত্যকার বিজ্ঞানের পর্যায়ে উঠতে পারেনি তার প্রধান কারণ হল যে এর অনুসৃত পদ্ধতিগুলি ছিল পুরোপুরি অবৈজ্ঞানিক। সে যুগের মনোবিজ্ঞানীরা মনে করতেন যে ব্যক্তির কথাবার্তা, আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে তাঁদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এবং গঠিত ধারণা থেকেই তার মনের প্রকৃতি ও গতি সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করা যায় এবং এই ধরনের অনুমান-প্রসূত সিদ্ধান্তের সাহায্যে মনোবিজ্ঞান গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু নিছক অতীতের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে গঠন করা সিদ্ধান্ত বা ধারণা কখনই অভ্রান্ত হতে পারে না এবং ফলে এই সব মনোবিজ্ঞানী যে সব সিদ্ধান্ত গঠন করতেন সেগুলি প্রায়ই পরস্পরবিরোধী হত এবং সেগুলি থেকে কোন ব্যাপারেই সর্বজনসম্মত তত্ত্ব গড়ে তোলা সম্ভব হত না। ফলে স্বভাবতই মনোবিজ্ঞান খেয়াল খুসীভরা জল্পনাকল্পনার গণ্ডী ছেড়ে একপাও এগোতে পারে নি। পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা মনোবিজ্ঞানের গবেষণায় সুনির্দিষ্ট এবং সুনিয়ন্ত্রিত নিরীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। ১৮৭৯ সালে জার্মান মনোবিজ্ঞানী ভুণ্ট (Wundt) লিপজিগে (Leipzig) প্রথম মনোবিজ্ঞানের গবেষণাগার স্থাপন করেন এবং তার পর থেকেই মনোবিজ্ঞানে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির ব্যাপক ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ সুরু হল।

ভুণ্ট এবং তাঁর কৃতী ছাত্রের দল মনোবিজ্ঞানমূলক গবেষণার নানা অভিনব পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। বিংশ শতাব্দীর সুরুতে মনোবিজ্ঞানের বহু নতুন নতুন শাখারও সৃষ্টি হয়। তাঁদের সকলের সম্মিলিত অবদানে মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির দ্রুত উন্নতি ঘটে। প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েডের (Freud) উদ্ভাবিত মানসিক প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের অভিনব পদ্ধতিগুলি মনোবিজ্ঞানকে, বিশেষ করে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানকে প্রচুর প্রভাবিত করেছে।

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতির ক্ষেত্রে সত্যকার যুগান্তর এনেছে সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতির (Statistical Method) উদ্ভাবন ও দ্রুত উন্নতি। ইতিপূর্বে দুই একটি পদ্ধতি ছাড়া মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিগুলিকে পুরোপুরি বিজ্ঞানসম্মত এবং সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন বলা চলত না। আধুনিক পরিসংখ্যান

প্রণালীর আবিষ্কারের ফলে এই পদ্ধতিগুলিকে পরিমার্জিত ও পরিশোধিত করে প্রায় ত্রুটিহীন এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়েছে।

১। নিরীক্ষণ পদ্ধতি (Experimental Method)

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান একটি গবেষণামূলক বিজ্ঞান। রসায়ন বিদ্যা, পদার্থ বিদ্যা, শরীরতত্ত্ব প্রভৃতির মত আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানেও পরীক্ষণ পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত হয়। কোন ঘটনা বা প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা এবং তার সঙ্গে অন্য ঘটনা বা প্রক্রিয়ার কার্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করার ক্ষেত্রে পরীক্ষণ পদ্ধতিই হল সর্বাপেক্ষা কার্যকর। আমরা জানি প্রকৃতি এক অবস্থায় একই রকম কার্য সম্পাদন করে। অর্থাৎ যদি কোন বিশেষ বিশেষ সর্তের অধীনে কোন একটি ঘটনা ঘটে, আর ঐ বিশেষ বিশেষ সর্তগুলির যদি পুনরাবির্ভাব ঘটানো যায়, তবে ঘটনাটিরও পুনরাবৃত্তি ঘটে। মানব আচরণও এক ধরনের প্রাকৃতিক ঘটনা। অতএব সে ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা সত্য হবে। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে আমরা কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সর্ত সৃষ্টি করে ঘটনাটি ঘটাই ও তার বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করি। ঐ বিশেষ বিশেষ সর্তগুলির মধ্যে যেটির অস্তিত্ব অপরিহার্য অর্থাৎ যেটি না থাকলে ঘটনাটি ঘটতে পারে না সেই সর্তটিকে খুঁজে বার করি। সর্তগুলির সব কটিই ঘটনাটি ঘটার পক্ষে অপরিহার্য নয়, কিন্তু যেটি অপরিহার্য সেটি সাধারণ ক্ষেত্রে অনাবশ্যক সর্তগুলির সঙ্গে এমনভাবে মিশে থাকে যে সেটিকে সহজে খুঁজে বার করা যায় না। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে এই অপরিহার্য সর্তটিকে খুঁজে বার করার জন্য একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বন করা হয়। তার নাম পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তন-সাধন (Varying the circumstances)। এই পন্থায় একটি ছাড়া আর সর্তগুলিকে অপরিবর্তিত রেখে ঐ বিশেষ সর্তকে পরিবর্তিত বা অপসারিত করে দেখা হয় যে ঐ বিশেষ সর্তটি ঘটনাটির প্রকৃত কারণ কি না। এভাবে প্রত্যেকটি সর্তকে স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করে ঘটনাটির প্রকৃত কারণটি বার করা হয়।

এই পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে বহু মানব-আচরণের সঠিক কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। বিশেষ করে অনেক ক্ষেত্রে যেটিকে আমরা পূর্বে কারণ বলে মনে করতাম, পরীক্ষণ পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে আজ তার অনেকগুলিই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, দ্রুত ও সন্তোষজনক পাঠশিক্ষার পক্ষে শাস্তিদান সহায়ক কি না, শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের এই প্রয়োজনীয় সমস্যাটির সমাধান নিম্নলিখিত পন্থায় পরীক্ষণ পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে।

পরীক্ষণমূলক ছাত্রদল (*Experimental Group*)	নিয়ন্ত্রিত ছাত্রদল (*Control Group*)
নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়	(একই) পাঠ্যবিষয়
—	—
নির্দিষ্ট পরিবেশ	(একই) পরিবেশ
—	—
নির্দিষ্ট শেখার ক্ষমতা	(একই) শেখার ক্ষমতা
—	—
নির্দিষ্ট পদ্ধতি	(একই) পদ্ধতি
—	—
শাস্তিদান	— — —
↓	↓
পাঠশিক্ষা	**পাঠশিক্ষা**

[শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সমস্যার সমাধানে পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রয়োগ]

দু'দল শিক্ষার্থীকে এমনভাবে বেছে নেওয়া হল যাদের শিখনের ক্ষমতা ও বুদ্ধি মোটামুটি একই রকম। এবার তাদের একই পরিবেশে একই পাঠ্য বিষয় একই পদ্ধতিতে শেখান হল। পার্থক্যের মধ্যে প্রথম দলকে শেখানোর সময় 'শাস্তির' ব্যবহার করা হল, দ্বিতীয় দলের ক্ষেত্রে কোনরূপ শাস্তির প্রয়োগ করা হল না। এখন যদি দেখা যায় যে প্রথম দল অর্থাৎ যারা শাস্তি পেয়েছে, দ্বিতীয় দল অর্থাৎ যারা শাস্তি পায়নি, তাদের অপেক্ষা দ্রুত বা ভাল পাঠ শিখেছে তবে বুঝতে হবে যে শাস্তিদান শিক্ষার সহায়ক। আর যদি দেখা যায় যে পাঠ শেখার দিক দিয়ে দু'দলের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, তবে বুঝতে হবে শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি দেওয়া বা না দেওয়া দুইই সমান। আর যদি দেখা যায় যে প্রথম দলের শিক্ষা দ্বিতীয় দলের শিক্ষা অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা মন্থর হয়েছে তবে বুঝতে হবে শাস্তিদান শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্ষতিকর।

প্রথম দলটি অর্থাৎ যাদের উপর শাস্তির প্রয়োগ করা হল, তাদের বলা হয় পরীক্ষণমূলক দল (Experimental Group)। আর দ্বিতীয় দলটি অর্থাৎ যাদের শাস্তি দেওয়া হল না, তাদের বলা হয় নিয়ন্ত্রিত দল (Control Group)।

পরীক্ষণ পদ্ধতির সাফল্যের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় হল, তিনটি বস্তু। প্রথম, যে ঘটনাটি নিয়ে পরীক্ষণ চালানো হবে (এখানে পাঠগ্রহণ) তার পুনরাবৃত্তি (Repetition)। পরীক্ষণের বিষয়বস্তুটির যদি পুনরাবৃত্তি ঘটানো না যায়, তবে তা নিয়ে পরীক্ষা চালানোই সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়, যে ব্যাপারটি নিয়ে পরীক্ষণ করা হচ্ছে (এখানে শাস্তিদান) সেটির উপরে আমাদের নিয়ন্ত্রণের (Control) ক্ষমতা থাকা দরকার এবং তৃতীয়, পরীক্ষণের বিষয়গুলি পরিবর্তনশীল (Variable) হওয়া চাই। যে বস্তু সর্বক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকে তার উপর পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ করা যায় না।

এখানে পাঠগ্রহণ, শাস্তিদান প্রভৃতি বিষয়গুলি পরিবর্তনশীল হওয়াতেই পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব হল।

২। ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতি (Developmental Method)

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ হল ব্যক্তিসত্তার মানসিক ও আচরণগত ক্রমবিকাশের স্বরূপ ও গতিভঙ্গী নির্ণয় করা। ব্যক্তির সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির ক্রমবিকাশ নিয়ন্ত্রিত হয়। এই প্রতিক্রিয়ার প্রভাব কি ভাবে কাজ করে, কোন্ অবস্থায় কি পরিবর্তন আনে, কখনই বা অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে ইত্যাদি জানার জন্য ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। এই পদ্ধতিতে শিশুর জন্ম থেকে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত বিকাশমান দিকগুলির পর্যবেক্ষণ করতে হয়। এই ধরনের পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্য দীর্ঘ সময় ও অধ্যবসায়ের প্রয়োজন হয়। সেজন্য পর্যবেক্ষণ সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত না হলে সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা থাকে। বুদ্ধি, অনুভূতি, সামাজিক সচেতনতা প্রভৃতি ব্যক্তিসত্তার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি নবজাত শিশুর মধ্যে নিতান্ত অঙ্কুরাবস্থায় থাকে। কেমন করে পূর্ণবয়স্কের ক্ষেত্রে সেগুলি সুপরিণত এবং জটিল হয়ে ওঠে—শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের এই মূল্যবান তথ্যগুলি পাওয়া গেছে এই ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতির সাহায্যে।

৩। কেস ষ্টাডি পদ্ধতি বা কেস হিষ্ট্রি পদ্ধতি
(Case Study Method or Case History Method)

ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতিতে আমরা ব্যক্তির ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তর প্রত্যক্ষ করি এবং সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের সিদ্ধান্ত গঠন করি। কিন্তু নানা কারণে সব সময়ে ঘটনাগুলির এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। যেমন, কোন মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী বা অপরাধ-প্রবণ বালক বা অসাধারণ কৃতীমান পুরুষ কেমন করে তার বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছল জানতে হলে তার অতীত ক্রমবিকাশের ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। এক্ষেত্রে আমাদের একমাত্র পদ্ধতি হল তার জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনাগুলির বিবরণ নানা স্থান থেকে সংগ্রহ করে পরে সেগুলিকে একত্রিত করে তার ক্রমবিকাশের একটি মোটামুটি সম্পূর্ণ ইতিহাস তৈরী করা। এই পদ্ধতিটিকে কেস স্টাডি বা কেস হিস্ট্রি পদ্ধতি বলা হয়।

ক্রমবিকাশমূলক পদ্ধতিতে ব্যক্তির ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংগ্রহ করা হয় প্রত্যক্ষভাবে, আর কেস ষ্টাডি বা কেস হিষ্ট্রি পদ্ধতিতে সেই কাজটিই করা হয় পরোক্ষভাবে। এই ইতিহাসের তথ্যগুলি সংগ্রহ করা হয় নানা পন্থায়,—কিছুটা ব্যক্তির নিজের ভাষণ থেকে, কিছুটা তার আত্মীয়স্বজন বন্ধু-প্রতিবেশী প্রভৃতিদের বিবরণ থেকে, আবার কিছুটা ব্যক্তির পরিবেশ, সমাজ জীবন প্রভৃতির প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে। সাধারণত কেস ষ্টাডিতে কি ধরনের তথ্যাদি সংকলিত করা হয় তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

১। ব্যক্তির নাম, ঠিকানা, জন্মদিন, বয়স, জন্মস্থান, বৃত্তি ইত্যাদি।

২। যে সমস্যার জন্য পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তার বিবরণ।

৩। পরিবার—মা, বাবা, ভাই, বোন, অন্যান্য আত্মীয় প্রভৃতির পরিচয়—বাড়ীতে তার প্রতি অন্য সকলের কি ধরনের মনোভাব।

৪। শিক্ষা—পরিবারের শিক্ষার মান। ব্যক্তির নিজস্ব আদর্শ ও তার পরিবারের শিক্ষার আদর্শের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব আছে কি না।

৫। স্বাস্থ্য, শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও দেহগত অন্যান্য তথ্য। যৌন বিকাশের বিবরণ।

৬। বুদ্ধির মান ও বিকাশ।

৭। প্রক্ষোভগত বিকাশ।

৮। সামাজিক বিকাশ, আচরণমূলক সমস্যাদি।

৯। বৃত্তি—আর্থিক সঙ্গতি।

১০। অভ্যাসমূলক বৈশিষ্ট্যাদি—বিশেষ আগ্রহ, হবি ইত্যাদি।

৪। চিকিৎসামূলক পদ্ধতি (Clinical Method)

বিংশ শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞানের পাশাপাশি আর একটি মানবহিতকর বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে। সেটি হল মনশ্চিকিৎসার শাস্ত্র (Psychiatry)। ফ্রয়েড, ইয়ুং (Jung), অ্যাডলার (Adler) প্রভৃতি প্রখ্যাত মানসিক ব্যাধির চিকিৎসকগণের দীর্ঘ গবেষণার ফলে আজ এই নতুন বিজ্ঞানটি পূর্ণাঙ্গ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ (Psycho-Analysis) থেকে পাওয়া মানসিক ব্যাধির স্বরূপ সম্বন্ধে এতদিন অজানা বহু মূল্যবান তথ্য মানসিক ব্যাধির চিকিৎসাকে আজ অনেক নির্ভরযোগ্য ও বিজ্ঞান-সম্মত করে তুলেছে। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কেননা শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের উপরই শিক্ষার কার্যকারিতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মনের দিক দিয়ে অসুস্থ ছাত্রের ক্ষেত্রে শিক্ষা অবাঞ্ছিত ফলেরই সৃষ্টি করে থাকে। ফলে মনশ্চিকিৎসার শাস্ত্রে প্রচলিত কতকগুলি পদ্ধতি ব্যাপকভাবে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হতে সুরু হয়েছে। যেমন—

ক। ফ্রয়েডের অবাধ-অনুষঙ্গ পদ্ধতি (Free-Association Method)

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে কোনরূপ দ্বিধা বা সংকোচ না করে তার মনে যে সব চিন্তা বা কথার উদয় হয় সেগুলি চিকিৎসকের কাছে সম্পূর্ণ ব্যক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। দেখা যায় যে এভাবে মনের কথা বিনা বাধায় ব্যক্ত করার ফলে মনের গভীর তলদেশে নিহিত অজ্ঞাত যে সব দ্বন্দ্ব থেকে তার মানসিক বিকার বা আচরণ-বৈষম্য দেখা দিয়েছিল সেগুলির প্রকৃত স্বরূপ চিকিৎসকের কাছে ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে। চিকিৎসকের পক্ষে তখন ব্যধির কারণ নির্ণয় করা সহজ হয়ে ওঠে।

খ। প্রতিফলন অভীক্ষা (Projective Test)

ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণের মূল নীতির উপর নির্ভর করে ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তির মনে অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভমূলক জটিলতার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য বহু অভিনব অভীক্ষা আজকাল আবিষ্কৃত হয়েছে। ব্যক্তির অপ্রকাশিত ব্যক্তি-সত্তাটি এই অভীক্ষাগুলির মাধ্যমে বাইরে প্রতিফলিত হয় বলে এগুলিকে প্রতিফলন অভীক্ষা (Projective Test) বলা হয়। রর্স্যা ইনকব্লট টেষ্ট (Rerschach Inkblot Test), কাহিনী সংবোধন অভীক্ষা (Thematic Apperception Test or TAT), শব্দ-অনুষঙ্গ অভীক্ষা (Word Association Test) ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

৪। প্রশ্নগুচ্ছ ও ব্যক্তিসত্তা-নির্ণায়ক প্রশ্নাবলী

(Questionnaire and Personality Inventory)

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে কতকগুলি বিশেষ প্রশ্নের লিখিত উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। ব্যক্তির দেওয়া উত্তরগুলি পরীক্ষা করে পরীক্ষক ব্যক্তির মানসিক সংগঠন, প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, মনোভাব প্রভৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে প্যারেন।

৫। পরিসংখ্যান পদ্ধতি (Statistical Method)

বিংশ শতাব্দীতে পরিসংখ্যান বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে পরিসংখ্যান পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ সুরু হয়েছে। ফলে শিক্ষাশ্রয়ী পরিসংখ্যান (Educational Statistics) নামে একটি নতুন বিজ্ঞান ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এই পদ্ধতির প্রয়োগের দ্বারা যেমন এক দিকে মানসিক এবং শিক্ষামূলক পরিমাপ-যন্ত্রগুলিকে বহুলাংশে ত্রুটিহীন করে তোলা হয়েছে, তেমনি আবার উপাদান-বিশ্লেষণ (Factor-Analysis) নামে নব আবিষ্কৃত প্রক্রিয়াটির সাহায্যে মানসিক কার্যের বিভিন্ন দিকগুলিকে বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন মানসিক শক্তির যথার্থ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন করাও সম্ভব হয়ে উঠেছে।

৬। অন্তর্নিরীক্ষণ (Introspection)

ব্যক্তি নিজেই যখন নিজের মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও কার্য পর্যবেক্ষণ করে তখন তাকে অন্তর্নিরীক্ষণ বলা হয়। যেমন, রাগ, দুঃখ বা আনন্দ হলে ব্যক্তির কি ধরনের অনুভূতি হয় কিংবা কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে সে কি ধরনের চিন্তা করে কিংবা অতীতের কোনও কিছু মনে করতে হলে কেমন করে মনের মধ্যে সেগুলিকে সে জাগিয়ে তোলে ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক কাজগুলি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য একমাত্র অন্তর্নিরীক্ষণের মাধ্যমেই সংগ্রহ করা যেতে পারে। অন্তর্নিরীক্ষণ নিছক মনের কথা বর্ণনা করা বা গল্পের ছলে নিজের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করা নয়। সুপরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নিজের মনের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়াকে সুনির্দিষ্ট ও সুসংহতভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং যতটা সম্ভব তার বাস্তব বিবরণ দেওয়াই হল সত্যকারের অন্তর্নিরীক্ষণ।

গত শতাব্দীতে অন্তর্নিরীক্ষণই ছিল মনোবিজ্ঞানের প্রধানতম পদ্ধতি। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রগতিশীল মনোবিজ্ঞানীরা বিশেষ করে আচরণবাদী

মনোবিজ্ঞানীরা অন্তর্নিরীক্ষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তাঁরা অন্তর্নিরীক্ষণের পদ্ধতির কতকগুলি অতি গুরুতর অসম্পূর্ণতার উল্লেখ করলেন। যথা, প্রথমত, এই পদ্ধতির উপর ব্যক্তির নিজের প্রভাব এত অধিক থাকে যে এ থেকে লব্ধ তথ্যগুলি মোটেই নির্ভরযোগ্য হয় না। দ্বিতীয়ত, মানসিক ঘটনাটি যখন প্রকৃতপক্ষে ঘটে তখন সেটিকে অন্তর্নিরীক্ষণ করা সম্ভবই হয় না। যাকে অন্তর্নিরীক্ষণ বলা হয় সেটি আসলে ঘটে মানসিক ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর। অর্থাৎ সেটি হয় প্রকৃতপক্ষে পশ্চাদ্‌নিরীক্ষণ (Retrospection)। এক কথায় প্রকৃত অন্তর্নিরীক্ষণ বাস্তবে ঘটেই না। সেই কারণেই সমস্ত অন্তর্নিরীক্ষণ অপরিহার্যভাবে ব্যক্তির কল্পনা, অনুমান, অতিরঞ্জন প্রভৃতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, শিশু, অশিক্ষিত, দুর্বল-ভাষা-সম্পন্ন ব্যক্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে অন্তর্নিরীক্ষণ সম্ভবপরই হয় না।

কিন্তু এত দোষ সত্ত্বেও অন্তর্নিরীক্ষণের উপযোগিতাকে একেবারে তুচ্ছ করা চলে না। মনের বিবিধ প্রক্রিয়াগুলি প্রত্যক্ষভাবে জানবার একমাত্র পন্থা হল অন্তর্নিরীক্ষণ। চিন্তা, কল্পনা, প্রক্ষোভের অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া, মনে করা, ভুলে যাওয়া প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির স্বরূপ একমাত্র অন্তর্নিরীক্ষণের মাধ্যমেই আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। এই কারণে অন্তর্নিরীক্ষণের মাধ্যমে পাওয়া তথ্যগুলি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য না হলেও, এগুলি যে সত্যকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রচুর সাহায্য করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অন্তর্নিরীক্ষণের ফলাফলকে গবেষণার চরম সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যদিও সম্ভব নয়, তবুও মনোবিজ্ঞানে, বিশেষ করে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে এগুলিকে বহুক্ষেত্রে বিকল্প তথ্যরূপে গ্রহণ করে সেগুলির উপর মূল্যবান বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্পন্ন করা সম্ভব।

এই সব কারণে অন্তর্নিরীক্ষণকে শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের স্বতন্ত্র একটি পদ্ধতি রূপে গ্রহণ করা না হলেও অন্যান্য পদ্ধতির সম্পূরকরূপে এটিকে গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

চার

আচরণের শ্রেণীবিভাগ (Types of Behaviour)

প্রতি প্রাণীকেই তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান (Adjustment) করে বা খাপ খাইয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে হয় এবং এই খাপ খাইয়ে নেওয়া বা সঙ্গতিবিধানের যে প্রচেষ্টা তার নামই আচরণ।

প্রাণীর আচরণকে মোটামুটি দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—শিক্ষাজাত (Learned) আর সহজাত (Unlearned)। শিক্ষাজাত আচরণ হল সেই সব আচরণ যা প্রাণী জন্মের পর পরিবেশের চাপে বা নিজের কোন চাহিদা পূরণের জন্য আয়ত্ত করে। আমাদের আশেপাশের যে কোন ব্যক্তির আচরণ বিশ্লেষণ করলে আমরা এই শ্রেণীর অসংখ্য শিক্ষাজাত আচরণের সন্ধান পাব, যেমন, কথা বলা, পোষাক পরা, রান্না করা, বই পড়া, ছবি আঁকা, বিবাহ করা, চাষ-বাস করা, খেলা করা, বাড়ীঘর তৈরী করা, তাস খেলা, ভোট দেওয়া, ধর্মাচরণ করা ইত্যাদি। মনুষ্যেতর প্রাণীর মধ্যেও শিক্ষাজাত আচরণের বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সার্কাসের যে কোন জন্তু বা বাড়ীর পোষ মানা জন্তুর কথা মনে করলেই এর উদাহরণ পাওয়া যাবে।

আচরণ
- শিক্ষাজাত
- সহজাত
  - রিফ্লেক্স
  - শরীরতত্ত্বমূলক আচরণ
  - প্রবৃত্তিমূলক আচরণ

সহজাত আচরণ বলতে সেই সব আচরণকে বোঝায় যেগুলি কোনরূপ শিক্ষা থেকে প্রসূত নয়, অর্থাৎ যে আচরণগুলি সম্পন্ন করার ক্ষমতা নিয়েই প্রাণী জন্মায় এবং যখনই প্রয়োজন দেখা দেয় কোনরূপ শিক্ষা বা পূর্ব অভিজ্ঞতা ছাড়াই সেগুলি সে সম্পাদন করতে পারে। সহজাত আচরণ আবার তিন প্রকারের হতে পারে। প্রথম, রিফ্লেক্স (Reflex), দ্বিতীয়, শরীরতত্ত্বমূলক আচরণ (Physiological Behaviour) এবং তৃতীয়, প্রবৃত্তিমূলক আচরণ (Instinctive Behaviour)।

১। রিফ্লেক্স (Reflex)

রিফ্লেক্স হল সহজাত আচরণের সরলতম রূপ। সময় সময় কোন বিশেষ জৈবিক প্রয়োজনের তাগাদায় কোন দৈহিক যন্ত্র ব্যক্তির কোনরূপ প্রচেষ্টার অপেক্ষা না রেখেই সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ঐ বিশেষ প্রয়োজনটি মেটাবার

ব্যবস্থা করে নেয়। দেহের এই স্বতঃসঙ্গতি-বিধানের প্রক্রিয়াকে রিফ্লেক্স্ বলা হয়। যেমন, চোখের মধ্যে ধূলো বা বালি পড়ার উপক্রম হলে চোখের পাতা আপনা আপনিই তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়। নাকের ঝিল্লীতে কিছু ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে হাঁচি হয়। শ্বাসনালীতে খাদ্যকণা ঢুকলে বিষম লাগে। এই সব জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করতে ব্যক্তির কোনরূপ ইচ্ছা বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এই কাজগুলি দেহযন্ত্র স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সম্পাদন করে। হাই তোলা, বমি করা, হাসা, ঢেকুর তোলা, কাসা প্রভৃতিও রিফ্লেক্সের উদাহরণ। এ সবগুলিই কোন না কোন পারিবেশিক পরিবর্তনের সঙ্গে বাঞ্ছিত সঙ্গতি-বিধানের উদ্দেশ্যে দেহের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা বিশেষ। হাঁটুর ঠিক নীচে যদি শক্ত কিছু দিয়ে ঘা দেওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পা-টি সবেগে ঝাঁকানি দিয়ে উঠবে। এর নাম হাঁটু-ঝাঁকানি (Kneo-jerk) রিফ্লেক্স। অধিকাংশ গ্রন্থির রস নিঃসরণও একপ্রকারের রিফ্লেক্স। যেমন, জিভের লালাক্ষরণ, চোখের জল পড়া, ঘাম পড়া প্রভৃতি হল রিফ্লেক্স জাতীয় আচরণ।

রিফ্লেক্সও অন্যান্য আচরণের মত পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের প্রয়াস। তবে অন্যান্য আচরণের তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত অনেক সরল, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য এবং এর আবির্ভাবের কারণ দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।[১]

২। শরীরতত্ত্বমূলক আচরণ (Physiological Behaviour)

রিফ্লেক্সের সমগোত্রীয় আর এক ধরনের সহজাত আচরণ হল শরীরতত্ত্ব-মূলক (Physiological) প্রক্রিয়াগুলি, যেমন, হৃদ্স্পন্দন, রক্তচলাচল, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, পরিপাচন প্রক্রিয়া ইত্যাদি। রিফ্লেক্সের মত এগুলিও স্বতঃপ্রণোদিত এবং ব্যক্তির প্রচেষ্টা-নিরপেক্ষভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে। কোন কোন শরীর-তত্ত্বমূলক আচরণ ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের অধীন, আবার কোন কোনটির উপর ব্যক্তির কোন নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে না। রক্ত চলাচল, হৃদ্স্পন্দন, পরিপাচন ক্রিয়া প্রভৃতি শরীরতত্ত্বমূলক প্রক্রিয়াগুলির উপর ব্যক্তির কোনরূপ নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা নেই। কিন্তু নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস রূপ শরীরতত্ত্বমূলক প্রক্রিয়াটি ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণের অধীন।

৩। সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct)

সহজাত আচরণের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে প্রাণীর প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি।

১। রিফ্লেকসের শারীরিক সংগঠন সম্বন্ধে আলোচনার জন্য পৃঃ ১৬৬—পৃঃ ১৬৮ দ্রষ্টব্য।

(Instinctive behaviours)। (এই সহজাত প্রবৃত্তির (Instinct) স্বরূপ ও কাজ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে বহুদিন ধরে তর্ক বিতর্ক চলে আসছে এবং এ সম্বন্ধে বহু বিভিন্ন ও পরস্পরবিরোধী মতবাদ পাওয়া যায়।) প্রবৃত্তি সম্বন্ধে এই মতবাদগুলিকে প্রধানত দু'ভাগে ভাগ করা যায়—প্রাচীন ও আধুনিক। প্রাচীনপন্থীদের মধ্যে ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগালের তত্ত্বটি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং তাঁর তত্ত্বটিকেই প্রবৃত্তি সম্বন্ধে প্রচীনপন্থী মতবাদের প্রতিনিধিস্বরূপ বলা চলে। অতএব এটি ভাল করে জানা হলে প্রাচীন মতবাদগুলির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলিও জানা হয়ে যাবে। ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি-বাদ আবার শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ায় আমরা এখানে এই মতবাদটির বিশদভাবে আলোচনা করব।

ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি-তত্ত্ব (McDougall's Theory of Instinct)

ম্যাকডুগালের মতে মানুষ এমন কতকগুলি সহজাত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রবণতা (Tendencies) নিয়ে জন্মায় যেগুলি হল তার ব্যবহারিক জীবনের সমস্ত চিন্তা এবং কাজের অপরিহার্য উৎস বা প্রেষণা শক্তি (Motive power)। তিনি এই সহজাত প্রবণতাগুলির নাম দিয়েছেন ইনষ্টিংক্ট (Instinct) বা প্রবৃত্তি।



ইনষ্টিংক্ট বা সহজাত প্রবৃত্তির সংগঠন

প্রবৃত্তির স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে প্রবৃত্তি হল কতকগুলি সহজাত বিশেষধর্মী মানসিক সংগঠন যেগুলি কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি প্রাণীর মধ্যে থাকে—এমন কতকগুলি জাতিগত বৈশিষ্ট্য যেগুলি প্রাণীর পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়ার ফলে ধীরে ধীরে আবির্ভূত হয়েছে এবং যেগুলি মনের প্রকৃতির জন্মগত উপাদান হওয়ায় কখনই মন থেকে দূর করে ফেলা যায় না এবং যেগুলি কোন উপায়েই প্রাণী তার জীবনকালে আহরণ করতে পারে না।

প্রবৃত্তির এই সংব্যাখ্যানকে ভিত্তি করে ম্যাকডুগাল প্রবৃত্তির নিম্নরূপ সংজ্ঞা দিলেন। প্রবৃত্তি একটি সহজাত বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জৈব-মানসিক

1. Social Psychology—McDougall

প্রবণতা (Psycho-physical disposition) যা তার অধিকারীকে প্রবৃত্ত করে (ক) কোন একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বস্তু প্রত্যক্ষ করতে বা তাতে মনোযোগ দিতে, (২) সেই বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর কোন বিশেষ প্রকৃতির প্রক্ষোভ (Emotion) অনুভব করতে এবং (৩) সেই বস্তু সম্বন্ধে বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করতে বা অন্তত সেভাবে কাজ করার একটা প্রেরণা অনুভব করতে।

ম্যাকডুগালের দেওয়া প্রবৃত্তির এই সংজ্ঞা থেকে প্রবৃত্তির কার্যপ্রণালীর চারটি স্বতন্ত্র সোপান দেখতে পাওয়া যায়। যথা—

প্রথম সোপানে

প্রবৃত্তিমূলক আচরণটি জাগাতে পারে এমন একটি উদ্দীপক ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করে বা তাতে মনোযোগ দেয়। যেমন, মনে করা যাক কোন ব্যক্তি হঠাৎ দেখতে পেল যে একটা পাগলা কুকুর তার দিকে ছুটে আসছে। এই সোপানটিকে প্রবৃত্তির উপলব্ধিমূলক বা জ্ঞানমূলক (Cognitive) দিক বলা যেতে পারে।

দ্বিতীয় সোপানে

উদ্দীপক প্রত্যক্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তার মনে বিশেষ প্রক্ষোভের অনুভূতি জাগবে। পাগলা কুকুরটাকে তার দিকে ছুটে আসতে দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার মনে ভয়রূপ প্রক্ষোভ জাগলো। এটি হল প্রবৃত্তির অনুভূতিমূলক (Affective) দিক। ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থলে আছে একটি করে বিশেষ প্রক্ষোভ এবং কোন প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ঘটার পক্ষে প্রবৃত্তির এই কেন্দ্রগত প্রক্ষোভটির জাগরণ অপরিহার্য। ম্যাকডুগালের মতে প্রক্ষোভই প্রবৃত্তি-জাত আচরণের পশ্চাতে প্রেষণামূলক শক্তি জোগায়।

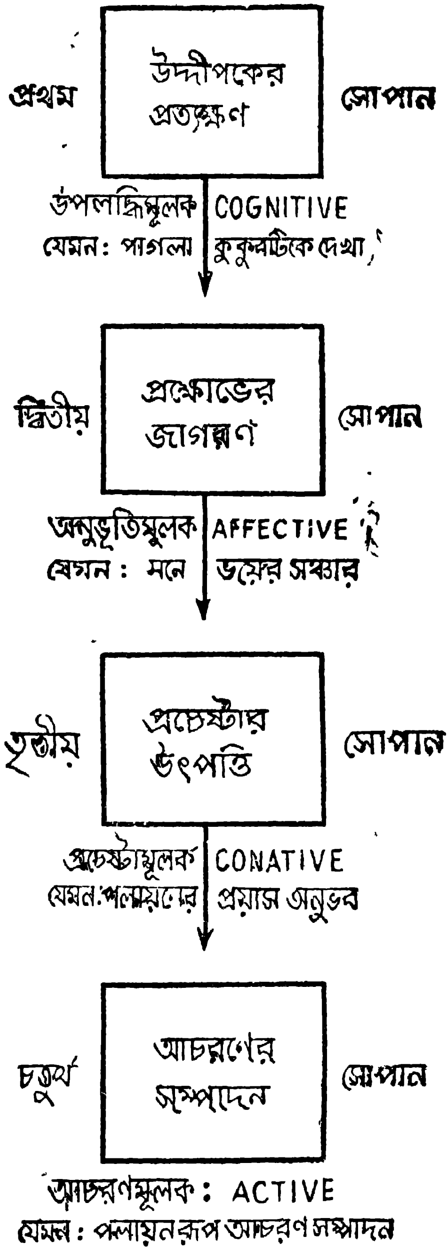
তৃতীয় সোপানে

প্রক্ষোভ জাগার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় বিশেষ একটি পদ্ধতিতে কাজ করার তীব্র তাড়না (Impulse)। যেমন, পাগলা কুকুর দেখে ভয় জাগার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির মনে তীব্র ইচ্ছা হল পালাবার। এটা হল প্রবৃত্তির প্রচেষ্টামূলক বা প্রয়াসমূলক (Conative) দিক। এই প্রচেষ্টার প্রকৃতি হল মানসিক ও দৈহিক উভয় শ্রেণীর প্রবণতার সংমিশ্রণ।

চতুর্থ সোপানে

প্রয়াস বা প্রচেষ্টাটি বাস্তবে আচরণের রূপ নিয়ে প্রকাশ পায়। অর্থাৎ পালাবার তাড়না মনে অনুভব করার পরে যখন ব্যক্তি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে সুরু করল তখন সত্যকার প্রবৃত্তিমূলক আচরণটি (Instinctive behaviour) সংঘটিত হল। এটি হল প্রবৃত্তির দৈহিক অভিব্যক্তি বা আচরণ-মূলক (Active) দিক।

উপরের উদাহরণে বর্ণিত প্রবৃত্তির নাম পলায়ন-প্রবৃত্তি এবং এর কেন্দ্রগত প্রক্ষোভটির নাম হল ভয় এবং তার আচরণ হল পালানো-রূপ কাজটি।



প্রবৃত্তিমূলক আচরণ ঘটার পক্ষে উপরের প্রত্যেকটি সোপানই অপরিহার্য। মাঝে যে কোন একটি সোপান বাদ গেলে সেখানেই প্রবৃত্তির কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। যেমন পাগলা কুকুর দেখে মনে ভয় না জাগলে পালাবার তাড়না অনুভূত হয় না। আর পালাবার তাড়না অনুভূত না হলে পালানো কাজটিও ঘটবে না।

ম্যাক্‌ডুগালের মতে কৌতূহল হল এরকম আর একটি সহজাত প্রবৃত্তি, আর তার কেন্দ্রগত প্রক্ষোভের নাম হল বিস্ময়। পথে যেতে যেতে এক ব্যক্তি একটি চকচকে জিনিস রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখল। (প্রথম সোপান—প্রত্যক্ষণ); তা দেখে তার মনে বিস্ময় জাগলো (দ্বিতীয় সোপান—প্রক্ষোভের জাগরণ); সঙ্গে সঙ্গে জিনিষটি কুড়িয়ে নেবার একটি তীব্র ইচ্ছা সে অনুভব করল (তৃতীয় সোপান—ইচ্ছার অনুভূতি); শেষে সেটা সে কুড়িয়ে নিল (চতুর্থ সোপান—আচরণ)।

ম্যাক্‌ডুগালের মতে ইনষ্টিংক্ট বা প্রবৃত্তির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক (Affective-Conative) কেন্দ্রটি। অর্থাৎ এর কেন্দ্রে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ থাকার ফলে, উপযুক্ত উদ্দীপকের আবির্ভাবে সেই কেন্দ্রগত সুপ্ত প্রক্ষোভটি জেগে ওঠে এবং প্রাণীর মধ্যে একটি বিশেষ প্রচেষ্টার সৃষ্টি করে। ম্যাকডুগালের মতে সেই জন্য প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ। এই প্রবৃত্তির কেন্দ্রগত বিশেষ প্রক্ষোভটি অনেকটা মোটরগাড়ীর ইঞ্জিনের মত। এটি সচল হলে তবে প্রবৃত্তিরূপ গাড়ীখানা চলবে। যেমন পলায়নরূপ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ হল ভয়। কৌতূহলরূপ প্রবৃত্তির প্রক্ষোভ হল বিস্ময়। একথা মনে রাখতে হবে যে প্রবৃত্তির যে প্রক্ষোভ, সেই প্রক্ষোভের জাগরণ ছাড়া সেই বিশেষ প্রবৃত্তিটি সক্রিয় হবে না। অর্থাৎ ভয় ছাড়া পলায়ন প্রবৃত্তি কাজ করবে না, বিস্ময় ছাড়া কৌতূহল জাগবে না।

ম্যাকডুগাল আরও বলেন সহজাত আচরণটির পরিণতি ঘটতে পারে দু' ধরনের অনুভূতিতে। যদি প্রবৃত্তিজাত আচরণটি বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং তার অভীষ্ট লক্ষ্যে গিয়ে পৌছতে পারে তবে একটা সুখ এবং তৃপ্তির আনন্দজনক অভিজ্ঞতা অনুভূত হবে। আর যদি সহজাত আচরণটি কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তবে একটা অতৃপ্তির অনুভূতিতে সেই আচরণের পরিণতি ঘটবে।

মানব প্রবৃত্তির তালিকা

ম্যাকডুগাল যখন প্রথম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির তালিকা প্রস্তুত করেন তখন তিনি মোট ১৪টি প্রক্ষোভের নাম করেন। তাদের সহগামী ১৪টি প্রক্ষোভ সমেত সেই ১৪টি প্রবৃত্তির তালিকাটি নীচে দেওয়া হল।

১। **পলায়ন** (ESCAPE) — **ভয়** (FEAR)

বিপদ সম্বন্ধে সচেতনতা ভয় জাগার প্রধান কারণ। বিপদ বলতে বোঝায়

দৈহিক বা সামাজিক নিরাপত্তার কোনরূপ অভাব। উচ্চশব্দ, আকস্মিক চীৎকার, শারীরিক ব্যথা, দুর্বোধ্য বা রহস্যময় কিছু, অনিশ্চয়তা প্রভৃতিও ভয় জাগার কারণ। এই প্রবৃত্তিটির আচরণ হল ভয়ের কারণ থেকে ছুটে দূরে চলে যাওয়া এবং নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করা।

২। যুযুৎসা — ক্রোধ
(COMBAT) — (ANGER)

যে কোনরূপ প্রবৃত্তিজাত আচরণে বাধা সৃষ্টি হলেই মনে ক্রোধ জাগে এবং বাধার কারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়। ক্ষুধার খাদ্য যদি কেউ কেড়ে নেবার চেষ্টা করে, কিংবা সন্তানসন্ততির প্রতি যদি কেউ কোনরূপ বিদ্বেষজনক আচরণ করে তবে ক্রোধ দেখা দেবে এবং যুযুৎসা প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে উঠবে।

৩। ঘৃণা — বিরক্তি
(REPULSION) — (DISGUST)

নোংরা কিছু স্পর্শ করলে প্রাণীর মধ্যে বিরক্তি আসে এবং বস্তুটির প্রতি ঘৃণা জন্মায়। এই প্রবৃত্তির আদিমতম রূপ হল যখন মুখের মধ্যে নোংরা কিছু প্রবেশ করে তখন তা মুখ থেকে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ফেলে দেওয়া। এই জন্যই থুথু ফেলা যে কোন রূপ ঘৃণা প্রকাশের একটি সর্বজনীন অভিব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ম্যাকডুগালের মতে এই প্রবৃত্তিটির সঙ্গে পলায়ন প্রবৃত্তির সম্পর্ক খুবই নিকট।

৪। বাৎসল্য — মমতা
(PARENTAL) — (TENDER EMOTION)

সন্তানকে বিপদ থেকে রক্ষা করা, তার ক্ষুধার খাদ্য সরবরাহ করা প্রভৃতি হল বাৎসল্য প্রবৃত্তির প্রকাশ। এর প্রক্ষোভ হল মমতা বা স্নেহ। সাধারণত সন্তানের অসহায় অবস্থা দেখলে বা কাতর চীৎকার শুনলে পিতামাতার মধ্যে এই প্রক্ষোভ জাগে। ম্যাকডুগালের মতে মানুষের এই প্রবৃত্তি নানা পরিবর্তিত রূপে প্রকাশ পায়।

৫। অনুনয় — দুঃখবোধ
(APPEAL) — (DISTRESS)

যখন প্রাণী দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন উপায় খুঁজে পায় না এবং নিজেকে অসহায় বলে মনে করে তখন তার মধ্যে অনুনয় প্রবৃত্তি দেখা দেয়। প্রাণী তার চেয়ে যাকে অধিকতর ক্ষমতাবান বলে মনে করে তার কাছে সে দুঃখ থেকে মুক্তি পাবার জন্য আবেদন জানায়।

৬। যৌনপ্রবৃত্তি — কাম
(MATING) — (LUST)

সাধারণত নারীর ক্ষেত্রে পুরুষ এবং পুরুষের ক্ষেত্রে নারী হল যৌন-প্রবৃত্তি জাগরণের কারণ। কতকগুলি বিশেষ দৈহিক যৌনবৈশিষ্ট্য বা যৌনচিহ্নও এই প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে উদ্দীপকের কাজ করে থাকে। এই প্রবৃত্তির আচরণও প্রধানত দেহগত। ফ্রয়েডের মতে এই প্রবৃত্তিটিই প্রাণীর সমগ্র জীবন-প্রচেষ্টার মূলে। তিনি এই প্রবৃত্তিটির নাম দিয়েছেন লিবিডো (Libido)।

৭। কৌতূহল — বিস্ময়
(CURIOSITY) — (WONDER)

কোন কিছু নতুন, দুর্বোধ্য, পূর্বে না দেখা এবং যার স্বরূপটি পুরোপুরি বোঝা যায় না—এমন বস্তু প্রাণীর মনে বিস্ময় জাগায় এবং সেটিকে ভাল করে জানার জন্য তার মধ্যে কৌতূহলরূপ প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

৮। বশ্যতা — হীনমন্যতা
(SUBMISSION) — (NEGATIVE SELF-FEELING)

নিজের চেয়ে যাকে বড় বলে মনে করা যায়, এমন কোনও ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হলে প্রাণীর মধ্যে নিজের সম্বন্ধে একটা হীনভাব জাগে এবং সেই উচ্চতর ব্যক্তির কাছে বশ্যতা স্বীকার করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

৯। আত্ম-প্রতিষ্ঠা — আত্মগরিমা
(SELF-ASSERTION) — (POSITIVE SELF-FEELING)

এই প্রবৃত্তিটি বশ্যতা প্রবৃত্তির ঠিক বিপরীত। নিজের চেয়ে ছোট কারও উপস্থিতিতে প্রাণীর মধ্যে আত্মগরিমারূপ প্রক্ষোভ জাগে এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রবৃত্তি দেখা দেয়।

১০। যৌথ-প্রবৃত্তি — একাকিত্ববোধ
(GREGARIOUS) — (FEELING OF LONELINESS)

প্রাণীর মধ্যে দলবদ্ধভাবে বাস করাটা প্রবৃত্তিমূলক। কোন প্রাণী নিজের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে সে নিজেকে একা মনে করে এবং তার মধ্যে স্বজাতীয়দের সঙ্গে দল বাঁধার প্রবৃত্তি জাগে। এই প্রবৃত্তিটির কেন্দ্রীয় প্রক্ষোভ হল একাকিত্ববোধ।

১১। খাদ্য-অন্বেষণ — ক্ষুধা
(FOOD-SEEKING) — (GUSTO)

প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন খাদ্য। সেই জন্য খাদ্য-অন্বেষণ হল

সকল প্রকার প্রাণীর মধ্যেই প্রবলতম প্রবৃত্তি। ক্ষুধার অনুভূতি হল এর কেন্দ্রীয় প্রক্ষোভ।

১২। সঞ্চয় স্বত্ব-বোধ
(ACQUISITION) (FEELING OF OWNERSHIP)

প্রাণীর কোন চাহিদা মেটাতে পারে এমন বস্তু দেখলেই সেটিকে নিজের অধিকারে আনা এবং সঞ্চিত করে রাখার প্রবৃত্তি তার মধ্যে জন্মায়। এর কেন্দ্রগত প্রক্ষোভ হল বস্তুটির উপর অধিকারের অনুভূতি।

১৩। নির্মাণ সৃজনী-স্পৃহা
(CONSTRUCTION) (FEELING OF CREATING)

প্রাণীর নিজের এবং তার আত্মীয়দের জন্য আবাসগৃহ নির্মাণের স্পৃহা থেকেই এই প্রবৃত্তির সুরু। পরে অন্যান্য বস্তু নির্মাণ করার প্রচেষ্টায় এই প্রবৃত্তির প্রয়োগ দেখা যায়। নতুন কিছু সৃষ্টি করার অনুভূতি হল এর কেন্দ্রীয় প্রক্ষোভ।

১৪। হাস্য আমোদ
(LAUGHTER) (AMUSEMENT)

ম্যাকডুগালের মতে ক্রোধ এবং সহানুভূতি এই দু'য়ের মাঝামাঝি প্রক্ষোভ হল আমোদবোধ। বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে আমরা ক্রোধ বা সহানুভূতি বোধ করতে পারি। যখন আমরা এই দু'য়ের একটিও বোধ করি না, তখন আমরা হাসি।

ম্যাকডুগালের প্রবণতা তত্ত্ব
(McDougall's Theory of Propensity)

প্রবৃত্তি-মতবাদটি প্রচারের পর ম্যাকডুগাল তাঁর পরবর্তী বইতে[1] প্রপেনসিটি (Propensity) বা প্রবণতা বলে আর একটি কথার ব্যবহার করেছেন। এর দ্বারা অবশ্য তিনি ইনষ্টিংক্ট কথাটি বাতিল করেন নি বা তাঁর প্রবৃত্তি মতবাদের মধ্যে কোন বিশেষ নতুনত্ব আনেন নি। সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত যে প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক কেন্দ্রটি আছে এবং যে কেন্দ্রটির জন্য প্রবৃত্তিমূলক আচরণ একটি বিশেষ নির্দিষ্ট গতিধারা বা সংগঠন ধরে এগোয় সেই কেন্দ্রটিরই তিনি প্রবণতা বলে স্বতন্ত্র একটি নাম দিয়েছেন।

মানুষের এই সহজাত কর্মপ্রবণতার পরিচয় দিতে গিয়ে ম্যাকডুগাল তাঁর পূর্বের চোদ্দটি প্রবৃত্তির সঙ্গে আরো কয়েকটি নতুন নাম যোগ করেছেন

1. The Energies of Man—McDougall

এবং তাঁর এই পরের তালিকা অনুযায়ী মানুষের সহজাত কর্মপ্রবণতার সংখ্যা দাঁড়ায় মোট সতেরটি। নীচে সেগুলির নাম ও কাজের বর্ণনা দেওয়া হল।

প্রবণতা (Propensity)	তার কাজ (Function)
১। খাদ্য অন্বেষণ প্রবণতা (Food-seeking propensity)	খাদ্য সংগ্রহ এবং সঞ্চয় করা।
২। বিরক্তি প্রবণতা (Disgust propensity)	কতকগুলি ঘৃণা-উৎপাদক বস্তু পরিহার করা এবং সেগুলি থেকে দূরে থাকা।
৩। যৌন প্রবণতা (Sex propensity)	সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কামনা করা এবং তার সঙ্গ করা।
৪। ভীতি প্রবণতা (Fear propensity)	ব্যথা বা আঘাত দিতে সমর্থ এমন কিছুর অভিজ্ঞতা থেকে পালানো এবং নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া।
৫। কৌতূহল প্রবণতা (Curiosity propensity)	নতুন কোন বস্তু বা স্থান পরীক্ষা করা।
৬। রক্ষণ বা বাৎসল্য প্রবণতা (Protective or Parental propensity)	শিশুকে খাওয়ান, বিপদ থেকে রক্ষা করা এবং আশ্রয় দেওয়া।
৭। যৌথ প্রবণতা (Gregarious propensity)	সমজাতীয়দের সঙ্গ করা এবং দলভ্রষ্ট হয়ে পড়লে দলে ফিরে আসার চেষ্টা করা।
৮। আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবণতা (Self-assertive propensity)	স্বজাতীয়দের উপর শাসন ও প্রভুত্ব করা, নিজেকে প্রতিষ্ঠা বা জাহির করা।
৯। বশ্যতা প্রবণতা (Submissive propensity)	অধিকতর শক্তিমানকে সম্মান দেখানো, তার অনুসরণ করা এবং তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা।
১০। ক্রোধ প্রবণতা (Anger propensity)	কোন প্রবণতার প্রকাশে বাধার সৃষ্টি হলে রাগ করা এবং সেই বাধা জোর করে দূর করার চেষ্টা করা।
১১। আবেদন প্রবণতা (Appeal propensity)	নিজের ক্ষমতা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে গেলে সাহায্যের জন্য উচ্চস্বরে চীৎকার করা।
১২। সৃজন প্রবণতা (Constructive propensity)	আশ্রয়স্থল ও উপকরণাদি নির্মাণ করা।

১৩।	সঞ্চয় প্রবণতা (Acquisitive propensity)	প্রয়োজনীয় বা আকর্ষণীয় কিছু সংগ্রহ করা বা নিজের আয়ত্তে আনা এবং তা সংরক্ষণ করা।
১৪।	হাস্য প্রবণতা (Laughter propensity)	অপরের ত্রুটি বা অসাফল্যে হাসা।
১৫।	আরাম প্রবণতা (Comfort propensity)	অস্বস্তিকর বা আরামনাশক কোন কিছু থেকে দূরে থাকা।
১৬।	বিশ্রাম বা নিদ্রা প্রবণতা (Rest or Sleep propensity)	ক্লান্ত হলে শোওয়া, বিশ্রাম নেওয়া বা ঘুমানো।
১৭;	পরিব্রাজন প্রবণতা (Migratory propensity)	নতুন নতুন স্থানে ঘুরে বেড়ানো।

উপরের ১৭টি প্রবণতা ছাড়াও ম্যাকডুগালের মতে মানুষের একাধিক অতি সরল এবং সাধারণধর্মী প্রবণতা আছে। এগুলির প্রধান কাজ হল দেহের বিশেষ চাহিদা মেটানো, যেমন নিশ্বাস ফেলা, কাসা ইত্যাদি। ম্যাকডুগাল যে এগুলিকে রিফ্লেক্স না বলে প্রবণতা বলে বর্ণনা করেছেন তার প্রধান কারণ হল যে তাঁর মতে এগুলির সম্পাদনের পেছনেও প্রচেষ্টা-প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি আছে।

ম্যাকডুগালের দেওয়া এই নতুন প্রবণতার তালিকাটির সঙ্গে আগের দেওয়া প্রবৃত্তির তালিকাটির নামের দিক দিয়ে খুব বড় একটা পার্থক্য নেই। কিন্তু প্রবৃত্তি কথাটির স্থানে প্রবণতা কথাটির ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে ম্যাকডুগাল একটি বড সত্য স্বীকার করে নিয়েছেন। সেটা হচ্ছে, প্রবৃত্তিমূলক আচরণ বলতে যে বাঁধাধরা অপরিবর্তনীয় আচরণ বোঝায় তা মানুষের ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। সাধারণত প্রবৃত্তি হল এমন একটি সহজাত অন্ধ শক্তি যার তাড়না প্রতিহত করার মত ক্ষমতা প্রাণীর নেই। প্রবৃত্তির গতিবেগ অদম্য। যেমন, মৌমাছি চাক বাঁধবেই, গুটিপোকা গুটি তৈরী করবেই। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই ধরনের অন্ধ অদম্য অমোঘ প্রবৃত্তির কাজ খুব অল্পই দেখা যায়। ম্যাকডুগাল যখন প্রথম তাঁর প্রবৃত্তি মতবাদ প্রচার করেন তখন মানুষ এবং মানুষেতর প্রাণীর মধ্যে প্রবৃত্তির কাজের দিক দিয়ে তিনি কোন প্রভেদ করেন নি। কিন্তু পরে মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির পরিবর্তে প্রবণতা কথাটির ব্যবহার করায় তিনি মানব আচরণের অসীম পরিবর্তনশীলতা ও বৈচিত্র্য স্বীকার করে নিয়েছেন।

সহজাত প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য

ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করলে প্রবৃত্তির নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যায়।

১। প্রবৃত্তি সহজাত, শিক্ষা প্রসূত নয়। মানব-শিশুর ক্ষেত্রে স্তন্যপান করা, হাঁসের বাচ্চার ক্ষেত্রে সাঁতার কাটা, মুরগীর বাচ্চার ক্ষেত্রে পাথর-কুচি ঠুকরে খাওয়া ইত্যাদি কাজগুলি কোনরূপ পূর্ব শিক্ষা ছাড়াই সম্পন্ন হয়ে থাকে।

২। এই কাজগুলি শিক্ষা-প্রসূত না হলেও এগুলিতে পটুত্বের অভাব হয় না এবং যে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য এগুলির উদ্ভব সে সে উদ্দেশ্যের পক্ষে এগুলি যথেষ্ট। পাখীর বাসা তৈরী করা, মৌমাছির চাক বাঁধা ইত্যাদি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৩। ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর উদ্দেশ্যমূলক (Purposive) স্বরূপটি। কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণই উদ্দেশ্যহীন নয় এবং প্রত্যেকটি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যই সৃষ্ট।

৪। এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য মূলত প্রাণীর বেঁচে থাকার তাগাদার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রবৃত্তি যেন প্রকৃতিদত্ত কতকগুলি অস্ত্র যার সাহায্যে প্রাণী তার পৃথিবীতে টিঁকে থাকার প্রাথমিক চাহিদাগুলি অন্য কারও সাহায্য ছাড়াই মিটিয়ে ফেলতে পারে। যেমন, যদি মানব-শিশুকে কেমন করে স্তন্যপান করতে হয় এটা শিখে নিয়ে স্তন্য পান করতে হয় তা হলে তার পক্ষে একদিনও বাঁচা সম্ভব হত না। খাদ্য পেষণ করে হজম করার জন্য মুরগীর ক্ষেত্রে পাথরের কুচি খাওয়া অবশ্য দরকার। এখন যদি মুরগীর বাচ্চাকে ঠুকরে খাওয়ার কাজটা শিখে নিয়ে তারপর এ কাজটা করতে হত তবে সে কোন খাদ্যই হজম করতে পারত না। প্রাণীর বাঁচার জন্য এই অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি আগে থেকেই প্রকৃতি প্রাণীকে শিখিয়ে দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান যাতে জীবন-যুদ্ধের প্রথম পর্যায়েই সে নিশ্চিহ্ন না হয়ে যায়।

৫। প্রাণীকে ব্যক্তিগতভাবে বাঁচতে সাহায্য করা ছাড়াও কতকগুলি প্রবৃত্তির লক্ষ্য হল সমগ্র জাতিকে টিঁকিয়ে রাখা। যৌন-প্রবৃত্তি এবং প্রজনন-মূলক আচরণের একমাত্র উদ্দেশ্য হল জাতিগত সংরক্ষণ। এছাড়া যৌথ-প্রবৃত্তি, বাৎসল্য, নির্মাণ প্রবৃত্তি প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি প্রাণীর জাতিগত সংরক্ষণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

৬। প্রবৃত্তি বিশেষ একটি প্রাণী-গোষ্ঠীর মধ্যে সর্বজনীনভাবে বর্তমান থাকে। যেমন, মৌমাছি মাত্রেই চাক বাঁধে, সব শুঁয়োপোকাই গুটি তৈরী করে ইত্যাদি।

৭। প্রাণী সারাজীবন ধরেই প্রবৃত্তির প্রভাব অনুভব করে। তবে সমস্ত প্রবৃত্তিই সারাজীবন সক্রিয় থাকে না এবং থাকলেও অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, স্তন্যপান প্রবৃত্তি বড় হলে থাকে না। আবার অনেক প্রবৃত্তি বিশেষ করে মানবের ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে বদলে যায়। কিন্তু কতকগুলি প্রবৃত্তি আমৃত্যু সক্রিয় থাকে, যেমন আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি, খাদ্যান্বেষণের প্রবৃত্তি, কৌতূহল প্রবৃত্তি ইত্যাদি।

৮। সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধির বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই। বুদ্ধি-প্রসূত আচরণের প্রথম এবং সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এই আচরণ পরিবেশ অনুযায়ী পরিবর্তনশীল অর্থাৎ পরিবেশ বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে আচরণও বদলে যায়। কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণ পূর্ব-নির্ধারিত, অপরিবর্তনীয় এবং অনেকটা যান্ত্রিক। সেজন্য এর কার্যকারিতা অব্যর্থ ও নিখুঁত। তবে যেহেতু এর মধ্যে বুদ্ধির কোন প্রভাব নেই সেজন্য যদি একবার এর পরিবেশের নির্দিষ্ট সংগঠনে কোন পরিবর্তন ঘটে তবে প্রবৃত্তির আচরণ সেখানে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৯। প্রবৃত্তিজাত আচরণ বিশেষ জাতির ক্ষেত্রে বিশেষ রকমের, যদিও একই জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রাণীদের মধ্যে এই অভিব্যক্তি একই প্রকৃতির রূপ গ্রহণ করে থাকে। যেমন, সব বাবুই পাখীই একপ্রকারের বাসা তৈরী করে। সব মৌমাছিদের গড়া মৌচাকেরই গড়ন মোটামুটি অভিন্ন। এই অভিন্নতার পেছনে আছে অবশ্য দৈহিক গঠনের মিল। হাঁসের বাচ্চাদের জলে সাঁতার কাটতে হবে বলে তাদের পায়ের পাতা জোড়া থাকে। মুরগীর বাচ্চাদের ঠুকরে পাথরকুচি খেতে হবে বলে তাদের ঠোঁট লম্বা ইত্যাদি। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বিশেষ একটি প্রবৃত্তিকে অভিব্যক্ত করতে হলে যে ধরনের দৈহিক গঠন দরকার প্রাণী সেই বিশেষ দৈহিক গঠন নিয়ে জন্মায়। আর সেই জন্য প্রাণীদের প্রবৃত্তিও যেমন ভিন্ন তাদের দৈহিক গঠনও সেইরকম ভিন্ন।

১০। প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে আছে প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক একটি কেন্দ্র। এই কেন্দ্রগত প্রক্ষোভের অনুভূতি থেকে সৃষ্ট হয় প্রচেষ্টা, যা শেষে পর্যবসিত হয় আচরণে। এই প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক কেন্দ্রটি আলোড়িত হলে প্রাণীর মধ্যে জাগে একটি অস্বস্তিকর উত্তেজনা (Tension) এবং এই অস্বস্তিকর উত্তেজনা দূর হয় ঐ বিশেষ প্রবৃত্তিজাত আচরণের সফল সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে।

সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির তুলনা

প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা বলেছি যে প্রবৃত্তিজাত আচরণ এবং বুদ্ধি-প্রসূত আচরণ—এই দু'য়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। বুদ্ধি এবং প্রবৃত্তির মধ্যে তুলনা করলে আমরা নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি দেখতে পাই।

প্রথম, বুদ্ধি ও প্রবৃত্তি উভয়েই সহজাত। দুইই ব্যক্তি সঙ্গে নিয়ে জন্মায়। প্রবৃত্তি নিজে একটি শক্তি নয়, এর শক্তির উৎস হল এর অন্তর্নিহিত প্রক্ষোভ-প্রচেষ্টামূলক কেন্দ্রটি। বুদ্ধি কিন্তু নিজে একটি শক্তি।

তৃতীয়, বুদ্ধি পরিবর্তনধর্মী, এ থেকে জাত আচরণ বৈচিত্র্যে ভরা। পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নতুন আচরণ সম্পাদন করাই হচ্ছে বুদ্ধির প্রথম ও সর্বপ্রধান কাজ। বস্তুত সেই জন্যই তার আবির্ভাব। আর প্রবৃত্তি অপরিবর্তনধর্মী, এ থেকে জাত আচরণ একঘেয়ে, বৈচিত্র্যহীন এবং যান্ত্রিক। একটি নির্দিষ্ট পরিবেশের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট পন্থায় খাপ খাইয়ে নেবার সামর্থ্যটুকু মাত্র প্রবৃত্তির আছে। যদি কোনও কারণে সেই পরিবেশ কিছুমাত্র বদলে যায় তবে প্রবৃত্তিজাত আচরণও ব্যর্থ হয়ে যায়। কিন্তু বুদ্ধির শক্তিমত্তা পরিবর্তনশীল এবং নতুন পরিবেশেই বিশেষভাবে তার উপযোগিতা প্রমাণিত হয়।

চতুর্থ, বুদ্ধি অতীত শিক্ষাকে বর্তমান ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারে। কিন্তু প্রবৃত্তির কর্মপ্রচেষ্টা পূর্ব নির্ধারিত ও শিক্ষার প্রভাবমুক্ত। অতীত শিক্ষার সাহায্য নেওয়ার ফলেই বুদ্ধিজাত আচরণ এত বিচিত্র ও বিভিন্ন হতে পারে আর শিক্ষার সাহায্য না নেওয়ার জন্যই প্রবৃত্তিজাত আচরণ নতুনত্বহীন ও যান্ত্রিক হয়।

পঞ্চম, প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি, দুইই প্রকৃতি কর্তৃক প্রাণীকে প্রদত্ত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের অস্ত্র বিশেষ। ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে প্রবৃত্তি হল পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণীর আদিমতম হাতিয়ার। আর প্রবৃত্তির তুলনায় মানবজীবনে বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটে অনেক পরে। যখন কালক্রমে প্রাণীর পরিবেশ এতই জটিল ও সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে যে কেবলমাত্র প্রবৃত্তির সাহায্যে তার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় তখন অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্ররূপে তার অস্ত্রাগারে বুদ্ধির আবির্ভাব ঘটে।

প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে কিন্তু প্রচুর মতভেদ আছে। হবহাউস, ম্যাকডুগাল, ড্রেভার প্রভৃতি প্রাচীনপন্থী প্রবৃত্তি-মতবাদীরা প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে কোনরূপ নির্দিষ্ট সীমারেখা টানতে রাজী নন। ম্যাকডুগালের মতে সহজাত আচরণের মধ্যেও নতুন বা অস্বাভাবিক পরিবেশের সঙ্গে সার্থক

সঙ্গতিবিধানের ক্ষমতা প্রায়ই দেখা যায়। এ থেকে বোঝা যায় যে প্রবৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধি সর্বত্র অঙ্গীভূত হয়ে আছে। অতএব তাঁদের মতে প্রবৃত্তি আর বুদ্ধির মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা নিতান্তই অসঙ্গত। ড্রেভারের মতে প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে কোনরূপ সুনিশ্চিত বিরোধিতা নেই। তাঁর মতে যে আচরণে অভিজ্ঞতা লাভের সম্ভাবনা অল্প সে আচরণ প্রবৃত্তিজাত আর যে আচরণে এই সম্ভাবনা অধিক সে আচরণ বুদ্ধিজাত।[1]

কিন্তু ভাল করে ভেবে দেখলে এই বিতর্ক নিতান্ত অর্থহীন। একথা খুবই সত্য যে বাস্তবে প্রাণীর কোন বিশেষ আচরণের কতটুকু প্রবৃত্তিজাত আর কতটুকু বুদ্ধিজাত তার সুনিশ্চিত পার্থক্যকরণ সম্ভব নয়। কেননা প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধি দুই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে প্রাণীর অস্ত্রস্বরূপ। যেখানে প্রবৃত্তি সঙ্গতিবিধানে ব্যর্থ হয়ে যায় সেখানেই বুদ্ধি আসে তার সাহায্যে। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধির পরিমাণ অল্প বলে তাদের আচরণের অধিকাংশই প্রবৃত্তিজাত, তবুও তাদের মধ্যে বহুক্ষেত্রে বুদ্ধির প্রভাব দেখা যায়। উচ্চতর প্রাণী বিশেষ করে মানুষের আচরণের উপর প্রবৃত্তির চেয়ে বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ অনেক বেশী এবং সেই জন্যই মানুষের আচরণের মধ্যে প্রবৃত্তিসুলভ যান্ত্রিকতার অভাব দেখা যায়। কিন্তু তা বলে মানব আচরণের উপর যে প্রবৃত্তি প্রভাব একেবারে নেই একথাও বলা চলে না।

যদিও ব্যবহারিক জীবনে প্রবৃত্তি এবং বুদ্ধির মধ্যে পার্থক্য করা যায় না তবুও তত্ত্বের দিক দিয়ে এ দুটি যে বিভিন্নধর্মী একথা স্বীকার করতেই হবে। কেননা জীবতত্ত্বের দিক দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে এমন একটা দিন ছিল যখন বুদ্ধি বলে কোন বস্তু প্রাণীর মধ্যে দেখা দেয়নি এবং তখন প্রাণী নিছক প্রবৃত্তিজাত আচরণের সাহায্যেই পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করত। এমন কি বর্তমানেও নিম্নতর প্রাণীদের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রবৃত্তিপরিচালিত আচরণ প্রচুর পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায়। সেইরকম মানুষের মত উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে এমন আচরণও প্রচুর আছে যা সম্পূর্ণভাবে প্রবৃত্তির প্রভাবমুক্ত। আমাদের ঐ উপরের যুক্তিকে আর কিছু এগিয়ে নিয়ে গেলে আমরা এমন একটি আগামী দিনের কথা ভাবতেও পারি যেদিন মানুষের সব আচরণই সম্পূর্ণভাবে প্রবৃত্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে পুরোপুরি বুদ্ধি-পরিচালিত হয়ে উঠবে।

প্রবৃত্তিজাত আচরণকে যান্ত্রিক বলে বর্ণনা করা হল বলে একথা যেন মনে

1. Instinct in Man : Drever

না করা হয় যে প্রবৃত্তির আচরণ সম্পূর্ণ অন্ধ বা উদ্দেশ্যবিহীন। বরং তার বিপরীতটি ঠিক। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য চরিতার্থের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলেই প্রবৃত্তির জাগরণ ঘটে, নইলে নয়। যেমন, নিজের নিরাপত্তা বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হলেই পালাবার প্রবৃত্তি জাগে। অতএব পলায়নরূপ কাজটিকে অন্ধ বা উদ্দেশ্যহীন কখনই বলা চলে না। তবে প্রবৃত্তিজাত আচরণকে যান্ত্রিক বলার কারণ হল যে এর মধ্যে কোনরূপ বৈচিত্র্য বা পরিবর্তনশীলতা নেই। পরিবেশ বদলে গেলেও বা গতানুগতিক আচরণের দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা না থাকলেও প্রবৃত্তিজাত আচরণের প্রকৃতি পাল্টায় না, একই ধারায় চলতে থাকে। কিন্তু বুদ্ধিজাত আচরণের প্রকৃতি ঠিক বিপরীত। পরিবেশের পরিবর্তিত রূপের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বুদ্ধিজাত আচরণ নিজেকেও পরিবর্তিত করার ক্ষমতা রাখে।

একটি উদাহরণ দিলেই প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির পার্থক্যটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। ক্ষুধায় খাদ্যের দিকে ছুটে যাওয়া প্রাণীর প্রবৃত্তিজাত। মনে করা যাক একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালের সামনে এক টুকরো মাছ রাখা হয়েছে। মাছটা দেখামাত্রই বিড়ালটি তার দিকে ছুটে যাবে। এটা তার প্রবৃত্তিজাত আচরণ। এখন এই মাছ আর বিড়ালের মাঝখানে একটি বড় কাঁচের দেয়াল রাখা হল। তার ফলে সোজাসুজি খাবারে গিয়ে পৌছান আর বিড়ালটির পক্ষে সম্ভব হল না। কিন্তু কাঁচের দেয়ালটির পাশ দিয়ে ঘুরে গেলে খাবারে গিয়ে ঠিক পৌছান যায়। এখন ক্ষুধারূপ প্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে বিড়ালটি ছুটে যেতেই কাঁচে গিয়ে ধাক্কা খেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও বার বার সে কাঁচের দেওয়ালের ভিতর দিয়ে আগের দিনের মত সোজা পথে খাবারে পৌছানোর চেষ্টা করতে লাগলো। এটি হল তার পুরোপুরি প্রবৃত্তিজাত আচরণ এবং এর প্রকৃতি একেবারে যান্ত্রিক ও অপরিবর্তনীয়।

বার বার এই ব্যর্থ চেষ্টার পর যখন সে ক্লান্ত হয়ে পড়ল তখন সে কাঁচটার চার পাশে ঘোরাফেরা করতে সুরু করল এবং কিছুক্ষণ এই ধরনের প্রচেষ্টার পরই সে পাশ দিয়ে ঘুরে যাওয়ার পথটি খুঁজে পেল এবং সেই পথে সে খাবারে গিয়ে পৌছল। এই দ্বিতীয় স্তরের আচরণগুলিকে আমরা বুদ্ধি পরিচালিত আচরণ বলব। কেননা এর মধ্যে পূর্বের যান্ত্রিকতা নেই এবং এগুলি পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম। ম্যাকডুগাল প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সব আচরণকেই প্রবৃত্তিজাত বলতে চান। কিন্তু সম্পূর্ণ প্রবৃত্তিমূলক আচরণ এবং বুদ্ধির প্রয়োগজনিত আচরণ

এই দু'য়ের মধ্যে সীমারেখা এতই স্পষ্ট এবং দু'য়ের প্রকৃতিও এত ভিন্ন যে এই পার্থক্যকরণ একান্ত স্বাভাবিক ও সঙ্গত। অন্তত প্রকৃতি ও পরিবর্তনশীলতার দিক দিকে প্রবৃত্তিজাত ও বুদ্ধিজাত আচরণের মধ্যে যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে তা অনস্বীকার্য।

প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক

(ম্যাক্‌ডুগালের মতবাদ অনুযায়ী প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রতিটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রে আছে একটি করে বিশেষ প্রক্ষোভ এবং সেই বিশেষ প্রবৃত্তিকে জাগায় সেই বিশেষ প্রক্ষোভটি। প্রবৃত্তি হচ্ছে বিশেষ একটি আচরণ-প্রবণতা, আর প্রক্ষোভ হচ্ছে সেই প্রবৃত্তির প্রেষণাশক্তি। যে কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ সৃষ্টি ও সম্পন্ন করে ঐ প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থিত বিশেষ প্রক্ষোভটি। যখন কেন্দ্রস্থিত প্রক্ষোভটি জাগে তখনি প্রবৃত্তিটি সক্রিয় হয়। আর যদি প্রক্ষোভটি না জাগে তাহলে প্রবৃত্তিটি নিষ্ক্রিয়ই থেকে যায়। উদাহরণ-স্বরূপ, পলায়নপ্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থিত প্রক্ষোভ হল ভয়। যখন ভয় জাগে তখনই ব্যক্তির মধ্যে পলায়নের প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সে পালায়। আর যদি বিপজ্জনক পরিস্থিতি সত্ত্বেও ব্যক্তির মধ্যে ভয় না জাগে তাহলে পলায়ন প্রবৃত্তি জাগবে না এবং ব্যক্তি পালাবেও না।) এক কথায় প্রবৃত্তির সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা সম্পূর্ণভাবে প্রক্ষোভের উপর নির্ভরশীল। ম্যাকডুগাল মানুষের ১৪টি প্রবৃত্তি ও সেগুলির কেন্দ্রস্থিত ১৪টি প্রক্ষোভের তালিকা দিয়েছেন।)

(কিন্তু ম্যাকডুগালের এই ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেছেন অনেক মনোবিজ্ঞানী, যেমন, জন ড্রেভার, ি র প্রভৃতি। অবশ্য যদিও ড্রেভার, রিভার প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানী প্রবৃ ড্রেভার প্রক্ষোভের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে ম্যাকডুগালের সঙ্গে একমত নন, তবু ই সত্য প্রবৃত্তিঘটিত মতবাদটি মোটামুটি ম্যাকডুগালের মতবাদেরই সমর্থ পারে ন ড্রেভার বলেন যে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিমূলক অভিজ্ঞতার মধ্যে আছে ি—বিশুদ্ধ যথা, প্রথম, একটি অনুভূত মানসিক তাড়না (Impulse) র্থাৎ যে সকটি প্রত্যক্ষিত বস্তু বা পরিস্থিতি এবং তৃতীয়, কোন আগ্রহ (In র্গত হল সার্থকতা-বোধের (Worthwhileness) একটি অনুভূতি বা nt), মনোনিবেশে প্রাণীর সন্তুষ্টি বা পরিতৃপ্তিতে।[১]

(প্রবৃত্তি lisation) প্রভৃ মধ্যে সম্পর্কের বর্ণনা দিতে গিয়ে ড্রেভার বলেছেন শটি প্রবণতা যথ প্রবৃত্তিজাত আচরণ তার সহজ বাধাহীন পথে এগোয় এ গ, আত্মশ্লাঘা, হীবোধের অনুভূতিটি পরিতৃপ্ত হয় তবে কোন

1. Insti over

প্রক্ষোভের জাগরণ ঘটবে না। কিন্তু যদি এই আচরণ কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন একটা মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হবে এবং এই উত্তেজনাই বিশেষ একটি প্রক্ষোভের রূপ নেবে।) ড্রেভার বলতে চান যে (প্রবৃত্তিজাত আচরণের সৃষ্টিকালে যে মানসিক তাড়না (Impulse) অনুভূত হয় সেটা প্রক্ষোভ নয়। সত্যকারের প্রক্ষোভ জাগে তখনই যখন সেই প্রাথমিক তাড়না কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হয়। এই প্রক্ষোভের কাজ হল সেই বাধাপ্রাপ্ত তাড়নার পিছনে শক্তি জোগান এবং আচরণের তীব্রতা বৃদ্ধি করে যাতে বাধাটা অতিক্রম করা যায় তার ব্যবস্থা করা)। সাধারণত প্রক্ষোভ জাগার ফলে প্রবৃত্তিজাত আচরণের মধ্যে যে পরিবর্তন বা নতুনত্ব দেখা দেয় তাতে প্রাণীর পক্ষে সঙ্গতিবিধানের কাজটি আরও উন্নতভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে যদি এই (প্রক্ষোভ প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত মাত্রায় জেগে ওঠে তবে প্রবৃত্তিজাত আচরণটি সঙ্গতিবিধানে একেবারেই অসমর্থ হয়ে ওঠে। যেমন, বিপদ দেখে প্রাণী পালাবার একটা তাড়না অনুভব করে, কিন্তু তখন তার মধ্যে ভয়রূপ কোন প্রক্ষোভ জাগে না। আর যদি সে বিনা বাধায় পালিয়ে যেতে পারে তবে তার মনে ভয় একেবারেই জাগবে না। কিন্তু যদি, সে পালাতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবেই তার মনে ভয়রূপ প্রক্ষোভটি জাগবে। এই ভয় তার পালাবার তাড়নাকে আরও তীব্র করে তুলবে এবং প্রাণীটি পালাবার জন্য নানারূপ বিভিন্ন আচরণ করতে থাকবে। কিন্তু ভয় যদি অত্যন্ত বেশী হয়ে ওঠে তবে তার পালাবার সমস্ত আচরণই ব্যর্থ হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত সে পালাতে পারে না, যেমন দেখা গেছে যে বাঘ বা অজগরের সামনা সামনি পড়ে হরিণের বাচ্চা এতই ভয় পেয়ে যায় যে সে পালানোর সমস্ত শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে।)

(ড্রেভার প্রবৃত্তিজাত আচরণের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের জাগরণের একটি চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। যখন কোন বিশেষ প্রবৃত্তিজাত আচরণ সম্পন্ন হতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন সেই বিশেষ আচরণটি যে সেই বিশেষ পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের পক্ষে যথেষ্ট নয় এইটিই প্রমাণিত হয়। তখন সাময়িকভাবে প্রাণীর প্রাথমিক মানসিক-তাড়না বাধাপ্রাপ্ত হয়, যাতে প্রাণী এই অবকাশে নতুন কোন উন্নত আচরণ উদ্ভাবন করে উঠতে পারে। আর তাড়নার এই বাধাপ্রাপ্তি ও আচরণের সাময়িক বিরতি থেকে জন্মায় প্রক্ষোভ)

এ থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। প্রাণীকে তার জটিল পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে হলে তার জন্মলব্ধ আচরণধারা ক্রমশ বদলাতে হবে। আর যতই সে তার পুরাতন আচরণধারা বর্জন করে সঙ্গতিবিধানের নতুন নতুন প্রচেষ্টা শিখবে ততই তাকে নতুন নতুন প্রক্ষোভের অনুভূতির মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ এক কথায় প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের নতুন নতুন প্রচেষ্টার উদ্ভাবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশ। সেই জন্য যে প্রাণীজাতির আচরণ-বৈচিত্র্য যত বেশী, তার প্রক্ষোভের জটিলতা এবং অভিনবত্বও তেমনি প্রচুর। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে প্রবৃত্তিমূলক আচরণ গতানুগতিক ও অপরিবর্তিত পথ ধরে চলে বলে তাদের মধ্যে প্রক্ষোভের বিচিত্রতা খুবই কম। কিন্তু মানুষের আচরণ পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী বহুবিধ হওয়ার ফলে তার মধ্যে প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও প্রকাশ যেমন বিচিত্র তেমনই সেগুলি সংখ্যাতেও অগণিত।

অতএব ড্রেভারের মতে প্রবৃত্তিমূলক আচরণের মধ্যে যে প্রক্ষোভ থাকবেই তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কখনও কখনও প্রবৃত্তিজাত আচরণটি বিনা বাধায় সম্পন্ন হলে প্রাণী কোনরূপ প্রক্ষোভ একেবারে অনুভব নাও করতে পারে। তবে সুনির্দিষ্ট কোন প্রক্ষোভের অনুভূতি না থাকলেও একটা বিশেষ আগ্রহ, অনুভূতি বা সার্থকতাবোধ সমস্ত প্রবৃত্তিজাত আচরণের পেছনেই আছে। ড্রেভারের মতে এই প্রাথমিক অনুভূতিটি প্রক্ষোভজাতীয় নয়, সেটা কেবল একটা জৈব-মানসিক শক্তি বিশেষ। প্রকৃত প্রক্ষোভ দেখা দেয় তখনই যখন এই প্রাথমিক শক্তিটির অভিব্যক্তি বাধাপ্রাপ্ত হয়।

কিন্তু একথা ড্রেভার স্বীকার করেন যে কতকগুলি প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে ম্যাক-ডুগালের ব্যাখ্যাটাই সত্য। কতকগুলি প্রবৃত্তিজাত আচরণ প্রক্ষোভকে বাদ দিয়ে ঘটতে পারে না। ড্রেভার এই কারণে প্রবৃত্তিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করেছেন—বিশুদ্ধ (Pure) ও প্রক্ষোভধর্মী (Emotional)। বিশুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি অর্থাৎ যে সকল প্রবৃত্তি প্রক্ষোভ ছাড়াই কাজ করতে পারে, সেগুলির অন্তর্গত হল সেই আচরণগুলি যেগুলি ব্যক্তি সঙ্গতিবিধান (Adjustment), মনোনিবেশ (Attention), সঞ্চালন (Locomotion), বাচন-ক্রিয়া (Vocalisation) প্রভৃতির ক্ষেত্রে সম্পন্ন করে। আর প্রক্ষোভধর্মী প্রবৃত্তির অন্তর্গত হল দশটি প্রবণতা যথা, ভয়, ক্রোধ, শিকার, সংগ্রহ, কৌতূহল, যৌথ-প্রবৃত্তি, পূর্বরাগ, আত্মশ্লাঘা, হীনমন্যতা এবং বাৎসল্য।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ড্রেভারের প্রবৃত্তি মতবাদের সঙ্গে সামান্য দু'একটি ক্ষেত্র ছাড়া ম্যাকডুগালের প্রবৃত্তি-মতবাদের উল্লেখযোগ্য কোনও পার্থক্য নেই।

প্রক্ষোভ ব্যাহতির সূত্র

ড্রেভারের প্রবৃত্তি মতবাদের একটি সূত্র শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রযোজ্য। ড্রেভার দেখিয়েছেন যে প্রবৃত্তিজাত আচরণ যদি সহজ পথে চলতে গিয়ে ব্যাহত হয় তবেই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং যদি সেই প্রক্ষোভ অতি তীব্র হয়ে ওঠে তবে আচরণের সহজ অগ্রগতিই শেষ পর্যন্ত রুদ্ধ হয়ে যায়। এই ঘটনাটি শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। পড়া তৈরী করার সময় বা পড়া দেবার সময় যদি কোন কারণে শিক্ষার্থীর সহজ ও স্বাভাবিক আচরণ ব্যাহত হয় তবে তার মনে বিরূপ প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং তার প্রচেষ্টা আরও বেশী করে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে যতটুকু পারা সম্ভব তাও সে করতে পারে না।

এই জন্য শিক্ষকের দেখা উচিত যে, প্রথমত শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও ক্ষমতার উপযোগী নয় এমন কোন কাজ যেন শিক্ষার্থীকে করতে না দেওয়া হয়। কারণ এ ধরনের কাজে প্রথমেই ব্যর্থতা আসে এবং ফলে শিক্ষার্থীর মনে বিরূপ প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীর অক্ষমতাকে কখনও বিদ্রূপ বা নিন্দা করা উচিত নয়। কারণ এর দ্বারা তার মধ্যে বিরূপ প্রক্ষোভ আরও তীব্র হয়ে উঠবে এবং তার অক্ষমতার মাত্রা বেড়ে যাবে।

তৃতীয়ত, শিক্ষার পরিবেশটিকে এমন করে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর মনে সর্বদাই অনুকূল প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে সম্পর্ক

প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে সম্পর্ক নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। প্রবৃত্তির প্রকৃতি বা স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য দেখা যায় সেই দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থেকেই এই মতভেদটি প্রসূত।

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে দুটি সূত্রের কথা বলেছেন, প্রথমটি, প্রবৃত্তির অনিত্যতার সূত্র (Law f Transitoriness) আর দ্বিতীয়টি, প্রবৃত্তির নিরোধ বা পরিবর্তনের সূত্র (Law of Inhibition)

১। প্রবৃত্তির অনিত্যতার সূত্র

প্রবৃত্তির অনিত্যতার সূত্রের দ্বারা জেমস বলতে চান যে ব্যক্তির মধ্যে প্রবৃত্তি

বিশেষ একটি সময়ে পূর্ণতালাভ করে এবং তার পরে ধীরে ধীরে হীনশক্তি হতে থাকে এবং শেষে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে প্রবৃত্তিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবার আগে তা থেকে অভ্যাসের সৃষ্টি হতে পারে এবং যা পরে ব্যক্তির মধ্যে থেকে যায় তা এই অভ্যাসটিই, প্রবৃত্তিটি নয়। যেমন, যৌথপ্রবৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে শিশু অপরের সঙ্গ খোঁজে, সমবয়সীদের সঙ্গে দল বাঁধে, কিন্তু বড় হলে এই যৌথ প্রবৃত্তিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। তবে দলবাঁধা বা সঙ্গ খোঁজা প্রভৃতি আচরণগুলি তার চরিত্রে একটি বিশেষ অভ্যাসের রূপে থেকে যায়। আবার যে প্রবৃত্তি থেকে কোন কারণে এ ধরনের কোন বিশেষ অভ্যাসের জন্ম হয়নি, সে প্রবৃত্তিটি কোনরূপ চিহ্ন না রেখেই একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়। যেমন, শিশুর স্তন্যপান করার প্রবৃত্তিটি বড় হলে চলে যায় এবং তা থেকে কোনরূপ বিশেষ অভ্যাস তার মধ্যে পরে থেকে যায় না।

জেমস স্পষ্টতই ম্যাকডুগাল প্রভৃতির মত প্রবৃত্তিকে অত প্রাধান্য দেন নি। তিনি প্রবৃত্তিকে অনেকটা অভ্যাসগঠনের সোপান বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর মতে অভ্যাস-গঠন শেষ হয়ে গেলে প্রবৃত্তির কাজও শেষ হয়ে যায়।

২। প্রবৃত্তির নিরোধের সূত্র

জেমসের দ্বিতীয় সূত্রের অর্থ হল যে অভ্যাসের দ্বারা কোন বিশেষ প্রবৃত্তিকে পরিবর্তিত করা এমন কি রুদ্ধ করাও যেতে পারে। যেমন, বাঘ দেখলে পালান মানুষের প্রবৃত্তিজাত কিন্তু সার্কাসে যারা কাজ করে তারা পালায় না। এখানে পলায়নরূপ প্রবৃত্তিজাত আচরণের নিরোধ বা পরিবর্তন সম্ভব হল অভ্যাসের দ্বারা।

জেমসের প্রথম সূত্রটির ঘোরতর প্রতিবাদ করেছেন ম্যাকডুগাল। তাঁর মতে প্রবৃত্তি ক্ষণস্থায়ী নয় এবং অভ্যাসের গঠন হয়ে গেলে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াও তার ধর্ম নয়। প্রবৃত্তি মনের চিরস্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় কর্মপ্রবণতা। এ থেকে অভ্যাসের জন্ম হয় একথা সত্য, কিন্তু অভ্যাস সৃষ্টি করে এর কাজ শেষ হয়ে যায় না। অভ্যাস গঠনের পরও প্রবৃত্তি অব্যাহত থাকে। ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তি যে ক্ষণস্থায়ী নয় তার বহু প্রমাণ প্রাণীজীবনে পাওয়া যায়। যেমন, কোন একটি বন্যপাখীকে আজন্ম একটি ছোট খাঁচায় বন্দী করে রাখার পরে সেটি বেশ বড় হয়ে উঠলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হল। তখন দেখা গেল যে বন্দীদশার জন্য যে সব প্রবৃত্তিজাত আচরণের বিকাশ তার মধ্যে ইতিপূর্বে একেবারেই হয় নি সেগুলি পূর্ণমাত্রায় তার মধ্যে প্রকাশ পেল। অতএব

প্রবৃত্তি চিরস্থায়ী ও অনপনেয়। প্রবৃত্তি যদি ক্ষণস্থায়ী হত তাহলে পাখীটির পক্ষে ছাড়া পাবার পর এই প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি সম্পন্ন করা সম্ভব হত না।[১]

কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী আবার প্রবৃত্তি এবং অভ্যাসের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য আছে বলে স্বীকার করেন না। তাঁরা অভ্যাসকে এক ধরনের প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তিকে জন্মগত বা জাতিগত অভ্যাস (Racial habit) বলে বর্ণনা করেন। এঁদের মতে প্রবৃত্তির যেমন প্রাণীকে বিশেষ একটি কাজে প্রবৃত্ত করার ক্ষমতা আছে তেমনি অভ্যাসের মধ্যেও সেই রকম একটি প্রেষণা-মূলক শক্তি (Drive or Motive power) আছে এবং সেই জন্য অভ্যাস নিজে থেকেই প্রাণীকে কোন বিশেষ কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে।

ম্যাকডুগাল অভ্যাসের এই প্রেষণামূলক শক্তির কথা স্বীকার করেন না। তিনি বলতে চান যে প্রাণী যখন কোন অভ্যাসগত আচরণ সম্পন্ন করে তখন অভ্যাসের কোন প্রেষণামূলক শক্তির দ্বারা সে তাড়িত-হয়ে তা করে না। তার সেই আচরণের পশ্চাতে কোন বিশেষ প্রবৃত্তির তাড়না থাকে। অর্থাৎ অভ্যাস একটি পুরোপুরি যান্ত্রিক আচরণ। এর নিজস্ব কোনও উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নেই। অভ্যাস কোন প্রবৃত্তিমূলক উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিছক উপকরণ মাত্র।

প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে মৌলিক পার্থক্যকে স্বীকার করে নিলেও আমরা অভ্যাস সম্বন্ধে ম্যাকডুগালের উপরের উক্তিটি মেনে নিতে পারছি না। অভ্যাস প্রথমে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণরূপে সৃষ্ট হলেও পরে যে তা নিজেই উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াতে পারে এটি মনোবিজ্ঞানের একটি সুপ্রমাণিত তথ্য। উডওয়ার্থ দেখিয়েছেন যে, একটি আচরণ প্রথমে সৃষ্ট হতে পারে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপকরণরূপে, কিন্তু পরে সেটি নিজেই উদ্দেশ্যে পরিণত হয়ে ব্যক্তির প্রেষণাশক্তির উৎস হয়ে উঠতে পারে। যেমন একজন তার স্বল্প আয়ে সংসার চালাবার (উদ্দেশ্য) জন্য মিতব্যয়িতার অভ্যাস (উপকরণ) সুরু করল। কিন্তু পরে যখন তার আয় পর্যাপ্ত হয়ে উঠল তখনও সে তার মিতব্যয়িতা ছাড়তে পারল না। এখানে অভ্যাসের ফলে উপকরণ নিজেই পরে উদ্দেশ্যে পরিণত হয়েছে। অলপোর্টের (Allport) প্রসিদ্ধ 'উদ্দেশ্যের স্বয়ংক্রিয়তার' তত্ত্ব'টি (Theory of Functional Autonomy of Motive) এই তথ্যকে ভিত্তি করেই গঠিত।[২]

প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের মধ্যে প্রথম ও সর্বপ্রধান পার্থক্য হচ্ছে প্রবৃত্তি জন্মগত, অভ্যাস অর্জিত। প্রবৃত্তিমূলক আচরণ স্বতঃপ্রণোদিত, প্রচেষ্টাবর্জিত

1. Outline of Psychology—McDougall 2. Personality—G. W. Allport

ও স্ব-শক্তিচালিত। অভ্যাস ইচ্ছা-নির্ভর ও প্রচেষ্টা-প্রসূত। তবে যদি কোন অভ্যাস বার বার চর্চার ফলে দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠে তখন সেটি নিজেই আচরণের শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রবৃত্তি থেকেও আবার অভ্যাসের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, খাওয়ার অভ্যাসটি খাদ্য-অন্বেষণরূপ প্রবৃত্তি থেকে জাত। অভ্যাসের প্রকৃতি ও গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে দ্বিতীয় খণ্ডে 'অভ্যাস' শীর্ষক অনুচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য।[১]

প্রবৃত্তি-তত্ত্বের সমালোচনা

প্রবৃত্তি-তত্ত্বটি ম্যাকডুগাল প্রমুখ প্রাচীনপন্থীদের মতবাদ। এই মতবাদটি বহুল প্রচারিত ও সমর্থিত হলেও বর্তমানে আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এটি সর্বজন-স্বীকৃত নয়। প্রাণীর আচরণের উপর বিশদ গবেষণার ফলে এমন অনেক নতুন তথ্য হস্তগত হয়েছে যেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে প্রবৃত্তি তত্ত্বটি আজ সম্পূর্ণ-ভাবে গ্রহণ করা যায় না। প্রবৃত্তি-তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহু সমালোচনার মধ্যে কয়েকটি নীচে দেওয়া হল।

(ক) মানুষের কোন একটি বিশেষ আচরণের ব্যাখ্যারূপে যদি একটি বিশেষ প্রবৃত্তিকে খাড়া করা হয় তবে সেই আচরণের সত্যকারের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। এতে মানব আচরণের মত একটি অতি জটিল বস্তুকে অনুচিত-ভাবে অতি-সরল করে ফেলা হয়।

(খ) প্রবৃত্তি-মতবাদে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তিকে একটি পৃথক ও বিচ্ছিন্ন কর্ম-প্রবণতা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মানব-আচরণ কেবলমাত্র কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার সমষ্টি নয়। এর সুসংহত ও সামগ্রিক রূপটি কেবলমাত্র প্রবৃত্তির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। এক কথায় মানব-আচরণকে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্তি অক্ষম।

(গ) ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির একটি বিশেষ সহগামী প্রক্ষোভ আছে কিন্তু বাস্তবে এর বহু বিপরীত নিদর্শন দেখা যায়। অবশ্য ড্রেভার, গিনসবার্গ প্রভৃতি প্রবৃত্তি-মতবাদীরাও একথা স্বীকার করেন।

(ঘ) প্রবৃত্তিগত আচরণ সর্বজনীন নয়। মানুষের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন প্রবৃত্তিগত আচরণের প্রচলন দেখা যায়। রুথ বেনেডিক্ট (Ruth Benedict), মার্গারেট মিড (Margaret Mead) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৃতত্ত্ববিদ্‌দের গবেষণায় মানব-আচরণের মধ্যে অদ্ভুত বৈষম্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। সভ্য মানুষের মধ্যে মৌলিক আচরণের প্রকৃতি মোটামুটি একরকমের হলেও

১। পৃঃ ৩০৪—পৃঃ ৩০৮ (দ্বিতীয় খণ্ড)

অসভ্য মানব সমাজে আচরণ ধারার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। এমন অনেক মানব-সমাজ আছে যেখানে বাৎসল্য বলে কোন সুনির্দিষ্ট প্রবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। এস্কিমোদের মধ্যে যুযুৎসা প্রবৃত্তি এক প্রকার নেই বললেই চলে।

(ঙ) মানুষের কোন আচরণই অপরিবর্তনীয় এবং যান্ত্রিক হয় না। তবে কেমন করে বলা চলে যে মানুষের আচরণ প্রবৃত্তি-প্রসূত? বস্তুত ম্যাকডুগালের বর্ণিত সতেরটি প্রবৃত্তিজাত আচরণের মধ্যে অল্প কয়েকটি ছাড়া অধিকাংশ আচরণকেই আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা প্রবৃত্তিজাত বলতে রাজী নন। তাঁদের মতে মানুষের ক্ষেত্রে সত্যকারের প্রবৃত্তিজাত আচরণ ঘটে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন যৌন-আচরণ, খাদ্য-অন্বেষণ, যৌথ-আচরণ ইত্যাদি। অন্যান্য তথাকথিত প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলি প্রকৃতপক্ষে এত পরিবর্তনশীল ও বৈচিত্র্যময় যে সেগুলিকে প্রবৃত্তিজাত বলা চলে না।

(চ) ফ্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণের গবেষণা থেকে জানা যায় যে এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলিকে আমরা আগে সহজাত বলে মনে করতাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সহজাত নয়, সেগুলি অর্জিত। অর্থাৎ অনেক আচরণকে আমরা সহজাত মনে করে প্রবৃত্তি-প্রসূত বলে ধরে নিয়ে থাকি, কিন্তু সেগুলি সহজাত বা প্রবৃত্তিমূলক নয়, সেগুলি শিক্ষা-প্রসূত।

(ছ) উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যে কোন বৈশিষ্ট্যেরই পশ্চাতে আছে বিশেষ কোন শরীরগত সংগঠন, যেমন দেখা যায় রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে। কিন্তু প্রবৃত্তির পেছনে কোন শরীরগত বৈশিষ্ট্য নেই, তবে কেমন করে প্রবৃত্তিকে সহজাত বলা চলে? এটি হল বার্নার্ডের সমালোচনা। এই সমালোচনায় অবশ্য ধরে নেওয়া হচ্ছে যে শারীরিক সংগঠন ছাড়া কোন কিছুই উত্তরাধিকার-সূত্রে পাওয়া যায় না।

(জ) বার্নার্ডের আর একটি সমালোচনা হল যে যাকে সাধারণত প্রবৃত্তিজাত আচরণ বলা হয় আসলে সেটি মোটেই সরল ও অমিশ্র কোন আচরণ নয়, বরং যথেষ্ট জটিল ও একাধিক আচরণের একটি মিশ্র রূপ। যেমন যৌন-আচরণ বা সন্তানের প্রতি মায়ের বাৎসল্য, এদুটির কোনটিই একটি অমিশ্র আচরণ নয়। এগুলি একাধিক আচরণের সমষ্টি এবং ব্যক্তির চারপাশের সামাজিক পরিবেশ থেকে শেখা। বার্নার্ড অবশ্য প্রবৃত্তিকে একেবারে অস্বীকার করেন না। তাঁর মতে সত্যকারের প্রবৃত্তিজাত আচরণ কয়েকটি জৈবিক চাহিদা মেটাবার জন্য সম্পাদিত হয়, যেমন নিঃশ্বাস ফেলা, কাসা ইত্যাদি। এগুলির কোন সামাজিক

গুরুত্ব নেই এবং ব্যক্তির আচরণ নির্ণয়ে এগুলির কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাও নেই।

(ঘ) প্রবৃত্তির সংখ্যা নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানীরা এক মত নন। কারও মতে প্রবৃত্তির সংখ্যা একটি বা দুটি। আবার কারও মতে কমপক্ষে একশটি। বার্নার্ড প্রায় ৫০০ জন প্রবৃত্তিমতবাদীর মত আলোচনা করে দেখিয়েছেন যে প্রবৃত্তির সংখ্যা সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই।

(ঙ) ম্যাকডুগালের মতে প্রাণীর সমস্ত কাজের পেছনে প্রেষণা-শক্তি যোগায় একমাত্র প্রবৃত্তি এবং প্রবৃত্তি ছাড়া আচরণের প্রেষণা-শক্তির অন্য কোন উৎস নেই। কিন্তু বহু আধুনিক মনোবিজ্ঞানী একথা স্বীকার করেন না। অলপোর্টের প্রসিদ্ধ 'উদ্দেশ্যের স্বয়ংক্রিয়তার সূত্র' (Theory of Functional Autonomy of Motive) হতে আমরা জানতে পারি যে কোন অর্জিত আচরণ বা অভ্যাস নিজে থেকেই উদ্দেশ্যে বা লক্ষ্যে পরিণত হতে পারে এবং আচরণের পেছনে প্রেষণা-শক্তি জোগাতে পারে। উডওয়ার্থ এই ঘটনাটিকেই উপকরণের (Mechanism) উদ্দেশ্যে (Drive) পরিণত হওয়া বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রবৃত্তি ছাড়াও প্রেষণা-শক্তির অন্য উৎস আছে।

প্রবৃত্তির আধুনিক মতবাদ : কনরাড লোরেঞ্জ

প্রবৃত্তির উপর আধুনিক মতবাদের জন্য আমরা নোবেল পুরস্কারবিজয়ী প্রসিদ্ধ প্রাণীতত্ত্ববিদ্ কনরাড লোরেঞ্জের (Conrad Lorenz) নিকট ঋণী। প্রাণী আচরণের উপর দীর্ঘ গবেষণা চালানোর ফলে লোরেঞ্জ প্রবৃত্তিজাত আচরণের প্রকৃতি ও কার্য সম্বন্ধে একটি নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে পেরেছেন। আমরা নীচে তাঁর মতবাদটি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

লোরেঞ্জের মতে প্রাণীর সহজাত আচরণকে তিন শ্রেণীতে ফেলা যায়, যেমন (১) রিফ্লেক্স (Reflex), (২) ট্যাক্সিস (Taxis) এবং (৩) প্রবৃত্তিজাত আচরণ (Instinctive movement)।

রিফ্লেক্স হল কোন বিশেষ উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে প্রাণীদেহে কোন বিশেষ অঙ্গের বা মাংসপেশীর প্রতিক্রিয়া। যেমন, লালাক্ষরণ, গ্রন্থির রস নিঃসরণ ইত্যাদি।

ট্যাক্সিস হল কোন বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের জন্য সম্পূর্ণ প্রাণীর সমগ্রভাবে প্রতিক্রিয়া। ট্যাক্সিস আচরণে প্রাণী হয় কোন বিশেষ উদ্দীপকের দিকে এগিয়ে যায়, নয় তা থেকে দূরে সরে আসে। ট্যাক্সিস সব সময়ে

1. King Solomon's Ring—Lorenz

কোন বিশেষ দিকে পরিচালিত আচরণ বিশেষ। স্রোতের বিরুদ্ধে মাছের সাঁতার কাটা, আলোর দিকে পোকার এগিয়ে যাওয়া ইত্যাদি হল ট্যাক্সিসের উদাহরণ।

প্রবৃত্তিজাত আচরণ রিফ্লেক্স বা ট্যাক্সিস থেকে অনেক দিক দিয়ে পৃথক। প্রথমত, বিভিন্ন প্রাণীজাতির মধ্যে প্রবৃত্তিজাত কাজ বিভিন্ন হবে। একই রিফ্লেক্স এবং একই ট্যাক্সিস বহু বিভিন্ন প্রাণীজাতির মধ্যে থাকতে পারে কিন্তু একই প্রবৃত্তিজাত কাজ দুটি বিভিন্ন প্রাণীজাতির মধ্যে দেখা যাবে না। লোরেঞ্জের মতে প্রবৃত্তিজাত আচরণের বৈষম্য দেখে প্রাণীজাতির শ্রেণীবিভাগ করা অনেক সহজ ও নির্ভুল। বস্তুত এই প্রবৃত্তিজাত আচরণের পার্থক্য ও মিল দেখে লোরেঞ্জ অনেক প্রাণীর নতুন শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

ট্যাক্সিস রিফ্লেক্সের সঙ্গে প্রবৃত্তিজাত কাজের দ্বিতীয় পার্থক্য হল রিফ্লেক্স ও ট্যাক্সিস যে কেবলমাত্র উদ্দীপক থেকে সৃষ্ট হয় তাই নয়, যতক্ষণ উদ্দীপকটি থাকে ততক্ষণই তারা সক্রিয় থাকে। উদ্দীপকটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে রিফ্লেক্সও অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু প্রবৃত্তিজাত কাজ উদ্দীপক থেকে সৃষ্ট হলেও উদ্দীপকের দ্বারা এর বহিপ্র্রকাশ নিয়ন্ত্রিত। অর্থাৎ একবার প্রবৃত্তিজাত আচরণটি ঘটতে সুরু হলে তা আর উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল থাকে না। তখন উদ্দীপক বর্তমান থাকুক আর না থাকুক, প্রবৃত্তিটি তার কাজ ঠিক করে যাবে। বন্দুকের ঘোড়াটি একবার টিপে দিলে যেমন বারুদের ক্যাপটি ফেটে যাওয়া, গুলিটিকে ধাক্কা মারা, গুলিটির বেরিয়ে যাওয়া প্রভৃতি কাজগুলি পর পর নিজে নিজে হয়ে যায়, সেই রকম একবার প্রবৃত্তিজাত আচরণ কোন উদ্দীপকের দ্বারা সক্রিয় হয়ে উঠলে তার পরবর্তী ধাপগুলি বন্দুকের ঘোড়া টেপার ক্ষেত্রের মতই পর পর নিজে নিজে ঘটে যাবে। সেই জন্য প্রবৃত্তিজাত আচরণকে বন্দুকের ঘোড়া টেপার প্রক্রিয়ার (Triggered Movement) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ট্যাক্সিস ও রিফ্লেক্স উদ্দীপকজাত ও উদ্দীপক নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণ উদ্দীপকজাত বটে, কিন্তু উদ্দীপক-নিয়ন্ত্রিত নয়। তবে এই তিন ধরনের আচরণেরই সৃষ্টি উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল।

কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ একবার সুরু হয়ে গেলে উপযুক্ত উদ্দীপক থাকুক আর না থাকুক আচরণটির সমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত সেটি ঠিকভাবেই চলবে। একবার একটা ষ্টার্লিং পাখীকে বন্দী অবস্থায় মানুষ করা হয়েছিল এবং তাকে কৃত্রিম উপায়ে খাওয়ান হত। কিন্তু লোরেঞ্জ দেখালেন যে পাখীটা তা সত্বেও পোকা শিকারের সমস্ত প্রক্রিয়াগুলি—যেমন পোকাটিকে ধরা, সেটিকে

মারা এবং গিলে ফেলা প্রভৃতি কাজগুলি ঠিক পর পর করে যাচ্ছে যদিও তার সামনে কোন পোকারই অস্তিত্ব নেই। লোরেঞ্জ এই ঘটনাটির নাম দিয়েছেন 'শূন্যে সক্রিয়তা' (Vacuum Activity)। অতএব দেখা যাচ্ছে রিফ্লেক্স এবং ট্যাক্সিস উদ্দীপকনির্ভর, প্রবৃত্তিজাত আচরণের সম্পাদন উদ্দীপকনিরপেক্ষ।

প্রবৃত্তিজাত আচরণের এই বৈশিষ্ট্যের কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা যায় যে কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ ঘটবার আগে সেই প্রবৃত্তিটিকে ঘিরে প্রাণীর মধ্যে এক ধরনের প্রতিক্রিয়ামূলক বিশেষ শক্তি (Reaction Specific Energy) সঞ্চিত হয়। যতক্ষণ না উপযুক্ত উদ্দীপকের (Releaser) সামনা সামনি প্রাণীটি আসছে এবং যতক্ষণ না ঐ প্রবৃত্তিটি মুক্তিলাভ করছে ততক্ষণ এই শক্তি প্রাণীর মধ্যে সঞ্চিত হতে থাকবে।

এই প্রক্রিয়ামূলক শক্তি সঞ্চয়ের ফলে প্রাণীর মধ্যে দুটি পরিবর্তন দেখা দেয়, প্রথম, প্রাণীর মধ্যে একটি অস্বস্তিকর উত্তেজনার (Tension) সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, প্রাণীর উদ্দীপক-বিচারের অনুভূতিবোধ ক্রমশ কমে আসে (Lowering of the threshold)। এই সঞ্চিত শক্তি যতই তীব্র হয়ে ওঠে ততই প্রাণীর উত্তেজনা বেড়ে যায় এবং ততই উপযুক্ত উদ্দীপকের প্রয়োজনীয়তা কমে আসে। শেষ পর্যন্ত এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যখন যেমন তেমন উদ্দীপকের দ্বারাই প্রবৃত্তিজাত আচরণটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বন্দুকের ঘোড়া টেপার প্রক্রিয়াটির মত আচরণটি একেবারে তার শেষ সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে থামে।

লোরেঞ্জের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রবৃত্তিজাত আচরণের কয়েকটি স্তর দেখান যেতে পারে। যথা—

প্রবৃত্তি > > >	প্রচেষ্টা >	> > লক্ষ্য
প্রতিক্রিয়ামূলক বিশেষ শক্তির (Reaction Specific Energy) সঞ্চয় এবং উত্তেজনার (Tension) অনুভূতি।	কোন বিশেষ লক্ষ্যে পৌছানর বা কোন বিশেষ কাজ করার জন্য অনুভূতমানসিক তাড়নার সক্রিয় বাহ্যিক প্রকাশ।	উপযুক্ত উদ্দীপকের দ্বারা অবরুদ্ধ প্রবৃত্তির মুক্তিলাভ ও তার ফলে উত্তেজনার পরিসমাপ্তি।

এই হল লোরেঞ্জের দেওয়া প্রবৃত্তিজাত আচরণের ব্যাখ্যা। প্রবৃত্তির এই আধুনিক মতবাদের সঙ্গে প্রাচীন মতবাদগুলির কতকগুলি বিরাট পার্থক্য আছে।

প্রথমত, আধুনিক মতবাদে প্রবৃত্তিজাত আচরণের একটি পরিষ্কার, নিখুঁত সুনির্দিষ্ট বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং রিফ্লেক্স ও ট্যাক্সিস জাতীয় অন্যান্য সহজাত

আচরণের এর সঙ্গে কোথায় এবং কতটুকু পার্থক্য তাও পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রাচীনপন্থী মতবাদগুলিতে প্রবৃত্তিকে একটি অস্পষ্ট, অনির্দিষ্ট এবং অপরিমিত শক্তি বা প্রবণতা বলে বর্ণনা করায় প্রবৃত্তির সত্যকারের স্বরূপটি আমাদের নিকট দুর্বোধ্য ও অবাস্তব থেকে গেছল।

দ্বিতীয়ত, এই মতবাদটি প্রাণী-আচরণ পর্যবেক্ষণের উপর সম্পূর্ণ ভিত্তি করে গঠন করা হয়েছে। এর মধ্যে অনুমান বা কল্পনার কোন স্থান নেই। ফলে এটি বিজ্ঞানসম্মত ও নির্ভরযোগ্য।

তৃতীয়ত, এই মতবাদে প্রবৃত্তির একটি সুনির্দিষ্ট এবং যথাযথ বর্ণনা পাওয়ার ফলে প্রাণী-আচরণের নিখুঁত ব্যাখ্যা দেওয়া এখন সম্ভব হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীনপন্থীরা যেগুলিকে প্রবৃত্তিজাত আচরণ বলে এসেছেন তার কতকগুলিকে লোরেঞ্জ রিফ্লেক্স বা ট্যাক্সিস নাম দিয়েছেন, কতকগুলিকে প্রকৃতই প্রবৃত্তিজাত বলে স্বীকার করেছেন আবার অনেকগুলিকেই শিক্ষা-প্রসূত আচরণ বলে বর্ণনা করছেন। প্রবৃত্তির এই সুনির্দিষ্ট রূপ এবং তার আচরণের সীমারেখা জানা না থাকায় এই বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণের সবগুলিকেই প্রাচীনপন্থীরা প্রবৃত্তিজাত বলে মনে করে এসেছেন।

লোরেঞ্জের দেওয়া প্রবৃত্তিজাত আচরণের ব্যাখ্যা যদি আমরা মেনে নিই তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে মানুষের ক্ষেত্রে নিছক প্রবৃত্তিজাত আচরণ খুব অল্পই পাওয়া যায়। মানব-আচরণ এতই বৈচিত্র্যময় ও পরিবর্তনধর্মী যে প্রবৃত্তির মত একটি যান্ত্রিক শক্তির দ্বারা তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তার সত্যকার ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে অন্য জায়গায়।

প্রবৃত্তি ও শিক্ষার মধ্যে সম্পর্ক

প্রবৃত্তির প্রকৃতি ও কাজ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এটা সকল শিক্ষাবিদ্‌ই মেনে নিয়েছেন। শিক্ষা ও প্রবৃত্তির মধ্যে এই সম্পর্ক আমরা দুদিক দিয়ে আলোচনা করব, প্রথম, শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব এবং দ্বিতীয়, প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব।

শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব (Effect of Instinct on Education)

ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা বিকাশের সঙ্গে সমার্থক। বস্তুত শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশের উপর প্রবৃত্তির প্রভাব যেমন গভীর, তেমনই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্যক্তিসত্তা হল তুটি শক্তির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার সম্মিলিত ফল। একটি শক্তি হল শিশু যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মেছে সেগুলি, এক কথায় যাকে বলা হয় উত্তরাধিকার বা বংশধারা (Heredity)। আর একটি শক্তি হল তার পরিবেশ বা শিক্ষা। এই তু'য়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকেই শিশুর পূর্ণ ব্যক্তিসত্তা রূপ গ্রহণ করে।

(শিশুর এই বংশধারার একটি বড় উপাদান হল তার সহজাত প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তিই প্রাথমিক অবস্থায় শিশুকে তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে সমর্থ করে এবং এগুলির সাহায্যেই সে তার জীবনধারণের প্রাথমিক আচরণগুলি সম্পন্ন করে। ক্ষুধায় খাওয়া, দলবদ্ধ জীবনযাপন করা, আত্মপ্রতিষ্ঠা করা, সঞ্চয় করা, নতুন কিছু সৃষ্টি করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ আচরণগুলি শিশু সম্পাদন করে তার প্রবৃত্তির সাহায্যে এবং তার এই আচরণগুলির উপরই তার ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করে।) যদিও প্রবৃত্তি সব মানুষের ক্ষেত্রে সমান তবু পরিবেশের বৈষম্য হেতু প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সব ক্ষেত্রে সমান হয় না এবং তার ফলে ব্যক্তিসত্তার গঠনের উপর প্রবৃত্তির প্রভাব বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে ওঠে। (অতএব বিনা দ্বিধায় এ সিদ্ধান্ত করা যায় যে শিশুর ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ নির্ণয়ে প্রবৃত্তির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।) বিশেষ করে শিশুর প্রথম জীবনের সমস্ত আচরণই প্রবৃত্তিজাত এবং সে সময়ে তার ব্যক্তিসত্তা গঠনে এই প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলিই সব চেয়ে শক্তিশালী উপকরণরূপে কাজ করে থাকে।) আধুনিক মনোবিজ্ঞানী বিশেষ করে মনঃসমীক্ষণবাদীদের মতে শৈশবেই ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ কাঠামোটি গঠিত হয়ে যায়। তার ফলে শৈশবকালীন প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার উপর যে গভীর প্রভাব রেখে যায় তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

এই সব কারণেই প্রাচীনপন্থী প্রবৃত্তিবাদীরা প্রবৃত্তির অপরিমিত শক্তির কথা বলে থাকেন। তাঁদের মতে শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবই একমাত্র প্রভাব। কেবল তাই নয়, তাঁদের মতে শিশুর আচরণগুলি প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত ত বটেই, (এমন কি তার পরিণত জীবনের সমস্ত আচরণই তার সহজাত প্রবৃত্তিগুলি থেকে প্রসূত। যেমন শৈশবে কৌতূহল-প্রবৃত্তি শিশুর জানার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলে এবং তাকে নানা বিষয়ে জানতে উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু সে যখন বড় হয়ে লেখা পড়া শেখে বা বিজ্ঞানের রহস্যভেদের জন্য গবেষণা চালায় বা দেশ বিদেশ পরিভ্রমণ করে নতুন নতুন জ্ঞান সঞ্চয় করে তখনও তার আচরণের মূলে আছে সেই কৌতূহল-প্রবৃত্তি, যদিও পরিণত বয়সের আচরণগুলি

শৈশবের তুলনায় অনেক বেশী জটিল ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। সেই রকম যৌথ প্রবৃত্তি এবং সংগঠন প্রবৃত্তিও মানুষের বহু আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। শিশুর প্রাথমিক সঙ্গলাভের ইচ্ছা এবং কাদা বালি দিয়ে বাড়ী তৈরী করার চেষ্টা পরিণত জীবনে দেখা দেয় ক্লাব, সংঘ, সমাজ প্রভৃতি গড়ার আচরণরূপে এবং শিল্প-কলা, সাহিত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টি করার প্রচেষ্টারূপে। এভাবে দেখান যেতে পারে যে ব্যক্তির পরিণত জীবনের সমুদয় আচরণই তার সহজাত প্রবৃত্তি থেকে প্রসূত। এক কথায় ম্যাকডুগালের মতে প্রবৃত্তিই মানব আচরণের একমাত্র উৎস।

প্রবৃত্তির অপরিহার্য সঙ্গী হল প্রক্ষোভ। প্রক্ষোভই ব্যক্তির সকল কাজের পিছনে প্রেষণা শক্তি জোগায়। অতএব শিশুর ক্রমবিকাশমান ব্যক্তিসত্তার উপাদান বলতে আমরা পাচ্ছি দুটি জিনিস, একটি সহজাত-প্রবৃত্তি, অপরটি তার সহগামী প্রক্ষোভ। ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীদের মতে শিশুর পরিণত-জীবনের আচরণ ধারার পূর্ণ সংগঠনটি নির্ভর করছে এই দুটি বস্তুর উপর। যেমন, শিশু বড হয়ে সৃজনশীল বা সঙ্গপ্রিয় হবে কিনা নির্ভর করছে তার সংগঠন-প্রবৃত্তি বা যৌথ প্রবৃত্তির উপব। সেই রকম শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি এবং তার সহগামী আত্মগরিমার প্রক্ষোভটি যদি যথাযথ বিকাশলাভ করে তবেই শিশু বড হয়ে সবল ব্যক্তিত্বের লোক হয়ে উঠবে এবং বিপরীতভাবে, যদি তার বশ্যতার প্রবৃত্তি ও তার সহগামী হীনমন্যতার প্রক্ষোভটি বৃদ্ধি পায় তবে সে বড় হয়ে দুর্বল প্রকৃতির লোক বলে পরিগণিত হবে।

এভাবে ম্যাকডুগাল এবং অন্যান্য প্রবৃত্তিবাদীরা ব্যক্তির প্রবৃত্তি এবং প্রক্ষোভের উপর ভিত্তি করে মানুষের ব্যক্তিসত্তার সমগ্র সংগঠনটিরই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ সংগঠনটিই প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের দ্বারা গঠিত। এই দুটি সহজাত উপাদানই শিশুর সমগ্র ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ ও সংগঠন নির্ধারণ করে থাকে। শিশুর প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলি যে পথে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং যতখানি অভিব্যক্ত হবার সুযোগ পায় তার উপরই তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশের গতিপথ নির্ভর করে। এক কথায় প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভই শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনের দুটি প্রধান শক্তি। এই দিক দিয়ে প্রবৃত্তিকে ব্যক্তিসত্তার ভিত্তি বা মূল উপাদান বলে বর্ণনা করা চলতে পারে।

প্রবৃত্তিবাদীরা তাঁদের এই মতবাদটি নানা ভাষায় বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন যে সহগামী প্রক্ষোভগুলি নিয়ে শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলিই হচ্ছে

ব্যক্তিসত্তার মূলভিত্তি।[১] আবার কেউ বলেছেন যে প্রবৃত্তিগুলি হচ্ছে চরিত্রের মূল উপাদান[২] ইত্যাদি।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে কিন্তু প্রবৃত্তির এই একাধিপত্য আর স্বীকার করা হয় না। শিশুর ব্যক্তিসত্তা গঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও প্রবৃত্তিকে শিশুর আচরণের একমাত্র নির্ণায়ক বলে কেউই স্বীকার করেন না। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুর ব্যক্তিসত্তা গঠনে যে শক্তিটি সব চেয়ে বেশী কাজ করে সেটি হল তার চাহিদা (Needs)।[৩] চাহিদা দু'শ্রেণীর হতে পারে, যথা, জৈবিক বা সহজাত চাহিদা এবং সামাজিক বা অর্জিত চাহিদা। কতকগুলি জৈবিক চাহিদা শিশুর প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন কামনা ইত্যাদি। কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় নিতান্তই অল্প। শিশুর আচরণকে বেশীর ভাগ নিয়ন্ত্রিত করে তার অর্জিত বা সামাজিক চাহিদাগুলি। এগুলির উপর প্রবৃত্তির প্রভাব আংশিক ও সীমাবদ্ধ। অর্জিত চাহিদাগুলি মূলত পরিবেশের দ্বারাই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। শিশু যতই তার পরিবেশের সংস্পর্শে আসে ততই তার মধ্যে নিত্য নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। নতুন নতুন সঙ্গতিবিধানের মাধ্যমে শিশু তার এই চাহিদাগুলি পূর্ণ করার চেষ্টা করে এবং তার সেই সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাই তার বহুমুখী আচরণের জন্ম দিয়ে থাকে। এক কথায় শিশুর পরিণত বয়সের ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ নির্ভর করে তার এই চাহিদাগুলির তৃপ্তি বা অতৃপ্তির উপর।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর বৃদ্ধির প্রাথমিক স্তরে প্রবৃত্তির আধিপত্য থাকলেও শিশু একটু বড় হলে তার মধ্যে বহু বিভিন্নধর্মী চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং তখন তার আচরণ এই চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যেই সম্পন্ন হয়। অতএব শিশুর প্রবৃত্তিকে তার আচরণের উৎস বলে বর্ণনা করা ঠিক নয়। শিশুর আচরণের উৎস হল তার এই বহুমুখী সদাপরিবর্তনশীল চাহিদাগুলি।

শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে প্রবৃত্তির প্রভাবকে গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার না করলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির ভূমিকা অবহেলার নয়। এই কথাটি অনস্বীকার্য যে শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলির উপর প্রবৃত্তির প্রভাব অত্যন্ত বেশী। অতএব বিচক্ষণ শিক্ষক এই তথ্যটিকে শিশুর ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই সযত্নে কাজে লাগাবেন। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি সংক্রান্ত নীচের তথ্যগুলি অবশ্য স্মরণ রাখা কর্তব্য।

---

1. **Instincts with their accompanying emotions are the very foundation of personality.**
2. **Instincts are the raw material of character.** 3. পৃঃ ৬৭।

প্রথমত, শিশুর শিক্ষা প্রবৃত্তিমুখী হবে। অর্থাৎ প্রবৃত্তি-বিরোধী কোন শিক্ষা তাকে দেওয়া উচিত নয়। প্রবৃত্তির গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যদি শিক্ষা দেওয়া হয় তবে সে শিক্ষা সহজ ও বাধাহীন হবে। যে শিক্ষা শিশুর প্রবৃত্তিকে ক্ষুণ্ণ বা দমিত করে সে শিক্ষা যে অনর্থকই তা নয়, শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ক্ষতিকরও হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষক শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে শিক্ষাকে অধিকতর আয়াসহীন ও কার্যকর করে তুলতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ শিক্ষায় শিশুর মনোযোগ অবশ্য প্রয়োজনীয়। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর প্রতি শিশুর কৌতূহলরূপ প্রবৃত্তিকে যদি ঠিকমত উদ্বুদ্ধ করা যায় তবে শিশুর লেখাপড়ায় মনোযোগও স্বাভাবিকভাবে দেখা দেবে। সেই রকম যৌথ-প্রবৃত্তিকে ঠিকমত কাজে লাগিয়ে শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে সহযোগিতা ও সংঘ-বদ্ধতা সৃষ্টি করতে পারেন। শিশুর আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিটিকে তৃপ্ত করে সহজেই শৃঙ্খলা রক্ষার সমস্যার সমাধান করা যায়। তেমনই শিক্ষক শিশুর সংগঠনপ্রবৃত্তিকে অভিব্যক্ত হবার সুযোগ দিয়ে তার সৃজনীস্পৃহাকে বিকশিত করতে পারেন ইত্যাদি।

তৃতীয়ত, প্রবৃত্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত করে শিক্ষক শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত গুণাবলীর সৃষ্টি করতে পারেন এবং অবাঞ্ছিত প্রবণতাগুলি দূর করতে পারেন। আমরা দেখেছি যে মানুষের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি অনেকাংশে নমনীয় ও পরিবর্তনশীল। পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ ও বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষক প্রবৃত্তিগুলিকে প্রয়োজনমত পরিপুষ্ট বা অবরুদ্ধ করে শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন। যেমন, শিশুর কৌতূহল প্রবৃত্তিকে ঠিক পথে পরিচালিত করে তার মধ্যে বিদ্যার্জনের আসক্তি সৃষ্টি করা যায়, তার সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে উপযুক্ত অভিব্যক্তির সুযোগ দিয়ে দেশ বিদেশের ছবি, ডাক-টিকিট বা মুদ্রা সংগ্রহের মত শিক্ষাপ্রদ হবি তার মধ্যে গড়ে তোলা যায়, তার সংবদ্ধতার প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দিয়ে তার মধ্যে সুনাগরিকতার গুণাবলী সৃষ্টি করা যায়, তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তিকে ব্যক্ত হবার সুযোগ দিয়ে তার মধ্যে সুপ্ত নেতৃত্বের ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা যায় ইত্যাদি।

প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব (Effect of Education on Instincts)

উইলিয়ম জেমসের মতে শিক্ষার দ্বারা সহজাত প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন সম্ভব। তিনি বিশ্বাস করেন যে শিক্ষার দ্বারা প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ বিলোপ-

সাধনও ঘটান যায়। ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা এই চরম মত গ্রহণ না করলেও এটা স্বীকার করেন যে মানবপ্রবৃত্তি যথেষ্ট মাত্রায় পরিবর্তনশীল এবং প্রয়োজন ও পরিবেশের চাপে তা বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে।

শিক্ষার দ্বারা কেমন করে প্রবৃত্তির পরিবর্তন সাধন করা যেতে পারে তার কতকগুলি পন্থার বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

১। অবদমন (Repression)

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের প্রথম পন্থা হল অবদমন। এর অর্থ হল প্রবৃত্তির বিকাশকে জোর করে রুদ্ধ করা। যখন কোন প্রবৃত্তি অবাঞ্ছিত বা অনিষ্টকর বলে মনে হয় তখন সেটির বহিপ্র্রকাশকে বলপূর্বক রুদ্ধ করা যায়। এ উপায়টি মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং প্রায়ই শেষ পর্যন্ত স্থায়ীভাবে কার্যকর হয় না। অবদমিত প্রবৃত্তি ভিন্ন রূপ নিয়ে ব্যক্তির মনে দেখা দেয় এবং উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে। সাধারণত যখন শাস্তির ভয় বা পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে শিশুকে কোন প্রবৃত্তিজাত আচরণ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করা হয় তখন আসলে শিশুর প্রবৃত্তিকে অবদমিতই করা হয়। কিন্তু এ ধরনের প্রচেষ্টা সাধারণত স্থায়ী হয় না এবং যেখানে স্থায়ী হয় সেখানে গুরুতর মানসিক জটিলতার সৃষ্টি করে এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠনকেই ক্ষুণ্ণ করে তোলে।

২। উন্নীতকরণ (Sublimation)

প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় পন্থার নাম হল উন্নীতকরণ। এই পন্থায় প্রবৃত্তির গতিধারাকে তার স্বাভাবিক অথচ অবাঞ্ছিত পথ থেকে সরিয়ে এনে বাঞ্ছিত কোন পথে পরিচালিত করা হয়। যে শিশু যুযুৎসাপ্রবৃত্তির প্রভাবে সঙ্গীদের সঙ্গে প্রায়ই মারামারি করে, তার সেই বিপথগামী প্রবৃত্তিকে বক্সিং, কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর খেলার মধ্যে দিয়ে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করা যায়। যে শিশু আজে বাজে টুকিটাকি জিনিষ জমিয়ে সময় ও শ্রম নষ্ট করে তার সঞ্চয়-প্রবৃত্তিকে শিক্ষাপ্রদ বস্তু সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে উন্নীত করে তোলা যেতে পারে। সেই রকম শিশুর অবাঞ্ছিত অর্থহীন কৌতূহলকে বাঞ্ছিত শিক্ষাদায়ক জিজ্ঞাসায় এবং তার বিরক্তি বা ঘৃণাকে অপ্রিয় বা অকাম্যের প্রতি ঘৃণায় উন্নীত করা যেতে পারে।

শিক্ষায় উন্নীতকরণ প্রক্রিয়াটির গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। বহু সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাবে শিশুর মধ্যে এমন অনেক আচরণ দেখা দেয় যেগুলি শিশুর নিজের দিক দিয়ে এবং সমাজের দিক দিয়ে কাম্য নয় এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তার সংগঠনটিকে ত্রুটিপূর্ণ করে তোলে। ফলে সেগুলিকে দূর করা বা নিয়ন্ত্রিত করা

অপরিহার্য হয়ে ওঠে। সাধারণত প্রাচীনপন্থী বিদ্যালয়গুলিতে এই ধরনের অবাঞ্ছিত সহজাত আচরণগুলি জোর করে অবদমিত করা হত। তার ফলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠত। অবদমনের চেয়ে অনেক উন্নত ও সন্তোষজনক পন্থা হল উন্নীতকরণ। এই পন্থায় অবাঞ্ছিত ও অপকৃষ্ট আচরণগুলিকে উন্নত ও বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করে নিয়ে যাওয়ার ফলে শিশুর ব্যক্তিসত্তা স্বাস্থ্যময় পথে গড়ে ওঠে। এই জন্য অনেক মনোবিজ্ঞানী বলেন যে শিক্ষার মূল লক্ষ্যই হল শিশুর প্রবৃত্তিগুলিকে তাদের অপকৃষ্ট স্তর থেকে উৎকৃষ্ট স্তরে উন্নীত করা।

৩। **বিরেচন** (Catharsis)

তৃতীয় পন্থাটির নাম হল বিরেচন। এই পন্থায় প্রবৃত্তিকে তার সহজ ও কাম্য পথে অভিব্যক্ত হতে দিয়ে শান্ত করা হয়। এই পন্থাটি অবদমন (Repression) পন্থাটির ঠিক বিপরীত। যে সব ক্ষেত্রে প্রবৃত্তিকে অবদমিত করা হয়েছে এবং যার ফলে ব্যক্তির মানসিক সাম্য নষ্ট হতে চলেছে সে সব ক্ষেত্রে বিরেচন পদ্ধতি গ্রহণ করাই মনোবিজ্ঞানসম্মত। ফ্রয়েড এই পদ্ধতির নাম দিয়েছেন এ্যাব্রিকসান (Abreaction)। কিন্তু নানা কারণে সর্বত্র বা সাধারণের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।

৪। **অন্যান্য পন্থা** (Other Methods)

চতুর্থ পন্থাটি হল প্রবৃত্তিটিকে বহিপ্র্কাশের সুযোগ না দেওয়া। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে উপযুক্ত সুযোগের অভাবে প্রবৃত্তিটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে গেছে। এটি অবশ্য অবদমন প্রক্রিয়ারই একটি প্রকার মাত্র। কিন্তু অবদমনের মত এ ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে আচরণটি দমন করা হয় না। এখানে প্রবৃত্তিটিকে প্রকাশের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে সেটিকে অভিব্যক্ত হতে দেওয়া হয় না। পঞ্চম, পরিবেশের পরিবর্তনও একটি ফলদায়ক পন্থা। অনেক সময় দেখা গেছে যে বিশেষ পরিবেশে হয়ত বিশেষ কোন প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তখন যদি সেই পরিবেশটিকে পরিবর্তিত করা যায় তবে প্রবৃত্তিটি আর কাজ না করতেও পারে। ষষ্ঠ, অনেক সময় বিপরীতধর্মী প্রবৃত্তিকে বিকাশের সুযোগ দিয়ে কোন বিশেষ অবাঞ্ছিত প্রবৃত্তিকে শক্তিহীন করে তোলা যেতে পারে। যেমন, কোন শিশুর বশ্যতা প্রবৃত্তিকে দূর করতে হলে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি যাতে বিশেষভাবে বিকাশলাভ করে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। শিশুর ঘৃণার ভাবকে দূর করতে হলে তার মনে শ্রদ্ধা বা ভালবাসার ভাব জাগানো একটি ফলপ্রদ উপায়।

---

1. **The whole task of education is to sublimate instincts.**

পাঁচ

চাহিদা—মানব আচরণের উৎস
(Needs—The Spring of Human Behaviour)

মনোবিজ্ঞানের কাজ হল মানব আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া। অর্থাৎ বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে ব্যক্তি অন্য কোনভাবে আচরণ না করে বিশেষ একভাবে কেন আচরণ করে তার কারণ নির্ণয় করা। এর জন্য মানব আচরণের মূল বা উৎস কোথায় তা নির্ণয় করা একান্ত দরকার।

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ তথ্যটি জানার প্রয়োজনীয়তা আরও অনেক বেশী। কেননা শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রধান কাজ হল শিশুকে কতকগুলি বাঞ্ছিত আচরণ শিখতে সাহায্য করা এবং তার প্রকৃতিদত্ত সম্ভাবনাগুলি যাতে পূর্ণ বিকাশলাভ করে তার আয়োজন করা। অতএব শিশুর বিভিন্ন আচরণের মূল বা উৎস কোথায় তা প্রথমেই জানতে হবে। এই জন্য মানব-আচরণের উৎস নির্ণয়নই হল শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের কর্মসূচীর প্রথম সোপান।

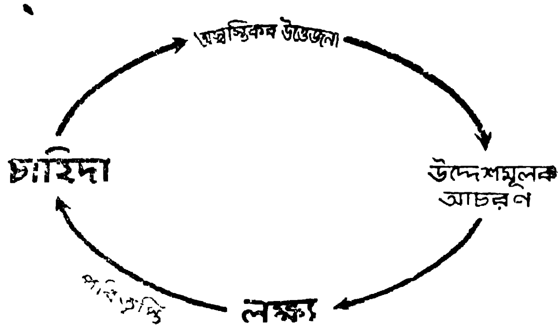
আমরা ইতিপূর্বেই দেখেছি যে ম্যাকডুগাল প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা সহজাত প্রবৃত্তিকে প্রাণীর আচরণের প্রকৃত উৎস বলে বর্ণনা করেছেন এবং প্রবৃত্তির দ্বারা প্রাণীর সকল আচরণেরই ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমরা এও দেখেছি যে মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা অনেকখানি সত্য হলেও মানুষের ক্ষেত্রে এ মতবাদ সম্পূর্ণ অচল। তবে মানব আচরণের প্রকৃত উৎসটি কোথায়?

মানব আচরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অপরিমিত পরিবর্তনশীলতা ও অপরিসীম বৈচিত্র্য। বিবিধতার দিক দিয়ে মানব আচরণ সকল প্রকার পরিগণনার বাইরে। যে কোন পরিণত ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনে সম্পন্ন আচরণগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে সেগুলি যেমন সংখ্যাবহুল তেমনই বৈচিত্র্যময়। অথচ নবজাত শিশুর আচরণ সে তুলনায় অনেক স্বল্প ও সরল। শিশু যত বড় হয় ততই সে নতুন নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে শেখে এবং ততই তার আচরণ দিন দিন জটিল থেকে জটিলতর হতে থাকে।

এখন প্রশ্ন হল শিশুর এই নতুন আচরণ শেখার পশ্চাতে কিসের চাপ থাকে? কেন শিশু নিত্য নতুন আচরণ শিখে চলে? এক কথায় এর উত্তর হল যে শিশুর চাহিদাই তার আচরণের প্রকৃত উৎস। চাহিদা কথাটির অর্থ হল অভাববোধ। প্রাণী যখন কোন বিশেষ বস্তুর অভাব বোধ করে তখন তার মধ্যে সেই বস্তুটির

চাহিদা জাগে। আর যখনই সে সেই বস্তুটি পেয়ে যায় তখনই তার অভাব-বোধ দূর হয়ে যায় এবং তার চাহিদাও আর থাকে না। এই চাহিদার জাগরণ আর চাহিদার তৃপ্তির মধ্যে কয়েকটি স্তর বা সোপান আছে। প্রাণীর মধ্যে কোনও একটি বিশেষ চাহিদা জাগলে তার মধ্যে দেখা দেয় একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি (Tension) এবং এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটিই প্রাণীকে সক্রিয় করে তোলে। অর্থাৎ সে তার এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটি দূর করার জন্য নানা রকম আচরণ করতে সুরু করে। যতই তার এই চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায় ততই এই অস্বস্তিকর অনুভূতিটি বেড়ে চলে। ফলে প্রাণীও বিভিন্ন প্রকৃতির আচরণ করে চলে এবং তার দ্বারা চেষ্টা করে তার অভাবের বস্তুটি পেতে ও চাহিদাটি মেটাতে। বস্তুত প্রাণীর মধ্যে কোনও চাহিদা জাগা মানে তার দেহমনোগত যে সাম্যাবস্থা (Equlibrium) পূর্বে ছিল তা নষ্ট হয়ে যাওয়া। আর যতক্ষণ না তার মধ্যে এই সাম্যাবস্থা ফিরে আসছে ততক্ষণ প্রাণীর প্রচেষ্টার শেষ হয় না। যে মুহূর্তেই সে তার অভাবের বস্তুটি পেয়ে যায় সেই মুহূর্তেই তার চাহিদা দূর হয়ে যায় এবং তার অস্বস্তিকর অনুভূতিও চলে গিয়ে তার দেহ-মনের লুপ্ত সাম্যাবস্থা ফিরে আসে।

প্রাণীর মধ্যে কোন চাহিদার উৎপত্তি এবং বিভিন্ন স্তরের মধ্যে দিয়ে তার পরিতৃপ্তি অনেকটা চক্রের আকারে সংঘটিত হয়ে থাকে। নীচের ছবি থেকে এ সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।



চাহিদা-লক্ষ্য চক্র
[চাহিদার জাগরণ—অস্বস্তিকর উত্তেজনা—আচরণ—চাহিদার পরিতৃপ্তি]

একটি উদাহরণ নেওয়া যাক। ক্ষুধা প্রাণী জীবনের একটি মৌলিক চাহিদা এটি হল খাদ্যের অভাববোধ। প্রাণীর মধ্যে এই চাহিদা জাগলে দেখা

১। স্বাভাবিক অবস্থায় মানবদেহের বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে একটি সাম্যাবস্থা বিরাজ করে। তাকে শরীরতত্ত্বের ভাষায় দেহসাম্য (homoestasis) বলা হয়।

দেয় একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং তা থেকে জন্ম নেয় খাদ্য-অন্বেষণরূপ আচরণটি। যতক্ষণ না প্রাণী তার সেই খাদ্য পাচ্ছে এবং তার দ্বারা তার ক্ষুধার চাহিদাটি মিটছে ততক্ষণ তার আচরণ চলতে থাকে। আর যেই তার চাহিদাটি মিটে যায় সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণও বন্ধ হয়ে যায়। প্রাণীর সমস্ত আচরণই এভাবে সংঘটিত হয়ে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে চাহিদাই প্রাণীর সমস্ত কাজের প্রেষণা শক্তি জুগিয়ে থাকে এবং এক কথায় চাহিদাই হল প্রাণী-আচরণের প্রকৃত উৎস।

মানব চাহিদার প্রকৃতি ও শ্রেণীবিভাগ

মানব চাহিদাকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, জৈবিক চাহিদা (Physiological or Organic need) আর দ্বিতীয়, মানসিক বা সামাজিক চাহিদা (Psychological or Social needs)।

জৈবিক চাহিদা হল সেই সব চাহিদা যা ব্যক্তিকে তার দেহগত অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মেটাতে হয়। যেমন, অক্সিজেনের চাহিদা, বিশেষ একটা তাপমাত্রার চাহিদা, খাদ্য-জল প্রভৃতির চাহিদা। এগুলি প্রধানত দেহের নানা যন্ত্রের অভাব বা প্রয়োজনীয়তা মেটানোর জন্য দেখা দিয়ে থাকে এবং এ থেকে উদ্ভূত আচরণ অপেক্ষাকৃত সরল ও সুনির্দিষ্ট। এই চাহিদাগুলি সহজাত এবং সাধারণত যাকে আমরা প্রবৃত্তি বলে থাকি এই চাহিদাগুলি অনেকটা সেই শ্রেণীর। যেহেতু এই চাহিদাগুলি নিয়ে প্রাণী জন্মায় সেহেতু এগুলিকে মৌলিক চাহিদাও (Primary needs) বলা হয়ে থাকে। এই চাহিদাগুলি মোটামুটি সর্বজনীন এবং এ থেকে উদ্ভূত আচরণগুলিও সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রায় একই রকমের।

শিশু জন্মাবার পর যে সকল আচরণ সম্পন্ন করে সেগুলি এই জৈবিক বা মৌলিক চাহিদাগুলির দ্বারাই মূলত নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তখন তার একমাত্র দ্রষ্টব্য কেমন করে তার দেহগত অভাবগুলি মিটিয়ে সে পৃথিবীতে তার অস্তিত্ব বজায় রাখবে।

কিন্তু শিশু কিছুটা বড় হবার পর থেকেই জৈবিক অভাব ছাড়াও আরও কতকগুলি অভাব সে বোধ করতে থাকে। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর সঙ্গে মানুষের একটি বড় পার্থক্য হল এই যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের বাঁচাটা কেবলমাত্র দেহগত অর্থাৎ দেহের অভাব মেটাতে পারলেই তাদের কাজ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বাঁচাটা দু'রকমের—প্রথম দেহগত, দ্বিতীয় সমাজগত।

দেহগত চাহিদাগুলি মেটাতে পারলেই দেহগত বাঁচার কাজটি শেষ হল। কিন্তু সামাজিক বাঁচার জন্য তাকে আরও অনেক রকম চাহিদা মেটাতে হবে। শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই সে এই সামাজিক বাঁচার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে এবং ততই তার মধ্যে নিত্যনূতন অভাববোধ দেখা দেয়। তার কাছে ক্রমশঃ জৈবিক চাহিদার চেয়ে সামাজিক চাহিদাগুলির গুরুত্ব অধিক হয়ে ওঠে এবং কালক্রমে এই ক্রমবর্ধমান সামাজিক চাহিদাগুলি তার আচরণের প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়। এই রকম একটি সামাজিক চাহিদা হল সহপাঠীদের মধ্যে শিশুর নিজের স্বীকৃতিলাভের প্রয়োজনীয়তা। এই স্বীকৃতিলাভের জন্য শিশু নানা রকম আচরণ সম্পন্ন করতে পারে এবং অনেক সময় স্বচ্ছন্দে তার জৈবিক চাহিদাকেও অবহেলা করে থাকে।

মানুষের সামাজিক চাহিদার সংখ্যা গুণে শেষ করা যায় না। এগুলি নিত্য বর্ধমান এবং পরিবর্তনশীল। পরিবেশের বিভিন্নতা অনুযায়ী এগুলির প্রকৃতিও বিভিন্ন। তবে সাধারণ সভ্য মানুষের সমাজে শিক্ষা ও কৃষ্টির সমতার জন্য তাদের পরিবেশের বেশ কিছুটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। সেজন্য দেখা গেছে যে অনেকগুলি চাহিদা প্রায় সমস্ত সভ্যসমাজের মানুষের মধ্যেই এক। সেগুলির একটি মোটামুটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

১। দৈহিক নিরাপত্তার চাহিদা (Need for Physical Security)

এই চাহিদাটি থেকে নানা রকম আচরণের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, বিপজ্জনক কোন পরিস্থিতি থেকে পালান, নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়া, খাদ্য-জল অনুসন্ধান করা, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, হাসপাতাল তৈরী করা, ওষুধ আবিষ্কার করা, স্বাস্থ্যবিভাগ স্থাপন করা, চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করা ইত্যাদি।

২। স্বাচ্ছন্দ্যের চাহিদা (Need for Comfort)

এ থেকে উদ্ভূত আচরণ হল আর্থিক সঙ্গতি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা, দারিদ্র্য থেকে দূরে থাকা, শারীরিক কষ্টকর বা মানসিক অস্বস্তিকর কিছু এড়িয়ে যাওয়া, চাকরি অনুসন্ধান করা, অর্থ সঞ্চয় করা ইত্যাদি।

৩। সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা (Need for Social Security)

যে সমাজে ব্যক্তি বাস করে সেই সমাজে তার একটি নিজস্ব ও স্বীকৃত স্থান থাকা প্রয়োজন। এর প্রধান অভিব্যক্তি হল অপরের সঙ্গ খোঁজা ও নির্জনতা পরিহার করা। শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই তার মধ্যে পিতামাতা, বাড়ী, স্কুল প্রভৃতি সম্বন্ধে একটি নিজস্ব অধিকার বোধ জাগাতে থাকে।

এই জন্য এটিকে অধিকৃতির চাহিদাও (Need for Belongingness) বলা হয়। এই চাহিদা থেকেই পরে জন্মায় স্বদেশ, পূর্বপুরুষ, ঐতিহ্য প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ।

সমাজে স্বীকৃতি-লাভের এই চাহিদা থেকে বহু বিভিন্ন ধরনের আচরণের উৎপত্তি হতে পারে। সমাজ যাতে ব্যক্তিকে স্বীকার করে নেয় তার জন্য ব্যক্তি সমাজ-সৃষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলে এবং সমাজ-নিষিদ্ধ আচরণগুলি থেকে নিবৃত্ত থাকে। বন্ধুত্ব, ভালবাসা, প্রতিবেশীর প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি নানা আচরণ এই চাহিদা থেকেই জন্মায়।

৪। আত্ম-স্বীকৃতির চাহিদা (Need for Recognition)

প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের সম্বন্ধে একটি মূল্যবোধ আছে, সে মূল্য বেশীই হোক্ আর কমই হোক্। অপরের কাছে এই মূল্যের স্বীকৃতি পাওয়ার ইচ্ছাটাও মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। এই চাহিদার জন্যই শিশু পরীক্ষায় ভাল করা, খেলার মাঠে অপরকে হারিয়ে দেওয়া বা অন্য কোনও প্রচেষ্টায় নিজের পারদর্শিতা দেখানোর চেষ্টা করে। পরিণত জীবনে ঐশ্বর্যলাভের, সম্মান অর্জনের বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সাফল্যলাভের প্রচেষ্টা এই চাহিদারই অভিব্যক্তি। রাজনীতি, যুদ্ধ, রাষ্ট্র-জীবন বা ছোট বড় সামাজিক অনুষ্ঠানে যাঁরা নেতৃত্ব করে থাকেন তাঁদের আচরণ মূলত এই চাহিদা থেকেই জন্মে থাকে। আত্মসম্মানবোধ এই চাহিদারই একটি অভিব্যক্তি এবং এই চাহিদার পরিতৃপ্তিতে জন্মায় আত্মশ্লাঘা।

৫। নূতনত্বের চাহিদা (Need for Novelty)

পরিতৃপ্তি মানুষের কাম্য হলেও কোন বস্তুর অভাব পরিতৃপ্ত হলেই মানুষের মধ্যে সেই পুরাতন বস্তুটির প্রতি বিরাগ দেখা দেয় এবং নতুন বস্তু পাবার আকাঙ্খা জাগে। এই নূতনত্বের আকাঙ্খা ব্যক্তির নানা আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। নতুন জামা কাপড় তৈরী করা থেকে নতুন দেশ বিদেশ দেখা, নতুন কিছু সংগ্রহ করা, নতুন লোকের সঙ্গে আলাপ করা প্রভৃতি যে কোন নতুন অভিজ্ঞতালাভই এই চাহিদাটির পর্যায়ে পড়ে।

৬। সক্রিয়তার চাহিদা (Need for Activity)

সক্রিয়তা প্রাণীমাত্রেরই স্বাভাবিক ধর্ম। যে জীবনীশক্তি নিয়ে প্রাণী জন্মায় কেবলমাত্র বেঁচে থাকায়, তার সবটা ব্যয় হয়ে যায় না। অবশিষ্ট শক্তি তখন প্রকাশ পায় নানা কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে। তা ছাড়া মানুষের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন শক্তি দক্ষতা তার নানা কাজের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ লাভ করে। এই সক্রিয়তার চাহিদা থেকে জন্ম নিয়েছে শিল্প-কলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, ভাস্কর্য

প্রভৃতি। খেলাধূলা, উৎসব, ভ্রমণ প্রভৃতিও এই চাহিদা থেকেই সৃষ্ট হয়েছে। ছোট শিশুর মধ্যে এ চাহিদাটির প্রকাশ খুব বেশী দেখা যায় এবং এটিকে সৃজনমূলক পথে নিয়ে যেতে পারলে শিশুর সৃজন-শক্তি সুষ্ঠু বিকাশলাভ করতে পারে।

৭। **স্বাধীনতার চাহিদা** (Need for Freedom)

ইচ্ছামত কথা বলা, কাজ করা এবং চলা ফেরার আকাঙ্খাও মানুষের একটি মৌলিক চাহিদা। এই স্বাধীনতার চাহিদা থেকে জন্মায় সকল রকম বন্ধন, শাসন, নিয়ম-শৃঙ্খলা, বিধি-নিষেধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার প্রচেষ্টা ইত্যাদি। সাধারণত স্কুলে বা বাড়ীতে শিশুর এই চাহিদাটির প্রতি সুবিচার করা হয় না এবং শিশুর পরিবেশকে বিধিনিষেধের দ্বারা এমনভাবে শৃঙ্খলিত করে ফেলা হয়, যার ফলে শিশুর এই মৌলিক চাহিদাটি অভিব্যক্ত হবার সুযোগ পায় না। এই জন্য অতিরিক্ত শাসনধর্মী বিদ্যালয় বা গৃহ পরিবেশ শিশুমাত্রেই এড়িয়ে চলে এবং সময় সময় তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানায়। অপরের সাহায্য না নিয়ে নিজে থেকে নতুন কিছু করা, নতুন জিনিস সৃষ্টি করা, কোন নতুন চিন্তা করা প্রভৃতি আচরণগুলি মূলত এই চাহিদাটিরই অভিব্যক্তি।

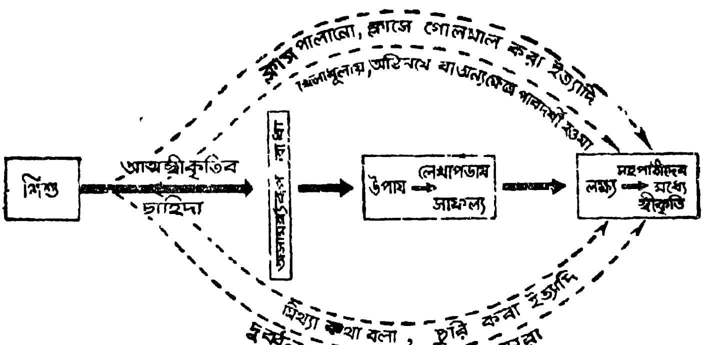
৮। **যৌনতৃপ্তির চাহিদা** (Need for Sexual Satisfaction)

এ চাহিদাটি মূলত জৈবিক এবং যৌন-উত্তেজনার তৃপ্তিই এই চাহিদাটির লক্ষ্য। যৌনমূলক সকল আচরণই এই চাহিদা-প্রসূত। পূর্বরাগ, বিবাহ, দাম্পত্য-জীবন যাপন প্রভৃতি বয়স্কসুলভ আচরণগুলি এই পর্যায়ে পড়ে। শিশুর ক্ষেত্রে এই চাহিদাটি সাধারণত যৌন-কৌতূহল ও যৌনঘটিত জিজ্ঞাসারূপে দেখা দেয়।

শিশুর চাহিদা ও শিক্ষা (Child's Need and Education)

আমরা দেখেছি যে চাহিদা থেকে জন্মায় আচরণ এবং সে আচরণের বিরতি ঘটে চাহিদার তৃপ্তিতে। এখন যদি শিশুর কোন বিশেষ চাহিদার তৃপ্তিলাভ না ঘটে তবে সেই চাহিদা-জনিত যে অস্বস্তিকর উত্তেজনা তার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল তা কখনই দূর হবে না বরং ক্রমশ বেড়েই চলবে। এর ফলে শিশু তার চাহিদা মেটানোর জন্য আরও নানারকম আচরণ করে চলবে। তার পরিচিত ও অভ্যস্ত আচরণগুলি শেষ হয়ে গেলে সে নূতন ও অনভ্যস্ত আচরণ করে দেখবে যে তার দ্বারা সে তার চাহিদা মেটাতে পারে কি না এবং যতক্ষণ না আংশিক বা বিকৃতভাবেও তার চাহিদা সে মেটাতে পারছে ততক্ষণ সে নানাভাবে চেষ্টা করতে ত্রুটি করবে না। ফলে দেখা গেছে যে শিশুর মধ্যে নানারূপ অদ্ভুত বা অবাঞ্ছিত আচরণের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণত পিতামাতা বা শিক্ষকেরা এই আচরণগুলির যথার্থ কারণ নির্ণয় করতে পারেন না এবং মনে করেন যে দুষ্টবুদ্ধি

বা খামখেয়ালের জন্যই শিশু এই আচরণ করছে। প্রকৃতপক্ষে যাকে আমরা সাধারণত সমস্যামূলক আচরণ (Problem behaviour) বলে থাকি সেগুলি এভাবে সৃষ্ট হয়ে থাকে। শিশু যখন স্বাভাবিক পন্থায় তার চাহিদা তৃপ্ত করতে পারে না তখন সে অস্বাভাবিক পথে তার চাহিদাটি তৃপ্ত করার চেষ্টা করে এবং তার ফলেই তার মধ্যে নানা অবাঞ্ছিত ও অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেয়। অতএব সমস্যামূলক আচরণগুলি সম্পূরক (Compensatory) আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছান যখন শিশুর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে তখন সে সেই লক্ষ্যের স্থানে একটি বিকল্প লক্ষ্য (Substituted goal) স্থাপন করে নেয় এবং সেই বিকল্প লক্ষ্যে পৌঁছানর মধ্যে দিয়ে নিজের চাহিদাটি তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। পরিবেশের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে এই খাপ খাওয়াতে না পারা বা সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্যকে অপসঙ্গতি (Maladjustment) বলে এবং এই ধরনের শিশুদের অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশু (Maladjusted child) বলা হয়।



[স্বাভাবিক পথে চাহিদা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় শিশু নানাবিধ প্রতিকল্প আচরণের সাহায্যে তার অতৃপ্ত চাহিদাটির তৃপ্তির চেষ্টা করে।]

যেমন, স্কুল-পরিবেশে সহপাঠীদের মধ্যে শিশুর আত্মস্বীকৃতি লাভের স্বাভাবিক পথ হল লেখাপড়ায় উৎকর্ষ দেখান। এখন কোন কারণে যদি একটি বিশেষ শিশু এ চাহিদাটি তৃপ্ত করতে না পারে তখন সেই শিশু নানা প্রতিকল্প আচরণের আশ্রয় নেয়, যেমন ক্লাশে গোলমাল করা, ক্লাশ পালান, মারামারি করা, মিথ্যা কথা বলা, চুরি করা ইত্যাদি। এই সকল আচরণের দ্বারা যে স্বীকৃতি সে সহজ পন্থায় পায় নি সেই স্বীকৃতি সে অস্বাভাবিক পন্থায় পাবার চেষ্টা করে। অবশ্য সব সময়েই প্রতিকল্প আচরণটি যে অবাঞ্ছিত বা মন্দ হয়

তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রতিকল্প আচরণ আবার শিশু এবং সমাজের পক্ষে শুভও হয়ে থাকে যেমন, যে ছেলে লেখাপড়ায় ভাল হতে পারল না, সে হয়ত খেলাধূলা, অভিনয় বা বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পারদর্শিতা দেখিয়ে তার ঈপ্সিত আত্মস্বীকৃতি আদায় করল।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে চাহিদার সহজ ও স্বাভাবিক তৃপ্তিই হল শিশুর সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তা গঠনের একমাত্র উপায়। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের প্রথম ও সর্বপ্রধান নির্দেশ হল যে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখার জন্য যাতে তার চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত হয় তা সর্বাগ্রে দেখতে হবে।[১] এই মহৎ সত্য থেকেই জন্ম নিয়েছে বর্তমান শতাব্দীর শিক্ষাকে শিশুর চাহিদাকেন্দ্রিক (Need-centred) করে তোলার বিশ্বব্যাপী আন্দোলন।

শিক্ষক ও পিতামাতার কর্তব্য

শিশুর বিভিন্ন চাহিদাগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে তৃপ্তি লাভ করে সেদিক দিয়ে শিক্ষক পিতামাতা প্রভৃতিদের করণীয় অনেক কিছু আছে। যথা—

প্রথমত, শিশুর চাহিদাগুলি যাতে অনর্থক বাধাপ্রাপ্ত না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। অবশ্য শিশুর সমস্ত চাহিদার পূর্ণতৃপ্তির আয়োজন করা সম্ভব নয়। সে সকল ক্ষেত্রে যাতে শিশু বাঞ্ছিত সম্পূরক আচরণ সম্পন্ন করে সেদিকে যত্ন নিতে হবে এবং তার উপযোগী সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা রাখতে হবে। যে সব কাজকর্ম সহ-পাঠক্রমিক কাজ নামে পরিচিত বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে সেগুলির পর্যাপ্ত আয়োজন করতে হবে। কারণ সেই সব কাজের মধ্যে দিয়ে শিশুর বহু ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করা যায়।

দ্বিতীয়ত, শিক্ষার পরিবেশকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিশুর চাহিদাগুলি যথাসম্ভব তৃপ্তিলাভের সুযোগ পায়। উদাহরণস্বরূপ শিশুর ক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদা একটি অতি প্রয়োজনীয় চাহিদা। এই চাহিদাটির তৃপ্তির উপর শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ অনেকখানি নির্ভর করে। বিদ্যালয় পরিবেশটি এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যেখানে শিশু সহজভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে এবং অন্যান্য সহপাঠীদের সঙ্গে মিলেমিশে সমগ্র পরিস্থিতির মধ্যে নিজের একটি সুনির্দিষ্ট স্থান বেছে নেবে। সেইরকম আর একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হল তার আত্মস্বীকৃতির চাহিদা। এ চাহিদাটির তৃপ্তির উপর শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু সংগঠন ও মানসিক শান্তি নির্ভর করে এবং বিদ্যালয়ে এটির যথাযথ তৃপ্তির আয়োজন অবশ্যই করতে

১। পৃঃ ৩৭ (তৃতীয় খণ্ড)

হবে। কেবলমাত্র লেখাপড়ায় ভাল হলে স্বীকৃতিদানের যে সংকীর্ণ ব্যবস্থা সাধারণ স্কুলে প্রচলিত আছে তাতে বহু শিশুরই আত্মস্বীকৃতির চাহিদা অতৃপ্ত থেকে যায়। সেই জন্য বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে দক্ষতা দেখিয়ে স্বীকৃতিলাভের ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে সকল প্রকার প্রতিভাসম্পন্ন শিশুই তার প্রাপ্য স্বীকৃতি পেতে পারে। সেই রকম শিশুর নতুনত্বের চাহিদা এবং সক্রিয়তার চাহিদা যাতে যথাযথ পরিতৃপ্তি লাভ করে তার পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা শিশুকে দিতে হবে। খেলাধূলা, অভিনয়, অঙ্কন, ভাস্কর্য প্রভৃতি নানা নূতন ও সৃজনমূলক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিশুর এই অতিপ্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি যাতে তৃপ্তিলাভ করতে পারে সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

সবশেষে, মনে রাখতে হবে যে শিশুর সমস্যামূলক আচরণের প্রকৃত কারণ হল তার চাহিদার অতৃপ্তি। অতএব যদি কোন অবাঞ্ছিত আচরণকে দূর করতে হয় তবে নিছক তার আচরণের চিকিৎসা না করে যে অতৃপ্ত চাহিদাটি তার মূল কারণ তার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। আধুনিক কালে যে সব শিশু পরিচালনাগার (Child Guidance Clinic) স্থাপিত হয়েছে সেগুলির কর্মসূচী মূলত এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

বুদ্ধির স্বরূপ (Nature of Intelligence)

বুদ্ধি একটি মানসিক শক্তি বিশেষ। অন্যান্য অমূর্ত বস্তুর মত বুদ্ধিরও সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত, যদিও খ্যাত অখ্যাত বহু মনোবিজ্ঞানী এর সংজ্ঞা দেবার বহু চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য বুদ্ধির কোনও সংজ্ঞাই আজ পর্যন্ত সর্ববাদী সম্মত বলে মেনে নেওয়া হয় নি। তবে বুদ্ধির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির আলোচনা থেকে বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য ধারণা পাওয়া যাবে। যেমন—

১। বুদ্ধির সর্বব্যাপকতা

বুদ্ধির উৎপত্তি ও ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে বুদ্ধির উপযোগিতা সম্বন্ধে একটি মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন দার্শনিকেরা মনে করতেন যে সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই বুদ্ধি মানুষের মধ্যে রয়েছে। কিন্তু বিবর্তন প্রক্রিয়ার উপর জীবতত্ত্ববিদ্‌দের আধুনিক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রাণী-বিকাশের আদিমতম স্তরে বুদ্ধির কোনও অস্তিত্ব ছিল না। তখন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রাণীর একমাত্র অস্ত্র ছিল তার প্রবৃত্তি। খাদ্য অন্বেষণ, বিপদ থেকে আত্মরক্ষা, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি বেঁচে থাকার প্রাথমিক কাজগুলি নিছক প্রবৃত্তিরই দ্বারা সংঘটিত হত। কিন্তু পরিবেশ যতই জটিল হতে সুরু করল ততই প্রবৃত্তিরই কার্যকারিতা কমে আসতে লাগিল। এই সময় প্রাণীর জীবনযুদ্ধে নতুন ও অধিকতর শক্তিশালী অস্ত্ররূপে দেখা দিল বুদ্ধি। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে বুদ্ধির প্রাথমিক ও সর্বপ্রধান কাজ হল জটিল এবং নতুন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে প্রাণীকে সাহায্য করা। মুখ্যত এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই বুদ্ধির উৎপত্তি হয়েছিল এবং আজও নতুন ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বুদ্ধিই মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

প্রবৃত্তির কাজ হল পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে প্রাণীকে সাহায্য করা। কিন্তু যেখানে প্রবৃত্তি ব্যর্থ হয় সেখানে বুদ্ধি সফল হয়। তার কারণ হল বুদ্ধির ব্যাপক পরিবর্তনশীলতা। প্রবৃত্তির প্রচেষ্টা যান্ত্রিক এবং সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে এর কাজ সীমাবদ্ধ। বুদ্ধির প্রচেষ্টা বৈচিত্র্যধর্মী এবং তার কর্মপরিধি সীমাহীন।

২। নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে সঙ্গতিসাধন

নতুন ও পরিবর্তিত পরিবেশে মানিয়ে নিতে প্রাণীকে সাহায্য করা যে বুদ্ধির সর্বপ্রথম কাজ এটা সকল মনোবিজ্ঞানীই মেনে নিয়েছেন। বার্ট (Burt) বলেছেন যে বুদ্ধি হচ্ছে দেহ ও মনের নতুন সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্যে দিয়ে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিসাধনের সাধারণ শক্তি। গডার্ড (Goddard) বলেন

১। পৃঃ ৪৪—পৃঃ৪৭

যে বুদ্ধি প্রাণীকে তার আসন্ন সমস্যার সমাধান করতে ও ভবিষ্যৎ সমস্যার ধারণা গঠন করতে সাহায্য করে। ষ্টার্নের (Storn) মতে নতুন পরিস্থিতি এবং সমস্যার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ক্ষমতাই হল বুদ্ধি।

৩। মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নততর ব্যবহার

বুদ্ধির তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে বুদ্ধি ব্যক্তিকে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নততর ব্যবহারে সমর্থ করে। প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সামর্থ্য নিয়ে জন্মায়। যেমন, চিন্তন, বিচারকরণ, অনুমান, সংবোধন প্রভৃতি। এগুলির উন্নত ব্যবহার থেকে দেখা দেয় পরিবেশের সঙ্গে অধিকতর সুষ্ঠু এবং কার্যকর সঙ্গতিসাধন। পরিবেশের বহুধর্মী শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত ও বাস্তব সমাধানে নিযুক্ত করতে পারে একমাত্র মনের এই বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলির উন্নত ব্যবহার।

উদাহরণস্বরূপ চিন্তন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই যে এটি আমাদের বাহ্যিক ও মূর্ত আচরণের একটি মানসিক ও অমূর্ত রূপ। অর্থাৎ যখন সত্যকারের 'কলকাতা থেকে দিল্লী যাওয়া' কাজটি আমরা মনে মনে সম্পন্ন করি তখনই আমরা বলি যে 'কলকাতা থেকে দিল্লী যাওয়া' সম্বন্ধে চিন্তা করছি। অথচ মনে মনে কাজটি সম্পন্ন করার ফলে আমাদের সময় ও পরিশ্রম অনেক কম লাগে এবং কোনরূপ পার্থিব বাধা আমাদের প্রচেষ্টার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় না। আর সত্যকার কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে যে দীর্ঘ সময় লাগত সেই সময়ের মধ্যে ঐ রকম লক্ষ লক্ষ চিন্তা করে ফেলা আমাদের পক্ষে সম্ভব। বুদ্ধিই চিন্তন-প্রক্রিয়ার এই অপরিমিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে বাস্তব সমস্যার সমাধানে কাজে লাগায়। যখন প্রাণী কোনও একটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন সেই সমস্যা সমাধানের যত রকম সম্ভাব্য পন্থা আছে সেগুলি চিন্তনের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখতে পারে এবং তার মধ্যে যেটিকে সে সবচেয়ে কার্যকর বলে মনে করে সেটিকে সে তার সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত করতে পারে। একেই বুদ্ধির প্রয়োগ বলা হয়। সহজাত প্রবৃত্তি চিন্তাশক্তির সাহায্য নেয় না বলেই তার প্রচেষ্টা নূতনত্ববিহীন, চিরনির্দিষ্ট এবং যান্ত্রিক। এই রকম বিচারকরণ, অনুমান প্রভৃতি অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়ার উন্নততর ব্যবহারও বুদ্ধির সাহায্যেই সম্ভবপর।

৪। অমূর্ত চিন্তন

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী টারম্যানের (Terman) ভাষায় বুদ্ধি হল অমূর্ত বা বস্তুবিবর্জিত চিন্তন (Abstract thinking) করার ক্ষমতা। চিন্তনের সময়

সাধারণত আমরা ভাষা, প্রতিরূপ প্রভৃতি মূর্ত বস্তুর সাহায্য নিয়ে থাকি। কিন্তু অনেক সময় আমরা এই ধরনের কোন মূর্ত বস্তুর সাহায্য ছাড়াই চিন্তা করতে পারি। যেমন, গণিত বা দর্শনের খুব সূক্ষ্ম তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় কোনরূপ মূর্ত বস্তুর ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। এই ধরনের চিন্তনগুলিকে অমূর্ত চিন্তন বলা হয় এবং বুদ্ধির সাহায্য ছাড়া এ ধরনের চিন্তন সম্ভবই নয়।

৫। সম্বন্ধমূলক চিন্তন

বুদ্ধির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বারা সম্বন্ধ-নির্ণয়মূলক চিন্তন করা সম্ভব হয়। দুই বা দু'য়ের বেশী বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করার সময় বুদ্ধির সাহায্য অপরিহার্য। সম্বন্ধ যত জটিল হয় বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তাও তত বাড়ে।

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী স্পীয়ারম্যানের (Spearman) দেওয়া বুদ্ধির সংজ্ঞাটিতে বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয়কেই বড করা হয়েছে। তাঁর মতে বুদ্ধি বলতে বোঝায় ত্রিবিধ মানসিক প্রক্রিয়া সম্পাদনের শক্তি, যথা -

(ক) অভিজ্ঞতার আহরণ (Apprehension of experienee)

(খ) সম্বন্ধের নির্ণয়ন (Eduction of relation)

(গ) সম-সম্বন্ধ-বোধকের নির্ণয়ন (Eduction of correlates)

স্পীয়ারম্যান মনের এই ত্রিবিধ প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন জ্ঞান-বিকাশের সূত্রাবলী (Noegenetic Laws)। তাঁর মতে আমাদের জটিল অজটিল সমস্ত জ্ঞানই এ ত্রিবিধ পন্থায় অর্জিত হয়ে থাকে।

৬। উন্নত মানসিক সংগঠন

বুদ্ধির আর একটি বড বৈশিষ্ট্য হল যে পরিস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী দেহ-মনের সব চেয়ে ভাল সংগঠন (Organisation) বা সমন্বয় (Integration) সম্পন্ন করা। এর জন্য প্রয়োজন মনের সমস্ত দিকগুলির মধ্যে সমন্বয়-সাধন করা এবং সেই লব্ধ সমন্বয়নের মাধ্যমে পরিবেশের সব চেয়ে উপযোগী প্রতিক্রিয়াটি নির্ণয় করা। প্রাণী যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন বুদ্ধিই তার বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে একটি সমন্বয় এনে সেগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে আসন্ন সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত করে। গেষ্টাল্ট মতবাদী (Gestaltist) মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধির এই মানসিক সংগঠন বা সমন্বয় সাধন করার ক্ষমতার উপরই সব চেয়ে বেশী জোর দিয়েছেন।

৭। পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ

বুদ্ধির আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বারাই পৃথকীকরণ

1. Psychology Down the Ages : Spearman

(Abstraction) এবং সামান্যীকরণ (Generalistion) নামে দুটি মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। কোন বস্তু থেকে অপ্রয়োজনীয় গুণগুলিকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় গুণগুলি আলাদা করে নেওয়ার নাম হল পৃথকীকরণ এবং সেই পৃথকীকৃত গুণগুলি সেই বস্তুর সমশ্রেণীভুক্ত আর সকলের উপর প্রয়োগ করার নাম হলো সামান্যীকরণ। বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা (Concept) তৈরী করতে এই প্রক্রিয়া দুটি অপরিহার্য।

৮। বিচারকরণ: আগমণ ও নিগমম

বুদ্ধির আর একটি কাজ হল ব্যক্তিকে বিচারকরণে (Reasoning) সাহায্য করা। কোন চিন্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করার নামই বিচার-করণ। বিচারকরণ আবার দু'প্রকারের হতে পারে—আগমম (Induction) এবং নিগমন (Deduction)। প্রথম পদ্ধতিতে আমরা বিশেষ বিশেষ ঘটনার পর্যবেক্ষণ থেকে কোনও একটি সামান্য সত্যে পৌঁছই এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একটি সামান্য সত্য থেকে কোনও একটি বিশেষ সত্যে আসি। দু'রকম বিচার-পদ্ধতিই আমাদের নতুন জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞানবৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় এবং উভয় প্রক্রিয়াই আবার বুদ্ধির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

৯। মানসিক প্রক্রিয়ার দ্রুততা

মানসিক প্রক্রিয়ার দ্রুততার (Speed) সঙ্গেও বুদ্ধির একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। বিচারকরণ, অনুমান, সংশোধন প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি দ্রুত সম্পাদন নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। একই মানসিক প্রক্রিয়া স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি যে সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার চেয়ে অনেক কম সময়ে সম্পন্ন করে। যে কোন মানসিক কাজ সম্পন্ন করার ক্ষিপ্রতা বুদ্ধির উপর নির্ভর করে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১০। বর্তমান পরিস্থিতিতে অতীত জ্ঞানের প্রয়োগ

বুদ্ধি এবং জ্ঞান কিন্তু এক নয়। যা প্রাণী শিক্ষার মাধ্যমে লাভ করে তার নাম জ্ঞান। কিন্তু বুদ্ধি হল একটি মানসিক শক্তি এবং এটি সহজাত। তবু বুদ্ধির সঙ্গে জ্ঞানের নিকট সম্পর্ক আছে। জ্ঞানের প্রয়োগ একমাত্র বুদ্ধির দ্বারাই সম্ভব এবং বুদ্ধিই অতীতের লব্ধ জ্ঞানকে বর্তমানের সমস্যা-সমাধানে নিযুক্ত করে থাকে। কেবলমাত্র জ্ঞান থাকলেই সমস্যার সমাধান করা যায় না, তার যথাযোগ্য প্রয়োগ করতে না পারলে সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়। বুদ্ধিই অতীত শেখা জ্ঞানকে বর্তমানে কাজে লাগাতে পারে।

বুদ্ধির সংজ্ঞা (Definition of Intelligence)

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বুদ্ধি বলতে আমরা বুঝি এমন একটি সহজাত মানসিক শক্তি যা আমাদের সমর্থ করে সম্পন্ন করতে—

১। নূতন এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন,

২। চিন্তন শক্তির উন্নততর ব্যবহার, যার মধ্যে আবার অন্তর্গত হল

(ক) অমূর্ত (abstract) চিন্তন,

(খ) সম্বন্ধ-ঘটিত (relational) চিন্তন,

(গ) পৃথকীকরণ (abstraction) ও সামান্যীকরণ (generalisation),

(ঘ) বিচার-করণ (reasoning), যা আবার দু'প্রকারের—

(i) নিগমনমূলক (deductive)

(ii) আগমনমূলক (inductive)

৩। সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির সুষ্ঠু সংগঠন (Organisation),

৪। অতীত জ্ঞানকে বর্তমান সমস্যার সমাধানে নিয়োজন এবং

৫। মানসিক কাজের দ্রুত সম্পাদন

যদিও একবাক্যে বুদ্ধির সম্পূর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া শক্ত, তবু বুদ্ধির উপরের সংজ্ঞাটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

বুদ্ধির বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of Intelligence)

বুদ্ধি বলতে আমরা যা বুঝি সেটি একটিমাত্র শক্তি না একাধিক শক্তি, এ প্রশ্ন বহুদিন ধরে চলেত আসছে। সেগুলি হল—

১। রাজতন্ত্রমূলক ধারণা

প্রথম ধারণা অনুযায়ী বুদ্ধি একটি একক শক্তি, যার অধীনে ও পরিচালনায় মনের অন্যান্য অসংখ্য শক্তিগুলি কাজ করে থাকে। এখানে বুদ্ধি যেন রাজা-বিশেষ এবং অন্যান্য শক্তিগুলি তার প্রজাবৃন্দের মত। এই ধারণাকে বুদ্ধির রাজতন্ত্র (Monarchic) ধারণা বলা চলতে পারে।

২। অভিজাততন্ত্রমূলক ধারণা

দ্বিতীয় ধারণায় বুদ্ধিকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শক্তির সমন্বয় বলে কল্পনা করা হয়েছে। এই ধারণা অনুযায়ী কতকগুলি বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি

সম্মিলিতভাবে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে। এই ধারণাটিকে অভিজাততন্ত্রমূলক (Oligarchic) ধারণা বলা যেতে পারে।

৩। গণতন্ত্রমূলক ধারণা

তৃতীয় ধারণায় বুদ্ধিকে এই ধরনের কোন একটি একক শক্তি বা কয়েকটি বিশেষ শক্তির সম্মেলন রূপে গ্রহণ করা হয় নি। তার পরিবর্তে মনের মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির অস্তিত্বের কল্পনা করা হয়েছে এবং এগুলির মিলিত শক্তিকেই বুদ্ধি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ধারণাকে বুদ্ধির গণতন্ত্রমূলক (Anarchic) ধারণা বলা যেতে পারে।

বুদ্ধি সম্বন্ধে উপরের ত্রিবিধ ধারণা শিক্ষাবিদ্‌দেব মধ্যে বহুদিন ধরেই প্রচলিত আছে কিন্তু গবেষণাভিত্তিক না হওয়ায় এই মতবাদগুলিকে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হত না। কিন্তু আধুনিককালের বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীদের গবেষণা থেকে বুদ্ধি সম্বন্ধে যে সকল মতবাদ পাওয়া গেছে সেগুলিকেও অনুরূপ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। নীচে বুদ্ধির উপব তিনটি আধুনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বর্ণনা দেওয়া হল।

(ক) স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্ব

(Spearman's Two-Factor Theory)

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী স্পীয়ারম্যানই প্রথম বুদ্ধি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা-প্রসূত একটি মতবাদ উপস্থাপিত করেন। তাঁর এই তত্ত্ব অনুযায়ী কিছু না কিছু মানসিক সক্রিয়তা আছে এমন সমস্ত কাজের পেছনেই দু'শ্রেণীর মানসিক শক্তির নিয়োগ আছে। প্রথমটি হচ্ছে সাধারণ শক্তি (General ability)। স্পীয়ারম্যান এই শক্তিটির নাম দিয়েছেন 'g' এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে কোন একটি বিশেষধর্মী শক্তি (Specific ability), স্পীয়ারম্যান যেটির নাম দিয়েছেন 's'। এই 'g' শক্তিটি সর্বগামী অর্থাৎ সমস্ত কাজেই তার প্রয়োগের প্রয়োজন হবে, যদিও অবশ্য নিয়োজিত 'g'র পরিমাণ সব কাজে সমান হবে না। আর 's' হল কোন বিশেষ কাজের উপযোগী একটি বিশেষধর্মী শক্তি এবং সেই বিশেষ কাজটি ছাড়া অন্য কাজে সেই 's'টির প্রয়োগ হবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রত্যেক কাজের জন্য একটি আলাদা 's' আছে। যেমন 'পড়া' কাজের জন্য পড়ার 's', 'অঙ্ক কষা' কাজের জন্য অঙ্ক কষার 's', 'বিচার করা' কাজের জন্য বিচার করার 's' ইত্যাদি। যেহেতু বিবিধতার দিক দিয়ে কাজ অসংখ্য রকমের হতে পারে, সেহেতু সংখ্যার দিক দিয়ে 's'ও গণনাতীত হয়ে থাকে। 'g' কিন্তু সংখ্যায়

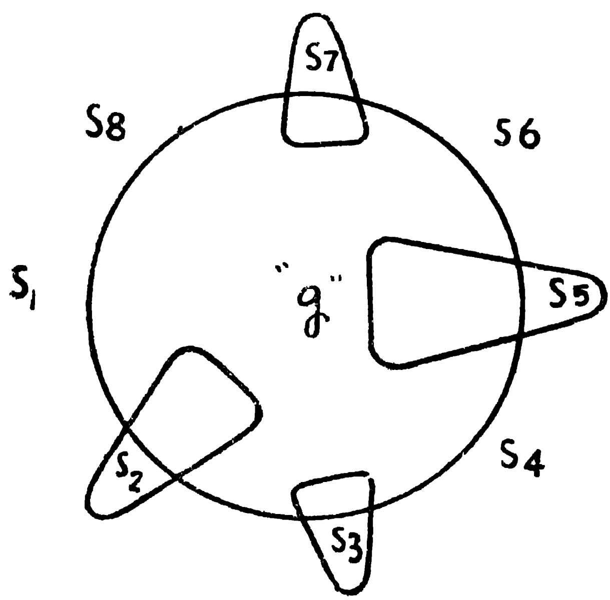
একটি, যদিও এর অনুপ্রবেশ সর্বত্র এবং অল্পমাত্রায় হোক্ বেশী মাত্রায় হোক্ সব কাজেই এর প্রয়োগ অপরিহার্য।

স্পীয়ারম্যান কল্পনা করেছেন যে প্রত্যেকটি মানুষ যেন 'g'র একটি নিজস্ব ভাণ্ডার নিয়ে জন্মায় এবং কোন কিছু করার সময় তা থেকে সে কিছু পরিমাণ 'g' নেয়, এবং সেই 'g'র সঙ্গে সেই কাজের বিশেষ 's'টি যোগ করে দিয়ে সে সেই কাজটি সম্পন্ন করে। যেমন--

'পড়া' রূপ কাজ করতে লাগে 'g'র কিছুটা + পড়ার 's'

'অঙ্ক কষা' রূপ কাজ করতে লাগে 'g'র কিছুটা + অঙ্ক কষার 's' ইত্যাদি।

স্পীয়ারম্যানের এই মতবাদটি নীচের ছবির মাধ্যমে পরিষ্কার বোঝান যায়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন কাজের জন্য একটি বিশেষ 's' এবং কিছু পরিমাণ 'g'র প্রয়োজন হচ্ছে। বিভিন্ন কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী 'g'রও পরিমাণ কম বা বেশী হচ্ছে।



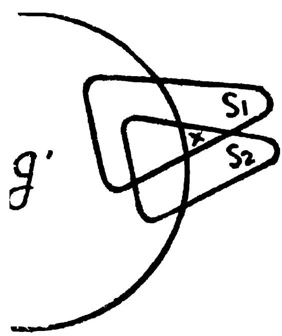
[স্পীয়ারম্যানের দ্বি-উপাদান তত্ত্বের চিত্ররূপ]

দেখা যাচ্ছে যে স্পীয়ারম্যা'নের এই মতবাদ অনুযায়ী আমাদের সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়ার মূলে দুটি উপাদান (Factor) বর্তমান। সেই জন্য এই মতবাদটিকে দ্বি-উপাদান তত্ত্ব (Two-Factor Theory) বলা হয়।

বুদ্ধি সম্বন্ধে প্রাচীন রাজতন্ত্রমূলক ধারণার সঙ্গে স্পীয়ারম্যানের এই তত্ত্বটির তুলনা করা যায়। কিন্তু প্রচলিত ধারণার মত স্পীয়ারম্যানের এই মতটি নিছক অনুমানপ্রসূত নয়। বিভিন্ন মানসিক কাজের ফলাফলের মধ্যে সহ-পরিবর্তনের (Correlation) মান নির্ণয় করে এবং জটিল গাণিতিক গণনার সাহায্যেই স্পীয়ারম্যান তাঁর এই প্রসিদ্ধ তত্ত্বটিতে পৌঁছতে পেরেছেন। সেই জন্য এই তত্ত্বটি সুপ্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য।

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা

দ্বি-উপাদান তত্ত্বের যে বর্ণনা উপরে দেওয়া হল সেটি হল স্পীয়ারম্যানের প্রাথমিক ব্যাখ্যা। পরবর্তী গবেষণার ফলে এই তত্ত্বটির অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে। স্পীয়ারম্যানের মতে মানসিক শক্তি দু'প্রকারের, 'g'—যা সব কাজের পেছনে থাকে, এবং 's'—যা কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজের পেছনে থাকে। এর মাঝামাঝি আর কিছুই নেই। কিন্তু পরে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে এমন কতকগুলি শক্তি আছে যেগুলি এ দু'ধরনের শক্তির মধ্যধর্মী অর্থাৎ যেগুলি 'g'র মত সব কাজে লাগে না বটে, তবে 's'র মত কেবলমাত্র একটি বিশেষ কাজেও সীমাবদ্ধ থাকে না। এই শক্তিগুলিকে



[শ্রেণীমূলক শক্তির (Group Factor) চিত্ররূপ]

বিশেষ এক শ্রেণীভুক্ত (Group) কাজগুলি সম্পন্ন করার সময় দেখা যায় অর্থাৎ এরা 'g'র মত সর্বজনীনও নয় আবার 's'র মত সঙ্কীর্ণও নয়। এক কথায় এরা 'g' আর 's'র মাঝামাঝি এক ধরনের শক্তি। যেহেতু বিশেষ এক শ্রেণীর কাজের ক্ষেত্রে এগুলি কার্যকর হয়, সেহেতু এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে শ্রেণীমূলক শক্তি (Group Factor)। এই রকম একটি শ্রেণীমূলক শক্তি হল ভাষামূলক শক্তি (Verbal ability or v)। এটিকে 'g'র মত সব কাজে

পাওয়া যায় না বটে তবে ভাষাঘটিত যত রকম কাজ আছে (যেমন পড়া, লেখা, মুখস্থ করা, বিচার করা ইত্যাদি) সেগুলির সবের মধ্যেই এটিকে' কিছু না কিছু পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন, উপরের ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথম কাজে $g+s_1$ লেগেছে এবং দ্বিতীয় কাজে $g+s_2$ লেগেছে। কিন্তু তা ছাড়া আরও একটা শক্তি (× চিহ্নিত) এই দু'টি কাজের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান। প্রথমটি যদি 'লেখা'রূপ কাজ হয় এবং দ্বিতীয়টি যদি 'মুখস্থ করা' কাজ হয় তবে এদের উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেণীভুক্ত শক্তিরূপে থাকবে 'v' বা ভাষামূলক শক্তি।

এই রকম আরও কয়েকটি শ্রেণীমূলক শক্তির নাম হল গাণিতিক শক্তি (Numerical ability or n), যান্ত্রিক শক্তি (Mechanical ability or m) ইত্যাদি।

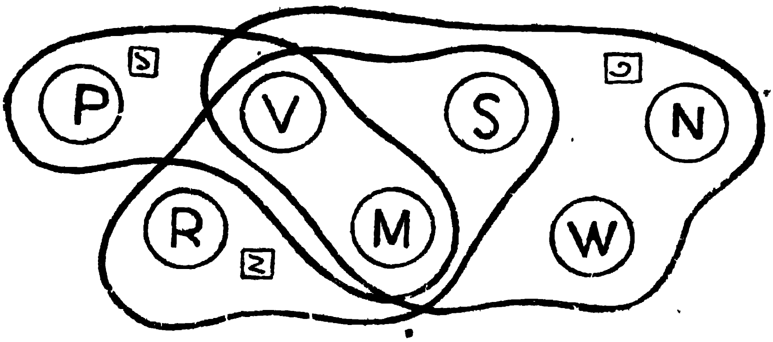
(খ) থার্ষ্টোনের প্রাথমিক শক্তিবাদ
(Thurstone's Primary Ability Theory)

প্রসিদ্ধ মার্কিন মনোবিজ্ঞানী থার্ষ্টোন বুদ্ধি বলে কোন একটি একক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তার পরিবর্তে তিনি সাতটি মৌলিক বা প্রাথমিক শক্তির (Primary Ability) উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হল—

১। ভাষাবোধ (Verbal Comprehension বা V)
২। সংখ্যা ব্যবহার (Number Facility বা N)
৩। স্মরণ (Memory বা M)
৪। আগমনমূলক বিচারকরণ (Inductive Reasoning বা R)
৫। উপলব্ধিমূলক শক্তি (Perceptual Ability বা P)
৬। অবস্থানমূলক বোধ (Space বা S)
৭। ভাষা উৎকর্ষ (Word Fluency বা W)

থার্ষ্টোনের মতে যাকে আমরা বুদ্ধি বলে থাকি সেটি আসলে উপরের সাতটি মৌলিক শক্তির সম্মিলিত রূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য সব কটি শক্তিই যে সব কাজেতে দরকার হয় তা নয়। এই সাতটি শক্তির মধ্যে কখনও বিশেষ কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে বিশেষ একটি কাজ করে, আবার আর কয়েকটি শক্তি একত্রিত হয়ে অন্য আর একটি কাজ করে ইত্যাদি। পরের পাতায় থার্ষ্টোনের তত্ত্বটির একটি চিত্ররূপ দেওয়া হল।

এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে ১নং কাজে লাগলো ভাষাবোধ (V), স্মৃতি (M) এবং উপলব্ধি শক্তি (P), আবার ২নং কাজে লাগলো ভাষাবোধ (V), স্মৃতি (M)



(থার্ষ্টোনের প্রাথমিক শক্তিতত্ত্বের চিত্ররূপ]

অবস্থান-ধারণা (S) এবং বিচার-করণ (R)। আবার ৩নং কাজে লাগছে ভাষাবোধ (V), স্মৃতি (M), অবস্থান বোধ (S), সংখ্যা-ব্যবহার (N) এবং শব্দ ব্যবহারের উৎকর্ষ (W) ইত্যাদি। বলা বাহুল্য কাজটির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কোন্ কোন্ শক্তি কখন জোট বাঁধবে।

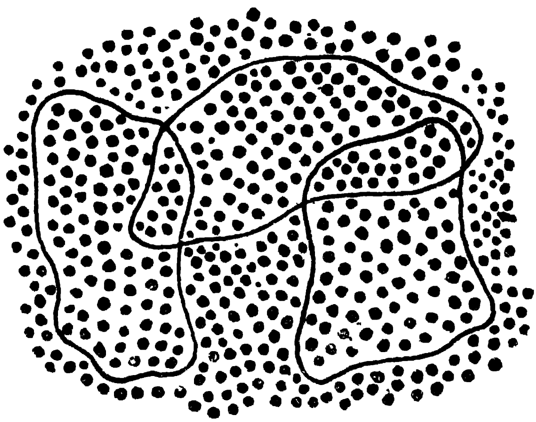
থার্ষ্টোনের তত্ত্বটি প্রাচীন বুদ্ধি সম্বন্ধে অভিজাততন্ত্রমূলক ধারণার সঙ্গে তুলনীয়। তবে থার্ষ্টোনের তত্ত্বটিও স্পীয়ারম্যানের তত্ত্বের মত জটিল গাণিতিক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

(গ) টমসনের বাছাই তত্ত্ব বা থর্নডাইকের বহু শক্তিতত্ত্ব

(Thompson's Sampling Theory or Thorndike's Multi-factor Theory)

গডফ্রে টমসন নামে একজন ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী কিন্তু উপরের দু'শ্রেণীর ব্যাখ্যার কোনটিই গ্রহণ করেন নি। তিনি বুদ্ধির তৃতীয় ব্যাখ্যার জনক। তাঁর মতে বুদ্ধি বলে কোন একটি একক শক্তি নেই। তার পরিবর্তে মনের মধ্যে অগণিত শক্তিকণা আছে, যেগুলির কোনটিরই পৃথক করে সংজ্ঞা বা বর্ণনা দেওয়া যায় না। এগুলিকে আমাদের মানসিক শক্তির একক (Unit) বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। যখন আমরা কোন একটি মানসিক কাজ করি, তখন এই অসংখ্য শক্তি-কণার মধ্যে কতকগুলি একসঙ্গে জোট বাঁধে এবং ঐ কাজটি করতে আমাদের সমর্থ করে। কি ভাবে এবং কোন্ কোন্ শক্তি-

কণাগুলি একটি বিশেষ কাজ করার সময় জোট বাঁধবে তা নির্ভর করে এই কাজটির প্রকৃতির উপর এবং শক্তি-কণাগুলির অন্তর্নিহিত ক্ষমতার উপর। এই জন্য টমসনের এই তত্ত্বটিকে 'বাছাই তত্ত্ব' (Sampling Theory) বলা হয়।



[টমসনের বাছাই তত্ত্ব বা থর্নডাইকের বহু-শক্তি-তত্ত্বের চিত্ররূপ]

আবার যেহেতু এই তত্ত্বটিতে বহু শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে সেহেতু প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইক একে বহুশক্তি তত্ত্ব (Multi-factor Theory) বলে বর্ণনা করেছেন। টমসন ও থর্নডাইকের তত্ত্ব দুটি মূলত অভিন্ন। উপরে টমসনের শক্তিকণা বা থর্নডাইকের বহু শক্তি তত্ত্বের একটি কল্পিত চিত্র দেওয়া হল। দেখা যাচ্ছে তিনটি বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তিকণার দল একত্রিত হয়ে কাজগুলি সম্পন্ন করছে।

সাত

বুদ্ধির পরিমাপ (Measurement of Intelligence)

বুদ্ধির স্বরূপ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও বুদ্ধির পরিমাপ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা মোটামুটি একটি সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন। অর্থাৎ কিভাবে বুদ্ধিকে মাপা যেতে পারে এ সম্বন্ধে বর্তমানে সকলেই প্রায় একমত।

বর্তমানে বহুল প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষার (Intelligence Test) আবিষ্কর্তা হলেন আলফ্রেড বিনে (Alfred Binet) নামে এক ফরাসী মনোবিজ্ঞানী। ১৯০০ সালে প্যারী নগরের একটি স্কুলের কর্তৃপক্ষ স্কুলের ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার শোচনীয় ফল দেখে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েন। কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁরা দেখলেন যে শিক্ষকদের মতে ছেলেমেয়েদের অমনোযোগ ও দুষ্টবুদ্ধিই এর জন্য দায়ী। আবার কেউ কেউ বললেন যে যথেষ্ট বুদ্ধির অভাবই ছেলেমেয়েদেব পড়াশোনায় অনগ্রসরতার কারণ। অপর পক্ষে অভিভাবকেরা শিক্ষকদেব অবহেলাকেই এর জন্য দায়ী কবলেন। তখন কর্তৃপক্ষ এই জটিল সমস্যাটির সমাধানেব ভাব দিলেন সেই সময়কার প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী আলফ্রেড বিনের হাতে। বিনে দেখলেন যে এই সমস্যার সমাধান করতে হলে প্রথমেই বুদ্ধি পরিমাপের একটি নির্ভরযোগ্য পন্থা উদ্ভাবন করা দরকার। অনেক গবেষণার পর বিনে বুদ্ধি পরিমাপের একটি অভীক্ষা (Test) তৈরী কবলেন। এই অভীক্ষাটি বর্তমানে 'বিনে সাইমন স্কেল' নামে প্রসিদ্ধ। সাইমন (Simon) ছিলেন বিনের সহকর্মী এবং এই উদ্ভাবনে তাঁর প্রধান সহায়ক।

বিনে-সাইমন স্কেলের বৈশিষ্ট্য

(Characteristics of Binet-Simon Scale)

(ক) বিনের অভীক্ষাটি কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা নিয়ে গঠিত। অভীক্ষার্থীকে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে বা সমস্যাগুলির সমাধান করতে বলা হয়।

(খ) এই প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি আবার এক শ্রেণীর নয়। নানা ধরনের মানসিক কাজ সম্পাদনের দ্বারা সেগুলির সমাধান করতে হয়। যেমন, মুখস্থ করা, মনে করা, চিনতে পারা, তুলনা করা, সম্বন্ধ নির্ণয় করা, বিচার করা, ভুল বার করা, সংখ্যা ব্যবহার করা ইত্যাদি বিভিন্ন মানসিক কাজ সম্পাদনের

মাধ্যমেই প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হয়। বিনে প্রথমেই ধরে নিয়েছিলেন যে বুদ্ধি একটি বিশেষধর্মী শক্তি নয়, এটি একটি সাধারণধর্মী শক্তি। অতএব কোন এক প্রকার বিশেষধর্মী কাজ সম্পাদনের সাহায্যে বুদ্ধির পরিমাপ করা যাবে না। এটিকে যথাযথ পরিমাপ করতে হলে বহু বিভিন্নধর্মী কাজ ও সমস্যা অভীক্ষাটির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কোন বিশেষ এক প্রকারের কাজ দিয়ে অভীক্ষাটি তৈরী করলে সকল অভীক্ষার্থীর প্রতি সুবিচার করা হবে না। কিন্তু যদি অভীক্ষাটির মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের কাজ ও সমস্যা দেওয়া থাকে তবে সকলের বুদ্ধিকেই পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হবে। এই কারণেই সমস্যা এবং প্রশ্নের বিবিধতা ও বৈচিত্র্যই বিনের অভীক্ষার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য।

(গ) বিনের অভীক্ষাটিকে একটি স্কেল (scale) বলা হয়। যে কোন স্কেলের বৈশিষ্ট্য হল যে এতে ক্রমবর্ধমান ধারায় কতকগুলি সমদূরত্বসম্পন্ন একক (unit) পর পর সাজান থাকে। যেমন, ইঞ্চির স্কেল, সেন্টিমিটারের স্কেল, ওজন করার যন্ত্র ইত্যাদি। বিনের অভীক্ষাতেও তেমনই কতকগুলি একক ক্রমবর্ধমান ধারায় সাজান আছে। এখানে একক হল অভীক্ষার্থীর বয়স। অভীক্ষার্থীর বয়স অনুযায়ী এককগুলি বিভিন্ন পর্যায় বা ভাগে বিভক্ত। এই স্কেলে নিম্নতম একক হল তিন বৎসর বয়সের জন্য নির্ধারিত কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা, তার উপরের এককটি চার বৎসরের জন্য নির্ধারিত কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্যা, তার উপরের এককটি পাঁচ বৎসরের জন্য এবং এই ভাবে ক্রমশ ধাপে ধাপে উঠে সর্বোচ্চ একক ১৫ বৎসরে গিয়ে স্কেলটি শেষ হয়েছে। বিনের অভীক্ষার আধুনিকতম সংস্করণে নিম্নতম একক সুরু হয়েছে দু'বৎসর থেকে এবং প্রতিটি ধাপে প্রথম দিকে ছ'মাস এবং পরে ১ বৎসর করে বেড়ে সব চেয়ে উপরের একক উন্নত-বয়স্কে শেষ হয়েছে। বয়স অনুযায়ী এককের বিভাগ থাকার জন্য বিনের অভীক্ষাকে বয়সগত স্কেল (Age Scale) বলা হয়।

(ঘ) বিনের অভীক্ষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এতে প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি ক্রমবর্ধমান দুরূহতার মান (Graded difficulty value) অনুযায়ী সাজান থাকে। অর্থাৎ অভীক্ষাটির সর্বপ্রথম প্রশ্নটি সবচেয়ে সহজ এবং সবশেষ প্রশ্নটি সবচেয়ে শক্ত এবং এ'দুয়ের মধ্যবর্তী প্রশ্নগুলি ক্রমশ সহজ থেকে শক্ত হয়ে উঠেছে। এভাবে সাজানোর মূলে রয়েছে অতি স্পষ্ট একটি সত্য। সেটি হল যে শিশুর মানসিক ক্ষমতাও তার বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে থাকে।

কোন্ প্রশ্নটির দুরূহতার মান কতটুকু এবং কোন্ বয়সের জন্য সেটি যোগ্য

এই অতি জটিল সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বিনেকে প্রচুর পরীক্ষণের সাহায্য নিতে হয়েছে এবং বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের উপর প্রশ্নগুলি বারবার প্রয়োগ করে তাঁকে সেগুলির দুরূহতার মান নির্ণয় করতে হয়েছে।

(ঙ) বিনের বুদ্ধির অভীক্ষার সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল মানসিক বয়সের (**Mental Age or M.A.**) পরিকল্পনাটি। সত্য বলতে কি বিনের মানসিক বয়সের অভিনব পরিকল্পনাটিই আধুনিককালের বুদ্ধির অভীক্ষার অপরিসীম সাফল্যের জন্য দায়ী। আমরা আগেই দেখেছি যে বিনের অভীক্ষায় বিভিন্ন বয়সের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি (বর্তমান সংস্করণে ছ'টি) প্রশ্ন বা সমস্যা দেওয়া আছে। এখন যদি কোন বালক একটি বিশেষ বয়সের (ধরা যাক, সাত বৎসরের) জন্য নির্দিষ্ট সব কটি প্রশ্নের ঠিকমত উত্তর দিতে পারে তবে বলা হবে যে ঐ বালকটির ঐ বৎসরের অর্থাৎ সাত বৎসরের মানসিক বয়স আছে, তার আসল বয়স যতই হোক্ না কেন। সেই রকম কোন বালক আট বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলি পারলে বলা হবে যে তার মানসিক বয়স আট। তেমনই নয় বৎসরের সব প্রশ্নগুলি পারলে বলা হবে তার মানসিক বয়স নয়, ইত্যাদি।

(চ) এখন সাধারণভাবে আট বছরের ছেলের উচিত আট বছরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারা অর্থাৎ আট বছরের ছেলের উচিত আট বছরের মানসিক বয়স থাকা। এক কথায় সাধারণ একটি আট বছরের ছেলের মানসিক বয়স আট বলেই ধরে নেওয়া হয়েছে। এখন যদি আট বছরের ছেলে ন'বছরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে তবে বুঝতে হবে যে তার মানসিক বয়স সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে বেশী এবং আর যদি সে আট বৎসরের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে না পারে তবে বুঝতে হবে যে তার মানসিক বয়স আট বছরের ছেলের চেয়ে কম।

কিন্তু কেবলমাত্র মানসিক বয়স এবং সময়গত বয়স জানলেই কোন ব্যক্তির বুদ্ধির সঠিক পরিমাপ পাওয়া যায় না। কেননা আট বছরের ছেলের পক্ষে বার বছরের মানসিক বয়স থাকাটা যতটা বুদ্ধির পরিচায়ক, এগার বছরের ছেলের পক্ষে ঐ একই মানসিক বয়স থাকা ততটা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। অতএব প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ জানার জন্য বিনে মানসিক বয়সকে সময়গত বয়স (**Chronological Age or C. A.**) দিয়ে ভাগ করে এ'দুয়ের একটি অনুপাত (Ratio) বার করলেন। এই অনুপাতটিই ব্যক্তির সত্যকার বুদ্ধিমত্তার সূচক। বিনের প্রবর্তিত এই মানসিক বয়স পরিমাপের পদ্ধতিটি থেকেই

বর্তমানে বুদ্ধ্যঙ্ক (Intelligence Quotient বা I. Q.) গণনা করার পদ্ধতির প্রচলন হয়েছে। বুদ্ধ্যঙ্ক গণনা করার সূত্রটি হল—

$$\text{বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{\text{মানসিক বয়স} \times ১০০}{\text{সময়গত বয়স}} \quad \left\{ I.\ Q. = \frac{M.A.}{C.A.} \times 100 \right\}$$

উপরের সূত্রটি প্রয়োগ করে আমরা দেখতে পাই যে

যে ছেলের সময়গত বয়স ৮ এবং মানসিক বয়স ৭,

$$\text{তার বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{১০০ \times ৭}{৮} = ৮৮$$

অতএব, সে সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন।

যে ছেলের সময়গত বয়স ৮ এবং মানসিক বয়সও ৮,

$$\text{তার বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{১০০ \times ৮}{৮} = ১০০$$

অতএব, সে সাধারণ আট বছরেব ছেলের মতই বুদ্ধিসম্পন্ন।

যে ছেলের সময়গত বয়স ৮ এবং মানসিক বয়স ৯,

$$\text{তার বুদ্ধ্যঙ্ক} = \frac{১০০ \times ৯}{৮} = ১১৩$$

অতএব সে সাধারণ আট বছরের ছেলের চেয়ে অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন।

এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যাচ্ছে যে, যে কোন বয়সেই ১০০ বুদ্ধ্যঙ্ক হল সেই বয়সের সাধারণ বা গড় (average) ব্যক্তিব বুদ্ধির মানেব সূচক। কারোও ১০০'র কম বুদ্ধ্যঙ্ক হলে বুঝতে হবে যে সেই বয়সের গড ব্যক্তির চেয়ে তার বুদ্ধি কম, আর ১০০'র বেশী বুদ্ধ্যঙ্ক হলে বুঝতে হবে যে সেই বয়সের গড় ব্যক্তির চেয়ে তার বুদ্ধি বেশী।

(ছ) বুদ্ধির অভীক্ষাব আর একটি বড বৈশিষ্ট্য হল যে এর সমস্যা বা প্রশ্নগুলি এমন ধরনেব হবে যা সমাধান করতে কোন অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োজন হবে না। কেননা বুদ্ধি হল সহজাত মানসিক শক্তি, এটি অর্জিত কোন বৈশিষ্ট্য নয়। অতএব এমন কোন প্রশ্ন করা চলবে না যার সমাধানের জন্য বিশেষভাবে অর্জিত জ্ঞানের দরকার হবে। যেমন, তাজমহল কে তৈরী কবেছিলেন বা ক' ডিগ্রীতে এক সমকোণ হয় ইত্যাদি প্রশ্ন দিয়ে বুদ্ধির পরিমাপ করা যাবে না। প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি এমন প্রকৃতিব হবে যেগুলির সমাধান করতে কেবলমাত্র মনের সাধারণ শক্তির প্রয়োগই লাগবে, কোন অর্জিত জ্ঞানের সাহায্য দরকার হবে না। তবেই হবে সত্যকার বুদ্ধির পরীক্ষা। যেমন, "একজন লোক বাড়ী ফিরে এসে দেখল যে চোরেরা তার বাড়ীতে ঢুকে সব চুরি করে

নিয়ে গিয়েছে, তখন তার কি করা উচিত ?"—এই প্রশ্নটির উত্তর দিতে সামান্যই অর্জিত জ্ঞান লাগে। আসলে যা লাগে তাকেই আমরা বুদ্ধি বলে থাকি। বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে যতদূর সম্ভব এই ধরনের অর্জিত জ্ঞান-নিরপেক্ষ প্রশ্ন দেবারই চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়ে একথা ঠিক হলেও সম্পূর্ণভাবে অর্জিত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে বুদ্ধির অভীক্ষা রচনা করা যায় না। কেননা, বুদ্ধি একটি অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তি। তাকে প্রকাশ করতে হলে কোন বিশেষ একটি বাহক বা মাধ্যমের প্রয়োজন এবং ভাষা, দক্ষতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সাহায্য বুদ্ধিকে বাইরে প্রকাশিত করার জন্য অপরিহার্য।

(জ) অতএব, পুরোপুরি অর্জিত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে কোন বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী সম্ভব হয় না। আধুনিক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে বিপরীতার্থক এবং সমার্থক শব্দ বলা, বাক্যের অর্থ-নির্ণয়, সংখ্যাঘটিত প্রশ্ন প্রভৃতি নানা অর্জিত-জ্ঞান-নির্ভর সমস্যা পাওয়া যায়। তবে এই সব বুদ্ধির অভীক্ষায় অভীক্ষা-নির্মাতাগণ ততটুকু অর্জিত জ্ঞানেরই ব্যবহার করেন যতটুকু তাঁরা মনে করেন যে অভীক্ষার্থীদের সকলের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান আছে। যেমন, ৮ বছরের ছেলেকে বলা হল, 'সপ্তাহের দিনগুলির নাম বল'। এখানে ধরে নেওয়া হচ্ছে যে সাধারণ সভ্যসমাজে যে কোন আট বছরের ছেলেই সপ্তাহের দিন ক'টার নাম জানে। 'বিনে-সাইমন স্কেলে'ও এই ধরনের অর্জিতজ্ঞান-ভিত্তিক বহু সমস্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে ভাষাধর্মী অর্জিত জ্ঞানের প্রাচুর্য এত যে অনেকে এগুলিকে বুদ্ধির অভীক্ষা না বলে বিদ্যাবত্তার দক্ষতার অভীক্ষা (Scholastic Aptitude Test) নাম দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে এই ধরনের ভাষাভিত্তিক ও অর্জিত জ্ঞানমূলক অভীক্ষাগুলিতে সত্যকারের বুদ্ধির পরিমাপ হয় না। এগুলিতে এক ধরনের বিদ্যামূলক দক্ষতার পরিমাপ করা হয়ে থাকে মাত্র।

(ঝ) বুদ্ধির অভীক্ষা সম্বন্ধে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে আমরা সত্যকারের বুদ্ধিকে পরিমাপ করতে পারি না, আমরা পরিমাপ করি বুদ্ধির বাহ্যিক প্রকাশ বা অভিব্যক্তিটি। অতএব আমরা যা পরিমাপ করি এবং সত্যকারের বুদ্ধি এ দুইই অভিন্ন কিনা তাও নিশ্চয় করে বলা যায় না। তাছাড়া কারোও সম্পূর্ণ বুদ্ধিটাকে পরিমাপ করা যায় কিনা তাও নিঃসন্দেহে বলা চলে না; বরং ব্যক্তির মোট বুদ্ধির একটি অংশকেই পরিমাপ করা যায় বলেই মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন।

বুদ্ধির অভীক্ষার দৃষ্টান্ত

বুদ্ধিকে বর্ণনা করা হয়েছে একটি সাধারণধর্মী শক্তিরূপে এবং এটিকে পরিমাপ করতে হলে নানা বিভিন্ন প্রকৃতির সমস্যা অভীক্ষাটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। এই জন্যই বিনে স্কেলে এবং অন্যান্য আধুনিক প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষায় বহু বিভিন্ন রকমের সমস্যা দেখতে পাওয়া যায়। এই ধরনের কয়েকটি সমস্যার বর্ণনা ও উদাহরণ নীচে দেওয়া হল।

১। **বস্তু, ছবি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রভৃতির নাম বলা** (Naming or Identifying)

যেমন :—একটা ঘোড়ার ছবি দেখিয়ে বলা হয়, "এটা কি বলত ?"

২। **স্মৃতি-শক্তি** (Memory)

যেমন :—একটা বাক্য বা গল্প বলে অভীক্ষার্থীকে সেটিকে মন থেকে বলতে বলা হয়।

৩। **সংখ্যা গণনা** (Counting Digits)

যেমন : ৬—৫—৯—৪ এই সংখ্যার সারিটি অভীক্ষার্থীকে শুনিয়ে তাকে সেটি পুনরায় বলতে বলা হয়।

৪। **দুটি বস্তু বা ধারণার মধ্যে তুলনা** (Comparision)

যেমন :—(ক) একটি ক্রিকেট বল ও কমলালেবুর মধ্যে কোথায় কোথায় মিল, আর কোথায় কোথায় পার্থক্য ?

(খ) দারিদ্র্য এবং দুর্দশার মধ্যে মিল এবং অমিল কোথায় কোথায় ?

৫। **সংবোধন** (Comprehension)

যেমন :—(ক) আমরা তৃষ্ণার্ত হলে কি করতে বাধ্য হই ?

(খ) হারিয়ে গেছে এমন একটি তিন বছরের ছেলেকে হঠাৎ পথে দেখলে তুমি কি করবে ?

৬। **বস্তু গণনা** (Counting Objects)

কতকগুলি বস্তু অভীক্ষার্থীর সামনে দিয়ে তাকে সেগুলি গুণতে বলা হয়।

৭। **শব্দ-সম্ভার পরীক্ষা—সমার্থক, বিপরীতার্থক ইত্যাদি**

(Vocabulary—Synonyms, Antonyms etc.)

যেমন :—(ক) কমলালেবু কাকে বলে ?

(খ) 'রোগ' কথাটির আর একটি প্রতিশব্দ বল। (সমার্থক শব্দ)

(গ) 'সাহসী' কথাটির ঠিক বিপরীত অর্থ বোঝায় এমন একটি শব্দ বল।

(বিপরীতার্থক শব্দ)

(ঘ) 'ধৈর্য', 'অধ্যবসায়', 'সংযোগ', 'প্রতিহিংসা' শব্দগুলির অর্থ বল।

(অমূর্ত শব্দ)

৮। অসম্ভবতা-নির্ণয় (Absurdity)

যেমন: (ক) হাত দুটো পিছন থেকে বাঁধা এবং পা দুটো বাঁধা অবস্থায় একটি যুবককে বন্ধ ঘরের মধ্যে পাওয়া গেল। লোকে ভাবলো যুবকটি নিজেই নিজেকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করে রেখেছিল—এই উক্তিটির মধ্যে এমন কি আছে যা বাস্তবে সম্ভব নয়।

(খ, একটা অসংগতিপূর্ণ ছবি দেখিয়ে বলা হয়, 'এর মধ্যে কোথায় কোথায় ভুল আছে বার কব।'

৯। উপমান (Analogy)

যেমন :—(ক) 'পাখী ওড়ে, মাছ —' (উঃ—সাঁতাব কাটে)

(খ) সূর্য দেয় উত্তাপ, ফুল —'

(গ) ঋণ হল দায়, আয় হল —

(ঘ) ৯'ব সঙ্গে ৬'র যা সম্পর্ক ন'র সঙ্গে কার সে সম্পর্ক ?

১০। বিচারকরণ (Reasoning)

যেমন :—(ক) একটা কাগজকে দু'বার ভাঁজ করাব পর তার একটা কোণে একটা ছোটো ফুটো করা হল। তাব পর প্রশ্ন করা হল, 'কাগজটা খুললে কটা ফুটো দেখা যাবে ?'

(খ) প্রশ্ন করা হল, লোকে চশমা পবে কেন ?—সুন্দর দেখাবে বলে, না, চোখ খারাপ বলে. না, ফ্যাসানের খাতিরে ?

১১। শ্রেণী-বিন্যাস (Classification)

যেমন :—(ক) টেবিল, বই, চেয়ার, আলমারী—এই ৪টি বস্তুর মধ্যে কোন্‌টি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয় ?

(খ) বেড়ানো, ওড়া, সাঁতার কাটা, লেখাপড়া করা—এই ৪টি কাজের মধ্যে কোন্ কাজটি ভিন্ন শ্রেণীর ?

১২। **সংখ্যা সারি** (Number Series)

যেমন :—শূন্যস্থানগুলিতে ঠিকমত সংখ্যা বসাও—

(ক)	১	৩	৫	৭	৯	১১	—	—
(খ)	৬	৯	১২	১৫	১৮	২১	—	—
(গ)	৯	১২	১০	১৩	১১	১৪	—	—
(ঘ)	১	৪	৯	১৬	২৫	৩৬	—	—

১৩। **বিচ্ছিন্ন বাক্য** (Dissected Sentence)

যেমন :—নীচের কথাগুলিকে এমনভাবে সাজাও যাতে অর্থবোধক একটি বাক্য হয়—

(ক) খুব যাত্রা উদ্দেশ্য করলাম গ্রামের ভোরে স্থরু।

(খ) সাহসী কাজ লোকে সৎ করে।

১৪। **সমস্যা সমাধান** (Problem Solving)

যেমন :—একটি ছেলেকে মা নদীতে পাঠালেন ঠিক এক সের জল আনতে। তাকে দিলেন ১টি ৩ সেরি পাত্র আর একটি ৮ সেরি পাত্র। এখন ছেলেটি কি করে ঠিক ১ সের জল আনবে দেখিয়ে দাও। মনে রেখো ১ সেরের কম বা বেশী জল আনা চলবে না।

১৫। **প্রবাদ-বিশ্লেষণ** (Proverb)

যেমন :—নীচের প্রবাদগুলিব কি অর্থ বল—

(ক) অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়।

(খ) ইটটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।

(গ) উলু বনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ নেই।

(ঘ) দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল।

১৬। **প্রয়োগমূলক সমস্যা** (Practical Problem)

যেমন :—(ক) ফর্ম বোর্ড .একটি কাঠের বোর্ডে বৃত্ত, চতুষ্কোণ, ত্রিভুজ প্রভৃতির আকারে গর্ত কাটা থাকে এবং ঐ মাপের কাঠের টুকরো দেওয়া হয়। অভীক্ষার্থীকে ঐ গর্তগুলিতে ঠিক মাপ মত কাঠের টুকরোগুলি বসাতে হয়।

(খ) নানা রঙের ও আকৃতির পুঁতি দিয়ে প্রদত্ত কোন নক্সা অনুযায়ী মালা গাঁথতে হয়।

(গ) একটি আয়তক্ষেত্র বা রম্বসের ছবিকে দু'টুকরো বা তিন'

টুকরো করে অভীক্ষার্থীকে টুকরোগুলিকে জুড়ে পূর্বের নক্সামত সাজাতে দেওয়া হয়।

(ঘ) গোলকধাঁধায় (Maze) ঠিক পথ বার করার সমস্যা বুদ্ধির অভীক্ষায় প্রায়ই দেওয়া হয়।

(ঙ) এ ছাড়া আঁকা, রেখা টানা প্রভৃতির সমস্যাও দেওয়া হয়ে থাকে।

অর্জিত জ্ঞান বা বিদ্যাবত্তার অভীক্ষা

(Achievement or Scholastic Test)

বিদ্যাবত্তার অভীক্ষা হল এক ধরনের অর্জিতজ্ঞানের অভীক্ষা। স্কুলে বা কলেজে কোন ছাত্র একটি বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ বিষয়ে কতটুকু শিখল সেটা পরীক্ষা করার জন্যই বিদ্যাবত্তার অভীক্ষার প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। যেমন, ইংরাজী বা ভূগোল বা ইতিহাসের উপর বিদ্যাবত্তার অভীক্ষা দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বুদ্ধির অভীক্ষা হল মনের সহজাত সাধারণ শক্তির মান নির্ণয়ের অভীক্ষা। বুদ্ধির পরিমাপে অর্জিতজ্ঞানের সঙ্গে অভীক্ষার্থীর সাফল্যের কোন সম্পর্ক থাকে না, বরং যতটা অর্জিত জ্ঞানকে বাদ দেওয়া যায় ততই বুদ্ধির অভীক্ষায় নির্ভরযোগ্যতা বাড়ে।

বিভিন্ন মানুষের জ্ঞান নানা কারণে কম বেশী থাকে এবং উপযুক্ত প্রচেষ্টার দ্বারা সেই জ্ঞানের পরিমাণ বাড়ানো চলতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি একটি সহজাত শক্তি এবং সাধারণভাবে বলতে গেলে প্রকৃতিদত্ত বুদ্ধির ভাণ্ডারে ইচ্ছা করলেই বিশেষ পরিবর্তন ঘটানো যায় না। অতএব অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা (Achievement Test) আর বুদ্ধির অভীক্ষা প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে বুদ্ধির কোন অভীক্ষা অর্জিত জ্ঞানকে একেবারে বাদ দিয়ে তৈরী করা খুবই শক্ত। কেননা বুদ্ধি একটি অমূর্ত শক্তিবিশেষ এবং তার বাহ্যিক অভিব্যক্তির জন্য কোন বাহক বা মাধ্যম অপরিহার্য। আর অর্জিতজ্ঞানই এই বাহক বা মাধ্যমরূপে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে একটু উচ্চস্তরের অভীক্ষা তৈরী করতে হলে তাতে জটিল সমস্যা দিতেই হবে। আর জটিল সমস্যা মানেই অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ।

প্রকৃতপক্ষে স্কুলে কলেজে যে সব পরীক্ষা এতদিন গতানুগতিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে সেগুলির সবই বিদ্যাবত্তা বা অর্জিতজ্ঞানের অভীক্ষা। কিন্তু

আধুনিক বিষয়মুখী নতুন অভীক্ষাগুলিকেই সাধারণত এই নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। প্রাচীন ত্রুটিপূর্ণ পরীক্ষাগুলিকে বাতিল করে সেগুলির স্থানে আজকাল এই নতুন বিদ্যাবত্তার অভীক্ষার প্রয়োগ হচ্ছে। এগুলি বর্তমানে শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা (Educational Test) নামেও পরিচিত।[১]

বিনে স্কেলের সংস্করণ (Revisions of Binet Scale)

বিনে তাঁর বুদ্ধির অভীক্ষা প্রথম তৈরী করেন ১৯০০ সালে। তাঁর জীবিতকালেই তিনি ১৯০৫, ১৯০৯ এবং ১৯১১ সালে অভীক্ষাটির পর পর তিনবার সংস্কার করেন। বিনে মারা যান ১৯১১ সালে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর অভীক্ষাটি দেখতে দেখতে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং অধিকাংশ দেশের মনোবিজ্ঞানীরাই এটিকে বুদ্ধির পরিমাপের সন্তোষজনক যন্ত্র বা মাধ্যম বলে গ্রহণ করেন। বিনের মূল অভীক্ষাটি ছিল ফরাসী ভাষায়। ক্রমশ নানা বিভিন্ন ভাষায় এটির অনুবাদ হতে থাকে। এর পরবর্তী সংস্করণগুলিতে অভীক্ষাটির মূল রূপের যথেষ্ট পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

ইংরাজী ভাষায় বিনে স্কেলের যতগুলি সংস্করণ হয়েছে তার মধ্যে আমেরিকার ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (Stanford University) অধ্যাপক টারম্যানের (Terman.) প্রণীত সংস্করণটিই বিখ্যাত। টারম্যান বিনে স্কেলের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করেন ১৯১৬ সালে। ১৯৩৭ সালে অধ্যাপক মেরিলের (Merrill) সহায়তায় এর আর একটি পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই সংস্করণটি বর্তমানে ষ্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেল (Stanford Binet Scale) নামে পরিচিত। বর্তমানে এই স্কেলটিই অধিকাংশ ইংরাজী ভাষাভাষী দেশে বুদ্ধির অভীক্ষারূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। টারম্যান মেরিলের সংস্করণ ছাড়াও গডার্ড (Goddard), বার্ট (Burt) প্রভৃতি বহু মনোবিজ্ঞানীর প্রণীত বিনের স্কেলের সংস্করণ প্রচলিত আছে।

ষ্ট্যানফোর্ড-বিনে স্কেল (Stanford-Binet Scale)

বিনের ১৯১১ সালের প্রকাশিত বুদ্ধির অভীক্ষাটিকে ভিত্তি করেই এই নতুন অভীক্ষাটি গঠিত হয়েছে। মূল বিনে-সাইমন স্কেলটি সুরু হয়েছিল সর্বনিম্ন ৩ বৎসর বয়স থেকে এবং সর্বোচ্চ ১৫ বৎসর বয়সে শেষ হয়েছিল। টারম্যান-মেরিলের এই নতুন সংস্করণ সুরু হয়েছে সর্বনিম্ন ২ বৎসর বয়স থেকে এবং শেষ

১। পৃঃ ৩—পৃঃ ৫ (তৃতীয় খণ্ড)

হয়েছে সর্বোচ্চ ধাপ উন্নত বয়স্ক (৩) বা Superior Adult (III) তে। বিনের মূল স্কেলে প্রশ্ন বা সমস্যার সংখ্যা ছিল ৫৪টি, টারম্যানের প্রথম ষ্ট্যানফোর্ড সংস্করণে এই সংখ্যা হয় ৯০টি এবং সব শেষ সংস্করণে প্রশ্নসংখ্যা বেড়ে হয় ১২৯টি।

এই প্রশ্নগুলির বিভাগ হল নিম্নরূপ।

২, ২½, ৩, ৩½, ৪, ৪½, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪—এর প্রত্যেকটি বয়সের জন্য ৬টি করে প্রশ্ন— = ১৬×৬	....	৯৬টি প্রশ্ন
সাধারণ বয়স্ক (Average Adult) স্তরের জন্য	....	৮টি প্রশ্ন
উন্নত বয়স্ক (১), উন্নত বয়স্ক (২) এবং উন্নত বয়স্ক (৩)—এর প্রত্যেকটি বয়সের জন্য ৬টি করে প্রশ্ন— = ৩×৬	....	১৮টি প্রশ্ন
প্রথম সাতটি বয়সের জন্য ১টি করে বিকল্প প্রশ্ন	....	৭টি প্রশ্ন
	মোট :	১২৯টি প্রশ্ন

বুদ্ধ্যঙ্কের পরিগণনা (Calculation of I. Q.)

বিনে-স্কেলের প্রয়োগের নিয়ম হল এই। অভীক্ষার্থীর সময়মত বয়সের ২ বৎসর নীচে থেকে অভীক্ষাটির প্রয়োগ সুরু করতে হয় এবং দেখতে হয় যে স্কেলের সর্বোচ্চ কোন্ বয়স পর্যন্ত অভীক্ষার্থী সব কটি প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিতে পারে। সেই বয়সটিকে অভীক্ষার্থীর মৌলিক মানসিক বয়স (Basal Mental Age) বলে ধরা হবে। তারপর এই মৌলিক বয়সের উপরের কয়েক বৎসরের প্রশ্নগুলি অভীক্ষার্থীকে পর পর দিয়ে দেখতে হবে যে কোন্ বয়সের কটি প্রশ্নের সে নির্ভুল উত্তর দিতে পারে। যতক্ষণ না অভীক্ষার্থী এমন একটি স্তরে এসে পৌঁছচ্ছে যখন সে আর একটি প্রশ্নেরও নির্ভুল উত্তর দিতে পারছে না ততক্ষণ পর্যন্ত অভীক্ষাটির প্রয়োগ চালিয়ে যেতে হবে। প্রত্যেকটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারলে অভীক্ষার্থীর কিছু কিছু মানসিক বয়স প্রাপ্য হয়। এই অর্জিত মানসিক বয়সের গণনা করা হয় 'মাসের' হিসাবে। বিভিন্ন বয়সের প্রশ্নের নির্ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্য মানসিক বয়স সমান হয় না। স্কেলের প্রথম ৭ বৎসর অর্থাৎ ২ বৎসর থেকে ৫ বৎসরের মধ্যে প্রত্যেকটি প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের জন্য অভীক্ষার্থীর মানসিক বয়স প্রাপ্য হবে ১ মাস হিসাবে অর্থাৎ একটি প্রশ্ন নির্ভুল হলে প্রাপ্য হবে ১ মাস, ২টি প্রশ্ন নির্ভুল হলে প্রাপ্য হবে ২ মাস ইত্যাদি। তেমনই ৬ বৎসর থেকে সাধারণ বয়স্ক বৎসরের (AA) মধ্যে

প্রত্যেক প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের জন্য অভীক্ষার্থীর পাওনা হবে ২ মাস করে মানসিক বয়স এবং উন্নত বয়স্ক (১) বয়সের প্রত্যেক প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের জন্য ৪ মাস করে, উন্নত বয়স্ক (২) বয়সের প্রত্যেক প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের জন্য ৫ মাস করে এবং উন্নত বয়স্ক (৩) বয়সের প্রত্যেকটি প্রশ্নের নির্ভুল সমাধানের জন্য ৬ মাস করে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে।

মনে করা যাক একটি ছেলের সময়গত বয়স ৪ বঃ ৮ মাস। সে ৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত সব প্রশ্ন পারল। তারপর সে পারল ৪½ বৎসরের ৪টি প্রশ্ন, ৫ বৎসরের ৩টি, ৬ বৎসরের ২টি এবং ৭ বৎসরের ১টি প্রশ্ন। তার মৌলিক বয়স হল ৪ বৎসর এবং পরবর্তী বৎসরগুলির জন্য তার অর্জিত মানসিক বয়স হল (৪ × ১) + (৩ × ১) + (২ × ২) + (১ × ২) = ১৩ মাস। অতএব তার মোট মানসিক বয়স হল ৪ বৎসর + ১৩ মাস = ৫ বৎসর ১ মাস। এখন এই ছেলেটির সময়গত বয়স যখন ৪ বৎসর ৮ মাস, তখন তার I. Q বা বুদ্ধ্যঙ্ক হবে

$$\frac{(\text{৫ বঃ ১ মাঃ}) \times \text{১০০}}{(\text{৪ বঃ ৮ মাঃ})} = \text{১০৯}$$

মনে করা যাক আর একজন অভীক্ষার্থীর সময়গত বয়স ১৩ বঃ ১ মাস। ১৩ বৎসর পর্যন্ত সে সমস্ত প্রশ্ন পারল। তারপরে সে পারল ১৪ বৎসরের ৫টি প্রশ্ন, সাধারণ বয়স্ক বয়সের ৪টি প্রশ্ন, উন্নত বয়স্ক (১) বয়সের ৩টি প্রশ্ন, উন্নত বয়স্ক (২) বয়সের ২টি প্রশ্ন এবং উন্নত বয়স্ক (৩) বয়সের ১টি প্রশ্ন। এই অভীক্ষার্থীটির মৌলিক মানসিক বয়স হল ১৩ বৎসর এবং পরবর্তী বৎসরগুলির জন্য তার অর্জিত মানসিক বয়স হল—(৫ × ২) + (৪ × ২) + (৩ × ৪) + (২ × ৫) + (১ × ৬) মাস = ১০ + ৮ + ১২ + ১০ + ৬ মাস = ৪৬ মাস। অতএব তার মোট মানসিক বয়স হবে ১৩ বৎসর + ৪৬ মাস বা ১৬ বৎসর ১০ মাস। এখন যদি এই অভীক্ষার্থীর সময়গত বয়স হয় ১৩ বৎসর ১ মাস, তবে তার I. Q. বা বুদ্ধ্যঙ্ক হবে—

$$\frac{(\text{১৬ বঃ ১০ মাঃ}) \times \text{১০০}}{(\text{১৩ বঃ ১ মাঃ})} = \text{১২৯}$$

বয়স্কব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্কের পরিগণনা

বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ক পরিগণনা করার নিয়ম একটু বিভিন্ন। দেখা গেছে যে ১৫ বৎসরের পর বুদ্ধির আর বিশেষ উন্নতি হয় না। সেজন্য মনোবিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে ১৫ বৎসরেই বুদ্ধির বিকাশের সীমারেখা টেনে দিয়েছেন। অতএব কোন বয়স্ক ব্যক্তির বুদ্ধির মান গণনা করার সময় ১৫ বৎসরকে সর্বোচ্চ

বয়স হিসাবে ধরা হয়, সত্যকার বয়স তার যতই হোক্ না কেন। যেমন, যদি কোন অভীক্ষার্থীর সময়গত বয়স হয় ২৪ বৎসর ২ মাস এবং তার মানসিক বয়স হিসাব করে দাঁড়ায় ১৭ বৎসর ২ মাস তাহলে তার বুদ্ধ্যঙ্ক হবে—

$$\frac{(\text{১৭ বঃ ২ মাঃ})\times\text{১০০}}{\text{১৫ বঃ}}=\text{১১৪}$$

ষ্ট্যানফোর্ড স্কেলে সর্বোচ্চ মানসিক বয়স হতে পারে ২২ বৎসর ১০ মাস এবং সে হিসাবে সর্বোচ্চ বুদ্ধ্যঙ্ক হতে পারে ১৭১।

ষ্ট্যানফোর্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর থেকে বুদ্ধির অভীক্ষা নিয়ে নানা দেশে ব্যাপক গবেষণা সুরু হয়। ফলে বহু নতুন ও অভিনব বুদ্ধির অভীক্ষা সৃষ্ট হয়। এগুলির অধিকাংশই অবশ্য বিনের বুদ্ধির অভীক্ষার মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

বুদ্ধির অভীক্ষার শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে বিভিন্ন দিক দিয়ে শ্রেণী বিভাগ করা যায়। প্রথমত, সমস্যা বা প্রশ্নের প্রকৃতির দিক দিয়ে বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে ভাষামূলক (Verbal) এবং ভাষাবিহীন (Non-verbal), এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। দ্বিতীয়ত, সংগঠনের দিক দিয়ে সেগুলিকে আবার ব্যক্তিগত (Individual) ও যৌথ (Group), এই দু'ভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ বুদ্ধির অভীক্ষা মোট চার রকমের হতে পারে—ভাষামূলক ব্যক্তিগত, ভাষাবিহীন ব্যক্তিগত, ভাষামূলক যৌথ ও ভাষাবিহান যৌথ।

ভাষামূলক অভীক্ষা ও ভাষাবিহীন অভীক্ষা (Verbal Test & Non-verbal Test)

ভাষামূলক অভীক্ষাগুলির উপাদান প্রধানত শব্দ, বাক্য, বাক্যাংশ ইত্যাদি। লিখিত এবং কথিত ভাষার সাহায্যেই অভীক্ষার্থীকে প্রদত্ত সমস্যাগুলির সমাধান করতে হয়। সমস্যার মধ্যেও প্রচুর ভাষার ব্যবহার থাকে। শব্দ বা বাক্যের অর্থ বলা, সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ ব্যবহার করা, লিখিত বাক্য পড়া ও তার অর্থ বোঝা ইত্যাদি নানাভাবে ভাষার ব্যবহার এই সব অভীক্ষায় অঙ্গীভূত থাকে। বিনে-সাইমন স্কেলটি একটি ভাষামূলক ব্যক্তিগত অভীক্ষা। তেমনই আর্মি আলফা (Army Alpha) একটি ভাষামূলক যৌথ অভীক্ষা।

ভাষাবিহীন বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে কথিত বা লিখিত ভাষার ব্যবহারকে

যতটা সম্ভব (একেবারে সম্ভব নয়) বর্জন করা হয়। এমন অনেক অভীক্ষার্থী আছে যারা ভাষা ব্যবহারে তেমন পটু নয় বা কোন কারণে তাদের ভাষা শিক্ষার মধ্যে দুর্বলতা থেকে গেছে। অতএব তাদের বুদ্ধির পরিমাপ করা ভাষা-মূলক অভীক্ষাগুলির মাধ্যমে যথাযথভাবে হতে পারে না, বিশেষ করে নিরক্ষর ও শিশুদের ক্ষেত্রে ভাষামূলক অভীক্ষার ব্যবহার চলতেই পারে না। তাদের জন্যই ভাষাবিহীন অভীক্ষার উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই শ্রেণীভুক্ত অভীক্ষাগুলি আবার নানা রকমের হতে পারে। আর্মি বিটা (Army Beta) একটি ভাষাবিহীন যৌথ অভীক্ষা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকায় ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বিদেশী সৈন্যদের বুদ্ধির পরিমাপ করার জন্য এই অভীক্ষাটি গঠিত হয়।

সম্পাদনী অভীক্ষা (Performance Test)

ভাষাবিহীন অভীক্ষার প্রথম পর্যায়ে পড়ে সম্পাদনী অভীক্ষা (Performance Test)। এগুলিতে নানা আকার ও রঙের কাঠের বা প্লাষ্টিকের টুকরোর সাহায্যে প্রদত্ত কোন বিশেষ নক্সার অনুকরণে একটি নক্সা তৈরী করতে হয় বা কোন প্রদত্ত সমস্যার সমাধান করতে হয়। প্রধানত দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের সাহায্যেই এই অভীক্ষাগুলির সমাধান করতে হয় বলে এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে সম্পাদনী অভীক্ষা। সম্পাদনী অভীক্ষায় সমস্যাটির সমাধানে বা প্রদত্ত নক্সাটির গঠনে সাফল্য এবং ক্ষিপ্রতার মধ্যে দিয়ে অভীক্ষার্থীর বুদ্ধির পরিমাপ করা যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। এ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ আছে। প্রচলিত সম্পাদনী অভীক্ষার মধ্যে আলেকজাণ্ডারের পাস এ্যালং (Alexander's Pass-Along), কোহ্'র ব্লক ডিজাইন (Koh's Block Design), ডিয়ারবর্নের ফর্মবোর্ড (Dearborn's Form Board), পোর্টিয়াস গোলকধাঁধা (Porteus Maze), হিলি'র পাজল (HealeyPuzzle) প্রভৃতির নাম করা যায়। কোন কোন বুদ্ধির অভীক্ষায় ভাষামূলক এবং ভাষাবর্জিত দু'রকম সমস্যাই দেওয়া হয়ে থাকে। ওয়েকস্লার বেলেভিউ ইন্টেলিজেন্স্ স্কেল (Wechsler Bellevue Intelligence Scale বা WBIS) এই ধরনের একটি ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষা।

আর একটি প্রসিদ্ধ ভাষাবিহীন ব্যক্তিগত বুদ্ধির অভীক্ষা হল গুডএনাফের (Goodenough) মানুষ-আঁকার অভীক্ষা (Man-drawing Test)। এতে অভীক্ষার্থীকে নিজের মন থেকে একটি মানুষের ছবি আঁকতে বলা হয়।

শিল্পনৈপুণ্যের দিক দিয়ে ছবিটির উৎকর্ষের কোনরূপ বিচার করা হয় না। প্রধানত দেখা হয় যে মানুষের দেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির মধ্যে কতগুলি অভীক্ষার্থী ছবিতে ঠিকমত আঁকতে পারল এবং কতগুলি পারল না। তাছাড়া বিশেষ করে মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি ও অবস্থিতির দিক দিয়ে পরস্পরের সম্পর্ক সম্বন্ধে অভীক্ষার্থীর ধারণা কতটা নির্ভুল ও বাস্তবধর্মী তা থেকেই অভীক্ষার্থীর বুদ্ধির একটি পরিমাপ পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করা হয়। ৪ থেকে ১০ বৎসরের শিশুদের বুদ্ধির অভীক্ষা রূপে এই অভীক্ষাটি আজকাল প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

গোলকধাঁধায় পথ বার করাও একটি অতি প্রচলিত সম্পাদনী অভীক্ষা। এগুলি নানা রকমের হয়ে থাকে। কখনও কাগজে ছাপা গোলকধাঁধায় পেন্সিল দিয়ে সংক্ষিপ্ততম পথটি বার করতে বলা হয়, আবার কখনও কাঠের ছোট ছোট দেওয়াল দিয়ে ঘেরা গোলকধাঁধায় আঙুল বা ষ্টাইলাস (Stylus) দিয়ে বেরোবার পথটি আবিষ্কার করার সমস্যা দেওয়া হয়। যে অভীক্ষার্থী যত কম ভুল করে এবং যত অল্প সময়ে সমস্যাটির সমাধান করতে পারে তার তত বেশী বুদ্ধি আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

সম্পাদনী অভীক্ষা ছাড়াও কাগজে কলমে উত্তর করা যায় এমন অনেক ভাষাবিহীন অভীক্ষা আছে। আর্মি বিটা অভীক্ষাটি এই ধরনের একটি ভাষাবিহীন যৌথ অভীক্ষা। ছবি, নক্‌সা ইত্যাদি আঁকার মধ্যে দিয়ে এই অভীক্ষাটির সমাধান করতে হয়।

ব্যক্তিগত অভীক্ষা ও যৌথ অভীক্ষা

(Individual Test & Group Test)

বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে তাদের সংগঠন ও প্রয়োগ পদ্ধতির দিক দিয়ে ব্যক্তিগত অভীক্ষা এবং যৌথ অভীক্ষায় ভাগ করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত অভীক্ষা হল সেই সব অভীক্ষা যেগুলি এক সময়ে একজনের বেশী অভীক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করা যায় না। এই অভীক্ষাগুলিতে অভীক্ষক একজন মাত্র অভীক্ষার্থীর সামনে সমস্যাগুলিকে একটির পর একটি উপস্থাপিত করেন এবং সেগুলির উত্তরে অভীক্ষার্থীর প্রদত্ত প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করে যান। বিনে-সাইমন স্কেলটি এই ধরনের একটি ব্যক্তিগত অভীক্ষা।

যৌথ অভীক্ষাতে কিন্তু তা করতে হয় না। অভীক্ষক একসঙ্গে বহু অভীক্ষার্থীর উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করতে পারেন। সাধারণত ছাপা ছোট

বইয়ের আকারে অভীক্ষাটি তৈরী করা হয়ে থাকে। তাতে সমস্যাগুলি ছোট ছোট এবং সহজবোধ্য প্রশ্নের আকারে দেওয়া থাকে এবং কেমন করে সেগুলির সমাধান করতে হবে তাও উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া থাকে। অভীক্ষার্থী সেই নির্দেশমত সমস্যাগুলির উত্তর বইটিতে লিখে দেয়। উত্তর দেওয়ার কাজটিও আজকাল খুব সরল ও সহজ করে তোলা হয়েছে। সাধারণত টিক দেওয়া বা নীচে দাগ দেওয়া বা ক্রশ-চিহ্ন দেওয়া প্রভৃতি অতি সহজ ও সংক্ষিপ্ত কাজের দ্বারা অভীক্ষার্থী প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারে।

বলা বাহুল্য ব্যক্তিগত অভীক্ষার চেয়ে যৌথ অভীক্ষার কতকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে। প্রথমত, এর প্রয়োগে অনেক সময় ও পরিশ্রম বাঁচে। একটি ব্যক্তিগত অভীক্ষা প্রয়োগ করতে কম করে দুই থেকে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। ফলে ব্যক্তিগত অভীক্ষার সাহায্যে একটি ক্লাশের ৫০টি ছেলের বুদ্ধির পরিমাপ করতে বহুদিন লেগে যাবে। কিন্তু যৌথ অভীক্ষার সাহায্যে এক দিনেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাদের সকলের বুদ্ধির পরিমাপ করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত অভীক্ষাটির প্রয়োগের সময় যথেষ্ট শিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষক না হলে অভীক্ষাটিই ব্যর্থ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যৌথ অভীক্ষায় নির্দেশ-দান সহজ ও সুনির্দিষ্ট। ফলে এগুলির প্রয়োগের জন্য অভিজ্ঞ বা বিশেষরূপে শিক্ষণপ্রাপ্ত অভীক্ষকের প্রয়োজন হয় না। অভীক্ষা প্রয়োগের কৌশল ও পদ্ধতি সম্বন্ধে ভাল করে অনুশীলন করে নিলে সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে যৌথ অভীক্ষা প্রয়োগ করা সম্ভব হয়।

কিন্তু আবার নির্ভরশীলতার দিক দিয়ে ব্যক্তিগত অভীক্ষার মূল্য অনেক বেশী। কেননা অভীক্ষাটি প্রয়োগের সময় অভীক্ষার্থী তার পরিবেশের সঙ্গে কতটা নিজেকে মানিয়ে নিতে পারল সেটির উপর অভীক্ষার সাফল্য অনেকখানি নির্ভর করে। যৌথ অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার কোন মূল্য দেওয়া হয় না। কিন্তু ব্যক্তিগত অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীর সঙ্গে অভীক্ষকের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে বলে তিনি তার মানসিক ও প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াগুলির সুবিচার করতে পারেন।

কিন্তু আজকের দ্রুত গতিশীল জগতে সময়-সংক্ষেপের দাম অনেক। ফলে গত কয়েক বছরের মধ্যে যৌথ অভীক্ষায় অভাবনীয় উন্নতি হয়েছে। বর্তমানে গঠিত নতুন অভীক্ষার অধিকাংশই যৌথ অভীক্ষা। যৌথ অভীক্ষার প্রথম ব্যাপক প্রচলন করেন আমেরিকার সামরিক বিভাগ প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। তাঁরা স্থির

করেন যে সামরিক কাজে যাদের নেওয়া হবে তাদের বুদ্ধি পরীক্ষা করে নেওয়া হবে। কিন্তু হাজার হাজার সৈনিক ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত অভীক্ষার মাধ্যমে বুদ্ধির পরীক্ষা করা সম্ভব নয়। সেজন্য আমেরিকার কয়েকজন বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীর তত্ত্বাবধানে দুটি যৌথ বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করা হয়। প্রথমটির নাম আর্মি আলফা অভীক্ষা (Army Alpha Test)। এটি ভাষামূলক এবং এর সমস্যাগুলির সমাধান ভাষার পঠন ও লিখনের মধ্যে দিয়ে করতে হয়। দ্বিতীয়টির নাম আর্মি বিটা অভীক্ষা (Army Beta Test)। ইতিপূর্বে ওটিস (Otis) নামে একজন মনোবিজ্ঞানী একটি ভাষাবর্জিত অভীক্ষা গঠন করেন। তাঁরই আবিষ্কৃত অভীক্ষার উপর নির্ভর করে এই নতুন অভীক্ষাটি গঠন করা হয়। এই অভীক্ষাটি ভাষাবর্জিত এবং এর অন্তর্গত সমস্যাগুলির সমাধানে ভাষার ব্যবহার প্রয়োজন হয় না। অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ করা, গোলকধাঁধায় পথ বার করা প্রভৃতি ভাষা-নিরপেক্ষ সমস্যার দ্বারা এই অভীক্ষাটি গঠিত। সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশার্থী অশিক্ষিত এবং বিদেশীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্যই এই অভীক্ষাটি প্রস্তুত করা হয়েছিল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাতে 'আর্মি আলফা' অভীক্ষাটির আবার নতুন করে সংস্কার করা হয়। এই নতুন সংস্করণটি আর্মি জেনারেল ক্লাসিফিকেসন অভীক্ষা (Army General Classification Test বা AGCS) নামে পরিচিত।

বুদ্ধির অভীক্ষার উপযোগিতা (Uses of Intelligence Test)

বর্তমান শতকে নানা কারণে বুদ্ধির অভীক্ষার দ্রুত ও ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। বুদ্ধির অভীক্ষা কোন্ কোন্ দিক দিয়ে আমাদের কাজে লাগে নীচে তার কয়েকটি ক্ষেত্রের উল্লেখ করা হল।

(ক) বুদ্ধির অভীক্ষা ব্যক্তির বুদ্ধির মান নির্ণয়ে সাহায্য করে। অর্থাৎ বুদ্ধির সাধারণ মানের চেয়ে যদি কারও বুদ্ধি কম বা বেশী থাকে তা আমরা এই বুদ্ধির অভীক্ষার মাধ্যমেই নির্ভরযোগ্যভাবে জানতে পারি।

(খ) বুদ্ধির অভীক্ষার মাধ্যমেই আমরা জানতে পেরেছি যে সব মানুষের মানসিক ক্ষমতা সমান নয়। স্কুলের লেখাপড়ার সঙ্গে বুদ্ধির সম্বন্ধ অতি-ঘনিষ্ঠ। বুদ্ধিমান ছেলে দ্রুত শেখে, বুদ্ধিহীনের শেখার গতি মন্থর। অতএব স্কুলে একটি ক্লাশে যদি বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এক সঙ্গে রেখে তাদের একই-ভাবে পড়ানো যায়, তাতে মাঝারি বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেরা মোটামুটি উপকৃত হলেও অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন এবং অধিক বুদ্ধিসম্পন্ন, এই দু'দলেরই বিশেষ কোন উপকার

হয় না। এই ব্যক্তিগত বৈষম্যের (Individual Difference) নীতিটি আজকাল সর্বত্রই মেনে নেওয়া হয়েছে এবং সমস্ত প্রগতিশীল বিদ্যালয়েই এই' নীতি অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার সংশোধন করার চেষ্টা চলছে। বিভিন্ন বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের এক ক্লাশে না রেখে সাধারণত—ভাল, মাঝারি এবং মন্দ, এই তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং এই তিন শ্রেণীর শিক্ষার্থীর বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী তাদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। বুদ্ধির মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের এই শ্রেণীবিন্যাস (Classification) করা সম্ভব হয় বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োগের দ্বারা।

(গ) বুদ্ধির অভীক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ গণনা করতে সাহায্য করে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরের লেখাপড়ায়, বিশেষ করে সাহিত্যধর্মী পাঠস্তরে, সাফল্য লাভের সঙ্গে বুদ্ধিমত্তার বেশ নিকট সম্বন্ধ আছে। আধুনিক পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে দেখা গেছে যে ক্লাশের পরীক্ষায় সাফল্য এবং বুদ্ধির অভীক্ষায় কৃতিত্বের মধ্যে সহপরিবর্তনের (Correlation) মান বেশ উঁচু (পরিসংখ্যানের ভাষায় ·৪০ থেকে ·৬০)। ফলে কোন ছাত্রের বুদ্ধ্যঙ্ক দেখে বলা চলে যে সে ভবিষ্যতে লেখাপড়ায় কৃতিত্ব অর্জন করবে কিনা এবং করলে কতটুকু করবে। যদি দেখা যায় যে কোন ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক বেশ কম তবে বলা চলতে পারে যে সাধারণ স্কুল কলেজের সাহিত্যধর্মী লেখাপড়ায় সে বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না।

(ঘ) এই থেকেই বুদ্ধির অভীক্ষার আধুনিক যুগের একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে। আজকাল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক পরিচালন (Educational Guidance) বুদ্ধির অভীক্ষার ব্যাপক প্রয়োগ সুরু হয়েছে। অর্থাৎ কোন ছেলের বুদ্ধির মান দেখে ভবিষ্যতে লেখাপড়ার কোন্ পথে তার যাওয়া উচিত সে সম্বন্ধে তাকে নির্ভরযোগ্য নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। যে ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক কম তাকে সাধারণ স্কুল কলেজের সাহিত্যধর্মী লেখাপড়ার দিকে যেতে না বলে কোন ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। যে ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক বেশ উঁচু তাকে উন্নত সাহিত্যমূলক পাঠস্তর অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া যায়। কার কোন্ শ্রেণীর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এটা পূর্বাহ্নে জানা গেলে শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন মত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় এবং অনুপযোগী শিক্ষা গ্রহণের ফলে সাধারণত শ্রম ও উৎসাহের যে অপরিমিত অপচয় ঘটে থাকে তার সম্ভাবনা অনেকাংশে কমে যায়।

(ঙ) বৃত্তিমূলক পরিচালনেও (Vocational Guidance) বর্তমানে বুদ্ধির

অভীক্ষার ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এমন বহু বৃত্তি আছে যেগুলির সাফল্য বুদ্ধির উচ্চমানের উপর নির্ভরশীল। যেমন, শিক্ষকতা, আইনজীবিকা, ব্যবসা-পরিচালনা, পরিশাসন-সংক্রান্ত কার্যাদি, সংবাদপত্র সম্পাদনা, ডাক্তারী প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আবার মোটর চালনা, যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কার্যাদি, জরীপের কাজ, ফ্যাক্টরীর কাজকর্মাদি, সীবন শিল্প, মৃৎশিল্প, ভাস্কর্য, বয়নশিল্প, যুদ্ধবৃত্তি, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি বহু জীবিকা আছে যাতে উচ্চবুদ্ধির মান না থাকলেও মোটামুটি সাফল্য লাভ করা চলতে পারে। বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে বিশেষ কোন্ ব্যক্তির কোন্ বৃত্তি অনুসরণ করা উচিত সে সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান নির্দেশ দেওয়া সম্ভবপর। অবশ্য কেবলমাত্র বুদ্ধির অভীক্ষাকে ভিত্তি করেই কারও পক্ষে কোন্ বৃত্তি নেওয়া উচিত, তা বলা যায় না। এর জন্য ব্যক্তির মধ্যে কি কি বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি বা দক্ষতা আছে এবং তার আগ্রহ মনঃ-প্রকৃতি ইত্যাদির স্বরূপ কি তাও জানতে হয়। অতএব এই সব তথ্য জানার জন্য বুদ্ধির অভীক্ষা ছাড়াও নানাপ্রকার বিশেষধর্মী অভীক্ষায় প্রয়োগ করতে হয়।

(চ) বুদ্ধির অভীক্ষার এই সকল উপযোগিতার জন্য আজকাল স্কুল-কলেজ ছাত্রছাত্রী গ্রহণ করা থেকে সুরু করে বড় বড় অফিসে, সেনাবিভাগে, দায়িত্বপূর্ণ চাকরীতে কর্মী নিয়োগের সময় বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া হয়। আধুনিক যুগে যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীতে নিয়োগের সময় যে সব নানাপ্রকারের পরীক্ষার প্রয়োগ করা হয় বুদ্ধির অভীক্ষা হল সেগুলির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। সেনা-নৌ-বিমান প্রভৃতি বিভাগে আজকাল বুদ্ধির অভীক্ষা ছাড়া কোনরূপ কর্মী নিয়োগ করাই হয় না।

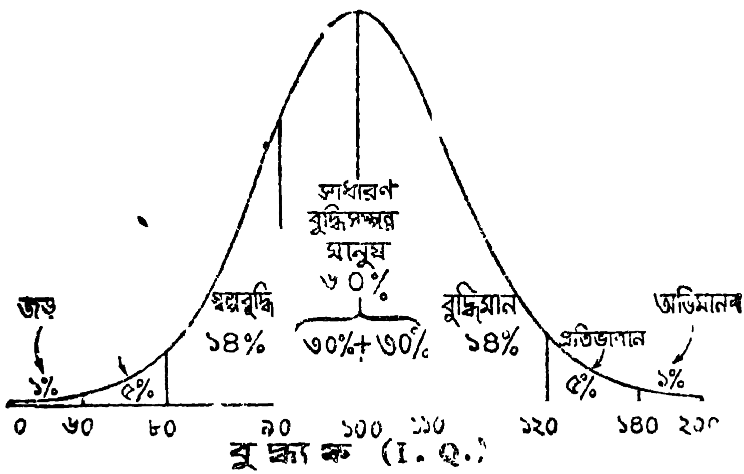
(ছ) মানসিক বিকার, ছেলেমেয়েদের সমস্যামূলক আচরণ, কিশোর, অপরাধ (Delinquency) প্রভৃতির চিকিৎসা করার সময় বুদ্ধির অভীক্ষা প্রয়োগ করাটা প্রাথমিক সোপান বলেই সর্বত্র পরিগণিত হয়ে থাকে। কেননা বুদ্ধিহীনতার সঙ্গে মনের বিকার বা অস্বাভাবিকতার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে বলে মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন।

বুদ্ধির বণ্টন (Distribution of Intelligence)

সকল মানুষের বুদ্ধি যে সমান নয় এটা একটি সর্বজনস্বীকৃত লৌকিক অভিজ্ঞতা। সকলেই কিছু না কিছু বুদ্ধি নিয়ে জন্মেছে একথা যেমন সত্য, আবার সকলের বুদ্ধি যে সমান নয় একথাও তেমনই সত্য। প্রকৃতির বণ্টনে কারও ভাগে

বুদ্ধি পড়েছে বেশী, আবার কারও ভাগে কম। এই সত্যটুকু আমাদের জানা থাকলেও, এই অসমান বণ্টনের প্রকৃত স্বরূপটি এতদিন আমাদের জানা ছিল না। সেটা সম্প্রতি জানা সম্ভব হয়েছে বুদ্ধির অভীক্ষার মাধ্যমে।

এখন জানা গেছে যে বুদ্ধির বণ্টনে প্রকৃতি অধিকাংশ লোকের প্রতি সুবিচারই করেছে। শতকরা প্রায় ৬০ জন লোকেরই আছে মাঝারি ধরনের বুদ্ধি এবং বুদ্ধ্যঙ্কের গণনায় বলা যায় যে তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১১০'র মধ্যে থাকবে। আবার ৯০ বুদ্ধ্যঙ্কের নীচে আছে প্রায় শতকরা ২০ জন। এরা হল প্রকৃতির অবহেলিত ছেলেমেয়ে। এদের এক কথায় বলা চলে ক্ষীণবুদ্ধি। এদের মধ্যে বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে আবার শ্রেণীবিভাগ করা চলে। ১১০ বুদ্ধ্যঙ্কের উপরেও সেই রকম আছে শতকরা ২০ জন। এরা প্রকৃতির দ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত। এদের নাম দেওয়া যায় উন্নত-বুদ্ধি। এদেরও মানের দিক দিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। জনসমাজে বুদ্ধির এই বণ্টনটিকে যদি চিত্রের



[স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র]

আকার দেওয়া যায়, তবে আমরা উপরের মত ঘণ্টার আকৃতিসম্পন্ন একটি ছবি পাব। অধিকাংশ লোক মাঝামাঝি বুদ্ধিসম্পন্ন বলে ছবিটির মাঝখানটা উঁচু এবং ফোলা। ক্ষীণবুদ্ধি এবং উন্নতবুদ্ধি লোকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম বলে ছবিটির দু'ধার ক্রমশ নীচু ও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধি ছাড়া আরও অনেক বৈশিষ্ট্যের বণ্টন এই ছবিটির আকার অনুসরণ করে বলে এই

ছবিটিকে স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র (Normal Distribution Curve) বলা হয়। দৈর্ঘ্য, জন্মহার প্রভৃতি অনেক মানবীয় বৈশিষ্ট্যের বণ্টনও এই চিত্রের মত।

ক্ষীণবুদ্ধি (Feebleminded)

আগের পাতার ছবি অনুযায়ী প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ২০ জনেরই বুদ্ধি সাধারণ বুদ্ধির মানের চেয়ে কম। অর্থাৎ বুদ্ধ্যঙ্কের হিসাবে তাদের ৯০'র কম বুদ্ধ্যঙ্ক। এদের বলা হয় ক্ষীণবুদ্ধি (Feebleminded)। এদের মধ্যে আবার শতকরা ১৪ জন ক্ষীণবুদ্ধি হলেও মোটামুটি জীবনধারণের মত বুদ্ধি তাদের আছে। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০ থেকে ৯০'র মধ্যে। এদের আমরা স্বল্পবুদ্ধি (Moron) বলতে পারি। এরা কোন চিন্তামূলক কাজ করতে পারে না এবং লেখাপড়াতে বেশীদূর এগোনও এদের পক্ষে সম্ভব হয় না। খুব ঘসামাজা করলে বড জোর তারা স্কুল ফাইনালের বেড়াটা ডিঙোতে পারে। কিন্তু যত্ন নিয়ে শেখালে এরা হাতের কাজকর্ম ভালই শেখে। সহজ যন্ত্রপাতির কাজ, বেতের কাজ, বোনা, সেলাই ইত্যাদি কাজ শিখে সকল সমাজেই অনেক স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তি সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে জীবন যাপন করে।

এর চেয়ে নীচের ধাপে যারা, তাদের বলা হয় বোধহীন (Imbecile)। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৬০ থেকে ৮০'র মধ্যে। এরা রীতিমত বোকা। লেখাপড়া করা দূরে থাকুক ভাল করে নিজেদের মনের ভাবটিও এরা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না। চেষ্টা করলে মোটামুটি বইটা পড়া, নামটা সই করা ইত্যাদি কাজগুলি এদের দ্বারা সম্ভব হতে পারে। এরা নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে কোন কাজ করতে পারে না, তবে শিক্ষা পেলে সহজ কাজ এরাও শিখতে পারে। এদের সংখ্যা আনুমানিক শতকরা ৫ জন।

সবচেয়ে শেষ ধাপে আছে জড় (Idiot)। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৬০'রও নীচে। এদের সম্বন্ধে লেখাপড়ার কথা ওঠে না। এরা ভাল করে কথা বলতে পারে না, বললেও বোঝে না। এদের পক্ষে একা একা চলাফেরা করা বিপজ্জনক। নিজেদের ভালমন্দও এরা বুঝতে পারে না। অনেক চেষ্টা করলে এদের ছোটখাট কাজ করতে শেখান যায়। সংখ্যায় এরা শতকরা একজন।

ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষা

প্রকৃতির অবহেলিত এই ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব আজকাল সকল সভ্য মানব-সমাজই স্বীকার করে নিয়েছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে বা প্রচলিত পদ্ধতিতে এদের

শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। স্বল্পবুদ্ধি (Moron) ছেলেমেয়েদের সাধারণ স্কুলে পড়ানো চললেও তাদের জন্য পৃথক শ্রেণীবিভাগ এবং বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হয়। বোধহীন (Imbecile) এবং জড় (Idiot) ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা বর্তমানে সব সভ্য দেশেই আছে। এই বিশেষ শিক্ষালয়গুলিতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষসাধনের জন্য বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির উন্নতির দ্বারা এদের বুদ্ধির অভাব মেটানোর চেষ্টা করা হয়। প্রসিদ্ধ ফরাসী মনোবিজ্ঞানী ইটরাড এবং সেগুঁই প্রথম ক্ষীণবুদ্ধিদের জন্য এই ধরনের বিশেষধর্মী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁদের বিদ্যালয়ে ক্ষীণবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের বিশেষ চর্চা এবং অনুশীলনের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তার ফলে তাদের সাধারণ কর্মদক্ষতা অনেক বৃদ্ধি পেত। ইটরাড ও সেগুঁইর প্রদর্শিত পথে আজকাল ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় নানা দেশে গঠিত হয়েছে।

ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধ-প্রবণতার একটি নিকট সম্পর্ক পাওয়া গেছে। কিশোর বয়সে যে সব ছেলেমেয়ে দুষ্কৃতিপরায়ণ হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে দেখা গেছে অনেকেই নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন। পরিণতবয়স্ক অপরাধীদের পরীক্ষা করেও দেখা গেছে যে তাদের মধ্যেও নিম্নবুদ্ধির সংখ্যা বেশ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধি স্বল্প থাকার ফলে এসব ব্যক্তির বিচারকরণের ক্ষমতা কম থাকে এবং তার ফলে ভবিষ্যৎ কর্মের গুরুত্ব তারা বুঝতে পারে না। এইজন্য তারা সহজেই প্রলোভনে ভুলে যায় এবং যে সব কাজকে সাধারণ সমাজে অপরাধ বা অন্যায় বলে মনে করা হয় সে সব কাজ করতে তারা ইতস্তত করে না।

উন্নতবুদ্ধি (Gifted Children)

নিম্নবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের মত উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদেরও বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১১০ থেকে ১২০'র মধ্যে তারা বুদ্ধির দিক দিয়ে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে এক ধাপ উপরে। ক্লাশে বা বাড়ীতে যাদের সাধারণত আমরা চালাক বা বুদ্ধিমান আখ্যা দিয়ে থাকি তারাই এই পর্যায়ে পড়ে।

এর উপরের ধাপে পড়ে প্রতিভাবানের দল। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০ থেকে ১৪০'র মধ্যে। আচারে ব্যবহারে লেখাপড়ায় এদের স্পষ্টই সাধারণ ছেলেমেয়েদের থেকে বেশ পৃথক বলে মনে হয়। ১৪০'র উপর যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তাদের সংখ্যা খুবই কম। এদের অতিমানবের পর্যায়ে ফেলা চলতে পারে।

এদের মানসিক শক্তি অপরিমিত এবং উপলব্ধি, বিচারকরণ, সমস্যা-সমাধান প্রভৃতি উন্নত ধরনের কাজে এদের দক্ষতা অনন্যসাধারণ। মানবজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে নতুন চিন্তা ও ভাবের জন্মদাতা এরাই হয়ে থাকে।

উন্নতবুদ্ধি হলেই যে জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবে এমন কোন কথা নেই। পার্থিব কৃতিত্বের জন্য যেমন বুদ্ধির দরকার, তেমনই দরকার শিক্ষার এবং জ্ঞানের। কিন্তু দেখা গেছে নানা কারণে এই উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ভালভাবে হয়ে ওঠে না। প্রথমত, যে গতানুগতিক প্রথায় আমাদের স্কুল কলেজে পড়ানো হয়ে থাকে তাতে উন্নতবুদ্ধিদের প্রতি মোটেই সুবিচার করা হয় না। প্রচলিত ক্লাশগুলিতে সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন অনুযায়ীই পড়ানো হয় এবং তার ফলে উন্নতবুদ্ধিদের কাছে সে পড়ার কোন আকর্ষণ থাকে না। ক্লাশে যা পড়ানো হচ্ছে তা হয় তাদের কাছে অনেক আগেই জানা, নয় তাদের প্রয়োজনের মানের অনেক নীচে।

ফলে তারা ক্লাশ পালায়, দুষ্কর্ম বা নাশকতামূলক কাজের দিকে ঝোঁকে এবং প্রায়ই লেখাপড়াকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করতে শেখে। এই জন্যই দেখা গেছে যে স্কুলে বুদ্ধির অভীক্ষায় যারা উৎকর্ষ দেখায় তারা পরবর্তী জীবনে প্রায়ই সাধারণ সাফল্যের চেয়ে বেশী কিছু লাভ করতে পারে না।

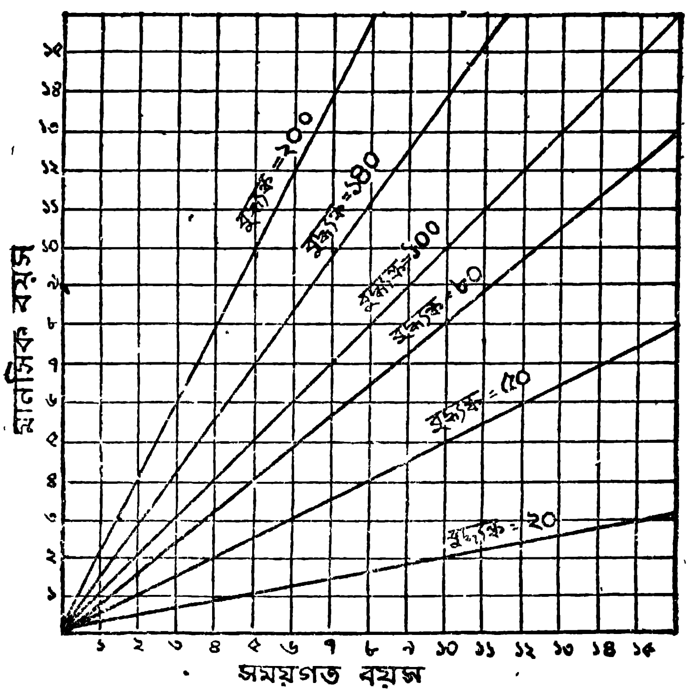
উন্নতবুদ্ধিদের শিক্ষা

এই জন্য আধুনিক যুগে উন্নতবুদ্ধিদের জন্যও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একত্রে উন্নত দ্ধিদের পড়ার ব্যবস্থা না করে পৃথকভাবে তাদের পড়ানোর পদ্ধতি আজকাল সমস্ত প্রগতিশীল স্কুলেই প্রবর্তিত হয়েছে। বর্তমান সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন এবং নবীন ভাবধারার সৃষ্টির সাহায্যে সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে হলে এই উন্নতবুদ্ধিরা যাতে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সমস্ত সমাজেরই প্রধানতম কর্তব্য। এমন কি উন্নতবুদ্ধিদের একেবারে পৃথক করে নিয়ে বিশেষ স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা কোন কোন দেশে প্রচলিত আছে। ইংলণ্ডের পাব্লিক স্কুলগুলি এই ধরনের স্কুল এবং সেগুলির অনুকরণে ভারতেও আজকাল পাব্লিক স্কুল স্থাপন করা সুরু হয়েছে। পাব্লিক স্কুলগুলির মাধ্যমে উন্নতবুদ্ধিদের শিক্ষার সমস্যাটির কিছুটা সমাধান করা গেলেও দুটি কারণে এগুলি বর্জনীয়। প্রথম, এগুলির পরিকল্পনা গণতন্ত্রের আদর্শবিরোধী, দ্বিতীয়, উন্নতবুদ্ধিদের সাধারণ ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে একেবারে পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়ার ফলে তাদের মধ্যে অনুচিত

শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও অসামাজিক মনোভাব সৃষ্টি করা হয়। সেই জন্য এর চেয়ে নির্দোষ পন্থা হল একই স্কুলে সকলকে রেখে বুদ্ধির মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের শ্রেণী-বিভাগ করে সেইমত তাদের শিক্ষা দেওয়া। এই নীতির অনুকরণে ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ত্রি-ধারা পন্থায় (Three-stream system) শিক্ষাদানের প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে।

বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্ত্তনীয়তা (Constancy of I. Q.)

সাধারণভাবে কোন ব্যক্তির বুদ্ধ্যঙ্ককে অপরিবর্তনীয় বলা হয়। অনেকের ধারণা যে ছেলেবেলায় কেউ বোকা থাকলে পরে বুদ্ধিমান হতে পারে বা ছেলেবেলায় যাকে বুদ্ধিমান বলে মনে হয়েছে বড় হলে সে বোকা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অসংখ্য পরীক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে এ ধারণা ভুল। বোকা ছেলে বড় হলে বোকাই থাকে। বুদ্ধিমান ছেলে বড় হলে বোকা হয়ে যায় না।



(বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা)

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বাড়লেও (বুদ্ধির এই বৃদ্ধি আনুমানিক ১৫ বৎসরেই শেষ হয়ে যায়), তার বয়স এবং বুদ্ধির বিকাশের মধ্যে অনুপাত একই থাকে। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তার বুদ্ধ্যঙ্ক বদলায় না।

আমরা আগেই দেখেছি যে বুদ্ধির বৃদ্ধি সকলের সমান নয়। বুদ্ধির অভীক্ষার প্রয়োগ করলে একটি ছেলের বিভিন্ন বয়সে বুদ্ধির মান নানা রকমের পাওয়া যাবে। কিন্তু তার মানসিক বয়স এবং সময়গত বয়সের মধ্যে অনুপাত সব সময়ে একই থাকবে এবং তার বয়স এবং বুদ্ধি বাড়লেও বুদ্ধ্যঙ্ক বাড়বে না বা বদলাবে না। আগের পাতার ছবি থেকে এ ব্যাপারটির একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যাবে।

যদিও মোটামুটিভাবে বুদ্ধ্যঙ্ককে অপরিবর্তনীয় বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, তবুও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে পরিবর্তনও দেখা গেছে। কতকগুলি গবেষণায় বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করে বুদ্ধ্যঙ্ককে বাড়াবার চেষ্টা করা হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যঙ্কের কিছুটা উন্নতিও দেখা গেছে। কিন্তু বুদ্ধ্যঙ্কের এই পরিবর্তন সব সময়ে বা সব ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তবে আধুনিক বহু মনোবিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন যে পরিবেশের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বুদ্ধ্যঙ্কের মধ্যে পরিবর্তন আনা যায়। এই মতবাদটি এখনও সম্পূর্ণভাবে সমর্থিত হয় নি এবং সাধারণভাবে বুদ্ধ্যঙ্ককে আমরা অপরিবর্তনীয় বলেই ধরে নিতে পারি। যদি চার বছরের কোন ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক পাওয়া যায় ৭০, তবে নিশ্চিন্তভাবে এটুকু বলা চলে যে ১০ বা ১২ বৎসর বয়সেও তার বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০।৭৫'র মধ্যেই থাকবে, ১০০ বা তার বেশী হবে না।

6. Analyse the concept of intelligence. How can you measure intelligence? Discuss the practical uses of such measurement.

Ans. (পৃঃ ৭৬—পৃঃ ৮০ + পৃঃ ৮৭—পৃঃ ১০৫)

7. What are intelligence tests? How do they differ from scholastic tests? Discuss their respective functions with illustration.

Ans. (পৃঃ ৮৭—পৃঃ ১০৫)

8. What is intelligence test? Why are some psychologists in favour of using the name 'Scholastic Aptitude Test's instead of Intelligence Test?

Ans. (পৃঃ ৮৭—পৃঃ ৯১)

[বিনে-সাইমন স্কেল এবং ঐ স্কেলের অনুসরণে গঠিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিতে ভাষামূলক দক্ষতা ও অর্জিত জ্ঞানের বহুল ব্যবহার করা হয় বলে অনেকে এই অভীক্ষাগুলিকে 'বিদ্যাবত্তার দক্ষতার অভীক্ষা' নাম দিয়েছেন। তাঁদের মতে এই অভীক্ষাগুলির দ্বারা শিশুর পুঁথিগত বিদ্যা আহরণের দক্ষতা কতটা আছে তারই পরিমাপ করা হয়, প্রকৃত বুদ্ধির পরিমাপ করা হয় না। বস্তুত এই ধরনের অভীক্ষাগুলির সঙ্গে স্কুল কলেজের সাফল্যের সহপরিবর্তনেরও উচ্চমান (·৬) পাওয়া যায় এবং সেই জন্য বর্তমানে বহুদেশে শিক্ষার্থীর সাহিত্যধর্মী পাঠস্তরে প্রবেশের যোগ্যতার বিচার করা হয় এই ধরনের অভীক্ষার ফলাফলের দ্বারা।

বিনে-সাইমন স্কেল এবং অনুরূপ ভাষামূলক বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে একথা অনেকখানি সত্য হলেও ভাষাবর্জিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি সম্পর্কে একথা বলা চলে না। উদাহরণস্বরূপ আর্মি-বিটা অভীক্ষা বা ঐ ধরনের অন্য কোন ভাষাবর্জিত অভীক্ষাকে কখনই বিদ্যাবত্তার দক্ষতার অভীক্ষা বলা চলবে না। তেমনই গুড্‌এনাফের মানুষ আঁকার অভীক্ষাটি সম্বন্ধেও একথা বলা যাবে না।]

9. Is I. Q. constant? Give reasons for your answer.

Ans. (পৃঃ ১০৯—পৃঃ ১১১)

10. Discuss the nature of intelligence in the light of the various theories. Describe any specific intelligence test and show how it is useful.

Ans. (পৃঃ ৭৬—পৃঃ ৮০ + পৃঃ ৮৭—পৃঃ ১০৫)

11. Explain in detail the nature of intelligence and indicate the uses of intelligence tests.

Ans. (পৃঃ ৭৬—পৃঃ ৮০ + পৃঃ ১০৩—পৃঃ ১০৫)

12. Define intelligence and discuss the importance of intelligence tests in child-guidance and class-teaching.

Ans. (পৃঃ ৭৬—পৃঃ ৮০ + পৃঃ ১০৩—পৃঃ ১০৫)

13. Describe any test of intelligence that you are familiar with and indicate the use of intelligence tests in school.

Ans. (পৃঃ ৭৮—পৃঃ ১০৫)

14. What are intelligence tests? Show your acquaintance with any one of them.

Ans. (পৃঃ ৮৭—পৃঃ ৯১)

আট

স্মৃতি ও বিস্মৃতি (Memory & Forgetting)

'মনে করতে পারা'টা প্রাণীমাত্রেরই সহজাত বৈশিষ্ট্য। সকল প্রাণীই পূর্বে শেখা বিষয়বস্তু অল্পবিস্তর মনে করতে পারে। আমাদের এই শক্তিটিই সাধারণ ভাষায় স্মৃতি নামে পরিচিত।

স্মৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা

স্মৃতি বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায় তা নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে বহু জল্পনা-কল্পনা চলে এসেছে এবং বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী স্মৃতির বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে এসেছেন। কারও মতে স্মৃতি একটা মানসিক শক্তি, কারও মতে স্মৃতি একটি মনের কাজ, আবার কেউ কেউ স্মৃতিকে কল্পনা করেছিলেন এমন একটি ভাণ্ডার বা আধার রূপে যেখানে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার ছাপ বা প্রতীকগুলিকে জমিয়ে রাখি। এই ধারণাগুলির মধ্যে স্মৃতির শক্তিতত্ত্বটিই প্রাচীনকালে সব চেয়ে বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা কল্পনা করতেন যে মন কতকগুলি শক্তির সমষ্টি। যেমন, চিন্তা করা, কল্পনা করা, বিচার করা, মনোযোগ দেওয়া প্রভৃতি হল মনের এক একটি বিশিষ্ট ও সুনির্দিষ্ট শক্তি। নিয়মিত চর্চার ফলে এগুলি শক্তিশালী হয় এবং চর্চার অভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাঁদের মতে স্মৃতিও এই ধরনের একটি মানসিক শক্তি। এই মনোবিজ্ঞানীদের শক্তিবাদী (Faculty Psychologist) নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক গবেষণার ফলে মনের এই শক্তিবাদ তত্ত্বটি পরিত্যক্ত হয়েছে।

অবশ্য আধুনিক উপাদান বিশ্লেষকগণও (Factor Analysts) অনেকটা প্রাচীন শক্তিবাদীদের মতই মনের কতকগুলি শক্তির কল্পনা করেছেন। থার্স্টোনের মতে মনের সাতটি মৌলিক শক্তি আছে এবং স্মৃতি (Memory) সেই সাতটি শক্তির অন্যতম।[১] কিন্তু আধুনিককালের এই মানসিক শক্তির পরিকল্পনা প্রাচীন শক্তির পরিকল্পনা থেকে অনেক পৃথক। সুনির্দিষ্ট মানসিক শক্তি বলতে যা বোঝায় অধুনা কল্পিত মানসিক সত্তাগুলি ঠিক সে রকম নয়। প্রথমত, এগুলিকে এক ধরনের মানসিক উপাদান (Factor) বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং ধরে নেওয়া হয়েছে যে এগুলি আমাদের বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার পেছনে থাকে এবং ঐ মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন হতে সাহায্য

১। পৃ: ৮৪

করে। দ্বিতীয়ত, এগুলির অস্তিত্ব নিরূপণ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে সহপরিবর্তন (Correlation) নির্ণয়ের জটিল গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে।

স্মৃতির আধুনিক সংব্যাখ্যান

প্রকৃতপক্ষে স্মৃতি হল একটি মানসিক প্রক্রিয়া। আরও নিখুঁতভাবে বলতে গেলে স্মৃতি একটি মাত্র মানসিক প্রক্রিয়া নয়, তিনটি স্বতন্ত্র মানসিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি। যথা, শিখন (Learning), সংরক্ষণ (Retaining) এবং স্মরণ (Remembering)।

স্মৃতির প্রথম ধাপে আসে শিখন। যা শেখা হয়নি তা মনে রাখার কথা ওঠে না। অতএব শিখন হল স্মৃতির অপরিহার্য প্রারম্ভিক সোপান।

স্মৃতির দ্বিতীয় ধাপে আসে শেখা বস্তুটির সংরক্ষণ করা বা মনে রাখা। আমরা যেটি শিখলাম সেটিকে আমরা এই ধাপে মনের মধ্যে ধরে রাখি। এই প্রক্রিয়াটি স্মৃতির সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ স্তর। শেখা বস্তুটিকে কি ভাবে মনের মধ্যে ধরে রাখা হয় তার নিখুঁত ব্যাখ্যা দেওয়া এখনও সম্ভব হয় নি। তবে শেখা বস্তুটির একটি বিশেষ প্রতীক (Symbol) যে আমাদের মস্তিষ্কের কোষে কোনভাবে আমরা সংরক্ষিত করি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের মতে স্মৃতির অংশগুলি পৃথক পৃথকভাবে মস্তিষ্কের কোন একটি কুঠরিতে জমা থাকে এবং দরকার পড়লে সেগুলিকে সেই গুপ্ত আশ্রয় থেকে টেনে বার করে আনা হয়। তাছাড়া স্মৃতির এই বিভিন্ন অংশগুলি অপরিবর্তিত অবস্থাতেই চিরকাল নিজেদের নির্দিষ্ট সত্তা বজায় রেখে আসে, যদিও সময়ের অতিক্রান্তিতে তারা ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে স্মৃতির এ ব্যাখ্যা একান্ত ভুল।

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী মুলার (Muller) স্মৃতির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তাঁর বহু প্রচলিত স্মৃতিছাপের (Memory trace) তত্ত্বটি উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর এই তত্ত্ব অনুযায়ী মস্তিষ্কের কোষে আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুগুলি কতকগুলি ছাপরূপে সংরক্ষিত হয়। এই ছাপগুলিকে অনেকটা ক্যামেরার প্লেটে বা ফিল্মে সংরক্ষিত ছবির সঙ্গে তুলনা করা যায়। একটি ফোটো প্লেট বা ফিল্ম যেমন একটি ত্রি-আয়তন বস্তুর দ্বি-আয়তন ছবি ধরে রাখতে পারে তেমনই আমাদের মস্তিষ্কও সব রকম বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই ছাপরূপে ধরে রাখতে পারে। যখন কোন বস্তু মনে করার প্রয়োজন হয় তখন আমরা সেই বস্তুটির ছাপগুলিকে জাগিয়ে তুলি এবং সেগুলির সাহায্যেই আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতাটির পুনঃসৃষ্টি করি।

কিন্তু নানা সাম্প্রতিক পরীক্ষণ থেকে মুলারের এই স্মৃতিছাপের তত্ত্বটি ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিক সংব্যাখ্যানে মস্তিষ্কে যা সংরক্ষিত হয় তা কোন বিশেষ নির্দিষ্ট সত্তাসম্পন্ন পৃথক বস্তু নয়। অর্থাৎ প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের কল্পিত স্মৃতির অংশ বা মুলারের পরিকল্পিত স্মৃতিছাপ বলে নির্দিষ্ট সত্তাসম্পন্ন কোন বস্তু মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয় না। সত্যকার মস্তিষ্কে যা সংরক্ষিত হয় তা হল মস্তিষ্কের একটি বিশেষ সংগঠন (Brain structure)। অর্থাৎ যখন কোন বিষয়-বস্তু আমরা শিখি সেটি কারোও টেলিফোন নাম্বারই হোক্, আর আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক-তত্ত্বই হোক্, তখনই আমাদের মস্তিষ্কের একটি গঠনমূলক পরিবর্তন ঘটে। এখন ঐ বিশেষ শেখা বস্তুটি মনে রাখার অর্থ হল মস্তিষ্কের ঐ পরিবর্তিত সংগঠনটি সংরক্ষিত করা। হোয়াগল্যাণ্ড (Hoagland) মস্তিষ্কের এই সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে তারযন্ত্রের বার্তাগ্রহণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একটি তারে যখন কোন সংবাদ সংরক্ষিত হয় তখন ঐ তারের পরমাণুগুলির মধ্যে বিশেষ একটি সংগঠনমূলক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। তারের সেই পারমাণবিক পরিবর্তনের রূপে সংবাদটিকে ধরে রাখা হয় এবং দরকার পড়লে সেটিকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। মস্তিষ্কেরও এইরকম সংগঠনঘটিত পরিবর্তনের রূপে আমরা শেখা বস্তুটিকে সংরক্ষিত করে থাকি। হোয়াগল্যাণ্ডের এই ব্যাখ্যাটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এটিকে মস্তিষ্কের সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার আধুনিক মতবাদরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তৃতীয় বা শেষ ধাপে ঘটে এই মস্তিষ্কে সংরক্ষিত বস্তুটিকে স্মরণ করার কাজটি। অর্থাৎ যেটি আমরা মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করেছি সেটিকে দরকার মত আমরা বাইরে প্রকাশ বা অভিব্যক্ত করি। হোয়াগল্যাণ্ডের ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে বলতে হয় যে যখন আমরা কিছু স্মরণ করি তখন আমাদের মস্তিষ্কের সংগঠনের মধ্যে আবার একটি নতুন পরিবর্তন সংঘটিত হয়! অতএব দেখা যাচ্ছে যে যাকে আমরা সচরাচর স্মৃতি বলে থাকি তার প্রক্রিয়াটি হল নিম্নরূপ—

শিখন >>> সংরক্ষণ >>> স্মরণ

[LEARNING >> RETAINING >> REMEMBERING]

স্মরণ-প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা আবার দুটি বিভিন্ন শ্রেণীর স্মরণের সন্ধান পাই। প্রথম, মনে করা (Recalling) এবং দ্বিতীয়, চেনা (Recognising)।

মনে করা (Recall) ও চেনা (Recognition)

এই দুটি প্রক্রিয়ার দ্বারা আমরা স্মরণের কাজ সম্পন্ন করলেও প্রকৃতির দিক

দিয়ে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। যখন আমরা পূর্বে জানা কোন নাম বা সাল বা ঘটনা মনে জাগানোর চেষ্টা করি তখন আমাদের স্মরণ প্রক্রিয়াটিকে 'মনে করা' নাম দিই। এখানে আমাদের মনে করার কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য একটি উদ্দীপক থাকে বটে এবং সেটির সঙ্গে প্রকৃত বস্তুটির যোগাযোগ থাকলেও সেটি একটি পৃথক বস্তু। কিন্তু 'চেনা'র ক্ষেত্রে প্রকৃত মনে করার বস্তুটিকেই ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং সেটি ঠিক সেই বস্তুটি কিনা তাই চিনতে বলা হয়।

মনে করার দৃষ্টান্ত : ইংরাজী বর্ণমালার L'র পর কোন্ বর্ণটি আসে ?

চেনার দৃষ্টান্ত : P, O, S, B, M, A—এগুলির মধ্যে কোন্‌টিকে এম্' বলা হয় ?

মনে করা (Recall)

অতএব মনে করা বলতে বোঝাচ্ছে সেই মানসিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা পূর্বে শেখা যে কোন বস্তু মনে জাগিয়ে তোলা হয়। এই ধরনের মনে করা বস্তু নানা শ্রেণীর হতে পারে, যেমন,

১। কোন তালিকা, পদ, তথ্য বা উপাদান যা আমরা পূর্বে শিখেছিলাম এখন সেগুলিকে ইচ্ছা করে মনে করছি।

২। কোন পূর্বে শেখা কাজ সম্পন্ন করা। এও এক ধরনের মনে করা।

৩। ইন্দ্রিয়জাত প্রতিরূপগুলিকে জাগিয়ে তোলা।

৪। ইচ্ছা না থাকলেও যে সব কথা বা ধারণা মনে এসে যায়।

৫। কোন একটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য যখন স্বেচ্ছায় কোন একটি বিশেষ বিষয় মনে করা হয়। যেমন, একটি বাক্য পড়তে গিয়ে তার অর্থটি মনে করার চেষ্টা করা।

৬। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে চিন্তন বা যাকে আমরা বিচারকরণ বলি।

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ মনে করা (Direct & Indirect Recall)

'মনে করা'কে আবার দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ। যখন একটি বস্তু থেকে আমাদের স্মরণ সরাসরি ঈপ্সিত বস্তুটিতে যায় তখন সেই মনে করাকে প্রত্যক্ষ মনে করা বলা হয়। আর যখন মনে করা কাজটি অন্য এক বা একাধিক মধ্যবর্তী বস্তুর মধ্যে দিয়ে ঈপ্সিত বস্তুতে পৌছয় তখন তাকে অপ্রত্যক্ষ মনে করা বলা যায়। যেমন, এক জনকে শেখান হল, নীচের শব্দযুগ্মগুলির মধ্যে প্রথমটি শুনলেই দ্বিতীয়টি বলবে। অর্থাৎ তার স্মৃতিতে প্রতি শব্দযুগ্মের মধ্যে একটি করে অনুষঙ্গ স্থাপন করে দেওয়া হল। যেমন—

পৃথিবী—মৃত্যু খাদ্য—সুখ মহাকাব্য—বীর ইত্যাদি।

এখন একদিন বা এক সপ্তাহ পরে শব্দযুগ্মগুলির প্রথমটি ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত করে তাকে দ্বিতীয়টি বলতে বলা হয়। যদি দেখা যায় যে ব্যক্তি সরাসরি কোন বস্তুর কথা না ভেবে প্রথম শব্দ থেকে দ্বিতীয় শব্দে যেতে পারে তা হলে তার 'মনে করা'কে প্রত্যক্ষ মনে করা বলা হয়। আর যদি প্রথম শব্দ থেকে দ্বিতীয় শব্দে যেতে মধ্যবর্তী এক বা একাধিক শব্দ বা ধারণার কথা ভেবে তাকে যেতে হয় তাহলে তার মনে করাকে অপ্রত্যক্ষ মনে করা বলা হবে। এই মধ্যবর্তী স্মৃতিগুলি কিন্তু ঈপ্সিত শব্দ না হলেও ঈপ্সিত শব্দে পৌঁছবার পক্ষে সহায়ক। যেমন কারও 'পৃথিবী' শব্দটি শুনে মনে হল 'জন্ম', কিংবা 'খাদ্য' শব্দটি শুনে মনে হল 'তৃপ্তি', কিংবা 'মহাকাব্য' শব্দটি শুনে মনে হল 'যুদ্ধ'। পরে এই মধ্যবর্তী শব্দ বা ধারণাগুলিই অভীক্ষার্থীকে প্রকৃত শব্দগুলিতে পৌঁছতে সাহায্য করে। যেমন, সে 'জন্ম' থেকে 'মৃত্যু'তে, 'তৃপ্তি' থেকে 'সুখে', 'যুদ্ধ' থেকে 'বীর' এ যেতে পারে।

মনে করার গতি

মিচোটে (Michotte) এবং পর্টিক (Portych) শেখা বস্তু মনে করতে কত সময় লাগে তার পরীক্ষণ করেছিলেন। তাঁদের পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে যদি প্রশ্ন করা হয়—

শেখার ঠিক পরেই	তবে ১.৫ সেঃ পরে	নির্ভুল উত্তর পাওয়া যায়।
শেখার একদিন পরে	তবে ২.৪ সেঃ পরে	নির্ভুল উত্তর পাওয়া যায়।
শেখার এক সপ্তাহ পরে	তবে ৩.০ সেঃ পরে	নির্ভুল উত্তর পাওয়া যায়।

আংশিক বা অসম্পূর্ণ স্মরণ

অনেক সময় দেখা যায় কোন বিশেষ নাম বা তারিখ বা নম্বর মনে আসি আসি করেও আসছে না। তখন বুঝতে হবে যে বস্তুটি সম্পূর্ণ মনে পড়ে নি বা আংশিক মনে পড়েছে। সে সময়ে কোন রকমের একটা ধাক্কা বা ঝাঁকুনি পেলেই হঠাৎ সেটা মনে পড়ে যেতে পারে। অনেক সময় দেখা গেছে যে এই ধরনের আংশিক বা অসম্পূর্ণ স্মরণের ক্ষেত্রে কোনভাবে ঈপ্সিত নাম বা কথাটির একটি অংশ বা অস্পষ্ট মিলসম্পন্ন কিছু দেখলে বা শুনলেও ব্যক্তির পূর্ণ স্মরণ এসে যায়।

প্রতিরূপ ও স্মরণ

স্মরণের একটি বড় উপাদান হল প্রতিরূপ। প্রতিরূপ প্রত্যক্ষিত বস্তুর অস্পষ্ট ছবিমাত্র। শব্দতালিকা বা লিখিত পদ্যাংশ, গদ্যাংশ ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষণ চালান সম্ভবপর কিন্তু প্রতিরূপের সদাপরিবর্তনশীল প্রকৃতির জন্য

প্রতিরূপ নিয়ে পরীক্ষণ চালান বেশ দুরূহ। তবু প্রতিরূপ নিয়ে স্মরণের উপর বহু পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।

চেনা (Recognition)

'মনে করা'র বিষয়বস্তু যত ব্যাপক, 'চেনা'র বিষয়বস্তু তত ব্যাপক হতে পারে না। চেনা কথাটি প্রযোজ্য কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর ক্ষেত্রে। চেনা কাজটি মনে করা কাজের চেয়ে ইন্দ্রিয়ের উপর অনেক বেশী নির্ভরশীল। কেননা চেনা কাজটি সম্পন্ন করতে কোন না কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লাগেই। কোন কিছু দেখে বা শুনে বা স্পর্শ করে বা গন্ধ শুঁকে বা আস্বাদ নিয়েই আমরা বলতে পারি যে বস্তুটি আমরা চিনি কি না।

মনে করা এবং চেনার মধ্যে সংগঠনমূলক পার্থক্য হচ্ছে যে মনে করায় ঈপ্সিত বস্তুটি দেওয়া থাকে না, খুঁজে নিতে হয়, চেনাতে বস্তুটি দেওয়া থাকে সেটি সেই বস্তু কিনা তাই বলতে হয়। মনে করার ক্ষেত্রে 'ক'কে উপস্থাপিত করে 'খ'কে মনে করতে বলা হয়, যেমন বাবরের নাম করে বলা হল তার ছেলে কে বল? কিন্তু চেনার ক্ষেত্রে 'ক'টি দেওয়াই থাকে এবং ঐটিকেই চিনতে বলা হয়। যেমন, আরও দশটা ছবির মধ্যে বাবরের ছবি রেখে বলা হল, বলত এর মধ্যে বাবর কে? স্পষ্টতই 'চেনা' কাজটি 'মনে করার' চেয়ে অনেক সহজ। ২৫টি অর্থহীন শব্দতালিকা একবার ৯৬ জন অভীক্ষার্থীকে পরিবেশন করে মনে করা ও চেনা—এই দু'টি পদ্ধতিতে তাদের স্মৃতির পরীক্ষা করা হল। দেখা গেল যে মনে করার প্রক্রিয়ার দ্বারা নির্ভুল মনে করতে পারল ১২ জন, চেনা প্রক্রিয়ার দ্বারা নির্ভুল মনে করল ৪২ জন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে চেনা প্রক্রিয়াটি মনে করা প্রক্রিয়ার চেয়ে অধিকতর সহজসাধ্য।

চেনা কাজটি ভুল হতে পারে যদি উপস্থাপিত উদ্দীপকটির সঙ্গে প্রকৃত উদ্দীপকটির আংশিক মিল থাকে। এই আংশিক মিলের মাত্রা যত বেশী হবে ততই ভুল চেনার হার বাড়বে।

উদাহরণস্বরূপ যদি প্রশ্ন করা যায়, নীচের সালগুলির মধ্যে কোনটি গান্ধীজীর ডাণ্ডী অভিযানের সাল?

১৯০৩ ১৯৩০ ১৯৪৭ ১৯৩৯

এখানে প্রকৃত উত্তর হল ১৯০৩। কিন্তু প্রদত্ত সংখ্যাগুলির মধ্যে নিছক আকৃতিগত মিল থাকায় অনেকেই ১৯৩০ বা ১৯৩৯ উত্তররূপে বলতে পারে। অবশ্য যদি পূর্বশিখন অতিদৃঢ় হয় তাহলে এই মিল থাকা সত্ত্বেও চেনা-ভুল না হতে পারে।

স্মৃতি ও শিখন

শিখনের সঙ্গে স্মৃতির সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। স্মৃতি ছাড়া কোন শেখাই স্থায়ী হয় না। যে ছেলে হামাগুড়ি দিতে শিখল বা যে ছাত্র লিখতে শিখল বা যে কুকুর মুখে করে লাঠিটা আনতে শিখলো, তারা যদি সেই শেখাটা মনে রাখতে না পারে তা হলে পরের দিন আবার প্রথম থেকে শেখা সুরু করতে হবে। ফলে কোনদিনই তাদের কোন শেখা এগোবে না। অতএব স্মৃতিকে শেখার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে বর্ণনা করা যায়। শিক্ষার অগ্রগতির প্রধান সোপানই হল স্মৃতি।

শেখার বিষয়বস্তুকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়—সঞ্চালনমূলক (Motor) এবং ভাষামূলক (Verbal)। ভাষামূলক বস্তুর মত সঞ্চালনমূলক অভিজ্ঞতাগুলিকেও আমরা মনে রেখে থাকি ; যেমন রান্না করা, সাইকেল চড়া, সাঁতার কাটা. এ সব কাজও আমরা স্মৃতি থেকে সম্পন্ন করে থাকি। বার বার সম্পন্ন করলে অনেক সঞ্চালনমূলক কাজই আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। অবশ্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশ কাজই সঞ্চালনমূলক এবং ভাষামূলক দু'শ্রেণীর কাজের মিশ্রণ।

স্মৃতি এক না বহু ? (Is Memory One or Many ?)

এটি সুপ্রমাণিত সত্য যে স্মৃতি একটি বিশেষ শক্তি নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার প্রভাব অনুযায়ী মস্তিষ্কের বিশেষ সংগঠনধারণের প্রক্রিয়া মাত্র। অতএব এই প্রক্রিয়াটি সর্বক্ষেত্রে যে একইভাবে কাজ করবে তার কোন অর্থ নেই। কোন বিশেষ শিক্ষার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ প্রক্রিয়া কখনও ভাল হয়, আবার কখনও কখনও আশানুরূপ হয় না। যেমন, কারও পক্ষে ইতিহাস মনে রাখা সম্ভব হয়, কিন্তু অঙ্ক মনে রাখা শক্ত হয়। প্রায় সকলের ক্ষেত্রেই কাহিনী, আলোচনা প্রভৃতি অর্থসম্পন্ন বিষয়গুলি মনে রাখতে কষ্ট হয় না, কিন্তু ইতিহাসের সাল, বাড়ীর নম্বর প্রভৃতি অর্থহীন বিষয়গুলি মনে রাখা শক্ত হয়। আবার চোখে দেখা জিনিস অনেক বেশী মনে থাকে, কানে শোনা বা বইতে পড়া জিনিসের চেয়ে। এসব কারণে বলা হয় যে স্মৃতি একটি নয়, স্মৃতি বহু। স্মৃতি-গত এই বৈষম্যের কারণ কিন্তু এ নয় যে মস্তিষ্কে এই সংরক্ষণের প্রক্রিয়াটি ক্ষেত্র ভেদে কম হয় বা বেশী হয়। আসলে এই বৈষম্য নির্ভর করে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রকৃতি ও শিখন পদ্ধতির উপর। কতকগুলি বিষয় সহজেই মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করে ও মস্তিষ্কের সংগঠনে ঈপ্সিত পরিবর্তন আনতে পারে,

আবার কতকগুলি বিষয় তা পারে না। শিখনের পদ্ধতি সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। অর্থাৎ কোন কোন পদ্ধতিতে শিখলে সংরক্ষণ ভাল হয় আবার কোন কোন পদ্ধতিতে শিখলে সংরক্ষণ দুর্বল হয়।

বার্গসঁর শ্রেণীবিভাগ : অভ্যাস স্মৃতি ও প্রতিরূপ স্মৃতি

স্মৃতির এই বৈশিষ্ট্যের জন্য নানা চিন্তাবিদ্ স্মৃতির নানা শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক বার্গসঁর (Bergson) মতে স্মৃতি দু'প্রকারের, অভ্যাস স্মৃতি (Habit Memory) ও প্রতিরূপ স্মৃতি (Image Memory)।

কোন শিক্ষণীয় বস্তুর বার বার চর্চা বা অনুশীলনের ফলে যখন সেটি অভ্যাসে পরিণত হয়, তখন সেই বস্তুটি মনে করাকে অভ্যাস স্মৃতি বলা চলে। এই ধরনের স্মৃতির মধ্যে কোনরূপ ইচ্ছামূলক প্রচেষ্টা থাকে না এবং এটি পরিপূর্ণ যান্ত্রিক প্রকৃতির। কোন ছেলে যখন নামতা মুখস্থ বলে বা ভাল করে শেখা কোন কবিতা আবৃত্তি করে তখন সে তা সম্পূর্ণ অভ্যাস থেকেই করে থাকে। তার শেখা বিষয়বস্তুটির অংশগুলি তার মনে পরস্পরের সঙ্গে শৃঙ্খলের মত বাঁধা থাকে এবং প্রথমটি মনে পড়লেই একটির পর একটি বাকিগুলি নিজে নিজে মনে এসে যায়। এই ধরনের মনে করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে কোনরূপ প্রচেষ্টা করতে হয় না। এই স্মৃতিকে যান্ত্রিক স্মৃতিও (Rote Memory) বলা হয়।

বার্গসঁ'র মতে অভ্যাস স্মৃতির ঠিক বিপরীত হল প্রতিরূপ স্মৃতি (Image Memory)। এই ধরনের স্মৃতিতে স্মরণের বিষয়বস্তুটি টুকরো টুকরোভাবে ব্যক্তির মনে আসে না। তার সম্পূর্ণ প্রতিরূপটি একসঙ্গে তার মনে জেগে ওঠে। এই শ্রেণীর স্মৃতির ক্ষেত্রে সত্য সত্যই অতীতের কোন ঘটনা মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলার কাজটি সংঘটিত হয় এবং তার মধ্যে ব্যক্তির নিজস্ব প্রচেষ্টাও থাকে। এই জন্য এই স্মৃতিকে বার্গসঁ প্রকৃত স্মৃতি (True Memory) নাম দিয়েছেন। তবে কেবলমাত্র প্রতিরূপমূলক স্মৃতিকেই প্রকৃত স্মৃতি আখ্যা দেওয়া চলে না। কেননা স্মৃতির উপাদান প্রতিরূপ ছাড়াও অন্য অনেক কিছু হতে পারে। যেমন, ধারণা, ভাষা, সংখ্যা প্রভৃতিও বহুক্ষেত্রে স্মৃতির উপাদান রূপে কাজ করে থাকে।

স্মৃতির আধুনিক শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা স্মৃতির অনেকগুলি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন যথা—

যান্ত্রিক স্মৃতি (Rote Memory)

যখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির অর্থ বা তার বিভিন্ন অংশগুলির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ উপলব্ধি না করে ব্যক্তি সেটিকে মনে রাখে তখন তাকে যান্ত্রিক স্মৃতি বলে।

যেমন, নামতা বা অর্থহীন শব্দ-তালিকা বা গাড়ীর বা টেলিফোনের নম্বর ইত্যাদি মনে রাখা হল যান্ত্রিক স্মৃতির উদাহরণ।

বিচারমূলক স্মৃতি (Logical Memory)

যখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির অর্থ উপলব্ধি করে এবং বিচারশক্তির সাহায্যে তার অন্তর্নিহিত সঙ্গতি হৃদয়ঙ্গম করে ব্যক্তি সেটিকে মনে রাখে তখন তাকে বিচারমূলক স্মৃতি বলে। যেমন, একটি গদ্য বা পদ্যের অংশ পড়ে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে সেটিকে মনে রাখা হল বিচারমূলক স্মৃতির উদাহরণ। যান্ত্রিক স্মৃতির চেয়ে বিচারমূলক স্মৃতি অনেক বেশী সহজসাধ্য ও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

অনুষঙ্গমূলক স্মৃতি (Associative Memory)

যখন আমরা একটি বস্তুর সঙ্গে অপর একটি বস্তুকে এমনভাবে মনের মধ্যে সংবদ্ধ করি যাতে একটির কথা বা ছবি মনে হলে অপরটির কথা বা ছবি সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে তখন সেই স্মৃতিকে অনুষঙ্গমূলক স্মৃতি বলা হয়। কারও নাম, বাড়ীর নম্বর, টেলিফোন নম্বর ইত্যাদি মনে রাখা হয় সাধারণত এই ধরনের স্মৃতির সাহায্যে। যান্ত্রিক স্মৃতি ও অনুষঙ্গমূলক স্মৃতির মধ্যে পার্থক্য খুব বেশী নয় এবং অনেক যান্ত্রিক স্মৃতিই অনুষঙ্গমূলক। অনুষঙ্গের সাহায্যে যান্ত্রিক স্মৃতি সৃষ্টি করা এবং তাঁকে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘদিন স্থায়ী করা সম্ভব হয়। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া স্মৃতি কষ্টসাধ্য হয় এবং বেশী দিন স্থায়ী হয় না। যান্ত্রিক স্মৃতিকে স্থায়ী করতে হলে অতিরিক্ত মাত্রায় পুনরাবৃত্তি করতে হয় অর্থাৎ যাতে বিষয়টির অতি-শিখন হয় তার ব্যবস্থা করতে হয়। গাড়ির নম্বর, বাড়ির নম্বর বা ইতিহাসের সাল ইত্যাদি মুখস্থ করতে গেলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইন্দ্রিয়জাত স্মৃতি (Sensory Memory)

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা থেকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জাত স্মৃতির সৃষ্টি হয়। স্পষ্টতই দেখা যায় যে আমাদের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে স্মৃতিও তত রকমের হতে পারে। যখন চোখে দেখা কোন বস্তুর আকৃতি ও বৈশিষ্ট্যাদি আমরা মনে রাখি তখন তাকে **চাক্ষুষ** স্মৃতি বলা যায়। এই রকম **শ্রাবণ** স্মৃতি, **স্পর্শজ** স্মৃতি, **ঘ্রাণজ** স্মৃতি, **স্বাদজ** স্মৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতির ইন্দ্রিয়জাত স্মৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। কোন একটি সুর বা শব্দ, কোন বিশেষ স্পর্শ, কোন বিশেষ গন্ধ, কোন বিশেষ আস্বাদ ইত্যাদি আমরা খুবই মনে রাখতে পারি। তবে এই বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জাত স্মৃতিগুলির মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন জ্ঞান অর্জনে সবচেয়ে অধিক পরিমাণে আমরা ব্যবহার করে থাকি চাক্ষুষ

স্মৃতির। তার কারণ হল যে আমাদের জ্ঞানের বড় একটা অংশ চক্ষু ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই অর্জিত।

প্রতিরূপ (Images)

বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে সব অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি সেগুলিকে যখন আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি তখন প্রকৃতপক্ষে তার একটি প্রতীক আমরা মস্তিষ্কে সংরক্ষণ করি। এই প্রতীক নানারূপ গ্রহণ করতে পারে। তার মধ্যে সবচেয়ে স্বাভাবিক ও ব্যাপকধর্মী প্রতীকটির নাম হল প্রতিরূপ (Image)। প্রায়ই দেখা যায় যে কোন কিছু পূর্বে দেখা, শোনা, স্পর্শ করা, আঘ্রাণ নেওয়া বা আস্বাদন গ্রহণ করার অভিজ্ঞতা মনে করার চেষ্টা করলে তার একটি অস্পষ্ট ছবি আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একেই প্রতিরূপ বলে। প্রতিরূপ হল ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতার একটি মানসিক ছবি। বলা বাহুল্য আমাদের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে প্রতিরূপও তত প্রকারের হতে পারে।

তবে প্রতিরূপই একমাত্র স্মৃতির উপাদান নয়। আমরা যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষণ (Perception) করি, সেগুলি প্রতিরূপ ছাড়াও অন্যান্য প্রতীকের সাহায্যে আমাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হতে পারে। ভাষা, ধারণা (Concept), সংখ্যা ইত্যাদিও আমাদের স্মৃতির উপাদান হতে পারে। তাছাড়া কোন কাজ করার প্রক্রিয়া, দেহের বিশেষ অঙ্গের সঞ্চালন, যেমন ঝাঁকানি বা পিছলে পড়ে যাওয়া প্রভৃতি সঞ্চালনমূলক প্রক্রিয়াও আমরা মনে রাখতে পারি।

স্মৃতি, কল্পন ও চিন্তন (Memory, Imagination & Thinking)

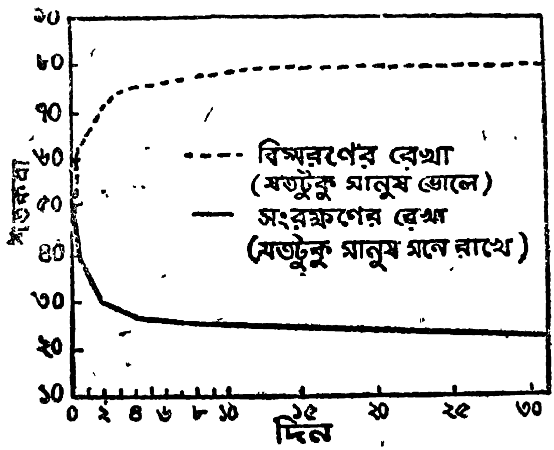
মনে করা ও কল্পনা করা উভয়ই মানসিক প্রক্রিয়া। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা আমাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত শেখা বস্তুগুলির প্রতীকগুলিকে জাগিয়ে তুলি। তবে পার্থক্যের মধ্যে মনে করার বেলায় যেমনটি আমরা শিখেছিলাম প্রতীকগুলিকে হুবহু সেভাবে মস্তিষ্কে জাগিয়ে তুলি এবং প্রতীকগুলির বিন্যাস এবং অনুক্রমে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করি না। কল্পনা করার বেলায় আমরা ঐ প্রতীকগুলিকে খুশীমত নতুনভাবে সাজাই। ফলে স্মৃতির ক্ষেত্রে জাগিয়ে তোলা প্রতীকগুলির সঙ্গে অতীতের অভিজ্ঞতার কোনও পার্থক্য থাকে না। সেগুলির বিন্যাসের ধারা এবং অনুক্রম সবই বাস্তব অভিজ্ঞতায় যেমন ছিল স্মৃতিতেও তাই থাকে, কিন্তু কল্পনের ক্ষেত্রে জাগিয়ে তোলা প্রতীকগুলি এবং আমাদের অতীতের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে কোন মিল থাকে না যেমন, ঘোড়া, পাখীর ডানা, প্যারিস, ইফেল টাওয়ার প্রভৃতির ছবি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে মনে

আনার নাম হল স্মরণ করা আর এগুলিকে ইচ্ছামত সাজিয়ে যদি মনে করা যায় যে প্যারিসের ইফেল টাওয়ারের উপর দিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে উড়ে যাচ্ছি তবে সেটি হল কল্পনা করা। এই জন্য অনেক মনোবিজ্ঞানী স্মৃতিকে পুনরাবৃত্তি-মূলক কল্পন (Reproductive Imagination) এবং প্রকৃত কল্পনাকে সৃজন-মূলক কল্পন (Productive Imagination) বলে বর্ণনা করেন। এক কথায় স্মৃতি হল পূর্ণভাবে বাস্তব-নির্ভর আর কল্পনা হল বাস্তব-বিলাসী।

প্রকৃতপক্ষে কল্পন হল চিন্তন-প্রক্রিয়ার (Thinking)[১] একটি বিশেষ শ্রেণী মাত্র। চিন্তন, কল্পন, বিচারকরণ এগুলির প্রত্যেকটিই এক প্রকার মানসিক আচরণ এবং প্রত্যেকটিই স্মৃতির উপর নির্ভরশীল। স্মৃতিও এক প্রকার মানসিক আচরণ, তবে এই আচরণে কোনও নূতনত্ব নেই এবং পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি-বিধানের জন্য যখন তার মধ্যে নূতনত্ব আনা হয় তখনই সেটা চিন্তনের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। যা শিখেছি তা যদি হুবহু মনে করি তখন হল স্মৃতি আর যখন শেখা প্রতীকগুলির সাহায্যে নতুন মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করি তখন সেটা হল চিন্তন, কল্পন বা বিচারকরণ।

বিস্মৃতি (Forgetting)

আলো ও অন্ধকারের মধ্যে যে সম্বন্ধ স্মৃতি ও বিস্মৃতির মধ্যে ঠিক সেই সম্বন্ধ। অর্জিত অভিজ্ঞতাকে মস্তিষ্কে সংরক্ষণের নাম হল স্মৃতি এবং সেই



[স্মরণ ও বিস্মরণের রেখা চিত্র]

১। পৃঃ ২২০ (দ্বিতীয় খণ্ড)

সংরক্ষণের অভাব হল বিস্মৃতি। কোন কিছু একবার শেখার পর যদি দেখা যায় সেটি মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয় নি তখন তাকে বিস্মৃতি বলা হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে স্মৃতি ও বিস্মৃতি মূলত একটি প্রক্রিয়া। দুটি বিভিন্ন দিক থেকে দেখার জন্য একই প্রক্রিয়ার দুটি বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে মাত্র। স্মৃতি ও বিস্মৃতির মধ্যে সম্পর্কটি পূর্ব-পৃষ্ঠার ছবি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে।

পূর্ব পৃষ্ঠার ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে যদি কেউ দু'দিনে ৩০% মনে রাখে, তবে দু'দিনে সে ৭০% ভোলে, তেমনই যদি ৬ দিনে ২৪% মনে রাখে তবে সে ঐ ৬ দিনে ৭৬% ভোলে, যদি ১ মাসে ২৫% মনে রাখে তবে ১ মাসে সে ৭৫% ভোলে ইত্যাদি।

ভুলে যাওয়া মনে রাখার মতই মস্তিষ্কের স্বাভাবিক ধর্ম। ভুলে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তাও প্রচুর। একটি জিনিস শিখতে গিয়ে যে ভুলগুলি শিক্ষার্থী অসতর্কতায় একবার শিখে ফেলে সেগুলি পরে ভুলে না গেলে শুদ্ধ বস্তু বা তথ্যটি কখনই সে শিখতে পারে না। শুদ্ধ বস্তুগুলি মনে রাখতে হলে অশুদ্ধ বস্তুগুলি প্রথমে তাকে ভুলতেই হবে। অতএব প্রয়োজনীয় বস্তু মনে রাখতে হলে অপ্রয়োজনীয়কে ভুলতে হবে, নির্ভুলকে মনে রাখতে হলে ভুলকে ভুলতে হবে। অতএব ভোলা কেবল মনের স্বাভাবিক ধর্মই নয়, অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যও।

স্মৃতির উপর কয়েকটি পরীক্ষণ (Some Experiments on Memory)

স্মৃতি ও বিস্মৃতি নিয়ে যে মনোবিজ্ঞানী প্রথম গবেষণা সুরু করেন তাঁর নাম এবিংহস (Ebbinghaus)। ইনিই প্রথম স্মৃতিকে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণাগারে নিয়ে আসেন। এঁর পরিচালিত পরীক্ষণগুলি থেকে মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য পাওয়া গেছে। এখানে তাঁর কতকগুলি বিখ্যাত পরীক্ষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

১। সংরক্ষণ ও বিস্মৃতির হার (Rate of Retention and Forgetting)

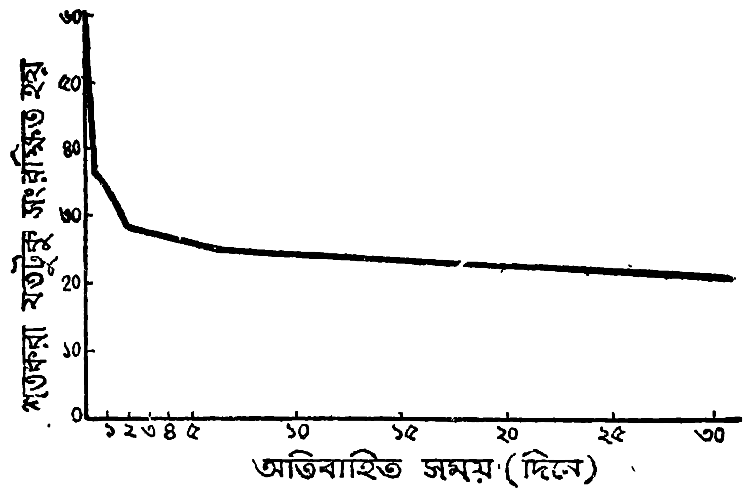
মানুষ কি হারে ভোলে এবং কতটুকু মনে রাখে এই বিষয়টি নিয়ে এবিংহস প্রথম পরীক্ষণ করেন এবং মানুষের বিস্মৃতির হার সম্পর্কে একটি তালিকা তৈরী করেন। যদি একটি অর্থহীন শব্দতালিকা মুখস্থ করার পর কিছু সময়ের ব্যবধানে সেটিকে আমরা মনে করার চেষ্টা করি তবে দেখা যাবে যে আমরা সম্পুণ তালিকাটি মনে করতে পারছি না, কিছুটা ভুলে গেছি। কত সময় পরে কতটা

মনে থাকে, আর কতটা ভুলে যাই তার একটি তালিকা এবিংহস দিয়েছেন। তালিকাটি এইরূপ—

শেখা ও মনে করার মধ্যে সময়ের ব্যবধান	শতকরা কতটা মনে থাকে	শতকরা কতটা ভুলে যাই
২০ মিনিট	৫৮	৪২
১ ঘণ্টা	৪৪	৫৬
৯ ঘণ্টা	৩৬	৬৪
২৪ ঘণ্টা	৩৪	৬৬
২ দিন	২৬	৭৪
৬ দিন	২৫	৭৫
৩১ দিন	২১	৭৯

এবিংহসের এই তালিকাটিকে নীচের রেখা চিত্রের আকারে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে।

এবিংহসের এই গবেষণা থেকে জানা যাচ্ছে যে কোন কিছু শেখার পর প্রথমেই আমাদের একটি বড় রকমের বিস্মৃতি ঘটে। একে প্রাথমিক বিস্মরণ



[এবিংহসের প্রসিদ্ধ সংরক্ষণ-রেখা (Curve of Retention)]

বলা হয়। উপরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে বিষয়টি শেখার ২০ মিনিট পরেই ৪২% প্রাথমিক বিস্মরণ ঘটেছে। তারপর ২০ মিনিট থেকে ২ দিন পর্যন্ত বিস্মরণ ঘটে বেশ দ্রুত, আরও ৩০%। কিন্তু ২ দিনের পর থেকে বিস্মরণের গতি মন্থর

হয়ে যায় এবং ১৫ দিন বা একমাসের পর তেমন উল্লেখযোগ্য বিস্মরণ আর ঘটে না। এই দীর্ঘ সময়ে মাত্র আরও ৫% বিস্মরণ ঘটে, কিন্তু তারপর আর বিস্মরণ ঘটে না বললেই চলে। এ থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পৌছান যায়। সেটি হচ্ছে যে আমরা কখনও কোন কিছু সম্পূর্ণ ভুলে যাই না। সমস্ত শেখা বস্তুর কিছু না কিছু আমাদের মস্তিষ্কে চিরকাল সংরক্ষিত হয়ে থাকে। এই জন্য এবিংহসের প্রদত্ত উপরের চিত্রটিকে সংরক্ষণের রেখাচিত্র (Curve of Retention) বলা হয়।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে এবিংহস এই সংরক্ষণের গবেষণা চালান অর্থহীন শব্দ তালিকা নিয়ে এবং তাঁর প্রদত্ত এই বিস্মৃতির হার অর্থহীন বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অন্য কোন প্রকৃতির বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে বিস্মৃতির হার অন্য প্রকার হবে।

এবিংহসের পর বহু আধুনিক মনোবিজ্ঞানী বিস্মরণের হার নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁদের প্রদত্ত তালিকা এবিংহসের তালিকার সঙ্গে পুরোপুরি না মিললেও মৌলিক নীতির দিক দিয়ে এবিংহসের তালিকার সঙ্গে সেগুলির বিশেষ কোন পার্থক্য পাওয়া যায় নি। এতে এবিংহসের গবেষণার উৎকর্ষ ও নির্ভরযোগ্যতা আরও বিশেষ করে প্রমাণিত হচ্ছে।

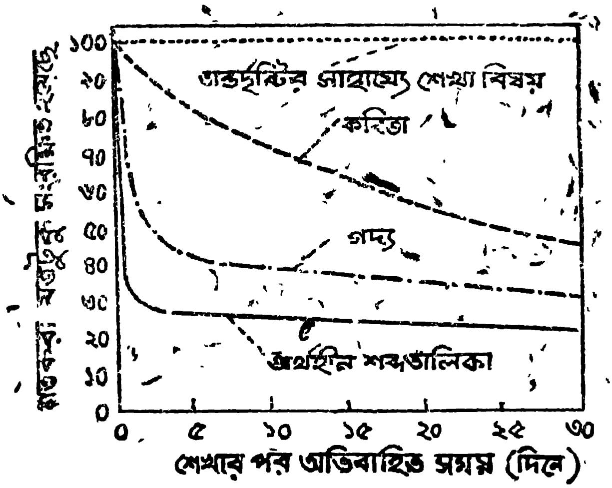
৩। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও বিস্মরণের হার
(Nature of Material and Rate of Forgetting)

বিস্মরণের হার সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত পরীক্ষণটি অর্থহীন শব্দতালিকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। অর্থপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে বিস্মরণের হার সম্পূর্ণ বিভিন্ন হতে দেখা গেছে। সেখানে প্রাথমিক বিস্মরণ যেমন কম, তেমনই পরবর্তী বিস্মরণের হারও দ্রুত নয়।

উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তিকে নিম্নলিখিত চারটি বিভিন্ন প্রকৃতির বিষয় শিখতে দেওয়া হল। তারপর বিভিন্ন সময়ের ব্যবধানে ঐ বিষয়গুলির কতটুকু তার মনে সংরক্ষিত হয়েছে তার পরীক্ষা করে নীচের তালিকাটি পাওয়া গেল।

	১ দিনে	৫ দিনে	২০ দিনে	৩০ দিনে
১। অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শেখা বিষয়	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
২। কবিতা	৯৫%	৮৬%	৫৬%	৪৫%
৩। গদ্য	৬৮%	৪৪%	৩৫%	৩০%
৪। অর্থহীন শব্দতালিকা	৩৪%	২৬%	২৪%	২২%

এই পরীক্ষণের ফলগুলিকে চিত্রে রূপায়িত করলে আমরা নীচের চিত্রটি



[বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুযায়ী বিস্মরণের হার]

পাই। উপরের রেখাচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে সব চেয়ে দ্রুত ও অধিক বিস্মরণ ঘটে অর্থহীন শব্দতালিকার ক্ষেত্রে। তার পর হয় গদ্যধর্মী বিষয়ে, তার পর হয় কবিতায়। যে বিষয়বস্তুটি ব্যক্তি একবার অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, সেটির ক্ষেত্রে তার বিস্মরণ একেবারেই ঘটে না। সময়ের অতিক্রান্তিতেও সে বস্তুটি তার সম্পূর্ণ মনে থাকে। উদাহরণস্বরূপ 'একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ একত্রে দুই সমকোণ'—সত্যটুকু যদি কাউকে একবার পরীক্ষণের সাহায্যে উপলব্ধি করতে সমর্থ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে কখনও সে সেটা ভুলবে না। এই থেকে সংরক্ষণের প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি কথা বলা চলে যে বিষয়বস্তু যতই অর্থপূর্ণ হবে ততই সেটি ভালভাবেও দীর্ঘ দিন মনে রাখা সম্ভব হবে। আর বিষয়বস্তু যত অর্থহীন হবে তত তার সংরক্ষণ কম ও দুর্বল হবে। এই জন্য আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির অর্থ যাতে শিক্ষার্থী ভাল করে বোঝে সেদিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি দেওয়া হয়। যান্ত্রিকভাবে বা অর্থ না বুঝে কোন কিছু শেখার যে কোন মূল্য নেই একথা আজ সবাই স্বীকার করেন।

৩। বিষয়বস্তুর পরিমাণ ও মুখস্থকরণের সময় ও প্রচেষ্টা
(Amount of Material and Time and Effort of Memorising)

সাধারণভাবেই আমাদের জানা আছে যে বিষয়বস্তুর পরিমাণ যত বেশী হবে

সেটি মুখস্থ করতে তত বেশী সময় ও প্রচেষ্টা লাগবে। কিন্তু বিষয়বস্তুর পরিমাণ বাড়ালে মুখস্থকরণের সময় ও প্রচেষ্টার পরিমাণ কি অনুপাতে বাড়বে সে সম্বন্ধে সাধারণভাবে আমাদের কিছু জানা নেই। এবিংহস প্রথম এই ব্যাপারটি নিয়ে পরীক্ষণ করে তার ফলাফলের একটি তালিকা তৈরী করেন। তিনি ৭, ১০, ১২, ১৬, ২৩ এবং ৩৬টি শব্দ সমন্বিত ৬টি তালিকা তৈরী করেন এবং এই প্রত্যেকটি তালিকা নির্ভুলভাবে মুখস্থ করতে তাঁর কতবার করে 'পড়া' লাগল এবং কত 'সময়' লাগল তার একটি তালিকা রাখলেন। এই ভাবে মুখস্থ করার পদ্ধতিটির তিনি নাম দিলেন 'শিখন পদ্ধতি' (Learning Method)। তারপর তিনি বিভিন্ন তালিকার প্রত্যেকটি শব্দ শিখতে গড়ে কত সময় লাগল তা গণনা করলেন। মোট ফলাফল দাঁড়াল নিম্নরূপ—

তালিকার দৈর্ঘ্য	'পড়া'র সংখ্যা	'পড়া'র মোট সময়	প্রতিশব্দ শেখার গড় সময়
৭	১	৩ সেঃ	০'৪ সেঃ
১০	১৩	৫২ সেঃ	৫'২ সেঃ
১২	১৭	৮২ সেঃ	৬'৮ সেঃ
১৬	৩০	১৯৬ সেঃ	১২'০ সেঃ
২৪	৪৪	৪২২ সেঃ	১৭'৬ সেঃ
৩০	৫৫	৭৯২ সেঃ	২২'০ সেঃ

[তালিকার দৈর্ঘ্য অনুযায়ী 'পড়া'র সংখ্যা ও সময় : এবিংহস]

উপরের তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে বিষয়বস্তুর দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধির তুলনায় পড়ার সময় ও সংখ্যা অনেক দ্রুত হারে বাড়ে। যেমন ৭টি শব্দের তালিকা মুখস্থ করতে লাগল ১ বার, কিন্তু ১০টির তালিকার বেলায় লাগল ১৩ বার, ১২টির বেলায় ১৭ বার, ২৪টির বেলায় ৪৪ বার। সময়ের দিক দিয়েও তেমনই ৭টি শব্দের তালিকার একটি শব্দ মুখস্থ করতে লাগল মাত্র ০'৪ সেঃ, কিন্তু ১০টি শব্দের তালিকার প্রতিটি শব্দ শিখতে লাগল ৫'২ সেঃ, ২৪টি শব্দের তালিকার প্রতিটি শব্দ শিখতে লাগল ১৭'৬ সেঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ যে হারে বিষয়বস্তুর পরিমাণ ও দৈর্ঘ্য বাড়ে তার চেয়ে অনেক দ্রুত হারে বাড়ে শেখার সময় ও পড়ার সংখ্যা।

৪। শিখনের মাত্রা ও সংরক্ষণ (Degree of Learning and Retention)

শিখনের মাত্রা নানা রকমের হতে পারে। কোন বিষয়বস্তু শেখার পর যখনই

একবার নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করা সম্ভব হয় তখন তাকে যথার্থ শিখন বলা চলে। কিন্তু তার পরও যদি আরও কয়েকবার পড়া যায় তাহলে তাকে অতি-শিখন (Over-learning) বলা হয়। আর শিখন যখন পূর্ণ-শিখনের মাত্রার নীচে থাকে তখন তাকে ন্যূন-শিখন (Under-learning) বলা হয়।

কোন বিশেষ একটি বিষয়বস্তুর সংরক্ষণের উপর ঐ বিষয়বস্তুটির অতি-শিখনের কতটা প্রভাব আছে সে সম্বন্ধে এবিংহস একটি পরীক্ষণ করেন। তিনি ১৬টি শব্দের কয়েকটি তালিকা নিলেন এবং প্রত্যেকটি তিনি মুখস্থ করতে সুরু করলেন। কিন্তু প্রত্যেকটি তালিকার ক্ষেত্রে তিনি শিখনের বিভিন্ন মাত্রা অবলম্বন করলেন। অর্থাৎ প্রথমটি পড়লেন ৮ বার, দ্বিতীয়টি ১৬ বার, তৃতীয়টি ২৪ বার, এই ভাবে। এইবার ২৪ ঘণ্টা পরে তিনি পরীক্ষা করে দেখলেন যে কোন্‌টি কতটা মনে আছে। এই পরীক্ষণ থেকে তিনি যে ফল পেলেন সেটিকে তালিকার আকারে নিয়ে গেলে দাঁড়ায়—

প্রথম দিনে পড়ার সংখ্যা	৮	১৬	২৪	৩২	৪২	৫৩	৬৪
২৪ ঘণ্টা পরে সংরক্ষণের শতকরা	৮	১৫	২৩	৩২	৪৫	৫৪	৬৪

এই থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে যত বেশী বার বিষয়বস্তুর পড়া হবে তত বেশী পরিমাণে ঐ বস্তুটি সংরক্ষিত হবে। এক কথায় অতিশিখনে সংরক্ষণ অধিক হয়।

৫। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে সংরক্ষণের হার (Retention of Different Subjects)

সাম্প্রতিক কালে বিদ্যালয়ের পাঠ্যবিষয়ের সংরক্ষণের হার নিয়ে অনেক পরীক্ষণ হয়েছে। অর্থাৎ দেখা হয়েছে কোন্ পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থীর কতটা সংরক্ষণ হয়। এই সব পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীদের সংরক্ষণের হারও বিভিন্ন। পাঠ্যবিষয়গুলির প্রকৃতিগত বিভিন্নতাই হল এই সংরক্ষণগত পার্থক্যের কারণ। একটি বিশেষ পরীক্ষণ থেকে পাওয়া বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের সংরক্ষণের হারের তালিকা দেওয়া হল।

সংরক্ষণের হার

	পাঠ্যবৎসরের শেষে	১ বৎসর পরে	৫ বৎসর পরে
উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব	·৬৪	·২১	·১৬
মনোবিজ্ঞান	·৭৮	·৩৯	·৩০
বীজগণিত	·৮৭	·৫৬	—
রসায়নবিদ্যা	·৬৩	·৪৭	·৩৩
ইতিহাস	·৭১	·৫৬	—

উপরের পরীক্ষণ এবং আরও অনেক অনুরূপ পরীক্ষণ থেকে একটি মোটা-মুটি সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে পাঠ্যবৎসরের শেষে শিক্ষার্থীদের সাধারণতঃ ৭৫%'র মত মনে থাকে। তার পর ১ বৎসর পরে সংরক্ষণ ৪০%'র কাছাকাছি পৌছয় এবং ৫ বৎসর পরে এই সংরক্ষণ ২৫%তে দাঁড়ায়। অবশ্য বিষয়বস্তুর প্রকৃতিগত বৈষম্য অনুযায়ী বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের হারও পৃথক হয়।

আধুনিক কালে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কলেজের পাঠ্যবিষয়গুলির কোন্‌টিতে শিক্ষার্থীর কি পরিমাণ সংরক্ষণ হয় তাই নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। এই সব গবেষণা থেকে লব্ধ ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যবিষয়গুলির উপর পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে গরমের ছুটির সময় শিক্ষার্থীদের সংরক্ষণ বৃদ্ধির দিকে যায়। বছরের শেষের দিকে দেখা যায় যে, যে সব তথ্য দুরূহ প্রকৃতির সেগুলি শিক্ষার্থী বেশী পরিমাণে ভুলতে থাকে, আর যেগুলি সহজ প্রকৃতির সেগুলি সে মনে রাখতে পারে। যেমন, ইতিহাসের সহজ তথ্যগুলি শিক্ষার্থীরা ভোলে না, কিন্তু উন্নত বা চিন্তামূলক তথ্যগুলি তারা বছরের শেষের দিকে ভুলে যায়। তেমনই গণিতের বেলায় মৌলিক বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের মনে থাকে, কিন্তু উন্নত বা দুরূহ বিষয়গুলি তারা বৎসরের শেষের দিকে মনে রাখতে পারে না।

মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবিষয়গুলির ক্ষেত্রে একটি পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীরা গণিতের প্রায় শতকরা ১০ ভাগ গরমের ছুটির সময় এবং প্রায় ৩৩ ভাগ ১ বৎসর পরে ভুলে যায়। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বিষয়বস্তুর প্রকৃতিগত বৈষম্যের জন্য সংরক্ষণেরও বৈষম্য হয়ে থাকে। যেমন, বিজ্ঞানের সাধারণ তথ্যগুলি এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তথ্যের প্রয়োগের বেলায় সংরক্ষণ বেশ উন্নত কিন্তু রাসায়নিক নামগুলি মনে রাখা এবং সমীকরণ লেখার বেলায় সংরক্ষণ দুর্বল হয়ে দাঁড়ায়। একটি পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে শেখা রসায়নশাস্ত্রের তথ্যমূলক বিষয়বস্তুগুলির মাত্র ১৯% ৫ বছর পরে মনে করতে পেরেছে।

কলেজ স্তরের পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে বিজ্ঞানে প্রচুর বিস্মৃতি ঘটতে দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে চারমাসে ৫০% এবং বৎসরের শেষে ৯৪%'র মত বিস্মৃতির দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। কারিগরিমূলক তথ্যের ক্ষেত্রে বিস্মৃতি সব চেয়ে বেশী ঘটে যদিও সেগুলির অন্তর্নিহিত নীতির বাস্তব-প্রয়োগে দক্ষতার কোনও অভাব দেখা যায় না। কলেজ স্তরে চার বৎসর বা তার পরেও যে সব

বিষয়ের সব চেয়ে বেশী সংরক্ষণ দেখা যায় সেগুলি হল আধুনিক ও প্রাচীন ইতিহাস, জ্যামিতি এবং সব চেয়ে কম সংরক্ষণ দেখা যায় পদার্থতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, প্রাচীনভাষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে। আর একটি পরীক্ষায় কলেজে নবাগত শিক্ষার্থীদের উপর বিশ্ব ইতিহাসের একটি অভীক্ষা দিয়ে দেখা গেছে যে তাদের সংরক্ষণ একটুও হ্রাস পায়নি।

একদল কলেজের মেয়ের উপর আমেরিকার ইতিহাসের তথ্যমূলক একটি অভীক্ষা দিয়ে দেখা যায় যে তাদের প্রাথমিক জ্ঞানের উপর এক বছর পরে প্রায় ৪০% বিস্মৃতি ঘটেছে। উপরের পরীক্ষণগুলি থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে বিষয়বস্তুর প্রকৃতি এবং শিখনের দুরূহতার উপর নির্ভর করে সংরক্ষণের পরিমাণ। তবে সাধারণভাবে বলা চলে যে তথ্যমূলক ও কারিগরি বিষয়বস্তুগুলির বিস্মৃতি তাড়াতাড়ি ঘটে, আর অপেক্ষাকৃত সাধারণধর্মী তথ্যাদি, বাস্তবক্ষেত্রে তথ্যের প্রয়োগ এবং মৌলিকসূত্রের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ অনেক ভাল হয়।

বিস্মরণের কারণ (Causes or Factors of Forgetting)

মানুষ ভোলে কেন, এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয়েছে। আমরা জানি যে কোন বস্তু ভুলে যাওয়া হল মস্তিষ্কে বস্তুটির সংরক্ষণ না হওয়া। দেখা গেছে যে অনেকগুলি কারণে সংরক্ষণ না হতে পারে। কারণগুলি কখনও পৃথকভাবে আবার কখনও মিলিতভাবে কাজ করতে পারে। নীচে বিস্মরণের প্রধান কয়েকটি কারণের আলোচনা করা হল।

১। চর্চার অভাব (Disuse)

সাধারণত কোন বস্তুর চর্চার অভাবকে আমরা সে বস্তুটির ভুলে যাওয়ার কারণ বলে মনে করে থাকি। যখন কোন বস্তু আমরা ভুলে যাই তখন ধরে নিই যে সেই বস্তুটি নিয়ে চর্চা বা আলোচনা না করার ফলেই আমরা সেটি ভুলে গেছি। এই ব্যাখ্যাটি কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা গ্রহণ করেন না। প্রথমত, কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বস্তুটির যখন কোনরূপ চর্চা করা হচ্ছে না বা মনে করার চেষ্টা করা হচ্ছে না সে সময়েও সেটির সংরক্ষণের পরিমাণ আগের চেয়ে বেড়েই গেছে, কমা দূরে থাকুক। এই ঘটনাটিকে স্মৃতি-রেশ (Reminiscence) বলা হয়। দ্বিতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে বস্তুটির চর্চাকালেই বিস্মরণ ঘটতে সুরু হয়েছে। তৃতীয়ত, চর্চার অভাবকে বিস্মরণের কারণ বলার অর্থ হল সময়ের অতিক্রান্তিকে কারণ বলে ধরে নেওয়া। কিন্তু সময়কে কোন ঘটনার কারণ বলা সঙ্গত নয়। কেননা, সময় হচ্ছে নমস্ত

ঘটনারই একটি সাধারণ পটভূমিকা বিশেষ। যদিও আমরা কথায় বলি যে সময়ে ফলটি পাকে বা সময়ে মানুষ বৃদ্ধ হয় বা সময়ে লোহাতে মরচে পড়ে, তবুও এর কোন ঘটনাটিরই কারণ রূপে সময়কে ধরা যেতে পারে না। এই ঘটনাগুলির সত্যকারের কারণ হল অন্য। এই জন্যই আমরা চর্চার অভাবকে ভুলে যাওয়ার কারণ বলতে পারি না।

২। পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ (Retro-active Inhibition)

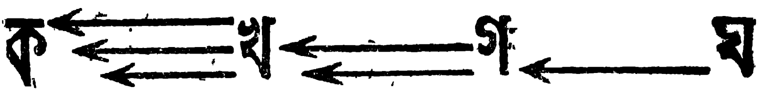
আমরা যখন একটি বিষয় শেখার পর আর একটি বিষয় শিখি, তখন দেখা যায় যে প্রথম বিষয়টির কিছুটা আমরা ভুলে গেছি। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় শেখা বিষয়টি পিছন দিকে চলে গিয়ে আমাদের প্রথম শেখা বিষয়টিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। এই মানসিক প্রক্রিয়াকে পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ (Retro-active Inhibition) বলা হয়। যেমন, মনে করা যাক একজন একটি বাংলা কবিতা মুখস্থ করল। তারপর সে আবার আর একটি বাংলা কবিতা মুখস্থ করল। এখন যদি সে প্রথম শেখা কবিতাটির কতটা মুখস্থ আছে তা পরীক্ষা করতে যায়, তাহলে দেখবে যে সে প্রথম কবিতাটির কিছুটা ভুলে গেছে, যদিও দ্বিতীয় কবিতাটি তার সম্পূর্ণ মনে আছে। এক্ষেত্রে প্রথম কবিতাটির বিস্মরণের কারণ হল পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ। এখানে দ্বিতীয় কবিতাটির অন্তর্গত শেখা বস্তুগুলি পেছন দিকে চলে গিয়ে পূর্বে শেখা প্রথম কবিতার বস্তুগুলির সঙ্গে এমন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে যে ব্যক্তির প্রথম কবিতাটির সংরক্ষণ কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অর্থাৎ প্রথম কবিতাটির কিছুটা সে ভুলে যায়। দুটি উপায়ে এই পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধের প্রভাবকে দুর্বল বা রুদ্ধ করা যায়। যথা—

প্রথমত, যদি প্রথম শেখা বস্তুটি ও দ্বিতীয় শেখা বস্তুটির মধ্যে কিছুটা সময়ের বিরতি দেওয়া হয়, তাহলে এই পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ আর তেমন কাজ করতে পারে না। অবশ্য এই অন্তর্বর্তী বিরতিকালে এমন কোন কাজ করা চলবে না যাতে মস্তিষ্কের পরিশ্রম হয়, অর্থাৎ এই বিরতিকালে মস্তিষ্ককে যতদূর সম্ভব বিশ্রাম দিতে হবে। সেই জন্য দেখা যায় যে পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ তখনই কাজ করে যখন দুটি শেখার কাজ পর পর ঘটে এবং তাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অতি অল্প থাকে বা একেবারে থাকে না।

দ্বিতীয়ত, যদি এই দুটি শেখা বিষয়বস্তুর মধ্যে আকৃতিগত মিল থাকে তবেই এই প্রতিরোধ বেশী পরিমাণে ঘটে থাকে। যেমন, প্রথমটি একটি বাংলা কবিতা ও দ্বিতীয়টিও একটি বাংলা কবিতা। কিংবা প্রথমটিও সংখ্যা সারি-

দ্বিতীয়টিও সংখ্যা সারি। এসব ক্ষেত্রে পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ প্রবল হয়। কিন্তু যদি প্রথম বিষয়বস্তু ও দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনরূপ আকৃতিগত মিল না থাকে তাহলে প্রতিরোধ অল্প ঘটে, বা ঘটে না। যেমন, যদি প্রথমটি ইংরাজী কবিতা এবং দ্বিতীয়টি বাংলা কবিতা বা প্রথমটি বাংলা গদ্য এবং দ্বিতীয়টি সংখ্যা-তালিকা হয় তাহলে এই প্রতিরোধ অল্পই ঘটে। কেননা এই ধরনের ক্ষেত্রে দুটি শেখা বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনরূপ মিল না থাকায় দু'য়ের মধ্যে কোনরকম বিভ্রান্তি বা দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে না।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রাশি রাশি বস্তু প্রতিনিয়তই শিখছি। অথচ সেগুলির খুব অল্পই আমাদের শেষ পর্যন্ত মনে থাকে। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এর প্রধান কারণ হল পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ। যেমন, প্রথম একটি বস্তু(ক) শেখার পর আমরা দ্বিতীয় একটি বস্তু(খ) শিখলাম। তার ফলে প্রথম বস্তুটির (ক'র) কিছুটা ভুলে গেলাম। তারপর আবার যখন তৃতীয় বস্তু (গ) শিখলাম তখন প্রথম বস্তুর (ক'র) আরও কিছু এবং দ্বিতীয় বস্তুর (খ'র) কিছু ভুললাম। আবার যখন চতুর্থ বস্তু (ঘ) শিখলাম তখন প্রথম বস্তুর (ক'র)



[পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধের ফলে বিস্মরণ]

আরও কিছুটা, দ্বিতীয় বস্তুটির (খ'র) আরও কিছুটা এবং তৃতীয় বস্তুটির (গ'র) কিছু ভুললাম। এভাবে যত নতুন বস্তু আমরা শিখে যাই তত পুরোন বস্তুর কিছুটা করে ভুলে যাই এবং শেষে প্রথম দিকের শেখা বস্তুগুলি ক্রমবর্ধমান হারে ভুলতে থাকি। এই বিস্মরণ মনের একটি স্বাভাবিক ও অতি প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া। এই স্বাভাবিক বিস্মরণ যদি না ঘটত তবে আমাদের শেখা সব বস্তুই মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়ে থাকত এবং শেষ পর্যন্ত এত অসংখ্য বিষয়বস্তু মস্তিষ্কে ভীড় করত যে আমাদের মানসিক সুস্থতা বজায় রাখাই কষ্টকর হয়ে উঠত।

৩। শিখনের মাত্রা (Degree of Learning)

শিখনের উৎকর্ষের মাত্রার উপর বিস্মরণ অনেকটা নির্ভর করে। প্রত্যেক বস্তু শেখার একটি সর্বনিম্ন মান আছে, যেখানে পৌছলে আমরা বলতে পারি যে বস্তুটি আমরা শিখেছি। এখন যদি কেউ এই সীমারেখা ছাড়িয়েও কিছুটা বেশী শিখে যায় তবে তার শেখাকে অতি-শিখন (Over-learning) বলা

চলে।[1] আর যদি ঐ সীমারেখার নীচে সে থাকে তবে তার শেখাকে ন্যূন-শিখন (Under-learning) বলা হয়। এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে, অতি-শেখা বস্তু ন্যূন-শেখা বস্তুর চেয়ে বেশী মনে থাকে। অতএব আমরা ন্যূন-শিখনকে (Under-learning) ভুলে যাওয়ার একটি কারণ বলতে পারি।

৪। পরিবর্তিত পরিবেশ (Altered Environment)

আমরা যখন কোন একটি বিষয় শিখি তখন আমাদের সেই সময়কার পরিবেশের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমাদের শেখা এবং মনে করা এ উভয় প্রচেষ্টার সঙ্গেই নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ে।[২] তার ফলে আমরা যখন পরে ঐ বিষয়টি মনে করার চেষ্টা করি তখন পরিবেশের ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির উপস্থিতি সুষ্ঠু স্মরণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এখন যদি কোন কারণে ঐ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবেশে অনুপস্থিত থাকে তবে দেখা যাবে যে আমাদের মনে করাটাও শক্ত হয়ে উঠেছে এবং ঐ বিষয়টি ভাল করে শেখা সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে আমরা ভুলে গেছি। আবার যদি কোন প্রকারে ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে ঐ বিষয়টি সহজে মনে এসে যাবে। এই জন্যই যখন আমরা কোন বিশেষ পরিবেশে একটি বস্তু শিখি অন্য পরিবেশে সেটি আমরা মনে করতে অসুবিধা বোধ করি। কিন্তু সেই পুরোনো পরিবেশে ফিরে এলে আমাদের মনে করতে আর অসুবিধা হয় না। বাড়ীতে নিজের পড়ার ঘরে ভাল করে তৈরী করা পড়াটি এই কারণেই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রায়ই ভুলে যায়।

৫। প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ (Emotional Blocking)

ভয়, রাগ, ঘৃণা, লজ্জা প্রভৃতি কোনও প্রক্ষোভ যদি ব্যক্তির মধ্যে তীব্রভাবে জেগে ওঠে তবে দেখা যায় যে ভাল করে শেখা বিষয়ও তার মনে পড়ছে না। কোনও প্রক্ষোভ সক্রিয় হয়ে উঠলে শরীরের মধ্যে অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীটি (Autonomic Nervous System) সক্রিয় হয়ে ওঠে। ফলে দেহ ও মনে একটা উত্তেজিত অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং সাময়িকভাবে বিস্মৃতি ঘটে।

৬। আঘাতজনিত বিস্মরণ (Shock Amnesia)

সংরক্ষণ হল মস্তিষ্কের একটি প্রক্রিয়া। যদি কোন কারণে মস্তিষ্কে কোনরূপ আঘাত লাগে তবে আংশিকভাবে বিস্মরণ ঘটতে পারে। খেলাধুলা, দুর্ঘটনা, যুদ্ধ

১। পৃঃ ১২৭ পরীক্ষণ দ্রষ্টব্য।

২। এটিকে অনুবর্তন (Conditioning) প্রক্রিয়া বলা হয়। (পৃঃ ১২২ দ্বিতীয় খণ্ড)

প্রভৃতি কারণে অনেক সময় আঘাত লাগার ফলে আঘাতজনিত বিস্মরণ (Shock Amnesia) ঘটতে দেখা গেছে।

৭। নেশাকারক বস্তু (Drugs)

মদ, আফিং, কোকেন প্রভৃতি নেশাকারক বস্তুগুলি যদি দীর্ঘকাল অতিরিক্ত ব্যবহার করা যায়, তবে সেগুলির প্রভাবে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষগুলি দুর্বল হয়ে ওঠে এবং তা থেকে স্মৃতিভ্রম ঘটতে পারে।

৮। অবদমন (Repression)

বিখ্যাত মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েড বিস্মরণের একটি নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে ভুলে যাওয়া একটি ইচ্ছাকৃত মানসিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ যা আমরা ভুলতে চাই, তাই আমরা ভুলি। অবশ্য আমাদের এই ভুলতে চাওয়া বা ইচ্ছাটি সচেতন মনের চাওয়া বা ইচ্ছা নয়, সেটি সম্পূর্ণ অচেতন মনের। তিনি দেখিয়েছেন যে আমাদের মনের অনেকখানি আমাদের কাছে একেবারে অজানা। এই অজ্ঞাত মনটির তিনি নাম দিয়েছেন অচেতন (Unconscious)। আর যাকে সাধারণত আমরা মন বলে আখ্যা দিয়ে থাকি, সেটি আসলে আমাদের সম্পূর্ণ মনের একটি অংশ মাত্র। মনের এই জ্ঞাত অংশটুকুর নাম তিনি দিয়েছেন চেতন (Conscious)। এখন যদি আমাদের এই চেতন মনে এমন কোন চিন্তা বা ইচ্ছার উদয় হয় যা আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত, তবে আমরা সেই চিন্তা বা ইচ্ছাটিকে চেতন মন থেকে জোর করে সরিয়ে আমাদের অচেতন মনে নির্বাসিত করি। ফলে সেটি আর আমাদের চেতন মনে থাকে না অর্থাৎ আমরা সেটিকে ভুলে যাই। চেতন মন থেকে অচেতন মনে নির্বাসিত করার এই প্রক্রিয়াটির নাম হল অবদমন (Repression)। অতএব ফ্রয়েডের মতে চেতন মন থেকে কোন চিন্তাকে অচেতন মনে অবদমিত করাকেই আমরা ভুলে যাওয়া নাম দিয়ে থাকি।

এখন প্রশ্ন হল, যদি ভুলে যাওয়াটা ইচ্ছাকৃতই হবে তবে আমরা যে সব বস্তু ভুলতে চাই না (যেমন, কোন দরকারী কাজের কথা বা পরীক্ষার পড়া) সেগুলি ভুলে যাই কেন? আবার এমন অনেক বস্তু আছে যেগুলি আমরা ভুলতে চাই (যেমন, কোন দুঃখ, শোক বা লজ্জার স্মৃতি), অথচ সেগুলি ভুলতে পারিনা কেন? এর উত্তর হল যে কোন্‌টি আমরা ভুলতে চাই আর কোন্‌টি চাই না তার প্রকৃত নির্ণায়ক কিন্তু আমাদের চেতন সত্তাটি নয়। আমাদের 'আমি' বা অহংসত্তার (Ego) কিছুটা অংশ চেতন হলেও, এর একটি বড় অংশ অচেতন।

ফলে কোন্‌টি আমাদের কাছে বাঞ্ছিত, অতএব মনে রাখতে হবে, আর কোন্‌টি আমাদের কাছে অবাঞ্ছিত অতএব ভুলে যেতে হবে, সেটি প্রায় ক্ষেত্রেই আমাদের চেতন অহংসত্তাটি ঠিক করে না। বস্তুত আমাদের আচরণের প্রকৃত নিয়ন্তা হল আমাদের অচেতন অহংসত্তাটি। যে বস্তুটি বাহ্যত মনে হচ্ছে আমরা ভুলতে চাই না অথচ ভুলে যাচ্ছি, আসলে সেটি আমাদের অচেতন অহংসত্তাটির কাছে বাঞ্ছিত নয়। যেমন, পরীক্ষার পড়া তৈরী করা বা বাধ্য হয়ে কোনও নীরস কর্তব্য পালন করা বা লৌকিকতার চাপে চিঠি লেখা প্রভৃতি কাজগুলি চেতন মনে আমরা পছন্দ করলেও আমাদের অচেতন মন ভুলে যেতে চায়। তেমনই আবার কোন দুঃখ, শোক বা লজ্জার কাহিনী আমরা ভোলার চেষ্টা করলেও ভুলতে পারি না। এর দুটি কারণ হতে পারে। প্রথম, আমাদের অচেতন অহংসত্তা হয় সেগুলিকে সত্য সত্য ভুলতে চায় না, যদিও চেতন সত্তা ভুলতে চায়। আর দ্বিতীয়, ঐ চিন্তা বা কথাগুলি বার বার মনে আনার ফলে ঐগুলির অতি-শিখন হয়ে যায় এবং ফলে আমাদের অহংসত্তা ভুলতে চাইলেও ঐগুলি আরও স্থায়ীভাবে মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়ে পড়ে।

ঘুম (Sleep)

ঘুমের সঙ্গে সংরক্ষণের একটি নিকট সম্পর্ক আছে। দেখা গেছে যে, কোন বিষয় শেখার পর যদি কিছুক্ষণ ঘুমান যায় তবে জেগে থাকার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভাল সংরক্ষণ হয়। জেগে থাকলে (কিছু না করলেও) কোনও না কোনও চিন্তা এসে সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটাবেই, কিন্তু যেহেতু ঘুমিয়ে পড়লে মস্তিষ্ক কোষে কোনরূপ পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ (Retroactive Inhibition) ঘটার সম্ভাবনা থাকে না, সেহেতু সংরক্ষণ বিনা বাধায় ঘটে ও বিস্মরণের হারও কম হয়। এই জন্য ঘুমের আগে শেখা বস্তু ভালভাবে ও দীর্ঘকাল মনে থাকে।

স্মৃতি-রেশ (Reminiscence)

মনে করা যাক একজনকে ১৬টি শব্দের একটি তালিকা মুখস্থ করতে দেওয়া হল। কিছুক্ষণ পর তাকে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে সে মাত্র ১২টি শব্দ মনে করতে পারছে। অতএব বোঝা গেল যে তার সংরক্ষণ হয়েছে ১৬টি শব্দের মধ্যে ১২টি শব্দ বা শিক্ষণীয় বস্তুটির মোট ৭৫%। এখন পরের দিন তাকে আবার পরীক্ষা করা হল এবং দেখা গেল যে সে ১৪টি শব্দ মনে করতে পারছে। এবার কিন্তু তার সংরক্ষণের পরিমাণ হল ৮৬%। অথচ ইতিমধ্যে সে ঐ শব্দগুলি আর নতুন করে মুখস্থ করেনি। কেবলমাত্র সময়ের ব্যবধানে

সংরক্ষণের এই ধরনের যে উন্নতি দেখা যায় তার নাম স্মৃতি-রেশ (Reminiscence)। মনোবিজ্ঞানীরা এই মানসিক ঘটনাটির নানারকম ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

স্মৃতির উন্নতি (Memory Training)

স্মৃতির উন্নতি করা যায় কিনা সে সম্বন্ধে জানতে সকলেরই অল্পবিস্তর কৌতূহল আছে। স্মৃতির উন্নতি চান সকলেই। বিশেষ করে বড় বড় কোম্পানীর অধিকর্তা, ব্যবসাদার, শিক্ষক, সেলস্‌ম্যান প্রভৃতি যাঁদের বৃত্তি নির্বাহের জন্য স্মৃতির উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হয়, তাঁরা স্মৃতির ক্ষমতা বাড়াতে সর্বদাই ব্যগ্র।

কিন্তু যখনই স্মৃতিকে আমরা মানসিক শক্তি বলে গ্রহণ করিনি তখনই এ প্রশ্নের উত্তর একরকম দেওয়া হয়ে গেছে। যেহেতু স্মৃতি কোনও একটি বিশেষ শক্তি নয়, সেহেতু এর কোনরূপ উন্নতি করার সম্ভব নয়। স্মৃতি একটি প্রক্রিয়া বিশেষ। অতএব একটি প্রক্রিয়ার ক্ষমতা বাড়া বা কমার কথা ওঠে না। স্মৃতির চর্চা করলে স্মৃতির ক্ষমতা বাড়ে, এই ছিল প্রাচীন শক্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মত। কিন্তু প্রথমে উইলিয়ম জেমস পরে আরও অনেক মনোবিজ্ঞানী প্রমাণ করে দিয়েছেন যে স্মৃতির চর্চা করলেই স্মৃতির শক্তি বাড়ে না।

তবে স্মৃতির পেছনে আছে মস্তিষ্কঘটিত একটি বিশেষ প্রক্রিয়া যার নাম দিয়েছি আমরা সংরক্ষণ। এই সংরক্ষণের মাত্রার উপর নির্ভর করছে স্মৃতির উৎকর্ষ বা অনুৎকর্ষ।

সুষ্ঠু স্মরণের সর্তাবলী (Conditions of Good Memory)

ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থায় সংরক্ষণের কাজটি ভালভাবে হয়। আবার কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থায় সংরক্ষণ আশানুরূপ হয় না। এই বিশেষ পরিস্থিতি বা অবস্থাগুলিকে আমরা সুষ্ঠু স্মরণের সর্তাবলী নাম দিতে পারি। একথা ভাবলে অবশ্যভুল হবে যে এই বিশেষ সর্তগুলির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের শক্তি বৃদ্ধি পায়। সংরক্ষণের শক্তি সব সময়েই অপরিবর্তিত থাকে। তবে ঐ বিশেষ সর্তগুলির উপস্থিতিতে সংরক্ষণ প্রক্রিয়াটি অধিকতর কার্যকর হয় মাত্র। যতক্ষণ এই সর্তগুলি বর্তমান থাকবে ততক্ষণই সংরক্ষণের উৎকর্ষও দেখা যাবে, আর সর্তগুলি অনুপস্থিত থাকলে সংরক্ষণের উৎকর্ষ কমে যাবে। অতএব সাধারণ-ভাবে বলতে গেলে স্মৃতির উন্নয়ন করা যায় না, কিন্তু এমন কতকগুলি অনুকূল সর্ত আছে যেগুলি কোন কিছু শেখার সময় অনুসরণ করলে সংরক্ষণ অধিকতর কার্যকর ও স্থায়ী হয়ে থাকে।

এই সর্তগুলিকে আমরা সাধারণভাবে কতকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, যথা শারীরিক (Physical), মানসিক (Mental), প্রক্ষোভমূলক (Emotional); পদ্ধতিমূলক (Relating to method) ও পরিবেশমূলক (Environmental)। এই বিভিন্ন শ্রেণীর সর্তগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

১। শারীরিক সর্তাবলী (Physical Conditions)

সুষ্ঠু স্মরণ অনেকখানি নির্ভর করে শারীরিক অবস্থার উপর। রোগ বা অসুস্থতা মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্মগুলিকে ব্যাহত করে এবং তার ফলে অনিবার্যরূপে সংরক্ষণ ক্ষুণ্ণ হয়। অতএব শারীরিক সুস্থতা হল সুষ্ঠু স্মরণের প্রথম সর্ত।

২। মানসিক সর্তাবলী (Mental Conditions)

সুষ্ঠু শিখনের মানসিক সর্তগুলিকে আবার কতকগুলি বিশেষ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

(ক) প্রেষণা (Motivation) :—মানসিক সর্তগুলির মধ্যে প্রথমে আসে প্রেষণা, বা যা মনে রাখতে হবে তা শেখার আন্তরিক আগ্রহ বা ইচ্ছা। অনিচ্ছায় বা অর্ধ-ইচ্ছায় শেখা বস্তু মস্তিষ্কে ভালভাবে সংরক্ষিত হয় না। এটি একটি পরীক্ষণ প্রমাণিত তথ্য যে বিনা প্রেষণায় কোন প্রকারের শিখন সম্ভব নয়। অতএব সুষ্ঠু স্মরণের একটি অপরিহার্য সর্ত হল শিক্ষণীয় বস্তুটির প্রতি প্রেষণাবোধ।

(খ) মনোযোগ (Attention) :—প্রেষণা বা ইচ্ছা যদি থাকে তবে স্বাভাবিকভাবেই মনোযোগের সৃষ্টি হয়। মনে রাখতে হলে বিষয়বস্তুটিতে যাতে ঠিকমত মনোযোগ দেওয়া হয় সেটি দেখতে হবে। অনেক সময় উপযুক্ত মনোযোগ না দেওয়ার জন্য সংরক্ষণ ঠিকমত হয় না। দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীরা ক্লাশে অধ্যাপকের বক্তৃতার নোটস নেয়। কিন্তু যদি নোটস লেখায় মনোযোগ বেশী থাকে তবে বক্তৃতা শোনা যায় না, ফলে অনেক সময় বিষয়বস্তুটি না বুঝেই শিক্ষার্থীরা নোটস করে এবং পরে সে নোটস তাদের কোন কাজেই লাগে না। সেই জন্য বক্তৃতা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হয়, নোটস মাঝে মাঝে করতে হয়। কারণ মনোযোগ দিয়ে শোনা বিষয় আমরা সহজে ভুলি না।

(গ) সংবোধন (Conprehension) :—শিক্ষণীয় বস্তুটি যে পরিমাণে শিক্ষার্থী বুঝতে পারে তার উপর সংরক্ষণের মাত্রা নির্ভর করে। দেখা গেছে, যে বস্তুটি শিক্ষার্থী যত বেশী বুঝতে পারে তত বেশী সেটি সে মনে রাখতে পারে। আর যে বস্তুর অর্থ না বুঝে যন্ত্রের মত শিক্ষার্থী মুখস্থ করে সে বস্তুটি মনে রাখা তার

পক্ষে শক্ত হয়। অবশ্য অর্থ বোঝা না বোঝা অনেকখানি নির্ভর করে বস্তুটির প্রকৃতির উপর।

৩। প্রক্ষোভমূলক সর্তাবলী (Emotional Conditions)

প্রক্ষোভমূলক সমতা হল মনে রাখার আর একটি অতি প্রয়োজনীয় সর্ত। শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকলেই মস্তিষ্কের প্রক্রিয়াগুলি সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হতে পারে। আর যদি কোন কারণে কোন বিশেষ প্রক্ষোভ অস্বাভাবিক মাত্রায় তীব্র হয়ে ওঠে তাহলে তার স্মৃতিও বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

অতিরিক্ত মাত্রায় বিরক্ত, ক্রুদ্ধ বা দুঃখিত অবস্থায় কিছু শেখা বা মনে রাখার চেষ্টা করাটা বেশ শক্ত এমন কি অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ভুলে যাওয়ার কারণগুলির মধ্যে প্রক্ষোভঘটিত প্রতিরোধকে একটি বড় কারণ বলে ধরা হয়েছে। এই জন্যই শিক্ষার্থীকে কিছু শেখাতে হলে তার মানসিক সাম্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সর্বপ্রথমে দরকার। প্রক্ষোভের দিক দিয়ে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীকে কিছু শেখানো নিরর্থক ও অপচয়বহুল।

৪। পদ্ধতিমূলক সর্তাবলী (Conditions relating to Method)

সুষ্ঠু সংরক্ষণ অনেকখানি নির্ভর করে পদ্ধতির নির্বাচনের উপর। দেখা গেছে যে উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করলে স্মৃতি সবল এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাছাড়া ভুল পদ্ধতিতে শেখার চেষ্টা করলে শিখতেও যেমন দেরী হয় তেমনই মনে রাখাও কষ্টকর হয়। শিখনের পদ্ধতি নানা প্রকারের হতে পারে এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রকৃতির উপর পদ্ধতির নির্বাচন নির্ভর করে।

সুষ্ঠু ও স্থায়ী সংরক্ষণের সহায়ক হয় নীচে এমন কতকগুলি পদ্ধতির উল্লেখ করা হল[১]।

(ক) সমগ্র পদ্ধতি : অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে কার্যকর।

(খ) অংশ পদ্ধতি : অর্থহীন বিষয়বস্তু, অতিদীর্ঘ বিষয়বস্তু, কৌশল, দক্ষতা ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি প্রযোজ্য।

(গ) মধ্যগ পদ্ধতি : অতিদীর্ঘ অথচ অর্থপূর্ণ বিষয়ের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানীরা অংশ ও সমগ্র পদ্ধতির মিশ্রিত এই পদ্ধতিটি অনুসরণের নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

১। পৃঃ ১৪০ (দ্বিতীয় খণ্ড)

(ঘ) আবৃত্তি পদ্ধতি : সাধারণত কোন কিছু মুখস্থ করার সময় পঠন পদ্ধতি ও আবৃত্তি পদ্ধতি, এই দু'রকম পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে এ তথ্যটি প্রমাণিত হয়েছে যে আবৃত্তি পদ্ধতি সাধারণ পঠন পদ্ধতির চেয়ে মনে রাখার পক্ষে অধিকতর সহায়ক।

(ঙ) সবিরাম পদ্ধতি : বিরতিহীন পদ্ধতিতে কোন কিছু শেখার চেয়ে মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে শেখা অনেক বেশী কার্যকর এবং তার ফলে সংরক্ষণ সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়।

(চ) অনুষঙ্গ পদ্ধতি : শেখার বিষয়গুলিকে অনুষঙ্গের সাহায্যে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে ফেলতে পারলে সেগুলি মনে রাখা সহজ হয়ে ওঠে। অনুষঙ্গ বলতে বোঝায় দুটি বিষয় বা চিন্তার মধ্যে কোন রকম একটি সম্পর্ক বা যোগাযোগের ধারণা। কখনও কখনও এই সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত থাকে আবার কখনও এই ধারণা চেষ্টা করে তৈরী করা যায়।

(ছ) প্রতিরূপের সাহায্যে শেখার চেষ্টা করলে মনে রাখার কাজটি সুষ্ঠু ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। যখন কোন কিছু মনে রাখার প্রয়োজন হয় তখন তার প্রতিরূপটিকে মনের মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ করতে পারলে বিষয়টির সংরক্ষণ সহজ এবং স্থায়ী হয়।

(জ) ছন্দ বা সুরের সাহায্যে শেখা বস্তু মনে রাখা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। সুর করে মুখস্থ করা কবিতা, নামতা ইত্যাদি বহুদিন মনে থাকে।

(ঝ) কতকগুলি স্মৃতিসহায়ক কৌশল (Mnemonic devices) আছে যেগুলি অবলম্বন করলে বস্তু বা ঘটনা মনে রাখা সহজ হয়। এ ছাড়া শেখা বস্তুর চর্চা বা অনুশীলন (Rehearsal) বস্তুটিকে মনে রাখতে সাহায্য করে।

(ঞ) পশ্চাদ্‌মুখী প্রতিরোধ ভুলে যাওয়ার একটি বড় কারণ। শিখনের সময় এমন সব ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত যার ফলে এই প্রতিরোধ সবচেয়ে কম হয়। যেমন পড়ার মাঝে মাঝে বিরতি দেওয়া, একই ধরনের বিষয়বস্তু পর পর না পড়া ইত্যাদি উপায় অবলম্বন করলে স্মৃতি সুদৃঢ় এবং স্থায়ী হয়।

৫। পরিবেশমূলক সর্তাবলী (Environmental Conditions)

(ক) অনুকূল পরিবেশ : মনে রাখার একটি প্রয়োজনীয় সর্ত হল যে পড়া বা শেখাটা যেন সব দিক দিয়ে অনুকূল পরিবেশে সম্পন্ন হয়। যদি পরিবেশ প্রতিকূল হয় তাহলে মনোযোগ ও একাগ্রতা ব্যাহত হয় এবং সংরক্ষণের কাজও ঠিকমত সম্পন্ন হয় না।

(খ) অপরিবর্তিত বা পরিচিত পরিবেশ : যে পরিবেশে কোন কিছু শেখা

হয়েছে সেই পরিবেশের পরিবর্তন হলে সেই বস্তুটি মনে রাখা কষ্টকর হয়ে ওঠে। অতএব শিখনের পরিবেশ যতটা অভিন্ন থাকে ততই স্মৃতি স্থায়ী ও সুদৃঢ় হয়।

স্মৃতির বিস্তার (Memory Span)

একবার শুনে প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষ দৈর্ঘ্যসম্পন্ন একটি সংখ্যা বা অক্ষরের সারি নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারে। কিন্তু এই সংখ্যা বা অক্ষরের সারিটি যদি ক্রমশ দৈর্ঘ্যে বাড়িয়ে যাওয়া হয় তবে এমন একটি সময় আসে যখন একবার শুনে সেটি আর নিখুঁতভাবে আবৃত্তি করা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এতে প্রমাণিত হয় যে সকলেরই স্মৃতির পরিধির একটি সীমা আছে। যতটুকু একবার শুনে ব্যক্তি আবৃত্তি করতে পারে সেইটিকে তার স্মৃতির বিস্তার (Memory Span) বলে বর্ণনা করা হয়। কোন ব্যক্তির স্মৃতির বিস্তার পরিমাপ করতে হলে তার সামনে ক্রমবর্ধমান দৈর্ঘ্যের সংখ্যাসারি বা অক্ষরের সারি পর পর উপস্থাপিত করে দেখতে হয় যে কতদূর পর্যন্ত সে নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারে। নীচে এই রকম দুটি সারি দেওয়া হল। প্রথমটি সংখ্যার সারি, দ্বিতীয়টি অক্ষরের সারি।

প্রথম সারিটি সুরু হয়েছে ৪টি সংখ্যা নিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে ১টি করে সংখ্যা বেড়ে সব শেষের সারিতে আছে ১০টি সংখ্যা। অক্ষরের সারিটিও সুরু হয়েছে ৪টি অক্ষর নিয়ে এবং একটি করে অক্ষর বাড়তে বাড়তে শেষ সারিতে আছে ১০টি অক্ষর।

৯ ৭ ১ ৩	গ চ ম ট
২ ৮ ৩ ৫ ৯	প ক ব জ ল
৬ ৪ ৯ ২ ৭ ১	ত অ ন ব চ হ
৭ ৩ ১ ৯ ৪ ৬ ২	ম হ ফ ব ল দ চ
৫ ২ ৬ ৮ ৫ ৩ ১ ৭	র ধ গ ন ল ব ত স
৮ ৩ ৬ ২ ৭ ১ ৪ ২ ৫	ধ ম ঝ প র ক ঞ চ ট
৩ ৯ ৭ ৪ ১ ৮ ৫ ২ ৪ ৭	ব র ঠ দ গ হ ঝ ড ন থ
(সংখ্যা সারি)	(অক্ষর সারি)

মনে করা যাক, এক ব্যক্তি সংখ্যা-সারির প্রথম ৪টি সারি নিখুঁত বলতে পারল, কিন্তু ৫ম সারিটি সম্পূর্ণ বলতে পারল না। ৪র্থ সারিতে ৭টি সংখ্যা থাকায় মোটামুটিভাবে বলা চলে যে সংখ্যার ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির স্মৃতির

বিস্তার হল ৭। তেমনই কেউ যদি ষষ্ঠ সংখ্যা সারিটি পর্যন্ত নির্ভুল বলতে পারে তাহলে তার স্মৃতির বিস্তার হবে ৯। একইভাবে অক্ষরের ক্ষেত্রেও ব্যক্তির স্মৃতির বিস্তারের পরিমাপ করা যেতে পারে।

বুদ্ধির অভীক্ষায় ব্যক্তির স্মৃতির বিস্তারের পরিমাপ প্রায়ই অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার কারণ হল যে স্মৃতির বিস্তারের সঙ্গে মনের বিকাশের গভীর সম্পর্ক আছে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। দেখা গেছে যে বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতির বিস্তারও বাড়ে। নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সাধারণ ব্যক্তির স্মৃতির বিস্তার প্রায় ৭'র কাছাকাছি।

নয়

মনোযোগের স্বরূপ (Nature of Attention)

সাধারণ মানুষ মনোযোগকে একটি মানসিক শক্তি বলে গণ্য করে থাকে। আবার অনেকে মনোযোগকে মনের একটি বিশেষ অবস্থা বলে বর্ণনা করে থাকেন। প্রাচীন শক্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীরা মনোযোগকে একটি মানসিক শক্তি বলে মনে করতেন এবং বিশ্বাস করতেন যে চর্চার দ্বারা মনোযোগের শক্তিকে বাড়ানো যায়।

কিন্তু এ সব ধারণা যে ভুল এ কথা নানা গবেষণার মাধ্যমে বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে। মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া বিশেষ। আমাদের পরিপার্শ্বে প্রতিমুহূর্তেই অসংখ্য উদ্দীপক ছড়ানো রয়েছে। তাদের প্রত্যেকেরই যেন প্রচেষ্টা আমাদের কাছ থেকে সাড়া বা প্রতিক্রিয়া আদায় করা। কিন্তু সেদিক দিয়ে আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। আমরা একই মুহূর্তে একটির বেশী দুটি উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে পারি না। স্বভাবতই আমাদের এই উদ্দীপকের জনতা থেকে একটি বিশেষ উদ্দীপককে বেছে নিতে হবে এবং সেটির প্রতি সাড়া দিতে হবে। বহু উদ্দীপকের মধ্যে থেকে একটি উদ্দীপকের এই মানসিক নির্বাচন ও তার প্রতি সাড়া দেওয়া—এই প্রক্রিয়া দু'টির একত্রিত নাম হল মনোযোগ দেওয়া। যেমন, এই মুহূর্তে একাধিক উদ্দীপক আমাকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। পাখার হাওয়া, টেবিল ল্যাম্পের আলো, বাইরে মোটর গাড়ীর হর্নের আওয়াজ, পাশের বাড়ীর পিয়ানোর টুং টাং শব্দ, সামনের বাগান থেকে ভেসে আসা হাসনাহানার গন্ধ, আমার সামনে রাখা লেখার প্যাড ইত্যাদি একরাশ উদ্দীপক তাদের বহুবিধ আবেদন আমার কাছে এনে হাজির করেছে। কিন্তু এতগুলি উদ্দীপকের আবেদন অগ্রাহ্য করে আমি একমাত্র আমার লেখার প্যাডটিকে বেছে নিয়েছি এবং তার আবেদনেই সাড়া দিয়েছি, অর্থাৎ লিখে চলেছি। বহু উদ্দীপকের মধ্যে থেকে আমার এই একটিকে বেছে নেওয়ার কাজটিকে মনোযোগ দেওয়া বলা হয়। এক কথায় আমি লেখার কাজে মনোযোগ দিয়েছি।

মনোযোগের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Attention)

মনোযোগ দেওয়ার কাজটি বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই।

মানুষের সব আচরণই পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা মাত্র। মনোযোগও তাই। যখন বিশেষ একটি উদ্দীপককে বেছে নিয়ে তার প্রতি আমরা সাড়া দিতে যাই তখন পরিবেশের সঙ্গে আমাদের নতুন করে সঙ্গতিবিধান করতে হয় এবং তার ফলে আমাদের অভ্যন্তরে নানারূপ পরিবর্তন দেখা দেয়। সেগুলি হল এই—

১। সঞ্চালনমূলক পরিবর্তন

প্রথমত, মনোযোগ দেবার সময় ব্যক্তির মধ্যে নানারকম সঞ্চালনমূলক পরিবর্তন (Motor Changes) দেখা দেয়। যেমন, বসা বা দাঁড়ানোর ভঙ্গীর মধ্যে পরিবর্তন, ঘাড় বাড়িয়ে দেখা বা মাথা হেলিয়ে শোনার চেষ্টা করা ইত্যাদি বিভিন্ন ভঙ্গীগত পরিবর্তন ছাড়াও শরীরের কতকগুলি বিশেষ পেশীর মধ্যে একটা কাঠিন্যও এই সময় দেখা দেয়।

২। ইন্দ্রিয়ঘটিত পরিবর্তন

দ্বিতীয়ত, মনোযোগ দেবার সময় ব্যক্তির মধ্যে নানারকম ইন্দ্রিয়ঘটিত পরিবর্তন (Sensory changes) দেখা দেয়। যেমন, কোন দৃশ্য বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে হলে চোখ ঘোরানো ও যথাস্থানে দৃষ্টি স্থাপন করা ইত্যাদি নানা চক্ষু-ইন্দ্রিয়ঘটিত আচরণ ব্যক্তিকে সম্পন্ন করতে হয়। তা ছাড়া এ সময় চোখের মধ্যেও পেশীগত নানা পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে থাকে। সেইরূপ অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রেও মনোযোগ দেবার সময় এই ধরনের নানা পরিবর্তন দেখা দেয়।

৩। স্নায়ুঘটিত পরিবর্তন

তৃতীয়ত, মনোযোগ দেবার সময় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্নায়বিক পরিবর্তন (Neural changes) সংঘটিত হয়। যখন আমরা মনোযোগ দিই তখন মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষে নানারকম গঠনমূলক পরিবর্তন দেখা দেয়।

৪। প্রত্যক্ষণের স্পষ্টতা

মনোযোগের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যক্ষণের স্পষ্টতা (Clarity of perception)। অর্থাৎ যে বস্তুটিতে আমরা মনোযোগ দিচ্ছি সে বস্তুটি পূর্বের চেয়ে আমাদের কাছে আরও বেশী পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমাদের প্রত্যক্ষণের গণ্ডীর মধ্যে সব সময়েই বহু বস্তু অন্তর্ভুক্ত থাকে। কিন্তু তার সবগুলিকে আমরা সব সময়ে পরিষ্কারভাবে প্রত্যক্ষণ করি না। সেগুলির মধ্যে যে বস্তুটির প্রতি আমরা বিশেষ করে মনোযোগ দিই সেই বস্তুটির প্রত্যক্ষণই পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হয়ে ওঠে, অন্যগুলি অস্পষ্টই থেকে যায়। যেমন, পাশের ঘরে কারা কথা বলছে

বলছে যদি আমি সেদিকে মনোযোগ না দিই তবে কি কথা হচ্ছে বুঝতে পারব না, কিন্তু যে মুহূর্তেই ওদিকে মনোযোগ দেব সে মুহূর্তেই ওদের কথাবার্তা আমার কাছে পরিষ্কার ও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

৫। সচেতনতার কেন্দ্রীভবন

মনোযোগের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল যে যখন কোন বস্তুর প্রতি আমরা মনোযোগ দিই তখন সেই বস্তুটি আমাদের সচেতনতার কেন্দ্রে (Centre of consciousness) এসে উপস্থিত হয়। আমাদের সচেতনতায় সব সময়েই বহু বস্তু বর্তমান রয়েছে। কিন্তু সব সময় সব বস্তুই আমাদের সচেতনতার কেন্দ্রে থাকে না। যখন যে বস্তুটির প্রতি মনোযোগ দিই সেটি ছাড়া আর সবই থাকে আমাদের সচেতনতার বিভিন্ন প্রান্তভূমিতে ছড়িয়ে এবং সেগুলির সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতাও নানা মাত্রার হতে পারে। কিন্তু যখনই সেগুলির মধ্যে কোন একটি বিশেষ বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিই তখনই সেই বস্তুটি সচেতনতার প্রান্ত থেকে কেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয় এবং পূর্ণভাবে আমাদের সচেতনতাকে অধিকার করে।

মনোযোগের নির্ধারকসমূহ বা সর্তাবলী
(Determiners or Conditions of Attention)

আমাদের মনোযোগ কিসের দ্বারা নির্ধারিত হয়, এ প্রশ্নটিও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের চারপাশে সব সময়েই অসংখ্য উদ্দীপক রয়েছে অথচ তাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়, আবার অন্য আর একটি সমর্থ হয় না। এর কারণগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথম, অভ্যন্তরীণ নির্ধারক (Internal Determiners) এবং দ্বিতীয়, বাহ্যিক নির্ধারক (External Determiners)। এই দু'ধরনের নির্ধারককে এক কথায় মনোযোগের সর্তাবলী (Conditions of Attention) বলা হয়।

অভ্যন্তরীণ নির্ধারক (Internal Determiners)

মনোযোগের অভ্যন্তরীণ নির্ধারক বলতে সেই সব বস্তুকে বোঝায়, যেগুলি থাকে ব্যক্তির মধ্যে। এই পর্যায়ের নির্ধারকগুলিকে এক কথায় মানসিক প্রস্তুতি (Mental Set) নাম দেওয়া যেতে পারে। মানসিক প্রস্তুতি বলতে বোঝায় বিশেষ কোন একটি বা এক শ্রেণীর উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার জন্য মনের দিক দিয়ে তৈরী হয়ে থাকা। বিভিন্ন ব্যক্তির মানসিক প্রস্তুতি বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। যেমন, কোন একটি নতুন দেশে একজন উদ্ভিদতত্ত্ববিদ্, একজন ভূতত্ত্ববিদ্ এবং একজন মনোবিজ্ঞানী বেড়াতে গেলেন। প্রথম ব্যক্তির

মনোযোগ আকর্ষণ করবে সে দেশের ফুল, ফল, গাছপালা প্রভৃতি। দ্বিতীয় ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণ করবে সে দেশের মাটি, পাথর, শিলাখণ্ড প্রভৃতি। আর তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করবে সে দেশের মানুষের আচরণ, প্রথা, উদ্দেশ্য প্রভৃতি। এই মানসিক প্রস্তুতির বিভিন্নতার পেছনে বহু রকম শক্তি কাজ করে থাকে। যেমন, ব্যক্তির আগ্রহ, কৌতূহল, চাহিদা, রুচি ইত্যাদি।

বাহ্যিক নির্ধারক (External Determiners)

মনোযোগের বাহ্যিক নির্ধারক হল সেই সব বৈশিষ্ট্য যা থাকে ব্যক্তির বাইরে কিন্তু উদ্দীপকের মধ্যে। এগুলিও আবার নানা রকমের হতে পারে, যেমন—

১। প্রকৃতি—প্রকৃতিগত কারণের জন্য কোন কোন উদ্দীপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে। যেমন, রঙীন জিনিস সাদা জিনিসের চেয়ে বেশী আকর্ষণীয় হয়।

২। তীব্রতা—উজ্জ্বল আলো, উচ্চ শব্দ, তীব্র ব্যথা প্রভৃতির প্রতি সহজেই আমাদের মনোযোগ যায়।

৩। আকৃতি—বিরাট আয়তনের কোন বস্তু ক্ষুদ্র আয়তনের বস্তুর চেয়ে আমাদের মনোযোগ অধিক আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়।

৪। পুনরাবির্ভাব—একটি উদ্দীপককে যদি বার বার আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হয় তবে আমরা সেটির প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হই।

৫। অবস্থিতি—কোন কোন বিশেষ অবস্থিতি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন, বইয়ের পাতার উপরের দিকটায় নীচের দিকের চেয়ে আগে আমাদের দৃষ্টি পড়ে। অতএব ঐ বিশেষ অবস্থিতিতে যদি কোন উদ্দীপক থাকে তবে সেটি আগেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

৬। পরিবর্তন—উদ্দীপকের মধ্যে কোন পরিবর্তন সংঘটিত হলে সেটি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন, একজন লোক চলতে চলতে হঠাৎ থেমে গেলেই আমাদের দৃষ্টি সে দিকে চলে যাবে।

৭। নতুনত্ব—যা অপ্রত্যাশিত বা অস্বাভাবিক তা স্বভাবতই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে।

৮। গতি—স্থির বস্তুর চেয়ে গতিশীল বস্তু আমাদের অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন, চঞ্চল নিয়ন আলোর বিজ্ঞাপন নিশ্চল আলোর বিজ্ঞাপনের চেয়ে অধিক আকর্ষণীয়।

৯। বিচ্ছিন্নতা—অন্য সকল উদ্দীপক থেকে যদি একটি বিশেষ উদ্দীপককে সরিয়ে আনা হয় তবে সেই বিচ্ছিন্ন উদ্দীপকটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

মনোযোগের শ্রেণীবিভাগ

(Classification of Attention)

প্রকৃতির দিক দিয়ে মনোযোগ তিন প্রকারের হতে পারে, যেমন,

১। স্বতঃপ্রসূত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ

(Involuntary or Non-volitional attention)

২। ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগ (Voluntary or Volitional attention) এবং

৩। অভ্যাসমূলক মনোযোগ (Habitual attention)।

১। স্বতঃপ্রসূত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ

যখন আমরা নিছক উদ্দীপক বা পরিস্থিতির তাগাদায় মনোযোগ দিতে বাধ্য হই, তখন সেই মনোযোগকে স্বতঃপ্রসূত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ বলা হয়। যেমন বিদ্যুৎ চমকানো, মটরগাড়ীর টায়ার ফাটার শব্দ, আকস্মিক ব্যথা, তীব্র ইলেকট্রিক শক ইত্যাদির প্রতি আমাদের মনোযোগ স্বতঃপ্রসূতভাবেই দেখা দেয়। সেগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে আমাদের কোন মানসিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। স্বতঃপ্রসূত মনোযোগ অনেকটা রিফ্লেক্স জাতীয় এবং এ জাতীয় মনোযোগের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি থাকুক আর না থাকুক মনোযোগ আপনা হতেই সেদিকে চলে যাবে।

২। ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগ

আর যখন কোন উদ্দীপকের প্রতি আমরা ইচ্ছা করে মনোযোগ দিই তখন সেই মনোযোগকে ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগ বলা হয়। আমাদের দৈনন্দিন কাজ কর্মে প্রতিনিয়তই এ ধরনের মনোযোগ আমরা দিয়ে থাকি। ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগের প্রয়োজন হয় সেই সকল ক্ষেত্রে যেখানে অপেক্ষাকৃত আকর্ষণীয় কোন উদ্দীপক আমাদের মনোযোগ অধিকার করে বসে এবং সেই আকর্ষণীয় উদ্দীপকের দাবীকে উপেক্ষা করে অন্য কোনও কম আকর্ষণীয় বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ দিতে হয়। যেমন, একঘেয়ে কোনও আলোচনা বা বক্তৃতা শোনা, নীরস কোনও রিপোর্ট বা প্রবন্ধ পড়া ইত্যাদি। এ সকল ক্ষেত্রে মনোযোগ দিতে আমাদের মানসিক প্রচেষ্টা ও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হয়। মনের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে আকর্ষণীয় কোনও বস্তুর

প্রতি মনোযোগ দেওয়া। ফলে মনের স্বাভাবিক প্রবণতা ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং ততক্ষণই মনোযোগ অটুট থাকে যতক্ষণ এই দ্বন্দ্বে ইচ্ছার শক্তি প্রবলতর থাকে।

৩। অভ্যাসগত মনোযোগ

কোনও কোনও ক্ষেত্রে আবার মনোযোগ দেওয়াটা একপ্রকার অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। এই মনোযোগকে অভ্যাসগত মনোযোগ বলা হয়। এ ধরনের মনোযোগের বৈশিষ্ট্য হল যে উদ্দীপকের কোনও নিজস্ব সহজ আকর্ষণ না থাকলেও সেটির প্রতি মনোযোগ দিতে ব্যক্তির কোনরূপ ইচ্ছা বা প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। যেমন, মোটরচালকের ক্ষেত্রে মোটরগাড়ীর হর্ন শোনা, মায়ের ক্ষেত্রে বাচ্চার কান্না শোনা, প্রুফ রীডারের ক্ষেত্রে বানান ভুল দেখা ইত্যাদি মনোযোগের ক্ষেত্রগুলি অভ্যাসের স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। তার ফলে এগুলির প্রতি কোন স্বাভাবিক আকর্ষণ না থাকলেও নিছক অভ্যাসের বশে এগুলির প্রতি স্বতঃপ্রসূত মনোযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। প্রকৃতির দিক দিয়ে স্বতঃপ্রসূত মনোযোগ আর অভ্যাসগত মনোযোগের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তবে প্রথম শ্রেণীর মনোযোগের মূলে আছে উদ্দীপকের আকর্ষণ করার স্বাভাবিক ক্ষমতা আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মনোযোগের মূলে আছে নিছক ব্যক্তির অভ্যাস।

যে সকল বিষয়ে এককালে মনোযোগ দিতে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন হত, অভ্যাসে পরিণত হলে সেই সকল ক্ষেত্রে মনোযোগ স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই সৃষ্ট হয়ে যায়। যে ছেলেকে স্কুলে অঙ্কের বইতে জোর করে মনোযোগ দিতে হয়েছিল, বড় হয়ে সে যখন গণিতের অধ্যাপক হল, তখন অনেক কঠিন কঠিন অঙ্কের বইতে মনোযোগ দিতে তার আর কোনরূপ মানসিক প্রচেষ্টা লাগল না। এই রূপান্তরের মূলে থাকে আমাদের প্রয়োজনবোধ, আগ্রহ, সামাজিক প্রথা, মনোভাব ইত্যাদি।

ক। আরোপিত ও স্বাভাবিক মনোযোগ

ইচ্ছা-নিরপেক্ষ (Non-volitional) মনোযোগকে আবার কোনও কোনও মনোবিজ্ঞানী দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা, আরোপিত (Enforced) এবং স্বাভাবিক (Spontaneous)। আরোপিত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ বলতে সেই মনোযোগকেই বোঝায় যা কোন প্রবৃত্তি থেকে জন্ম নেয় এবং প্রবৃত্তির তাগাদাতেই সক্রিয় থাকে। যেমন, ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাওয়ার সময় যে মনোযোগ

ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় সেটি আরোপিত ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগ। ক্ষুধারূপ প্রবৃত্তিটিই যেন এই মনোযোগ ব্যক্তির উপর আরোপ করে দিয়েছে এবং যতক্ষণ এই প্রবৃত্তিটি সক্রিয় থাকে ততক্ষণ মনোযোগও অব্যাহত থাকে।

স্বাভাবিক ইচ্ছা-নিরপেক্ষ মনোযোগের মূলে আছে কোন অর্জিত আগ্রহ বা সেন্টিমেণ্ট। যেমন, ধরা যাক কারও মধ্যে ছবি তোলার গভীর আগ্রহ জন্মেছে। তার ফলে ছবি বা ছবি-ঘটিত অন্য কিছুতে তার মনোযোগ স্বাভাবিক ভাবেই যাবে।

খ। অবিভক্ত ও বিভক্ত মনোযোগ

ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগকেও আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে—অবিভক্ত (Implict) এবং বিভক্ত (Explict)। অবিভক্ত ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগের ক্ষেত্রে মনোযোগের পশ্চাতে থাকে একটি মাত্র এবং অবিভক্ত ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ। আর বিভক্ত ইচ্ছাপ্রসূত মনোযোগের ক্ষেত্রে মনোযোগকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন হয় বার বার ও একাধিক ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ। স্পষ্টতই অবিভক্ত মনোযোগ বিভক্ত মনোযোগের তুলনায় দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং অধিকতর কার্যকর হয়।

মনোযোগের বিকাশ (Development of Attention)

শিশুর মনোযোগের বিকাশ পর্যবেক্ষণ করলে তার তিনটি স্তর পাওয়া যায়। প্রথম, শৈশবে শিশুর মনোযোগ ইচ্ছা-নিরপেক্ষ থাকে। এ সময়ে উদ্দীপকের প্রকৃতি অনুযায়ীই তার সমস্ত মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয়। ইচ্ছার প্রয়োগ করে কোন কিছুতে মনোযোগ দেওয়া তার পক্ষে তখন সম্ভব হয় না। সেই জন্য অতি শৈশবে শিশুকে এমন কোন বিষয় বা তথ্য শেখানোর চেষ্টা করা উচিত নয় যাতে তাকে জোর করে মনোযোগ দিতে হবে। রঙচঙে জিনিসপত্র প্রচুর ছবিওয়ালা বই ইত্যাদি সহজেই তার মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং সেই ধরনের বস্তুর সাহায্যেই তাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত।

শিশু আর একটু বড় হলে ক্রমশ তার ইচ্ছার দ্বারা সে তার মনোযোগকে নিয়ন্ত্রিত করতে শেখে। স্বাভাবিকভাবে মনোযোগ আকৃষ্ট হয় না বা তার কাছে আকর্ষণীয় নয় এমন কোন বিষয় বা বস্তুর প্রতিও সে মনোযোগ দিতে সমর্থ হয় না। বিশেষ করে স্কুলে নানা কাজ ও পাঠে ইচ্ছা-প্রসূত মনোযোগ প্রয়োগ করতে সে বাধ্য হয়।

তৃতীয় স্তরে অর্থাৎ পরিণত বয়সে তার মধ্যে অভ্যাসমূলক মনোযোগ দেখা

দেয়। এই সময় এককালে যে বস্তুর প্রতি তাকে জোর করে মনোযোগ দিতে হত তার প্রতি সে বিনা আয়াসে মনোযোগ দিতে সমর্থ হয়। নিজের কাজকর্ম, বৃত্তির চাপ, পরিবেশের চাহিদা, হবি, শখ ইত্যাদি থেকে ব্যক্তির মধ্যে এই ধরনের নানা অভ্যাসমূলক মনোযোগ দেখা দেয়।

মনোযোগ ও আগ্রহ (Attention and Interest)

কোন কোন উদ্দীপকের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যা স্বভাবতই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। এগুলির ক্ষেত্রে মনোযোগ দেবার জন্য আমাদের কোন চেষ্টা করতে হয় না। উদ্দীপকটি জোর করে আমাদের মনোযোগ অধিকার করে, আমাদের মন সেটির প্রতি সাড়া দেবার জন্য তৈরী থাক, আর না থাক। এগুলিকে মনোযোগের বাহ্যিক নির্ধারক বলা হয়।

কিন্তু যে সকল উদ্দীপকের এভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করার স্বাভাবিক ক্ষমতা নেই, সে সকল ক্ষেত্রে আমাদের মনোযোগ নিয়ন্ত্রিত হয় অভ্যন্তরীণ নির্ধারকের দ্বারা—এক কথায় যার নাম দিয়েছি আমরা মানসিক প্রস্তুতি। এই মানসিক প্রস্তুতির একটি বড় উপাদান হল আগ্রহ। যে বস্তুটির প্রতি আমাদের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে সেই বস্তুর প্রতি মনোযোগ দেবার জন্য আমাদের মানসিক প্রস্তুতিও স্বভাবত গঠিত হবে।

নানা মনোবিজ্ঞানী আগ্রহের নানা সংজ্ঞা দিয়েছেন। হার্বার্টের মত আগ্রহ হল নতুন কোন জ্ঞান আহরণের জন্য মনের প্রস্তুতি। ডিউইর মতে ব্যক্তির নিজের বিকাশপ্রক্রিয়ার অভিমুখে তার সত্তার স্বতঃপ্রসূত অগ্রগতিই হল আগ্রহ। আগ্রহকে আমরা যে ভাবেই বর্ণনা করি না কেন একথা অনস্বীকার্য যে আগ্রহ ও মনোযোগের মধ্যে একটি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ বর্তমান। মনোযোগ হল মনের উদ্দীপক-নির্বাচনী প্রক্রিয়া এবং এর পেছনে আছে মনের একটি বিশেষ সংগঠন। এই সংগঠনকেই আমরা মানসিক প্রস্তুতি বা আগ্রহ বলে থাকি। এই মানসিক প্রস্তুতি বা আগ্রহের জন্যই আমরা অনেকগুলি উদ্দীপকের মধ্যে থেকে একটি বিশেষ উদ্দীপককে বেছে নিই। যখন এই বিশেষ মানসিক সংগঠনটি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে তখন তাকে আগ্রহ বলি আর যখন সেটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিশেষ একটি মানসিক প্রক্রিয়ার রূপ নেয় তখন তাকে বলি মনোযোগ। এক কথায় বিশেষ একটি উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেওয়ার ইচ্ছাটি যখন নিছক ইচ্ছারূপে মনে থাকে তখন তাকে বলি আগ্রহ, আর যখন হাজার উদ্দীপকের মধ্যে থেকে ঐ বিশেষ উদ্দীপকটিকে বেছে নিয়ে সেটির প্রতি

সাড়া দিই তখন তাকে বলে মনোযোগ। ম্যাকডুগালের ভাষায় আগ্রহ হল সুপ্ত মনোযোগ এবং মনোযোগ হল আগ্রহের সক্রিয় অবস্থা[1]।

আমাদের মধ্যে এই আগ্রহ সৃষ্টির পিছনে থাকতে পারে নানা কারণ, যেমন, জৈবিক চাহিদা, মানসিক চাহিদা, কৌতূহল, মনোভাব, অনুকরণ, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি। যে কোনও কারণের জন্যই আগ্রহ সৃষ্টি হোক্ না কেন, আগ্রহ একবার সৃষ্টি হলে তা যে একটি শক্তিশালী মানসিক সংগঠন হয়ে দাঁড়ায় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আগ্রহ কেবলমাত্র ব্যক্তির মনোযোগকেই নিয়ন্ত্রিত করে না, আগ্রহ ব্যক্তির আচরণধারা, প্রেষণা প্রভৃতি সব কিছুকেই বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

শিক্ষায় আগ্রহ ও মনোযোগ

(Interest & Attention in Education)

কোন কিছু শিখতে হলে মনোযোগের প্রয়োজন সব চেয়ে আগে। পঠনীয় বিষয়টির প্রতি ঠিকমত মনোযোগ দিতে না পারলে সেটি শেখা সম্ভব হয় না। আবার আগ্রহের সঙ্গে মনোযোগের সম্বন্ধও অঙ্গাঙ্গী। যা ভিতরে আগ্রহ তাই বাইরে মনোযোগ। অতএব শিক্ষার সঙ্গে আগ্রহের সম্পর্ক যে অতি নিবিড় একথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

তাহলে একথাও বলা চলতে পারে যে শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি যাতে শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকে সেটি সর্বাগ্রে দেখতে হবে। এক কথায় শিশুর শিক্ষাকে তার আগ্রহের উপর গড়ে তুলতে হবে। যে শিক্ষায় শিশু আগ্রহ বোধ করে না সে শিক্ষা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

এই কারণেই শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে তোলাটা আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান কর্মসূচী। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই শিক্ষাবিদ্গণ এই নীতির উপর বিশেষ করে গুরুত্ব দিয়ে এসেছেন। জার্মান শিক্ষাবিদ্ জোহান হার্বার্ট শিক্ষায় শিক্ষার্থীর আগ্রহ সৃষ্টি করা শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য বলে বর্ণনা করেছেন। আধুনিক শিক্ষাবিদ্ জন ডিউই আগ্রহের এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে ব্যক্তির ঈপ্সিত ক্রমবিকাশের পথে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তার সত্তার এগিয়ে যাওয়ার নামই আগ্রহ। অতএব আগ্রহ হবে শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত পথ-নির্দেশক। তাঁর মতে শিশুর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা বলে কোন কথা হতে পারে না। কেননা আগ্রহ সত্তার বিকাশলাভের স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়াস, তা বাইরে থেকে সৃষ্টি করা যায় না।

1. Interest is latent attention and attention is interest in action —McDougall.

শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করতে হলে তাকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। এ কথাটির কিন্তু অনেকে ভুল অর্থ করেন। তাঁরা মনে করেন যে শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করে তোলার অর্থ হল যে শিক্ষণীয় বস্তুর মধ্যে যা কিছু দুরূহ, কঠিন বা শ্রমসাপেক্ষ তা শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে বাদ দিতে হবে এবং কেবলমাত্র সহজ, রমণীয় ও চিত্তাকর্ষক বস্তু দিয়েই শিক্ষাসূচী সংগঠিত হবে। তাঁরা এই জন্যই আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে 'কোমল শিক্ষব্যবস্থা' (Soft Pedagogy) বলে সমালোচনা করেন এবং এ ধরনের শিক্ষানীতি গ্রহণ করলে শিক্ষার মান অত্যন্ত অবনত হয়ে যাবে বলে তাঁরা মনে করেন।

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের আশঙ্কা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং আগ্রহ কথাটির বিকৃত অর্থ থেকেই এই ভুল ব্যাখ্যার জন্ম হয়েছে।

শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে তোলার অর্থ এ নয় যে শিক্ষার মানকে নীচু করতে হবে বা শিক্ষার সূচীতে দুরূহ বা জটিল কোন বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা চলবে না। এ কথাটির প্রকৃত অর্থ হল যে শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণ করার জন্য শিশুর মধ্যে যেন যথেষ্ট স্বাভাবিক উৎসাহ ও ইচ্ছা থাকে। শিশুর মধ্যে যদি পাঠ গ্রহণের জন্য যথার্থ আসক্তি থেকে থাকে তবে সে পাঠ যতই দুরূহ বা কষ্টসাপেক্ষ হোক্ না কেন অতি সহজেই শিশু তা গ্রহণ করবে, অবশ্য যদি সে পাঠ শিশুর মানসিক সামর্থ্যের অনুপযোগী না হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষাকে চিত্তাকর্ষক করার আধুনিক আন্দোলনটি সুপ্রমাণিত মনস্তত্ত্বমূলক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাঁরা এই আন্দোলনকে 'কোমল শিক্ষানীতি' বলে সমালোচনা করে থাকেন তাঁরা আসলে এর মূল সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেন নি।

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে যেখানে মনোযোগ স্বতঃপ্রসূত বা ইচ্ছা-নিরপেক্ষ সেখানে না হয় বলা চলে যে মনোযোগের পিছনে শিশুর আগ্রহ আছে এবং সে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষাও যে স্বভাবতই আগ্রহ-অনুগামী হবে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই ত আর স্বতঃপ্রসূত মনোযোগ আসে না। শিক্ষার বহু বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থী পাঠগ্রহণে স্বতঃপ্রসূত মনোযোগ দিতে পারে না এবং তাকে জোর করে ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের দ্বারা বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ আনতে হয়। সে সকল ক্ষেত্রে কি করে শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক বলে বর্ণনা করা যায়?

এই উত্তরে এটুকু বলা যেতে পারে যে অপেক্ষাকৃত দুরূহ ও বাহ্যত নীরস পাঠে মনোযোগ দিতে হলে শিক্ষার্থীকে অবশ্য ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হয়,

একথা সত্য। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে সেই পাঠ-গ্রহণে তার আগ্রহের অভাব আছে কিংবা তার মনোযোগ আগ্রহভিত্তিক নয়। বহির্জগতের পরস্পরের প্রতিযোগী অসংখ্য উদ্দীপক থেকে মনোযোগকে সরিয়ে এনে অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয় কোনও উদ্দীপকের উপর মনোযোগকে নিবদ্ধ করতে হলে ইচ্ছার প্রয়োগ অপরিহার্য, কিন্তু এই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগের পিছনে যদি শিক্ষার্থীর সত্যকারের আগ্রহবোধ না থাকে তবে সে মনোযোগ কখনই স্থায়ী হয় না এবং শিক্ষাও কার্যকর হয় না। যখন ক্লাশরুমে শিক্ষার্থী কোনও দুরূহ অর্থ-নীতি বা দর্শনের তত্ত্বব্যাখ্যা শুনছে তখন তাকে জোর করে সেই বক্তৃতায় মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হচ্ছে বটে, কিন্তু তার ইচ্ছাশক্তির পিছনে নিশ্চয় কাজ করছে ঐ বক্তৃতাটি শোনার সার্থকতা সম্বন্ধে একটি দৃঢ় বিশ্বাস। একেই আমরা আগ্রহ বলতে পারি। এক কথায় যে বস্তুর শিক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর কোন রকম উপকার হবে বা তার কোন চাহিদা মিটবে সেই বস্তুর প্রতিই শিক্ষার্থীর আগ্রহ আছে বলা যায়।

এই আগ্রহ বা সার্থকতা সম্বন্ধে সচেতনতার অপর নাম হল চাহিদা বোধ। যে বস্তু সম্বন্ধে ব্যক্তির মধ্যে চাহিদা জন্মায়, তা পাবার জন্য স্বাভাবিকভাবেই তার আগ্রহ আসে। প্রাচীন এবং বহু আধুনিক শিক্ষাবিদেরই ধারণা যে শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ বাইরে থেকে সৃষ্টি করা যায়। এই বিশ্বাসের বশেই শিক্ষার ক্ষেত্রে শাস্তি পুরস্কার দেবার প্রথা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। শিক্ষক বা পিতামাতারা বিশ্বাস করতেন যে শাস্তির ভয়ে বা পুরস্কারের লোভে শিশুর আগ্রহ জন্মাবে। কিন্তু এটি একটি বিরাট মনস্তত্ত্বমূলক ভুল। আগ্রহ হল স্বাভাবিক প্রেরণাবোধ। ডিউইর ভাষায় আগ্রহ হল ব্যক্তিসত্তার নিজের বিকাশের পথে এগিয়ে যাবার স্বতঃপ্রসূত প্রয়াস। অতএব শাস্তি-পুরস্কারের সাহায্যে যে আগ্রহ সৃষ্টি করা হয় সে আগ্রহ ক্ষণস্থায়ী, দুর্বল ও কৃত্রিম। তা থেকে স্থায়ী ফল পাবার আশা কখনই করা যেতে পারে না। সেজন্য স্বাভাবিক আগ্রহ সৃষ্টি করতে হলে দেখতে হবে যে শিক্ষণীয় বস্তুর প্রতি যেন শিক্ষার্থীর সত্যকারের চাহিদা জন্মায়। অর্থাৎ শিক্ষাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিশুর ব্যক্তিসত্তার প্রয়োজনের সঙ্গে তার পূর্ণ সঙ্গতি থাকে। সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি এতদিন নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছে। এর ফলে শিশুর নিজস্ব চাহিদার কাছে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতি একেবারে অপরিচিত বলে মনে হত এবং শিশু কোনদিনই সেগুলি গ্রহণ করতে আগ্রহ বোধ করতে না। ফলে শিক্ষা হয়ে উঠত শাসন-ভিত্তিক ও নিপীড়নমূলক।

কিন্তু আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় বিকাশমান শিশুর বিভিন্ন চাহিদা-গুলিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং শিক্ষার বিষয়, পদ্ধতি, শৃঙ্খলা—এ সমস্তকেই সেই চাহিদাগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ফলে শিশুর পাঠগ্রহণে স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা দেয় এবং অতি সহজে ও স্বল্প আয়াসে শিশু পাঠ শিক্ষা করতে পারে।

মনোযোগের বিস্তার (Span of Attention)

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে স্মৃতির বিস্তার[1] সীমাবদ্ধ। সেই রকম মনোযোগের বিস্তারেরও একটা সীমা আছে। অর্থাৎ একবার মাত্র মনোযোগ দিয়ে যে কটি দ্রব্য ব্যক্তি নির্ভুলভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে তার সংখ্যা সীমাবদ্ধ। এই পরিমাপকে মনোযোগের বিস্তার (Span of Attention) বা উপলব্ধির বিস্তার (Span of Apprehension) বলা হয়।

ট্যাকিস্‌টোস্কোপ (Tachistoscope) নামক যন্ত্রের সাহায্যে মনোযোগের বিস্তারের পরিমাপ করা হয়। এই যন্ত্রটিতে ব্যক্তির সামনে কতকগুলি বস্তুর ছবি (যেমন বিন্দু, রেখা, শব্দ, ফুল, ফল বা জন্তুর ছবি) মুহূর্তের জন্য আলোকিত হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই বস্তুগুলিকে ঐ অল্প সময়ের জন্য একবার দেখে ব্যক্তিকে বলতে হয় সে ক'টি বস্তু দেখেছে। আলোকনের সময়টি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয় যাতে ব্যক্তি একবারের বেশী দু'বার মনোযোগ দেবার সময় না পায়। আলোকিত বস্তুর সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়িয়ে দেখতে হয় যে সর্বোচ্চ কত সংখ্যক বস্তু ব্যক্তিটি এভাবে একবার মাত্র মনোযোগ দিয়ে নির্ভুলভাবে দেখতে পারে। দেখা গেছে যে সাধারণ মানুষ ৫।৬ টির বেশী বস্তু একসঙ্গে একবারে দেখতে পারে না। অতএব এই ৫ বা ৬ হল ব্যক্তির মনোযোগের বিস্তার।

মনোযোগের বিচলন (Fluctuation of Attention)

মনোযোগের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল এর পরম অস্থিরতা। এটি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা যে আমাদের মনোযোগ প্রতিনিয়তই এক বস্তু থেকে অপর বস্তুতে সঞ্চালিত হচ্ছে। একটি বস্তুর উপর মনোযোগ দেবার চেষ্টা করলে দেখা যাবে যে সেই বস্তু থেকে বার বার মনোযোগ অন্যত্র চলে যাচ্ছে এবং বার বার ফিরে আসছে। মনোযোগের এই আচরণের

১। পৃঃ ১৪১

নাম দেওয়া হয়েছে বিচলন (Fluctuation)। আবার দেখা গেছে যে কখনও কখনও দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী উদ্দীপকের মধ্যে মনোযোগ ঘোরাফেরা করে। যেমন, পাশের ঘরে রেডিও বাজছে আর আমি নিজের ঘরে একটি বইতে মন দেবার চেষ্টা করছি। দেখা যাবে যে মনোযোগ ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত রেডিও এবং বইয়ের মধ্যে দুলন্ত থাকবে। একে মনোযোগের বিদোলন (Oscillation) বলা হয়।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মনোযোগের বিচলনের হার ৫.৬ সেকেণ্ড। অর্থাৎ একটি বিশেষ উদ্দীপকে ৫.৬ সেকেণ্ডের বেশী আমরা মনোযোগ রাখতে পারি না। স্বভাবতই আপত্তি উঠবে যে সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে আমরা একটি বস্তুতে এর চেয়ে অনেক বেশীক্ষণ মনোযোগ রাখতে পারি, যেমন আমরা একঘণ্টা মনোযোগ দিয়ে একটি কাজ করতে পারি বা একটি বই পড়তে পারি। এর উত্তর হল যে আমরা যখন একটি বইয়ের পাতার উপর মন দিই, আসলে তখন কিন্তু একটি বিশেষ স্থানে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে না। সমস্ত পাতার মধ্যে এক স্থান থেকে অপর স্থানে আমাদের মনোযোগ বার বার সঞ্চালিত হয়, যদিও 'বই পড়া' রূপ কাজেই সমস্ত সময় আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকছে। বড় কোনও উদ্দীপকে আমাদের মনোযোগ অনেকক্ষণ থাকতে পারে। তার কারণ, ঐ উদ্দীপকটির এক অংশ থেকে আর এক অংশে মনোযোগ সঞ্চালিত হয়। কিন্তু খুব ছোট উদ্দীপক নিলে দেখা যাবে যে মনোযোগ তাতে কখনই ৫.৬ সেকেণ্ডের বেশী নিবদ্ধ থাকতে পারছে না।

মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ

এই জন্য মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ করা হয় ক্ষুদ্রতম উদ্দীপক নিয়ে। ক্ষুদ্রতম উদ্দীপক বলতে বোঝায় যে উদ্দীপকটি এত ক্ষুদ্র যে তার চেয়ে ক্ষুদ্র হলে তা আমাদের প্রত্যক্ষণের বাইরে চলে যাবে। যেমন, একটি ঘড়ি আমাদের কানের কাছ থেকে এতটা দূরে রাখা হল যে তার চেয়ে আর একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে গেলেই তার টিক্ টিক্ শব্দটি আর কানেই শোনা যাবে না। এখন যদি ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দটির প্রতি আমরা মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করি তবে দেখা যাবে যে শব্দটি কিছুক্ষণ শোনা যাচ্ছে আবার কিছুক্ষণ শোনা যাচ্ছে না। এর কারণ হল আমাদের মনোযোগের বিচলন। অর্থাৎ ঘড়ির টিক্‌টিক্ শব্দের উপর আমাদের মনোযোগ একবার থাকছে, আর একবার থাকছে না।

আর একটি পরীক্ষণে দৃষ্ট বস্তুর উপর মনোযোগের বিচলনের পরিমাপ করা হয়। এই পরীক্ষণে ব্যবহৃত যন্ত্রটির নাম ম্যাসন ডিস্ক। ম্যাসন ডিস্কটি একটি

ইলেকট্রিক মটরের উপর ফিট করা গোলাকার সাদা চাকা। এই চাকাটির উপর তার কেন্দ্র থেকে পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত একটি মোটা কাল লাইন আঁকা থাকে। এই কাল লাইনটির মাঝে মাঝে আবার সাদা দাগ দেওয়া থাকে। এই চাকাটি যদি ইলেকট্রিক মটরের সাহায্যে জোরে ঘোরানো যায় তবে ঐ কাল লাইনটি অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং তার পরিবর্তে দেখা যাবে কতকগুলি ক্ষীণ ধূসর রঙের ঘূর্ণায়মান বৃত্ত।

আর একটি যন্ত্রের উপর একটি গোলাকার ড্রাম ঘোরে। এই ড্রামটির উপর লাগান থাকে একটি ধূমায়িত (Smoked) কাগজ। এই যন্ত্রটির নাম কিমোগ্রাফ (Kymograph)। অভীক্ষার্থীর হাতের কাছে থাকে একটি চাবি এবং চাবিটির সঙ্গে একটি ষ্টাইলাস বা লোহার কলম সংযুক্ত থাকে। চাবিটি টিপলে ষ্টাইলাসটি সচল হয়ে ওঠে এবং ঐ ঘূর্ণায়মান ধূমায়িত কাগজের উপর দাগ কেটে যায়।

এইবার অভীক্ষার্থীকে ঐ ম্যাসন ডিস্কের উপর ঘূর্ণায়মান যে কোন একটি ধূসর বৃত্তের উপর মনোযোগ দিতে বলা হয়। অভীক্ষার্থী এই চেষ্টা করলেই দেখতে পাবে যে বৃত্তটি কিছুক্ষণের জন্য অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, আবার কিছুক্ষণ পরে আবির্ভূত হচ্ছে। এর অর্থ হল ধূসর বৃত্তটির উপর তার মনোযোগ কিছুক্ষণের জন্য থাকছে, আবার কিছুক্ষণ থাকছে না। এখন প্রয়োজনমত চাবিটি টিপে অভীক্ষার্থী বৃত্তটির আবির্ভাব ও অদৃশ্যভবনের একটি নিখুঁত রেখাচিত্র ঐ কিমোগ্রাফটির উপর এঁকে ফেলতে পারে। এই বৃত্তটির আবির্ভাব ও অদৃশ্য-ভবনের হার থেকেই ব্যক্তির মনোযোগের বিচলনের হিসাব করা হয়ে থাকে।

মনোযোগের বিচলনের এই সকল পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এই ধরনের ক্ষুদ্রতম চাক্ষুষ উদ্দীপকে ব্যক্তির মনোযোগ ৫।৬ সেকেণ্ডের বেশী নিবদ্ধ থাকে না।

মনোযোগের বিভাজন (Division of Attention)

অনেকের ধারণা মনোযোগকে ভাগ করে দুটি বা তার বেশী উদ্দীপকের উপর একই সময় তা প্রয়োগ করা সম্ভব। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনোযোগ অবিভাজ্য। তবে সার্কাসে দেখা যায় যে খেলোয়াড়রা একই সঙ্গে হাত, পা, মুখ দিয়ে বিভিন্ন কাজ করছে। জুলিয়াস সিজার নাকি একসঙ্গে চারটি চিঠি আবৃত্তি করে যেতেন এবং সেই সঙ্গে পঞ্চমটি নিজে লিখতে পারতেন। মাইকেল মধুসূদন একই সঙ্গে দু'তিন খানা বইয়ের পাণ্ডুলিপি মুখে মুখে রচনা করে যেতেন

মনোযোগের বিভাজনের এই রকম অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও বহু ক্ষেত্রে আমরা একাধিক কাজ একসঙ্গে সমাধান করে থাকি। প্রকৃতপক্ষে এগুলির দু'রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমত সার্কাসের খেলোয়াড়ের ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন কাজগুলি এমন একটি যান্ত্রিক স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে যায় ফলে সেগুলি সম্পন্ন করতে তার আর মনোযোগ লাগে না। সে যদি চারটি কাজ একসঙ্গে করে তবে তার তিনটি কাজ যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে আর একটির জন্য হয়ত তার মনোযোগের প্রয়োজন হয়।

জুলিয়াস সিজার, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি কিন্তু মনোযোগের দ্রুত বিদোলনের দৃষ্টান্ত। এঁরা মনোযোগকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন যে বিভিন্ন কাজগুলির মধ্যে মনোযোগকে তাঁরা প্রয়োজনমত সঞ্চালিত করে সব কাজগুলিই একসঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।

মনোযোগের নিয়ন্ত্রণ (Control of Attention)

মনোযোগের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যা জানা গেল তা থেকে আমরা মনোযোগ নিয়ন্ত্রণের উপায় সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান তথ্য আহরণ করতে পারি। যাঁরা প্রায়ই মনোযোগের অভাব সম্বন্ধে অভিযোগ করেন তাঁরা নীচের উপায়গুলি অবলম্বন করেল উপকৃত হতে পারেন।

মনোযোগের বিকর্ষক (Distractor of Attention)

১) মনোযোগ নষ্ট করে দেয় এমন কতকগুলি বিকর্ষক (Distractor) সব ক্ষেত্রেই থাকে। কারও কারও ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ বিকর্ষক থাকে যেমন, বিশেষ কোনও সমস্যা বা দুশ্চিন্তা, বিশেষ কোন কিছুর প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি। মনোযোগকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এই বিকর্ষকগুলিকে দূর করতে হবে সর্বাগ্রে। প্রয়োজন হলে যে পরিবেশে বিকর্ষক থাকে সেই পরিবেশ থেকে দূরে সরে যেতে হবে। আর যদি বিকর্ষককে পরিবেশ থেকে দূর করা সম্ভব না হয় তবে সেই বিকর্ষকের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। যেমন, বাড়ীর পাশের কারখানায় হাতুড়ির আওয়াজ বা পাশের বাড়ীর কাঁদুনে ছেলের একঘেয়ে চীৎকার, এগুলি যখন দূর করা সম্ভব নয় তখন এগুলিকে অগ্রাহ্য করার অভ্যাস করে নিতে হবে। তবে বিকর্ষকের সঙ্গে যুদ্ধ করার চেয়ে বিকর্ষককে এড়িয়ে যাওয়া ভাল, বিশেষ করে যদি বিকর্ষকটি শক্তিশালী হয়। কেননা শক্তিশালী বিকর্ষককে ঠেকিয়ে রাখতে হলে যথেষ্ট মানসিক শক্তির অপচয় ঘটে।

২) দুশ্চিন্তা ও অমীমাংসিত সমস্যা মনোযোগের বিকর্ষণের একটি বড় কারণ।

এই জন্যই অল্পবয়স্কদের অপেক্ষা বয়স্কদের পক্ষে মনোযোগ দেওয়া শক্ত হয়ে ওঠে। মনোযোগ দিতে হলে এই ধরনের বিকর্ষণকারী সমস্যাগুলির একটি সাময়িক সমাধান পূর্বাহ্নে করে নিতে হবে।

৩) অতৃপ্ত বাসনাও একটি বড় বিকর্ষক। যেমন, পড়তে বসলে ঘুরে বেড়ানো, গল্প করা, সিনেমায় যাওয়া প্রভৃতি বাসনাগুলি অতৃপ্ত থেকে যায়। ফলে মনোযোগের বিচলন ঘটে। অতএব পড়ায় মনোযোগ দিতে বসার আগে নিজের মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে হবে। দুটি বা তার বেশী বাসনার মধ্যে কোন্ বাসনাটির তৃপ্তি হওয়া আগে দরকার সেটা ঠিক করে নিয়েই তবে মনোযোগ দিতে হবে।

৪) মনোযোগের সবচেয়ে বড় কথা হলো প্রেষণার (Motive) বোধ। যে বস্তুর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে তার প্রতি আন্তরিক আগ্রহ না থাকলে মনোযোগ আসতে পারে না। সাধারণত দেখা যায় যে ব্যক্তির সত্যকারের চাহিদার সঙ্গে মনোযোগের বস্তুর কোনও প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকায় মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিশেষ করে বৃত্তিমূলক ব্যাপারে অনেক সময় ভুল নির্বাচন হওয়ার ফলে মন দিয়ে কাজ করা সম্ভব হয় না। এর জন্য প্রথমত প্রয়োজন চাহিদা অনুযায়ী বৃত্তির নির্বাচন (১) আর দ্বিতীয়ত যদি ঘটনাচক্রে বা বাধ্য হয়েই কোন চাহিদা-বিরোধী বৃত্তির নির্বাচন হয়ে থাকে তবে তাকে অপরিবর্তনীয় বলে গ্রহণ করতে হবে এবং সেটিকে ব্যক্তির নিজের চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হবে। তখন দেখা যাবে যে তার পক্ষে মনোযোগ দিতে আর অসুবিধা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রেও প্রথমে দরকার মনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া।

৫। মনোযোগ দেবার আর একটি ভাল উপায় হল পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত কাজ করা। যার কাজের মধ্যে যত ভাল পরিকল্পনা এবং শৃঙ্খলা আছে তার পক্ষে মনোযোগ দেওয়া তত সহজ।

দশ

স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System)

প্রাণীর প্রত্যেকটি আচরণই হল পারিবেশিক উদ্দীপনার উত্তরে দেওয়া তার সাড়া বা প্রতিক্রিয়া (Response)। পরিবেশের যে সব শক্তি আমাদের কাছে থেকে এই সাড়া বা প্রতিক্রিয়া আদায় করতে পারে সেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে উদ্দীপক (Stimulus)। উদ্দীপকের কাছ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে প্রাণীর চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা জিহ্বা, ত্বক প্রভৃতি এবং এগুলির নাম হল গ্রহণেন্দ্রিয় (Receptor)। এই গ্রহণেন্দ্রিয়গুলি সেই উদ্দীপনা পাঠিয়ে দেয় প্রাণীর অভ্যন্তরে এবং প্রাণী তার উত্তরে পেশী, গ্রন্থি, অস্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে নানা আচরণ সম্পন্ন করে থাকে। শেষোক্ত বস্তুগুলিকে এইজন্য বলা হয় কর্মেন্দ্রিয় (Effector)।

অভ্যন্তরীণ সমন্বয় (Internal Integration)

কিন্তু উদ্দীপকের প্রভাব ও প্রাণীর প্রতিক্রিয়া, এ দু'য়ের মাঝখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর আছে। আমরা তাকে বলতে পারি অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের স্তর। এই অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নই প্রাণীর আচরণের প্রকৃতির নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। যখন প্রাণী কোন একটি বিশেষ আচরণ সম্পন্ন করে তখন তার মধ্যে নীচের স্তরগুলি পর পর অনুষ্ঠিত হয়। যথা—

উদ্দীপকের ক্রিয়া—>অভ্যন্তরীণ সমন্বয়ন—>প্রাণীর প্রতিক্রিয়া

এই অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটি সম্পন্ন করে যে যন্ত্রসমষ্টি তার নাম দেওয়া হয়েছে স্নায়ুতন্ত্র (Nervous System)। কোন উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে, একাধিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কেমন করে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে স্থির রাখতে হবে, কেমন করে পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলিকে সংগঠিত করতে হবে ইত্যাদি অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের অতি প্রয়োজনীয় কাজগুলি সম্পন্ন করতে প্রাণীকে সমর্থ করে তার স্নায়ুতন্ত্র। যে প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র যত উন্নত তার অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটিও তত ভাল হয়। এই জন্যই উন্নত স্নায়ুতন্ত্রের অধিকারী প্রাণীর আচরণ বিশেষধর্মী, সুসংহত এবং উদ্দীপকের উপযোগী হতে পারে। তার সঙ্গতিবিধানের উৎকর্ষও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় এবং তার ফলে জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার সম্ভাবনাও তার প্রচুর বেড়ে যায়।

স্নায়ুপথ (Nervepath)

যখন একটি উদ্দীপক প্রাণীর কোন গ্রহণেন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করে তখন যে পথের মাধ্যমে তার গ্রহণেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় তাকে স্নায়ু (nerve) বলা হয়। এই স্নায়ুপথ বেয়ে অতি দ্রুতবেগে (প্রায় সেকেণ্ডে ৭৫ গজ) উদ্দীপনা গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে কর্মেন্দ্রিয়ে পৌঁছয় এবং তারই ফলে প্রাণীর আচরণ সংঘটিত হয়। কিন্তু গ্রহণেন্দ্রিয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে এই স্নায়ু সংযোগ সরাসরি ঘটে না। এই দু'য়ের মধ্যে সংযোগ-কেন্দ্ররূপে কাজ করে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড। সমস্ত স্নায়ুগুলিই হয় মস্তিষ্ক নয় মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে শরীরের সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। স্নায়বিক উদ্দীপনা গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে জন্মলাভ করে মস্তিষ্কে পৌঁছয় এবং সেখান থেকে উপযুক্ত কর্মেন্দ্রিয়ে পুনরায় প্রেরিত হয় ও তারই ফলে অভীষ্ট আচরণ সংঘটিত হয়। যেমন, আমাকে কেউ নাম ধরে ডাকল। আমি মাথাটা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম। এখানে প্রথমে আমার কানের মধ্যে শব্দতরঙ্গ প্রবেশ করল এবং স্নায়ুপথ বেয়ে তাই থেকে জাত উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌঁছল। তারপর মস্তিষ্ক থেকে নির্দেশপূর্ণ উদ্দীপনা আবার স্নায়ুপথ বেয়ে পৌঁছল আমার ঘাড়ের মাংসপেশীতে এবং তারই ফলে আমি মাথাটি ঘোরালাম। যে স্নায়ুগুলি গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে উদ্দীপনা মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে যায়, সেগুলির নাম সংবেদক (sensory) বা অন্তর্মুখী (afferent) স্নায়ু এবং যে স্নায়ুগুলি মস্তিষ্ক থেকে কর্মেন্দ্রিয়তে বার্তা বয়ে নিয়ে যায় সেগুলিকে প্রচেষ্টক (motor) বা বহির্মুখী (efferent) স্নায়ু নাম দেওয়া হয়েছে।

স্নায়ুতন্ত্রের বিবর্তন

প্রাথমিক অবস্থায় প্রাণীর স্নায়ুমণ্ডলী ছিল অত্যন্ত সরল। এককোষী প্রাণীদের কোনরূপ স্নায়ুমণ্ডলীই ছিল না। কোষের অভ্যন্তরস্থ প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে উদ্দীপনার সঞ্চালন ঘটত বটে, কিন্তু এই সঞ্চালন ছিল অত্যন্ত অসংহত ও সব দিকে বিস্তৃত, কোন নির্দিষ্ট দিকের অভিমুখী বা কোনও বিশেষ প্রতিক্রিয়ার প্রতি উদ্দিষ্ট ছিল না। অর্থাৎ সে সময় কোন বিশেষ উদ্দীপকের কোন বিশেষ প্রতিক্রিয়া ছিল না। তারপর প্রাণীদেহে দেখা দিল পেশী এবং এগুলি ইন্দ্রিয় থেকে জাত উদ্দীপনার দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠত। তখনও পর্যন্ত স্নায়ুতন্ত্রের আবির্ভাব হয়নি। এর পরের স্তরে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু দেখা

দিল। এগুলি গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে বেরিয়ে পেশীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল এবং গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে সরাসরি উদ্দীপনা পেশীতে বহন করে নিয়ে যেত। ,স্নায়ুতন্তুর উদ্ভবকে স্নায়ুতন্ত্রের বিবর্তনের প্রথম সোপান বলে বর্ণনা করা যায়।

স্নায়ুতন্ত্রের বিবর্তনের এই প্রাথমিক স্তরে কোনও কোনও ক্ষেত্রে এক ধরনের স্নায়ুজাল (nerve-net) দেখা দিয়েছিল। পেশীগুলি এই তন্তুজালের সঙ্গে সংযুক্ত থাকত এবং গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে উদ্দীপনা এসে পৌঁছত এই স্নায়ুজালে এবং তার ফলে দেহের বিভিন্ন পেশীগুলি সক্রিয় হয়ে উঠত। কিন্তু এক্ষেত্রে বিশেষ কোন উদ্দীপনার উত্তরে বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সাড়া দেওয়া সম্ভব হত না, কেননা সকল উদ্দীপনাই স্নায়ুজালের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত এবং যে কোন ধরনের উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া রূপে দেহের সমস্ত পেশীগুলিই একসঙ্গে সক্রিয় হয়ে উঠত।

কিন্তু উন্নত স্নায়ুতন্ত্রে এই ধরনের অনির্দিষ্ট বা এলোমেলো প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে না। সেখানে একটি বিশেষ উদ্দীপনাকে একটি নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সাড়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। একটা জেলিফিসের গায়ে গরম কিছু ঠেকলে তার সমস্ত শরীরটা সঙ্কুচিত হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের হাতে বা পায়ে গরম কিছু ঠেকলে আমরা হাত বা পা-টাই সরিয়ে নেব, জেলিফিসের মত সমস্ত শরীর দিয়ে প্রতিক্রিয়া করব না।

স্নায়ুজালের পরের স্তরে দেখা দেয় আধুনিক ও উন্নত স্নায়ুতন্ত্র। এই স্তরের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা বিশেষধর্মী প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব। অর্থাৎ এর দ্বারা বিশেষ উদ্দীপনাকে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সাড়া দেওয়া যায়। উন্নত স্নায়ুতন্ত্রের নানা বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই সুনির্দিষ্ট ও উদ্দীপক-উপযোগী আচরণ করা সম্ভব হয়েছে।

সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষের স্নায়ুতন্ত্র সর্বাপেক্ষা উন্নত ও জটিলতম। এর প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়নের ব্যবস্থা। এখানে গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে কর্মেন্দ্রিয়ে উদ্দীপনা সরাসরি যায় না, মধ্যবর্তী একটি সমন্বয়ন কেন্দ্রের মধ্যে দিয়ে সংযোগটা স্থাপিত হয়। এই সমন্বয়ন কেন্দ্রটিই হল মস্তিষ্ক এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডও এই সমন্বয়নের কাজটি করে থাকে।

স্নায়ুতন্ত্রের গঠন

আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এর সন্নিকর্ষমূলক (synaptic) প্রকৃতি। এটি বুঝতে হলে স্নায়ুতন্ত্রের গঠনটি ভাল করে জানা দরকার।

স্নায়ুতন্ত্র বলতে বোঝায় ছোট বড় বহু স্নায়ুতন্তুর একটি একত্রিত সমষ্টি। স্নায়ুতন্তুগুলি কেন্দ্রীয় সমন্বয়নস্থল অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। প্রত্যেকটি স্নায়ুতন্তু আবার কতকগুলি অনুতন্তুর সমষ্টি এবং টেলিফোনের তারের মত উপরে একটি আবরকের দ্বারা ঢাকা।

স্নায়ুতন্ত্রের একক (unit) বলে যে বস্তুটিকে ধরা হয়েছে তার নাম নিউরন (Neuron)। ডোনাল্ডসনের হিসেবে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রে ১২ বিলিয়ন (১২ লক্ষ কোটি) নিউরন আছে এবং এদের পারস্পরিক সমন্বয়নের মাধ্যমেই দেহযন্ত্রের সমস্ত কাজ চলে।

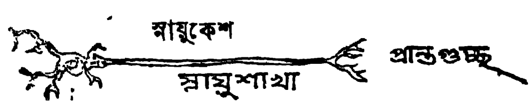
এক একটি নিউরন অতি সূক্ষ্ম আকৃতির এবং এর মধ্যে আছে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি :

কোষদেহ (Cell Body)

নিউরনের মধ্যে আছে একটি কোষ যা থেকে নিউরনের কাজগুলি সম্পন্ন হয়। এটির মধ্যে থাকে প্রোটোপ্লাজম এবং এটিই হল প্রাণীর জীবনীশক্তির বাহক এক প্রকার তরল পদার্থ।

স্নায়ুকেন্দ্র (Nucleus)

কোষদেহের কেন্দ্রে আছে স্নায়ুকেন্দ্র। প্রতিটি স্নায়ুকোষের বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি নির্ধারণ করে এই স্নায়ুকেন্দ্র।



[একটি নিউরনের ছবি। একদিকে স্নায়ুকেশ (dendrite), আর একদিকে স্নায়ুশাখা (axon), আর মাঝে হল কোষদেহ (cell body)। স্নায়ুকেশ ও স্নায়ুশাখা উভয়েরই শেষে রয়েছে প্রান্তগুচ্ছ (end brush)]

স্নায়ুশাখা (Axon)

প্রত্যেকটি নিউরনের একটি করে শাখা আছে। এগুলি সময় সময় বেশ লম্বা হয়। এই শাখার মধ্যে দিয়েই কোষদেহ থেকে উদ্দীপনা অন্য কোন নিউরনে বা কর্মেন্দ্রিয়ে প্রবাহিত হয়।

স্নায়ুকেশ (Dendrite)

কোষদেহের একদিকে যেমন থাকে স্নায়ুশাখা বা এক্সন তেমনই অপর দিকে থাকে স্নায়ুকেশ বা ডেনড্রাইট। স্নায়ুকেশগুলি অন্য নিউরন বা গ্রহণেন্দ্রিয় থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে কোষদেহে পাঠিয়ে দেয়।

প্রান্তগুচ্ছ (End Brush)

প্রত্যেক এক্সন বা ডেনড্রাইটের শেষপ্রান্তে আছে প্রান্তগুচ্ছ। এগুলির মধ্যে দিয়ে উদ্দীপনা গৃহীত বা প্রেরিত হয়।

এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিউরনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে এবং দেহের এক অংশ থেকে অপর অংশে উদ্দীপনা-সঞ্চালনের পথরূপে কাজ করে। একটি নিউরনের কোষদেহ থেকে উদ্দীপনা স্নায়ুশাখা (axon) বেয়ে প্রান্তগুচ্ছে (end brush) আসে। সেখান থেকে তার সংলগ্ন আর একটি নিউরনের ডেনড্রাইটে উদ্দীপনা প্রবাহিত হয় এবং সেখান থেকে সেই নিউরনটির কোষদেহে গিয়ে পৌছয়। সেখান থেকে আবার সেই নিউরনটির এক্সন বেয়ে অপর আর একটি নিউরনে উদ্দীপনা সঞ্চালিত হয়। এই ভাবে এক নিউরন থেকে আর এক নিউরনে উদ্দীপনা সঞ্চালিত হয়ে থাকে।

সন্নিকর্ষ (Synapse)

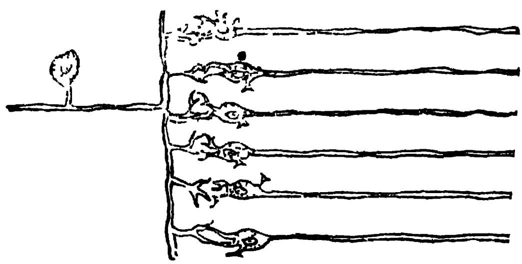
আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এটি প্রকৃতিতে সন্নিকর্ষমূলক (Synaptic)। এর অর্থ হল যে যদিও এক নিউরন থেকে আর এক নিউরনে উদ্দীপনা চালিত হতে পারে, তবু তাদের মধ্যে কোন প্রকৃত অঙ্গগত যোগাযোগ নেই। একটি নিউরনের নির্গমন মুখ অর্থাৎ এক্সন এবং অপর একটি নিউরনের গ্রহণমুখ অর্থাৎ ডেনড্রাইট পাশাপাশি খুব কাছাকাছি হয়ে অবস্থান করে অথচ তারা পরস্পরকে স্পর্শ করে না। তার ফলে একটির এক্সন থেকে অপরটির ডেনড্রাইটে যখন যেতে হয় তখন উদ্দীপনাকে মাঝের ফাঁকটুকু একপ্রকার লাফ দিয়ে পার হতে হয়। দুটি নিউরনের মাঝের এই যে অবস্থা তাকে সন্নিকর্ষ (Synapse)[১] বলে এবং এই ধরনের স্নায়ুতন্ত্রগুলিকে সন্নিকর্ষমূলক স্নায়ুতন্ত্র বলা হয়।

বলা বাহুল্য সন্নিকর্ষমূলক সংগঠন উন্নত স্নায়ুতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। স্নায়ুগুলি যদি টেলিফোনের তারের মত অবিচ্ছিন্ন ও অখণ্ড হত তাহলে সেগুলির কাজের মধ্যে

১। পৃঃ ১৬৫ (চিত্র)

কোনও রকম পরিবর্তনশীলতা থাকত না। মানব আচরণের অসীম বৈচিত্র্যের মূলেই আছে তার স্নায়ুতন্ত্রের এই সন্নিকর্ষমূলক বৈশিষ্ট্য।

এই ধরনের সন্নিকর্ষমূলক সংগঠনের বড় বৈশিষ্ট্য হল যে নিউরনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকার ফলে উদ্দীপনার এক নিউরন থেকে অপর নিউরনে যাওয়ার কাজটি চিরনির্দিষ্ট পন্থায় এবং যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। অর্থাৎ উদ্দীপনার কোন একটি বিশেষ নিউরনে যাওয়া না যাওয়াটা নির্ভর করে এই সন্নিকর্ষের উপর। অনেক সময় কোন উদ্দীপনা সন্নিকর্ষে বাধা পেয়ে আর

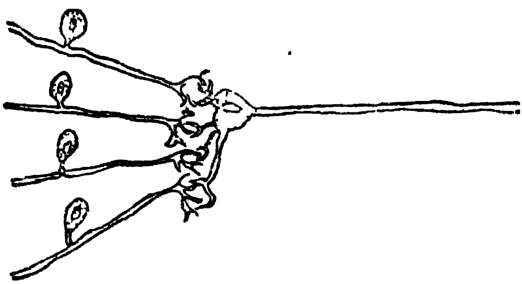


[এখানে একটি সংবেদক নিউরন থেকে একাধিক প্রচেষ্টক নিউরনে উদ্দীপনা পরিচালিত হচ্ছে। এটি সম্ভব হচ্ছে সন্নিকর্ষের জন্যই।]

নাও এগোতে পারে। আবার কখনও কখনও অনেকগুলি নিউরন একত্র হয়ে কোন একটি বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চালনকে সাহায্য করতে বা বাধা দিতেও পারে। আবার কখনও সন্নিকর্ষ একটি উদ্দীপনাকে তার নির্দিষ্ট পথের পরিবর্তন ঘটিয়ে আর এক পথে পরিচালিত করতে পারে। এছাড়া সন্নিকর্ষের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে এক নিউরন থেকে আর একটি নিউরনে হয় উদ্দীপনা সম্পূর্ণ পরিবাহিত হবে, নয় একেবারে কিছুই হবে না, মাঝামাঝি মাত্রার কোন সঞ্চালন হবার সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ আংশিক বা হ্রাসপ্রাপ্তরূপে উদ্দীপনা কখনও এক নিউরন থেকে আর এক নিউরনে সঞ্চালিত হয় না। একে সন্নিকর্ষের 'সম্পূর্ণ-বা-একেবারে নয়'-র তত্ত্ব (Theory of All-or-None) বলে বর্ণনা করা হয়।

তাছাড়া নিউরনগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত না থাকার ফলে আর একটি বড় সুবিধা হচ্ছে যে একটি মাত্র নিউরন থেকে উদ্দীপনা একের বেশী নিউরনে সঞ্চালিত হতে পারে। কেননা প্রত্যেকটি নিউরনের এক্সনের প্রান্তগুচ্ছগুলির কাছেই রয়েছে আরও অনেকগুলি নিউরনের ডেনড্রাইটের কেশগুচ্ছ। ফলে উদ্দীপনাটি নিউরনের স্নায়ুকেন্দ্রের নির্দেশ অনুসারে প্রয়োজনবোধে একটি বা একাধিক নিউরনে পরিবাহিত হতে পারে। আবার ঠিক এইভাবেই অনেকগুলি

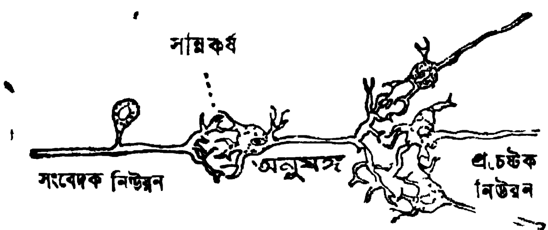
নিউরনের উদ্দীপনা একই সঙ্গে একত্রিত হয়ে একটিমাত্র নিউরনে সঞ্চালিত হতে পারে।[১]



[এখানে সন্নিকর্ষের জন্যই একাধিক সংবেদক নিউরন থেকে একটি প্রচেষ্টক নিউরনে উদ্দীপনা পরিচালিত হচ্ছে।]

নিউরনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Neurons)

নিউরনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা—(১) সংবেদক (sensory) বা অন্তর্মুখী (afferent) নিউরন। এগুলি গ্রহণেন্দ্রিয় (receptor) থেকে উদ্দীপনা নিয়ে মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে পৌঁছে দেয় ; (২) প্রচেষ্টক (motor) বা



[সংবেদক নিউরনের মাধ্যমে স্নায়ু-উদ্দীপনা মস্তিষ্কে পৌঁছলে সেখান থেকে প্রচেষ্টক নিউরনে উদ্দীপনা পরিচালিত হয়। এই পরিচালনা ঘটে মধ্যবর্তী অনুষঙ্গ বা সঙ্গতিসাধক নিউরনের মাধ্যমে।]

বহির্মুখী (efferent) নিউরন। এগুলি মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড থেকে উদ্দীপনা বহন করে কর্মেন্দ্রিয়ে (effector) পৌঁছে দেয় এবং (৩) অনুষঙ্গ (association) বা সঙ্গতিসাধক (adjustor) নিউরন। এগুলি কেবলমাত্র মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে পাওয়া যায় এবং এগুলির একমাত্র কাজ হল সংবেদক এবং প্রচেষ্টক নিউরনগুলির মধ্যে সংযোগসাধন করা।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রাণীর আচরণের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের প্রক্রিয়াটি নিম্নবর্ণিত উপায়ে ঘটে থাকে। প্রথমে উদ্দীপক থেকে প্রসূত উদ্দীপনা

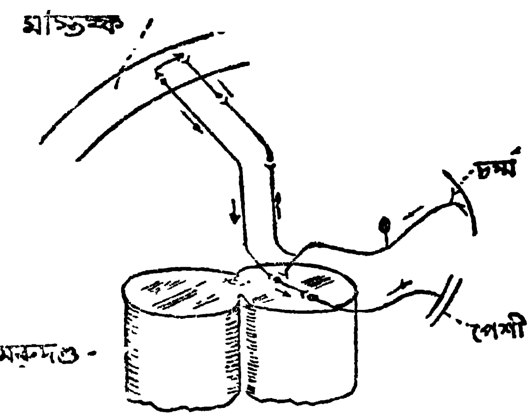
১। পৃঃ ১৬৫'র উপরের চিত্র

গ্রহণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সংবেদক বা অন্তর্মুখী স্নায়ু বেয়ে গিয়ে পৌঁছয় মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডে, সেখানে সঙ্গতিসাধক বা অনুষঙ্গ নিউরনের মাধ্যমে উদ্দীপনা প্রচেষ্টক বা বহির্মুখী স্নায়ুতে সঞ্চালিত হয়। সেখান থেকে উদ্দীপনা প্রবাহিত হয় কর্মেন্দ্রিয়গুলিতে এবং তার ফলে কর্মেন্দ্রিয়গুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে যে সমন্বয়সাধনের কাজটি ঘটে সেটির উপরই আচরণের বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা নির্ভর করে। যেমন আমায় কেউ ডাকলে আমি তার দিকে তাকাব কি তাকাব না, সাড়া দেব কি দেব না, কি ধরনের সাড়া দেব—এ সবই নির্ভব করছে সংবেদক ও প্রচেষ্টক নিউবনগুলির মধ্যে মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডের সঙ্গতিসাধক নিউরনগুলি সংবেদক ও প্রচেষ্টক নিউরনগুলির মধ্যে কি ধরনের যোগাযোগ স্থাপন করে তার উপর।

রিফ্লেক্স (Reflex)

কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্দীপকের এই প্রতিক্রিয়াটি পূর্ব-নির্ধারিত এবং এক প্রকার সুনির্দিষ্ট করাই থাকে। এই সব ক্ষেত্রে বিশেষ এক প্রকারের উদ্দীপনা সৃষ্ট হলে বিশেষ এক ধরনের প্রতিক্রিয়া নিজে নিজেই এসে দেখা দেয়। যেমন,



[এই ছবিতে দু'শ্রেণীর সমন্বয়নের কাজ দেখান হয়েছে। দেহের চর্ম থেকে উদ্দীপনা সমন্বয়নের মাধ্যমে পেশীতে গিয়ে পৌঁছচ্ছে। প্রথম সমন্বয়নটি ঘটছে মস্তিষ্কের মাধ্যমে এবং সেজন্য এটি উন্নত প্রকৃতির এবং দ্বিতীয় সমন্বয়নটি ঘটছে মেরুদণ্ডের মাধ্যমে এবং সেজন্য এটি অপেক্ষাকৃত নিম্নপ্রকৃতির। মেরুদণ্ডের মাধ্যমে সমন্বয়নের পথটিকে রিফ্লেক্স আর্ক বলা হয়।]

আগুনে হাত পড়লে হাতটা তৎক্ষণাৎ সরে আসবে। চোখের মধ্যে কিছু ঢোকার উপক্রম হলে চোখ নিজে নিজে বন্ধ হয়ে যাবে ইত্যাদি। এই আচরণ-গুলির ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের কাজটি সরলতম এবং আগে থেকেই সম্পন্ন করা থাকে। এই ধরনের আচরণকে রিফ্লেক্স (Reflex) বলা হয়।

রিফ্লেক্স হল সহজাত আচরণের সরলতম রূপ। সময় সময় বিশেষ জৈবিক প্রয়োজনের তাগাদায় কোন দৈহিক যন্ত্র আমাদের কোনরূপ সচেতন প্রচেষ্টার অপেক্ষা না রেখেই সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ঐ বিশেষ প্রয়োজনটি মেটাবার ব্যবস্থা করে নেয়। দেহের এই স্বতঃ সঙ্গতি-বিধানের প্রক্রিয়াকে রিফ্লেক্স বলে। যেমন, চোখের মধ্যে কোন ধূলো বা বালি পড়ার উপক্রম হলে চোখের পাতা আপনা আপনি তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে যায়। নাকের ঝিল্লিতে কিছু ঢুকলে হাঁচি হয়। শ্বাসনালীতে খাদ্যকণা ঢুকলে বিষম লাগে। এই সব জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করতে আমাদের কোনরূপ প্রয়াস বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। এ কাজগুলি দেহযন্ত্র স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সম্পাদন করে। হাই তোলা, বমি করা, হাসা, কাসা প্রভৃতি কাজগুলিও রিফ্লেক্সের উদাহরণ। এ সবগুলিই কোন না কোন পারিবেশিক পরিবর্তনের সঙ্গে বাঞ্ছিত সঙ্গতি-বিধানের উদ্দেশ্যে দেহের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টা। হাঁটুর ঠিক নীচে যদি শক্ত কিছু দিয়ে ঘা দেওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পা-টি সবেগে ঝাঁকানি দিয়ে উঠবে। এর নাম 'হাঁটু-ঝাকানি' (Knee-jerk) রিফ্লেক্স। অধিকাংশ গ্রন্থির রস-নিঃসরণও এক প্রকারের রিফ্লেক্স। যেমন জিভের লালাক্ষরণ, চোখের জল পড়া, ঘাম পড়া ইত্যাদি।

রিফ্লেক্সও অন্যান্য আচরণের মত পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের প্রয়াস। তবে অন্যান্য আচরণের তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত অনেক সরল, দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য এবং এর আবির্ভাবের কারণ দেহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে সমন্বয়নের কাজটি মস্তিষ্কে সংঘটিত হয় না। মেরুদণ্ডের মাধ্যমেই সংবেদক ও প্রচেষ্টক স্নায়ুপথগুলির মধ্যে সংযোগটা স্থাপিত হয় এবং উদ্দীপকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আচরণটি নিজে নিজে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। সংবেদক ও প্রচেষ্টক স্নায়ুপথের মধ্যে সহজতম ও সরলতম সমন্বয়-পথটির নাম রিফ্লেক্স আর্ক (Reflex Arc)[১]। এই সংযোগের প্রকৃতিটি পূর্ব নির্ধারিত থাকে বলেই রিফ্লেক্স আচরণের মধ্যে কোন বৈচিত্র্য নেই এবং সেটি যান্ত্রিক ও পূর্বনির্দিষ্ট। সাধারণ ক্ষেত্রে রিফ্লেক্স আচরণে মস্তিষ্কের কোন হস্তক্ষেপ থাকে না বটে, কিন্তু কোন কোন রিফ্লেক্সের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হলে মস্তিষ্ক হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং আচরণের প্রকৃতিকেও পরিবর্তিত করতে পারে। যেমন, আগুনে হাত পড়লে হাত সরিয়ে নেওয়া একটি রিফ্লেক্স আচরণ, কিন্তু মস্তিষ্ক ইচ্ছা করলে হাত সরিয়ে না নিতেও পারে। কিন্তু খাদ্য দেখলে লালাক্ষরণ হওয়া একটা রিফ্লেক্স এবং মস্তিষ্কের সেখানে হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা নেই।

১। পৃঃ ১৬৭ (চিত্র)

স্নায়ুতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Nervous System)

যদিও আমাদের স্নায়ুতন্ত্রটি একটি সুসংবদ্ধ একক যন্ত্ররূপে কাজ করে তবু এর কাজের প্রকৃতি অনুযায়ী এটির কয়েকটি প্রধান বিভাগের উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা—

কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র (Central Nervous System)

প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি হল কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র। এতে আছে মস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড। সাধারণত মেরুদণ্ডে রিফ্লেক্স জাতীয় সরল সমন্বয়নের কাজগুলি সংঘটিত হয় এবং উচ্চস্তরের সমন্বয়নের কাজগুলি সাধিত হয় মস্তিষ্কে।

প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র (Peripheral Nervous System)

দ্বিতীয় বিভাগটির নাম হল প্রান্তীয় স্নায়ুতন্ত্র। এই বিভাগের মধ্যে পড়ে সেই সকল স্নায়ু যেগুলি মেরুদণ্ড থেকে বেরিয়ে দেহের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলির মধ্যে ৩১ জোড়া তন্তু বেরিয়েছে মেরুদণ্ড থেকে এবং ১২ জোড়া মস্তিষ্ক থেকে।

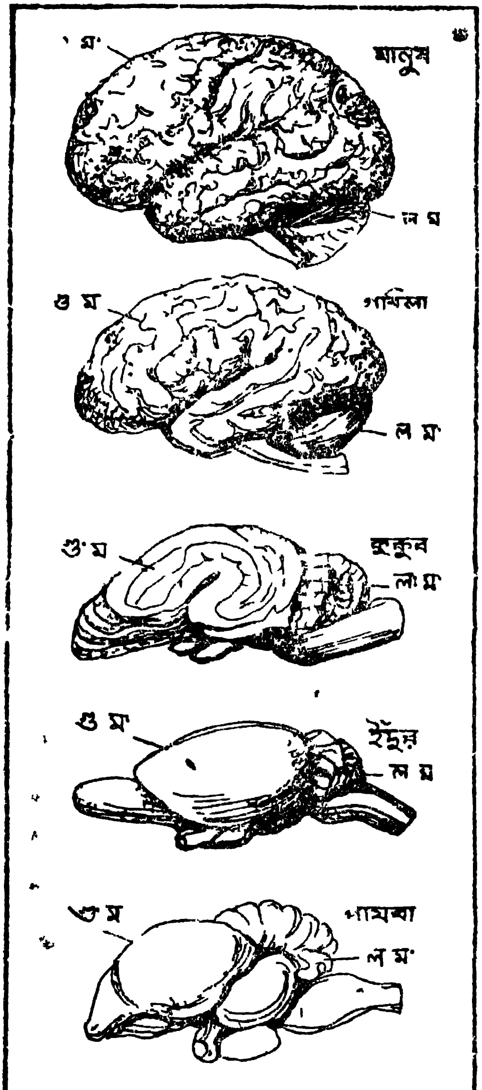
স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র (Autonomic Nervous System)

তৃতীয় বিভাগটির নাম হল স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র। এই বিভাগটি মস্তিষ্ক থেকে বেরিয়ে হৃদ্‌পিণ্ড, ফুসফুস, অন্ত্র ইত্যাদি দেহের অভ্যন্তরীণ যন্ত্রপাতিগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। কোন প্রক্ষোভের জাগরণ ও সক্রিয়তার সময় এই অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্রগুলি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং শরীরের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন প্রত্যঙ্গগুলিকে উত্তেজিত করে তোলে। সমস্ত প্রক্ষোভমূলক আচরণের পেছনেই আছে এই বিশেষ স্নায়ুতন্ত্রের সক্রিয়তা। অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্রের আবার দুটি বিভাগ আছে, সিম্প্যাথেটিক ও প্যারাসিম্প্যাথেটিক।

মস্তিষ্ক (Brain)

অভ্যন্তরীণ সমন্বয়নের প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের ভূমিকা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সকল রকম আচরণের চরম নিয়ন্ত্রণ মস্তিষ্কের সমন্বয়সাধক যন্ত্রপাতির উপর নির্ভরশীল। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় প্রাণীজীবনের উন্নতির একটা লক্ষণ হচ্ছে মস্তিষ্কের আকৃতির ক্রম বৃদ্ধি। প্রাণী যত উন্নত হচ্ছে ততই তার মস্তিষ্কের আকৃতি বাড়ছে। অবশ্য সমস্ত প্রাণীর মধ্যে মানুষের মস্তিষ্ক যেসব চেয়ে বড় তা নয়। হাতি এবং তিমি মাছের মস্তিষ্ক মানুষের মস্তিষ্কের চেয়ে আকৃতিতে অনেক বড়। মানুষের মস্তিষ্ক ওজনে প্রায় ১$\frac{1}{2}$ সের, হাতির ৬ সের এবং তিমির ৫ সের। কিন্তু দেহের ওজনের সঙ্গে মস্তিষ্কের অনুপাত বিচার করলে মানুষের মস্তিষ্ক সব চেয়ে বড়। যেমন, তিমি মাছের দেহ ও মস্তিষ্কের অনুপাত হল ১০০০০ : ১, হাতির ৫০০ : ১ এবং মানুষের হল ৫০ : ১।

মাছ থেকে মানুষ : মস্তিষ্কের ক্রমবিবর্তন



গু: ম:=গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum) : : ল: ম:=লঘুমস্তিষ্ক (Cerebellum)। প্রাণী যত উন্নত হতে থাকে, গুরুমস্তিষ্কের আয়তন লঘুমস্তিষ্কের আয়তনের তুলনায় ততই বড় হতে থাকে।

মস্তিষ্কের সঙ্গে মেরুদণ্ডের অনুপাতও প্রাণীর অগ্রগতির একটা বড় লক্ষণ। একটা ব্যাঙের মস্তিষ্ক তার মেরুদণ্ডের ওজনের সমান, বাঁদরের মস্তিষ্ক তার মেরুদণ্ডের ১৫ গুণ কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক তার মেরুদণ্ডের ৫৫ গুণ বড়।

শরীরের সমস্ত অঙ্গের মধ্যে মস্তিষ্কের কাজ সব চেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ। সমস্ত গ্রহণেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও অন্যান্য দেহাংশের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার কাজ করছে মস্তিষ্ক। ফলে প্রাণীর দেহ যত আকৃতিতে বড় হতে থাকে ততই মস্তিষ্কের উপর কাজের চাপ বাড়তে থাকে। এই জন্যই দেহের অনুপাতে মস্তিষ্কের আয়তনের উপর প্রাণীর উন্নত কাজের ক্ষমতা প্রধানত নির্ভর করে।

মানুষেরও মস্তিষ্ক প্রথম প্রথম ছিল অত্যন্ত সরল প্রকৃতির। কিন্তু যতই পরিস্থিতি জটিলতর হতে থাকে ততই মানুষকে বাধ্য হয়ে চিন্তন, বিচার-

করণ, সমস্যা-সমাধান ইত্যাদি উন্নত ও জটিল ধরনের কাজগুলি করতে হয় এবং ফলে ধীরে ধীরে তার মস্তিষ্ক আয়তনে বাড়তে থাকে। মস্তিষ্ক-আধারের (Skull) সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যে এই বৃদ্ধি হওয়ার ফলে মস্তিষ্কের আকৃতিটি সরলপথে এবং অবাধে বাড়তে পাড়ে নি এবং তার ফলে নানা স্থানে তার গায়ে ভাঁজ খেয়ে গেছে। এই জন্যই আমাদের মস্তিষ্ক এত ভাঁজ বা গভীর বলিরেখায় (convolution) পূর্ণ।

কিন্তু কেবল আয়তনে বাড়াটাই মস্তিষ্কের উৎকর্ষের লক্ষণ নয়। উচ্চ ও উন্নত ধরনের সমন্বয়ন করার ক্ষমতাও তার থাকা চাই। নিম্নশ্রেণীর অনেক প্রাণীর যথেষ্ট বড় মস্তিষ্ক থাকা সত্ত্বেও তাদের মস্তিষ্ক কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তরের পূর্বনির্দিষ্ট যান্ত্রিক সমন্বয়নের কাজগুলিই করতে পারে। ফলে তাদের মস্তিষ্ক আয়তনে বড় হলেও সেগুলির কার্যকারিতা খুব বেশী নয়। তাদের পক্ষে কোনও উন্নত আচরণ করা সম্ভব হয় না। যেমন দেখা যায় হাতি বা তিমি মাছের ক্ষেত্রে।

গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum) ও লঘুমস্তিষ্ক (Cerebellum)

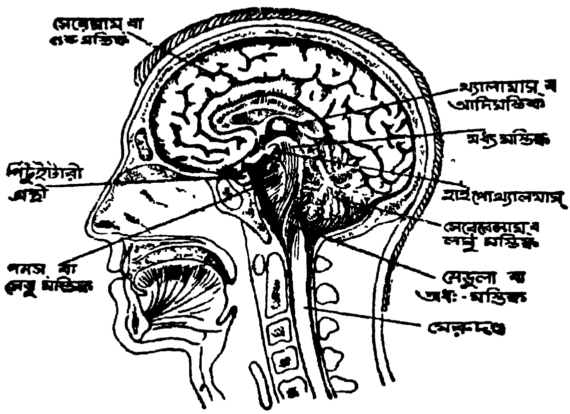
কিন্তু মানুষ প্রভৃতি উন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রে উচ্চ ও জটিল ধরনের সঙ্গতি-বিধানের কাজ করার উপযোগী মস্তিষ্ক আছে এবং তার জন্যই তারা অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান। মস্তিষ্কের যে অংশটুকু এই উন্নত সঙ্গতিবিধানের কাজের উপযোগী তাকে নতুন মস্তিষ্ক (New Brain) বলা হয়। এই অংশটুকুর নাম গুরুমস্তিষ্ক (Cerebrum) এবং যে অংশটুকু প্রধানত দৈহিক সঙ্গতিবিধানের কাজ করে থাকে তাকে বলা হয় পুরানো মস্তিষ্ক। এই অংশটুকুর নাম লঘুমস্তিষ্ক (Cerebellum)। ক্রমবিবর্তনের পর্যায়ে প্রাণী যত উন্নত হয় ততই তার গুরুমস্তিষ্কের আয়তন লঘুমস্তিষ্কের আয়তনের চেয়ে বড় হতে দেখা যায়।[১]

গুরুমস্তিষ্ক সমগ্র মস্তিষ্ক-সংগঠনের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অংশ। মস্তিষ্ক-আধারের সীমাবদ্ধ অপরিসর স্থানের মধ্যে গুরুমস্তিষ্কের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এর গায়ে অসংখ্য ভাঁজ (convolution) এবং ফাটল (fissure) দেখা দিয়েছে। গুরুমস্তিষ্কের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ হল বহিঃপ্রদেশটি, যার নাম দেওয়া হয়েছে মস্তিষ্ক-আস্তরণ (cerebral cortex)। এই আস্তরণে কোটি কোটি স্নায়ু আছে। এগুলি দেখতে ধূসর বর্ণের। উন্নত সমন্বয়নের ক্ষমতাসম্পন্ন সঙ্গতি-সাধক নিউরনগুলি থাকে এইখানেই। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর মস্তিষ্ক-আস্তরণ এই জন্য

১। পৃঃ ১৭০ (চিত্র)

বেশ সরল। মানুষের মস্তিষ্ক-আস্তরণ অত্যন্ত জটিল, অসংখ্য ভাঁজসম্পন্ন এবং, তার ফলেই তার পক্ষে নানা উচ্চশ্রেণীর সঙ্গতিবিধান করা সম্ভব হয়।

গুরুমস্তিষ্কের প্রধান দুটি ফাটলের নাম রোলাণ্ডো ফাটল (Fissure of Rolando) এবং সিলভিয়াস ফাটল (Fissure of Sylvius)। এ দুটি ফাটল সমগ্র গুরুমস্তিষ্কটিকে চারটি ভাগে (lobe) ভাগ করেছে। (১) সম্মুখ ভাগ (Frontal lobe), (২) মধ্য ভাগ (Parietal lobe) (৩) পশ্চাৎ ভাগ



[মানব-মস্তিষ্কের বিভিন্ন বিভাগগুলি]

(Occipital lobe) এবং (৪) নিম্নভাগ (Temporal lobe)। গুরুমস্তিষ্ক ও লঘুমস্তিষ্ক ছাড়া মস্তিষ্কের আরও কয়েকটি বিভাগ আছে, যথা :—

সেতুমস্তিষ্ক (Pons)

এটি মস্তিষ্কের নিম্নাংশের একটা বর্ধিত ভাগ ; এই অংশটি গুরুমস্তিষ্ক ও লঘুমস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ ঘটায়। দৈহিক ভারসাম্য ও প্রচেষ্টামূলক সমন্বয়ন বহুলাংশে এই মস্তিষ্কের উপর নির্ভরশীল।

অধঃমস্তিষ্ক (Medulla)

সেতু মস্তিষ্কের নীচে অধঃমস্তিষ্কের স্থান। শ্বাসক্রিয়া, রক্তচাপ প্রভৃতি শারীরিক প্রক্রিয়া এই অংশের উপর নির্ভরশীল। এর প্রধান কাজ হল মেরুদণ্ড ও উচ্চতর স্নায়ুকেন্দ্রের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখা।

থ্যালামাস (Thalamus)

এটি মস্তিষ্কের প্রাচীনতম অংশ। এর অবস্থান ঠিক মস্তিষ্কের উপরে। এটির কাজ অনেকটা সুইচবোর্ডের মত। সমস্ত সংবেদনজাত উদ্দীপনাকে মস্তিষ্ক আস্তরণের যথোপযুক্ত স্থানে পরিচালিত করার কেন্দ্রস্থল হল এই থ্যালামাস।

হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus)

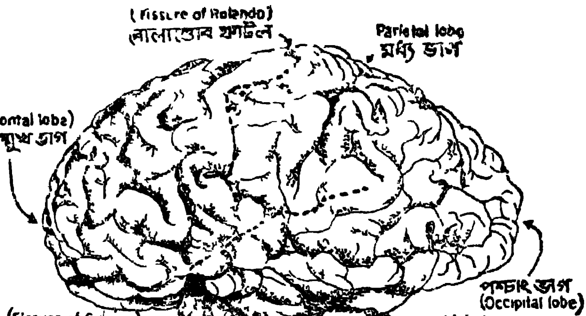
এটির স্থান থ্যালামাসের নীচে সেতুমস্তিষ্কের উপরে। আধুনিক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে হাইপোথ্যালামাসটি প্রক্ষোভমূলক প্রক্রিয়ার জাগরণের প্রধান কেন্দ্র।

গুরুমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ডের কাজ
(Functions of Cerebrum, Cerebellum & Spinal Cord)

মস্তিষ্কের তিনটি প্রধান ভাগ আছে, যথা, গুরুমস্তিষ্ক, লঘুমস্তিষ্ক ও মেরুদণ্ড। এগুলির প্রত্যেকটিই মানব শরীরের কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে থাকে।

গুরুমস্তিষ্কের কাজ :

গুরুমস্তিষ্কটি চারটি বিভাগে বিভক্ত। যথা, সম্মুখভাগ (Frontal lobe) মধ্যভাগ (Parietal lobe), পশ্চাৎভাগ (Occipital lobe) এবং নিম্নভাগ (Temporal lobe)। প্রতিটি ভাগেরই কাজ সুনির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র।



[মানব মস্তিষ্কের বিভিন্ন বিভাগ]

এর মধ্যে সম্মুখ ভাগটি (Frontal lobe) মানুষের ক্ষেত্রে অন্যান্য প্রাণী অপেক্ষা সবচেয়ে বেশী উন্নত। বিচারকরণ, যুক্তিধর্মী চিন্তন, উদ্ভাবন, পরিকল্পন ইত্যাদি উন্নত মানসিক প্রক্রিয়াগুলি এই সম্মুখ ভাগ থেকে সৃষ্ট বলে মনে করা হয়ে থাকে। ব্যথা প্রভৃতি কতকগুলি সংবেদন উপলব্ধি করার ক্ষমতাও এই অংশটি থেকে জন্মায় এবং যাকে আমরা প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি বলি সেগুলিও এই সম্মুখভাগের কোন অংশ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে বলে মনোবিজ্ঞানীরা

বিশ্বাস করেন। গুরুমস্তিষ্ক ও থ্যালামাস নামক অংশ দুটির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে এবং দেখা গেছে যে এই দু'য়ের মধ্যে সংযোগটা যদি বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় তবে সংবেদনটি আনন্দের কি দুঃখের তা নির্ণয় করার ক্ষমতা ব্যক্তির থাকে না। তাছাড়া যদি সম্মুখ ভাগের সঙ্গে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় তবে ব্যক্তির বিচার করা বা পরিকল্পনা করার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। মস্তিষ্কের সম্মুখভাগের শেষাংশটি প্রাণীর ইচ্ছাপ্রসূত দেহসঞ্চালনকে (Voluntary movement) নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

গুরুমস্তিষ্কের মধ্যভাগ থেকে জন্মায় অনির্দিষ্ট সাধারণ প্রকৃতির সংবেদনগুলি। স্পর্শ, অবস্থিতির উপলব্ধি, ব্যথা, উত্তাপ প্রভৃতি বিভিন্ন সংবেদনের উৎস হল এই মধ্যভাগটি।

গুরুমস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগটি কেবলমাত্র চক্ষু ইন্দ্রিয়ের উদ্দীপক গ্রহণ ও তার সংব্যাখ্যানের কাজ করে থাকে অর্থাৎ এটি হল চাক্ষুষ সংবেদনের উৎসস্থল।

গুরুমস্তিষ্কের নিম্নভাগ শ্রবণেন্দ্রিয়ের উদ্দীপক গ্রহণ ও সংব্যাখ্যানের কাজ করে থাকে অর্থাৎ এটি হল শ্রবণমূলক সংবেদনের উৎসস্থল। বস্তুত মস্তিষ্কের সক্রিয়তার প্রকৃত উৎস হল মস্তিষ্কের উপরের ধূসরবর্ণের বহিৰ্প্রদেশটি। একে মস্তিষ্কের আস্তরণ বা কর্টেক্স্ (Cortex) বলা হয়। মস্তিষ্কের মধ্যভাগ, পশ্চাৎভাগ ও নিম্নভাগের উপরের আস্তরণের একটা বড় অংশকে অনুষঙ্গ ক্ষেত্র (Association Areas) নাম দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রগুলিতে অসংখ্য অনুষঙ্গ নিউরন (Association neurons) বা সঙ্গতিসাধক নিউরন (Adjustment neurons) আছে। মস্তিষ্ক-আস্তরণের এই অংশেই বিভিন্নধর্মী সংবেদন গৃহীত, সংব্যাখ্যাত ও অতীতের বা বর্তমানের অন্যান্য সংবেদনের সঙ্গে সমন্বিত করা হয়ে থাকে। চাক্ষুষ, শ্রবণমূলক, স্পর্শমূলক প্রভৃতি বিভিন্ন স্মৃতিরও বাসভূমি বোধ হয় এই অংশটিই। এই বিভিন্ন স্মৃতিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে আমরা কথা বলা, পড়া, লেখা, হিসাব করা, বাঁ-ডান ঠিক করা, শরীরের বিভিন্ন অংশ দেখান, দিক মনে রাখা, পথ খুঁজে পাওয়া, সুর চিনতে পারা, বাজনা বাজানো, রঙের পার্থক্য নির্ণয় করা ইত্যাদি বিশেষধর্মী কাজগুলি করতে পারি।

লঘুমস্তিষ্কের কাজ

লঘুমস্তিষ্ককে (Cerebellum) ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক বলা হয়। প্রাণীর বিভিন্ন গতির মধ্যে সমন্বয় আনা এবং সূক্ষ্ম দেহসঞ্চালনগুলি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার পেছনে আছে মস্তিষ্কের এই অংশটি। লঘুমস্তিষ্ক না থাকলে আমাদের চলাফেরা হয়ে

উঠত শ্রীহীন, অপটু ও ঝাঁকুনিপূর্ণ। তাছাড়া আমাদের দেহের ভারসাম্য বজায় রাখায় লঘুমস্তিষ্কের ভূমিকা প্রচুর। কানের মধ্যে যে ভেষ্টিবুলার জলপথ আমাদের দেহের অবস্থিতির সংবেদন গ্রহণ করে তার সঙ্গে লঘুমস্তিষ্কের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে এবং আমরা দাঁড়িয়ে আছি, কি ফিরে দাঁড়াচ্ছি, কি হেঁটে হচ্ছি ইত্যাদি ব্যাপারগুলি জানতে পারি লঘুমস্তিষ্কের সাহায্যেই। আমাদের ইচ্ছাজাত দেহসঞ্চালনের উপরও লঘুমস্তিষ্কের প্রচুর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আছে।

মেরুদণ্ডের কাজ

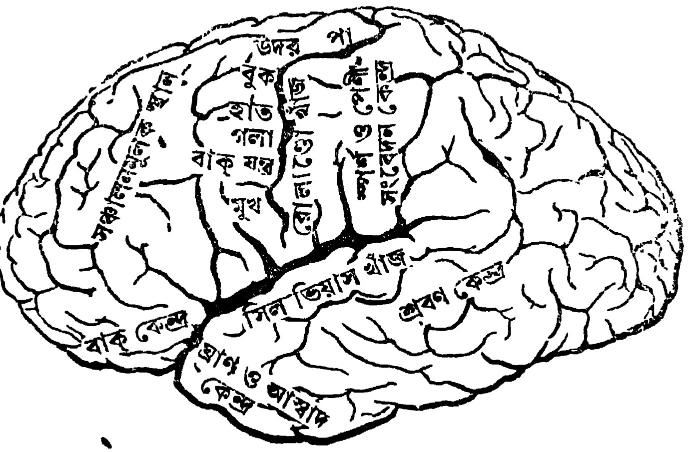
আমাদের মেরুদণ্ডের দুটি প্রধান কাজ আছে। প্রথমটি হল মস্তিষ্ক এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি মধ্যবর্তী সংযোজন-কেন্দ্র রূপে কাজ করা। বস্তুত মস্তিষ্ক থেকে নির্গত স্নায়ু উদ্দীপনাগুলিকে শরীরের বিভিন্ন অংশে পাঠান এবং ইন্দ্রিয় ও অন্যান্য দেহাংশ থেকে আগত স্নায়ু-উদ্দীপনাগুলিকে মস্তিষ্কে পরিচালিত করা—এই মূল্যবান কাজগুলি সম্পন্ন হয় মেরুদণ্ডের মাধ্যমে। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় থেকে জাত উদ্দীপনাগুলি মেরুদণ্ডের বিভিন্ন সংবেদক নিউরনের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌঁছয় এবং সেখান থেকে মেরুদণ্ডের প্রচেষ্টক নিউরনের সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে উপস্থিত হয় এবং প্রাণীর মধ্যে বিভিন্ন আচরণ সৃষ্টি করে।

মেরুদণ্ডের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রিফ্লেক্সের কেন্দ্ররূপে কাজ করা। রিফ্লেক্সমূলক আচরণের সময় সংবেদক-স্নায়ু ও প্রচেষ্টক স্নায়ুর মধ্যে সংযোগটি মস্তিষ্কে সংঘটিত হয় না, হয় মেরুদণ্ডে। যেমন, গরম কিছুতে হাত পড়লে সঙ্গে সঙ্গে হাতটি সরে আসে। এই রিফ্লেক্স আচরণটির পেছনে মস্তিষ্কের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের কোন প্রয়োজন হয় না এবং আচরণটি নিছক মেরুদণ্ডের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে।

এ ছাড়া আমাদের শরীরের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বা পরিবেশের সঙ্গে অন্যান্য অংশগুলির বর্তমানে কি ধরনের অবস্থিতিগত সম্পর্ক রয়েছে তার ধারণাও সৃষ্ট হয় কতকগুলি মেরুদণ্ডের নিউরনের সাহায্যে। হাত ভেঙে যাওয়ার ব্যথা, পেশী মুচড়ে যাওয়ার ব্যথা প্রভৃতি গভীর শারীরিক বেদনার অনুভূতি এবং স্পর্শ, শৈত্য ইত্যাদির ধারণাও মেরুদণ্ডের স্নায়ুমণ্ডলীর মাধ্যমে সৃষ্ট হয়ে থাকে।

মস্তিষ্কের আঞ্চলিকতা (Localisation of Brain)

নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ দেহের বিভিন্ন অংশকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং আমাদের বিভিন্ন আচরণ মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যেমন, মস্তিষ্কের সম্মুখভাগটি আমাদের সমস্ত সঞ্চালনমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে সমর্থ করে থাকে। সেই জন্য এই অংশটিকে সঞ্চালনমূলক ক্ষেত্র (Motor Area) বলে বর্ণনা করা হয়। আবার এই অংশেরই বিভিন্ন স্থানের দ্বারা পা, উদর, বুক, হাত, গলা, বাক্‌যন্ত্র, মুখ



[মস্তিষ্কের আঞ্চলিকতা]

প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন অংশগুলি নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। মস্তিষ্কের মধ্যভাগটি হল স্পর্শ ও পেশীসংবেদন কেন্দ্র, নিম্নভাগটি ঘ্রাণ ও আস্বাদনের কেন্দ্র, মধ্যভাগ শ্রবণ কেন্দ্র এবং সম্মুখভাগের নিম্নাংশ হল বাক্‌কেন্দ্র। মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগের নিম্নাংশটি ঘ্রাণ ও আস্বাদনের কেন্দ্র। তাছাড়া ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে যে আমাদের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে। যেমন, গুরুমস্তিষ্কের মধ্যভাগ থেকে জন্মায় স্পর্শের উপলব্ধি, অবস্থিতির অনুভূতি, ব্যথা, উত্তাপ প্রভৃতি সংবেদনগুলি। গুরুমস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগটি চাক্ষুষ সংবেদনের উৎসস্থল। আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গগত সঞ্চালনের মধ্যে সমন্বয়নের কাজ করে থাকে লঘুমস্তিষ্কটি। দেহের গতিবিধির নিয়ন্ত্রণের কাজও করে এই লঘুমস্তিষ্কটি। মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিভিন্ন কর্মক্ষমতার এই বণ্টনকে মস্তিষ্কের আঞ্চলিকতা (Localisation of Brain) বলা হয়ে থাকে। যদিও এটা পরীক্ষণ-প্রমাণিত সত্য যে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত

তবু এই বিভিন্ন অংশগুলিকে একেবারে স্বতন্ত্র বা বিচ্ছিন্ন সত্তা বলে মনে করলে বিরাট ভুল হবে। মস্তিষ্কের প্রত্যেকটি অংশ পরস্পরের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। প্রত্যেকটি অংশের কাজের উপর অন্যান্য অংশগুলির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব আছে এবং প্রয়োজন হলে একটি অংশের কাজ অপর অংশটিকে সম্পন্ন করতে দেখা গেছে। প্রসিদ্ধ শরীরতত্ত্ববিদ্ ল্যাসলে (Lashley) মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের কাজ নিয়ে নানা পরীক্ষণ করেছেন। তাঁর পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে যদিও মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে থাকে, তবু প্রয়োজনের সময় এই বিভিন্ন অংশগুলি একত্রিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবেও কাজ করতে পারে। ল্যাসলের পরীক্ষণ থেকে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে যদি কোন কারণে মস্তিষ্কের কোন একটি বিশেষ অংশ অকর্মণ্য হয়ে পড়ে তাহলে মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশগুলি সেই অংশটির কাজের ভার নিজের উপর তুলে নেয় এবং সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবেই সেই কাজটি সম্পন্ন করে। মস্তিষ্কের এই বৈশিষ্ট্যকে সমকর্মক্ষমতা (Equipotentiality) বলেও বর্ণনা করা হয়।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি (Endocrine Glands)

যখন কোন উদ্দীপক আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমে আমাদের মধ্যে উদ্দীপনা পাঠায় তখন আমাদের শরীর নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে সে উদ্দীপনায় সাড়া দেয়। যে সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে আমাদের শরীর এই সাড়া বা প্রতিক্রিয়াটি সম্পন্ন করে থাকে সেগুলিকে আমরা প্রতিক্রিয়ক যন্ত্র (Reacting Mechanism) বা কর্মেন্দ্রিয় (Effector) নাম দিয়ে থাকি। গ্রন্থি (Glands) হল এই ধরনের একটি প্রতিক্রিয়ক যন্ত্র বা কর্মেন্দ্রিয়।

অন্যান্য কর্মেন্দ্রিয়ের তুলনায় গ্রন্থিগুলির বৈশিষ্ট্য হল এই যে এগুলি থেকে এক ধরনের রাসায়নিক তরল পদার্থ ক্ষরিত হয় এবং এই তরল পদার্থ আমাদের শরীরের উপর নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত গ্রন্থিরসের প্রকৃতিও যেমন বিভিন্ন তেমনি শরীরের উপর তাদের প্রভাবও বিভিন্ন। যেমন, কোন কোন গ্রন্থিরস আমাদের খাদ্য হজমে সাহায্য করে, কোন কোনটি আবার শরীরের তাপমাত্রা বজায় রাখে। হৃদ্‌স্পন্দন, রক্তসঞ্চালন, দূষিত পদার্থের নিঃসরণ, যৌনকার্য, শরীরের বৃদ্ধি ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় কাজের মূলে গ্রন্থিরসের প্রচুর প্রভাব আছে। আমাদের বিশেষ বিশেষ আচরণ ও ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক সমন্বয়ও বিশেষভাবে গ্রন্থিরসের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে থাকে।

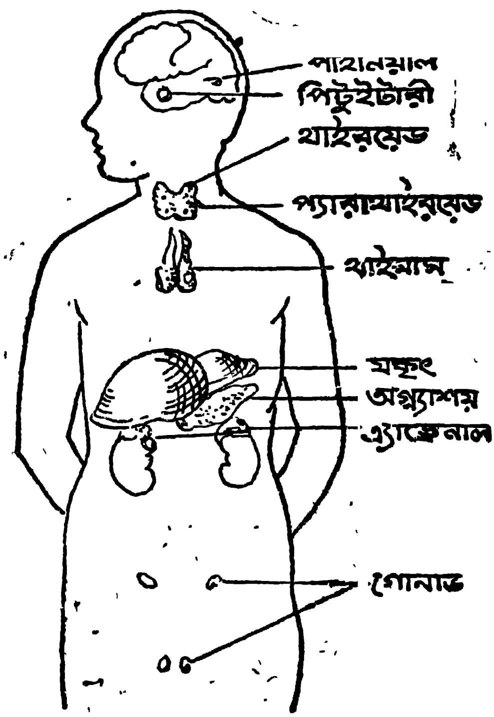
আমাদের শরীরে দু'শ্রেণীর গ্রন্থি পাওয়া যায়। সছিদ্র (Duct) এবং নিশ্ছিদ্র (Ductless)। সছিদ্র গ্রন্থিগুলির মধ্যে নলের মত গঠন থাকে এবং সেই নল বেয়ে গ্রন্থিরস এসে শরীরের নানা অংশে পড়ে। লালাগ্রন্থি (Salivary gland), পাচকগ্রন্থি (Gastric gland,) অগ্ন্যাশয় (Pancreas), যকৃৎ (Liver), মূত্রগ্রন্থি (Kidney), ঘর্মগ্রন্থি (Sweat gland), অশ্রুগ্রন্থি (Tear gland) ইত্যাদি হল সছিদ্র গ্রন্থির দৃষ্টান্ত। এগুলি থেকে সরু নল বেয়ে গ্রন্থিরস নির্গত হয় এবং আমাদের শরীরের বহু প্রয়োজনীয় কাজ এগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে।

নিশ্ছিদ্র গ্রন্থি (Ductless glands) থেকে গ্রন্থিরস সরাসরি রক্তস্রোতে গিয়ে পড়ে এবং তার জন্য কোন নলের সাহায্য লাগে না। এই গ্রন্থিরসগুলিকে

হরমোন (Hormone) নাম দেওয়া হয়েছে। যেহেতু এই ধরনের গ্রন্থিগুলির ক্ষরণ অভ্যন্তরীণ, সেই হেতু এগুলিকে অন্তঃক্ষরা (Endocrine) গ্রন্থিও বলা হয়ে থাকে।

আমাদের শরীরে কতগুলি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি আছে এবং শরীরে সেগুলির অবস্থিতি কোথায় কোথায় তার একটি বিবরণ নীচের ছবিটি থেকে পাওয়া যাবে।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি থেকে যে হরমোন নির্গত হয় তা সরাসরি গিয়ে আমাদের রক্তস্রোতে পড়ে এবং শরীরের সর্বত্র পরিবাহিত হয়। তার ফলে



[বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির পরিচয় ও অবস্থিতি]

এই হরমোন শরীরের সমস্ত প্রতিক্রিয়ক যন্ত্রগুলির মধ্যে সমন্বয় আনতে এবং সেগুলিকে সুসংবদ্ধভাবে কাজ করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। শরীরের বিভিন্ন অংশগুলির এই নিয়ন্ত্রণকে রাসায়নিক সমন্বয়ন (Chemical Integration) নাম দেওয়া হয়েছে। এই সমন্বয়নের কাজ ছাড়াও শরীরের বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ, প্রক্ষোভমূলক আচরণ, ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ইত্যাদি

নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজও এই গ্রন্থিগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির বিশেষ বিশেষ কাজের একটি বিবরণ দেওয়া হল।

পিটুইটারি গ্রন্থি (Pituitary Gland)

মাথার প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় মস্তিষ্কের নীচে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত। গ্রন্থিটির দুটি প্রধান অংশ আছে। সম্মুখ অংশ ও পশ্চাৎ অংশ। পিটুইটারির সম্মুখ অংশ থেকে একটি বিশেষ হরমোন নিঃসৃত হয় যা আমাদের শরীরের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে। যদি হরমোনটি অধিকমাত্রায় নিঃসৃত হয় তবে শরীরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখা দেয়। অসাধারণ দৈর্ঘ্য, অতিকায় আকৃতি, বিরাট হাত পা ইত্যাদি শারীরিক অস্বাভাবিকতাগুলি এই পিটুইটারি হরমোনের আতিশয্য থেকে দেখা দেয়। আবার যদি এই হরমোনটি অল্পমাত্রায় নিঃসৃত হয় তাহলেও শরীরের স্বাভাবিক বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। হাত-পাগুলি ছোট হয়ে ওঠে, শরীর খর্বাকার হয় এবং দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও অস্বাভাবিকভাবে ছোট হয়ে যায়।

পিটুইটারির পশ্চাৎ অংশ থেকে যে হরমোনটি নিঃসৃত হয় তার দ্বারা আমাদের শরীরের মসৃণ পেশীগুলি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। এই হরমোন অন্ত্র, মূত্রাশয়, জরায়ু প্রভৃতি শরীরের যন্ত্রপাতিগুলিকে অধিকতর সক্রিয় করে তোলে।

থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid Glands)

গলার মধ্যে শ্বাসনালীর দু'পাশে এই গ্রন্থিটি অবস্থিত। এ থেকে যে হরমোনটি নিঃসৃত হয় তার নাম হল থাইরক্সিন। শরীরের সামগ্রিক বিকাশে এই গ্রন্থিটির কাজ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শৈশবে এই গ্রন্থিটি থেকে যদি নিঃসরণ যথেষ্ট পরিমাণে না ঘটে, তবে শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার বৃদ্ধিই বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে উঠে। ফলে যে রোগটি দেখা দেয়; তার নাম ক্রেটিনতা (Cretinism)। থাইরক্সিন প্রয়োগে এই রোগ সেরে যায়। আর যদি পরিণত বয়সে থাইরক্সিনের নিঃসরণ কম হয় তবে মিক্সেডেমা (Myxedema) নামে ব্যাধি দেখা দেয়। চুল উঠে যাওয়া, চামড়া পুরু ও স্ফীত হয়ে ওঠা, শরীরের রাসায়নিক কাজ মন্থর হয়ে যাওয়া, মেদ বৃদ্ধি ইত্যাদি হল এই রোগটির লক্ষণ। তাছাড়া উৎসাহের অভাব, বিষন্নতা, অবসন্নতা ইত্যাদি উপসর্গও এ রোগে দেখা দেয়।

আবার যদি থাইরক্সিনের নিঃসরণ অতিরিক্ত মাত্রায় হয় তবে শরীরের প্রতিক্রিয়াগুলিও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। দ্রুত নাড়ীর স্পন্দন, রক্তের চাপ বৃদ্ধি,

শারীরিক প্রক্রিয়ার দ্রুততা ইত্যাদি দেখা দেয় এবং অস্থিরতা, অতিরিক্ত উৎসাহ, স্নায়ুদৌর্বল্য, অনিদ্রা প্রভৃতি উপসর্গের আবির্ভাব হয়।

প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid Gland)

এর প্রধান কাজ হল আমাদের শরীরের চুণের (Calcium) ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা। রক্তের মধ্যে চুণের পরিমাণের উপর নির্ভর করে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনার তীব্রতা। এই গ্রন্থিটি অধিকমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠলে স্নায়বিক অস্থিরতা, অনুভূতি-প্রবণতা, অন্তর্মুখিতা ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দেয়।

এ্যাড্রেনাল গ্রন্থি (Adrenal Gland)

প্রতিটি মূত্রাশয়ের (Kidney) উপর একটি করে এ্যাড্রেনাল গ্রন্থি আছে। প্রতিটি গ্রন্থির আবার দুটি দিক বা স্তর আছে। অন্তঃকেন্দ্র বা মেডুলা (Medulla) এবং বহিঃস্তর বা করটেক্স (Cortex)। বহিঃস্তর থেকে যে রসটি নিঃসৃত হয় তার নাম কোর্টিন (Cortin)। এই গ্রন্থিরসটি আমাদের শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই রসটির নিঃসরণ কম হলে রক্তচাপের হ্রাস, পেশীমূলক দুর্বলতা, পরিপাচনঘটিত গোলযোগ, অতিরিক্ত ক্লান্তি এবং প্রতিরোধ শক্তির অবনতি ইত্যাদি দেখা দেয়। যৌনমূলক বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও এই গ্রন্থিরসটির যথেষ্ট প্রভাব আছে।

শৈশবে এই রসটির অতি নিঃসরণ ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মধ্যে পুরুষোচিত ভাব সৃষ্টি করে এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে নারীসুলভ ক্রিয়াগুলিকে ব্যাহত করে তোলে।

এ্যাড্রেনালের অন্তঃকেন্দ্র (Medulla) থেকে নির্গত হয় এ্যাড্রেনালিন (Adrenalin) নামে গ্রন্থিরসটি। আজকাল এই রসটি কৃত্রিম উপায়ে তৈরী করা হয়েছে এবং তার নাম দেওয়া হয়েছে এ্যাড্রেনিন (Adrenin)। মনোবিজ্ঞানে এই গ্রন্থিরসটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা প্রক্ষোভের বিকাশ ও অভিব্যক্তির সঙ্গে এই গ্রন্থিরসটির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। উত্তেজনা বা প্রক্ষোভের জাগরণের সময় এই গ্রন্থিরসটি প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হতে সুরু করে। হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত হয়ে ওঠা, রক্তের চাপ বেড়ে যাওয়া, যকৃৎ থেকে সঞ্চিত শর্করা ক্ষরিত হওয়া, পরিপাচন ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া, ফুসফুসে বাতাস যাওয়ার পথ স্ফীত হয়ে ওঠা এবং প্রচণ্ড ধরনের কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য শারীরিক পরিবর্তন এই এ্যাড্রেনালিনের অতি নিঃসরণের জন্যই ঘটে থাকে।

গোনাড গ্রন্থি (Gonad Gland)

এগুলি হল যৌনমূলক গ্রন্থি এবং ছেলে বা মেয়ে উভয়ের শরীর ও মনের যৌনমূলক বিকাশের পিছনে এই গ্রন্থিগুলির যথেষ্ট প্রভাব আছে।

অগ্ন্যাশয় (Pancreas)

এ থেকে ইনসুলিন (Insulin) নামে গ্রন্থিরসটি নিঃসৃত হয়। শরীরের অভ্যন্তরস্থ নিঃসৃত শর্করার ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয় এই গ্রন্থিরসটির দ্বারা।

পাইনাল (Pineal)

এই গ্রন্থিটি শৈশবেই সক্রিয় থাকে এবং যৌবনাগমের পর এর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। যৌনবিকাশের কাজে এই গ্রন্থিটির প্রভাব আছে বলে মনে করা হয়।

থাইমাস (Thymus)

এ গ্রন্থিটিও যৌবনাগমের পর ধীরে ধীরে নিষ্ক্রিয় হয়ে ওঠে। এর কাজের প্রকৃত স্বরূপ ঠিক জানা যায় নি।

যকৃৎ (Liver)

পরিপাচন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করা ছাড়াও এটি থেকে এক ধরনের হরমোন নির্গত হয়। কিন্তু তার কাজের প্রকৃত স্বরূপ এখনও অজ্ঞাত।

অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ভারসাম্য

বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির কাজের প্রকৃতি বিভিন্ন, এমন কি সময় সময় পরস্পরবিরোধীও হয়ে থাকে। একটি গ্রন্থি যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন অপরটির কাজ তার দ্বারা ব্যাহত হয়, আবার কখনও কখনও একটি গ্রন্থির সক্রিয়তা অপর গ্রন্থিটিকে সক্রিয় করে তোলে। এই জন্য গ্রন্থিগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের একটি পরিষ্কার বিবরণ দেওয়া শক্ত।

তবে গ্রন্থিগুলির প্রকৃতি ও কাজের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটি সহযোগিতা ও বোঝাপড়ার ভাব সব সময় দেখা যায়। যেমন, থাইরয়েডের কাজে সহায়তা করে এ্যাড্রেনাল, আবার গোনাড গ্রন্থির কাজের তীব্রতা বাড়িয়ে দেয় পিটুইটারির সম্মুখ ভাগটি। এইভাবে দেখা যায় যে তাদের মৌলিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও গ্রন্থিগুলি কখনও একক বা বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে না। তাদের সমস্ত কাজের মধ্যেই একটি পারস্পরিক একতাবোধ ও সামগ্রিক সমন্বয়ন বর্তমান। শরীরতত্ত্ববিদেরা এই ব্যাপারটিকেই অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ভারসাম্য (Balance of Endocrine Glands) নাম দিয়েছেন।

বার

সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ (Sensation and Perception)

জড়বস্তু এবং প্রাণীর মধ্যে সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল যে জড়বস্তু তার বাইরের কোন বস্তুর অস্তিত্ব জানতে পারে না, কিন্তু প্রাণী তা পারে। এর জন্য প্রাণীর দেহের মধ্যে এমন সব বিশেষধর্মী যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম আছে যা অ-প্রাণীর মধ্যে নেই। এই বিশেষধর্মী যন্ত্রপাতির সাহায্যেই প্রাণী তার বাইরের উদ্দীপকটিকে স্নায়ু উদ্দীপনার রূপে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে এবং বাইরের জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে।

প্রাণীর যে কোন ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞানকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি স্তর দেখতে পাই। প্রথমত, বাইরের উদ্দীপকের দ্বারা প্রেরিত উদ্দীপনা থেকে প্রসূত একটি স্নায়ুমূলক অনুভূতি এবং দ্বিতীয়ত, সেই অনুভূতিটির প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি ধারণা বা এক কথায় সেই অনুভূতিটির সংব্যাখ্যান। যেমন, ঘুম থেকে চোখ খুলে তাকাতেই এক ঝলক আলো চোখের মধ্যে দিয়ে অক্ষিপটে পড়ল এবং সেখান থেকে উদ্দীপনা সৃষ্ট হয়ে অক্ষিমূলক স্নায়ু (Optic Nerve) বেয়ে মস্তিষ্কে গিয়ে উপস্থিত হল। সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ এক ধরনের অনুভূতি আমাদের মস্তিষ্কে লিপিবদ্ধ হল। এই অনুভূতিটি কিসের বা কি প্রকৃতির বা তার কি নাম ইত্যাদি সম্বন্ধে সেই মুহূর্তে আমাদের কোনও পরিষ্কার জ্ঞান থাকে না। কিন্তু ঠিক পরমুহূর্তেই আমাদের জ্ঞান হয় যে আমাদের অভিজ্ঞতাটি এক ঝলক আলোর এবং সেটা খুব উজ্জ্বল সাদা, ঈষৎ উষ্ণ এবং সূর্য থেকে উদ্ভূত ইত্যাদি। এই পরবর্তী বোধগুলি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলো সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানটি সম্পূর্ণ হল। এই প্রথম স্তরের অভিজ্ঞতাকে বলা হয় সংবেদন (Sensation) এবং দ্বিতীয় স্তরের অভিজ্ঞতাকে বলা হয় প্রত্যক্ষণ (Perception)।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সকল জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মূলে আছে সংবেদন। সংবেদন হচ্ছে উদ্দীপকের প্রাথমিক বোধ। আর প্রত্যক্ষণ হচ্ছে সেই সংবেদনের সংব্যাখ্যাত রূপ। অতএব বিনা সংবেদনে প্রত্যক্ষণ হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষণ ছাড়াও সংবেদন হতে পারে। তবে বাস্তবে কারও পক্ষে বিশুদ্ধ সংবেদন বা প্রত্যক্ষণ-বর্জিত সংবেদন লাভ করা সম্ভব নয়। কেননা যে মুহূর্তে সংবেদনটি সৃষ্টি হবে সেই মুহূর্তেই তার একটি সংব্যাখ্যান মস্তিষ্ক তৈরী করে

নেবে। তত্ত্বের দিক দিয়ে বলা যেতে পারে যে একমাত্র সদ্যজাত শিশুর ক্ষেত্রেই নিছক সংবেদন হওয়া সম্ভবপর, কেননা তার সংবেদনের সংব্যাখ্যান করার মত কোন পূর্বজ্ঞান তখনও তার মস্তিষ্কের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

সংবেদনকে প্রত্যক্ষণে নিয়ে যেতে সাহায্য করে অতীত অভিজ্ঞতা এবং ঐ বস্তুটি সম্বন্ধে পূর্বে আহরিত বিভিন্ন তথ্যাদি। তাছাড়া পরিবেশের প্রভাবও প্রত্যক্ষণের স্বরূপ নির্ণয়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। অতীত অভিজ্ঞতা, পূর্বজ্ঞান, পারিবেশিক প্রভাব ইত্যাদি একযোগে আমাদের অর্থহীন সংবেদনকে অর্থময় করে তোলে। সংবেদন প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান নয়, জ্ঞানের উপাদান মাত্র, প্রত্যক্ষণে সেই উপাদান পূর্ণাঙ্গ ও অর্থময় জ্ঞানের রূপ ধারণ করে।

সংবেদনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Sensation)

সংবেদন জন্মায় উদ্দীপনা থেকে এবং উদ্দীপনা জন্ম নেয় আমাদের ইন্দ্রিয়গুলির সক্রিয়তা থেকে। যখনই আমাদের কোন একটি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাইরের জগতের কোন বস্তুর সংযোগ ঘটে, তখনই আমাদের দেহের অভ্যন্তরে স্নায়ুপথে উদ্দীপনা দেখা দেয় এবং সেই উদ্দীপনা থেকে সংবেদন সৃষ্ট হয়। সেই জন্য আমাদের যতগুলি ইন্দ্রিয় আছে সংবেদনও তত প্রকারের হয়ে থাকে। প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা ধরা হয়েছে পাঁচটি—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। আর এদের মাধ্যমে যে সকল সংবেদন আমরা অর্জন করে থাকি সেগুলির নাম হল, চাক্ষুষ (Visual), শ্রাবণ (Auditory), স্পর্শজ (Tactual), ঘ্রাণজ (Olfactory) এবং স্বাদজ (Gustatory) সংবেদন। কিন্তু প্রাচীন শিক্ষাবিদ্‌দের মতে ইন্দ্রিয়বোধর পাঁচটি হলেও বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে এগুলি ছাড়াও আমাদের আরও অনেকগুলি ইন্দ্রিয়বোধ আছে। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল স্থিরতা বা ভারসাম্যের বোধ (Static sense) এবং পেশী সঞ্চালনের বোধ (Muscle sense or Kinaesthesis)। স্পর্শের বোধকে আমরা এতদিন এক ধরনের সংবেদন বলে মনে করে এসেছি কিন্তু তার মধ্যেও চারটি বিশেষধর্মী ও বিভিন্ন প্রকৃতির অনুভূতি পাওয়া গেছে, যথা, ব্যথা, চাপ, শৈত্য এবং উষ্ণতা। দেখা গেছে যে ব্যথার সংবেদন সৃষ্ট হয় চর্মের নীচে অবস্থিত অসংখ্য ব্যথা-স্থল (Pain spot) থেকে, আর সাধারণ স্পর্শ উদ্ভূত হয় চর্মের নীচে অবস্থিত অনুরূপ অসংখ্য স্পর্শ স্থল (Touch spot) থেকে। অর্থাৎ স্পর্শের ইন্দ্রিয় এবং ব্যথার ইন্দ্রিয় দুটি বিভিন্ন এবং সেই জন্য স্পর্শের সংবেদন ও ব্যথার সংবেদন দুটিও বিভিন্ন। তেমনই শরীরের

কোনও অংশে চাপ দিলে যে সংবেদন জাগে তা সাধারণ স্পর্শের সংবেদন থেকে স্বতন্ত্র একটি সংবেদন। এই রকম শৈত্যের সংবেদন এবং উষ্ণতার সংবেদন দুটিও স্পর্শের সংবেদন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সংবেদন।

দেহজ সংবেদন

এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্রগুলির কাজ থেকে আর এক শ্রেণীর সংবেদন উদ্ভূত হয়। এগুলির নাম দেওয়া হয়েছে দেহজ সংবেদন (Organic sensation)। আমাদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আমাদের দেহের অভ্যন্তরের যন্ত্রপাতিগুলি পরিপাচনক্রিয়া, রক্তসঞ্চালন, শ্বাসক্রিয়া প্রভৃতি যে সকল অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে থাকে সেগুলি থেকে যে সব সংবেদন জন্মায় সেগুলিকেই দেহজ সংবেদন বলা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ক্ষুধা বা তৃষ্ণার সময় শরীরের মধ্যে যে ধরনের অনুভূতি হয় তাকে সাধারণ স্পর্শবোধের পর্যায়ে ফেলা চলে না। তেমনই ক্ষুধা বা তৃষ্ণার তৃপ্তিতে এক ধরনের সর্বদৈহিক অনুভূতির অভিজ্ঞতা হয়। শরীরতত্ত্ববিদেরা এগুলিরই নাম দিয়েছেন দেহজ অনুভূতি। এই অনুভূতিগুলি সম্পূর্ণ অনির্দিষ্ট প্রকৃতির এবং এগুলির কোন নির্দিষ্ট নাম দেওয়া সম্ভব নয়। পাকস্থলী, অন্ত্র ইত্যাদির মধ্যে কোনও রূপ ক্ষত বা টিউমার সৃষ্টি হলেও যে অনির্দিষ্ট প্রকৃতির সংবেদন দেখা দেয় তাও এই ধরনের দেহজ সংবেদনের অন্তর্গত।

সংবেদনের ধর্ম (Attributes of Sensation)

উদ্দীপক এবং তা থেকে প্রসূত সংবেদনের প্রকৃতির দিক দিয়ে সংবেদনের চার রকম ধর্ম বা লক্ষণের কথা বলা যায়, যথা গুণ (Quality), তীব্রতা (Intensity), ব্যাপ্তি (Extensity) এবং স্থিতি (Duration)।

আমাদের যে বস্তুটির সংবেদন হচ্ছে তাকেই সংবেদনের গুণ বলা হয়। যেমন, চাক্ষুষ সংবেদনের গুণ হল যে রঙটি দেখছি সেটি, শ্রাবণ সংবেদনের গুণ হল যে ধ্বনিটি আমরা শুনছি সেটি, স্বাদজ সংবেদনের গুণ হল যে তিক্ততা বা মিষ্টতার আমরা আস্বাদ পাচ্ছি সেটি ইত্যাদি।

গুণের দিক দিয়ে সংবেদনের মধ্যে দু'রকমের পার্থক্য হতে পারে। জাতিগত (Generic) ও উপজাতিগত (Specific)। চাক্ষুষ সংবেদন ও শ্রাবণ সংবেদনের মধ্যে পার্থক্যটা জাতিগত, কেননা এ দুটি সংবেদনই বিভিন্ন জাতির অন্তর্গত। কিন্তু লাল রঙের সংবেদন ও নীল রঙের সংবেদনের মধ্যে পার্থক্যটি

উপজাতিগত। কেননা এ দুটি সংবেদন একই জাতির অন্তর্গত কিন্তু তারা উপজাতির দিক দিয়ে বিভিন্ন।

সংবেদনের তীব্রতা বলতে বোঝায় সংবেদনের পরিমাণ বা মাত্রা। উদ্দীপকের শক্তির উপর নির্ভর করছে সংবেদনের তীব্রতা। যেমন, একটি ২০০ বাতির আলোর সংবেদনের তীব্রতা ১০০ বাতির আলো থেকে জাত সংবেদনের তীব্রতার চেয়ে অনেক বেশী। তেমনই একটু জোরে চীৎকার করলে যে সংবেদন অনুভূত হবে তার তীব্রতা সাধারণ কণ্ঠস্বর থেকে জাত সংবেদনের তীব্রতার চেয়ে বেশী।

সংবেদনের ব্যাপ্তি বলতে বোঝায় যে সংবেদনটি কতটা জায়গা জুড়ে আছে। যেমন, হাতের উপর একটি পিন ঠেকালে যে সংবেদন হবে তার ব্যাপ্তি হাতের উপর একটি বই রাখলে যে সংবেদন হবে তার ব্যাপ্তির চেয়ে অনেক কম। এক বালতি জলে একটা আঙুল ডোবালে যে সংবেদন হবে তার চেয়ে বেশী ব্যাপক সংবেদন হবে সম্পূর্ণ হাতটা ডোবালে। তেমনই একটি পোষ্টকার্ডের চাক্ষুষ সংবেদন একটি খবরের কাগজের চাক্ষুষ সংবেদনের চেয়ে অনেক কম ব্যাপক, যদিও গুণের দিক দিয়ে এ দুটি সংবেদনই অভিন্ন।

স্থানগত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য (Local Character or Sign)

কোন ব্যাপ্তিসম্পন্ন সংবেদনকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বহু ছোট ছোট বিশেষধর্মী সংবেদন নিয়ে সমগ্র সংবেদনটি গঠিত। এই ছোট ছোট সংবেদনগুলি সব দিক দিয়ে এক হলেও তাদের অবস্থিতির বিভিন্নতার দিক দিয়ে তারা পৃথক। এই অবস্থিতির বৈষম্যকে সংবেদনগুলির স্থানগত ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য (Local character or Sign) বলা হয়। এর অর্থ হল এই যে যদিও এই ছোট ছোট সংবেদনগুলি একই ইন্দ্রিয় থেকে উদ্ভূত তবুও ইন্দ্রিয়ের বিভিন্ন অংশের উদ্দীপনা থেকে সেগুলির জন্ম বলে তাদের মধ্যে স্থানগত একটি স্বতন্ত্রতা বা পার্থক্য থাকে। যেমন, যদি পিঠের উপর কেউ হাত রাখে তবে আমরা চোখে না দেখেও বলতে পারি যে পিঠের কোন্ জায়গায় হাত রাখা হয়েছে। যদিও হাত রাখার সংবেদনগুলি সব জায়গায় এক, তবু তাদের স্থানগত বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্রতার জন্যই প্রত্যেকটি বিভিন্ন স্পর্শকে পৃথকভাবে চিনে নিতে আমাদের অসুবিধা হয় না। স্পর্শজ এবং চাক্ষুষ সংবেদনের ক্ষেত্রেই এই স্থানগত পার্থক্যটি বিশেষভাবে জানা যায়। বস্তুত, সংবেদনের এই ব্যাপ্তি থেকেই আমাদের স্থান সম্বন্ধে ধারণা জন্মেছে।

সংবেদনের স্থিতি বলতে বোঝায় যে সংবেদন কতটা সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছে। কোন সংবেদন মুহূর্তের জন্য ঘটতে পারে, কোনটি আবার কিছুকাল থাকতে

পারে আবার কোনটি বহুক্ষণ স্থায়ী হতে পারে। সংবেদনের এই স্থায়িত্বমূলক ধর্ম থেকেই আমাদের সময় সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মেছে।

স্থান ও কালের প্রত্যক্ষণ
(Perception of Space and Time)

কেমন করে আমরা স্থান (Space) ও কাল (Time) প্রত্যক্ষ করি তা নিয়ে বহু জল্পনা কল্পনা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য দৃশ্যমান বস্তুর মত এ দুটি বস্তু প্রত্যক্ষভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। স্থান বলে প্রকৃতপক্ষে কোন অস্তিত্বসম্পন্ন বস্তু নেই। বরং কোন বস্তুর অস্তিত্বের অভাবকেই স্থান বলা হয়। সাধারণত আমরা দু'ধরনের স্থানের কথা উল্লেখ করে থাকি, পূর্ণ স্থান (Filled space) এবং শূন্য স্থান (Empty space)। পূর্ণ স্থান প্রকৃতপক্ষে স্থান নয়, কেননা সেখানে কোন একটি বস্তু স্থানটি অধিকার করে থাকে। প্রকৃত স্থান হল শূন্যস্থান এবং সেটি যেহেতু অভাবাত্মক বস্তু, সেহেতু সেটি প্রতক্ষভাবে আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হতে পারে না। সময় বলেও তেমনই কোন দৃশ্যমান বস্তু নেই এবং কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সময়কে প্রত্যক্ষণ করা যায় না। কিন্তু তবু আমরা এ দুটি বস্তুর প্রত্যক্ষণ করে থাকি এবং সেটি সম্ভব হল কেমন করে?

স্থানের প্রত্যক্ষণ সম্বন্ধে দু'শ্রেণীর মতবাদ প্রচলিত আছে, সৃজনমূলক (Genetic) এবং সহজননমূলক (Nativistic)। সৃজনমূলক মতবাদ অনুযায়ী স্থানের সম্বন্ধে কোনরূপ ধারণা নিয়ে শিশু জন্মায় না। তার জন্মের পর পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সে স্থান সম্বন্ধে ধারণা অর্জন করে। বিশেষ করে সংবেদনের ব্যাপ্তি থেকেই স্থানের ধারণাটির সৃষ্টি হয়। সহজনন-মূলক মতবাদ অনুযায়ী শিশুর জন্মের সময় থেকেই তার মধ্যে অপরিণত অবস্থায় নিহিত থাকে স্থান সম্বন্ধীয় ধারণা এবং পরে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই অবিকশিত ধারণাও পূর্ণতা লাভ করে।

স্থানের ধারণা অর্জিতই হোক্ আর সহজাতই হোক্ সংবেদনের ব্যাপ্তি যে সেটির বিকাশের প্রধানতম উপকরণ সে বিষয়ে সকল মনোবিজ্ঞানীই একমত। যখন আমরা একটি লম্ব: সরল রেখার দিকে তাকাই তখন আমাদের সেই চাক্ষুষ সংবেদনটির মধ্যে আছে অনেকগুলি সমকালীন এবং পাশাপাশি অবস্থিত বিন্দুর সংবেদন। এই সংবেদনগুলির বিভিন্ন স্থানগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাদের অবস্থিতির পার্থক্যটি আমরা জানতে পারি এবং এই জ্ঞান থেকেই স্থানের প্রসারণ বা বিস্তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা জন্মায়। আর একটি ধারণা আমাদের স্থানের প্রত্যক্ষণে সাহায্য করে। সেটি হল গতি বা অঙ্গসঞ্চালনের (Movement) সংবেদন।

আমাদের ব্যাহত বা বাধাপ্রাপ্ত গতি থেকে আমরা পূর্ণস্থানের ধারণা পেয়েছি এবং অব্যাহত গতি থেকে পেয়েছি শূন্যস্থানের ধারণা। তাছাড়া হাত-পা নাড়া, চলাফেরা থেকে দূরত্ব ও দিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছি।

সেই রকম সময়ের প্রত্যক্ষণও আমরা পেয়ে থাকি সংবেদনের স্থিতি থেকে। কোন সংবেদন অল্পক্ষণ থাকে, আবার কোন সংবেদন অনেকক্ষণ স্থায়ী হয়। সংবেদনের স্থিতির এই বিভিন্নতা থেকেই আমাদের সময় সম্বন্ধে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। যে সংবেদনটি কিছুক্ষণ আগে ছিল কিন্তু এখন নেই, সেই সংবেদনটি থেকে আমরা অতীতের ধারণা পেয়েছি। যে সংবেদনটি এখন এই মুহূর্তে ঘটে চলছে সেই সংবেদনটি আমাদের বর্তমান সম্বন্ধে ধারণা দিয়েছে। সেই রকম যে সংবেদনটি বর্তমান মুহূর্তের পরে ঘটবে সেই সংবেদনটি আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণার সৃষ্টি করে।

দূরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তনের প্রত্যক্ষণ
(Perception of Distance, Depth & Three Dimension)

আমরা যখন কোন বস্তু দেখি তখন সেই বস্তুটি থেকে আলো আমাদের চোখের মধ্যে রেটিনা বা অক্ষিপটের উপর প্রতিফলিত হয়। ফলে সেখানে ঐ বস্তুটির একটি প্রতিকৃতির সৃষ্টি হয়। এখন এই প্রতিকৃতিটি বইয়ের পাতায় ছাপা ছবি বা সিনেমার পর্দায় প্রতিফলিত ছবির মত দ্বি-আয়তন বিশিষ্ট, অর্থাৎ এর দৈর্ঘ্য আছে, প্রস্থ আছে কিন্তু গভীরতা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা প্রকৃতপক্ষে তিনটি আয়তনই প্রত্যক্ষণ করে থাকি। আমার সামনে রাখা মোটা অভিধানটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতা, এ তিনটি বৈশিষ্ট্যই আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, যদিও আমার অক্ষিপট দুটিতে ঐ বইটির যে ছবি দুটি প্রতিফলিত হয়েছে সে দুটির মাত্র দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আছে, কোন গভীরতা নেই।

অতএব প্রশ্ন হল যে আমাদের অক্ষিপটে প্রতিফলিত ছবিগুলির যদি কোন গভীরতা না থেকে থাকে এবং সেগুলি যদি কেবলমাত্র দ্বি-আয়তনবিশিষ্ট ছবি হয়ে থাকে তবে আমরা দূরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তন কেমন করে দেখি?

এই দূরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তন দেখার কারণগুলিকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা—এক-চক্ষুমূলক কারণ (Monocular factors) ও দ্বি-চক্ষুমূলক কারণ (Binocular factors)।

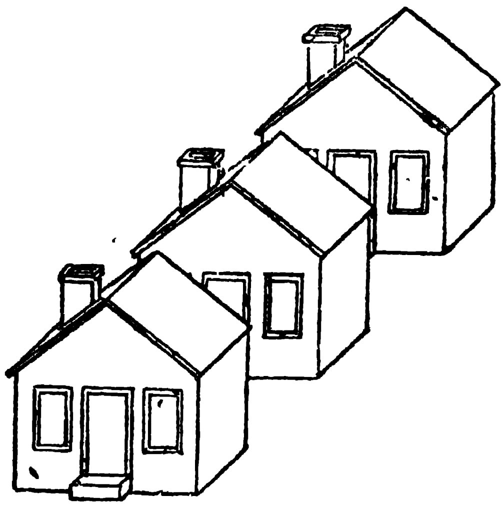
এক-চক্ষুমূলক কারণ (Monocular Factors)

যখন আমরা একটি মাত্র চোখের ব্যবহার করি তখন নিম্নলিখিত কারণগুলি

আমাদের গভীরতা এবং ত্রি-আয়তন দেখতে সাহায্য করে। এগুলিকেই এক-চক্ষুমূলক কারণ বলা হয়। এগুলি যে দ্বি-চক্ষুমূলক দর্শনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে তা বলাই বাহুল্য।

ক। বস্তুর অন্তরালবর্তিতা (Interposition of Objects)

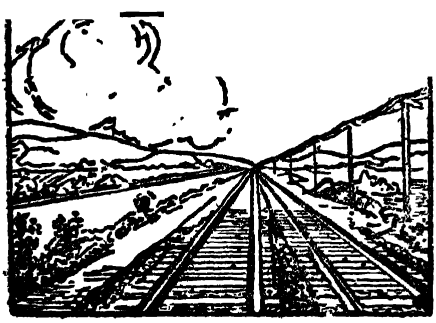
একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে আড়াল করলে যেটি সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে সেটি নিকটে এবং যেটি আংশিক দেখা যাচ্ছে সেটি দূরে অবস্থিত বলে ধরে নেওয়া



[বস্তুর অন্তরালবর্তিতা]

হয়। যেমন, উপরের ছবিটিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাড়ী দুটি আংশিক আবৃত থাকায় অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী বলে মনে হচ্ছে এবং প্রথম বাড়ীটি সম্পূর্ণ অনাবৃত থাকায় আর দুটির তুলনায় নিকটবর্তী বলে মনে হচ্ছে।

খ। রেখামূলক চিত্রানুপাত (Linear Perspective)



[রেখামূলক চিত্রানুপাত]

দূরের বস্তু সব সময় ছোট ও সঙ্কুচিত দেখায়, কাছের বস্তু বড় দেখায়। পাশে রেল লাইনের ছবিটিতে কোন্ থামটি কাছে ও কোন্টি দূরে তা ঐ থামগুলির আকৃতি দেখে সহজেই বোঝা যাচ্ছে। রেল লাইনের ক্ষেত্রে লাইনের রেখাগুলি বিস্তৃত থেকে ক্রমশ কেন্দ্রীভূত হয়ে দূরত্বের ধারণা সৃষ্টি করেছে।

গ। বায়বীয় চিত্রানুপাত (Aerial Perspective)

যে বস্তুটি দূরে থাকে সেটি নিকটবর্তী বস্তুর চেয়ে অস্পষ্ট ও ঝাপসা দেখায়। এর কারণ যে বস্তুটির দূরত্ব যত বেশী হবে সেটির মধ্যবর্তী বাতাসের পরিমাণ তত বাড়বে এবং ফলে তত ধূলো, বাষ্প ইত্যাদির দ্বারা আমাদের দৃষ্টি ব্যাহত হবে।

ঘ। আলো ও ছায়া (Light and Shade)

যেখানে গর্ত বা নীচু জায়গা থাকে সেখানে ছায়ার সৃষ্টি হয়। অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং সমতল জায়গা আলোকিত দেখায়। ফলে আলোছায়ার বিভিন্ন সমাবেশ স্থানটির দূরত্ব বুঝতে আমাদের সাহায্য করে।

ঙ। লম্বন (Parallax)

একটি চোখ বন্ধ রেখে যদি ধীরে ধীরে মাথাটিকে একপাশে সরানো যায় তবে দেখা যাবে যে সামনের বস্তুগুলিও সঙ্গে সঙ্গে সরতে সুরু করেছে। তবে যেগুলি কাছের বস্তু সেগুলি যেদিকে মাথা নাড়া হচ্ছে তার বিপরীত দিকে চলবে, আর যেগুলি দূরের বস্তু সেগুলি মাথা যেদিকে নাড়া হচ্ছে সেদিকেই চলতে থাকবে। দূরত্বের মাত্রা অনুযায়ী চোখের সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্ট বস্তুর এই বৈষম্যপূর্ণ সঞ্চালনকে লম্বন (Parallax) বলে। আমরা সব সময়েই অল্পবিস্তর মাথা নাড়িয়ে থাকি, ফলে আমাদের সামনে অবস্থিত বস্তুগুলির দূরত্ব সম্বন্ধে মনে মনে একটি ধারণা গড়ে ওঠে।

চ। সঙ্গতিবিধান (Accommodation)

দূরের জিনিষ দেখার সময় চোখের মধ্যবর্তী লেন্সটি (Lens) সিলিয়ারি পেশীগুলির চাপে আরও সমতল হয়ে ওঠে। আর কাছের জিনিষ দেখার সময় লেন্সটি আরও গোলাকার হয়ে ওঠে। সিলিয়ারী পেশীর এই সক্রিয়তা থেকে আমাদের মস্তিষ্ক বস্তুটির দূরত্ব সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরী করে নেয় বলে মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন।

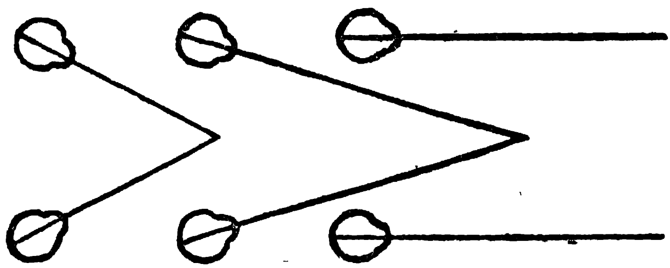
দ্বি-চক্ষুমূলক কারণ (Binocular Factors)

দূরত্ব, গভীরতা ও ত্রি-আয়তন প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে যে কারণগুলি কেবলমাত্র দ্বি-চক্ষুসম্পন্ন প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে সেগুলিকে দ্বি-চক্ষুমূলক কারণ বলা হয়। সেগুলি হল এই—

ক। কেন্দ্রীভবন (Convergence)

যখন কোন বস্তুকে ভাল করে দেখতে হয় তখন বস্তুটিকে আমাদের দুটি

চোখের ফোভিয়ার সমরেখায় আনতে হয়। ফলে চোখের গোলক দুটিকে ঘুরিয়ে এমন একটি অবস্থানে আনতে হয় যাতে বস্তুটি দুটি ফোভিয়ার কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায়। কাছের বস্তু দেখার সময় চোখ দুটি ভেতরের দিকে সরে আসে এবং দূরের জিনিষ দেখার সময় চোখ দুটি প্রায় সমান্তরাল হয়ে ওঠে। এই



(কেন্দ্রীভবনের ক্ষেত্রে চক্ষুদ্বয়ের বিভিন্ন অবস্থা)

কেন্দ্রীভবনের ফলে চোখ দুটির মধ্যে যে পরিবর্তন আসে তা থেকে মস্তিষ্ক দূরত্ব সম্বন্ধে একটি ধারণা করে নেয়।

খ। অক্ষপটমূলক বৈষম্য (Retinal Disparity)

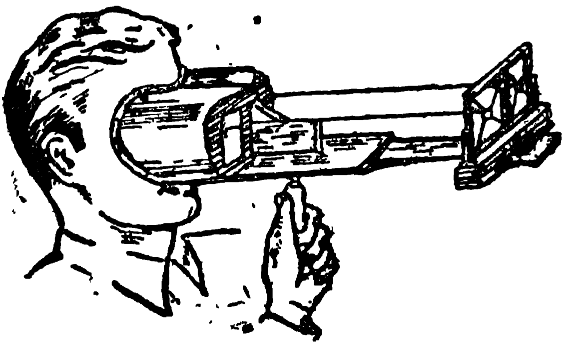
আমাদের চোখ দুটির মধ্যে অবস্থানগত কিছুটা পার্থক্য থাকার ফলে দুটি রেটিনা বা অক্ষিপটে কোন দৃষ্ট বস্তুর যে দুটি প্রতিকৃতির সৃষ্টি হয় সে দুটির প্রতিকৃতি সম্পূর্ণ এক হয় না। সে দুটি প্রতিকৃতি প্রায় একরকম হলেও একেবারে অভিন্ন নয় এবং তাদের মধ্যে কিছুটা বৈষম্য থাকেই। বাঁ চোখটি বন্ধ করে সামনের কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে, আবার ডান চোখ বুজিয়ে ঠিক সেই বস্তুটির দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে দু'বারে ঐ বস্তুটির যে দুটি প্রতিকৃতি দেখা গেল সে দুটি একেবারে অভিন্ন নয়। তাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছেই। এই বৈষম্যের কারণ হল আমাদের চোখের দুটি অক্ষিপটের অবস্থিতি-গত পার্থক্য। এই পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন রেটিনায় প্রতিফলিত প্রতিকৃতি দুটির মধ্যে যে বৈষম্য দেখা দেয় তার নাম অক্ষিপটমূলক বৈষম্য। প্রতিকৃতির এই বৈষম্যের ফলে আমাদের মস্তিষ্কে কিছুটা বিভিন্ন দু'শ্রেণীর স্নায়ু উদ্দীপনার সৃষ্টি হয় এবং মস্তিষ্ক সেই দুটি বিভিন্ন স্নায়ু উদ্দীপনার মধ্যে একটি বোঝাপড়া করে নেয় এবং ধরে নেয় যে বস্তুটি গভীরতাবিশিষ্ট বা ত্রি-আয়তনসম্পন্ন হওয়ার ফলেই এই বৈষম্য দেখা দিয়েছে।

এ থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে দূরত্ব, গভীরতা বা ত্রি-আয়তন মস্তিষ্ক

প্রকৃত পক্ষে সরাসরি প্রত্যক্ষ করে না, একই বস্তুর ঈষৎ বিভিন্ন দুটি দ্বি-আয়তন-মূলক প্রত্যক্ষণ থেকে দূরত্ব, গভীরতা বা ত্রি-আয়তনের অনুমান করে নেয়।

ষ্টেরিওস্কোপ (Stereoscope)

অক্ষিপটমূলক বৈষম্যের ঘটনাটি ষ্টেরিওস্কোপ নামক যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণিত করা যায়। একই বস্তুর দুটি দ্বি-আয়তন-বিশিষ্ট সমতল ছবি নেওয়া হয়ে থাকে—ডান চোখ দিয়ে দেখলে বস্তুটিকে যেমন দেখায় ঠিক সেই রকম একটি ছবি এবং বাঁ চোখ দিয়ে বস্তুটিকে দেখলে যেমন দেখায় সেই রকম আর একটি



[ষ্টেরিওস্কোপ]

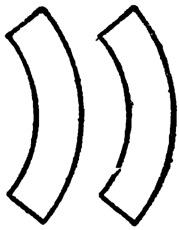
ছবি। এইবার ছবি দুটি ষ্টেরিওস্কোপ নামক যন্ত্রটিতে পাশাপাশি এমনভাবে রাখা হয় যাতে প্রথম ছবিটি ঠিক ডান চোখের দৃষ্টিপথে পড়ে এবং দ্বিতীয় ছবিটি ঠিক বাঁ চোখের দৃষ্টিপথে পড়ে। তার ফলে এই যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে দেখলে ছবি দুটি একটির উপর আর একটি অভিস্থাপিত হয়ে যায় এবং দৃষ্ট বস্তুটিকে অবিকল ত্রি-আয়তন-সম্পন্ন বলে মনে হয়।

ভ্রান্তবীক্ষণ ও অলীকবীক্ষণ (Illusion & Hallucination)

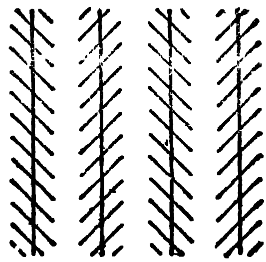
কখনও কখনও আমাদের প্রত্যক্ষণের বস্তুটি প্রকৃতপক্ষে যেরূপ ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষণ না করে, সেটিকে অন্য কোনরূপে আমরা প্রত্যক্ষণ করি। এই ধরনের প্রত্যক্ষণকে ভ্রান্ত-বীক্ষণ (Illusion) বলা হয়। যেমন, সন্ধ্যার অন্ধকারে দড়িকে সাপ বলে মনে করা, ব্লাক আউটের রাত্রে অপরিচিত ব্যক্তিকে পুরানো বন্ধু বলে মনে করা, অন্ধকারে ল্যাম্পপোষ্টকে ভূত বলে ভাবা ইত্যাদি। ভ্রান্ত-বীক্ষণ এক ধরনের প্রত্যক্ষণ, তবে ভুল প্রত্যক্ষণ।

কিন্তু অলীক-বীক্ষণ (Hallucination) প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষণ নয়। সম্পূর্ণ কল্পনা-প্রসূত এবং নিজের মন-গড়া অবাস্তব কিছু দেখাকে অলীক-বীক্ষণ বলা হয়। ম্যাকবেথ যখন তার চোখের সামনে শূন্যে দোলায়মান রক্তময় ছুরিকা দেখেছিলেন বা কোন শোকজর্জরিত ব্যক্তি তার মৃত প্রিয়জনকে চোখের সামনে

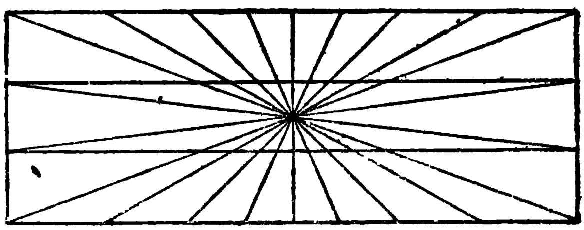
কয়েকটি চাক্ষুষ ভ্রান্তবীক্ষণের উদাহরণ



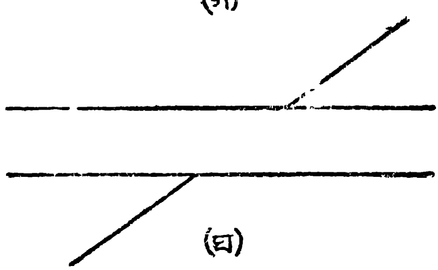
(ক)



(খ)



(গ)



(ঘ)

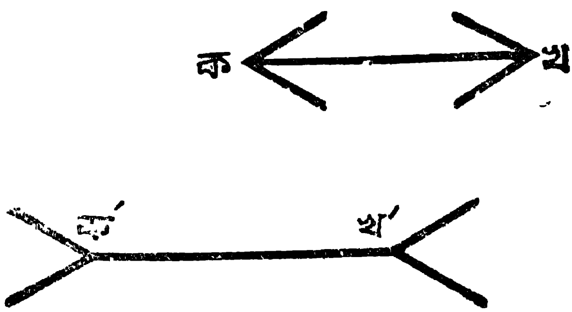
(ক) ভুণ্টের (Wundt) ভ্রান্তবীক্ষণ। (গ) হেরিংএর (Hering) ভ্রান্তবীক্ষণ।
(খ) জোলনারের (Zollner) ভ্রান্তবীক্ষণ। (ঘ) পগেনডর্ফের (Poggendorf) ভ্রান্তবীক্ষণ।

দেখতে পান বা তার সঙ্গে কথা বলেন, তখন বুঝতে হবে যে এগুলি অলীক-বীক্ষণেরই উদাহরণ। ভ্রান্ত-বীক্ষণ ও অলীক-বীক্ষণ দুইই ভুল অভিজ্ঞতা, কিন্তু পার্থক্যের মধ্যে হল এই যে ভ্রান্তবীক্ষণ বাহিক ও বাস্তব উদ্দীপকের উপর

নির্ভরশীল, কিন্তু অলীকবীক্ষণ পুরোপুরি ব্যক্তির মনোজাত অভিজ্ঞতা ও কোনরূপ বাস্তব ও বাহ্যিক উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল নয়। যেমন, দড়ি না থাকলে তাকে সাপ মনে করা চলে না, ল্যাম্পপোষ্ট না থাকলে ভূত দেখা যায় না। কিন্তু অলীকবীক্ষণে এমন কোন বাহ্যিক উদ্দীপক থাকে না যা থেকে প্রত্যক্ষণটি জন্মাতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এটি ব্যক্তির মনের অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতার বহির্জগতে প্রতিফলন ছাড়া আর কিছু নয়।

অলীকবীক্ষণ অস্বাভাবিক মনের ধর্ম। রোগশোক, মানসিক আঘাত, মনোবিকার প্রভৃতি নানা কারণে মনের স্বাভাবিক অবস্থার এমন অবনতি হতে পারে যার ফলে ব্যক্তির জীবনে অলীকবীক্ষণ ঘটে।

ভ্রান্তবীক্ষণকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, বহির্কারণজাত ও অন্তর্কারণ-জাত। যখন বস্তুর বাইরের কোন কারণের জন্য ভ্রান্তবীক্ষণ ঘটে থাকে, তখন তাকে বহির্কারণজাত ভ্রান্তবীক্ষণ বলা যেতে পারে। যেমন, দড়িকে সাপরূপে দেখা বহির্কারণজাত ভ্রান্তবীক্ষণ। কেননা এই ভ্রান্তবীক্ষণের কারণ দড়ির মধ্যে নেই, আছে বাইরে। এখানে অন্ধকার, ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা, তার পূর্ব অভিজ্ঞতা, মানসিক অবস্থা ইত্যাদি কারণের জন্যই তার দড়িকে সাপ বলে ভুল হয়ে থাকে।



[মুলার-লায়ার ভ্রান্তবীক্ষণ]

কিন্তু কোন কোন ভ্রান্তবীক্ষণের কারণ বস্তুর মধ্যেই নিহিত থাকে এবং ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত কোন কারণের জন্য এই ভ্রান্তবীক্ষণ ঘটে না। যেমন, উপরের ছবিটিতে ক'খ' রেখাটিকে কখ রেখাটির চেয়ে বড় দেখাচ্ছে কিন্তু মেপে দেখলে দেখা যাবে যে দুটি রেখাই একই দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট। এই ভ্রান্তবীক্ষণটি অন্তর্কারণজাত অর্থাৎ এর কারণটি রেখাদুটির প্রকৃতির মধ্যে নিহিত আছে এবং তার ফলে সকলেই এই ভুলটি দেখতে বাধ্য। উপরের জ্যামিতিক ভ্রান্তবীক্ষণটি

মুলার-লায়ার ভ্রান্তবীক্ষণ (Muller-Lyer Illusion) নামে পরিচিত। এই ধরনের বহু জ্যামিতিক চিত্র আছে যেখানে ব্যক্তিমাত্রেই ভুল দেখবে। এই ক্ষেত্রগুলিকে সর্বজনীন ভ্রান্তবীক্ষণের উদাহরণ বলা চলে। ১৯৪র পাতায় এইরূপ কতকগুলি চাক্ষুষ ভ্রান্তবীক্ষণের ছবি দেওয়া হল। এর সবগুলির ক্ষেত্রেই বস্তুর যা প্রকৃত স্বরূপ তা আমরা দেখি না, দেখি অন্যরকম।

তের

মানব বংশধারা (Human Heredity)

ব্যক্তির আচরণের সুরু তার জন্মের প্রথম মুহূর্ত থেকেই। জন্ম বলতে যেদিন শিশু প্রথম ভূমিষ্ঠ হয় সেদিনথেকেই সাধারণত বোঝায়, কিন্তু সত্যকারের জন্ম হয় তার অনেক আগে, প্রায় ৯ মাস আগে, যেদিন প্রথম মাতৃগর্ভে প্রাণের সূচনা হয় পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের সম্মিলনে। সেই দিনই সত্যকারের প্রথম যাত্রা সুরু হয় পৃথিবীর একটি নতুন মানুষের।

কোষ-বিভাজন (Cell Division)

পিতৃবীজ মাতৃকোষের মধ্যে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি কোষ মিলে একটি কোষে পরিণত হয়। এই একটি কোষ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি কোষে পরিণত হয়। এই দুটি কোষের প্রত্যেকটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে ৪টি কোষে, ৪টি কোষ আবার ৮টি কোষে, ৮টি কোষ আবার ১৬টি কোষে —এইভাবে কোষ-বিভাজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে শীঘ্রই একটির স্থানে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয়। এই সময় কোষসমষ্টি ধীরে ধীরে একটি নল বেয়ে মাতৃজরায়ুতে আশ্রয় নেয় এবং সেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে এই কোষবৃদ্ধি চলতে থাকে। প্রথম প্রথম এই কোষগুলির মধ্যে বাহ্যিক কোনও পার্থক্য থাকে না, কিন্তু প্রায় দু'সপ্তাহের পর থেকে কোষগুলি ক্রমশ বিভিন্ন কার্যের জন্য বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে উঠে এবং প্রায় ৩ মাসের পর থেকে কোষগুলি মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি ধারণ করতে থাকে। প্রায় পুরোপুরি ৯ মাস এই ভাবে কোষ বিভাজনের ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশু পৃথিবীর আলো দেখতে পায়।

প্রাণীজন্মের সমস্ত রহস্য নিহিত রয়েছে এই কোষ নামক অদ্ভুত বস্তুটির ভিতর। প্রাণের মৌলিক উপাদান এবং ক্রমবিকাশের প্রয়াস, দেহমনোগত বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব, স্বাতন্ত্র্য, এ সবই বীজাকারে লুকিয়ে থাকে এই কোষের ভিতর। অতএব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার অনেক আগেই তার ভাগ্যের অনেকখানি নির্ধারিত হয়ে যায় পিতৃবীজ এবং মাতৃকোষের মিলনে। কেমন করে সেটি হয় তা একটু জানা দরকার।

কোষ ও ক্রোমোজোম (Cell & Chromosome)

প্রত্যেকটি কোষের আকৃতি অনেকটা গোলাকার। তার চারধারে পাতলা চামড়ার মত একটা দেওয়াল থাকে। কোষের মধ্যে থাকে কোষকেন্দ্র (nucleus)। কেন্দ্রের চারপাশে থাকে এক ধরনের হালকা তরল পদার্থ। কোষের কেন্দ্রটি হল কোষের প্রাণস্বরূপ। পিতৃবীজ এবং মাতৃকোষ, এই দুটিই এক একটি এই ধরনের কোষ। পিতৃকোষের আকার অনেকটা কীটের মত। এই দু'রকম কোষের কেন্দ্রে সুতোর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি বস্তু আছে। এগুলির নাম ক্রোমোজোম বা কোষতন্তু। বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত প্রাণীর মাতৃপিতৃ-কোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা বিভিন্ন। মানুষের ক্ষেত্রে এই ক্রোমোজোমের সংখ্যা হল ২৩টি।[১] মাতৃপিতৃকোষের মিলনে যে নতুন সম্মিলিত কোষটি তৈরী হয় তার ক্রোমোজোমের সংখ্যা হয় ২৩ জোড়া বা মোট ৪৬টি। প্রত্যেক জোড়া ক্রোমোজোমের একটি আসে পিতার কোষ থেকে আর একটি আসে মাতার কোষ থেকে। যখন এই আদিম কোষটি দ্বিধাবিভক্ত হয় তখন নতুন কোষ দুটির প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে ২৩টি এইরকম ক্রোমোজোম। এই নতুন কোষ দুটি আবার যখন বিভক্ত হয়ে ৪টি কোষে পরিণত হয় তখন সেই নতুন কোষগুলির প্রত্যেকটির মধ্যেও থাকে ২৩ জোড়া বা মোট ৪৬টি এই রকম ক্রোমোজোম। এইভাবে পরে যতগুলি কোষের সম্মেলনে মানবদেহের সৃষ্টি হয় তার প্রত্যেকটিতে থাকে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম। এখানে প্রশ্ন হল, যদি মানবদেহের প্রত্যেকটি কোষে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে তবে পিতৃবীজে বা মাতৃকোষে কেমন করে কেবলমাত্র ২৩টি করে ক্রোমোজোম এল। এ প্রশ্নের উত্তর হল এই যে পিতৃবীজ বা মাতৃকোষ গঠিত হবার সময় ক্রোমোজোমগুলি স্বাভাবিকভাবে বিভক্ত হয়ে যায় না অর্থাৎ সেখানে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকলেও তা থেকে ২৩ জোড়া ক্রোমো-জোম-সম্পন্ন কোষ তৈরী হয় না। সে ক্ষেত্রে একটি ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের সমষ্টি ভেঙ্গে দুটি ২৩টি ক্রোমোজোমসম্পন্ন কোষ উৎপন্ন হয়। এই অস্বাভাবিকতা ঘটে কেবলমাত্র পিতৃবীজ এবং মাতৃকোষের সৃষ্টির ক্ষেত্রেই। এই জন্যই পিতৃবীজ এবং মাতৃকোষের কেবল ২৩টি করে ক্রোমোজোম থাকে। কিন্তু অন্য যে কোন কোষে থাকে ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম।

১। এতদিন বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল মানুষের ক্রোমোজোম সংখ্যায় ২৪ জোড়া বা ৪৮টি, কিন্তু বহু সাম্প্রতিক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে ক্রোমোজোমগুলি সংখ্যায় ২৩ জোড়া বা ৪৬টি।

জীন (Gene)

মানবশরীরে যেখানে যত কোষ আছে সব কোষের মধ্যে (অবশ্য বীজ-কোষগুলি ছাড়া) ২৩ জোড়া বা ৪৬টি ক্রোমোজোম থাকে। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যদি এক জোড়া ক্রোমোজোম পরীক্ষা করা যায় তবে দেখা যাবে যে এর প্রত্যেকটি ক্রোমোজোম দেখতে বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন গঠনের কতকগুলি পুঁতির মত বস্তু দিয়ে গাঁথা বা ভাঁজ খাওয়া একটি মালার মত। এই গোলাকার বস্তুগুলি আসলে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের জটিল সমষ্টি মাত্র। এগুলির নাম জীন (Gene)। এই জীনই হল প্রাণীর বংশধারার (Heredity) একক। যদিও জীনের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু এখনও জানা যায়নি, তবু এটুকু জানা গেছে যে এই জীনের ক্ষমতা অসীম। মানুষের দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক সব রকম বৈশিষ্ট্যের মূলেই আছে জীনের ক্রিয়া। জীন সব সময় জোড়ায় কাজ করে। এই জোড়ার একটি আসে মাতৃকোষ থেকে আর একটি আসে পিতৃকোষ থেকে। এই জীনগুলিই মানুষের সমস্ত দৈহিক বা আচরণগত বৈশিষ্ট্যের মূলে আছে। যদিও প্রত্যেক জোড়া জীনের একটি আসে পিতার ক্রোমোজোম থেকে, আর একটি আসে মাতার ক্রোমোজোম থেকে, তবুও সময় সময় তারা প্রকৃতিতে অভিন্ন হয়। তখন তাদের মিলিত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। যেমন যদি মা ও বাবা দুইজনেরই মধ্যে নীলচক্ষুর জীন থাকে, তবে তাদের সম্মিলিত ক্রিয়ার ফলে নবজাতকের চোখ নীল হবে। কিন্তু সময় সময় মিলিত জীন দুটি বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট হতে পারে। তখন সাধারণত দুটি জীনের একটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং অপরটি নিষ্ক্রিয় থেকে যায়। দুটি জীনের মধ্যে যে জীনটি সক্রিয় হয়ে ওঠে তার বৈশিষ্ট্যই নবজাতকের মধ্যে দেখা যায়। এই জীনটিকে সক্রিয় জীন (Dominant Gene) বলা যেতে পারে। অপর জীনটি এই ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় রূপে অবস্থান করে। এই জীনটিকে নিষ্ক্রিয় জীন (Recessive Gene) বলা হয়। যেমন মা ও বাবার দুজনের জীন দুটির একটি যদি নীলচক্ষুর জীন হয় এবং অপরটি যদি কটাচক্ষুর জীন হয়, তবে দ্বিতীয় জীনটি সক্রিয় হবে এবং প্রথমটি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে এবং তার ফলে নবজাতকের চোখ হবে কটা রঙের। এই ক্ষেত্রে নীলচক্ষুর জীনটি নিষ্ক্রিয় বলে তার কোন প্রভাব নবজাতকে দেখা যাবে না।

অতএব দেখা যাচ্ছে মানবের দৈহিক সংগঠন, মানসিক ও চারিত্রিক গুণাবলী, আচরণের বৈশিষ্ট্যাদি এ সবই নির্ধারিত হয় ক্রোমোজোম এবং

জীনের জোড়বাঁধার প্রকৃতির দ্বারা। সাধারণভাবে মানুষের ক্রোমোজোম এবং জীনগুলি মোটামুটি একই রকমের হয় বলে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে এত বেশী দেহগত ও আচরণগত মিল পাওয়া যায়। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেকটি মানবের জন্মকোষের অন্তর্গত ক্রোমোজোম এবং জীনের সম্মেলন একান্তভাবে নিজস্ব, যা সে তার পিতামাতার কাছ থেকে তার জন্মের সময় উত্তরাধিকারসূত্রে পায়। এই পাওয়ার মধ্যে আকস্মিকতার প্রভাব অনেকখানি। প্রথমত যে পিতৃবীজ এবং মাতৃকোষের সম্মিলনে একটি বিশেষ শিশু জন্মায় সেই কোষ দুটির অন্তর্গত ক্রোমোজোম এবং জীনের সংগঠনটি যে কি হবে তা আকস্মিকতার উপরই বহুলাংশে নির্ভর করে : দ্বিতীয়ত এই দুটি জননকোষের মিলনের সময় কোন্ ক্রোমোজোমের সঙ্গে কোন্ ক্রোমোজোম জোড় বাঁধবে এবং তারপরে আবার প্রত্যেকটি ক্রোমোজোম জোড়ার অন্তর্গত কোন্ জীনের সঙ্গে, কোন্ জীনটি জোড় বাঁধবে, এই দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাও নির্ধারিত হয় সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে। এই জোড়বাঁধা প্রক্রিয়াটি যে কোনও ভাবে ঘটতে পারে। ফলে দু'টি জননকোষের মিলনে উৎপন্ন নতুন কোষটি বিভিন্নতার দিক দিয়ে গণনাতীত সংখ্যক হতে পারে। এইজন্যই জন্মগত উত্তরাধিকারের দিক দিয়ে দুটি বিভিন্ন পিতামাতার সন্তান একেবারে অভিন্ন হবে এটা তত্ত্বের দিক দিয়ে অসম্ভব না-হলেও বাস্তবে এক কোটিতেও একটি ঘটার সম্ভাবনা নেই। তবে এই অসম্ভব ঘটনাটি অন্য আর এক প্রকারে সম্ভব হতে পারে। সেটি হল যখন সমকোষী বা অভিন্ন যমজ সন্তান (Identical twins) জন্মগ্রহণ করে।

পিতামাতার সঙ্গে সন্তানদের বা একই পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে যে নানারকম সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় তাও ঐ ক্রোমোজোম বা জীনের মিলের জন্য। পিতামাতার সঙ্গে সন্তানসন্ততির কিছু না কিছু সাদৃশ্য থাকবেই, কেননা সন্তানসন্ততি যে ৪৬টি ক্রোমোজোম পিতামাতার কাছ থেকে পায়, সেগুলির মধ্যে ২৩টি পিতার নিজস্ব, ২৩টি মাতার নিজস্ব। পিতা আবার তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে ২৩টি ক্রোমোজোম পেয়েছিলেন এবং তা থেকে তিনি ২৩টি ক্রোমোজোম দিয়েছেন তাঁর সন্তানকে। অতএব পিতামহ-পিতামহীর কিছু ক্রোমোজোম তাদের পৌত্রপৌত্রীর মধ্যে সরাসরি চলে আসে। সেইজন্যই পিতামহ-পিতামহীর সঙ্গে পৌত্রপৌত্রীর কিছুটা মিল প্রায়ই থাকে। ভাইবোনদের মধ্যে যে সাদৃশ্য দেখা যায় তাও একই কারণে। পিতৃবীজে এবং মাতৃকোষে যথাক্রমে পিতা এবং মাতার মোট ৪৬টি ক্রোমোজোমের অর্ধেক অর্থাৎ ২৩টি করে ক্রোমোজোম থাকে। যদিও বিভিন্ন



জন্মের সময় প্রতিটি পুরুষ এবং প্রতিটি নারী তাঁদের মা, বাবা
প্রত্যেকের কাছ থেকে পান ২৩টি করে ক্রোমোজোম,
অর্থাৎ মোট ৪৬টি ক্রোমোজোম।
সন্তান জন্মের সময়
এঁরা প্রত্যেকে
তাকে
নিজেদের অর্ধেক
ক্রোমোজোম
দেন।
২৩
২৩
২৩
২৩
৪৬
৪৬
২৩
২৩
বাবার কাজ কেবল
নিজের অর্ধেক ক্রোমোজোম
সন্তানের দেহে
সঞ্চালিত করা।
মা যদিও সন্তানকে গর্ভে
ধারন করেন তবু তিনিও তাকে
নিজের অর্ধেক ক্রোমোজোমের বেশি
প্রায় কিছুই দেন না।
৪৬
এই ৪৬টি ক্রোমোজোমই একত্রে শিশুর
বংশধারায় নির্ণায়ক
সমস্ত উপাদানই ধারন করে।

বংশধারা প্রক্রিয়া

পিতৃবীজে এবং মাতৃকোষে এই ৪৬টি ক্রোমোজোমের প্রকৃতি বিভিন্ন হতে পারে, তবুও কিছু কিছু ক্রোমোজোম বিভিন্ন পিতৃবীজে বা মাতৃকোষে অভিন্ন হবেই। ফলে যদিও ভাইবোনেরা পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের বিভিন্ন সম্মেলন থেকে জন্ম লাভ করে, তবুও তাদের মধ্যে কিছুটা মিল সব সময়েই থাকে।

সমকোষী ও ভিন্নকোষী যমজ (Identical & Fraternal Twins)

অবশ্য সমকোষী বা অভিন্ন যমজ সন্তানদের (Identical Twin) ক্ষেত্রে এই সাদৃশ্য চরমে ওঠে। সমকোষী বা অভিন্ন যমজ সন্তানেরা একই পিতৃবীজ এবং মাতৃকোষের সম্মেলন থেকে উদ্ভূত হয়। সাধারণত পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের মিলনে যে একটি কোষের সৃষ্টি হয় তো প্রথমে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দু'টি কোষে পরিণত হয়, পরে এই কোষ দু'টি ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হতে হতে একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়। কিন্তু অভিন্ন যমজ সন্তানের ক্ষেত্রে এই দ্বিধাবিভক্ত কোষদুটি পরস্পরের কাছ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং পরে কোষ বিভাজনের ফলে দু'টি বিভিন্ন শিশুতে পরিণত হয়। অতএব দেখা যাচ্ছে যে অভিন্ন যমজ সন্তানদের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমগুলি সম্পূর্ণ একই এবং সেইজন্য তাদের বংশধারাও সম্পূর্ণ এক। কিন্তু ভিন্নকোষী বা সাধারণ যমজ সন্তানেরা সাধারণ ভাইবোনের মতই বিভিন্ন পিতৃবীজ ও মাতৃকোষের মিলনে উৎপন্ন হয়। পার্থক্যের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রে দুটি পিতৃবীজ ও দুটি মাতৃকোষের মিলন একই সময় ঘটে থাকে। সাধারণ ভাইবোনদের মধ্যে বংশধারার যতটুকু সাদৃশ্য থাকতে পারে তার বেশি সাদৃশ্য এই শ্রেণীর যমজ সন্তানের মধ্যে থাকতে পারে না। অভিন্ন যমজের ক্ষেত্রে হয় দুটিই ছেলে হবে, নয় দুটিই মেয়ে হবে, একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে হতে পারে না। কিন্তু সাধারণ যমজদের ক্ষেত্রে একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে খুবই হতে পারে। তা ছাড়া তাদের মধ্যে শরীরের আকৃতি, চেহারা, মানসিক শক্তি সমস্ত দিক দিয়েই যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে পারে। কিন্তু অভিন্ন যমজদের মধ্যে এসব দিক দিয়ে অদ্ভুত মিল দেখা যায়। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে যমজ সন্তান পর্যবেক্ষণ করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে। অভিন্ন যমজদের ক্ষেত্রে বংশধারা সম্পূর্ণ অভিন্ন হয় বলে আচরণের প্রকৃতি নির্ণয়ে পরিবেশ বা শিক্ষার প্রভাব কতটুকু এবং কিভাবেই বা তা কার্যকর হয় তা জানা সম্ভব হয়। কেননা জন্মের সময় অভিন্ন যমজদের জন্মগত উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ এক হওয়ার ফলে পরে তাদের মধ্যে যেটুকু বৈসাদৃশ্য দেখা যায় তা অবশ্যই সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রসূত। কিন্তু ভাইবোনদের মধ্যে

কিংবা সাধারণ যমজদের মধ্যে বংশধারা অভিন্ন নয় বলে তাদের মধ্যে পার্থক্য বংশধারা-প্রসূতও হতে পারে আবার শিক্ষাপ্রসূতও হতে পারে। সেইজন্য তাদের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রভাব এবং বংশধারার প্রভাব এই দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

বংশধারার স্বরূপ (Nature of Heredity)

বংশধারা বলতে সেই সকল বৈশিষ্ট্যকে বোঝায় যা শিশু তার জন্মের মুহূর্তে তার পিতামাতার কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে এবং তার অন্যান্য পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পরোক্ষভাবে পেয়ে থাকে।

বংশধারা হল সহজাত বৈশিষ্ট্যাবলী অর্থাৎ এগুলি শিশু সঙ্গে নিয়ে জন্মায়। শিশু জন্মাবার পরের মুহূর্ত থেকেই নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে সুরু করে। যেহেতু শিশু তার চারপাশে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিনিয়ত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি অর্জন করে, সেহেতু সেগুলি নিছক শিক্ষার দান এবং সেগুলি থেকে বংশধারাকে স্বতন্ত্র ধরে নিয়ে বিচার করতে হবে।

সাধারণত প্রচলিত ভাষণে আমরা বংশধারা বলতে কেবলমাত্র পিতামাতার সঙ্গে শিশুর যেটুকু সাদৃশ্য আছে সেইটুকুকেই বুঝে থাকি। কিন্তু সাদৃশ্যগুলি যেমন বংশধারার অন্তর্গত তেমনই বৈসাদৃশ্যগুলিও তার বংশধারার একটা অপরিহার্য অঙ্গ। কেননা পিতামাতার সঙ্গে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই শিশু তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া ক্রোমোজোম এবং জীনের কাছ থেকে পেয়ে থাকে।

বংশধারার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Heredity)

সাধারণভাবে বংশধারাকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, যেমন, ১। দেহগত (Physical) ২। মানসিক (Mental) এবং ৩। মনঃপ্রকৃতিগত (Temperamental)।

দেহগত বংশধারা বলতে বোঝায় ব্যক্তির আকৃতি, গঠন, গায়ের রঙ ইত্যাদি। এই শ্রেণীরই অন্তর্গত হল ব্যক্তির গ্রন্থিগত (glandular) বৈশিষ্ট্যগুলি। শরীরের বিভিন্ন গ্রন্থির (gland) কার্যধারার উপর দেহের বৃদ্ধি ও মনের সংগঠন অতি নিবিড়ভাবে নির্ভর করে।

মানসিক বংশধারার মধ্যে পড়ে নানা মানসিক বৈশিষ্ট্য। প্রথম আসে ব্যক্তির প্রক্ষোভগত সংগঠন এবং সহজাত প্রবৃত্তিগুলি। দ্বিতীয় পর্যায়ে উল্লেখ-যোগ্য হল তার চিন্তন (thinking), কল্পন (imagining), ইচ্ছন (willing)

প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পাদনের সামর্থ্য এবং তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হল ব্যক্তির সহজাত বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক শক্তি। এই মানসিক শক্তিকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়, সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধি এবং বিশেষধর্মী শক্তি-সমূহ। বিশেষধর্মী শক্তি বলতে বোঝায় বিশেষ কোন ক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখানোর ক্ষমতা, যেমন, গাণিতিক শক্তি, ভাষামূলক শক্তি, যন্ত্রঘটিত শক্তি ইত্যাদি।

মনঃপ্রকৃতি (Temperament) বলতে বোঝায় মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য যাকে আমরা চলতি কথায় মুড বা মেজাজ বলে থাকি। দেখা গেছে যে মনের মৌলিক কাঠামোটির সংগঠন ও প্রকৃতির দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্যের অনেকখানি সহজাত। অলপোর্ট মনঃপ্রকৃতিকে মনের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন।

পরিবেশের স্বরূপ (Nature of Environment)

পরিবেশ কথাটির শব্দগত অর্থ হল ব্যক্তির চতুষ্পার্শ্ব। কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানে আমরা পরিবেশকে আরও ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছি। পরিবেশের প্রকৃত গণ্ডী ব্যক্তির চতুষ্পার্শ্বটুকুর বাইরে আরও অনেকদূর বিস্তৃত হতে পারে। শিক্ষা-বিজ্ঞানে পরিবেশ বলতে বোঝায় সেই সকল শক্তি যেগুলি ব্যক্তির উপর কোন না কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং ব্যক্তির আচরণকে কিছুমাত্রায় বদলাতে সক্ষম হয়। এই সংব্যাখ্যান অনুযায়ী কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের সত্যকার পরিবেশ হাজার হাজার বছর আগের মিশর বা ব্যাবিলনের কোন বিস্মৃত প্রভাতে নিহিত থাকতে পারে আবার তেমনই কোন জ্যোতির্বিদের পরিবেশ দু'পাঁচশো আলোকবর্ষ দূরের কোন অজ্ঞাতনামা নীহারিকাকে ঘিরে গড়ে উঠতে পারে। এক কথায় পরিবেশ হল সেই শক্তি বা শক্তির সমষ্টি যা ব্যক্তির আচরণে প্রত্যক্ষভাবে পরিবর্তন ঘটাতে সমর্থ হয়।

জন্মের মুহূর্ত থেকে শিশু কোন না কোন পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ে এবং পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি তার উপরে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দেয়। শিশুকে সেই পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়, নতুবা তার অস্তিত্ব বজায় রাখাই কঠিন হয়ে ওঠে। শিশুর এই প্রচেষ্টাকেই সঙ্গতি-বিধান (adjustment) বলা হয়। আর এই সঙ্গতিবিধান করতে গিয়ে শিশুর মধ্যে যে আচরণের পরিবর্তন সংঘটিত হয় তাকেই বলা হয় শিক্ষা। অতএব পরিবেশের প্রভাব এবং শিক্ষাকে আমরা অভিন্ন বলে ধরে নিতে পারি।

পরিবেশ বড়, না বংশধারা ?

পরিবেশ ও বংশধারা নিয়ে একটি জটিল বিতর্ক বহুদিন ধরেই শিক্ষাবিদ্ ও মনোবিজ্ঞানীদের শিরঃপীড়ার কারণ ঘটিয়ে এসেছে। সে বিতর্কটি হল ব্যক্তির জীবন গঠনে বংশধারা বড়, না পরিবেশ বড় ? এ নিয়ে বহু গবেষণাও হয়েছে।

বংশধারাবাদী (Hereditarian)

একদল শিক্ষাবিদ্ বলেন যে বংশধারাই সব, পরিবেশের কোন মূল্যই নেই। শিশু যে বংশধারা নিয়ে জন্মাবে সে বংশধারাই সম্পূর্ণভাবে তার ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নির্ণয় করবে, তা তার পরিবেশ যেমনই হোক্ না কেন। অর্থাৎ পরিবেশ ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়ার কোন মূল্যই নেই এবং তা ব্যক্তির বংশধারার মধ্যে কোন পরিবর্তনও আনতে পারে না। এঁদের আমরা বংশধারাবাদী বলে বর্ণনা করতে পারি। বাংলা প্রবাদ 'গাধা পিটিয়ে ঘোড়া হয় না' বা ইংরাজী প্রবাদ 'শূয়োরের কান থেকে সিল্কের থলি তৈরী হয় না' ইত্যাদি উক্তিগুলি এই বংশধারাবাদেরই সমর্থক। বংশধারাবাদীদের সংব্যাখ্যানে শিক্ষার গুরুত্ব খুবই কম। তাঁরা যখন বংশধারাকে অপরিবর্তনীয় ও অমোঘ বলে ধরে নিয়েছেন তখন স্পষ্টতই তাঁরা শিক্ষার প্রভাবের বিশেষ কোন মূল্য দিচ্ছেন না। তাঁদের মনে শিক্ষা শিশুর মধ্যে সত্যকারের কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারে না।

পরিবেশবাদী (Environmentalist)

তেমনই আর একদল শিক্ষাবিদ্ আছেন যাঁরা ব্যক্তির জীবনে বংশধারার কোন মূল্য দিতে চান না। তাঁদের কাছে পরিবেশই সব। উপযুক্ত পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে খুশীমত গড়ে তোলা যায়, তা তার বংশধারা যাই থাকুক না কেন। এঁদের আমরা পরিবেশবাদী বলতে পারি। প্রসিদ্ধ আচরণবাদী ওয়াটসন একজন চরম পরিবেশবাদী। তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে তাঁকে যদি একটি স্বাভাবিক স্বাস্থ্যবান শিশু দেওয়া যায় এবং যদি তিনি নিজের ইচ্ছামত পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তবে তিনি সেই শিশুটিকে তাঁর খুশীমত যে কোন শ্রেণীর মানুষরূপে গড়ে তুলতে পারেন— ডাক্তার, আইনজীবী, শিল্পী, ব্যবসাদার এমন কি ভিক্ষুক বা চোর রূপেও। শিশুটির পূর্বপুরুষদের প্রতিভা, প্রবণতা, সামর্থ্য, বৃত্তি, জাতি ইত্যাদি যাই হোক না কেন, তাতে কিছু এসে যাবে না।

বংশধারাবাদীদের কাছে যেমন শিক্ষার মূল্য বিশেষ নেই, পরিবেশবাদীদের কাছে কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। পরিবেশবাদীরা বংশধারার বিশেষ কোন মূল্য দেন না। তাঁদের কাছে শিক্ষাই সব। শিক্ষা অদ্ভুত ক্ষমতার অধিকারিণী—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী।

পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ

বংশধারাবাদী এবং পরিবেশবাদীদের এই সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে আসতে হলে আমাদের এ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণগুলির সঙ্গে প্রথমে পরিচিত হতে হবে। এই বিতর্ককে ভিত্তি করে নানা শ্রেণীর গবেষণা বহুদিন হতেই চলে আসছে।

বংশধারামূলক গবেষণা ঃ কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ

বংশধারাবাদীদের মধ্যে প্রথমে ফ্রান্সিস গ্যাল্টনের (Francis Galton) নাম করতে হয়। তিনি ডারউইন প্রভৃতি বিখ্যাত মনীষীদের পূর্বতন কয়েক পুরুষের কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ করেন এবং তা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে মানুষের ব্যক্তিসত্তা নির্ধারিত হয় তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির দ্বারা। কার্ল পিয়ার্সন (Karl Pearson) গ্যাল্টনের কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণের কাজটি পরে আরও চালিয়ে নিয়ে যান এবং তাঁর প্রাপ্ত ফলাফল মোটামুটিভাবে গ্যাল্টনের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। নিম্নশ্রেণীর লোকদের কুলপঞ্জী পর্যবেক্ষণ করেন ডাগডেল (Dugdale)। তাঁর প্রসিদ্ধ ইয়ুক্স্ (Jukes) পরিবারের পর্যবেক্ষণ বংশধারাবাদের স্বপক্ষে যায়। কুখ্যাত অপরাধী ইয়ুক্সের পরিবারে নিম্নমনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির আধিক্য দেখে ডাগডেল সিদ্ধান্ত করেন যে ব্যক্তিসত্তা গঠনে বংশধারার প্রভাবই সব চেয়ে বেশী। গডার্ডের (Goddard) কালিকাক (Kallikak) পরিবারের পর্যবেক্ষণটিও বংশধারাবাদীদের স্বপক্ষে একটি বড় প্রমাণ বলে উল্লেখ করা যায়। গত আমেরিকা বিপ্লবের সময় এক ব্যক্তি দুটি বিভিন্ন স্থানে দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির নারীর সংস্পর্শে আসে। তাদের মধ্যে একজন উন্নত-বুদ্ধিসম্পন্ন এবং উচ্চবংশজাত। অপরটি স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সমাজের নিম্নস্তরের মেয়ে। কালক্রমে এই দুটি নারীকে অবলম্বন করে ঐ ব্যক্তির দুটি বিভিন্ন বংশশাখা গড়ে ওঠে। গডার্ড সেই দুটি বংশশাখা পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে, উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন মেয়েটির বংশে উন্নতস্তরের ছেলেমেয়েই বেশী জন্মেছে এবং স্বল্পবুদ্ধি মেয়েটির বংশের ছেলেমেয়েদের অধিকাংশই সমাজের নিম্নস্তরে

বাস করছে। এ ছাড়া গডার্ড আরও ৩২৭টি স্বল্পবুদ্ধি ব্যক্তির পরিবারের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করেন এবং দেখেন যে এই পরিবারগুলির মধ্যে শতকরা ৩৪টি ক্ষেত্রে ক্ষীণবুদ্ধিতা তাদের পূর্বগামীদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

পরিবেশের প্রভাব (Effect of Environment)

শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে পরিবেশের প্রভাব কি প্রকৃতির এবং কতটুকু তা নির্ণয়ের জন্য নানাপ্রকার পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। জন্মের মুহূর্ত থেকে বিভিন্ন পরিবেশের শক্তিগুলি কিভাবে শিশুর বংশধারাকে প্রভাবিত করে সে সম্বন্ধে নানা মূল্যবান তথ্য বর্তমানে সংগৃহীত হয়েছে।

গর্ভস্থিত অবস্থায় পরিবেশের প্রভাব

শিশুর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে পরিবেশ যে একটি অপ্রতিরোধ্য শক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পৃথিবীতে আলো দেখার আগে প্রতিটি শিশুকে দশমাসের মত সময় মাতৃগর্ভে কাটাতে হয়। এই সময় শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ অনেকগুলি পারিবেশিক শক্তির উপর নির্ভর করে। সেগুলির মধ্যে নীচের কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(১) মায়ের বয়স (২) মায়ের পূর্বের গর্ভসংখ্যা (৩) মায়ের ব্যাধি ও অসুস্থতা (৩) মায়ের পুষ্টি (৪) সংক্রামক ব্যাধি (৬) ওষুধের ব্যবহার (৭) বিশেষ ধরনের শারীরিক ঘটনা এবং (৮) মায়ের প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতা।

বহু পরীক্ষণ থেকে এটা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে এই পারিবেশিক কারণগুলি গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধিপ্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। শিশুর শারীরিক গঠন, ওজন, উচ্চতা, বিভিন্ন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এমন কি প্রক্ষোভ-মূলক এবং মানসিক সংগঠনও এই শক্তিগুলির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

যমজ পর্যবেক্ষণ (Twin Study)

ব্যক্তির উপর বংশধারা ও পরিবেশের তুলনামূলক প্রভাব নির্ণয়ের জন্য যমজ-সন্তান পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি খুবই কার্যকর। যমজ সন্তান দু'শ্রেণীর হতে পারে—সমকোষী বা অভিন্ন যমজ এবং ভিন্নকোষী যমজ। সমকোষী যমজ বলতে বোঝায় যে দুটি শিশুই এক এবং অভিন্ন মাতৃ-পিতৃকোষ থেকে জন্মেছে এবং ভিন্নকোষী যমজ বলতে বোঝায় যে-দুটি সন্তান দুটি বিভিন্ন কোষ থেকে জন্মলাভ

করেছে। সমকোষী যমজের ক্ষেত্রে বংশধারা একেবারে অভিন্ন হয়। এখন যদি দুটি সমকোষী যমজ শিশুকে তাদের জন্মের পর থেকে দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ করা হয় এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করে যদি দেখা যায় যে তাদের পরিবেশের বিভিন্নতা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি তবে বুঝতে হবে যে বংশধারাই সব, পরিবেশ কিছুই নয়। কিন্তু যদি দেখা যায় যে বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হওয়ার ফলে তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা গেছে তবে বুঝতে হবে যে পরিবেশের প্রভাবই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

ভিন্নকোষী যমজের জন্মাবার হার প্রতি হাজারে দশ থেকে বারো। আর সমকোষী যমজ সন্তানের জন্মের হার প্রতি হাজারে তিন থেকে চার। যেহেতু সমকোষী যমজেরা পিতা ও মাতার জীনের একই সমাবেশ থেকে জন্মেছে সেহেতু তাদের বংশধারা অভিন্ন হয়। বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে এমন সমকোষী যমজের দৃষ্টান্ত খুবই কম পাওয়া যায়। থর্নডাইক, মেরীম্যান, নিউম্যান, ফ্রীম্যান, হলজিনগার প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের যমজ সন্তান নিয়ে অনেকগুলি পরীক্ষণ চালান। নিউম্যান, ফ্রীম্যান ও হলজিনগার কর্তৃক ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত টুইনস্ (Twins) নামক বহুখ্যাত যমজ পর্যবেক্ষণের বিবরণীতে এই ধরনের ১৯টি যমজের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর পরেও নিউম্যান এবং মূলার আরও ১০টি ক্ষেত্রের উল্লেখ করেন যেখানে সমকোষী যমজ সন্তানেরা ঘটনার বৈচিত্র্যে দুটি বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হয়েছে। শুইসিন্‌গার (Schwesinger) এই সমস্ত পরীক্ষণের ফলাফলগুলির একটি সারাংশ তৈরী করেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যমজ সন্তান দুটি বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হলেও তাদের পরিবেশের মধ্যে সত্যকারের বৈষম্য থাকে না। তার ফলে তাদের দৈহিক আকৃতি, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতি প্রায় এক রকমেরই হয়। কিন্তু যেখানে পরিবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈষম্য থাকে সেখানে দুজনের মধ্যে সবদিক দিয়ে কিছু না কিছু পার্থক্য দেখা যায়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে যমজ সন্তানদের একজন আর একজনের চেয়ে উচ্চতায় ও ওজনে কম বা বেশী হয়েছে। তাছাড়া এই সব ক্ষেত্রে আস্বাদনের ক্ষমতা, রোগপ্রবণতা প্রভৃতির দিক দিয়েও সমকোষী যমজদের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা গেছে। সমস্ত পর্যবেক্ষকদের মতেই উচ্চতা, আকার, মাথার আকৃতি, মনোবিকারমূলক প্রবণতা ইত্যাদির উপর পরিবেশের প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কাজ করে থাকে।

মোটামুটিভাবে একই রকম পরিবেশে অভিন্ন যমজ সন্তানেরা মানুষ হলে তাদের মধ্যে অদ্ভুত রকমের মিল দেখা যায়। সেখানে পরিবেশের মিলের জন্য বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। নীচের ক্ষেত্রটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নিউম্যান এডুইন (Edwin) ও ফ্রেড (Fred) নামে দুটি অভিন্ন যমজ সন্তানের সন্ধান পান। এরা খুব অল্প বয়সেই পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যায় এবং দুটি বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হয়। এদের যখন বয়স ২৬ তখন নিউম্যান তাদের আবিষ্কার করেন। তাদের পরীক্ষা করে তিনি দু'জনের মধ্যে অদ্ভুত রকমের মিল দেখতে পান। চোখের ও চুলের রঙ, দাড়ি, গোঁফ, গায়ের রঙ, কানের গঠন, সাধারণ আকৃতি ইত্যাদির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে কোন রকম বৈষম্য ছিল না। উচ্চতা ও ওজনও দুজনের প্রায় একই রকম ছিল। তাদের দু'জনেরই বিদ্যুৎ-সংক্রান্ত কাজে আগ্রহ জন্মেছিল এবং দুজনেই তাদের নিজের নিজের সহরে কোন টেলিফোন কোম্পানীর মেরামতি শাখায় কাজ করত। দুজনেই বিয়ে করেছিল একই বয়সের এবং একই প্রকৃতির দুটি মেয়েকে এবং একই বছরে। প্রত্যেকেরই একটি করে ছেলে জন্মেছিল এবং প্রত্যেকেই একটি করে ফক্স টেরিয়ার কুকুর পুষেছিল এবং সবচেয়ে মজার কথা তার নামও তারা একই দিয়েছিল—ট্রিক্সি।

এই পর্যবেক্ষণ থেকে মানুষের উপর বংশধারার প্রভাবই বিশেষভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু এখানে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে যদিও ফ্রেড ও এডুইন দুটি বিভিন্ন সহরে ও বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হয়েছিল, তাদের পরিবেশ কিন্তু বলতে গেলে একপ্রকার অভিন্নই ছিল। সেজন্য এক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব-জনিত কোন বৈষম্য তাদের মধ্যে দেখা যায় নি। কিন্তু যখনই সত্যকারের বিভিন্ন পরিবেশে যমজ সন্তানেরা মানুষ হয় তখনই তাদের উপর পরিবেশজনিত পার্থক্য বেশ ভালভাবেই দেখা দেয়। নীচের অভিন্ন যমজসন্তানের ক্ষেত্রটি তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গ্ল্যাডিস (Gladys) এবং হেলেন (Helen) নামে দুটি সমকোষী যমজ ঘটনাচক্রে ১৮ মাস বয়সে পৃথক হয়ে যায়। হেলেনের পালিকা মাতা নিজে শিক্ষিতা না হলেও হেলেনকে স্কুল-কলেজে পড়িয়ে বি-এ পাশ করান। হেলেন পাশ করে শিক্ষকতার কাজ নেয় এবং এক শিক্ষিত আসবাব-ব্যবসায়ীকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করে। লেখাপড়া শিখে হেলেনের মধ্যে বেশ মার্জিত ভাব দেখা যায়। লোকের সঙ্গে সামাজিক আচরণে তার মধ্যে কোন আড়ষ্টতা ছিল না এবং নারীসুলভ আকর্ষণও তার মধ্যে যথেষ্ট ছিল।

কিন্তু গ্ল্যাডিসের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত ঘটে। অতি শৈশবেই তার লেখাপড়া শেষ হয়ে যায়। ক্যানাডার নির্জন রকি অঞ্চলে সে মানুষ হয় এবং বিভিন্ন মিল ও কারখানায় জীবিকার জন্য তাকে কাজ করে বেড়াতে হয়। হেলেনের স্বাস্থ্য মোটের উপর সব সময়ই ভাল ছিল। কিন্তু গ্ল্যাডিস ছিল ক্ষীণস্বাস্থ্য ও প্রায়ই রোগে ভুগত। ৩৫ বছর বয়সে যখন তাদের আবিষ্কার করা হল তখন দেখা গেল তাদের মধ্যে নানা দিক দিয়ে বিরাট বৈষম্য। উচ্চতা, ওজন চুলের রঙ ইত্যাদির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ না থাকলেও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ দিক দিয়ে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা গেল। মুখের ভাব, চেহারার বাঁধুনী, নারীসুলভ সৌন্দর্য ইত্যাদির দিক দিয়ে হেলেন গ্ল্যাডিসের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। তাছাড়া হেলেন ছিল আত্মবিশ্বাসী, মার্জিতা, মাধুর্যময়ী এবং আচরণে আক্রমণধর্মী। গ্ল্যাডিস কিন্তু ছিল দুর্বল-চেতা, অস্থিরচিত্তা এবং সৌন্দর্যহীনা।

মানসিক শক্তি এবং বিদ্যাবত্তার অভীক্ষার দিক দিয়ে হেলেন গ্ল্যাডিসের চেয়ে অনেক উন্নত বলে প্রমাণিত হল। হেলেনের বুদ্ধ্যঙ্ক হল ১১৬ আর গ্ল্যাডিসের বুদ্ধ্যঙ্ক হল ৯২, মোট ২৪ পয়েন্টের তফাৎ। হাতের লেখার ধাঁচের দিক দিয়ে দুজনের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা গেল। হেলেনের হাতের লেখা বেশ পরিণত কিন্তু গ্ল্যাডিসের হাতের লেখা ১৪।১৫ বছর বয়সের মেয়েদের মত কাঁচা। ব্যক্তিসত্তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে যে এই দুই যমজের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য দেখা দিয়েছিল তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সত্যকারের বিভিন্ন পরিবেশে সমকোষী যমজেরা মানুষ হলে তাদের মধ্যে শারীরিক সৌন্দর্য, আচরণ, অভ্যাস, ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ, মানসিক শক্তি ইত্যাদি সব দিক দিয়েই বেশ উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যেতে পারে। বুদ্ধির অভীক্ষায় হেলেন এবং গ্ল্যাডিসের মধ্যে যে ২৪ পয়েন্টের পার্থক্য দেখা গেছে তা গুরুত্বের দিক দিয়ে মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। এর দ্বারা বংশধারার উপর পরিবেশের প্রভাব যে সত্যই কার্যকর তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়।

বংশধারা ও বুদ্ধি (Heredity and Intelligence)

বুদ্ধির দিক দিয়ে শিশুর ব্যক্তিসত্তা-নির্ণয়ে বংশধারার প্রভাব বেশ গুরুত্ব-পূর্ণ। বুদ্ধির উপর পরিবেশের ক্ষমতা তেমন উল্লেখযোগ্য নয় বলেই অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীর ধারণা। সমকোষী ও ভিন্নকোষী যমজ সন্তান, এক পিতা-মাতার সন্তান, এক গোষ্ঠিভুক্ত ভাইবোন প্রভৃতিদের উপর প্রদত্ত বুদ্ধির অভীক্ষা

থেকে প্রাপ্ত ফলের মধ্যে তুলনা করে দেখা গেছে যে অভীক্ষার্থীদের মধ্যে বংশধারার সমতা যত বেশী, বুদ্ধির অভীক্ষার ফলও তত কাছাকাছি। আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পরিসংখ্যান শাস্ত্রের ভাষায় এই বিভিন্ন দলের মধ্যে সহ-পরিবর্তনের (Correlation) মানের তালিকাটি নিম্নরূপ।

সমকোষী যমজ	....	·৯০
ভিন্নকোষী যমজ	....	·৭৫
এক পিতামাতার সন্তান	....	·৫০
এক গোষ্ঠিভুক্ত ভাইবোন	....	·০০
সম্বন্ধহীন ছেলেমেয়ে	... .	·০০

উপরের পরিসংখ্যান থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যাচ্ছে যে বংশধারার দিক দিয়ে ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্ক যত বেশী থাকে তাদের বুদ্ধির ক্ষমতার মধ্যেও তত বেশী মিল থাকে।

এ ছাড়া শিশুর বুদ্ধির সঙ্গে তার পিতামাতার বৃত্তি এবং সামাজিক মর্যাদারও একটা নিকট সম্বন্ধ পাওয়া গেছে। দেখা গেছে, যে সকল ব্যক্তি উন্নত শ্রেণীর বৃত্তি অনুসরণ করেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা উন্নতবুদ্ধির হয় আর যাঁরা নিম্নশ্রেণীর ব্যবসা বা কেরানিগিরি, মিস্ত্রিগিরি ইত্যাদি সাধারণ পেশা অনুসরণ করেন তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বুদ্ধির স্বল্পতা দেখা যায়। বুদ্ধির উপর যে বংশধারার যথেষ্ট প্রভাব আছে তা এই থেকে প্রমাণিত হচ্ছে।

পরিবেশ ও বুদ্ধি (Environment & Intelligence)

বুদ্ধির উপর বংশধারার প্রভাবকে সর্বাধিক ধরে নিলেও এমন অনেক ক্ষেত্র পাওয়া গেছে যেখানে পরিবেশের পরিবর্তনে বুদ্ধির মধ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে। নিউম্যান, ফ্রিম্যান প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে পরিবেশের বৈষম্যের জন্য সমকোষী যমজদের মধ্যেও ১০ থেকে ২০ পয়েন্ট পর্যন্ত বুদ্ধ্যাঙ্কের পার্থক্য হয়ে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে ৩০ পয়েন্টেরও পার্থক্য পাওয়া গেছে। হেলেন ও গ্ল্যাডিসের ক্ষেত্রে বুদ্ধ্যাঙ্কের তফাৎ ছিল ২৪ পয়েন্টের।

এই থেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেন যে বুদ্ধির বিকাশে বংশধারার প্রভাব অনস্বীকার্য হলেও পরিবেশেরও যথেষ্ট প্রভাব আছে। ১৯৩০ সালে নিউম্যান, ফ্রিম্যান, হলজিনগার একই পরিবেশে পালিত ৫০টি ভিন্নকোষী

যমজ এবং ৫০টি সমকোষী যমজ এবং ভিন্ন পরিবেশে পালিত ১৯টি সমকোষী যমজ পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্ত করেন যে বুদ্ধির বিকাশে কোন কোন ক্ষেত্রে বংশধারার প্রভাব বড়, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাবই বড়। যেমন উদাহরণস্বরূপ, খুব ভাল পরিবেশে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও দেখা গেল যে একটি ছেলের বুদ্ধ্যঙ্ক ৭০'এর বেশী উঠল না। বুঝতে হবে যে এখানে বংশধারা পরিবেশ অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী। আবার একটি ১০০ বুদ্ধ্যঙ্ক সম্পন্ন ছেলে ভাল পরিবেশের সাহায্য পাওয়ায় ১২০ বা ১৩০ বুদ্ধ্যঙ্কে উঠে গেল। এখানে বুঝতে হবে যে পরিবেশের প্রভাব বংশধারাকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত করেছে।

বুদ্ধির উপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে মতভেদের কারণ থাকলেও ব্যক্তি-সত্তার অন্যান্য দিকগুলির উপর যে পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এক রকম একমত। এ্যাভিরনের (Aveyron) বন্যবালক, ভারতের বনে প্রাপ্ত নেকড়েপালিত মানবশিশু প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করলেই আমরা পরিবেশের প্রভাবের অসীম গুরুত্বের প্রমাণ পাই। সাধারণ মানসিক শক্তিসম্পন্ন এই শিশুগুলি কেবলমাত্র উপযুক্ত পরিবেশের অভাবেই অমানুষরূপে বড় হয়ে উঠেছিল। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে সকল প্রকার মানসিক শক্তিই উপযুক্ত সংস্কৃতিমূলক পরিবেশের সাহায্য ছাড়া পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না।

ইংলণ্ডের ক্যানালবোটের ছেলেমেয়ে, জিপ্সী ছেলেমেয়ে বা সুদূর পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী ছেলেমেয়ে প্রভৃতি যারা উন্নত পরিবেশের সাহায্য পায় না তাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে সাধারণ সহরের ছেলেমেয়েদের চেয়ে তারা অনেক দিক দিয়ে বেশ পশ্চাদ্‌পদ।

আয়োয়া (Iowa) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানটি শিশুদের নার্সারী স্কুলে যোগদানের প্রভাব নিয়ে যে দীর্ঘ গবেষণা চালান, তা থেকে মোটামুটি এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, যে সকল ছেলেমেয়ে নার্সারী স্কুলের সুনিয়ন্ত্রিত ও উন্নত পরিবেশের সাহায্য পায় তারা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছেলেমেয়েদের চেয়ে মানসিক শক্তির দিক দিয়ে বেশ উন্নত হয়ে ওঠে। পরিবেশের ক্ষমতা সম্পর্কে এই সিদ্ধান্তটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। স্মিডিটের (Schmidt) আর একটি পরীক্ষণ পরিবেশের অসীম ক্ষমতা প্রমাণিত করে। স্বল্পবুদ্ধি বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল এমন ২৫৪টি ছেলেমেয়েকে উন্নত এবং সুপরিকল্পিত পরিবেশে রেখে দেখা গেল যে তিন বছরের মধ্যে তাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। লেখাপড়ার দিক দিয়ে তারা ত অদ্ভুত উন্নতি

করলই, এমন কি তিন বছর পরে তাদের মধ্যে বুদ্ধির অভীক্ষায় মাত্র ৭·২% ছেলেমেয়ে স্বল্পবুদ্ধি বলে প্রমাণিত হল। এ থেকে যদিও প্রমাণিত হচ্ছে না যে পরিবেশই তাদের বুদ্ধির উন্নতির একমাত্র কারণ, তবুও এটা অনস্বীকার্য যে বুদ্ধিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করতে এবং অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়াকে সুপরিণত করতে পরিবেশ যথেষ্টই সাহায্য করে।

শিক্ষায় বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব

বংশধারা ও পরিবেশের উপর এই সকল গবেষণা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে উভয়েরই অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ। এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টি বড় এবং কোন্‌টি ছোট, এ বিতর্ক নিষ্প্রয়োজন ও অর্থহীন। কেননা, যেমন কেবলমাত্র বংশধারা শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে গড়ে তুলতে পারে না, তেমনই কেবলমাত্র পরিবেশও শিশুর পূর্ণ বিকাশসাধন করতে পারে না। ব্যক্তিসত্তা হল এ দু'য়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। বংশধারা যোগায় কাঁচা-মাল আর পরিবেশ তাই দিয়ে গড়ে তোলে ব্যক্তিসত্তার পরিণত রূপটি।

আবার কেবলমাত্র বংশধারা ও পরিবেশের নিছক যোগফল বা সমষ্টিকেই ব্যক্তিসত্ত বলে ধরে নিলে ভুল হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিসত্তাকে বিশ্লেষণ করলে কেবল যে খানিকটা বংশধারা আর খানিকটা পরিবেশের ফল পাওয়া যাবে তাও নয়। এ দুয়ের পারস্পরিক সংঘাতে দুইই বদলে যায় এবং তাদের মধ্যে থেকে তৃতীয় একটি সত্তার আবির্ভাব হয়। তারই নাম ব্যক্তিসত্তা।

শিশুর শিক্ষায় বংশধারার প্রভাবের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে শিক্ষার্থীর বংশধারাই তার শিক্ষার গতি ও সীমারেখা নিয়ন্ত্রিত করে দেবে। কি ভাবে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হবে, কি স্তরের শিক্ষা দেওয়া হবে এবং কোথায় সেই শিক্ষার সীমারেখা টানা হবে এই সব মূল্যবান তথ্য নির্ধারিত করে দেবে শিশুর বংশধারা।

শিক্ষায় শিক্ষার্থীর দৈহিক বংশধারার প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সাধারণভাবে দৈহিক আকৃতি, গঠন ইত্যাদি শিশুর শিক্ষাকে তেমন প্রভাবান্বিত করে না। তবে একথা সত্য যে যদি শিশুর কোনও শারীরিক খুঁত বা অসম্পূর্ণতা থাকে তবে তা শিশুর শিক্ষার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অ্যাডলারের (Adler) পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রচুর নিম্নতাবোধ (Sense of inferiority) জন্মায় এবং তাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী, মানসিক সংগঠন এবং আচরণ-বৈশিষ্ট্য তার দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

মানসিক বংশধারা কিন্তু শিশুর শিক্ষাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বিশেষ করে বুদ্ধির প্রভাব শিশুর শিক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে যে স্কুলকলেজের সাফল্য অনেকখানি ('৬০ সহপরিবর্তনের মান) নির্ভর করে বুদ্ধির উপর। অতএব শিশু কি পরিমাণ বুদ্ধির অধিকারী তার উপর তার শিক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে নির্ভরশীল এবং পরিবেশের চাপে বুদ্ধির বিশেষ পরিবর্তন হয় না বলেই সাধারণত মনোবিজ্ঞানীরা ধরে নেন। এই ব্যাপারটা বুদ্ধ্যঙ্কের অপরিবর্তনীয়তা নামে পরিচিত। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শিশুর বুদ্ধ্যঙ্ক মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিতই থাকে। অবশ্য কতকগুলি আধুনিক পরীক্ষণে এই সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের বিরোধিতা করা হয়েছে। দেখা গেছে যে উপযুক্ত পরিবেশের নিয়ন্ত্রণে কখনও কখনও বুদ্ধ্যঙ্কের পরিবর্তনও ঘটান যায়। তবে এই মতবাদটি এখনও পুরোপুরি সমর্থিত হয়নি। বুদ্ধি বা সাধারণ শক্তি ছাড়াও আরও কতকগুলি বিশেষধর্মী শক্তি শিশু উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে এবং সেগুলি শিশুর শিক্ষাকে রীতিমত প্রভাবিত করে থাকে। ভাষাত্মক শক্তি, যন্ত্রঘটিত শক্তি, গাণিতিক শক্তি ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষধর্মী শক্তিগুলি শিশুর শিক্ষার প্রকৃতি ও কার্যকারিতাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

এই সকল তথ্য থেকে আমরা মোটামুটিভাবে ধরে নিতে পারি যে শিশুর বিভিন্ন মানসিক শক্তি সহজাত ও একরকম অপরিবর্তনীয়। অতএব শিশুর শিক্ষা এই দিক দিয়ে অনেকখানি বংশধারার উপর নির্ভরশীল।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর মনঃপ্রকৃতিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এই মনঃপ্রকৃতি শিশুর মনের মৌলিক সংগঠনের স্বরূপ নির্ধারিত করে দেয় এবং তার ব্যক্তিসত্তার কাঠামোটি গড়ে তোলে। শিশুর মানসিক সংগঠনের সঙ্গে শিক্ষা অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। মনঃপ্রকৃতি বা মনের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়ার স্বরূপের উপর শিক্ষার সফলতা অনেকটা নির্ভর করে এবং মনঃপ্রকৃতি প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে শিশুর বংশধারা বা উত্তরাধিকারের উপর।

কিন্তু তা বলে একথা ভাবলেও ভুল হবে যে ব্যক্তিসত্তা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয় বংশধারার দ্বারা। আগেই বলেছি যে বংশধারা শিক্ষার গতিপথ এবং সীমারেখা নির্ধারিত করে দেয় কিন্তু শিক্ষার মূল অবয়ব গড়ে ওঠে পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। পরিবেশই বংশধারাকে রূপময় করে তোলে। হাতুড়ির ঘায়ে যেমন আকৃতিহীন লোহার তাল বিশেষ একটা রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তেমনই পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার চাপে গঠনহীন রূপহীন বংশধারাটি

সাবয়ব হয়ে ওঠে। অতএব শিশুর শিক্ষা এক দিক দিয়ে যেমন বংশধারার উপর নির্ভরশীল তেমনই আবার নির্ভরশীল পরিবেশের বিভিন্নধর্মী প্রতিক্রিয়ার উপর।

বংশধারা ও শিক্ষকের কর্তব্য

এ থেকে আমরা আর একটি অতি মূল্যবান সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছি। শিশুর শিক্ষা এবং ব্যক্তিসত্তা গঠনে শিক্ষকের দায়িত্ব হল অসীম। পরিবেশের নিয়ন্ত্রণের উপর যখন শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুগঠন এতখানি নির্ভর করছে তখন এ দিক দিয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য যে অপরিসীম সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিক্ষক শিশুর বংশধারার প্রকৃতি বদলাতে পারেন না বা তার সঙ্গে কিছুটা যোগ করেও দিতে পারেন না, একথা সত্য। কিন্তু বংশধারাকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করাটা অনেকখানি শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। বংশধারার পূর্ণ-বিকাশ নির্ভর করে পরিবেশের উপর। উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই, বংশধারা স্বাভাবিক ও সহজ পথে এগোতে পারে, তার বৃদ্ধি ও পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ পেতে পারে এবং পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছতে পারে। বংশধারা থাকে অবিকশিত সম্ভাবনা-বৈচিত্র্যের রূপে শিশুর মধ্যে সুপ্ত অবস্থায়। একমাত্র উপযোগী পারিবেশিক শক্তিই সেই সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি জাগাতে এবং পূর্ণভাবে বিকশিত করতে পারে।

শিক্ষার্থীর বংশধারার সুষ্ঠু ও পূর্ণ বিকাশের জন্য সুবিবেচক শিক্ষকের কি কি করা উচিত তার একটি বিবরণী নীচে দেওয়া হল।

১। আধুনিক ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করা। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মানসিক শক্তি অনুযায়ী শ্রেণী বিভাজন করা এবং তাদের সামর্থ্যের উপযোগী করে শিক্ষা প্রক্রিয়াটির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ করা।

২। শিক্ষণ পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-সম্মত করে তোলা এবং যাতে শিক্ষার্থী সার্থক ও কার্যকর শিখন লাভ করতে পারে তা দেখা।

৩। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চাহিদা, রুচি ও সামর্থ্য পর্যবেক্ষণ করা এবং সেই মত শিক্ষার বিষয়বস্তুকে বহুমুখী করে তোলা।

৪। শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে শিশুদের মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা করা।

৫। স্কুলে স্বাস্থ্যপ্রদ পরিবেশ গড়ে তোলা। ক্লাশঘরগুলি যথেষ্ট প্রশস্ত এবং আলো-বাতাসময় করা। খেলাধূলা ও অন্যান্য সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা।

৬। শিখন-সহায়ক আধুনিক উপকরণগুলির বহুল ব্যবহার করা। শিক্ষক শিক্ষার্থীর অনুপাত বিজ্ঞান-সম্মত করে তোলা।

৭। শিক্ষার্থীর দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য নিয়মিত স্বাস্থ্য-পরীক্ষণ করা, চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখা এবং স্বাস্থ্যরক্ষার আইন-কানুন সম্বন্ধে শিক্ষার্থী-দের অবহিত করা।

৮। শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করা। যে সকল শিক্ষার্থী পশ্চাদ্‌পদ তাদের অসাফল্যের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা এবং সেগুলি দূরীকরণের জন্য উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া।

৯। সু-পরিচালনা ও সুমন্ত্রণার সাহায্যে শিক্ষার্থীকে তার পক্ষে উপযোগী কর্মসূচী অনুসরণ করতে সাহায্য করা।

বংশধারার তত্ত্ব (Theories of Heredity)

কেমন করে বংশধারা পিতামাতার কাছ থেকে তার সন্তান-সন্ততিতে সঞ্চালিত হয় তার মোটামুটি একটি চিত্র আমরা পেয়েছি। প্রকৃতির এই সৃজন রহস্য সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বহুদিনই অত্যন্ত স্বল্প ছিল। বর্তমানে নানা গবেষকদের মূল্যবান ব্যাপক পরীক্ষণের ফলে প্রাণীসৃষ্টির রহস্যের বহু তথ্য আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

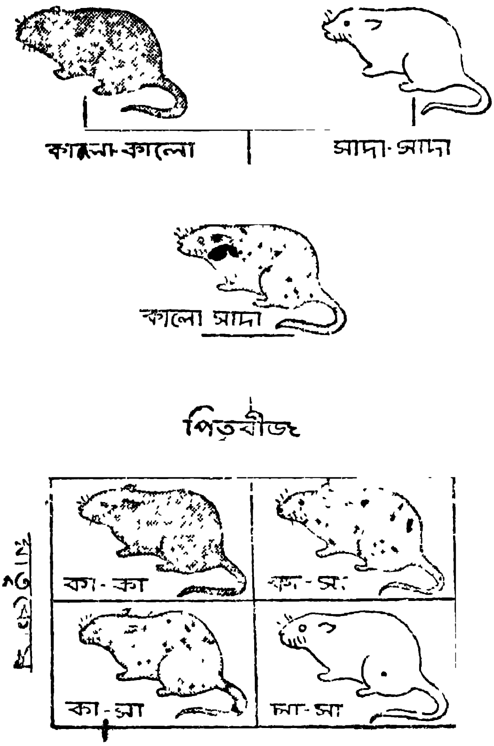
মেণ্ডেলবাদ (Mendelism)

বংশধারার অন্তর্নিহিত রহস্য সম্বন্ধে প্রথম আলোকপাত করেন গ্রেগরি মেনডেল নামে একজন অস্ট্রিয়াবাসী ধর্মযাজক। ১৮৮৬ সালে তিনি শুঁটি, মৌমাছি প্রভৃতির বংশবিস্তার নিয়ে পরীক্ষণ চালান এবং তা থেকে যে কয়েকটি মূল্যবান সিদ্ধান্ত গঠন করেন, সেগুলির উপরেই আধুনিক কালের বংশধারা সম্বন্ধে প্রচলিত তত্ত্বগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অবশ্য সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে মেণ্ডেলের তত্ত্বের মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাহলেও মেণ্ডেলের আবিষ্কৃত মৌলিক সূত্রগুলি একপ্রকার অপরিবর্তিতই আছে বলা চলে।

বৈশিষ্ট্য-এককের সূত্র (Law of Unit Character)

মেণ্ডেলবাদের সব চেয়ে বড় অবদান হল বংশধারা-এককের (Heredity units) পরিকল্পনাটি। এই সূত্রটির অর্থ হল যে প্রাণী উত্তরাধিকার সূত্রে যে সব বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পায় সেগুলির পেছনে বিশেষ বিশেষ সুনির্দিষ্ট বংশধারা-

এককের প্রভাব আছে। অর্থাৎ প্রাণীর সহজাত ধর্মগুলি সুনির্দিষ্ট ও অখণ্ড সত্তাসম্পন্ন। এই ধারণাটিকে বৈশিষ্ট্য-এককের সূত্র (Law of Unit Character) বলে বর্ণনা করা যায়। এই বৈশিষ্ট্য বা বংশধারার একক-গুলির আধার হল জনন-কোষের মধ্যস্থিত ক্রোমোজোমগুলি বা আরও নির্ভুল-



(মেণ্ডেলবাদের চিত্ররূপ)

ভাবে বলতে গেলে, ক্রোমোজোমের মধ্যস্থিত জীনগুলি। যেমন শিশুর কটা চোখ হওয়ার পেছনে আছে বাবা মার কাছ থেকে পাওয়া কটা চোখের জীনটি। সেই রকম শিশুর স্বল্পবুদ্ধি হওয়ার পেছনে আছে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া স্বল্পবুদ্ধির জীনটি ইত্যাদি।

সক্রিয়-নিষ্ক্রিয় জীনের তত্ত্ব

(Theory of Dominant-Recessive Genes)

মেণ্ডেলবাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল সক্রিয়-নিষ্ক্রিয় (Dominant-Recessive) জীনের পরিকল্পনাটি। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বংশ-ধারা-একক বা জীনটি সক্রিয়ও হতে পারে আবার নিষ্ক্রিয়ও হতে পারে।

সক্রিয় হলে তার বৈশিষ্ট্যটি নবজাতকে প্রকাশ পাবে, আর নিষ্ক্রিয় হলে তার কোনরূপ প্রভাবই নবজাতকে দেখা যাবে না। প্রথম শ্রেণীর জীনকে সক্রিয় জীন বলা হয়, আর দ্বিতীয় শ্রেণীর জীনকে নিষ্ক্রিয় জীন বলা হয়। যেমন, যদি কটা চোখের জীন নীল চোখের জীনের সঙ্গে জোট বাঁধে তবে শিশু কটা চোখের অধিকারী হয়। কেননা কটা চোখের জীন হল সক্রিয় জীন আর নীল চোখের জীন হল নিষ্ক্রিয় জীন। তার ফলে নবজাতক নীল চোখের অধিকারী না হয়ে কটা চোখের অধিকারী হবে। তবে নীল চোখের জীনটি শিশুর মধ্যে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকলেও তার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে এবং তার পরবর্তী বংশধরে সক্রিয় জীন হয়ে দেখা দিতে পারে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তির পরবর্তী বংশধারা নীল চোখের অধিকারী হয়ে জন্মাতে পারে।

জীনের এই সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেও বিশেষ একটি নিয়ম দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, কাল ইঁদুর এবং সাদা ইঁদুরের মিলনে সমস্ত বাচ্চা হবে কাল রঙের। এখানে কাল রঙের জীন এবং সাদা রঙের জীন এ'দুয়ের মধ্যে কাল রঙের জীন হল সক্রিয় এবং সাদা রঙের জীন হল নিষ্ক্রিয়। সেইজন্য সব বাচ্চাই হল কাল রঙের। কিন্তু বাচ্চাগুলি কাল রঙের হলেও তারা হল মিশ্র জীন সম্পন্ন অর্থাৎ তাদের বীজকোষে কাল রঙের জীন এবং সাদা রঙের জীন দুই'ই পাশাপাশি রইল, যদিও কাল রঙের জীন সক্রিয় বলে তাদের সকলের গায়ের রঙ কাল হল।

এখন এই মিশ্রজীনসম্পন্ন ইঁদুরদের থেকে যে বাচ্চা হবে তাদের মধ্যেও $\frac{3}{4}$ অংশ হবে কাল ইঁদুর আর $\frac{1}{4}$ অংশ হবে সাদা ইঁদুর। আবার $\frac{3}{4}$ কাল ইঁদুরের মধ্যে $\frac{1}{3}$ হবে কেবল কাল রঙের জীনসম্পন্ন এবং তাদের বাচ্চারা সবাই কাল হবে। বাকী $\frac{2}{3}$ কাল ইঁদুর হবে সঙ্করজাতীয় বা মিশ্রজীনসম্পন্ন অর্থাৎ তাদের বাচ্চাদের মধ্যেও ঠিক ঐ রকম ৩ : ১ অনুপাতে কাল ও সাদা বাচ্চা জন্মাবে। $\frac{1}{4}$ অংশ সাদা ইঁদুরের বাচ্চারা কেবল সাদাই হবে।

মোটামুটি মেণ্ডেলবাদের প্রধান সূত্রগুলি উপরে বর্ণিত হল। মেণ্ডেলের পর বহু প্রাণীতত্ত্ববিদ্ বংশধারার প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁদের আবিষ্কৃত তথ্য থেকে জানা গেছে যে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রত্যাশিত বংশধারার মধ্যেও প্রচুর পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে।

সাধারণত জীনের প্রকৃতি অনুযায়ী সন্তানসন্ততির বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়ে থাকে। কিন্তু দুটি কারণে এই প্রত্যাশিত উত্তরাধিকারের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিতে পারে। প্রথমটি হল জীনের সংবিকৃতি (Mutation) এবং দ্বিতীয়টি হল পরিবেশের বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন।

সংবিকৃতি (Mutation)

কখনও কখনও জীনের মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তার ফলে সন্তানসন্ততির উত্তরাধিকারের মধ্যেও গুরুতর পরিবর্তন ঘটে। একে জীনের সংবিকৃতি বলা হয়। এই ধরনের জীনের সংবিকৃতির জন্য প্রাণীর মধ্যে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তা অস্বাভাবিক প্রকৃতির হয়ে থাকে। এখন যদি এই আকস্মিক পরিবর্তনটি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি-বিধান করে টিকে থাকতে না পারে তা হলে ঐ বিকৃতিসম্পন্ন প্রাণী তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না এবং বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু যদি প্রাণী তার এই বিকৃতি নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকতে পারে এবং বংশসৃষ্টি করে যেতে পারে তবে এই বিকৃতি তার বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং ঐ সংবিকৃতিসম্পন্ন প্রাণী একটি নতুন স্বতন্ত্র শাখা রূপে বেঁচে থাকে। কাল ভেড়া, অস্বাভাবিকভাবে শ্বেতবর্ণ প্রাণী, ছ'আঙুল-ওয়ালা হাত বা পা সম্পন্ন মানুষ ইত্যাদি হল এই ধরনের সংবিকৃতির উদাহরণ যেগুলি প্রাণীর মধ্যে সংঘটিত হওয়া সত্ত্বেও ঐ প্রাণী বেঁচে থাকতে পেরেছে। আবার প্রাণী বিবর্তনের ইতিহাসে দেখা যায় যে এমন অনেক সংবিকৃতি প্রাণীর মধ্যে ঘটেছে যা পরিবেশের সঙ্গে সংঘাতে অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং ঐ সংবিকৃতিসম্পন্ন প্রাণী স্বল্পকাল অবস্থানের পর বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এক্স-রের সাহায্যে অনেক প্রাণীর মধ্যে পরীক্ষণমূলকভাবে এই ধরনের বিকৃতির সৃষ্টি করা গেছে।

পারিবেশিক পরিবর্তন (Environmental Changes)

কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবেশের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও জীনের প্রকৃতি ও সংগঠনের মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে এবং তার ফলে প্রাণীর মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলের মাছি নিয়ে মরগ্যান যে পরীক্ষণ করেন তাতে দেখা গেছে যে যদি অপেক্ষাকৃত কম তাপে মাছিগুলির জন্ম দেওয়া যায় তবে তাদের অতিরিক্ত পা'এর আবির্ভাব হয়। কোন কোন স্যালাম্যাণ্ডারের কানকো সারা জীবন থেকে যায় এবং তারা জলেই বাস করে। কিন্তু তাপমাত্রার বিশেষ পরিবর্তনে ঐ কানকোগুলো অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ঐ জাতীয় স্যালাম্যাণ্ডারেরা তখন ডাঙ্গায় উঠে আসে এবং সেখানেই বাস করতে থাকে। তাদের বাচ্চাদের যদি ঐ পরিবেশে রেখে দেওয়া যায় তবে তারা বহু বংশ ধরে ডাঙ্গার প্রাণী হয়েই বাস করে।

চোদ্দ

অনুষঙ্গের সূত্রাবলী (Laws of Association)

চিন্তন, কল্পন, বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে মনে করা কাজটির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে সকল প্রতীকের সাহায্যে আমরা চিন্তনের কাজ সম্পন্ন করি সেগুলি আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া এবং কোন না কোন রূপে সেগুলি আমাদের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত হয়ে থাকে। চিন্তনের সময় সেগুলিকে আমরা পুনরুজ্জীবিত করে তুলি অর্থাৎ লৌকিক ভাষণে সেগুলিকে আমরা 'মনে করি'।

এই মনে করা কাজটিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে যে মানসিক প্রক্রিয়াটি তার নাম অনুষঙ্গ। অনুষঙ্গ বলতে বোঝায় দুটি বস্তুর মধ্যে এমন একটা বিশেষ ধরনের সম্পর্ক যার দ্বারা একটি আর একটির কথা মনে জাগাতে পারে। যেমন, দুই ভাইকে যদি দেখতে এক রকম হয় তবে একজনকে দেখলে আর একজনের কথা মনে পড়ে যায়। অনুষঙ্গ যে কোন দুটি প্রতীকের মধ্যে স্থাপিত হতে পারে। যেমন দুটি ধারণার মধ্যে বা দুটি প্রতিরূপের মধ্যে বা একটি ধারণা এবং একটি প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ সৃষ্ট হতে পারে। তেমনই আবার একটি প্রত্যক্ষিত বস্তু এবং একটি প্রতীকের মধ্যেও অনুষঙ্গ সৃষ্ট হতে পারে, অর্থাৎ কোন বস্তু বা ব্যক্তি দেখে আমাদের মনে একটি ধারণা বা প্রতিরূপের উদয় হতে পারে। যেমন, হিমালয় দেখে মনে একটি প্রশান্তির ধারণা জন্মাতে পারে, বুদ্ধমূর্তি দেখে অহিংসার কথা মনে পড়তে পারে।

অনুষঙ্গ আবার আর একদিক দিয়ে দু'শ্রেণীর হতে পারে। যেমন সর্বজনীন এবং ব্যক্তিগত। কতকগুলি ব্যাপারে একটি বিশেষ সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে একই প্রকারের অনুষঙ্গ গঠিত হতে পারে। যেমন চরকা দেখলে প্রত্যেক ভারতীয়েরই মহাত্মা গান্ধীর কথা মনে পড়ে বা সেবাধর্মের কথা উঠলে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের কথা মনে পড়ে ইত্যাদি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ একেবারে নিছক ব্যক্তিগত হতে পারে, যেমন, কারও রেলগাড়ী দেখলে তার জন্মগ্রামটির কথা মনে পড়ে যায় বা ছোট ছেলে দেখলে মৃত পুত্রের কথা মনে পড়ে যেতে পারে।

অনুষঙ্গের প্রকৃতি অনুযায়ী তিনটি প্রধান সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। যথা, ১। সাদৃশ্যের সূত্র (Law of Similarity), ২। সান্নিধ্যের সূত্র (Law of Contiguity) এবং ৩। বৈসাদৃশ্যের সূত্র (Law of Contrast)।

১। সাদৃশ্যের সূত্র (Law of Similarity)

যখন দুটি বস্তুর মধ্যে আকারগত বা প্রকৃতিগত কোনরূপ সাদৃশ্য থাকে তখন একটির প্রত্যক্ষণ বা চিন্তা অপরটির স্মৃতি আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে, যেমন কারও ছবি দেখলে প্রকৃত ব্যক্তিটির কথা মনে পড়ে যায়, ছেলেকে দেখলে তার বাবার কথা মনে পড়ে ইত্যাদি। তাছাড়া কাব্যে, সাহিত্যে বা দৈনন্দিন ভাষণে আমরা যে সকল উপমা ও রূপকের ব্যবহার করে থাকি সেগুলির মূলে এই সাদৃশ্যসূচক অনুষঙ্গ প্রচুর পরিমাণে আছে যেমন, পুরুষ-সিংহ, চন্দ্রানন, শোকসমুদ্র, হরিণ-চক্ষু ইত্যাদি।

২। সান্নিধ্যের সূত্র (Law of Contiguity)

যখন দুটি বস্তু একসঙ্গে বা পর পর আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয় তখন দুয়ের মধ্যে এমন একটি অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় যার ফলে একটির প্রত্যক্ষণ বা চিন্তা অপরটির স্মৃতিকে আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে। যেমন, গীতাঞ্জলীর নাম করলে রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয় বা পণ্ডিচেরীর কথা বললে শ্রীঅরবিন্দের কথা মনে হয় বা কুইনাইনের নাম করলে তিক্ততার কথা মনে হয় ইত্যাদি। সান্নিধ্য আবার দু'প্রকারের হতে পারে, স্থানগত এবং কালগত। কখনও কখনও দুটি বস্তুর মধ্যে তাদের স্থানগত সমতা বা সান্নিধ্যের জন্য অনুষঙ্গ স্থাপিত হতে পারে, যেমন ফুল দেখলে গন্ধের কথা মনে পড়ে। আবার কখনও সময়গত একতা বা সান্নিধ্যের জন্য একটি বস্তু আর একটি বস্তুর কথা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয়, যেমন কোন গানের প্রথম কলিটি মনে এলে পরের কলিগুলি পর পর মনে এসে যায়।

৩। বৈসাদৃশ্যের সূত্র (Law of Contrast)

দুটি বস্তুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈসাদৃশ্য থাকলেও একটির কথা মনে হলে অপরটির কথা মনে পড়ে যায়, যেমন দুঃখের মধ্যে সুখের দিনগুলির কথা মনে পড়ে যায়, পরিণত বয়সের তিক্ত দিনগুলিতে ছেলেবেলার নির্ঝঞ্ঝাট দিনগুলির কথা মনে পড়ে যায়, বড়লোকের বাড়ীতে অপচয়ময় ভোজের দিনে পথবাসী অনাহারী ভিক্ষুকের কথা মনে পড়ে যায় ইত্যাদি।

যদিও অনুষঙ্গের এ তিনটি সূত্রের পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে তবু এদের মধ্যে প্রচুর মিল আছে এবং অনেক দিক দিয়ে এরা পরস্পরের উপর নির্ভরশীল।

সান্নিধ্যের মধ্যে সাদৃশ্য

যখন দুটি বস্তুর কথা তাদের সান্নিধ্যের জন্য আমাদের মনে উদিত হয় তখন সাদৃশ্যও তাদের মধ্যে বেশ কিছুটা কাজ করে থাকে। যেমন ফুল দেখে গন্ধের কথা মনে পড়ল। অর্থাৎ বর্তমানে প্রত্যক্ষিত ফুলটি প্রথমে আমাদের মনে পূর্বে প্রত্যক্ষিত গন্ধসম্পন্ন একটি ফুলের কথা মনে জাগাল। তারপর সেই ফুল থেকে সান্নিধ্যের জন্যই আমাদের গন্ধের কথা মনে পড়ল। অতএব সান্নিধ্যের অনুষঙ্গে প্রথমে আসে সাদৃশ্যসূচক অনুষঙ্গ, তারপর আসে সান্নিধ্যসূচক অনুষঙ্গ।

সাদৃশ্যের মধ্যে সান্নিধ্য

তেমনই সাদৃশ্যের অনুষঙ্গের মধ্যে সান্নিধ্য আছে। সাদৃশ্য মানে কিছুটা মিল, কিছুটা অমিল। মিলটুকু মনে আসে সাদৃশ্যের জন্য কিন্তু তারপর দুয়ের মধ্যে যেটুকু অমিল সেটুকু মনে আসে সান্নিধ্যের জন্য। যেমন, এক ভাইকে দেখে অপর ভাইটির কথা মনে পড়ল। এখানে প্রথম ভাইয়ের সঙ্গে দ্বিতীয় ভাইয়ের যেখানে যেখানে মিল সেটুকু মনে এল সাদৃশ্যের জন্য। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মনে এল তাদের মধ্যে অমিলটুকু। এখানে দ্বিতীয় ভাইয়ের সঙ্গে প্রথম ভাইয়ের মিলটুকু তাদের মধ্যে অমিলটুকুকেও আমাদের মনে জাগিয়ে তুলল এবং সেটি হল সান্নিধ্যের জন্যই।

সাদৃশ ও বৈসাদৃশ্য

সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের সূত্র দুটির মধ্যে প্রচুর মিল আছে। দুটি বস্তুর মধ্যে বৈসাদৃশ্যের সূত্র তখনই কাজ করে যখন তাদের মধ্যে শ্রেণীগত বা জাতিগত অভিন্নতা থাকে। দুঃখের অভিজ্ঞতা সুখের স্মৃতি জাগায় বা খুব গরমের দিনে আমাদের শীতের দিনের কথা মনে পড়ে। এখানে দুঃখ-সুখ, গরম-শীত ইত্যাদি অভিজ্ঞতাগুলি একই শ্রেণী বা জাতির অন্তর্গত। নইলে একটি অপরটির কথা মনে করাতে পারত না। তাছাড়া বৈসাদৃশ্যের চিন্তার মধ্যেও সান্নিধ্য কাজ করে থাকে। সাধারণত একটি বস্তুর প্রকৃতিকে ভাল করে বোঝার জন্য তার বিপরীত প্রকৃতির বস্তুটিকে আমরা তার পাশাপাশি রাখি এবং তুলনা করে থাকি। সেজন্য যখনই একটি বস্তু দেখে তার বিপরীত বস্তুটিকে মনে পড়ে তখনই এই

সান্নিধ্যসূচক অনুষঙ্গটি কাজ করে থাকে। অতএব বৈসাদৃশ্যের সূত্রটি সাদৃশ্য এবং সান্নিধ্য এই দুয়ের উপর নির্ভরশীল।

অনেক মনোবিজ্ঞানী এই তিনটি সূত্রের পরিবর্তে একটিমাত্র সূত্র গঠনের পক্ষপাতী। বেন, জেমস প্রভৃতি সান্নিধ্যের সূত্রটিকেই মৌলিক সূত্র বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের মতে আর দুটি সূত্র এই সূত্রটিরই অন্তর্ভুক্ত। আবার কোন কোন মনোবিজ্ঞানী সাদৃশ্যের সূত্রটিকেই মৌলিক সূত্র বলে বর্ণনা করে থাকেন।

৪। সমষ্টিকরণের সূত্র (Law of Redintegration)

হ্যামিলটনের মতে সমষ্টিকরণের সূত্রটিকে (Law of Redintegration) অনুষঙ্গের মৌলিক সূত্র বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে এবং সান্নিধ্য, সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য এ সবগুলিকেই এই সূত্রটির বিভিন্ন রূপ বলে ব্যাখ্যা করা যায়। এই সূত্রটির অর্থ হল যে একটি বিশেষ সমষ্টির যদি একটি অংশ আমাদের মনের সামনে উপস্থাপিত করা যায় তাহলে আমাদের মানসিক প্রচেষ্টা হবে বাকী অংশগুলিকে জাগিয়ে তুলে ঐ সমষ্টিকে প্রতিষ্ঠিত করা। অর্থাৎ ফুলের আকৃতি, গন্ধ, গঠন সমস্ত নিয়েই আমাদের মনে তৈরী হয়ে আছে ফুল সম্বন্ধে একটি সমষ্টিগত বা সমগ্র ধারণা। এখন যদি এই সমগ্র ধারণার একটা অংশ, যেমন ফুলের আকৃতি বা গন্ধ আমাদের মনে আসে তাহলে মনের চেষ্টাই হবে ফুলের বাকী বৈশিষ্ট্যগুলি জাগিয়ে তুলে ফুলটির সমগ্র ধারণাটিকে মনের মধ্যে সৃষ্টি করা। অনুষঙ্গের এই সংব্যাখ্যানটি বেশ সুসঙ্গত এবং আধুনিক গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

অনুষঙ্গতত্ত্বের সমালোচনা

এক সময়ে মানসিক প্রক্রিয়ার বর্ণনা ও ব্যাখ্যায় মনোবিজ্ঞানীদের প্রধান উপকরণ ছিল অনুষঙ্গের পরিকল্পনাটি। অনুষঙ্গবাদীদের (Associationist) মনে করতেন যে সকল রকম মানসিক প্রক্রিয়ার মূলে আছে কতকগুলি মানসিক একক এবং সেগুলির একটির সঙ্গে আর একটিকে জুড়ে আমাদের স্মৃতি, চিন্তা, কল্পনা, বিচারকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলির সৃষ্টি হয়েছে। এই মানসিক এককগুলিরও তাঁরা শ্রেণীবিভাগ করলেন, যেমন সংবেদন (sensation), ধারণা (idea or concept), প্রতিরূপ (image) ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে সংযোগ-প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা রূপে তাঁরা তৈরী করলেন অনুষঙ্গের সূত্রগুলি। তাঁদের মতে সংবেদন, ধারণা, প্রতিরূপ প্রভৃতি নানারূপ অনুষঙ্গের জন্য পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে

যায় এবং আমাদের মনে বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অনুষঙ্গবাদীরা মানসিক প্রক্রিয়ার এই ব্যাখ্যাকে নির্ভুল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করেন।

কিন্তু পরবর্তী বহু মনোবিজ্ঞানী অনুষঙ্গবাদীদের এই অতি সহজ ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করতে পারলেন না। তাঁদের মতে অনুষঙ্গ মানসিক প্রক্রিয়ার সংগঠনের বর্ণনামাত্র, ব্যাখ্যা নয়। মানসিক প্রক্রিয়াকে ঐভাবে টুকরো টুকরো করে বিশ্লেষণ করে পরীক্ষা করতে গেলে তার প্রকৃত সত্তাটিই নষ্ট হয়ে যাবে। অতএব মানসিক প্রক্রিয়ার যথার্থ ব্যাখ্যা হবে সমগ্রধর্মী, অংশধর্মী নয়। অনুষঙ্গবাদীদের মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ প্রথাকে তাঁরা মানসিক রসায়ন (Mental Chemistry) বলে সমালোচনা করেন। আধুনিককালে মানসিক প্রক্রিয়ার সমগ্রতাকে অক্ষুণ্ণ রেখে এবং তার সম্পূর্ণ সংগঠনটিকে ভিত্তি করেই তার স্বরূপের ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করা হয়।

অবশ্য অনুষঙ্গমূলক বর্ণনার দ্বারা মানসিক প্রক্রিয়ার পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে না পারা গেলেও অনুষঙ্গের তত্ত্বটি থেকে মনের প্রকৃতি ও কাজ সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য আজ সংগ্রহ করা গেছে। থর্নডাইকের সংযোজনবাদ ও প্যাভলভের অনুবর্তন প্রক্রিয়ার তত্ত্বটিকে শিখন-প্রক্রিয়ার অনুষঙ্গমূলক সংব্যাখ্যানের আধুনিক রূপ বলা যেতে পারে।

শিক্ষা ও অনুষঙ্গ

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুষঙ্গের সূত্রগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। আমাদের স্মৃতির সংগঠনে অনুষঙ্গের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অনুষঙ্গকে ভিত্তি করে আমাদের অধিকাংশ স্মৃতিই গড়ে উঠে থাকে। অর্থহীন শব্দতালিকা মুখস্থ করার সময় দেখা গেছে যে অনুষঙ্গের সাহায্যে আমরা মনের মধ্যে একটি শব্দের সঙ্গে আর একটি শব্দকে গ্রন্থিবদ্ধ করে থাকি। আমাদের বহু ধারণা, বিশ্বাস, মনোভাব অনুরাগ ও বিরাগ নিছক অনুষঙ্গ থেকেই জন্মলাভ করে থাকে। শব্দের অর্থ এবং নামও আমরা শিখে থাকি অনুষঙ্গের সাহায্যে।

সাধারণত আমাদের মধ্যে অনুষঙ্গ সৃষ্ট হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে, অনেকটা যান্ত্রিক পন্থায়। যাকে আমরা অনুবর্তন প্রক্রিয়া (Conditioning) বলে বর্ণনা করে থাকি সেই প্রক্রিয়াতেই আমাদের চিন্তা বা ধারণাগুলির মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়ে থাকে। যেমন, রক্তকে লাল রঙের দেখতে দেখতে আমাদের মধ্যে রক্ত

১। পৃঃ ১০৫ (দ্বিতীয় খণ্ড) ২। পৃঃ ১২২ (দ্বিতীয় খণ্ড)

এবং লাল রঙের মধ্যে একটি অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়ে যায় এবং তার ফলে লাল কিছু দেখলে আমাদের রক্তের কথা মনে পড়ে।

আবার কৃত্রিম উপায়ে পরিকল্পিত প্রচেষ্টার দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে অনুষঙ্গ সৃষ্টি করা যায়। অর্থাৎ কোন একটা বিশেষ বস্তুর ধারণা আমাদের মনে রাখতে হলে আমাদের আগে থেকেই মনে আছে বা সহজে আমরা ভুলিনা এমন কোন একটি বস্তুর স্মৃতির সঙ্গে সেটিকে গ্রন্থিবদ্ধ করে দেওয়া যেতে পারে এবং এইভাবে গ্রন্থিবদ্ধ হলে আমরা এই নতুন বস্তুটিও সহজে ভুলি না। যখন কোন নতুন বিষয়বস্তু আমরা মুখস্থ করি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা সেটিকে আমাদের পূর্বে শেখা বস্তুর সঙ্গে অনুষঙ্গ স্থাপন করে মনে রাখার চেষ্টা করি। অর্থাৎ মুখস্থকরণ মানেই হল নতুন অনুষঙ্গ স্থাপন। বিষয়বস্তু যত অর্থহীন এবং কৌশলধর্মী হবে ততই অনুষঙ্গ যান্ত্রিক এবং কৃত্রিম হবে। আর বিষয়বস্তু যত অর্থপূর্ণ হবে তত অনুষঙ্গ স্বাভাবিক ও আয়াসহীন হবে। অর্থহীন বিষয়বস্তু, কৌশল ইত্যাদি শেখার ক্ষেত্রে ইচ্ছাপ্রসূত প্রচেষ্টার সাহায্যে অনুষঙ্গ স্থাপন করতে হয় এবং বারবার অনুশীলনের সাহায্যে সেই অনুষঙ্গকে দৃঢ়বদ্ধ করতে হয়। শিক্ষক এই মানসিক প্রক্রিয়াটিকে শিক্ষার কাজে লাগাতে পারেন। যে সব বিষয়বস্তু দুরূহ বা সহজে মনে রাখা যায় না সেগুলিকে শিক্ষক অনুষঙ্গের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনে গ্রন্থিবদ্ধ করে দিতে পারেন। এই সব ক্ষেত্রে সাধারণত সান্নিধ্যমূলক অনুষঙ্গের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে কৃত্রিম অনুষঙ্গের সাহায্যে মনে রাখা প্রায়ই কষ্টকর ও স্বল্পস্থায়ী হয়ে থাকে।

এক

শারীরিক ও সঞ্চালনমূলক বিকাশ

(Physical and Motor Development)

কেমন করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটি কোষ ধীরে ধীরে বিকাশলাভ করে একটি পূর্ণাঙ্গ সক্রিয় মানুষে পরিণত হয়, এ ঘটনাটি চিরকালই জীবতত্ত্ববিদ্‌দের পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। (শিক্ষাবিজ্ঞানেও শিশুর শারীরিক বিকাশের পূর্ণ বিবরণী জানাটা অপরিহার্য।) কেননা শিক্ষা বলতে আজকাল নিছক মনের উৎকর্ষসাধন বা কোন বিশেষ জ্ঞান আহরণকে বোঝায় না; (শিশুর ব্যক্তিসত্তার পূর্ণ ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশকেই বোঝায় এবং শিশুর মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক প্রভৃতি সব দিকগুলির বিকাশই তার শারীরিক বিকাশের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।)

গর্ভকালীন আচরণ (Pre-natal Behaviour)

শিশুর শারীরিক বিকাশকে যদিও আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে থাকি, প্রকৃতপক্ষে শারীরিক বিকাশ একটি অবিচ্ছিন্ন একক ঘটনা এবং সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া এর বৈশিষ্ট্যগুলির গুরুত্ব বোঝা যায় না। তাছাড়া যদিও ভূমিষ্ঠ হবার মুহূর্ত থেকেই শিশুর সঙ্গে আমরা পরিচিত হই, তবু তার প্রকৃত শারীরিক বিকাশ সুরু হয় সেদিন থেকে যেদিন প্রথম মাতৃগর্ভে তার প্রকৃত জন্ম হয় ভূমিষ্ঠ হবার প্রায় দশ মাস আগে। সেইজন্যই আধুনিক জীবতত্ত্ববিদেরা শিশুর মাতৃগর্ভে থাকাকালীন বিকাশপ্রক্রিয়া লক্ষ্য করাটাও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন। এই সব পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে মাতৃগর্ভস্থ ভ্রূণেরও উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দেবার ক্ষমতা যথেষ্ট থাকে। সে যে সাড়া দেয় তা তার সমস্ত দেহ দিয়ে এক ধরনের সামগ্রিক প্রক্রিয়ার (Mass Activity) রূপে এবং এ সময় বিশেষধর্মী সাড়া সে খুব বেশী দিতে পারে না। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করতেন যে শিশুর গর্ভকালীন আচরণ কতকগুলি বিশেষধর্মী প্রক্রিয়ার (Specific reactions) সমষ্টি মাত্র। কিন্তু আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলি একেবারেই বিশেষধর্মী নয়। সেগুলি এক

ধরনের বিশিষ্টতাবর্জিত সামগ্রিক প্রকৃতির আচরণ। পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার আচরণগুলি ধীরে ধীরে বিশেষায়িত হয়ে ওঠে।

উচ্চতা ও ওজনের বৃদ্ধি

ব্যক্তির আচরণ ও সঙ্গতিবিধানের স্বরূপ নির্ণয়ে তার শারীরিক সঞ্চালন-মূলক (motor) বিকাশের প্রভাব যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। শিশু যেমন বড় হতে থাকে তেমনই তার উচ্চতা এবং ওজনও বৃদ্ধি পায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বিভিন্ন দৈহিক অনুপাতের পরিবর্তন ঘটে এবং তার দেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গও বিভিন্ন হারে বৃদ্ধি পায়। এই শেষোক্ত ঘটনাটিই শিশুর আচরণের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

শিশুর জীবনের সুরুতে তার শারীরিক বৃদ্ধির হার বেশ দ্রুত থাকে কিন্তু যতই সে পরিণতির (Maturity) দিকে এগিয়ে যায় ততই এই বৃদ্ধির হার কমে আসতে থাকে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় প্রাপ্তযৌবনদের (Adolescent) ক্ষেত্রে। ছেলেমেয়েদের যখন যৌবন দেখা দেয় তখন তাদের শরীরের কোন কোন অঙ্গ অতি দ্রুত বাড়তে থাকে এবং অনেক ছেলেমেয়ের উচ্চতা ও ওজনের ক্ষেত্রে হঠাৎ বাড় বা আকস্মিক বৃদ্ধি (Spurt) দেখা দেয়। কিন্তু মাতৃগর্ভে জন্ম নেবার সময় থেকে ভূমিষ্ঠ হবার সময় পর্যন্ত তার উচ্চতা প্রায় ২০.৫ ইঞ্চিতে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর প্রথম দু'বছর উচ্চতা দ্রুত বাড়তে থাকে, কিন্তু দু'বছরের পর থেকে উচ্চতার বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমতে থাকে। ৫ বছর বয়সের সময় সাধারণ শিশু ২০.৫ ইঞ্চি উচ্চতা থেকে প্রায় ৪২ ইঞ্চি উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছয় এবং সতেরো-আঠারো বছর বয়সে তার উচ্চতা ৬৮.৫ ইঞ্চিতে দাঁড়ায়। এই বয়সের পর উচ্চতার আর বিশেষ বৃদ্ধি হয় না।

উচ্চতা বৃদ্ধির এই বিবরণটি পাশ্চাত্যদেশের ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণ থেকে নেওয়া। কয়েকটি উপজাতি ছাড়া অধিকাংশ ভারতীয়দের উচ্চতা পাশ্চাত্যবাসীদের উচ্চতার চেয়ে জাতিগতভাবেই কিছু কম। ফলে ভারতীয় ছেলেমেয়েদের যথাযথ পর্যবেক্ষণ করলে এই বিভিন্ন বয়সের উচ্চতার মাপ কিছু কম হওয়াই স্বাভাবিক।

শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক ধারণা

শিশুর আচরণের উপর তার শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি নানাদিক দিয়ে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিশেষ করে তার নিজের সম্বন্ধে ধারণা এবং অপরের

মনে সে যে ধারণার সৃষ্টি করে—এ ছুটি ব্যাপার বিশেষভাবে প্রভা
শিশুর নিজের শরীরের আয়তন ও দৈহিক শক্তির দ্বারা। প্রথম শৈশবে প্রায়
বয়স্ক লোকদের তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন থাকে।
তারপর যতই তার শারীরিক আকৃতি ও শক্তি বাড়তে থাকে ততই সেই
নিজেকে তার চেয়ে যারা ছোট তাদের চেয়ে এবং অতীতে সে নিজে যা ছিল
তার চেয়ে বড় বলে মনে করতে থাকে। এই ভাবে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি
তার নিজের সম্বন্ধে 'ছোট' বা 'বড়'র ধারণাকে অনেক দিক দিয়ে প্রভাবিত
করে। নিজের সম্বন্ধে এই 'ছোট' বা 'বড়'র ধারণা থেকেই অনেক সময়
কোন্ কাজ শিশুর পক্ষে করা উচিত এবং কোন্ কাজ তার করা উচিত নয়
তারও একটা মান তার মধ্যে জন্মায়। যেমন যখন সে 'ছোট' ছিল তখন সে
যে কাজ করতে পারত সে কাজ সে 'বড়' হয়ে উঠলে আর করতে পারে না।
শিশুর এই উচিত অনুচিতের বোধকেই যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে তাকে
সামাজিক রীতিনীতি ও অনুশাসনে দীক্ষিত করা হয়ে থাকে।

আবার শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি বয়স্কদের মনে শিশুর সম্বন্ধে ধারণাকে অনেক দিক দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। যেমন, যে শিশু শারীরিক আকৃতির দিক দিয়ে ছোট তাকে সাধারণত আমরা অসহায়, দুর্বল ইত্যাদি মনে করে তার প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ দিই। তেমনই আবার যে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি তার বয়সের তুলনায় বেশী তাকে আমরা বিশেষভাবে দেখাশোনার দরকার বলে মনে করি না এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তাকে রীতিমত স্বাধীনতা দেওয়া হয়ে থাকে। শিশুর প্রতি বয়স্কদের এই মনোভাব তার ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নির্ণয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

উচ্চতা বৃদ্ধির হার সব শিশুর ক্ষেত্রে সমান হয় না। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন বয়সে উচ্চতার বৃদ্ধি সর্বোচ্চ সীমায় গিয়ে পৌঁছয়।

আবার দেখা গেছে যে বিভিন্ন ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে বৃদ্ধির প্রকৃতিও সব সময়ে সমান হয় না। যেমন, যে সব মেয়ের রজঃসৃষ্টি দেরীতে হয়, তাদের চেয়ে যে সব মেয়েদের অল্পবয়সে রজঃসৃষ্টি হয় তারা বেশী লম্বা হয়।

বৃদ্ধির হার এবং ধারা বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হলেও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সেগুলির মধ্যে একটা মিল ও সমতা দেখা যায়। যেমন, যে সব মেয়েদের রজঃসৃষ্টি একই বয়সে হয়ে থাকে তাদের বৃদ্ধির হার প্রায় একই রকম হতে দেখা যায়। বিভিন্ন বয়সে যেমন বৃদ্ধির হারের মধ্যে বিভিন্নতা থাকে,

ধরনের বিশি বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৃদ্ধির হারের মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। সঙ্গে তার হস্ত বা পায়ের বৃদ্ধির হার মাথার বৃদ্ধির হারের চেয়ে অনেক বেশী। উচ্চ মেয়েদের শারীরিক বৃদ্ধির হার ছেলেদের চেয়ে কিছুটা দ্রুত। অর্থাৎ বছরের একটি মেয়ে ৮ বছরের একটি ছেলের চেয়ে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে অধিক পরিণত। এর একটি কারণ হল যে মেয়েদের যৌনপরিণতি ছেলেদের চেয়ে বেশ কিছু আগে ঘটে থাকে।

কঙ্কালগত বয়সের (Skeletal age) সাহায্যে বিভিন্ন বয়সে শিশুর শারীরিক বৃদ্ধির গতি ও হার নির্ণয় করা যায়। কঙ্কালগত বয়স বলতে বোঝায় বিভিন্ন সময়ে দেহের অন্তর্গত কঙ্কালের বৃদ্ধির বিভিন্ন স্তর বা পর্যায়। বহু ছেলেমেয়ের ক্ষেত্রে শরীরগত বয়স এবং কঙ্কালগত বয়সের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা গেছে।

আমাদের সামাজিক জীবনে ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের এই শারীরিক ও যৌনবৃদ্ধির দ্রুততার বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন স্বামী-স্ত্রীর বয়সের মধ্যে বেশ কিছুটা ব্যবধান রাখাটা আমাদের দেশে বহুদিনের অনুসৃত প্রথা। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ঘটনারও কিছুটা প্রভাব আছে। যেমন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে যে মেয়ে সে ঐ শ্রেণীতে পঠনরত ছেলেদের চেয়ে অনেক বেশী যৌনসচেতন এবং সেটা তার আচরণে স্পষ্টই প্রকাশ পেয়ে থাকে।

যৌবনাগমে শারীরিক পরিবর্তনের প্রভাব

যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। এই সময় তারা শরীর মন সব দিক দিয়ে পরিণত ব্যক্তি হবার পথে এগিয়ে যায়। তাদের মনে নানা দিক দিয়ে এমন সব পরিবর্তন দেখা দেয় যার ফলে পরিবেশের সঙ্গে তাদের পূর্বপ্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিবিধানের (Adjustment) পন্থাগুলি একেবারে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। তখন তারা পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের পন্থা নতুন করে শিখতে বাধ্য হয়।

যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের শরীরের আয়তনে এবং বিশেষ করে কয়েকটি বিশেষ অঙ্গের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিতান্ত আকস্মিকভাবে দেখা দেয়। এই সময় ছেলেমেয়েরা প্রজনন শক্তির অধিকারী হয় এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয়। শরীরের এই আকস্মিক বৃদ্ধি মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃসৃষ্টি এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে বীর্যোৎপাদন পর্যন্ত চলতে থাকে এবং তারপর থেকেই এই বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমতে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন গৌণ যৌন লক্ষণগুলি

(Secondary sexual characters) এই সময় ছেলেমেয়েদের দেহে আত্ম-প্রকাশ করে থাকে।

যৌবনাগমে এই আকস্মিক শারীরিক বৃদ্ধিতে ছেলেমেয়েরা এক বছরে প্রায় ৪ থেকে ৫ ইঞ্চি বেড়ে যায়, ওজনও একবছরে ১০।১২ কিলোগ্রামের মত বেড়ে থাকে। তাছাড়া হাত, পা ও নাক এগুলো সব আকারে বড় হয়ে যায়। এই সব আকস্মিক বৃদ্ধির ফলে আশেপাশের জনগণের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তাদের বেশ অসুবিধা হয়। যে শরীরটাকে সে এতদিন বেশ সুনিপুণভাবেই নিয়ন্ত্রিত করে আসছিল, সেই শরীরটি যেন হঠাৎ অসংহতভাবে ইতস্তত বেড়ে গিয়ে তার হাতের বাইরে চলে গেল। যতদিন না সে এই হঠাৎ বৃদ্ধির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে ততদিন সে একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে বাস করে।

শারীরিক বৃদ্ধির বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে যৌনপরিণতিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে যৌনপরিণতি বিভিন্ন বয়সে দেখা দেয়। এর ফলে শরীরের আয়তন ও উচ্চতার দিক দিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ত দেখা দেয়ই তাদের আচরণের মধ্যেও বেশ বৈষম্য প্রকাশ পায়। যে ছেলে বা মেয়ের যৌনপরিণতি আগে আগে দেখা দেয় তারা অন্যান্য ছেলে বা মেয়ের চেয়ে মনের দিক দিয়ে অনেক বেশী পরিণত হয়ে ওঠে। ফলে স্কুলে, লাইব্রেরীতে বা খেলার মাঠে সে তার সম-বয়সী সঙ্গী বা সঙ্গিনীদের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না।

যৌনপরিণতির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মনে অপরিহার্যভাবে দেখা দেয় যৌনবিষয়ে আগ্রহ। এই আগ্রহ নানারূপে প্রকাশ পায়। সাধারণত ছেলে-দের ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রতি ও মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ ও মনোযোগের রূপ নিয়েই এই আগ্রহ দেখা দেয়। যৌনবিষয়ে কৌতূহলও এই সময়ের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অবশ্য যৌন সচেতনতা যৌবনাগমেই যে প্রথম দেখা দেয় তা নয়, বাল্য-কালে বহুক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। ফ্রয়েডের সংব্যাখ্যান অনুযায়ী অতি শৈশব থেকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌন-প্রবৃত্তি সক্রিয়ভাবেই দেখা দেয়। তবে প্রকৃতির দিক দিয়ে এই শৈশব-কালীন যৌনবোধের সঙ্গে পরিণত বয়সের যৌনবোধের প্রচুর পার্থক্য থাকে।

প্রাপ্তযৌবনদের এই আকস্মিক দৈহিক বৃদ্ধি এবং যৌনপরিণতি তার

শিক্ষার উপর বেশ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। তার মানসিক ও প্রাক্ষোভিক দিকগুলির পরিবর্তন এই একই সময় দেখা দেয়। ফলে তার মধ্যে কতকগুলি অতি-প্রয়োজনীয় চাহিদার সৃষ্টি হয় এবং সেগুলির যদি যথাযথ তৃপ্তি না হয় তাহলে তা থেকে নানা জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়।

যৌবনাগমে যে সব যৌনমূলক আকাঙ্ক্ষা ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখা দেয় সেগুলিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত করার মত বিশেষ কোন আয়োজন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় নেই। সাধারণ পরিবারে বা প্রচলিত শিক্ষায়তনে প্রাপ্তযৌবনদের এই সব চাহিদাকে একরকম এড়িয়েই যাওয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নানা কঠোর সামাজিক ও নৈতিক অনুশাসনের দ্বারা তাদের সেই স্বাভাবিক চাহিদাগুলিকে অবদমিত করা হয়। এর ফলে অনিবার্যভাবে দেখা দেয় প্রাপ্তযৌবনদের মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তাদের সমস্ত শিক্ষা, মনোভাব ও ব্যক্তিসত্তার সংগঠন এই মানসিক দ্বন্দ্বের প্রভাবে বিশেষভাবে বিকৃত হয়ে ওঠে। উপযুক্ত শিক্ষক চেষ্টা করলে প্রাপ্তযৌবনদের এই গুরুতর জীবন সমস্যার সমাধানে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারেন। ভালো ভালো বই, প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা, নানারকম শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষক তাদের প্রকৃত চাহিদার স্বরূপটি তাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে তাদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি, স্থৈর্য ও উপলব্ধি সৃষ্টি করতে পারেন।

সঞ্চালনমূলক বিকাশ (Motor Development)

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পুষ্টি ও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর হাত, পা, পেশী ইত্যাদির সঞ্চালনে শক্তি, গতি এবং ত্রুটিহীনতা বৃদ্ধি পায়। একেই আমরা সঞ্চালনমূলক বৃদ্ধি (Motor Development) নাম দিয়ে থাকি। শিশুর মানসিক বৃদ্ধি অনেকখানি নির্ভর করে তার এই সঞ্চালনমূলক বৃদ্ধির উপর। হাত পা প্রভৃতি অঙ্গের সঞ্চালনের সাহায্যেই শিশু পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হয়, তার কৌতূহল তৃপ্ত করে এবং তার জ্ঞানের পরিধি বাড়ায়। তেমনই সামাজিক মনোভাবেরও পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয় অপরের সঙ্গে মেলামেশার মধ্যে দিয়ে এবং তাও অনেকাংশে নির্ভর করে সঞ্চালনমূলক বৃদ্ধির উপর। শিশুর প্রক্ষোভমূলক বিকাশও প্রচুর পরিমাণে তার সঞ্চালনমূলক বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। শিশুর সামর্থ্য, গতি, কৌশলশিক্ষা, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয়সাধন ইত্যাদির উপর নির্ভর করে শিশুর জীবনের ব্যর্থতা বা

সাফল্য। অতএব তার মানসিক বিকাশের প্রকৃতিও তার এই সঞ্চালনমূলক বিকাশের দ্বারা প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত হয়। এক কথায় শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির বিকাশ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তার সঞ্চালনমূলক দিকের বিকাশের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সত্যটি যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে শিশুর বুদ্ধির বিকাশ এবং তার সঞ্চালন-মূলক দিকের বিকাশের মধ্যে প্রায়ই মিল থাকে না। কোন শিশু হয়ত বুদ্ধির দিক দিয়ে বেশ উন্নত কিন্তু সঞ্চালনমূলক কৌশলে সে পশ্চাদ্‌পদ হতে পারে। আবার কেউ হয়ত বুদ্ধির দিক দিয়ে তেমন উজ্জ্বল নয় কিন্তু সঞ্চালনমূলক কৌশলে সে বেশ দক্ষ। অর্থাৎ যে শিশুর জ্ঞানমূলক শক্তির দিকটা (যেমন, বুদ্ধি, ভাষামূলক ক্ষমতা ইত্যাদি) দুর্বল সে সঞ্চালনমূলক শক্তির দিক দিয়ে তার সেই অক্ষমতাকে পূরণ করতে চেষ্টা করে। আবার যে সঞ্চালনমূলক কাজে অপটু সে তার জ্ঞানমূলক শক্তি দিয়ে তার সে অভাবটা মেটাতে চায়। ব্যক্তিসত্তা-সংগঠনের এই প্রয়োজনীয় তথ্যটি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সামগ্রিক ও বিশেষধর্মী আচরণ

শিশুর প্রথম শৈশবে বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন থাকে নিতান্ত এলোমেলো, সমন্বয়হীন এবং অসংহত। তার হাত পা নাড়ার মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই এবং সেগুলির কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্যও থাকে না। তারপর ধীরে ধীরে সেই অসংযত সঞ্চালন সুনিয়ন্ত্রিত ও সমন্বয়পূর্ণ হয়ে ওঠে। ক্রমশ শিশুর চোখ ও হাতের মধ্যে সমন্বয়ন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং শিশু হাতে করে জিনিষপত্র তুলে ধরতে শেখে।

তার চলাফেরাও ঠিক এই ভাবে প্রথম শৈশবের অসংহত ও অসংযত অঙ্গসঞ্চালন থেকে সুসংহত ও সুসমন্বিত আচরণ হয়ে ওঠে। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশু ২ মাসে থুতনিটা মাটি থেকে তুলতে পারে, ৪ মাসে কেউ ধরলে বসতে পারে, ৬ মাসে চেয়ারে বসিয়ে দিলে একা বসতে পারে এবং সামনে কিছু দোলালে হাত দিয়ে তা ধরতে পারে, ৭ মাসে একা একা বসতে পারে, ৮ মাসে সাহায্য পেলে দাঁড়াতে পারে, ৯ মাসে কোন কিছু ধরে দাঁড়াতে পারে, ১০ মাসে হামাগুড়ি দিতে পারে, ১১ মাসে অপরের হাত ধরে চলতে পারে, ১৩ মাসে একা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে, ১৪ মাসে বিনা অবলম্বনে দাঁড়াতে পারে এবং ১৫ মাসে একা একা চলতে পারে। (৯'র পাতার চিত্র দ্রষ্টব্য)

শিশুর এই সঞ্চালনমূলক বিকাশের বৈশিষ্ট্যই হল সাধারণধর্মী আচরণ থেকে বিশেষধর্মী আচরণে যাওয়া। প্রথম শৈশবে তার সমস্ত আচরণই থাকে সাধারণধর্মী, কোন বিশেষ সুনির্দিষ্ট কাজ করার ক্ষমতা তখন তার হয় না। কিন্তু যত সে বড় হয় তার এই সাধারণ প্রকৃতির আচরণগুলি ধীরে ধীরে বিশেষ প্রকৃতির আচরণে পরিণত হয়। তখন সে সুনির্দিষ্ট ও বিশেষ প্রকারের কাজ করতে সমর্থ হয়, যেমন সে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শেখে, চলতে শেখে, বুড়ো আঙ্গুলের ব্যবহার শেখে ইত্যাদি।

সে যখন আরও বড় হয় তখন এই বিশেষধর্মী আচরণগুলি জটিলতর ও মিশ্রধর্মী হতে সুরু করে। শিশু প্রথম দিকে বিশেষধর্মী আচরণগুলি স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্নভাবে আয়ত্ত করে, তার ক্রমবিকাশের পরের ধাপে ঐ আচরণগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় এবং শিশু জটিলতর বিশেষধর্মী আচরণ করতে সমর্থ হয়। যেমন, প্রথম শিশু 'দৌড়ান' রূপ বিশেষধর্মী আচরণটি সম্পন্ন করতে শিখল। তারপর 'বল ছোঁড়া' রূপ আর একটি বিশেষধর্মী আচরণ সম্পন্ন করতে শিখল। পরের ধাপে, সেই শিশু ক্রিকেট খেলার সময় 'দৌড়তে দৌড়তে বল ছোঁড়া' রূপ জটিলতর বিশেষধর্মী আচরণটি সম্পন্ন করতে শিখল।

ছেলে ও মেয়ের মধ্যে পার্থক্য

সঞ্চালনমূলক বিকাশের দিক দিয়ে ছেলেরা সমবয়সী মেয়েদের চেয়ে অনেক এগিয়ে যায়। ছেলেরা যত বড় হয় ততই শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কৌশলে মেয়েদের চেয়ে বেশী পটুতা দেখায়। এর কারণ হল যে, ছেলেরা সঞ্চালনমূলক আচরণের উপযোগী কতকগুলি বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে জন্মায় এবং মেয়েদের শারীরিক সংগঠনে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে যা দ্রুত অঙ্গসঞ্চালনে অসুবিধা সৃষ্টি করে। তাছাড়া আমাদের প্রচলিত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা অনুযায়ী শিশুকাল থেকেই ছেলেদের দৌড়ঝাঁপ ও নানাপ্রকৃতির খেলাধূলায় উৎসাহিত করা হয়ে থাকে এবং মেয়েদের ঐ ধরনের সঞ্চালনমূলক আচরণ থেকে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা করা হয়। এই সব কারণে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে সঞ্চালনমূলক আচরণে অগ্রগামী হয়ে থাকে। কিন্তু জটিল সঞ্চালনমূলক কাজের সব ক্ষেত্রেই যে ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে অগ্রগামী তা নয়। দেখা গেছে, যে সব জটিল কাজের সম্পাদনে নিছক দৈহিক শক্তির প্রয়োজন সে সব কাজ ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে


১১ মাস
হাত ধরে চলতে পারে
১৩ মাস
সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে
১৫ মাস
একা একা চলতে পারে
৯ মাস
কোন কিছু ধরে দাঁড়াতে পারে
১০ মাস
হামাগুড়ি দিতে পারে
৮ মাস
সাহায্য পেলে দাঁড়াতে পারে
৭ মাস
একা একা বসতে পারে
৬ মাস
চেয়ারে বসতে পারে এবং হাত দিয়ে জিনিষ ধরতে পারে
৪ মাস
ধরলে বসতে পারে
০ মাস
গর্ভস্থ অবস্থা
২ মাস
মুখ তুলতে পারে

অনেক দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু যে সব জটিল কাজে নিছক দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করতে হয় না সে সব কাজে অনেক ক্ষেত্রে মেয়েরা ক্ষিপ্রতায় ছেলেদের ছাড়িয়ে যায়। ম্যাকফারলেনের একটি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে একটা কাঠের চাকার বিভিন্ন অংশগুলি একত্রিত করে একটি পুরো চাকা তৈরী করার কাজে ছেলেরা দ্রুততায় মেয়েদের ছাড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু একটি পোষাকের বিভিন্ন অংশগুলি জোড়া দিয়ে পুরো পোষাকটা তৈরী করার কাজটা মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারল।

খেলা

শিশুর সঞ্চালনমূলক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের খেলা দেখা দেয়। তার বিভিন্ন বয়সের সঞ্চালনমূলক কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খেলারও প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। যেমন, প্রথম শৈশবে কেবলমাত্র হাত পা নাড়া, মুখে শব্দ করা ইত্যাদিতেই তার খেলা সীমাবদ্ধ থাকে। একটু বড় হলে যখন তার বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কাজের মধ্যে সমন্বয় দেখা দেয় তখন দৌড়ান, লাফান, টানাটানি করা, ধাক্কা মারা, ছোঁড়াছুঁড়ি করা এই সব কাজই তখন খেলার রূপ নেয়। এর পরের ধাপে তার খেলার মধ্যে জটিল এবং মিশ্রিত সঞ্চালনমূলক কাজ দেখা যায়, যেমন ফুটবল খেলা, ক্রিকেট খেলা ইত্যাদি। যৌবনাগমের সময় থেকে যৌথ ও সংগঠনমূলক খেলায় সে বেশী আনন্দ পায়।

শিশুর বৃদ্ধির প্রথম দিকে বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে খেলার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে কিন্তু ৮।৯ বৎসর বয়স থেকে দেখা যায় যে খেলার সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে। এর অর্থ এ নয় যে, বয়স বাড়তে থাকলে শিশুর খেলার সময় কমে আসে। বস্তুত যা হয় তা হল তার খেলার প্রকৃতিগত বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্য কমে যায়। একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে ৮ বছর বয়সে ছেলেরা ৪০ রকমের খেলা খেলে, ১৪ বছর বয়সে ২৫ রকম এবং ২২ বছর বয়সে ১৭ রকম। মেয়েদের ক্ষেত্রেও এইভাবেই বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলার প্রকৃতিগত বিচিত্রতার সংখ্যা ধীরে ধীরে কমে আসে।

বাঁ ও ডান হাতের ব্যবহার

এক বৎসর বয়সের সময় বহু ছেলেমেয়ের মধ্যে ডান হাতের চেয়ে বাঁ হাত বেশী ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু বড় হলে তাদের অধিকাংশই আর সকল ছেলেমেয়ের মত ডান হাতের উপরই নির্ভর করতে

থাকে। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে ঐই সব শিশুর বাঁ হাত থেকে ডানহাতে পরিবর্তন করাটা তাদের পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতিদের চাপে সংঘটিত হয়ে থাকে এবং যদি এই চাপ না দেওয়া হত তাহলে পৃথিবীতে ন্যাটা বা বাম-হস্ত-নির্ভর মানুষের সংখ্যা আরও বেশী হত। তাঁদের মতে যে সব শিশুর মধ্যে ছেলেবেলা থেকে বাঁ হাত বেশী ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা যায় তাদের চাপ দিয়ে ডান হাত ব্যবহার করতে বাধ্য করা মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে উচিত নয়।

বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক দিক

বিভিন্ন সঞ্চালনমূলক কাজগুলির মধ্যে বিশেষ কোন পারস্পরিক সম্পর্ক নেই। যদি কেউ কোন একটি বিশেষ সঞ্চালনমূলক কাজে দক্ষ হয় তাহলে সে যে অন্য একটি সঞ্চালনমূলক কাজে দক্ষ হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। এইজন্যই স্কুল কলেজে কতকগুলি সীমাবদ্ধ খেলাধূলার আয়োজন রাখলে শিশুর সঞ্চালনমূলক বিকাশের প্রয়োজনীয়তা মিটবে না। যাতে শিশু বিভিন্ন ধরনের সঞ্চালনমূলক কাজের অনুশীলন করতে পারে তার জন্য নানা ধরনের খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

দুই

মানসিক বিকাশ (Mental Development)

নবজাত মানবশিশুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার পরম অসহায়তা ও অপরের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা। বয়স্কদের সাহায্য ও যত্ন ছাড়া সে বাঁচতেই পারে না। বাঁচার জন্য যা কিছু আচরণ করা তার পক্ষে অপরিহার্য সেগুলির অধিকাংশই তার অজ্ঞাত থাকে এবং পরিবেশের প্রভাবে এসে তাকে সেগুলি ধীরে ধীরে শিখতে হয়। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের বাঁচবার উপযোগী অধিকাংশ আচরণই জন্ম থেকে শেখা থাকে এবং তার ফলে তাদের ক্ষেত্রে শিখনের প্রয়োজনীয়তা অপেক্ষাকৃত কম।

কিন্তু যদিও মানবশিশু জন্মের সময় অসহায় ও পরনির্ভরশীল থাকে, তবু সে কতকগুলি সহজাত আচরণ করার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। এগুলিকে রিফ্লেক্স নাম দেওয়া হয়েছে,—যেমন, চমকে ওঠা, গিলে ফেলা, কোন জিনিস ধরা, হাঁচা, কাশা ইত্যাদি। তাছাড়া পরিপাচন ক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন, হৃৎস্পন্দন ইত্যাদি শরীরতত্ত্বমূলক আচরণগুলিও এ পর্যায়ে পড়ে। এছাড়াও কতকগুলি সহজাত আচরণ আছে যেগুলিকে আমরা প্রবৃত্তিজাত আচরণ[১] নাম দিয়েছি।

কিন্তু কেবলমাত্র এই সহজাত আচরণগুলিই তার বাঁচার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। সন্তোষজনক জীবনযাপনের জন্য তাকে বহু নতুন আচরণ ও কাজ শিখতে হবে এবং সেই সব শেখার উপযোগী যথেষ্ট মানসিক শক্তি ও সাজসরঞ্জাম নিয়েই সে জন্মেছে। অর্থাৎ এক কথায় শিশু মাত্রেই শিখনের ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। এই শিখনের ক্ষমতাই হল শিশুর মনের একটা বড় উপাদান এবং শিশুর মানসিক প্রক্রিয়ার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল এই শিখন ক্ষমতার ক্রমবিকাশ।

এই শিখন ক্ষমতার ক্রমবিকাশের ধারা বুঝতে হলে শিশুর চিন্তন, কল্পন, বিচারকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলির ক্রমবিকাশ ভাল করে পর্যবেক্ষণ করা অত্যাবশ্যক। এই সঙ্গে আর একটি বস্তুরও পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য। সেটি হল শিশুর বুদ্ধি ও অন্যান্য বিশেষধর্মী মানসিক শক্তির ক্রমবিকাশ। এই পরিচ্ছেদে আমরা শিশুমনের এই বৈশিষ্ট্যগুলিরই আলোচনা করব। মনের আর একটি

১। প্রথম খণ্ড, পৃ: ৩১

গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি। সেই দিকটির বিকাশ সম্পর্কে আমরা পরের অধ্যায়ে আলোচনা করব।

অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের স্তর

জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাহ্যিক উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে শিশু যে প্রাথমিক অনুভূতি আহরণ করে মনোবিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন সংবেদন (sensation)। এই সংবেদন নিছক শিশুর শারীরিক অভিজ্ঞতার স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে।. কিন্তু অতি শীঘ্রই এটি প্রত্যক্ষণে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং মানসিক অভিজ্ঞতার রূপ গ্রহণ করে। এই প্রত্যক্ষণের সৃষ্টিকেই শিশুর মানসিক বিকাশের প্রথম সোপান বলা চলে।

প্রত্যক্ষণ বলতে বোঝায় সংবেদনের সংব্যাখ্যাত রূপ। প্রথম স্তরে শিশুর সমস্ত সংবেদন একটি অবিচ্ছিন্ন একক অভিজ্ঞতার রূপে থাকে কিন্তু ক্রমশঃ শিশু মনে মনে তার সংবেদনগুলির একটা ব্যাখ্যা বা অর্থ করে নেয় এবং তারই সাহায্যে সে একটি সংবেদন থেকে আর একটি সংবেদনকে পৃথক করে নিতে পারে। এই স্তরকে আমরা শিশুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের স্তর বলতে পারি। মানসিক বিকাশের এই স্তরে শিশু ক্রমশঃ বিভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে এবং তার ফলে ধীরে ধীরে তার মনের পরিধি বা প্রসার বাড়াতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যেমন প্রথম প্রথম বিভিন্ন রঙ বা শব্দ তার কাছে একই ধরনের প্রত্যক্ষণ সৃষ্টি করত, কিন্তু যত তার মানসিক পরিধি বাড়তে থাকে তত সে বিভিন্ন রঙ বা বিভিন্ন শব্দ থেকে জাত প্রত্যক্ষণগুলির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে সমর্থ হয়। তাছাড়া প্রথম শৈশবে শিশুর বিভিন্ন ইন্দ্রিয়গুলি পূর্ণভাবে কর্মক্ষম থাকে না। ফলে তার অভিজ্ঞতাগুলিও হয় অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। কিন্তু সময়ের অতিবাহনের সঙ্গে সঙ্গে তার ইন্দ্রিয়গুলি ধীরে ধীরে পুষ্ট হয়ে ওঠে এবং তার অভিজ্ঞতাগুলি সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত রূপ ধারণ করে। এই অভিজ্ঞতা অর্জনের স্তরে তার চাক্ষুষ ইন্দ্রিয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। শিশুর অভিজ্ঞতাগুলি যতই সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট হয়ে থাকে ততই সেগুলি ধীরে ধীরে সাধারণধর্মী থেকে বিশেষধর্মী হয়ে ওঠে।

শিখন (Learning)

এই অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের স্তরে শিশু তার পুরাতন অভিজ্ঞতা নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে শেখে। এই সময় থেকেই হল শিশুর শিখনের সুরু। শিশু যত ছোট থাকে তত তার প্রতিক্রিয়া বর্তমানের ঘটনাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু

যত সে বড় হয় ততই সে সময় ও স্থান উভয়ের দিক দিয়েই দূরত্বসম্পন্ন ঘটনার প্রতি সাড়া দিতে পারে। যেমন, অতীতের মায়ের বকুনীর কথা ভেবে শিশু হয়ত কাঁচের আলমারিতে হাত দেওয়া বন্ধ করল, কিংবা প্রবাসী পিতার ছবি দেখে শিশু হয়ত আনন্দ প্রকাশ করতে সুরু করল ইত্যাদি। শিশু আরও যখন বড় হয় তখন ভবিষ্যতের প্রত্যাশাও তার আচরণকে এইভাবে প্রভাবিত করতে সুরু করে। যেমন, পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে প্রশংসা পাবার প্রত্যাশায় সে মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে আরম্ভ করে। এইভাবে শিশুর সময়গত ও স্থানগত ধারণার পরিধি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে।

প্রতীক-ব্যবহারের স্তর

শিশুর মন যত পুষ্টিলাভ করে তত সে তার বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করার ক্ষমতা অর্জন করে। সময় এবং স্থানের দিক দিয়ে অনুপস্থিত ঘটনা বা বস্তুর প্রতি সাড়া দেওয়া থেকে সে শেখে তার সামনে অনুপস্থিত বস্তুকে কোন প্রতীক (symbol) দিয়ে বোঝাতে। যেমন, ক্ষুধায় ক্রন্দনরত শিশু মাকে দেখেই কান্না থামাল। এখানে মা নিজে তার খাদ্য নন। মা হলেন তার খাদ্যের প্রতীক মাত্র, কেননা মা দেখা দিলেই খাবার আসবে। এইভাবে প্রতীকের ব্যবহার করতে সমর্থ হওয়াটা মানসিক অগ্রগতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় ও নতুন আচরণ-শিক্ষার পক্ষে প্রতীক ব্যবহার একটি অপরিহার্য উপাদান।

শিশু যে কেবল প্রতীকের প্রতি সাড়া দিতে শেখে তা নয়, প্রতীকের সাহায্যে সে আচরণ করতেও শেখে। ইতিপূর্বে সে মূর্ত বস্তু ছাড়া চিন্তা করতে পারত না, এখন থেকে সে তার চিন্তায় অমূর্ত বস্তু ব্যবহার করতে শেখে। যেমন, ছুটি পেলে কি ভাবে সে দিনটা কাটাবে তার পরিকল্পনা সে এখন মনে মনে করে। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই পরিকল্পনার ক্ষমতা শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে এবং দূরস্থিত কোন লক্ষ্যকে উদ্দিষ্ট করে সে কাজ করার ক্ষমতাও আহরণ করে।

এই সব মানসিক বিকাশগুলির অবশ্য কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই বা সেগুলি আকস্মিকভাবেও শিশুর মধ্যে দেখা দেয় না। প্রতিটি মানসিক প্রক্রিয়া ধীরে ধীরে অত্যন্ত অপরিণত অবস্থা থেকে বিকাশ লাভ করে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি সুপুষ্ট হয়ে ওঠে। অবশ্য শিশুর ক্ষেত্রে নানা কারণে সব প্রক্রিয়াই সমানভাবে পুষ্টি লাভ করে না এবং সেইজন্যই মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে এত প্রভেদ দেখা যায়।

ভাষার বিকাশ

শিশুর মানসিক অগ্রগতির দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হল তার ভাষার বিকাশ[১]। শিশুর ভাষার বিকাশকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে, যেমন রিফ্লেক্স্ স্তর, অনুকরণ-পুনরাবৃত্তির স্তর, অর্থবোধের স্তর, ভাষাসচেতনতার স্তর, বাক্য-কথন স্তর এবং লিখন-পঠনের স্তর। জন্মের প্রথম বছর থেকেই শিশু অর্থহীন শব্দ উচ্চারণ করতে সুরু করে এবং তারপর তার সেই অর্থহীন শব্দগুলি ধীরে ধীরে তার পরিবেশের বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু, কাজ, ঘটনা ইত্যাদির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গিয়ে তার কাছে নানা অর্থসম্পন্ন হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বৎসরেই সে বয়স্কদের ব্যবহৃত বহু শব্দ নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করে নেয় এবং তিন বছর বয়সেই সে বেশ ভালভাবেই কথা বলতে শেখে। আরও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে জটিল বাক্য, বাক্যধারা, প্রবাদ ইত্যাদি ব্যবহার করতে সমর্থ হয় এবং তার পরিবেশ থেকে সুযোগমত শব্দ চয়ন করে তার ক্ষুদ্র শব্দ-ভাণ্ডারটি ক্রমশ সে সমৃদ্ধ করে তোলে। পড়তে পারা, লিখতে পারা, চিত্রমূলক ভাষা (যেমন, ম্যাপ, চার্ট, নক্সা ইত্যাদি) ব্যবহার করা প্রভৃতি জটিলতর কাজগুলি শিশু শেখে আরও কয়েক বৎসর পরে। এগুলি পুরোপুরি শিশুর মানসিক বৃদ্ধির উপরই নির্ভর করে না, অনেকখানি নির্ভর করে সমাজে প্রচলিত প্রথা ও পদ্ধতির উপর। তবে সাধারণত সমস্ত সভ্যসমাজে শিশু ছ'বছর বয়স থেকে পড়তে এবং সাত-আট বছর বয়স থেকে লিখতে শেখে।

ধারণার বিকাশ

শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হল তার মধ্যে ধারণার (concept) বিকাশ[২]। উন্নত চিন্তনের পক্ষে ধারণার ব্যবহার অপরিহার্য। ধারণা বলতে বোঝায় কোন একটি বস্তুর জাতি বা শ্রেণী সম্পর্কে একটা সামগ্রিক বোধ। যেমন, শিশু জ্ঞান হবার পর থেকে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন আকৃতি, বর্ণ ও প্রকৃতির কয়েকটি গরু দেখল। সেগুলি প্রথম দিকে তার কাছে থাকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথক পৃথক কতকগুলি প্রাণীরূপে। কিন্তু যখন গরুর জাতি বা শ্রেণী সম্বন্ধে তার মধ্যে একটা সামগ্রিক বোধ জন্মায় তখন সে সেই বিচ্ছিন্ন জন্তুগুলিকে 'গরু' এই একটি কথার দ্বারা বোঝাতে সমর্থ হয়। এই ধারণার গঠনে দুটি মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয়, যথা পৃথকীকরণ

১। পৃ: ২৩৫ ২। পৃ: ২১৮

(Abstraction) ও সামান্যীকরণ (Generalisation)। শিশুর মানসিক পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এই দুটি প্রক্রিয়াও সুপরিণত হয়ে ওঠে এবং শিশু নানা জটিল ধারণা গঠন করতে সমর্থ হয়। কতকগুলি বিশেষ ধরনের এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ জটিল ধারণা এই সময় শিশুর মনে গঠিত হয়। সেগুলি হল কার্য ও কারণের ধারণা, সময়ের ধারণা এবং স্থানের ধারণা। অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের স্তরে শিশু বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাগুলির স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে। কিন্তু সে-গুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করতে শিশু শেখে আরও পরে। বিশেষ করে শিশু দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে তখনই যখন তার মধ্যে উন্নত চিন্তার ক্ষমতা দেখা দেয়।

সর্বপ্রাণবাদ (Animism)

প্রথম শৈশবে শিশুর কাছে থাকে সবই প্রাণবন্ত, সজীব। সে সমস্ত ঘটনারই ব্যাখ্যা করে তার এই সর্বপ্রাণবাদমূলক (animistic) ধারণার দ্বারা। যেমন বলটা মাটিতে গড়াচ্ছে, বেলুনটা উড়ছে, বইটা টেবিল থেকে পড়ে গেল, আকাশে মেঘ চলছে--এ সব ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা করার সময় শিশু বল, বেলুন, বই, মেঘ ইত্যাদি বস্তুগুলিকে জীবন্ত প্রাণী বলে মনে করে। কিন্তু শিশু আরও একটু বড় হলে, প্রায় ৫।৬ বৎসর বয়স থেকে তার এই সর্বপ্রাণবাদ-মূলক ধারণা কমতে থাকে এবং প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে বিবিধ ঘটনার সে ব্যাখ্যা করতে শেখে। ডুৎসে'র (Deutsche) পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে কিণ্ডারগার্টেনের বয়স থেকেই ছেলেমেয়েরা প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করতে সমর্থ হয়। তবে শিশু সত্যকারের তর্কবিদ্যা-ভিত্তিক এবং বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দিতে পারে সেইসব ঘটনারই যেগুলি তার বোধশক্তির পরিসীমার মধ্যে পড়ে।

সময় ও স্থানের ধারণা

কাকে অতীত বা বর্তমান বা ভবিষ্যৎ বলে এ ধরনের বিভিন্ন সময় সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা বা জ্ঞানগুলি বিভিন্ন কালবোধক কাজ থেকেই শিশু আহরণ করে থাকে। যেমন, সে চলে গেছে, সূর্য ডুবে গেছে, পরে যাব, এখন যাচ্ছি, এই ধরনের উক্তিগুলি থেকেই শিশুর মধ্যে বিভিন্ন কালের ধারণা তৈরী হয়। বিশেষ করে 'তখন', 'এখন', 'পরে' এই সব কালবোধক উক্তি বিভিন্ন সময় সম্বন্ধে শিশুর জ্ঞানসৃষ্টিতে বিশেষ সাহায্য করে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে যে

ন'দশ বৎসর বয়সের আগে ঐতিহাসিক সময় সম্পর্কে ধারণা গঠন করা শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না এবং সে সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা জন্মাতে তার আরও বেশী সময় লাগে। সাধারণত বিদ্যালয়ে ইতিহাসের সাল, তারিখ বা তাম্রযুগ, প্রস্তরযুগ ইত্যাদি প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগ-বিভাগ শিশুদের মুখস্থ করতে বাধ্য করা হয় বটে কিন্তু এ সবের ধারণা তাদের কাছে নিতান্তই অর্থহীন থেকে যায়। বস্তুত সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর আগে শিশুদের যে সব ইতিহাস পড়ান হয় সেগুলি তাদের কাছে গল্পকাহিনীর চেয়ে কোন অংশে বেশী অর্থপূর্ণ বলে বোধ হয় না। পিস্‌টরের (Pistor) একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে ঐতিহাসিক সময়ানুক্রম সম্পর্কে ধারণার বিকাশ বিশেষ করে নির্ভর করে শিশুর দৈনিক অভিজ্ঞতা কতখানি তার মনকে পরিণত করতে পারল তার উপর। শিশুর স্থান সম্পর্কেও ধারণার সৃষ্টি হতে সুরু হয় বেশ শৈশবকাল থেকে। স্থানের ধারণা সাধারণত জন্মায় গতি বা সঞ্চালন থেকে এবং যে দিন থেকে শিশু চলাফেরা করতে সুরু করে সেদিন থেকেই অস্পষ্টভাবে তার মধ্যে জন্ম নেয় স্থানের ধারণা। পরে ধীরে ধীরে সে অধিকৃত স্থান এবং শূন্য স্থানের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারে।

সামাজিক সচেতনতা

প্রথম শৈশবে শিশু থাকে অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক এবং একান্তভাবে নিজের ব্যাপারেই ব্যাপৃত। ১ বছর বয়স থেকে অপরের প্রতি তার অনুরাগ জাগতে সুরু করে। কিন্তু বিদ্যালয়-জীবন সুরু হওয়া থেকেই তার মধ্যে প্রকৃত সামাজিক দল সম্বন্ধে ধারণা জন্মায় এবং আর সকলের সঙ্গে সে দল বাঁধতে শেখে। কিন্তু প্রথম দিকে সে যে সব দল বাঁধে সেগুলি থাকে আকারে ছোট। তার প্রধান কারণ হল যে এই সময় সংঘ, রাষ্ট্র, সমাজ, ইত্যাদি বৃহত্তর সামাজিক সংগঠন সম্বন্ধে তার মনে কোন পরিষ্কার ধারণা জন্মায় না।

কল্পন ও দিবাস্বপ্ন

চিন্তন হল প্রতীকমূলক আচরণ। আমরা চিন্তনের সময় মূর্ত বস্তুর পরিবর্তে তার কোন না কোন প্রতীকের ব্যবহার করি। শিশু বেশ শৈশব থেকেই চিন্তা করতে পারে। কিন্তু সে চিন্তা মূলত প্রতিরূপের (Image) উপর নির্ভরশীল। প্রতিরূপও একধরনের প্রতীক, মূর্ত বস্তুর মানসিক ছবি মাত্র। প্রথম দিকে শিশু এই ধরনের মানসিক ছবির সাহায্যেই চিন্তা করে। নিছক প্রতিরূপ-ধর্মী চিন্তনকেই কল্পনা (Imagination) বলা হয়। অতএব শিশুর প্রাথমিক চিন্তন

হল প্রতিরূপমূলক এবং কল্পনধর্মী। এই সময়েই শিশুর মনোজগৎ জুড়ে থাকে দিবা-স্বপ্ন ও অলীক কল্পনা (Make-believe)। দিবা-স্বপ্ন দেখার অভ্যাস শিশুর মধ্যে যৌবনাগম পর্যন্ত বেশ তীব্রভাবেই বর্তমান থাকে এবং বহু ব্যক্তির ক্ষেত্রে সারাজীবনই থেকে যায়। দিবাস্বপ্ন ও অলীক কল্পনা শিশুর দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক দিকগুলির মধ্যে সমন্বয় আনে এবং তার মধ্যে প্রক্ষোভমূলক সমতার সৃষ্টি করে। শিশু তার বহুবিধ অপূর্ণ চাহিদার আংশিক তৃপ্তি এই ধরনের অলীক কল্পনার মধ্যে দিয়ে লাভ করে এবং তা থেকে তার বাস্তব জীবনের নানা নতুন ধরনের খেলা ও আচরণ জন্ম নেয়। সময় সময় দিবাস্বপ্ন শিশুকে বাস্তব জগৎ থেকে পলায়নে সাহায্য করে বটে, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে বাস্তব সমস্যার সঙ্গে সংঘর্ষে নামার আগে প্রাথমিক প্রস্তুতিরূপেও দিবাস্বপ্ন কাজ করে থাকে।

চিন্তনের বিকাশ

শিশু প্রকৃত চিন্তন করতে পারে তখনই যখন থেকে সে ভাষার ব্যবহার করতে শেখে। ভাষা হল চিন্তন প্রক্রিয়ার একটি শক্তিশালী বাহন। ভাষা ব্যবহারের পরের ধাপে শিশু শেখে ধারণা (concept) গঠন করতে এবং যখন থেকে সে ধারণা গঠনে সমর্থ হয় তখন থেকেই সে উন্নত ধরনের চিন্তন করতে পারে। চিন্তনের মধ্যে শিশু যত বেশী ধারণার ব্যবহার করতে পারে ততই তার চিন্তন জটিল ও উন্নত হয়ে ওঠে। ভাষা ও ধারণার ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে চিন্তনের মধ্যে প্রতিরূপের ব্যবহার ক্রমশ কমে আসতে থাকে।

বিচারকরণের বিকাশ

বিচারকরণ হল সমস্যামূলক চিন্তন। সাধারণ চিন্তন প্রক্রিয়া বেশ পুষ্ট হলে বিচারকরণের ক্ষমতা দেখা দেয়। শৈশবে দু'চারটি ছোটখাট সমস্যার সমাধান করার ক্ষমতা থাকলেও যাকে আমরা তর্কবিজ্ঞানসম্মত বিচারকরণ বলি তা শিশুর মধ্যে ৭।৮ বছর বয়সের আগে দেখা দেয় না।

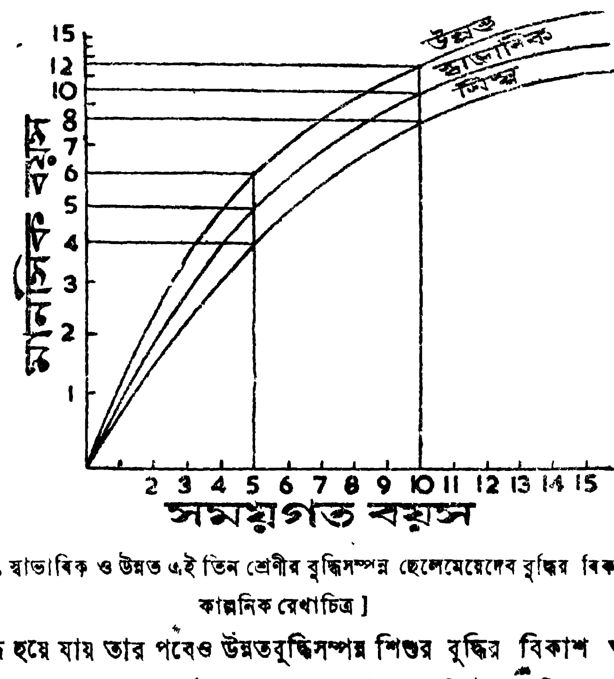
বুদ্ধি ও অন্যান্য মানসিক শক্তি

শিশুর সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়ার পিছনে যে সাধারণধর্মী মানসিক শক্তিটি কাজ করে তার নাম বুদ্ধি। বুদ্ধির স্বল্পতা বা প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে শিশুর বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির কার্যকারিতার মান ও মাত্রা। চিন্তন, বিচারকরণ, ধারণাগঠন প্রভৃতি উন্নত স্তরের মানসিক প্রক্রিয়াগুলির কার্যকারিতা বিশেষভাবে নির্ভর করে বুদ্ধির উপর।

এটি একটি প্রমাণিত সত্য যে সমস্ত শিশু সমান মানসিক শক্তি বা বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় না। মানসিক কাজ সম্পন্ন করার শক্তির দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে যে বিরাট পার্থক্য দেখা যায় তার মূলে আছে বুদ্ধির দিক দিয়ে এই ব্যক্তিগত বৈষম্য। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধি পরিমাপের নির্ভরযোগ্য যন্ত্র আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তার সাহায্যে বর্তমানে শিশুর বুদ্ধির পরিমাপ করা এবং তার বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়াগুলির কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা গঠন করা সম্ভব হয়েছে।

বুদ্ধির বিকাশের একটি বিশেষ গতিপথ ও সীমারেখা আছে। বহু পর্যবেক্ষণ থেকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে সাধারণভাবে ১৫ থেকে ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুর বুদ্ধি বাড়ে এবং তার পরেই বুদ্ধির বৃদ্ধিতে ছেদ ঘটে। অর্থাৎ সেই সীমারেখার পর আর বুদ্ধি বাড়ে না।

অবশ্য বুদ্ধির হার সব শিশুর ক্ষেত্রে সমান হয় না। উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বুদ্ধির বিকাশের হার স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বুদ্ধির বিকাশের হারের চেয়ে অনুপাতে কম থাকে। কিন্তু পরে স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বুদ্ধির বিকাশ



[নিম্ন, স্বাভাবিক ও উন্নত এই তিন শ্রেণীর বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির বিকাশের কাল্পনিক রেখাচিত্র]

যখন বন্ধ হয়ে যায় তার পরেও উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বুদ্ধির বিকাশ অব্যাহত থাকে। অবশ্য কোন বয়সেই স্বল্পবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর বৃদ্ধি উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিশুর

বুদ্ধির চেয়ে প্রকৃতপক্ষে বেশী হয় না (১৯ পাতার চিত্র দ্রষ্টব্য)। আর মধ্যধী শিশু বা যাকে আমরা সাধারণ (average) শিশু বলি তার বুদ্ধির বিকাশের হার এই দুই শ্রেণীর শিশুর বুদ্ধির বিকাশের হারের মাঝামাঝি হয়ে থাকে।

তিন

প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development)

ইংরাজী ইমোসন (Emotion) কথাটি এসেছে, ল্যাটিন ধাতু ইমোভেয়ার (Emovere) থেকে, যার অর্থ হল উত্তেজিত হওয়া বা প্রক্ষুব্ধ হওয়া। অতএব ইমোসন বা প্রক্ষোভ বলতে বোঝায় এমন একটি মানসিক অবস্থা যা ব্যক্তিকে উত্তেজিত বা প্রক্ষুব্ধ করে তোলে। বস্তুত যখন কোন ব্যক্তি প্রক্ষোভের দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন সে দেহে মনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তার স্বাভাবিক সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায়।

এই প্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা যেমন তার কাজের পেছনে শক্তি জোগায় তেমনই তার আচরণের প্রকৃতিকেও নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুত মানব আচরণের স্বরূপ বুঝতে হলে তার প্রক্ষোভের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া অপরিহার্য। বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর শিক্ষার অগ্রগতি, তার মানসিক সংগঠন, আর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ—এ সবই বিশেষভাবে নির্ভর করে তার প্রক্ষোভের সুষম বিকাশের উপর।

সাধারণত রাগ, ভয়, আনন্দ, দুঃখ, বিরক্তি, ঘৃণা ইত্যাদি শব্দের দ্বারা যে সব উত্তেজিত বা বিচলিত মানসিক অবস্থাকে বোঝায় সেগুলিকেই আমরা প্রক্ষোভ নাম দিয়ে থাকি। বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে প্রাক্ষোভিক আচরণ অগণিত হতে পারে। এমন অনেক জটিল প্রক্ষোভধর্মী অনুভূতি আছে যার সুনির্দিষ্ট কোন নাম দেওয়া আজও সম্ভব হয়নি।

প্রাক্ষোভিক অভিজ্ঞতামাত্রেই শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার প্রতিক্রিয়ার মিশ্রণ। প্রক্ষোভের মানসিক দিকটি হল বিশেষ একটি মানসিক অনুভূতি, যেমন, রাগ, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি। আর এর শারীরিক দিকটি হল ব্যক্তির শরীরের উপর অটোনমিক স্নায়ুতন্ত্র নামে বিশেষ একটি স্নায়ুগুচ্ছের কাজ থেকে জাত নানা ধরনের শারীরিক প্রক্রিয়া যেমন, বিশেষ বিশেষ গ্রন্থিরসের নিঃসরণ, রক্ত সঞ্চালনের দ্রুততা, হৃৎস্পন্দনের গতিবেগের বৃদ্ধি দেহের শর্করাক্ষরণের হারের বৃদ্ধি ইত্যাদি।

আদিম বা মৌলিক প্রক্ষোভ (Primary or Basic Emotion)

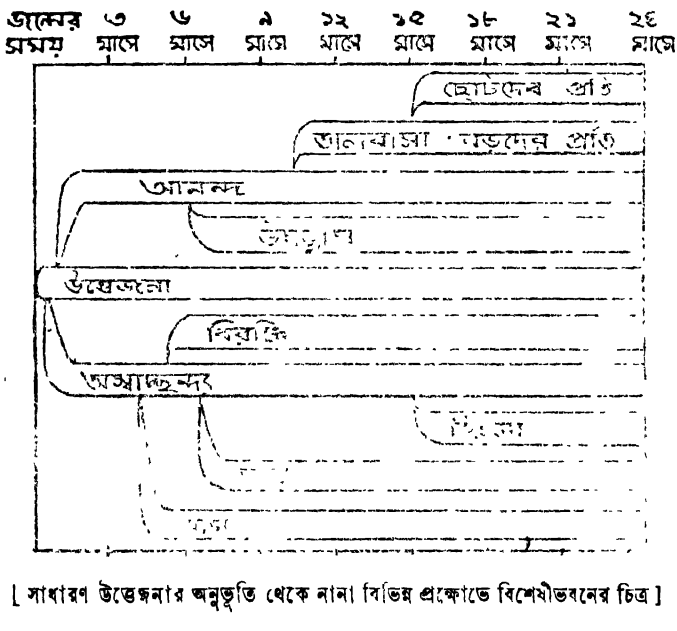
নবজাত শিশু কি ধরনের এবং কটি প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায় এ নিয়ে দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীরা বহুদিন ধরেই গবেষণা করে আসছেন। ডেকার্ট (Descarte) বিস্ময়, ভালবাসা, ঘৃণা, কামনা, আনন্দ ও দুঃখ—এই ছ'টি মৌলিক প্রক্ষোভের কথা বলেছেন। অন্যান্য দার্শনিকেরাও মৌলিক প্রক্ষোভের অনুরূপ তালিকা ইচ্ছামত পেশ করেছেন। কিন্তু সেগুলি নিছক স্বকপোলকল্পিত, বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত নয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষণের সাহায্যে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভগুলি নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। ওয়াটসনের মতে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভ বলতে তিনটি—ভয়, রাগ এবং ভালবাসা। ভয় জাগে মাত্র দুটি কারণ থেকে, উচ্চশব্দ এবং আকস্মিক পতন। রাগ জাগে শিশুর স্বাভাবিক দেহ সঞ্চালনে কোন বাধার সৃষ্টি করা হলে এবং ভালবাসা বা আনন্দ জাগে শিশুকে যখন আদর করা হয়। ওয়াটসন তাঁর একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের মাধ্যমে এই মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হন। শারমান (Sherman) কিন্তু ওয়াটসনের এই তত্ত্বের বিরোধিতা করেন। তিনি কয়েকটি পরীক্ষণের দ্বারা প্রমাণিত করেন যে শিশুর প্রতিক্রিয়াগুলি এতই সাধারণধর্মী যে কোন্ প্রক্ষোভের কোন্‌টি প্রতিক্রিয়া তা বাইরে থেকে কখনই বোঝা যায় না।

শৈশবে প্রক্ষোভমূলক আচরণ যে নিতান্তই সাধারণধর্মী থাকে এ সিদ্ধান্ত আজকাল সকল মনোবিজ্ঞানীই সমর্থন করেন। ক্যাথারিন ব্রিজেস Katherine Bridges) একাধিক পরীক্ষণের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এক-ধরনের সাধারণ প্রকৃতির উত্তেজনামূলক অবস্থাকেই শিশুর আদিম প্রক্ষোভ বলে বর্ণনা করা যায়। দেখা গেছে যে, শিশুর উপর যে কোন শ্রেণীর উদ্দীপক প্রয়োগ করা হোক্ না কেন শিশুর উত্তেজিত হওয়ার প্রকৃতিটি প্রায় সবক্ষেত্রে একই প্রকারের হয়ে থাকে।

শিশুর জন্মের প্রথম দিনগুলিতে চেঁচান, কাঁদা, হাত পা ছোঁড়া ইত্যাদি আচরণগুলি দেখলে মনে হয় যে সেগুলির পেছনে প্রক্ষোভের যথেষ্ট প্রভাব আছে। কিন্তু এই আচরণগুলি এতই সাধারণধর্মী যে এগুলি থেকে প্রক্ষোভের প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করা চলে না। বস্তুত এটা একটা বিরাট মনো-বৈজ্ঞানিক ভুল হবে যদি আমরা রাগ, আনন্দ, দুঃখ ইত্যাদি বয়স্কসুলভ প্রক্ষোভগুলির দ্বারা শিশুর আচরণগুলি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি।

প্রক্ষোভের বিশেষীভবন

শিশু যত বড় হয় তত তার আচরণগুলি বিশেষায়িত হয়ে থাকে। এই সময় থেকে শিশুর প্রাথমিক সাধারণধর্মী উত্তেজনার অনুভূতিটি পর্বত-অবতীর্ণা স্রোতস্বতীর মত নানা বিশেষধর্মী প্রক্ষোভের শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে যায়। প্রক্ষোভের এই বিশেষায়িত হয়ে যাওয়াটা শিশুর বাহ্যিক অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পায়। গুডএনাফের (Goodenough) একটি পরীক্ষণে দেখা যায় যে দশমাস বয়সের একটি শিশুর মুখের বিভিন্ন ভঙ্গী দেখে বিভিন্ন প্রক্ষোভের অস্তিত্বের অনুমান করা যায়।



[সাধারণ উত্তেজনার অনুভূতি থেকে নানা বিভিন্ন প্রক্ষোভে বিশেষীভবনের চিত্র]

ব্রিজেসের মতে তিনমাস বয়স থেকেই শিশুর প্রক্ষোভ বিশেষায়িত হতে সুরু করে। তার এই মৌলিক সাধারণধর্মী উত্তেজনা থেকে প্রথমে দুটি বিভিন্ন প্রকৃতির প্রক্ষোভপ্রবাহ জন্ম নেয়—আনন্দ ও অস্বাচ্ছন্দ্য। ৬ মাসের সময় আনন্দ রূপ প্রক্ষোভটি বিশেষায়িত হয়ে উচ্ছ্বাসের (Elation) রূপ নেয়। ...হীন হলেও অস্বাচ্ছন্দ্য রূপ প্রক্ষোভটি ৪ মাস বয়সে বি... হয়ে রাগে, গুরুতর অসুস্থ... করে এবং এই বিরক্তিতে এবং ৬ মাসে ভয়ে পরিণত হয় ...ক বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তোলে।

ব...শেষায়িত হয়ে প্রথমে বড়দের প্রতি ভা

মাসের সময় তার সমবয়সী বা তার চেয়ে ছোট শিশুদের প্রতি ভালবাসায় পরিণত হয়। আবার ১৫ মাসের সময় থেকে শিশুর মনে হিংসারূপ-প্রক্ষোভটিও দেখা দেয়। ব্রিজেসের মতে এটি অস্বাচ্ছন্দ্যরূপ প্রক্ষোভ-প্রবাহ থেকেই জন্ম নিয়ে থাকে।

শিশুর মধ্যে প্রথমে যে নির্দিষ্ট প্রক্ষোভমূলক আচরণটি দেখা যায় তা হল তার পরিচিত কোন মানুষের মুখ দেখে হাসা। পরে এই নীরব হাসি উচ্চ হাসির রূপ গ্রহণ করে। গেসেলের একটি পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে ১ মাস বয়স থেকেই শিশুর ক্ষুধা, রাগ, ব্যথা ইত্যাদি জনিত কান্নার মধ্যে পার্থক্য ধরা যায়।

শিশুর এই প্রক্ষোভমূলক আচরণ যতই বিশেষায়িত হতে থাকে ততই তার প্রক্ষোভের প্রকাশও সুসংহত ও সুনির্দিষ্ট হয়ে-ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম দিকে শিশুর রাগের প্রকাশ থাকে কতকগুলি অনির্দিষ্ট ও সমন্বয়হীন আচরণের সমষ্টিমাত্র রূপে এবং যে উদ্দীপকটি তার রাগ সৃষ্টির কারণ রূপে কাজ করে সেটির সঙ্গে কার্যকর সঙ্গতিবিধানের পক্ষে সেই আচরণগুলি মোটেই উপযোগী হয় না। কিন্তু শিশু যত বড় হয় তত তার রাগের অভিব্যক্তি বস্তু বা পরিস্থিতির উপযোগী হয়ে ওঠে। সেই রকম আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি অন্যান্য প্রক্ষোভের অভিব্যক্তিগুলিও ধীরে ধীরে সুনির্দিষ্ট, সুসংহত ও লক্ষ্য-উপযোগী হয়ে ওঠে। কিন্তু প্রক্ষোভ যখন অত্যন্ত তীব্র হয়ে ওঠে তখন সকল বয়সের ব্যক্তির আচরণই অসংহত, অসংযত, ও সমন্বয়হীন হয়ে যায় এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে সমর্থ হয় না।

বাহ্যিক অভিব্যক্তি

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভের অভিব্যক্তির মধ্যে আরও একটি উল্লেখ-যোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। শিশু যত মনের দিক দিয়ে পরিণত হয় তত তার বাহ্যিক অভিব্যক্তির তীব্রতা কমে আসে এবং তার আচরণও যথেষ্ট পরিমাণে সংযত ও মার্জিত হয়ে ওঠে। যেমন ৩।৪ বৎসরের শিশু রেগে গেলে চিৎকার করে কাঁদে, হাত পা ছোড়ে, উদ্দাম আচরণ করে, ৭'৮ বৎসর বয়সে রাগের ...ক্তি সম্ব. আর চীৎকার করে কাঁদে না বা ঐ ভাবে হাত পা ছোঁড়ে না, আরও সময় ... ভুল ...একেবারেই কাঁদে না, তার দৈহিক প্রকাশও অনেক মার্জিত এবং বড় হলে ... যায়। সংযত হয়ে ...

সামাজিক দৃষ্টান্ত, অপরের নিন্দা-প্রশংসা ইত্যাদি পারিবেশিক শক্তি এবং শিশুর নিজের অতীত অভিজ্ঞতার জন্যই শিশু তার প্রক্ষোভের বাহ্যিক অভি-ব্যক্তি দমন করতে শেখে। সে নিজে বুঝতে পারে যে এই ধরনের অসংহত ও উদ্দাম আচরণের দ্বারা তার অভীষ্ট সিদ্ধ হতে পারে না এবং সেইজন্য সে তার আচরণকে সংযত, সুসংহত করার চেষ্টা করে। তাছাড়া বিশেষ করে তার চার পাশের বয়স্কসমাজের নিন্দা ও সমালোচনার ভয়ে সে তার প্রক্ষোভের অসংযত প্রকাশকে সংযত, করতে বাধ্য হয়। তার ফলে শিশু যতই বড় হয়, প্রক্ষোভের বাহ্যিক অভিব্যক্তিও ততই সে দমন করতে থাকে এবং দেখা গেছে যে, ৭।৮ বৎসর বয়সে ছেলেমেয়েরা নিজেদের প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি বেশ সাফল্যের সঙ্গেই অপরের কাছ থেকে গোপন করতে পারে। এর ফলে পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি বয়স্কদের পক্ষে শিশু কি ধরনের প্রক্ষোভ কখন অনুভব করল তা বুঝতে পারা একান্তই দুষ্কর হয়ে ওঠে।

প্রক্ষোভের বাহ্যিক অসংযত অভিব্যক্তি দমন করা যে সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য অপরিহার্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আজ যদি আমরা আমাদের সমস্ত প্রক্ষোভকে বিনা দ্বিধায় পূর্ণভাবে বাইরে প্রকাশ করতাম তাহলে পৃথিবীটা মোটেই একটি আকর্ষণীয় বাসস্থান হয়ে উঠত না। কিন্তু একথাও যেমন সত্য তেমনই প্রক্ষোভের অভিব্যক্তি দমন করার যে একটা অত্যন্ত ক্ষতিকর দিক আছে সে কথাও তেমনই অনস্বীকার্য। বহু ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের অভিব্যক্তি দমন করার ফলে মনের উপর তার প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য রীতিমত ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। প্রক্ষোভকে বাইরে অভিব্যক্ত করতে পারলে মনের মধ্যে তার অবাঞ্ছিত প্রভাব থাকে না। যেমন দুঃখের সময় কাঁদলে মনটা হাল্কা হয়ে যায়। রাগ প্রকাশ করে ফেললে পরে আর রাগ থাকে না। এরই নাম বিরেচন প্রক্রিয়া (Catharsis)। আর দুঃখ, রাগ ইত্যাদি যদি দমন করা হয় তবে সেগুলি মনের মধ্যে অবদমিতই থেকে যায় এবং মানসিক সাম্যকে স্থায়ীভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ সম্পর্কিত এই তথ্যটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ীতে ও স্কুলে প্রায়ই দেখা যায় যে বয়স্কদের শাসন বা নিন্দার ভয়ে শিশুরা তাদের প্রক্ষোভগুলিকে দমন করে। এর ফলে তাদের বাহ্যিক আচরণ বর্তমানের মত ত্রুটিহীন হলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের মধ্যে এই অবদমন গুরুতর অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তাদের ভবিষ্যৎ আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তোলে।

অনেক সময় অবদমিত প্রক্ষোভ এতই তীব্র হয়ে ওঠে যে শিশুর আচরণ অস্বাভাবিক পথ গ্রহণ করে এবং তা থেকে নানা জটিল সমস্যা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়ত, প্রক্ষোভ গোপন বা দমন করার ফলে শিশু অনেক সময় অপরকে ভুল বোঝে এবং বহু অনাবশ্যক কষ্ট বা মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করতে সে বাধ্য হয়। যেমন, কোন বিশেষ ব্যাপারে সে যদি অসুবিধা অনুভব করে এবং যদি তার মনের ভাব সে অপরের কাছে প্রকাশ করতে না পারে, তবে তাকে নীরবে সেই অসুবিধা সহ্য করতে হয় এবং তার ফলে সে আর দশজনের প্রতি একটা রাগের ভাব মনে মনে পোষণ করে চলে।

তৃতীয়ত, অনেক ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শিশুর মনে ভয়, রাগ, দুঃখ ইত্যাদি প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে থাকে। শিশু যদি সে সময় তার প্রক্ষোভ দমন বা গোপন না করে কারও কাছে খোলাখুলিভাবে তা প্রকাশ করে তাহলে তার প্রক্ষোভের মিথ্যা কারণটি দূর হয়ে যেতে পারে এবং তার মানসিক সাম্য ফিরে আসতে পারে।

এই সব কারণে কঠোর বিধি-নিষেধ অনুশাসনের চাপে শিশুর প্রক্ষোভের অভিব্যক্তি যাতে প্রতি পদে ব্যাহত না হয় এবং যাতে তার প্রাক্ষোভিক বিকাশ সহজ ও স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া সুশিক্ষার কার্যসূচীর একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ।

প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি-প্রবণতার পরিবর্তন

শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রক্ষোভের প্রকাশের মধ্যে যেমন পরিবর্তন দেখা দেয়, তেমনই তার প্রক্ষোভের অনুভূতি-প্রবণতার মধ্যেও বেশ পরিবর্তন আসে। শৈশবে তার এই অনুভূতি-প্রবণতার পরিধি থাকে সীমাবদ্ধ এবং বিশেষধর্মী ও সুনির্দিষ্ট কতকগুলি উদ্দীপক ছাড়া তার মনে প্রক্ষোভ জাগে না। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উপলব্ধি শক্তি, মানসিক সামর্থ্য, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিধি ইত্যাদি বাড়তে থাকে এবং সেই সঙ্গে তার প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি-প্রবণতারও পরিধি প্রসারিত হয়।

আগে যে উদ্দীপক সরাসরি শিশুর উপর কাজ করত, শিশু সেগুলির সম্বন্ধেই কেবলমাত্র প্রক্ষোভ অনুভব করত, দূরবর্তী বা অনুপস্থিত কোন উদ্দীপক তার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। কিন্তু শিশু যতই বড় হতে থাকে ততই অতীতের কোন ঘটনা এবং বর্তমানে অনুপস্থিত কোন

বস্তু বা ব্যক্তি তার প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন সে তার অতীতের কোন কাজের জন্য অনুশোচনা বা গর্ব বোধ করতে পারে বা ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনা বা চিন্তা তার মনে আনন্দ বা দুঃখ সৃষ্টি করতে পারে।

শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভের অনুভূতি প্রধানত দৈহিক নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকত। অন্য কোন চিন্তা বা ধারণা তার মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারত না। কিন্তু শিশু যত বড় হয় তত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক ইত্যাদি কারণগুলি তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে এবং এই সব কারণেও তার মনে প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যেমন অপরের নিন্দায় সে দুঃখ পায়, প্রশংসায় আনন্দিত হয়, ব্যর্থতার চিন্তায় ভয় পায়, দেশের বা বংশের গৌরবে গর্ব বোধ করে, অন্যায় কাজ করলে অপরাধ অনুভব করে ইত্যাদি।

তাছাড়া শিশুর দেহ ও মনের পরিণতি দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেবল-মাত্র উদ্দীপকের প্রকৃতির দ্বারাই তার প্রক্ষোভের স্বরূপ ও তীব্রতা নির্ধারিত হয় না, তার মানসিক সংগঠন ও অভ্যন্তরীণ প্রবণতাই তার প্রক্ষোভের জাগরণ, স্বরূপ ও তীব্রতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন আগে হয়ত পাহাড় বা ঝরণা দেখলে শিশুর মনে কোন ভাবোদয় হত না, কিন্তু এখন ঐসব দেখলে শিশুর মনে বিস্ময় বা আনন্দ জেগে ওঠে। তেমনই কোন শিশু হয়ত খেলাধূলায় কৃতিত্ব দেখিয়ে আনন্দ পায়। আবার অন্য একটি শিশু খেলাধূলায় ভাল না করতে পারলে বিন্দুমাত্র ক্ষুন্ন হয় না কিন্তু পরীক্ষায় দু'নম্বর কম পেলে দুঃখে, ক্ষোভে অভিভূত হয়ে পড়ে। এই অভ্যন্তরীণ প্রবণতার পরিবর্তনের পেছনে প্রধানত কাজ করে শিশুর পরিবেশের প্রকৃতি, তার শিক্ষা দীক্ষা ও তার বিভিন্ন দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের পরিণতি।

শিশুকে সার্থক শিক্ষা দিতে হলে তার প্রক্ষোভের প্রকৃত স্বরূপ ও কারণ জানা যে অত্যন্ত প্রয়োজন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিশেষ করে তার আচরণের যথার্থ ব্যাখ্যা দিতে হলে তার আচরণের পেছনে কি ধরনের প্রক্ষোভ কাজ করছে তা জানা অত্যাবশ্যক। শিশুর আপাত অর্থহীন অনেক আচরণই তার প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে পরিষ্কার হয়ে ওঠে। অনেক সময় পিতামাতা, শিক্ষক এবং অন্যান্য বয়স্করা শিশুর প্রক্ষোভের প্রকৃত স্বরূপ না জানতে পেরে প্রায়ই তাকে ভুল বোঝেন এবং তার আচরণের ভুল

ব্যাখ্যা করেন। যেমন, দেখা গেল যে কোন শিশু সকল ব্যাপারেই অনাসক্ত ও উদাসীন, কোন কিছু নিয়ে দাবী বা ঝগড়া করে না। পিতামাতা শিক্ষকেরা তাই থেকে মনে করলেন যে শিশুর এই উদাসীন আচরণ তার অনাসক্ত ও সংযত মনের পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এমন হতে পারে যে শিশু মোটেই উদাসীন বা অনাসক্ত নয়। তার প্রতি আর সকলের আচরণ থেকে তার মনে হয়ত এমন ধারণা জন্মেছে যে সকলে তার প্রতি অবিচার করছে এবং সেই কারণে তার মনে জেগেছে সকলের প্রতি রাগ ও অসন্তোষ এবং সমস্ত কাজের প্রতিই অনাসক্তি। শিশুর আচরণের এই ধরনের ভুল ব্যাখ্যার জন্য সমস্ত শিক্ষা প্রচেষ্টাই ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে এবং তার ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ ব্যাহত হবার খুবই সম্ভাবনা থাকে।

চার

সামাজিক বিকাশ (Social Development)

সামাজিক বিকাশ বলতে বোঝায় শিশুর পরিপার্শ্বের অন্যান্য ব্যক্তি, বিভিন্ন দল, সংগঠন প্রভৃতির সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের ক্রমবিকাশ। শিশু যখন প্রথম পৃথিবীতে আসে তখন সে থাকে না-সামাজিক না-অসামাজিক প্রকৃতির। তখনও পর্যন্ত সে কোন মানুষের সংস্পর্শে আসে না এবং সেজন্য তার সামাজিক বা অসামাজিক হবার কথা ওঠেই না। কিন্তু শীঘ্রই সে নানা ধরনের মানুষের সংস্পর্শে আসতে থাকে, ছোট বড় নানা রকম দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং আরও পরে নানা বৃহত্তর সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়। এইভাবে সে ক্রমশ একটি অপরিণত সমাজ-চেতনাহীন শিশু থেকে একটি পূর্ণ সামাজিক চেতনাসম্পন্ন মানুষে পরিণত হয়। শিশুর এই সামাজিক আচরণের ক্রমবিকাশকে এক কথায় সামাজিকীভবন (Socialisation) নাম দেওয়া হয়ে থাকে।

সহজাত উপাদান

যদিও জন্মের সময় শিশুর মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ বা মনোভাব বলতে কিছু থাকে না, তবু তার মধ্যে সামাজিক প্রবণতা ও সামাজিক আচরণ সম্পন্ন করার শক্তি জন্ম থেকেই বর্তমান থাকে। যাঁরা সহজাত প্রবৃত্তির (Instinct) সাহায্যে মানব আচরণের ব্যাখ্যা করে থাকেন তাঁরা যৌথ বা সামাজিক প্রবৃত্তি নামে একটি সহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন এবং তাঁদের মতে শিশুর সামাজিকীকরণের পিছনে এই প্রবৃত্তিটির ক্রিয়াই সবচেয়ে প্রভাবশালী। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এই ধরনের কোন সুনির্দিষ্ট সামাজিক প্রবৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও মানবশিশুর মধ্যে যে সামাজিক জীবন যাপন করার একটা সহজাত প্রবণতা আছে একথা অস্বীকার করেন না। তাছাড়া সামাজিক আচরণের উপযোগী মানসিক সংগঠন, নির্ভরপ্রবণতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা, দয়া ইত্যাদি মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি মানবশিশুর মধ্যে প্রথম থেকে নিহিত থাকে এবং উপযুক্ত পরিবেশ পেলেই সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

পারিপার্শ্বিক উপাদান

শিশুর সামাজিকীভবনে সহজাত প্রবণতা ও সমাজধর্মী বৈশিষ্ট্যগুলি গুরুত্বপূর্ণ হলেও পরিবেশই যে সব চেয়ে বড় শক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেখা গেছে যে জন্ম থেকে শিশু যদি সমাজধর্মী পরিবেশে মানুষ না হয় তাহলে সে একটি অসামাজিক জীবরূপে গড়ে ওঠে। এ্যাভিরনের (Avyron) বন্য বালক, ভারতের বনে প্রাপ্ত নেকড়েপালিত বালক প্রভৃতির কাহিনী থেকে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত করা যায় যে সামাজিক পরিবেশে যদি শিশু মানুষ না হয় তবে সে সামাজিক আচরণ বা রীতিনীতি শেখে না। সে জন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়াকে মূলত সামাজিক অভ্যাস-গঠন বলেই বর্ণনা করে থাকেন। প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রথা, রীতি-নীতি, আচরণ বৈশিষ্ট্য প্রচলিত আছে। সেগুলিকে শেখা এবং আয়ত্ত করার উপর শিশুর সামাজিকীভবন নির্ভর করে। এ দিক দিয়ে সামাজিকীভবন এক প্রকৃতির শিখন ছাড়া আর কিছুই নয় এবং আর সকল শিখন-প্রক্রিয়ার মতই সামাজিকীভবন প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পন্থা, অন্তর্দৃষ্টি, অনুবর্তন, অনুষঙ্গ, অনুশীলন ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল।

জন্মের সময় থেকেই শিশু থাকে আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মনিমগ্ন। আহ্‌লের (Uhl) ভাষায় শিশু জীবন সুরু করে অহংসর্বস্ব (egoist) রূপে। তার চার পাশের পৃথিবীকে সে স্বার্থপরের মত তার একান্ত নিজস্ব পৃথিবী বলে মনে করে এবং এই পৃথিবী থেকে সে অনেক কিছু পাবার প্রত্যাশা করে। কিন্তু শীঘ্রই তার এই মনোভাবের পরিবর্তন হতে সুরু করে। সমাজ এবং তার সত্তার মধ্যে যে ব্যবধানের দেওয়ালটা সে গড়ে তুলেছিল সেটা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে এবং এমন একদিন আসে যখন শিশু সেই সমাজেরই একজন হয়ে ওঠে। এই অহংসর্বস্ব স্বার্থপর শিশু থেকে সমাজচেতন, সঙ্গকামী ও পারস্পরিক আদান-প্রদানে অভ্যস্ত পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির ক্রমবিবর্তনের নামই সামাজিকীভবন।

স্বতন্ত্রীভবন (Individualisation)

শিশুর এই মানসিক বিকাশের প্রথম ধাপটির আমরা নাম দিতে পারি স্বতন্ত্রীভবন (Individualisation)। এই সময় শিশুর অহংসত্তা জন্ম নেয়। সে নিজেকে 'আমি' বলে জানতে শেখে। কিন্তু তখনও তার মধ্যে 'তুমি' বলে

কোন ধারণার সৃষ্টি হয় না। সে ভাবে, আমার খেলনা আমার। কিন্তু 'তোমার খেলনা'র কথা তখনও সে ভাবতে শেখে না।

সামাজিকীভবন (Socialisation)

এর পরের ধাপে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ থেকে ধীরে ধীরে দেখা দেয় সামাজিকীভবন (Socialisation)। এই ধাপেই সে 'আমি'র বিপরীত 'তুমি'কে চিনতে শেখে। কিন্তু এ ধাপেও সে 'আমি' এবং 'তুমি'র মধ্যে কোন আদান-প্রদানের সম্পর্ক স্থাপন করে না। সে ভাবে 'আমার খেলনা আমার, তোমার খেলনা তোমার।'

কিন্তু এর পরে আরও বড় হলে শিশু অন্যান্য শিশুর সঙ্গে মিশতে সুরু করে, খেলনার আদান-প্রদান করে। তখন সে ভাবতেও শেখে, 'আমার খেলনা তোমারও।' এই ধাপে শিশুর সত্যকারের সামাজিক বিবর্তন সুরু হয়। তবে সামাজিকীভবনের সময় শিশুর স্বতন্ত্রীভবনের কাজ বন্ধ থাকে ভাবলে ভুল হবে। দুটি প্রক্রিয়াই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। নিজের অহংসত্তা সম্বন্ধে শিশুর সুনির্দিষ্ট জ্ঞান না সৃষ্টি হলে তার সামাজিক সচেতনতার কোন অর্থই হয় না। তেমনই সামাজিক বোধ যদি অপরিণত থাকে তবে শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ সংকীর্ণ ও একমুখী হয়ে ওঠে। অতএব এ দুটি প্রক্রিয়ার সমান অগ্রগতিই শিশুর সুস্থ ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে অপরিহার্য।

ঠিক কোন্ সময় থেকে শিশুর সামাজিক আচরণ সুরু হয় একথা নির্দিষ্ট-ভাবে বলা যায় না। তবে দেখা দেখা গেছে যে জন্মের প্রথম কয়েক মাস শিশু পুরোপুরি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকে, অপরের প্রতি মনোযোগ দেয় না। কিন্তু ৫।৬ মাস থেকেই শিশুর হাসা, শব্দ ও ভঙ্গীর অনুকরণ করা, নিজের প্রতি অপরের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা ইত্যাদি আচরণ দেখে মনে হয় যে শিশুর মধ্যে এই সময় থেকেই সামাজিক সচেতনতা ধীরে ধীরে জাগতে সুরু করে। প্রথম প্রথম তার এই সামাজিক প্রতিক্রিয়া কেবলমাত্র বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতিই মনোযোগে সীমাবদ্ধ থাকে, পরে অবশ্য ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতিও তার মনোযোগ যায়।

ইতিপূর্বে শিশু প্রাণহীন ও প্রাণবান্ এ দুয়ের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য বুঝতে পারত না এবং দু'য়ের প্রতি তার আচরণ একই ধরনের ছিল। কিন্তু দেখা যায় যে শীঘ্রই সে প্রাণহীন ও প্রাণবানের মধ্যে পার্থক্যটা বুঝতে পারে এবং দু'য়ের

প্রতি তার আচরণের ধারা ও প্রকৃতি বদলে যায়। দেখা যায় যে বড়দের কারও মুখ কাছে আনলে শিশু হেসে ওঠে, কিন্তু কোন জড় বস্তু দেখে সে ওভাবে হাসে না। প্রাণহীন ও প্রাণবানের মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে এই সচেতনতা শিশুর সামাজিক বিকাশের একটি উল্লেখযোগ্য সোপান।

প্রায় ১ বছর বয়স থেকেই শিশুর দৃষ্টি তার সমবয়সী ছেলেমেয়েদের প্রতি আকৃষ্ট হয় কিন্তু মিলে মিশে খেলার স্তর আসে দু'বছর আড়াই বছর বয়স থেকে। বস্তুত ২ বছর বয়সের আগে পর্যন্ত শিশুর আত্মকেন্দ্রিকতা বেশ তীব্র থাকে এবং মাঝে মাঝে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করা ছাড়া সে বিশেষ সামাজিক মনোভাবের পরিচয় দেয় না। এমন কি ৪।৫ বৎসর বয়স পর্যন্তও শিশুকে বেশ নির্জনতাপ্রিয় ও আত্মমুখী দেখা যায়।

স্কুলে প্রবেশ করার সময় থেকে শিশুর সত্যকারের সামাজিক হওয়ার কাজের সুরু হয়। এই সময় শিশুরা স্কুল, ক্লাব ইত্যাদি বড় বড় সংগঠনের মধ্যে থাকলেও সেগুলির মধ্যেই আবার ছোট ছোট দল বাঁধে এবং এই সব ছোট দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ খুব নিকট ও দৃঢ় হয়ে ওঠে। সে যত বড় হয় তত সে আরও বেশী করে যৌথ কাজে প্রবৃত্ত হয় এবং বৃহত্তর দল বা গোষ্ঠীতে অংশগ্রহণ করতে সমর্থ হয়। তার নিজের মানসিক শক্তি ও সংগঠন অনুযায়ী সে কখনও দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে আবার কখনও দলের নেতার অনুগামী হয়।

এই দল বাঁধা মেলামেশা ইত্যাদি সামাজিক আচরণের মধ্যেও শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক (Individualistic) প্রবণতা প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ বন্ধুর নির্বাচন, বিশেষ ধরনের খেলাধূলার প্রতি অনুরাগ, ছোট ছোট দলের মধ্যে নিজের সঙ্গকামিতাকে সীমাবদ্ধ রাখা ইত্যাদি থেকে প্রমাণিত হয় যে শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক মনোভাবও যথেষ্ট অব্যাহত রয়েছে।

আট দশ বৎসর বয়স থেকে শিশুর সামাজিক মনোভাব বেশ প্রবল হয়ে উঠতে থাকে। এই সময় থেকে বৃহত্তর দল গঠনের প্রতি শিশুর আকর্ষণ যায় এবং বড় বড় সম্মিলিত কর্ম প্রচেষ্টায় অংশ গ্রহণ করতে সে ইচ্ছুক হয়। ফারফে'র (Furfey) পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায় যে দশবছর বয়স থেকে শিশুদের মধ্যে দল সম্বন্ধে মর্যাদাবোধ, দল-আনুগত্য ইত্যাদি ধারণাগুলি যথেষ্ট পুষ্ট হয়ে উঠে এবং ধীরে ধীরে সমাজপ্রীতি শিশুর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক মনোভাবের স্থান অধিকার করে।

এই সময় আরও দেখা যায় যে খেলাধূলা প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক বা বিনোদন-মূলক সম্মেলন ইত্যাদি যৌথ-প্রচেষ্টামূলক বৃহত্তর উদ্যোগে শিশু সোৎসাহে অংশ গ্রহণ করে। তার ফলে দলবিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, আত্মত্যাগ, ইত্যাদি সামাজিক গুণগুলি যেমন একদিকে শিশুর মধ্যে বিকশিত হয়ে ওঠে তেমনই উপযুক্ত ক্ষেত্রে দল-নেতা তৈরীর কাজও সুরু হয়ে যায়।

শিশুর সামাজিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে আর একটি বস্তু। সেটি হল আচরণের ক্ষেত্রে সমাজের অনুমোদিত মান সম্বন্ধে সচেতনতা। প্রায় ২।৩ বৎসর বয়স থেকে সুরু করে, বিশেষ করে ৬।৭ বৎসর বয়সের পর থেকে ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ সম্বন্ধে বয়স্করা যে মান স্থাপন করেন শিশু সে সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং সেই মান অনুযায়ী তার নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে।

শিশুর সামাজিক বিকাশকে এই থেকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে তার যৌনসচেতনতার জাগরণ। ৯।১০ বৎসরের ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এবং মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গেই খেলতে ভালবাসে এবং বিপরীত দলের সঙ্গে মেশার কোন আকর্ষণ অনুভব করে না। কিন্তু যৌবনাগমের সূচনা থেকেই তাদের এই মনোভাবের পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময় থেকে কোন ছেলে সুযোগ পেলে মেয়েদের দলে যোগ দিয়ে খেলে এবং মেয়েরাও ছেলেদের দলে মিশে খেলতে চায়। সাধারণত প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদির চাপে তারা সব সময় এ ধরনের সুযোগ পায় না। মেয়েদের যৌবনাগম ছেলেদের আগে হয় বলে তাদের মধ্যে ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ আগেই দেখা দেয়।

সামাজিক বিকাশে বিভিন্ন শক্তির কাজ

শিশুর সামাজিক বিকাশ বহু বিভিন্নধর্মী শক্তির সম্মিলিত প্রক্রিয়ার ফল-রূপে দেখা দেয়। এই শক্তির কতকগুলি বংশধারার অংশ বা সহজাত, আর কতকগুলি পরিবেশের বৈশিষ্ট্য থেকে সঞ্জাত। সেগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

পরিণমন (Maturation)

সহজাত শক্তিগুলির মধ্যে প্রথমে আসে শিশুর পরিণমন (Maturation) প্রক্রিয়া। সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে সমাজের আর দশজনের সঙ্গে

আচরণের উপর এবং সেই আচরণ নির্ভর করে শিশুর দৈহিক মানসিক ইত্যাদি দিকগুলির পরিণমনের উপর। ডেনিসের (Dennis) একটি পরীক্ষণে জন্মের পর থেকে দুটি শিশুকে সাত মাস বয়স পর্যন্ত এমন একটা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে রাখা হল যেখানে কেউ তাদের সামনে হাসত না। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেল যে যখন উপযুক্ত সময় এল শিশু দুটি অপরের কোনরূপ উৎসাহদান ছাড়াই হাসতে সক্ষম হল।

সামাজিক আচরণ যে পরিণমনের উপর নির্ভরশীল অনেক পরীক্ষণ থেকে এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। ধরা যাক একটি দু'বছরের ছেলেকে চার বছর বয়সের উপযোগী সামাজিক আচরণ শেখান হল এবং আর একটি ছেলেকে তেমন কিছু শেখান হল না। যখন দু'জনেরই চার বৎসর বয়স হবে তখন দেখা যাবে যে দ্বিতীয় ছেলেটি নিজে নিজেই চার বৎসর বয়সের উপযোগী আচরণ শিখে ফেলেছে এবং প্রথম ছেলেটির প্রায় সমান হয়ে উঠেছে। এই থেকে আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি যে শিশুর বিভিন্ন বয়সের সামাজিক আচরণ তার সেই বয়সের পরিণমনের উপর নির্ভরশীল।

বুদ্ধি (Intelligence)

আর একটি সহজাত বস্তুর উপর শিশুর সামাজিক বিকাশ বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সেটি হল শিশুর বুদ্ধি। আমরা জানি সব শিশুই সমান বুদ্ধির অধিকারী হয় না এবং সকলের বুদ্ধির বিকাশের হারও সমান নয়। ফলে বিভিন্ন সামাজিক আচরণ সকলের পক্ষে সমানভাবে আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। এমন অনেক জটিল সামাজিক আচরণ আছে যেগুলি উন্নতবুদ্ধির ছেলেমেয়েরা চটপট আয়ত্ত করে নেয় এবং সামাজিক সাফল্য ও প্রশংসা অর্জন করে। কিন্তু স্বল্পবুদ্ধি হওয়ার জন্য আর একটি ছেলের পক্ষে হয়ত সেই একই আচরণ যথাযথ আয়ত্ত করা সম্ভব হল না এবং ফলে তার ঈপ্সিত সামাজিক প্রশংসা থেকে সে বঞ্চিত হল। অবশ্য সাধারণভাবে সামাজিক আচরণ আয়ত্ত করতে অতিরিক্ত বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। বুদ্ধির সাধারণ মান শিশুর সামাজিকীভবনের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু সাধারণ মানের চেয়ে যদি কোন শিশুর বুদ্ধি কম থাকে তবে তার পক্ষে সামাজিক আচরণ শেখার পক্ষে বেশ বাধার সৃষ্টি হয়।

পরিণমন প্রক্রিয়া, বুদ্ধি ইত্যাদি ছাড়া আরও অনেক সহজাত উপাদানের

উপর সামাজিক বিকাশ নির্ভরশীল। সেগুলি হল শিশুর মনঃপ্রকৃতি (Temperament), জন্মগত প্রবণতা, প্রক্ষোভ ইত্যাদি।

শিখন (Learning)

পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশুর সামাজিক বিকাশকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। এই পর্যায়ে প্রথমে পড়ে শিখন (Learning)। সামাজিক আচরণ শিশু আয়ত্ত করে শিখন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। শিখন সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়ে থাকে, প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে, অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে এবং অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এছাড়া অনুকরণ, অভিভাবন ইত্যাদি পন্থাতেও শিশু নানা আচরণ শিখে থাকে।

শিখন আবার নির্ভর করে বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের উপর। যে পরিবেশে শিশু বড় হয় সেই পরিবেশের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিই শিশুর সামাজিক সংগঠনের প্রকৃতি নির্ধারিত করে দেয়। এই কারণেই বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মানুষ হয়েছে এমন শিশুদের সামাজিক বিকাশের প্রকৃতিও বিভিন্ন।

শিশু যে সমাজে বাস করে সেই সমাজের কৃষ্টি, প্রথা, প্রচলিত রীতিনীতি শিশুর সামাজিক বিকাশকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। দুটি বিভিন্ন সংস্কৃতি-সম্পন্ন সমাজ থেকে আসা দুটি ছেলে বা মেয়ে,—যেমন একটি আমেরিকান ছেলে এবং একটি ভারতীয় ছেলের কিংবা একটি বাঙালী ছেলে এবং একটি নেপালী ছেলের—সামাজিক আচরণের মধ্যে তুলনা করলে এই তথ্যটির যাথার্থ্য প্রমাণিত হবে। আবার একই সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় অথচ বিভিন্ন প্রথা ও রীতিনীতির মধ্যে মানুষ হওয়ার জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে সামাজিক বিকাশের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। যেমন, যে ছেলেটি সাধারণ শ্রমিকের ঘর থেকে এসেছে তার খেলাধূলা মালবহন করা, মেসিন চালান ইত্যাদি ধরনের আচরণে সীমাবদ্ধ থাকে। আর যে ছেলেটি কোন শিক্ষক পরিবার থেকে এসেছে তার খেলা প্রকাশ পায় পড়া বা পড়ানোর রূপে।

সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর (Socio-economic Status)

শিশুর সামাজিক বিকাশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে শিশুর পরিবারের সামাজিক-অর্থনৈতিক অবস্থা। একই সমাজের ভিতরে বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরভুক্ত বহু ব্যক্তিকে দেখা যায়। এই বিভিন্ন স্তরভুক্ত ব্যক্তিদের

বাড়ীর আবহাওয়া ও পরিবেশের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। তার ফলে শিশুদের সামাজিক বিকাশের মধ্যেও যথেষ্ট বিভিন্নতা দেখা দেয়। যেমন, যে শিশু নিম্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর থেকে এসেছে তার পক্ষে অপরের সঙ্গে সহজ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করায় যথেষ্ট অসুবিধা হয়। প্রায়ই তার ব্যবহারে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব দেখা যায় এবং নিজের দারিদ্র্য সম্বন্ধে সচেতন থাকায় সে নিম্নতাবোধে (Sense of inferiority) ভোগে। তার ফলে শিশুর স্বাভাবিক সামাজিক বিকাশ ব্যাহত হতে পারে। তেমনই আবার উচ্চ সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর থেকে যে সব ছেলেমেয়ে আসে তাদের মধ্যে সামাজিক বিকাশ সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হতে পারে এবং সামাজিক আচরণ শিখতে তাদের অসুবিধা হয় না। অপর দিকে নিম্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরভুক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিনয়, ভদ্রতা, স্বাবলম্বন, শ্রমশীলতা প্রভৃতি গুণ দেখা যায় এবং উচ্চ সামাজিক অর্থনৈতিক স্তরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ঔদ্ধত্য, অবাধ্যতা, দাম্ভিকতা, আলস্য, অমনোযোগ ইত্যাদি দোষও অনেক সময় দেখা যায়। যে সব পিতামাতার আর্থিক অবস্থা ভাল নয় তাঁদের ছেলেমেয়েরা নানা প্রয়োজনীয় কাজে নিপুণ হয়ে ওঠে এবং মানসিক শক্তির দিক দিয়ে উৎকর্ষের অধিকারী না হলেও অনেক সময় ব্যবহারিক কুশলতা ও বাস্তব অভিজ্ঞতার সাহায্যে সামাজিক সাফল্য লাভ করে। আবার নিম্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরের ছেলেমেয়েরা সরাসরি মায়েদের হাতে লালিত পালিত হওয়াতে তাদের বিকাশটা স্বাভাবিক হয় এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার কৃত্রিমতা বিশেষ দেখা যায় না। এর ফলে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে আশাভঙ্গের সম্ভাবনা কম থাকে। কিন্তু উচ্চ সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তরের ছেলেমেয়েরা প্রায়ই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে এবং বেতনভোগী ধাত্রী ইত্যাদির দ্বারা মানুষ হয় এবং সেজন্য তাদের মানসিক সংগঠনে নানারূপ কৃত্রিমতা ও অসঙ্গতি স্থান পায়। তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে পরবর্তী জীবনে এই সব ছেলেমেয়েদের ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের আঘাত সহ্য করতে হয়।

সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থার পার্থক্য শিশুদের নৈতিক মানকেও বহু ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। সাধারণত দেখা গেছে যে মধ্যবিত্ত ঘর থেকে যে সব ছেলেমেয়ে আসে তাদের মধ্যে উচিত-অনুচিত এবং করণীয়-অকরণীয়ের একটা বেশ সুনির্দিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত ধারণা থেকে থাকে। উচ্চবিত্তসম্পন্ন ঘরের ছেলেমেয়েদের ততটা সুকঠোর নীতিবোধ জন্মায় না এবং প্রায়ই ভালমন্দের

বিচারে তারা উদারহৃদয় হয়ে থাকে। তবে খুব নিম্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর থেকে যে সব ছেলেমেয়ে আসে তাদের মধ্যে আবার দুর্নীতির প্রভাবও মাঝে মাঝে দেখা যায় এবং মধ্য বা উচ্চ সামাজিক অর্থনৈতিক স্তরের ছেলে-মেয়েদের তুলনায় তারা ছোটখাট অপরাধ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না।

শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশে তার পরিবারের সামাজিক-অর্থনৈতিক স্তর যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সেইজন্য শিশুর মনোভাব, আচরণ, প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ ইত্যাদি নির্ভুলভাবে জানতে হলে তার পরিবার ও বাড়ীর পটভূমিকা ভাল করে জানা একান্তই প্রয়োজন।

সামাজিক আচরণে বৈষম্য

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর সামাজিক আচরণের প্রকৃতি নির্ণয় করে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদান। এই সব শক্তি ও উপাদান বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। তার ফলে শিশুর সামাজিক আচরণের মধ্যে প্রচুর বিভিন্নতা দেখা যায়। যেমন, কোন শিশু সঙ্গপ্রিয় ও মিশুকে হয়, কোন শিশু আত্মকেন্দ্রিক ও লাজুক প্রকৃতির হয়, আবার কোন শিশু আক্রমণধর্মী (Aggressive) এবং কর্তৃত্বপ্রিয় হয়ে ওঠে ইত্যাদি।

কোন কোন শিশুর মধ্যে বাধ্যতা ও সহযোগিতার মনোভাব বেশী দেখা যায়, আবার কারও আচরণে প্রতিরোধের (Resistance) চেষ্টা খুব প্রবল মাত্রায় প্রকাশ পায়। বন্ধুতামূলক আচরণও বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে প্রচুর মাত্রায় দেখা যায়। খুব শৈশব থেকেই এই দু'ধরনের আচরণ শিশু
গড়ে ওঠে এবং সামাজিক বিকাশ স্বাভাবিক সহজ পথে অগ্রস
মধ্যে বাধ্যতামূলক আচরণের সংখ্যাই দিন দিন বেড়ে ও
শিশুকে আর সকলের সঙ্গে সুস্থ সমাজজীবন যাপনে স
নানা প্রতিকূল পারিবেশিক কারণে অনেক সময়ে শ
মধ্যে বেড়ে ওঠে এবং পরে শিশু অসামাজিক ব্যক্তি
মেনজার্টের (Mengert) একটি পরীক্ষণে প্রকা
বন্ধুতামূলক আচরণ শত্রুতামূলক আচরণের চেয়ে

আচরণ দেখা যায়।
প্রতিরোধ করে। প্রতি-
করা, চীৎকার করে কাঁদা
চেষ্টা দেখা দেয় অবাধ্যতা ও
বলে সে তা করে না। এই
নক (Negative) আচরণের
ময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই

সমানুভূতি (Sympathy)

বিভিন্ন ধরনের সামাজিক আচরণের মধ্যে
গুরুত্ব প্রচুর। অপরের দুঃখে দুঃখ এবং সুখে

ভূতি। এই আচরণটি ব্যক্তির নিজস্ব সঙ্গতিবিধানে যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তেমনই সমাজজীবন গঠনেও এর সহায়তা অপরিহার্য। বস্তুত সমস্ত সমাজজীবনের ভিত্তি ও সংগঠন দুইই সমানুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত। সমানুভূতিমূলক আচরণ করার প্রবণতা ও শক্তি নিয়ে শিশুমাত্রেই জন্মে থাকে কিন্তু আচরণটির মাত্রা ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে শিশুর পরিবেশ ও প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিবিধানের উপর। তাছাড়া সমানুভূতি প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে অতীত অভিজ্ঞতার উপর। সমানুভূতিমূলক আচরণমাত্রের মধ্যে আছে অভেদীকরণ (Identification) নামে একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ অপরের সুখ বা দুঃখের সময় নিজেকে তার সঙ্গে আংশিক বা সম্পূর্ণ অভিন্ন বলে মনে করা। এই অভিন্নতাবোধ যত বেশী হবে সমানুভূতির মাত্রা ও তীব্রতাও তত বাড়বে। বলা বাহুল্য যে কারও দুঃখ বা সুখে-সমানুভূতি প্রকাশ করতে হলে ব্যক্তির নিজের সেই ধরনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকাটা অপরিহার্য। দেখা গেছে যে খুব ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে সমানুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব হয় না, কেননা দুঃখ বা সুখের বিভিন্ন কারণ বা চিহ্নগুলির সঙ্গে তারা পরিচিত নয়। কেউ জোরে কেঁদে উঠলে শিশুও কেঁদে উঠতে পারে। কিন্তু কারও হাত পা ভেঙে গেলে বা কোন জায়গা ফুলে উঠলে ব্যক্তি যে দুঃখ বোধ করে সে দুঃখে ছোট শিশুরা দুঃখ অনুভব করে না কেননা তারা জানেই না যে এগুলি দুঃখ বা ব্যথার চিহ্ন। কিন্তু যত তারা বড় হয় ততই বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তারা এই সব চিহ্নগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে এবং সকল রকম সমানুভূতিমূলক আচরণ করতে সমর্থ হয়।

সমানুভূতিমূলক আচরণগুলি যাতে শিশুর মধ্যে ভালভাবে বিকশিত হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়াটা শিক্ষার কর্মসূচীর অন্তর্গত। কেননা সমাজের আর দশজনের সঙ্গে শিশু কি প্রকারের সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হবে তা বিশেষভাবে নির্ভর করে এই আচরণটির উপর। যদি তার সমানুভূতি স্বাভাবিক পথে বিকশিত হয় তবে তার সঙ্গতিবিধানের কাজটাও সুষ্ঠু ও আয়াসহীন হবে এবং তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশও স্বাস্থ্যময় এবং সুষম হয়ে উঠবে। আর যদি শিশুর মধ্যে সমানুভূতি সুবিকশিত না হয় তবে তার সঙ্গতিবিধান প্রতি পদে বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং ব্যক্তিসত্তার বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠবে।

সমানুভূতিমূলক আচরণ অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে শিশুকে শেখানো যায় না। কেননা শিশুর সমানুভূতিমূলক বোধ ও আচরণ নির্ভর করে অসংখ্য বস্তুর উপর।

তবে শিশুর চারপাশের বয়স্কেরা তাঁদের আচরণের মাধ্যমে শিশুর সামনে সমানুভূতির সুদৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন এবং পরোক্ষভাবে তাকে সমানুভূতিমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করতে পারেন। তা ছাড়া রাগ, বিরক্তি, ঘৃণা ইত্যাদি সমানুভূতির বিরোধী প্রক্ষোভগুলি যাতে শিশুর মধ্যে বেশী মাত্রায় না জন্মায় সেদিকেও যত্ন নেওয়া আবশ্যক। প্ররোচনা, আলোচনা ইত্যাদির সাহায্যেও সময় সময় শিশুর মধ্যে সমানুভূতি জাগান যায়।

বন্ধুতা (Friendship)

শিশুর মধ্যে ভালবাসার প্রক্ষোভ জাগার সময় থেকে বন্ধুত্বমূলক আচরণও দেখা দেয়। দু'বছর বয়স থেকেই শিশু বন্ধুত্ব পাতাতে সুরু করে এবং যত বড় হয় তত তার বন্ধুত্বমূলক আচরণের পরিধি বাড়তে থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু নির্বাচনের মাপকাঠিও বদলে যায়। নিজের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিশু তার বন্ধু নির্বাচন করে। সাধারণত বন্ধুদের মধ্যে উচ্চতা, ওজন, বুদ্ধি, পড়াশোনা, খেলাধুলা, হবি ইত্যাদির দিক দিয়ে মিল থেকে থাকে। যদিও সব ক্ষেত্রেই এই সব মিল দেখা যায় না তবে এ কথাটি সত্য যে কোন একটি ব্যাপারের মিল থেকেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং ঐ মিলটির স্থায়িত্বের উপর বন্ধুত্বেরও স্থায়িত্ব নির্ভর করে। একই স্থানে বা একই সামাজিক সংগঠনের মধ্যে থাকার জন্যও শিশুতে শিশুতে বন্ধুত্ব হয়ে থাকে। তা ছাড়া বন্ধুত্ব সৃষ্টিতে শিশুদের পরিবারের আদর্শ ও সাংস্কৃতিক মান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবেশিক বৈশিষ্ট্য ইত্যাদিও প্রচুর পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

আক্রমণধর্মিতা (Aggression) ও প্রতিরোধ (Resistance)

অতি শৈশব থেকেই শিশুর মধ্যে প্রতিরোধমূলক আচরণ দেখা যায়। ছোট শিশুকে স্নান করাতে বা জামা পরাতে গেলে সে প্রতিরোধ করে। প্রতিরোধের প্রাথমিক অভিব্যক্তি হল হাত-পা শক্ত করা, চীৎকার করে কাঁদা ইত্যাদি। বড় হয়েও শিশুর এই প্রতিরোধের প্রচেষ্টা দেখা দেয় অবাধ্যতা ও একগুয়েমির রূপে। তাকে কোন কিছু করতে বললে সে তা করে না। এই প্রতিরোধমূলক মনোভাব চরম অবস্থায় নেতিমূলক (Negative) আচরণের রূপ নেয় এবং যৌবনাগমের (Adolescence) সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই নেতিমূলক আচরণ বিশেষভাবে দেখা যায়।

প্রতিরোধমূলক আচরণের প্রথম কারণ হল যে শিশু প্রচলিত সামাজিক আচরণগুলির প্রকৃত স্বরূপটি ভাল করে জানতে চায় এবং সেই সঙ্গে নিজের শক্তির একরকম যাচাই করে নিতে চায়। দ্বিতীয়ত, পিতামাতা বা অন্যান্য বয়স্কেরা শিশুর সঙ্গে আচরণের সময় তার ইচ্ছা বা চাহিদাটি ঠিকমত ধরতে পারেন না বা ধরার চেষ্টাও করেন না। এজন্য তারা প্রায়ই তাঁর পছন্দবিরোধী কাজ করে থাকেন এবং তার ফলে শিশুর মধ্যে প্রতিরোধমূলক আচরণ দেখা দেয়। তৃতীয়ত, অনেকক্ষেত্রে পিতামাতা, শিক্ষক, সমাজনেতা প্রভৃতির নির্দেশগুলি শিশু ঠিকমত বুঝতে পারেনা এবং সেগুলিকে সে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করে প্রতিরোধমূলক আচরণ করে। চতুর্থত, অনেক ক্ষেত্রে শিশুর শক্তির বাইরে কোন কাজ দিলে তার মধ্যে প্রতিরোধমূলক আচরণ দেখা দেয়। যে শিশু অঙ্কেতে কাঁচা তাকে অঙ্ক কষতে বললে সে স্বভাবতই প্রতিরোধ করবে। কিন্তু যদি তাকে ভাল করে অঙ্ক শেখান যায় তাহলে তার মধ্যে প্রতিবোধও আর থাকবে না।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রতিরোধমূলক আচরণ নানা কারণে কমে আসে। প্রথমত, শিশুর সামাজিক সচেতনতা ও দলপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং সে নিজে থেকেই সামাজিক রীতিনীতি, প্রথা, অনুশাসন ইত্যাদি মানতে ইচ্ছুক হয়। দ্বিতীয়ত, তার বুদ্ধি ও উপলব্ধিশক্তি বাড়ার ফলে আগে যে সব নির্দেশ ও উপদেশকে সে তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ বলে মনে করত এখন সেগুলি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা সে নিজেই বুঝতে পারে। তৃতীয়ত, বহু-ক্ষেত্রে মনে মনে আপত্তি থাকলেও অপ্রীতিকর বা অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতি এড়িয়ে যাবার জন্য কাজটি বা নির্দেশটির বিরুদ্ধে বাইরে সে কোনরূপ প্রতিরোধ প্রকাশ করে না। অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক পরিবেশ, বয়স্কদের বিবেচনাহীন আচরণ প্রভৃতি কারণে কোন কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে এই প্রতিরোধের প্রচেষ্টা বড় হওয়া পর্যন্ত থেকে যায় এবং তার ফলে তার সামাজিক সম্পর্কের সুষ্ঠু বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

আক্রমণধর্মিতা ও প্রতিবোধের মধ্যে নিকট সম্পর্ক আছে। আক্রমণধর্মী আচরণের মধ্যে অপরের প্রতি প্রতিরোধের প্রবণতা তো আছেই, উপরন্তু তাকে আক্রমণ করার প্রচেষ্টাও এর অন্তর্গত। সাধারণত রাগ থেকেই এই আচরণ জন্মায় এবং শৈশব থেকেই শিশুর মধ্যে এই আচরণ দেখা যায়। শিশু বড় হলে মারামারি করা, যুদ্ধ করা, ঝগড়া করা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে এই

আচরণ প্রকাশ পায়। আরও বড় হলে এই ধরণের বাহ্যিক প্রকাশ অনেক কমে আসে কিন্তু নানা পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত আচরণের মধ্যে দিয়ে আক্রমণধর্মিতার মনোভাবটি প্রকাশ পায়। পরিণত জীবনে আক্রমণধর্মিতা দৈহিক আক্রমণের স্তর ছেড়ে মনোবৈজ্ঞানিক আক্রমণের স্তরে ওঠে এবং নিন্দা, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, সমালোচনা, অপরকে নিয়ে বিদ্রূপ, কেউ আঘাত পেলে বা বিপদগ্রস্ত হলে হাসা, উপহাস করা ইত্যাদি ধরনের আচরণের মধ্যে দিয়ে আমাদের এই মনোভাবটি অভিব্যক্ত হয়।

স্থূল আক্রমণের ইচ্ছাকে মার্জিত আক্রমণমূলক আচরণে পরিবর্তন করাকে উন্নীতকরণ (Sublimation) বলা হয়। সমাজের প্রচলিত প্রথা, রীতি-নীতি শালীনতাবোধ, অপরের সুদৃষ্টান্ত, রুচিবোধ ইত্যাদি কারণে শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার আক্রমণধর্মিতার অভিব্যক্তিকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত করে ফেলে। এই পরিবর্তনের কাজে শিক্ষক পিতামাতা প্রভৃতি তাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। শিশুর এই আক্রমণধর্মিতা যাতে সৃজনমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হতে পারে তার জন্য উপযুক্ত সুযোগ শিশুকে দিতে হবে। যেমন, নানা ধরনের প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলায় শিশুকে অংশগ্রহণ করতে দিলে তার আক্রমণধর্মিতা আর অসামাজিক পন্থায় প্রকাশ পায় না।

প্রতিরোধমূলক এবং আক্রমণধর্মী আচরণের একটা ভাল দিক আছে। অল্পমাত্রায় প্রতিরোধমূলক আচরণপ্রবণতা সকলের মধ্যেই থাকা দরকার, কেননা কারও নির্দেশ মত কোন আচরণ করার আগে আচরণটির প্রকৃতি বিবেচনা করে দেখা ও প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য মানসিক প্রতিরোধের প্রয়োজন। তেমনই প্রতিযোগিতামূলক সামাজিক পরিবেশে সাফল্যলাভের জন্য সংযতমাত্রায় আক্রমণধর্মিতাও অপরিহার্য।

প্রতিযোগিতা (Competition)

শিশুদের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধ জাগার সময় থেকেই তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার আচরণ দেখা যায়। সাধারণত স্কুল জীবনের সুরু থেকেই শিশুরা অপরের কাছ থেকে নিজেদের কাজের সমর্থন ও প্রশংসা পাবার জন্য উৎসুক হয় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। এই প্রতিযোগিতার মনোভাব শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে বেড়েই চলে এবং বলতে গেলে সারাজীবনই অব্যাহত থাকে।

শিশু যাতে তার কাজে যথাসাধ্য শক্তি ও প্রচেষ্টা নিয়োগ করে তার জন্য আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় এই প্রতিযোগিতামূলক আচরণের সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। স্কুলে শ্রেণী উন্নয়ন, পরীক্ষার নম্বর দেওয়া, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি প্রথাগুলি শিশুর প্রতিযোগিতামূলক আচরণকে তীব্র করে তোলে এবং তার ফলে শিশু অপরের কাছে নিজের মূল্য প্রমাণ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে। বাড়ীতেও পিতামাতারা নানা পদ্ধতির সাহায্যে শিশুর মধ্যে এই প্রতিযোগিতার মনোভাবকে তীব্রতর করার চেষ্টা করেন। যেমন, কোন শিশুর কাজের সমালোচনা করার সময় তাকে অন্য কোন শিশুর সঙ্গে প্রায়ই তুলনা করা হয়ে থাকে।

প্রতিযোগিতামূলক আচরণের সাহায্যে শিশুকে কাজে উৎসাহিত করা সম্ভব হলেও এই ধরনের মনোভাবের সাহায্য নেওয়ার একটা অত্যন্ত বিষময় দিকও আছে। যে সব বাড়ীতে বা স্কুলে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশের সৃষ্টি করা হয় সেখানে শিশুদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা অত্যন্ত স্বাভাবিক-ভাবেই দেখা দেয় এবং তাদের মধ্যে প্রীতি বা সহযোগিতার কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠে না। এর ফলে স্বাস্থ্যময় সমাজজীবন গঠনের প্রথম উপকরণ যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রীতিময় সম্পর্ক তারই অত্যন্ত অভাব দেখা যায়। ফলে শিশুরা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মপ্রিয় হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, প্রতি-যোগিতামূলক আবহাওয়ায় সকলের পক্ষে সাফল্য লাভ করা সম্ভব নয়। যারা প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয় তাদের মনের উপর অত্যন্ত প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আশাভঙ্গ, লজ্জা ও আত্মগ্লানি তাদের মানসিক স্বাস্থ্যকে নষ্ট করে দেয় এবং বহুক্ষেত্রে শিশুদের মধ্যে জটিল সমস্যামূলক আচরণ সৃষ্টি করে। সেইজন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে অতিরিক্ত প্রতিযোগিতার দ্বারা শিশুদের পরিবেশকে কখনও বিকৃত হতে না দেওয়া উচিত।

সহযোগিতা (Co-operation)

মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুদের পরিবেশে প্রতিযোগিতার পরিবর্তে সহ-যোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করা সব দিক দিয়ে ভাল। সহযোগিতামূলক আচরণে শিশুরা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পরিবর্তে দলগত উন্নতিকে বড় করতে শেখে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিশুর নিজের ব্যক্তিগত সাফল্যলাভই হল তার প্রচেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু সহযোগিতার ক্ষেত্রে দলগত সাফল্য হল তার

সকল প্রচেষ্টার প্রধানতম লক্ষ্য এবং সেই দলের একজন সদস্যরূপে সেই সাফল্যের সে একজন অংশীদার মাত্র। শিশুদের মনে এই দলগত আদর্শ সৃষ্টি করতে পারলে তাদের পরিবেশে পারস্পরিক সহযোগিতার আবহাওয়া স্বভাবতই সৃষ্ট হবে এবং মনোবিজ্ঞানীদের মতে সেই আবহাওয়া প্রতিযোগিতা-মূলক আবহাওয়ার চেয়ে শিশুর কোন অংশে কম অগ্রগতি হবে না। অপর পক্ষে সহযোগিতার ক্ষেত্রে শিশুদের মধ্যে তিক্ত রেষারেষি, ঈর্ষা, ঘৃণা ইত্যাদি অবাঞ্ছিত মনোভাবের সৃষ্টি হয় না। ববং তাদের সকলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি ও ঐক্য অক্ষুন্ন থাকে। তা ছাড়া সহযোগিতামূলক পরিবেশে ব্যক্তিগত সাফল্য বা উৎকর্ষের জন্য কোন স্বতন্ত্র অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হয় না বলে সকলেরই সাফল্যের চাহিদা অল্পবিস্তর পরিতৃপ্ত হয় এবং তার ফলে সমাজ-জীবন অধিকতর একতাবদ্ধ ও স্থায়ী হয়।

পাঁচ

জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর

(Different Stages of Development)

প্রত্যেক মানুষই তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের উপযোগী নানা-রকম দৈহিক ও মানসিক উপকরণ নিয়ে জন্মায়। কিন্তু তার জন্মের সময় সেগুলি থাকে নিতান্ত অপরিণত অবস্থায়। তারপর যতই দিন যেতে থাকে ততই সেগুলি এক অভ্যন্তরীণ বিকাশমূলক শক্তির প্রভাবে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে এবং শেষে এমন একদিন দেখা দেয় যখন সেগুলি তাদের পূর্ণ পরিণতিতে পৌছয়। মানব-সত্তার এই জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তরের আমরা বিভিন্ন নাম দিয়ে থাকি। যেমন, শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবনাগম, বয়ঃ-প্রাপ্তি ইত্যাদি। এই স্তরগুলির এই ধরনের বিভাজন সম্পূর্ণ কল্পনাজাত এবং এদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধেও বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ডক্টর আরনেষ্ট জোনসের মতে শৈশব থাকে পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত, বাল্যকাল বার বৎসর বয়স পর্যন্ত, যৌবনাগম বার থেকে আঠার এবং তারপর আসে বয়ঃপ্রাপ্তি। আবার কারও কারও মতে শৈশব থাকে সাত বৎসর পর্যন্ত, বাল্যকাল সাত থেকে চোদ্দ, যৌবনাগম চোদ্দ থেকে একুশ এবং একুশে দেখা দেয় পূর্ণ পরিণতি। এ সম্বন্ধে মতান্তর থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং স্তরগুলির মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট বয়সের সীমারেখা টানা যেতেই পারে না।

শৈশব (Infancy)

জন্মের আগে গর্ভাবস্থাতেই শিশুর বিকাশ-প্রক্রিয়া অনেকখানি সংঘটিত হয়ে থাকে। যেমন, শিশুর পূর্ণপরিণতি-প্রাপ্ত মস্তিষ্কের প্রায় চার ভাগের একভাগ তার জন্মের সময়ই তৈরী হয়ে থাকে। গেসেল (Gesell) এবং ম্যাকগ্র (Mcgraw) শিশুর ক্রমবিকাশকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, যথা দৈহিক, ভাষাগত, সঙ্গতিমূলক এবং ব্যক্তিক-সামাজিক।

দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি শৈশবের একটা বড় বৈশিষ্ট্য। একমাসে শিশু মাথা তুলতে পারে, দু'মাসে মাথা খাড়া করতে পারে, পাঁচ মাসে কোন কিছুর উপর ভর দিয়ে বসতে পারে, আট'ন মাসে দাঁড়াতে পারে, দশ মাসে

হামাগুড়ি দিতে পারে, বার মাসে কারও হাত ধরে চলতে পারে, পনেরো মাসে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে পারে এবং দেড় বছরে দৌড়তে পারে। শরীরের অন্যান্য অংশের চেয়ে মাথার বৃদ্ধি এই সময় অনেক দ্রুত হয়ে থাকে। চলা ফেরা করার ক্ষমতা শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিণতির উপর উপর নির্ভর করে, যেমন মেরুদণ্ড শক্ত হওয়া, হাড় ও পেশী সবল হওয়া ইত্যাদি। শৈশবে শরীরগঠনের এই অতিপ্রয়োজনীয় কাজগুলি ঘটে থাকে।

শিশু প্রথম ছ'মাসে অস্পষ্ট আওয়াজ, দু'একটা অর্থহীন শব্দের উচ্চারণ ইত্যাদি ছাড়া বিশেষ কিছুই করতে পারে না। কিন্তু এক বৎসর বয়স থেকেই সে কথা বলতে শেখে। কোন্ বয়সে কত কথা শিশু শেখে স্মিথ (Smith) তার একটা হিসাব দিয়েছেন।

বয়স :	১ বৎ	২ বৎ	৩ বৎ	৪ বৎ	৫ বৎ……১২ বৎ
শব্দসংখ্যা :	৪	২৭২	৮৯৬	১৫৪০	২০৭২……১৫,০০০

প্রথম প্রথম শিশুর প্রক্ষোভ থাকে অসংযত ও সরল প্রকৃতির। এই সময় সামান্য কারণে শিশুর প্রক্ষোভ জাগতে পারে এবং অতি অল্পেই প্রক্ষোভের প্রকৃতি বদলে যেতে পারে। তিন বৎসর বয়স পর্যন্ত প্রক্ষোভের এই অসংযত অবস্থা বর্তমান থাকে কিন্তু চার বৎসর বয়স থেকে সামাজিক পরিবেশের চাপে এই অসংযত প্রক্ষোভ ধীরে ধীরে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খল হয়ে উঠে।

শৈশবের এই সময়েই শিশুর নিজের সম্বন্ধে ধারণা গড়ে উঠতে থাকে। এই ধারণার প্রকৃতি অনেকখানি নির্ভর করে তার আশেপাশের আর সকলে তার প্রতি কি মনোভাব পোষণ করে তার উপর। শিশুকে যদি তার কাজে প্রশংসা বা উৎসাহিত করা হয় তবে তার আত্মবিশ্বাস সুদৃঢ় হয়ে ওঠে এবং সে ভবিষ্যতে আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি হয়। আর তাকে যদি সর্বদা নিন্দা বা শাসন করা হয় তবে সে দুর্বল ও আত্মবিশ্বাসহীন ব্যক্তিরূপে বড় হয়ে উঠে। আর যদি তাকে তাচ্ছিল্য বা অবহেলা করা হয় তাহলে সে হয়ে ওঠে আত্মকেন্দ্রিক ও অসামাজিক। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মতে শৈশবেই ব্যক্তির পরিণত বয়সের ব্যক্তিসত্তার কাঠামোটি তৈরী হয়ে যায় এবং এই সময়ে সে যে সকল অভিজ্ঞতা লাভ করে সেগুলিই তার ভবিষ্যৎ মনোভাব ও জীবনদর্শনের প্রকৃত রূপদান করে এবং তার পরিণত জীবনের আচরণকে সব দিক দিয়েই প্রভাবিত করে। অতএব শিশু তার পরিবেশের কাছ থেকে কি ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ

করে সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি রাখা দরকার। বিশেষভাবে দেখা উচিত যে, শিশু যেন উত্তেজনাপূর্ণ বা আঘাতাত্মক কোন অভিজ্ঞতার (trauma) সম্মুখীন না হয়। এই ধরনের প্রতিকূল অভিজ্ঞতা তার বিকাশমুখী মনে গভীর ছাপ রেখে যায় এবং তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বৃদ্ধিকে বিশেষভাবে ব্যাহত করে তোলে।

শিশুর অধিকাংশ আচরণই প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত। পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে ধীরে ধীরে সে নতুন জিনিষ শিখতে সুরু করে এবং তখনই তার প্রবৃত্তিমূলক আচবণ তার শিক্ষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হয়ে যায়। অতএব এই সময় শিশুকে কোন কিছু শেখাতে হলে তা যেন তার সহজাত প্রবণতার সমাভিমুখী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে শিশুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার কৌতূহল। সে তার চারপাশে যা দেখে তাই তার কাছে নতুন। অতএব তার জিজ্ঞাসার আর শেষ থাকে না। আবার কেবল প্রশ্ন করেই সে ক্ষান্ত হয় না অনেক কিছু সে নিজে পরীক্ষা করে, অনুসন্ধান করে এবং স্বহস্তে নাড়াচাড়া করে দেখে। শিশুর এই জানবার এবং অনুসন্ধানের ইচ্ছাকে তার শিক্ষার ক্ষেত্রে নিযুক্ত করলে শিশু স্বাভাবিকভাবে এবং অতি সহজেই শেখে।

শৈশবের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল শিশুর নির্ভরশীলতার মনোভাব। শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য শিশু অপরের উপর নির্ভর করেই, মনের দিক দিয়েও সে চায় সকলের মনোযোগ ও ভালবাসা। সে নিজেকে আর সবলের অনুরাগের একমাত্র কেন্দ্ররূপে দেখতে চায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যদিও স্বাভাবিকভাবে এই পরনির্ভরতার ভাবটি কেটে যায় এবং শিশু আত্মনির্ভর হতে শেখে, তবুও এই ভালবাসার আকাঙ্ক্ষাটি কিন্তু একেবারে চলে যায় না। শিশুকে নানা বিভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কখনও কখনও সে এমন পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়ে যেখানে সে খুব ভালভাবে সঙ্গতিবিধান করে উঠতে পারে না। ফলে তার আত্মবিশ্বাস বিশেষভাবে ধাক্কা খায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার মধ্যে হীনতাবোধ, ভীতি ইত্যাদি জাগে। তখন সে নানা প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। খেলা একটা এই ধরনের প্রচেষ্টা। খেলার মধ্যে দিয়ে শিশু সেই বিশেষ পরিস্থিতিটি কল্পনা করে নেয় এবং চেষ্টা করে সেই পরিস্থিতিটিকে স্ববশে আনার। একটা কাজ বার বার করাও শৈশবের একটি বিশেষ লক্ষণ। ফ্রয়েডের মতে এটি

পুনরাবৃত্তির (Repetition) মাধ্যমে শিশু কোন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতার প্রত্যুত্তর দেয় এবং যে পরিস্থিতিটিকে সে বাস্তবে আয়ত্ত করতে পারেনি সেটিকে সে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে।

শৈশবের যৌনতার (Sexuality) মধ্যে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে। পূর্বে মনে করা হত যে শিশুর কোনরূপ যৌন-সচেতনতা থাকে না এবং বেশ কিছু বয়স হলেই তবে তার মধ্যে যৌনবোধ দেখা দেয়। কিন্তু ফ্রয়েডের ব্যাপক গবেষণা থেকে এই ধারণা অসত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেখা গেছে যে বেশ সুতীব্র যৌনবোধ অতি শৈশব থেকেই শিশুর মধ্যে সক্রিয় থাকে এবং তার আচরণ ও বিকাশধারাকে বহু দিক দিয়ে প্রভাবিত করে।

শিশুর যৌনবোধ এবং পরিণত ব্যক্তির যৌনবোধের মধ্যে সর্বপ্রধান পার্থক্য হল এই যে শিশুর ক্ষেত্রে যৌন অনুভূতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ ও প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী অস্বাভাবিক প্রকৃতির হয়ে থাকে। স্বাভাবিক যৌনতা বলতে বোঝায় সেই যৌনবোধ যা ব্যক্তিকে প্রজননক্ষম আচরণ করতে প্ররোচিত করে। কিন্তু শিশুর যৌনতার সঙ্গে প্রজননমূলক উদ্দেশ্যের কোন সম্বন্ধ নেই। শিশুর ক্ষেত্রে যৌনশক্তি—ফ্রয়েড যার লিবিডো নাম দিয়েছেন—নানা অস্বাভাবিক পাত্র থেকে পাত্রান্তরে ঘুরে বেড়ায় এবং যৌবনের সুরুতে সেটি তার স্বাভাবিক আশ্রয়স্থলটি খুঁজে পায়।[১] তখন থেকে প্রজননমূলক আচরণের মধ্যেই তার যৌনতা সীমাবদ্ধ থাকে। ফ্রয়েডের মতে পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে যৌনতার লক্ষ্য হল প্রজনন, কিন্তু শিশুর ক্ষেত্রে সেটি কেবলমাত্র দৈহিক আনন্দলাভেই নিবদ্ধ থাকে এবং নিজের দেহের যে অঙ্গ বা যে প্রক্রিয়া থেকেই যৌন আনন্দ পাওয়া যায় শিশু তাতেই আসক্ত হয়। এই জন্য শিশুর যৌনতাকে স্বরতিমূলক (Auto-erotic) বলা হয়। পরে ধীরে ধীরে শিশুর যৌনবোধ নিজের দেহ ছেড়ে অন্য দেহের প্রতি নিবদ্ধ হয়। এই সময় ছেলে-দের আসক্তির পাত্রী হন তাদের মা, মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের বাবা। ফ্রয়েডের মতে এই আসক্তি যৌনমূলক এবং এই যৌনপ্রবণতাটির নাম তিনি দিয়েছেন ঈডিপাস কমপ্লেক্স (Oedipus Complex)।[২] শিশুর মধ্যে যখন এই কমপ্লেক্স দেখা দেয় তখন মার প্রতি তার ভালবাসার ক্ষেত্রে সে তার বাবাকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে এবং তাই থেকে বাবার প্রতি তার মনে একটা বিদ্বেষের ভাব জন্মায়। মেয়েদের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীতটি ঘটে। বোধের

১। পৃ: ১২৫—পৃ: ১২৭ ২। পৃ: ১২৯

পরিণতি। শৈশবে শিশু থাকে পুরোপুরি আত্মকেন্দ্রিক। যত সে বড় হয় ততই তার সামাজিকবোধ, বন্ধুপ্রীতি ও দলবাঁধার আকাঙ্খার রূপে দেখা দেয়। এই সময়ে সে আর একা থাকতে বা একা খেলতে চায় না। সকল সময়েই সে তার সমবয়সীদের সঙ্গ খোঁজে। ম্যাকডুগাল প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা একেই যৌথ-প্রবৃত্তি (Gregarious instinct) নাম দিয়েছেন।

বাল্যকালে যৌনতা প্রসুপ্ত অবস্থায় থাকার ফলে ছেলেদের এ সময় মেয়েদের প্রতি বা মেয়েদের ছেলেদের প্রতি কোন আকর্ষণ দেখা যায় না এবং ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এবং মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে এবং খেলতে ভালবাসে। ১০।১১ বৎসর বয়সের সময় থেকে ছেলেমেয়েদের মধ্যে অপর পক্ষের প্রতি আকর্ষণ দেখা দেয়।

এই দলপ্রীতি থেকে জন্ম নেয় শিশুর সামাজিক অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য। বাড়ীর এবং বাইরের অধিবাসীদের বন্ধন অতিক্রম করে সে বাইরের জগৎকে ভালবাসতে শেখে। সে বোঝে যে দলে থাকতে হলে তাকে দলের সমস্ত নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে। সমাজের আর সকলের নিন্দা প্রশংসাকে সে ধীরে ধীরে মূল্য দিতে শেখে। এইভাবে তার মধ্যে জন্মায় সমাজের প্রচলিত রীতি, নীতি, আচার-ব্যবহারের প্রতি আনুগত্যবোধ। এই সামাজিক অভিজ্ঞতা থেকেই আবার বিকশিত হয় শিশুর নৈতিক বোধ। কোনটি করণীয় কোনটি অকরণীয় সে শিক্ষাও সে পায় এই সময় থেকে। নীতি-জ্ঞান গঠনের পেছনে সামাজিক শাস্তি-পুরস্কার নিন্দা-প্রশংসা প্রভৃতি প্রেরণাবোধক গুলির প্রচুর প্রভাব থাকে।

বাল্যকালের শেষের দিকে, যাকে অনেকে কৈশোর (Later childhood) বলতে পারি, সেই সময়ে ছেলেমেয়েদের দল-প্রীতি অত্যন্ত প্রবলভাবেই দেখা দেয়। এ সময়টিকে দলবাঁধার কাল (Gang period) বলা হয়। এই সময় দল-বিশ্বস্ততা সকল প্রকার চিন্তা ও বিচারবুদ্ধিকে ছাপিয়ে যায় এবং অত্যন্ত গভীর-ভাবে শিশুর মনকে প্রভাবিত করে। দলের প্রতি আনুগত্য সময় সময় এতই তীব্র হয়ে দেখা দেয় যে দলের সম্মানরক্ষার জন্য তার প্রত্যেকটি কিশোর সদস্যই প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকে।

এই বয়সের ছেলেমেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খা তাদের বিভিন্ন খেলা-ধূলার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। শিকার করা, যুদ্ধ করা, প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা, কুস্তি, বক্সিং প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ছেলেরা নিজেদের সত্তাকে

প্রতিষ্ঠিত করাব প্রয়াস পায়। মেয়েরাও সাজসজ্জা, নাচ-গান অভিনয় এবং ঘরকন্না পুতুল খেলা প্রভৃতির মাধ্যমে আর সকলের দৃষ্টিতে নিজেদেব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে। খেলাকে এই জন্য অনেক মনোবিজ্ঞানী শিশুব প্রস্তুতির প্রচেষ্টা বলে বর্ণনা করে থাকেন। তবে খেলা যে এই সময় শিশুর নানা মানসিক চাহিদা ও স্পৃহাকে অভিব্যক্ত করে তাতে সন্দেহ নেই।

এই বয়সের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল নতুন কিছু সৃষ্টি কবার প্রচেষ্টা। কাঠের বা মাটিব জিনিস তৈবী করা, ছবি আঁকা, নৃত্য গীত প্রভৃতি কাজের দিকে এ সময় ছেলেমেয়েবা একটা সহজ আকর্ষণ বোধ করে এবং সুযোগ সুবিধা পেলেই কোন কিছু সৃষ্টি কবাব আনন্দে তাবা মেতে ওঠে। কিন্তু সাধাবণত এই সময় উপযুক্ত সাহায্য না পাওয়ার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের উৎসাহ কমে যায় এবং একটু বড হলেই এই অতি মঙ্গলকব প্রবণতাটি পবিপোষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। সেইজন্য যাতে এই বৈশিষ্ট্যটি সমুচিত সাহায্য ও উৎসাহ পেয়ে পুষ্ট হয়ে ওঠে সেদিকে শিক্ষক, পিতা, মাতা সকলের সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

শৈশবেব ও বাল্যকাল এবং কৈশোরের চিন্তাতেও প্রতিরূপের (image) আধিক্য একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গ্যাল্টনেব গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সকল রকম মানসিক কাজেই ছোট ছেলেমেয়েরা পরিণত ব্যক্তিব চেয়ে অনেক বেশী প্রতিরূপের সাহায্য নিয়ে থাকে।

মনোযোগের বিস্তারেব পরীক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে যে পরিণত ব্যক্তিব মনোযোগেব বিস্তাব ছোট ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী। অর্থাৎ একজন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি একটি কিশোর অপেক্ষা অনেক বেশী সংখ্যক বিষয়ে একসঙ্গে মনোযোগ দিতে পারে।

বুদ্ধিব বিকাশের দিক দিয়ে একথা প্রমাণিত হয়েছে যে বুদ্ধি শৈশব থেকে ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে ১৫।১৬ বৎসর বয়সে তাব পূর্ণ পরিণতিতে পৌছয় এবং তারপরে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া বুদ্ধি সাধারণত আর বাড়ে না।

বিচারকরণের শক্তি শৈশবে খুব কমই থাকে এবং সাত আট বছরের ছেলেমেয়ে সহজ সাধাবণ সমস্যা ছাড়া শক্ত কিছুর সমাধান করতে পারে না। ১১।১২ বৎসর বয়স থেকে শিশুব মধ্যে সত্যকারের বিচার ক্ষমতা জন্মায় এবং আরও কিছু বয়স বাড়লে তাব পক্ষে জটিল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়।

যৌবনাগম (Adolescence)

যৌবনাগমের সুরু যৌন-পরিণতিতে (Puberty)। যৌন-পরিণতি বলতে ছেলেদের ক্ষেত্রে বীর্যোৎপাদন ও মেয়েদের ক্ষেত্রে রজঃসৃষ্টি বোঝায়। ছেলেমেয়ে উভয় ক্ষেত্রেই এই সময় যৌন ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতালাভ ঘটে ও দেহে নানারূপ যৌনসূচক চিহ্নের আবির্ভাব হয়। এগুলিকে গৌণ যৌন চিহ্ন (Secondary sexual character বলা হয়।

কি ছেলে কি মেয়ে উভয়ের জীবনেই যৌবনাগম নানাদিক দিয়ে একটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কোন কোন প্রাচীন মনোবিজ্ঞানী এই সময়কে পীড়ন ও কষ্টের (Stress and strain) কাল বলে বর্ণনা করেছেন। আবার কেউ কেউ এই সময়টিকে অপরাধপরায়ণতার কাল বলে বর্ণনা করে থাকেন। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা কিন্তু এই ধরনের চরম বর্ণনাকে সম্পূর্ণ অতিরঞ্জন বলে মনে করে থাকেন। তবে একথা সত্য যে যৌবনাগম ব্যক্তির জীবনে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ সময় কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন প্রাপ্তযৌবনদের (Adolescent) জীবনে দেখা দেয় এবং এগুলি তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

যৌবনাগমকে আর্নেষ্ট জোনস শৈশবের পুনরাবৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন।[1] শৈশবে দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভগত ও যৌনমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে এক চরম অসংহতি ও বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, বাল্যকাল ও কৈশোরের আগমনে সে অসংহতি ও বিশৃঙ্খলা ধীরে ধীরে লোপ পায় এবং শিশু অত্যন্ত সন্তোষজনক-ভাবে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে। কিন্তু যৌবনের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে সেই বিশৃঙ্খলা ও সংহতি আকস্মিকভাবে আবার লোপ পেয়ে যায় এবং ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও যৌনমূলক জগতে এক বিরাট বিপর্যয় দেখা দেয়। শৈশবে যেমন তাকে এক নতুন জগতের অপরিচিত শক্তিগুলির সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করার জন্য প্রয়াস করতে হয়েছিল, যৌবনাগমেও সেইভাবে আবার তার চারপাশের পৃথিবীর সঙ্গে নতুন করে সঙ্গতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। শৈশবে যেমন নতুন পরিবেশের সঙ্গে ঠিক মত সঙ্গতিবিধান করতে না পারার জন্য বার বার তাকে দুঃখকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, যৌবনাগমেও তেমনই তার পুরাতন ও পরিচিত পরিবেশের সঙ্গে সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য

1. Adolescence is the recapitulation of infancy : Jones

তাকে প্রতিপদে ব্যর্থতা, লজ্জা ও হতাশা বরণ করতে বাধ্য করে। এই দিক দিয়ে শৈশবের সঙ্গে যৌবনাগমের একটা খুব বড় মিল আছে।

যৌবনাগমে ছেলেমেয়েদের মধ্যে এক সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন দেখা দেয়। এই সময়ে ছেলেমেয়ে উভয়ের দেহেই আকস্মিকভাবে এমন কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে যেগুলি পরিবার বা বাইরের আর সকলের দৃষ্টি সহজেই আকর্ষণ করে। অনেক ক্ষেত্রে বয়ঃপ্রাপ্তরা ছেলেমেয়েদের এই দৈহিক পরিবর্তনগুলিকে ভালভাবে নেন না এবং কখনও কখনও সেগুলি নিয়ে উপহাস, বিদ্রূপ এবং বিরূপ মন্তব্যও করেন। তার ফলে যৌবনপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েদের মনে একটা অস্বাচ্ছন্দ্যময় ও অস্বস্তিকর মনোভাব দেখা দেয় এবং তাদের আচরণ সঙ্কোচপূর্ণ ও আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। এর ফলে অনেক সময় তারা গুরুতর মানসিক আঘাতও পায় এবং বাস্তব থেকে নিজেদের অপসৃত করে নেয়।

বুদ্ধি বা মানসিক শক্তির দিক দিয়ে যৌবনপ্রাপ্তির সময় ছেলেমেয়েদের মনে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে না। তবে এই সময় বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলি তাদের সহজ বৃদ্ধি প্রচেষ্টার ফলে পূর্ণতালাভ করে। ফলে মননশক্তি, বোধশক্তি, বিচারশক্তি ইত্যাদি মানসিক সামর্থ্যগুলির দিক দিয়ে ছেলেমেয়েরা পরিণত ব্যক্তির সমকক্ষ হয়ে ওঠে। এই নবলব্ধ সামর্থ্যগুলি সম্বন্ধে তাদের মনে সচেতনতা দেখা দেয় এবং পরিবার বা সমাজের আর দশজনের মত তারাও ছোটবড় সমস্যার সমাধানে নিজেদের অভিমত নিয়ে এগিয়ে আসে। কিন্তু সাধারণত তাদের এই অগ্রক্ষেপকে অনেক পরিণত ব্যক্তিই অকালপক্বতা বলে মনে করেন এবং ধমক দিয়ে দূরে সরিয়ে দেন বা অগ্রাহ্য করেন। তার ফলে এই ছেলেমেয়েরা নিজেদের অবহেলিত বলে মনে করে এবং তাদের মনে সারা পৃথিবীর বিরুদ্ধেই একটা বিদ্রোহের ভাব দেখা দেয়।

প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সব চেয়ে বড় পরিবর্তন দেখা দেয় তাদের অনুভূতির রাজ্যে। বলতে গেলে সেখানে একটা ছোটখাট বিপ্লব ঘটে যায়। দেহের আকস্মিক পরিবর্তন, যৌন পরিণতি, মানসিক শক্তির পূর্ণতা লাভ, বাইরের জগতের উপর এগুলির প্রতিক্রিয়া, এসব মিলে প্রাপ্তযৌবনের মনে একটি বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং তার এতদিনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রক্ষোভের সংগঠনটি ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। নিজের বহুমুখী পরিপূর্ণতার নতুন উপলব্ধিতে যেমন একদিক দিয়ে তার মনে এক অনাস্বাদিত আনন্দ দেখা দেয়, তেমনই তার সামর্থ্য ও প্রয়োজনের প্রতি সমাজের উদাসীনতা ও তাচ্ছিল্য তার মনে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এর ফলে অধিকাংশ প্রাপ্তযৌবন-

কেই অন্তর্মুখী (introvert) বা আত্মকেন্দ্রিক (self-centred) হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই সময় বাইরের জগতের প্রতি তাদের মনে একটা বিক্ষোভের ভাব জাগে এবং অনেকেই মনে করে যে তাদের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করা হচ্ছে না বরং সকলে মিলে তাদের অন্যায়ভাবে নিপীড়ন করছে। পরিবার বা সমাজের অন্যান্য বয়স্ক লোকেরা প্রাপ্তযৌবনদের এই মানসিক চিন্তাধারা অনুসরণ করতে না পেরে অনেক সময় তাদের প্রতি সত্যই যথেষ্ট অবিচার করে থাকেন এবং তার ফলে তাদের মধ্যে এই ধরনের নিপীড়নমূলক মনোভাব (Persecution mentality) তীব্র হয়ে ওঠে।

এই নিপীড়নমূলক মনোভাব থেকেই প্রাপ্তযৌবনের মধ্যে জন্ম নেয় বিদ্বেষের মনোবৃত্তি। সহজেই সে কোন কিছু স্বীকার করতে বা মেনে নিতে চায় না। তার পরিণত বুদ্ধি ও উন্নত মননক্ষমতা তাকে জোগায় তার বিদ্রোহের পেছনে আত্মবিশ্বাস। সে প্রচলিত বিশ্বাস রীতিনীতি, ধর্মীয় বা সামাজিক মান প্রভৃতি সবেরই বিরোধিতা করে। সে নিজে সমাজসংস্কারকের ভূমিকা অভিনয় করতে চায়। তবে সমাজের প্রাচীন যা কিছু তা ভাঙ্গার মধ্যেই তার আনন্দ সীমাবদ্ধ থাকে, নতুন করে কিছু গড়ার প্রতি তার তেমন আগ্রহ দেখা যায় না।

যৌবনপ্রাপ্তিতে যৌনতা পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। সেই জন্য প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে যৌন চাহিদাকে খুব বড় স্থান দিয়েছিলেন; কিন্তু আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে এ সময় সত্যকারের যৌনচাহিদা তেমন কিছু অস্বাভাবিক বা তীব্র রূপ ধারণ করে না। বরং এই সময়ে যৌনঘটিত আকস্মিক শারীরিক পরিবর্তনগুলি ছেলেমেয়েদের কাছে মধুর বিস্ময়রূপে দেখা দেয় এবং তাদের যৌনচাহিদা মূলত প্রণয়ঘটিত কল্পনা ও চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। গভীর ভাববিলাসময় প্রেমের ঘটনা এ সময় ছেলেমেয়েদের জীবনে প্রায়ই ঘটে থাকে।

যৌন কৌতূহল কিন্তু এ সময় তীব্রতর আকার ধারণ করে এবং যৌনঘটিত রহস্য জানার জন্য প্রাপ্তযৌবনদের আগ্রহের সীমা থাকে না। কিন্তু অধিকাংশ দেশেই যথোপযুক্ত যৌনশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় প্রাপ্তযৌবনদের সে কৌতূহল হয় অতৃপ্ত থেকে যায়, নয় অবাঞ্ছিত স্থান থেকে তাদের অর্ধসত্য ও বিকৃত সত্য আহরণ করতে হয়। এর ফলে তাদের ভবিষ্যৎ যৌনজীবন অনেক ক্ষেত্রে সমস্যাজটিল হয়ে ওঠে।

যৌবন-প্রাপ্তির সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অবাস্তব কল্পনা ও দিবা-

স্বপ্নের আধিক্য। সর্বতোমুখী পরিণতি প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে যে সকল নতুন প্রয়োজনের সৃষ্টি করে সেগুলি বাস্তবে তৃপ্তি লাভ করতে পারে না। ফলে সে দিবাস্বপ্ন ও অলীক কল্পনার সাহায্য নেয় সেগুলিকে পূর্ণ করতে। প্রাপ্তযৌবনদের দিবাস্বপ্ন বিশ্লেষণ করলে দু'শ্রেণীর স্বপ্ন পাওয়া যায়, প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠামূলক বা আত্মগৌরবমূলক স্বপ্ন। যেমন, প্রাপ্তযৌবন স্বপ্ন দেখে যে সে পড়াশোনায় প্রথম হচ্ছে বা খেলায় সব চেয়ে সেরা স্থান অধিকার করছে বা কোন দুঃসাহসিক কাজ করছে ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর স্বপ্ন হচ্ছে প্রণয়মূলক। যেমন, সে তার আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়ী বা প্রণয়িনীকে লাভ করছে। প্রাপ্তযৌবনদের অধিকাংশ দিবাস্বপ্নই তীব্র প্রক্ষোভে নিষিক্ত থাকে এবং এই ধরনের অলীক কল্পনার সাহায্যে সে তার অতৃপ্ত প্রক্ষোভের তৃপ্তি সাধন করে। সে দিক দিয়ে প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে দিবাস্বপ্নের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে। এগুলি প্রাপ্তযৌবনদের মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করে এবং তাদের প্রাক্ষোভিক সাম্য বজায় রাখে। কিন্তু অতিরিক্ত ও অতি-অবাস্তব দিবাস্বপ্ন সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব-বিকাশের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায় সে কথাও খুবই সত্য।

প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা ও সমস্যা
(Needs and Problems of the Adolescent)

যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্তযৌবনদের দেহে মনে চিন্তায় ধারণায় ও অনুভূতিতে এক কথায় তাদের সমগ্রসত্তার মধ্যে প্রচণ্ড পরিবর্তন দেখা দেয়। এই বহুমুখী পরিবর্তন তাদের পূর্বতন সঙ্গতিবিধানের সমস্ত প্রয়াসকে নিষ্ক্রিয় করে তোলে এবং তাদের ক্ষেত্রে তখন পরিবেশের সঙ্গে নতুন করে আবার সঙ্গতি-বিধান করার প্রয়োজন হয়। তাদের নিজেদের চাহিদার মধ্যেও এই ধরনের বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেয়। তাদের দেহ, প্রক্ষোভ ও চিন্তার ক্ষেত্রে এই সব নানা পরিবর্তন থেকে তাদের মধ্যে বিভিন্ন নতুন নতুন চাহিদার সৃষ্টি হয়। বাল্যকালে তাদের চাহিদা মূলত শারীরিক ও কতকগুলি সহজ মানসিক প্রয়োজনে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু যৌবনাগমে তাদের মনের রাজ্যের আরও অনেক নতুন নতুন দরজা খুলে যায়। ধর্মাধর্ম, বৃহত্তর সমাজের আবেদন, ভাল-মন্দের বিচার, যৌনস্পৃহা, জীবনরহস্য সম্পর্কে কৌতূহল, নতুন নতুন ধারণা ও অনুভূতি তাদের মনকে পরিপ্লাবিত করে তোলে এবং তাদের মধ্যে নব নব প্রয়োজনের উত্তুঙ্গ তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সমস্যা তখনই দেখা দেয় যখনই তাদের এই নব অনুভূত

চাহিদাগুলি বাস্তবে অতৃপ্ত থেকে যায়। আমাদের প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় এই সব চাহিদা তাদের পুরাতন পরিচিত পরিবেশে সাধারণত তৃপ্ত হবার কোন সুযোগ পায় না। ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় অতৃপ্তি এবং অতৃপ্তি থেকে আসে অপসঙ্গতি (Maladjustment)। অপসঙ্গতি বলতে বোঝায় পরিবেশের সঙ্গে সুসঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য। প্রাপ্তযৌবনদের চারপাশে যে সব বিভিন্নধর্মী শক্তি আছে সেগুলির সঙ্গে তারা ঠিকমত মানিয়ে নিতে পারে না এবং এই অপসঙ্গতি থেকেই তাদের মধ্যে জন্মায় নানারকম অবাঞ্ছিত প্রবণতা, দুষ্কৃতি এবং সমস্যামূলক আচরণ।

যৌবনপ্রাপ্তি—ঝড়ঝঞ্ঝার ও অপরাধপ্রবণতার কাল কি?

যৌবনপ্রাপ্তির সময় অপরিহার্যভাবেই যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় একথা সত্য নয়। বরং স্বাভাবিকভাবে এই সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে নৈতিক সচেতনতার পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটে এবং এক উচ্চ আদর্শবোধ কম বেশী সব প্রাপ্তযৌবনের মনকেই প্রভাবিত করে থাকে। তবে যদি বিকৃত পরিবেশে সমস্যামূলক আচরণের দ্বারা প্রাপ্তযৌবনদের মন বিষাক্ত করে তোলা হয়, তাহলে তাদের অনুভূতিশীল মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং এক অস্বাভাবিক আক্রমণধর্মিতা তাদের মধ্যে জাগতে পারে। এই সব প্রাপ্তযৌবনদের পক্ষে তখন অপরাধপ্রবণ (Delinquent) হয়ে ওঠা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তারা যে মনোযোগ ও সহানুভূতি স্বাভাবিক পন্থায় পেল না অপরাধ-কর্ম সম্পাদনের দ্বারা তারা সেই মনোযোগ আদায় করার চেষ্টা করে। গুরুতর ক্ষেত্রে তারা পেশাদার দুষ্কৃতিকারীদের দলে যোগ দিয়ে ভবিষ্যৎ জীবনে গুরুতর অপরাধী হয়েও দাঁড়াতে পারে। কিন্তু এ পরিণতি একান্ত অস্বাভাবিক পরিবেশেই ঘটতে পারে। সাধারণ স্বাভাবিক পরিবেশে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে অপরাধী হবার কোনও প্রবণতা দেখা যায় না—এটি বহুপরীক্ষণ প্রমাণিত তথ্য।

অনেক প্রাচীন মনোবিজ্ঞানী যৌবনপ্রাপ্তিকে 'ঝড়ঝঞ্ঝার কাল' বা 'অপরাধ প্রবণতার কাল' বলে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত বহু পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এ মন্তব্যগুলি অতিশয়োক্তি। প্রকৃতপক্ষে প্রাপ্তযৌবনদের মনে প্রাক্ষোভিক বিপর্যয়, অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা এবং অনেক সময় উদ্দামতা দেখা দিলেও তাকে সত্যকারের ঝড়ঝঞ্ঝা বলে বর্ণনা করা চলে না। তাছাড়া এ সময় যেটুকু বিপর্যয় ও অসঙ্গতি দেখা দেয় তা স্থায়ীও নয়। এই ধরনের সাময়িক অপসঙ্গতি তখনই সৃষ্টি হয় যখন তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনগুলি ঠিকমত তৃপ্ত হয় না।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে একমত যে উপযুক্ত যত্ন ও মনোযোগ, সুবিবেচনা ও সহানুভূতি, মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রাপ্তযৌবনদের বিভিন্ন সমস্যাগুলি সমাধান করার চেষ্টা করলে তাদের মধ্যে এ ধরনের কোনও আচরণমূলক সমস্যা দেখা দেয় না এবং সুস্থ ও সুষম ব্যক্তিসত্তা নিয়ে তারা গড়ে উঠতে পারে। বিশেষ করে এ সময় তাদের মধ্যে যে সব বহুমুখী চাহিদা দেখা দেয় সেগুলির তৃপ্তির আয়োজন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

ষ্ট্যানলী হল, হলিংওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা প্রাপ্তযৌবনদের চাহিদা নিয়ে বিস্তারিত পর্যবেক্ষণ করে তাদের প্রধান প্রধান চাহিদার বিবরণী দিয়েছেন। তাঁদের সেই সব পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে এবং প্রাপ্তযৌবনদের বিভিন্ন পরিবর্তনের গুরুত্ব বিচার করে তাদের প্রধান প্রধান চাহিদাগুলির একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল। যেমন,

১। মুক্ত সক্রিয়তার চাহিদা (Need for Free Activity)

এ সময় ছেলেমেয়েদের সর্বদেহে একটা আকস্মিক বৃদ্ধি দেখা দেয়। এই দৈহিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সক্রিয়তার সুযোগ এবং মুক্ত বাতাস ও রোদে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অবাধ সঞ্চালনের অবকাশ। খেলাধূলা, দৌড়ঝাঁপ, ভ্রমণ, পিকনিক ইত্যাদির মাধ্যমে প্রাপ্তযৌবনদের এই মূল্যবান চাহিদাটির তৃপ্তি হতে পারে। সেইজন্যই মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্তি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে অপরিহার্য বলেই পরিগণিত হয়েছে।

২। স্বাধীনতার চাহিদা (Need for Freedom)

যৌবনপ্রাপ্তিতে যে প্রয়োজনটি ছেলেমেয়েদের মনে সর্বপ্রথম দেখা দেয় সেটি হল বন্ধনমুক্তির চাহিদা। আজন্ম তারা সব দিক দিয়ে পরের উপর নির্ভরশীল ছিল, কিন্তু আজ সেই পরনির্ভরতা থেকে তারা মুক্তি খোঁজে এবং সমাজের একজন হয়ে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে চায়। সে নিজে থেকেই নানা গুরুজনের দায়িত্ব বহন করতে এগিয়ে আসে, পরিবারের সাধারণ সমস্যা সম্বন্ধে মতামত দেয় এবং কোন কাজের ভার পেলে আনন্দ ও উৎসাহের সঙ্গে তা সম্পন্ন করে। ছেলেমেয়েদের এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তাদের মানসিক স্বাভাবিক পরিণতির ফল। মনের বিভিন্ন দিকের পূর্ণতা থেকেই তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ভরতা জাগে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার আগ্রহ দেখা দেয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের বয়ঃপ্রাপ্তরা প্রাপ্তযৌবনদের এই মনোভাবকে ভাল

চোখে দেখেন না, ফলে সংঘর্ষ অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং তাই থেকেই ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নানা রকম আচরণবৈষম্য দেখা দেয়।

৩। সমাজ-জীবনের চাহিদা (Need for Social Life)

যৌবনাগমের পূর্বে শিশু বৃহত্তর সমাজ সম্পর্কে একান্তই উদাসীন ছিল। তার নিকটতম পরিবেশ ছাড়া তার আগ্রহ দূরতর ক্ষেত্রে বিস্তৃত হত না। কিন্তু যৌবনাগমে তার পরিণত মনের দরজায় বৃহত্তর পৃথিবীর আবেদন এসে পৌঁছয়। নিজের ক্ষুদ্র পরিবেশের গণ্ডীর বাইরে মানবসমাজের সঙ্গে একাত্মতার এক অনুভূতি তার মনকে স্পর্শ করে। সে অপরের সঙ্গ খোঁজে, অপরিচিতের সঙ্গে পরিচিত হয়, নিজের স্বাধীনতা স্বেচ্ছায় গোষ্ঠীর স্বার্থে বিলিয়ে দেয়। স্কুল, ক্লাব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন প্রভৃতি নানাবিধ যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে প্রাপ্তযৌবনদের এই সমাজ-জীবনের প্রয়োজনটি তৃপ্ত হয়।

৪। যৌন-তৃপ্তির চাহিদা (Need for Sex Satisfaction)

যৌবনপ্রাপ্তির সময় থেকেই যৌনসচেতনতা পরিণতিলাভ করে। শৈশবে যৌনবোধ নিতান্তই অসংগঠিত ও অপরিণত অবস্থায় থাকে। বাল্যকালে যৌনতা থাকে সুপ্ত বা অবদমিত অবস্থায়। কিন্তু যৌবনাগমে এই যৌনবোধ পরিণত ও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তিকে সুস্থ ও স্বাভাবিক যৌনজীবন যাপনের জন্য প্রস্তুত করে তোলে। এই পরিণত যৌনসচেতনতা প্রকাশ পায় ছেলেদের ক্ষেত্রে সঙ্গিনী এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে সঙ্গীর জন্য কামনার রূপে। এই সময় ছেলেরা ও মেয়েরা পরস্পরের সঙ্গ কামনা করে এবং পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা ও মেলামেশায় আনন্দলাভ করে। সঙ্গী বা সঙ্গিনীর জন্য কামনা ছাড়াও যৌন চাহিদা আর একটি রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। সেটি হল যৌন কৌতূহল। এই সময় যৌনঘটিত বিষয় ও যৌন রহস্য সম্পর্কে জানবার জন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে অদম্য আগ্রহ দেখা দেয়। তাদের এ চাহিদা তৃপ্ত করার জন্য সমাজে বিজ্ঞানভিত্তিক যৌন শিক্ষাদানের আয়োজন থাকা একান্ত প্রয়োজন। যে সব সমাজে যৌন শিক্ষাদানের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই সে সব ক্ষেত্রে প্রাপ্তযৌবনেরা নানা উৎস থেকে অর্ধসত্য ও বিকৃত তথ্য সংগ্রহ করে এবং তার ফলে তাদের যৌনজীবন বিষময় হয়ে ওঠে।

৫। নতুন জ্ঞানের চাহিদা (Need for New Knowledge)

প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি পূর্ণতা লাভ করে এবং

বিভিন্ন মানসিক শক্তিগুলিও তাদের পরিণতিতে পৌঁছয়। ফলে তাদের স্বাভাবিক কৌতূহল অতি তীব্র হয়ে ওঠে এবং নতুন নতুন জ্ঞানলাভের প্রতি তাদের আকাঙ্খা দেখা দেয়। মানব অস্তিত্বের বহুমুখী ভাবধারার প্রতি তারা ক্রমশ আকৃষ্ট হয় এবং সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞানভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করার প্রয়াস তাদের মধ্যে দেখা দেয়। এই সময় প্রাপ্তযৌবনদের এই স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানলিপ্সাকে উপযুক্ত পথে পরিচালিত করার উপরই তাদের সার্থক জীবন-প্রস্তুতি নির্ভর করে।

৬। আত্ম-অভিব্যক্তির চাহিদা
(Need for Self Expression)

প্রাপ্তযৌবনদের প্রাক্ষোভিক তৃপ্তি প্রধানত নিজেদের অভিব্যক্ত ও প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। লেখাপড়া, খেলাধূলা, সঙ্গীত, অভিনয়, সৃজনীমূলক প্রচেষ্টা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তারা চেষ্টা করে নিজেদের বিকাশোন্মুখ সত্তাকে অভিব্যক্ত করতে এবং সমাজের আর সকলের কাছে নিজেদের মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করতে। এই চাহিদার তৃপ্তি প্রাপ্তযৌবনদের সুস্থ ও সুষম ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য। যে সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই অত্যাবশ্যক চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায় তারা দুর্বলচেতা, আত্মবিশ্বাসহীন ও জীবনসংগ্রামে পশ্চাদ্‌পদ হয়ে ওঠে।

৭। নীতিবোধের চাহিদা (Need for Moral Sense)

এই সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদির বোধগুলিও সুপরিণত হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে বিভিন্ন বস্তু বা কাজ সম্পর্কে নৈতিক মান তাদের মধ্যে নিতান্তই অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট আকারের ছিল। যৌবনাগমে তাদের এ সম্পর্কে একটা সুচিন্তিত ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসার প্রচেষ্টা দেখা যায়। নিজের বা পরের সকলের কাজই এ নীতিবোধের মাপকাঠিতে সে পরিমাপ করে এবং নিজে যদি কখনও তার এই নৈতিক মানের বিরোধী কাজ করে তা হলে সে তীব্র অপরাধবোধ থেকে কষ্ট পায়।

৮। আত্মনির্ভরতার চাহিদা বা বৃত্তির চাহিদা
(Need for Self-dependence or Need for a Vocation)

এ সময়ে ছেলেমেয়েদের নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তা করতে দেখা যায় এবং কেমন করে স্বনির্ভর হওয়া যায় সে সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন তাদের মনে উদয়

হয়। স্বাধীন উপার্জনক্ষম হয়ে নিজেকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার নানা পরিকল্পনা তারা মনে মনে রচনা করে। বিভিন্ন বৃত্তি ও উপার্জনের পন্থার প্রতি তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হতে দেখা যায়। অনেকে এই জন্য এই চাহিদাটিকে বৃত্তির চাহিদা বলেও বর্ণনা করে থাকেন।

৯। জীবনদর্শনের চাহিদা
(Need for a Philosophy of Life)

যৌবনপ্রাপ্তিতেই প্রথম ছেলেমেয়েদের মনে জীবন ও বহির্জগৎ সম্বন্ধে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্ন জাগে। মানুষের জীবনের অর্থ কি, কিসেই বা জীবনের সার্থকতা বা এই সৃষ্টির রহস্য কি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি তাদের মনকে বার বার দোলা দিয়ে যায়। এসব প্রশ্নের উত্তর তারা সর্বত্র সন্ধান করে এবং সেগুলি সম্বন্ধে যতটুকু তথ্য তারা সংগ্রহ করতে পারে তাই নিয়ে মোটামুটি একটা ধারণা গড়ে তোলে। এ সময় দরকার হল তাদের মধ্যে এমন একটি সন্তোষজনক জীবন দর্শন গড়ে তোলা যা তার ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালীকে প্রবুদ্ধ ও অর্থময় করে তুলতে পারবে।

প্রাপ্তযৌবনদের এই প্রয়োজনগুলির যদি যথাযথ তৃপ্তি না হয় তা হলে তাদের সঙ্গতিবিধান বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং তা থেকে তাদের মধ্যে নানারকম অবাঞ্ছিত মানসিক জটিলতা ও আচরণমূলক বৈকল্য দেখা দেয়। ফলে তাদের ক্রমবিকাশের সুষ্ঠু অগ্রগতি নানাভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে। যারা সাহসী তারা তাদের অতৃপ্ত চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য অসামাজিক ও অমঙ্গলকর পন্থা গ্রহণ করে এবং সমাজে অপরাধপরায়ণ (Delinquent) বলে কুখ্যাত হয়। যারা তা পারে না তারা আংশিক বা কৃত্রিম তৃপ্তিতেই সন্তুষ্ট থাকে বা তাদের চাহিদাকে দমন করতে বাধ্য হয়। অধিকাংশ প্রাপ্তযৌবনই দিবাস্বপ্ন বা অলীক কল্পনার মধ্যে দিয়ে তাদের চাহিদার তৃপ্তি খোঁজে। এর কোনটিই স্বাভাবিক বিকাশের লক্ষণ নয় এবং স্বাস্থ্যময় ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টিতে বিশেষ বাধাস্বরূপ। অতএব পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি সকলের কর্তব্য হল যাতে প্রাপ্তযৌবনদের প্রয়োজনগুলি যথাসম্ভব তৃপ্তিলাভ করে এবং তাদের মধ্যে অবাঞ্ছিত জটিলতা দেখা না দেয় সে দিক সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া।

প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে পিতামাতা ও শিক্ষকের কর্তব্য

প্রাপ্তযৌবন ছেলেমেয়েদের স্বাভাবিক বিকাশপ্রচেষ্টা যাতে কোনরূপ বাধাপ্রাপ্ত না হয় এবং তাদের মানসিক ও প্রাক্ষোভিক সমস্যাগুলির যাতে

যথাযথ সমাধান হয় তার জন্য পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি সকলেরই সহযোগিতা অপরিহার্য। প্রাপ্তযৌবনদের সর্বতোমুখী বিকাশকে স্বাস্থ্যময় ও সুষম করে তুলতে হলে পিতামাতা শিক্ষকদের কতকগুলি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। যেমন—

১। প্রাপ্তযৌবনদের সঙ্গে সহানুভূতি ও বিচক্ষণতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। তাদের শারীরিক পরিবর্তনগুলিকে সহজভাবে নিতে হবে এবং যথাসম্ভব তাদের সঙ্গে মানসিক সংঘাত এড়িয়ে চলতে হবে।

২। তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার চাহিদাকে তৃপ্তিদানের জন্য তাদের যথেষ্ট সুযোগ দিতে হবে। ছোটখাট দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তাদের উপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে তৃপ্ত করতে হবে।

৩। ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির উপর প্রাপ্তযৌবনদের সমগ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ে যদি তার প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারে তা হলেই তাদের ব্যক্তিগত সার্থকতাবোধ পরিতৃপ্ত হবে, নতুবা ব্যর্থতা বা আংশিক সাফল্য তাদের আত্মবিশ্বাসকে ক্ষীণবল করে তুলবে এইজন্য মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে বহুমুখী পাঠক্রমের প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজন। সেই কারণে আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে এমন সব বিভিন্নধর্মী পাঠ্য বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে যাতে প্রাপ্তযৌবনদের বিকাশমান বহুমুখী সম্ভাবনা ও প্রয়োজনগুলি তাদের পরিতৃপ্তি খুঁজে পায়। ভারতে সম্প্রতি প্রবর্তিত বহুসাধক বিদ্যালয়গুলিতে প্রচলিত গতানুগতিক এক-মুখী পাঠক্রমকে পরিত্যাগ করে নানা বিভিন্নধর্মী পাঠ্যবিষয়ের প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে প্রাপ্তযৌবনদের দীর্ঘ-অবহেলিত প্রয়োজনগুলি কিছু পরিমাণে পরিতৃপ্তি লাভ করবে সন্দেহ নেই।

৪। প্রাপ্তযৌবনদের সর্বতোমুখী বৃদ্ধিকে পূর্ণতালাভের সুযোগ দেবার জন্য প্রচুর পরিমাণে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর ব্যবস্থা রাখতে হবে। খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক সম্মেলন, ভ্রমণ, অভিনয় ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের সত্তার সব দিকগুলি যাতে অবাধে অভিব্যক্ত হতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

৫। এই সময়ে ছেলেমেয়েরা যাতে একটি উপযুক্ত জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারে সেদিক দিয়ে শিক্ষক ও পিতামাতাদের সক্রিয় ও সযত্ন সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন। তাদের ভাল ভাল বই পড়ার সুযোগ দেওয়া, জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি নিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করা, সেগুলি সম্বন্ধে সন্তোষজনক ধারণা গঠনে তাদের সাহায্য করা, প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার অবকাশ দিয়ে তাদের মধ্যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা ইত্যাদির সাহায্যে জীবন সম্বন্ধে একটি গঠনমূলক পরিকল্পনা গড়ে তুলতে ছেলেমেয়েদের সাহায্য করা উচিত। সুপরিকল্পিত প্রকৃতিবীক্ষণও কল্পনাশক্তি বিকাশের পক্ষে খুব সহায়ক এবং ভ্রমণ, পিকনিক, স্কাউটিং ইত্যাদির মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা যাতে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে পারে তার আয়োজন

করা উচিত। তাছাড়া নানাদেশ ভ্রমণের ফলে প্রাপ্তযৌবনদেব মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীও প্রসারিত হয় এবং তারা উদার জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারে।'

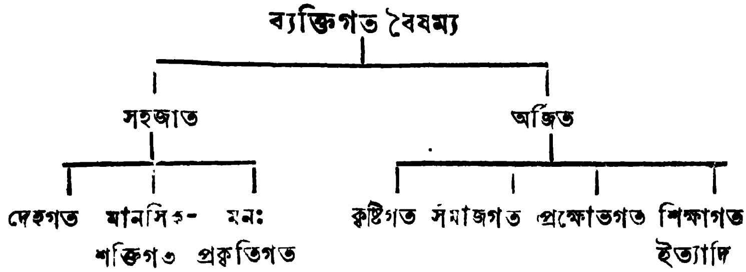
৬। যৌনবিষয় সম্বন্ধে প্রাপ্তযৌবনদেব নবজাগ্রত কৌতূহল মেটাবার জন্য প্রাপ্তযৌবনদেব পাঠক্রমের যৌনশিক্ষাব ব্যবস্থা বাখা একান্ত দবকার। যৌন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে যাতে ছেলেমেয়েরা বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানলাভ কবতে পারে তাব আয়োজন সর্বস্তবের পাঠক্রমেই অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

ছয়

ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual Difference)

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিশদ গবেষণার ফলে সাম্প্রতিককালে যে সব গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিটি। এই নীতির মূল কথা হল যে মানুষের মধ্যে নানা দিক দিয়ে প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান। অবশ্য ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই বৈষম্যের কথাটি বহু প্রাচীন কাল থেকেই আমাদের জানা, কিন্তু তার নিখুঁত ও যথার্থ স্বরূপটি আজ মনোবিজ্ঞানই আমাদের সামনে তুলে ধরেছে।

স্কুলের একই ক্লাশে পড়ে এমন একদল সমবয়সী ছেলেকে পরীক্ষা করলে আমাদের কাছে ব্যক্তিগত বৈষম্যের তত্ত্বটি পরিষ্কার হয়ে উঠবে। দেখা যাবে যে দেহের গঠন, ওজন, উচ্চতা, স্বাস্থ্য, গায়ের রঙ, চোখের রঙ প্রভৃতির দিক দিয়ে তাদের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য রয়েছে। কেউ দীর্ঘ, কেউ খর্ব। কারও স্বাস্থ্য খুব ভাল, কেউ চির-রুগ্ন, কারও চোখের রঙ কাল, কারও বা কটা ইত্যাদি। তেমনি আবার স্বভাব, হাব-ভাব, অভ্যাস ইত্যাদির দিক দিয়েও তাদের মধ্যে বৈষম্যের অন্ত নেই। কেউ হয়তো শান্ত, কেউ অশান্ত, কেউ নিষ্ঠুর কেউ কোমল, কেউ বাস্তবধর্মী, কেউ আবার স্বপ্নবিলাসী। পড়াশোনার দিক দিয়েও তাদের মধ্যে প্রচুর অমিল। কেউ হয়তো সহজেই পড়া শেখে, কারও শিখতে বেশ সময় লাগে। কেউ অতি সহজেই একের পর এক পরীক্ষার বেড়া ডিঙিয়ে এগিয়ে যায়, কেউ আবার নিম্নতম পরীক্ষাতেই ব্যর্থ হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এইভাবে দেখা যাবে যে নানা বিভিন্ন দিক দিয়ে তাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যগুলিকে শ্রেণীবিভাগ করলে আমরা নীচের বৈষম্যগুলি পাই। যথা—(১) দেহগত (Physical), (২) মানসিক শক্তিগত (Intellectual) (৩) মনঃপ্রকৃতিগত (Temperamental) (৪) প্রক্ষোভগত (Emotional) (৫) কৃষ্টিগত (Cultural) (৬) সমাজগত (Social), (৭) শিক্ষাগত (Educational) ইত্যাদি।



এই বৈষম্যগুলিকে আমরা আবার আর এক দিক দিয়ে দু'শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা সহজাত (inherited) এবং অর্জিত (acquired)। সহজাত বৈষম্যগুলিকে আমরা মৌলিক বৈষম্য বলে বর্ণনা করতে পারি। কেননা এই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্তি জন্ম থেকে উত্তরাধিকার-সূত্রে পেয়ে থাকে এবং সেজন্য সেগুলির ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে পার্থক্য থাকবেই। কিন্তু অর্জিত বৈষম্যগুলি ব্যক্তি এবং পরিবেশের সংঘাতে সৃষ্টি হয়ে থাকে এবং সেগুলির জন্য পরিবেশের পার্থক্য প্রধানত দায়ী। পরিবেশ যতই একরকম হয়ে ওঠে ততই এই অর্জিত বৈষম্যের পরিমাণও কমে যায়। অবশ্য এই অর্জিত বৈষম্য কখনও একেবারে লোপ পেতে পারে না এমন কি পরিবেশ সম্পূর্ণ অভিন্ন হয়ে উঠলেও নয়। তার কারণ হল এই যে অর্জিত বৈষম্যগুলির পেছনে পরিবেশের শক্তি প্রধানত কাজ করলেও ব্যক্তির সহজাত নিজস্ব শক্তিরও অবদান সেখানে থাকবেই এবং এই সহজাত শক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বলে তাদের সামগ্রিক ফল বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হবেই।

উপরে বর্ণিত বৈষম্যগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি অর্থাৎ দেহগত, মানসিক শক্তিগত ও মনঃপ্রকৃতিগত বৈষম্যগুলি হল সহজাত মৌলিক বৈষম্য। আর বাকীগুলি যেমন কৃষ্টিগত, প্রক্ষোভগত, সমাজগত ইত্যাদি বৈষম্যগুলি হল অর্জিত। অর্থাৎ এই বৈষম্যগুলি শিশুর মধ্যে জন্মের সময় থাকে না. কিন্তু পরে পরিবেশের প্রভাবের বিভিন্নতা হেতু তার মধ্যে দেখা দেয়। কিন্তু সহজাত বৈষম্যগুলি নিয়েই শিশু ভূমিষ্ঠ হয়।

অবশ্য কোন বৈষম্যকেই সম্পূর্ণ সহজাত বা সম্পূর্ণ অর্জিত বলা চলে না। বিভিন্ন সহজাত বৈশিষ্ট্যের প্রভাবও যথেষ্ট থেকে থাকে। তবু আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য এই শ্রেণীবিভাগটি গ্রহণ করা যেতে পারে।

সহজাত বৈষম্য ও বংশধারা

(Innate Differences and Heredity)

সহজাত বৈষম্যগুলি শিশুর বংশধারা বা উত্তরাধিকারের অংশবিশেষ। বংশধারা বলতে সেই বৈশিষ্ট্যগুলির সমষ্টিকে বোঝায় যেগুলি শিশু তার পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে জন্মের সময় পেয়ে থাকে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি আবার তার পিতামাতা তাঁদের পিতামাতাদের (অর্থাৎ শিশুর পিতামহ-পিতামহী, মাতামহ-মাতামহীদের) কাছ থেকে পেয়েছেন। তাঁরা আবার সেই বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁদের পিতামাতাদের (অর্থাৎ শিশুর প্রপিতামহ-প্রপিতামহী, প্রমাতামহ-প্রমাতামহীদের) কাছ থেকে পেয়েছিলেন। এভাবে বলা যেতে পারে যে শিশু যে বৈশিষ্ট্যগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে পায় সেগুলির মধ্যে তার সমস্ত পূর্বপুরুষদেরই অল্পবিস্তার অবদান আছে।

এখন এই বংশধারা বা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলি কিভাবে পিতামাতার কাছ থেকে শিশুর মধ্যে আসে ? এটি জানতে হলে প্রাণী সৃষ্টির রহস্য কিছুটা জানা দরকার।[১]

শিশু যখন জন্মায় তখন মাতৃগর্ভে দুটি কোষের (cell) সম্মেলন ঘটে। একটি আসে পিতার কাছে থেকে, তার নাম দেওয়া যেতে পারে পিতৃকোষ আর একটি আসে মায়ের কাছ থেকে, তাকে বলা যেতে পারে মাতৃকোষ। প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে থাকে তেইশটি করে সুতোর মত পদার্থ যাকে বলা হয় কোষতন্তু বা ক্রোমোজোম। এই প্রতিটি ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে আবার চল্লিশ থেকে একশটি করে অতি সূক্ষ্ম এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ যাকে বলা হয় জীন (Gene)। এই জীনই হল প্রকৃতপক্ষে উত্তরাধিকারের বাহক। শিশুর জন্মের সময় পিতৃকোষের এবং মাতৃকোষের জীনগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় এবং তাদের এই মিলনের উপর শিশুর বংশধারার স্বরূপ নির্ভর করে। শিশুর দৈহিক গঠন, গায়ের রঙ, উচ্চতা, চোখের রঙ, নাকমুখ চোখের আকৃতি, বুদ্ধি, মনের প্রকৃতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি নির্ধারিত করে এই পিতা ও মাতার মিলিত জীনগুলি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পিতৃ-মাতৃকোষের জীনগুলির মাধ্যমেই শিশু তার পিতামাতার কাছ থেকে তার সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলি লাভ করে থাকে এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলিকেই এক কথায় আমরা বংশধারা নাম দিয়ে থাকি।

১। প্রথম খণ্ড : পৃঃ ১৯৭

জীন সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা না গেলেও একটু জানা গেছে যে জীনের ক্ষমতা অসীম। মানুষের দৈহিক, মানসিক, চারিত্রিক সব রকম বৈশিষ্ট্যের মূলেই আছে জীনের ক্রিয়া। জীন সব সময় জোড়ায় কাজ করে, যার একটি আসে মাতৃকোষ থেকে আর একটি আসে পিতৃকোষ থেকে। জীনের এই জোড়াবাঁধার উপরেই বংশধারার প্রকৃতি পূর্ণভাবে নির্ভর করে। প্রত্যেক পিতা বা মাতার নিজস্ব জীনের গুণ ও প্রকৃতি বিভিন্ন হয়। প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের জন্ম পিতামাতার বিভিন্ন জীনের সম্মেলন থেকে হয় বলে একই পিতামাতার ছেলেমেয়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। একমাত্র সমকোষী যমজ ছেলে বা মেয়েদের ক্ষেত্রে জীনগুলি একই থাকে এবং সেজন্য তাদের বংশধারা একেবারে অভিন্ন হয়।

ত্রিবিধ সহজাত বৈষম

এই বংশধারা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রকৃতির দিক দিয়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যেমন, দৈহিক, মানসিক ও মনঃপ্রকৃতিগত। দৈহিক বংশধারার মধ্যে পড়ে ব্যক্তির দেহের গঠন, উচ্চতা, নাক ও মুখ-চোখের রঙ ও নানাপ্রকার অন্তর্দৈহিক বৈশিষ্ট্য। গ্রন্থিগত পার্থক্যও এই পর্যায়ে পড়ে। মানসিক বংশধারার মধ্যে প্রধানত পড়ে নানাবিধ মানসিক শক্তি ও বুদ্ধি। সবশেষে আসে মনের মৌলিক প্রকৃতি বা স্বরূপ, যাকে ইংরাজীতে টেমপারামেণ্ট বলা হয়। দেখা গেছে যে ব্যক্তি তার টেমপারামেণ্ট বা মনঃপ্রকৃতিটিও জন্ম থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে থাকে।

এই তিন শ্রেণীর বংশধারার বৈশিষ্ট্য থেকে তিন শ্রেণীর সহজাত বৈষম্যের উৎপত্তি হয়ে থাকে। যথা, দেহগত বৈষম্য, মানসিক শক্তিগত বৈষম্য ও মনঃপ্রকৃতিগত বৈষম্য।

দেহগত বৈষম্য (Physical Differences)

দেহগত বৈষম্য নানা শ্রেণীর এবং মাত্রার হতে পারে। জাতিগত বিভিন্নতা অনুযায়ী দৈহিক গঠন ও শরীরের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে পার্থক্য দেখা দিতে পারে। তাছাড়া ব্যক্তির বংশধারার বিভিন্নতার জন্যও মানুষে মানুষে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। একটি নিগ্রো ছেলের পাশে একটি ইউরোপীয় ছেলেকে বা একজন চীনদেশীয় ছেলের পাশে একটি রাজপুত ছেলেকে দাঁড় করালে দেহগত বৈষম্যের স্বরূপটি জানা যাবে। সুস্বাস্থ্য বা কুস্বাস্থ কিন্তু সহজাত নয়, পরিবেশের প্রভাব থেকে অর্জিত। তবে বিভিন্ন শারীরিক প্রবণতা, যাকে আমরা ইংরাজীতে কনস্টিটিউশান (Constitution) বলি, সেগুলি সহজাত বৈশিষ্ট্যের পর্যায়ে পড়ে।

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দেহগত বৈষম্যের মূল্য আজকাল খুব বেশী নয়। বর্তমান জগতে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সুনির্দিষ্ট শারীরিক বৈশিষ্ট্যের মূল্য বিশেষ কোথাও দেওয়া হয় না। তবে অঙ্গহীনতা বা শারীরিক কোন খুঁত থাকলে তা ব্যক্তির মনোভাব এবং ব্যক্তিসত্তা গঠনের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করে থাকে। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী অ্যাডলারের (Adler) পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেছে যে শারীরিক ত্রুটিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিম্নতাবোধ (Sense of inferiority) প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে।

মানসিক শক্তিগত বৈষম্য (Intellectual Differences)

মানসিক শক্তির দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে বৈষম্য দেখা যায় তার গুরুত্ব কিন্তু সব দিক দিয়েই বেশী।

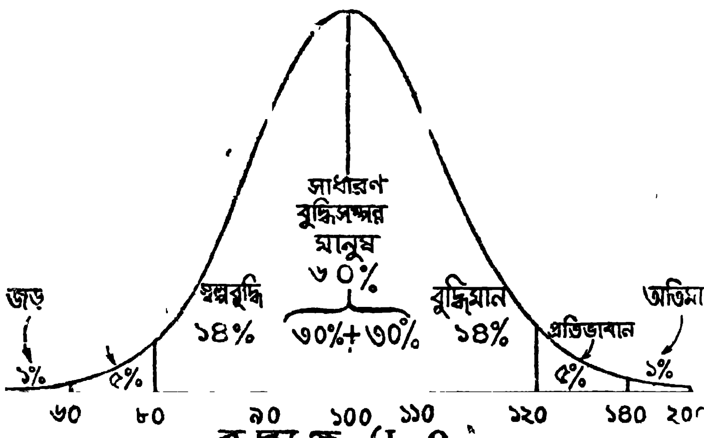
মানসিক শক্তিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, যথা, সাধারণ শক্তি ও বিশেষ শক্তি। সাধারণ শক্তি হল সেই শক্তি যেটি আমাদের সকল প্রকার কাজ করার পিছনেই থেকে থাকে। একেই আমরা সাধারণ ভাষণে বুদ্ধি (Intelligence) নাম দিয়ে থাকি। আর বিশেষ শক্তি হল সেই শক্তি যেটি ব্যক্তিকে বিশেষ কোন কাজ দক্ষভাবে সম্পন্ন করতে সমর্থ করে থাকে।

সাধারণ এবং বিশেষ, উভয় প্রকার শক্তির দিক দিয়েই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়।

সকল মানুষের যে বুদ্ধি সমান নয় এটি একটি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা। কিন্তু কার কত বুদ্ধি, বেশী হলে কত বেশী, কম হলে কত কম এ সম্বন্ধে নির্ভুলভাবে জানা এতদিন সম্ভব হয়নি। সেটি বর্তমানকালে জানা সম্ভব হয়েছে অধুনা আবিষ্কৃত বুদ্ধির অভীক্ষার সাহায্যে। বুদ্ধির অভীক্ষা হল বুদ্ধি পরিমাপ করার এক ধরণের যন্ত্র বা উপকরণ। এর দ্বারা কে কতটা বুদ্ধির অধিকারী তা নির্ভরযোগ্যভাবে জানা যায়। যে সংখ্যার দ্বারা বুদ্ধির পরিমাণ সূচিত হয় তাকে বুদ্ধ্যঙ্ক বলে। সাধারণ মানুষ অর্থাৎ যার বুদ্ধি স্বাভাবিক মানের চেয়ে কমও নয়, বেশীও নয়, তার বুদ্ধ্যঙ্ক হল ১০০। যার বুদ্ধি স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে কম তার বুদ্ধ্যঙ্ক হল ১০০'র কম এবং বুদ্ধি যত কম হবে বুদ্ধ্যঙ্কও তত কমে যাবে। তেমনি যার বুদ্ধি স্বাভাবিক মানুষের চেয়ে বেশী তার বুদ্ধ্যঙ্ক হল ১০০'র বেশী এবং বুদ্ধি যত বেশী হবে তত বুদ্ধ্যঙ্কও বেড়ে যাবে। কোন্ মানুষের কতটা বুদ্ধি আছে আজকাল তা নির্ণয় করা হয় এই বুদ্ধ্যঙ্কের সাহায্যে।[১]

১। প্রথম খণ্ড: বুদ্ধির পরিমাপ: পৃঃ ৮৭ দ্রষ্টব্য।

এই পরিমাপের সাহায্যে দেখা গেছে যে প্রকৃতি বুদ্ধির বণ্টনে অধিকাংশ লোকের প্রতি সুবিচারই করেছে। শতকরা প্রায় ৬০ জন লোকেরই আছে মাঝামাঝি বুদ্ধি এবং বুদ্ধ্যঙ্কের হিসাবে বলা যায় যে তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০ থেকে ১০০'র মধ্যে। আবার ৯০ বুদ্ধ্যঙ্কের নীচে আছে প্রায় শতকরা ২০ জন মানুষ। এরা হল প্রকৃতির অবহেলিত ছেলেমেয়ে। এদের এক কথায় বলা চলে ক্ষীণবুদ্ধি। এদের মধ্যেও আবার বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে নানা শ্রেণী বা স্তর আছে। ১১০ বুদ্ধ্যঙ্কের উপরেও সেই রকম আছে শতকরা ২০ জন। এরা প্রকৃতির দ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত। এদের নাম দেওয়া যায় উন্নতবুদ্ধি। এদেরও বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে বিভিন্ন স্তর বা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। জনসমাজে বুদ্ধির এই বণ্টনকে যদি চিত্রের আকার দেওয়া যায়, তবে আমরা ঘণ্টার আকারসম্পন্ন একটি ছবি পাব। অধিকাংশ লোক মাঝামাঝি বুদ্ধিসম্পন্ন বলে ছবিটির



[জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধির বণ্টনের আদর্শ চিত্ররূপ]

মধ্যভাগ উঁচু এবং ফোলা। জনসাধারণের মধ্যে ক্ষীণবুদ্ধি এবং উন্নতবুদ্ধি লোকদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম বলে ছবিটির দুপ্রান্ত ক্রমশ নীচু ও সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। এই ছবিটিকে স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র (Normal Distribution Curve) বলা হয়।[১]

ক্ষীণবুদ্ধি (Feebleminded)

আমরা দেখেছি যে প্রতি ১০০ জনের মধ্যে প্রায় ২০ জনের বুদ্ধি সাধারণ বুদ্ধির মানের চেয়েও কম। অর্থাৎ বুদ্ধ্যঙ্কের হিসেবে তাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৯০'র কম।

১। প্রথম খণ্ড : পৃঃ ১০৬

এদের বলা হয় ক্ষীণবুদ্ধি (Feebleminded)। এদের মধ্যে আবার ১৪ জন ক্ষীণবুদ্ধি হলেও মোটামুটি জীবনধারণের মত বুদ্ধি এদের আছে। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৮০ থেকে ৯০'র মধ্যে। এদের স্বল্পবুদ্ধি (Moron) বলা হয়। এরা কোন চিন্তামূলক কাজ করতে পারে না বা লেখাপড়ায় বেশীদূর এগোতে পারে না। খুব ঘসামাজা করলে বড় জোর প্রবেশিকা পরীক্ষার বেড়াটা ডিঙোতে পারে। কিন্তু শেখালে তারা হাতের কাজ ভাল ভাবেই শেখে। সহজ প্রকৃতির যন্ত্রপাতির কাজ, বেতের কাজ, বোনা, সেলাই ইত্যাদি কাজ শিখে সকল সমাজেই অনেক স্বল্পবুদ্ধিই সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিলে মিশে জীবন যাপন করে।

এর চেয়ে নীচের ধাপে যারা থাকে তাদের বলা চলে বোধহীন (Imbecile) এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৬০ থেকে ৮০'র মধ্যে। এরা রীতিমত বোকা। লেখাপড়া করা দূরে থাকুক ভাল করে নিজের মনের ভাবটাও এরা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারে না। চেষ্টা করলে মোটামুটি বইটা পড়া, নামটা সই করা ইত্যাদি অতি সহজ কাজগুলি এদের দ্বারা হতে পারে। এরা দায়িত্ব নিয়ে কোন কাজ করতে পারে না, তবে শিক্ষা পেলে সহজ হাতের কাজ এরাও শিখতে পারে। এদের সংখ্যা আনুমানিক শতকরা ৫টি।

সর্ব চেয়ে শেষ ধাপে আছে জড় (Idiot)। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ৬০'রও নীচে। এদের সম্বন্ধে লেখাপড়ার কথা ওঠে না। এরা ভাল করে কথাও বলতে পারে না, বললেও বোঝে না। এরা একা চলাফেরা করতে পারে না। নিজেদের ভালমন্দও বোঝে না। অনেক চেষ্টা করলে এদের ছোটখাট কাজ করতে শেখান যায়। সংখ্যায় এরা শতকরা একজন।

প্রকৃতির অবহেলিত এই ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব আজকাল সকল সভ্য মানব সমাজই স্বীকার করে নিয়েছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে বা প্রচলিত পদ্ধতিতে এদের শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। স্বল্পবুদ্ধি (Moron) ছেলেমেয়েদের সাধারণ স্কুলে পড়ানো চললেও তাদের জন্য পৃথক শ্রেণীবিভাগ এবং বিশেষ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হয়। বোধহীন (Imbecile) এবং জড় (Idiot) ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষ শিক্ষায়তনের ব্যবস্থা আধুনিক সব দেশেই আছে। এই বিশেষ শিক্ষায়তনগুলিতে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধনের জন্য বিশেষ পন্থা নেওয়া হয় এবং ইন্দ্রিয়ানুভূতির উন্নয়নে দ্বারা বুদ্ধির অভাব মেটানোর চেষ্টা করা হয়। ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার একটা সম্পর্ক পাওয়া গেছে। কিশোর বয়সে যে সব ছেলেমেয়ে দুষ্কৃতিপরায়ণ হয়ে ওঠে তাদের মধ্যে দেখা গেছে

যে অনেকেই নিম্নবুদ্ধিসম্পন্ন। প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদেরও পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে তাদের মধ্যে নিম্নবুদ্ধির সংখ্যাই বেশী। বুদ্ধি অল্প থাকার ফলে এসব ব্যক্তির বিচারকরণের ক্ষমতা কম থাকে এবং তার জন্য ভবিষ্যৎ কর্মের গুরুত্ব তারা বুঝতে পারে না। ফলে তারা সহজেই প্রলোভনে ভুলে যায় এবং গুরুতর অপরাধ করতেও ইতস্তত করে না।

উন্নতবুদ্ধি (Gifted Children)

নিম্নবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের মত উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদেরও বুদ্ধির মানের দিক দিয়ে শ্রেণীবিভাগ করা চলে। যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১১০ থেকে ১২০'র মধ্যে তারা বুদ্ধির দিক দিয়ে সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে এক ধাপ উপরে। ক্লাশে বা বাড়ীতে তাদের আমরা সাধারণত চালাক বা বুদ্ধিমান (Bright) আখ্যা দিয়ে থাকি তারাই এই পর্যায়ে পড়ে।

এর উপরের ধাপে পড়ে প্রতিভাবানের (Genius) দল। এদের বুদ্ধ্যঙ্ক ১২০ থেকে ১৪০'র মধ্যে। আচারে ব্যবহারে লেখাপড়ায় এদের নিঃসন্দেহে সাধারণ ছেলেমেয়েদের থেকে যথেষ্ট পৃথক বলে মনে হয়। ১৪০'র উপর যাদের বুদ্ধ্যঙ্ক তাদের সংখ্যা খুবই কম। এদের অতিমানবের (Superman) পর্যায়ে ফেলা চলতে পারে। এদের মানসিক শক্তি অপরিমিত এবং উপলব্ধি, বিচার-করণ, সমস্যা-সমাধান প্রভৃতি কাজে এদের দক্ষতা অকল্পনীয়। সাধারণত এরাই নতুন চিন্তা ও ভাবের জন্ম দিয়ে থাকে।

উন্নতবুদ্ধি হলেই যে জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারবে এমন কোন কথা নেই। পার্থিব কৃতিত্বের জন্য যেমন বুদ্ধির দরকার তেমনি দরকার শিক্ষা এবং জ্ঞানের। কিন্তু দেখা গেছে যে নানা কারণে এই উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়া ভালভাবে হয়ে ওঠে না। প্রথমত গতানুগতিক যে প্রথায় আমাদের স্কুলে কলেজে পড়ানো হয়ে থাকে তাতে উন্নতবুদ্ধিদের প্রতি মোটেই সুবিচার হয় না। সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাদানের ফলে এই উন্নতবুদ্ধিদের কাছে লেখাপড়ার কোন আকর্ষণ থাকে না। ক্লাশে যা পড়ানো হয়, তা হয় তাদের কাছে অনেক আগে থেকেই জানা, নয় তাদের প্রয়োজনের মানের নীচে। ফলে তারা ক্লাশ পালায়, দুষ্কৃতি করার দিকে ঝোঁকে এবং প্রায়ই লেখাপড়াকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে। সেই জন্য দেখা গেছে যে স্কুলে বুদ্ধির অভীক্ষায় যারা উৎকর্ষ দেখিয়েছে তারা পরবর্তী জীবনে প্রায়ই সাধারণ সাফল্যের চেয়ে বেশী কিছু লাভ করতে পারে নি।

এই জন্য আধুনিক যুগে উন্নতবুদ্ধিদের জন্যও বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এদের শিক্ষা না দিয়ে পৃথকভাবে এদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি আজকাল সকল প্রগতিশীল স্কুলেই প্রচলিত হয়েছে। এমন কি উন্নতবুদ্ধিদের একেবারে পৃথক করে নিয়ে বিশেষ স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা কোন কোন দেশে প্রচলিত হয়েছে। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পাবলিক স্কুলগুলি এই ধরনের স্কুল এবং সেগুলির অনুকরণে ভারতেও আজকাল পাবলিক স্কুল খোলা সুরু হয়েছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে ত্রি-ধারা (Three-stream) পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের মাধ্যমেও এই সমস্যার একটা সমাধান করার চেষ্টা হয়েছে।

সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধি ছাড়া বিশেষধর্মী মানসিক শক্তির দিক দিয়েও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর প্রভেদ থাকতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় যে কোন শিশু বিশেষ একটি দক্ষতা নিয়ে জন্মেছে এবং সেই ক্ষেত্রে সে বিনা আয়াসেই যথেষ্ট উৎকর্ষ দেখাতে সমর্থ হচ্ছে। যেমন খুব শিশুকাল থেকেই কোন ছেলে হয়তো খুব ভাল অঙ্ক কষতে পারে বা কোন মেয়ে ভাল গান গাইতে পারে, আবার কেউ কেউ যন্ত্রপাতির কাজ কর্মে বিশেষ পারদর্শিতা দেখায় ইত্যাদি। এগুলির মূলে আছে নানা বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি। এই বিশেষ মানসিক শক্তিগুলি নানা শ্রেণীর হতে পারে, যেমন—ভাষামূলক শক্তি (Verbal ability or v), গাণিতিক শক্তি (Numerical ability or n), যন্ত্রমূলক শক্তি (Mechanical ability or m), অবস্থানমূলক শক্তি (Spatial ability or s) ইত্যাদি।

সাধারণ এবং বিশেষ, উভয় ধরনের মানসিক শক্তিই যে প্রত্যেকের ব্যক্তি-সত্তার স্বরূপ নির্ণয়ে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে সে কথা বলা বাহুল্য। সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধির সব চেয়ে বড় প্রভাব দেখা যায় লেখাপড়ার ক্ষেত্রে। যাদের বুদ্ধি স্বাভাবিক মানের চেয়ে কম তারা স্কুল কলেজের পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে পারে না এবং যারা বোধহীন জড় তারা লেখাপড়া করতেই পারে না। লেখাপড়া ছাড়া সাধারণ ব্যবহারিক জীবনেও বুদ্ধির প্রয়োজন যথেষ্ট। যে কোন দায়িত্বপূর্ণ পরিচালনার কাজ সুসম্পন্ন করতে হলেও বেশ উন্নত বুদ্ধির দরকার। তাছাড়া সকল প্রকার মানসিক কাজের সুসংগঠন, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, দ্রুতচিন্তন, বিচারকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তারাই উৎকর্ষ দেখাতে পারে যাদের বুদ্ধির পরিমাপ সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশী। এই সকল কারণে বৃত্তিমূলক জীবনে বুদ্ধির প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর।

বিশেষধর্মী মানসিক শক্তিগুলিও ব্যক্তির বৃত্তিমূলক জীবনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। যে বিষয়ে ব্যক্তির বিশেষ মানসিক শক্তি আছে সে বিষয়টিকে যদি সে তার বৃত্তিরূপে নির্বাচিত করে নেয় তবেই ব্যক্তির বৃত্তিজীবনে সাফল্য সুনিশ্চিত।

মনঃপ্রকৃতিগত বৈষম্য (Temperamental Differences)

মনঃপ্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝায় মনের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, যাকে আমরা চলতি কথায় মেজাজ বা মুড বলে থাকি। দেখা গেছে যে মনের মৌলিক কাঠামোটির গঠনের দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পার্থক্য আছে এবং এই পার্থক্যের অনেকখানি সহজাত। অলপোর্ট মনঃপ্রকৃতিকে মনের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া বলে বর্ণনা করেছেন। প্রায়ই দেখা যায় যে কোন ব্যক্তি কোমল প্রকৃতির আবার কেউ নিষ্ঠুর স্বভাবের, কারও মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই অমায়িকতা দেখা যায়, কারও আচরণ অতিমাত্রায় রুক্ষ, কেউ বা আক্রমণধর্মী হয়ে থাকেন, আবার কেউ বা বশ্যতাপ্রিয় হন। এই ধরনের বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তামূলক বৈশিষ্ট্যগুলি সৃষ্টিতে পরিবেশের যথেষ্ট প্রভাব থাকলেও সহজাত মনঃপ্রকৃতিই প্রকৃতপক্ষে এগুলির মৌলিক ভিত্তিরূপে কাজ করে থাকে।

অর্জিত বৈষম্য ও পরিবেশ

(Acquired Differences & Environment)

সহজাত বৈষম্যের মূলে যেমন আছে বংশধারা তেমনি পরিবেশ আছে অর্জিত বৈষম্যের পেছনে। ব্যক্তিমাত্রেই জন্ম থেকেই কোন না কোন পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে। পরিবেশহীন অস্তিত্ব কারও ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। সাধারণ ভাবে পরিবেশ বলতে বোঝায় আমাদের চার পাশে যে সব বস্তু বা ব্যক্তি আছে সেগুলিকেই। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিবেশের আরও ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে পরিবেশ বলতে সেই শক্তি-সমষ্টিকেই বোঝায় যা ব্যক্তির আচরণের মধ্যে কোন না কোনরূপ পরিবর্তন আনতে সমর্থ হয়। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী বহুদূরে অবস্থিত বস্তু বা ব্যক্তি কিংবা অতীতের এমন কি ভবিষ্যতের, বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনাও আমাদের পরিবেশের অন্তর্গত হতে পারে। বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে পরিবেশ নানা কারণে বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে উঠতে পারে এবং তার ফলে নানারূপ ব্যক্তিগত বৈষম্য দেখা দেয়, যথা, কৃষ্টিগত বৈষম্য, সমাজগত বৈষম্য, প্রক্ষোভঘটিত বৈষম্য, শিক্ষাগত বৈষম্য, নীতিগত বৈষম্য, অভ্যাসগত বৈষম্য ইত্যাদি।

কৃষ্টিগত বৈষম্য (Cultural Difference)

সব শিশু এক পরিবেশে মানুষ হয় না। বিভিন্ন দেশ অনুযায়ী প্রাকৃতিক পরিবেশও প্রচুর বিভিন্ন। এস্কিমোরা সারা বছর বরফের গুহায় কাটায় আবার আফ্রিকার লোকেরা সারা বছরই সূর্যের প্রখর আলোর তলায় বসবাস করে। বাঙলা দেশের লোকেরা শস্যশ্যামল সমতলভূমিতে নিরায়াস জীবন যাপন করে, আবার পার্বত্য নাগারা পাহাড়ের রুক্ষ পরিবেশে কঠোর পরিশ্রমে দিন কাটায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার পর আসে সামাজিক পরিবেশের বিভিন্নতা। প্রাচীন মানবের বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী থেকে জন্ম নিয়েছে আজকের বিভিন্ন জাতি ও জনসমাজ। প্রত্যেক জনসমাজেরই আচরণ, ভাবধারা, সংস্কার, রীতিনীতি প্রথা প্রভৃতির বহু দিনের সযত্ন সঞ্চিত নিজস্ব একটি ভাণ্ডার আছে এবং সেই বিশেষ সমাজে যে শিশু জন্মায় সে সেই জাতিগত ভাব ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারটির অধিকারী হয়। বিভিন্ন সমাজের মধ্যে প্র,র মৌলিক ঐক্য থাকলেও ভাবধাবা, আচরণ, রীতিনীতি, প্রথা ইত্যাদিব দিক দিয়ে অমিলও বিরাট। এই জাতিগত ভাবধারা ও সংস্কৃতির পার্থক্য থেকে জন্ম নেয় কৃষ্টিগত বৈষম্য, যেমন দেখা যায় একদল ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের মধ্যে বা একদল বেদুইন ও আমেরিকানের মধ্যে।

সমাজগত বৈষম্য (Social Difference)

জাতিগত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিমূলক বৈশিষ্ট্য যেমন কৃষ্টিগত বৈষম্যের মূলে আছে তেমনি শিশু যে সমাজে মানুষ হয়, সেই সমাজের প্রচলিত আচার ব্যবহার, প্রথা পদ্ধতি, আইন কানুন প্রভৃতি বিভিন্নতা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সমাজগত বৈষম্যের সৃষ্টি করে থাকে। জন্ম থেকে সুরু করে পরিণতবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত শিশু ছোট বড় অনেকগুলি সমাজের মধ্যে দিয়ে জীবন কাটায়। এর প্রত্যেকটি সমাজেরই অল্পবিস্তর প্রভাব তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। সর্বপ্রথম যে সামাজিক সংগঠনটি তার চিন্তা, আচরণ ও মনোভাবকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে সেটি হল তার পরিবার। প্রত্যেক পরিবারেরই কতকগুলি নিজস্ব ভাব, আদর্শ ও আচরণের ধারা আছে এবং সেই পরিবারের শিশুমাত্রেই সেই ভাব, আদর্শ ও আচরণের ধারা অনুযায়ী মানুষ হয়ে থাকে। ফলে দেখা যায় যে দুটি বিভিন্ন পরিবারে মানুষ হয়েছে এমন দুটি শিশুর মধ্যে বয়স, বুদ্ধি ইত্যাদি অভিন্ন হলেও ভাব ও আচরণগত বৈষম্য প্রচুর। পরিবারের পর আসে স্কুল, লাইব্রেরী, ক্লাব, অফিস ইত্যাদি। এই বিভিন্ন

সামাজিক সংগঠনগুলি শিশুর ভাবধারা ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যের উপর প্রচুর প্রভাব বিস্তার করে এবং তার ফলে বিভিন্ন সামাজিক পরিবেশে মানুষ হয়েছে এই ধরনের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাব, ভাষা, আদর্শ, আচরণ ইত্যাদির দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈষম্য দেখা যায়।

প্রক্ষোভঘটিত বৈষম্য (Emotional Difference)

যে কোন দু'জন পরিণতবয়স্কের প্রক্ষোভের স্বরূপ ও সংগঠন পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে সেদিক দিয়ে দু'জনের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। একজন হয়তো অল্পেতেই রেগে যান বা আনন্দিত হন, আবার আর এক ব্যক্তির হয়ত রাগ বা আনন্দ দুইই দেরীতে দেখা দেয়। একজনের প্রক্ষোভ হয়ত তীব্র অথচ অল্পস্থায়ী, আর একজনের প্রক্ষোভ অগভীর কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী। একজন হয়ত প্রক্ষোভের বহিপ্রকাশে অনিচ্ছুক, অপর এক ব্যক্তি হয়ত তাঁর প্রক্ষোভ প্রকাশে কোনরূপ দ্বিধা বা ইতস্তত করেন না। তাছাড়া প্রক্ষোভের বিষয় বস্তুর দিক দিয়েও বিভিন্ন ব্যক্তি মধ্যে প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়। যে বস্তুতে বা ব্যাপারে একজন আনন্দিত হন, অপর ব্যক্তি হয়ত সে বস্তুতে বা ব্যাপারে উদাসীন। আর একজন হয়ত সেই বস্তুতে বা ব্যাপারে বিরক্তি বোধ করবেন। আনন্দ, দুঃখ, রাগ, ঘৃণা ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি যখন কোন বিশেষ বস্তু বা ব্যক্তিকে ঘিরে সুসংগঠিত হয় তাকে সেন্টিমেন্ট বলে। গঠনের দিক দিয়ে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই সেন্টিমেন্টের মধ্যেও অপরিসীম পার্থক্য দেখা যায়।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে প্রক্ষোভঘটিত বৈষম্য থাকে তার মূলেও আছে প্রধানত পরিবেশের প্রভাব। শিশু যখন জন্মায় তখন নিতান্ত সরল ও স্বল্প কয়েকটি প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায়, কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবেশের প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রক্ষোভের সেই সরল সংগঠনটি জটিল আকার ধারণ করে। বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন হওয়ার ফলেই তাদের প্রক্ষোভগত সংগঠনও পৃথক হয়ে দাঁড়ায়। প্রক্ষোভগত বৈষম্য সৃষ্টিতে বিশেষভাবে কাজ করে থাকে শিশুর পরিবার, স্কুল, সঙ্গীসাথী প্রভৃতির সম্মিলিত প্রভাব। কণ্ডিসানিং (Conditioning) বা অনুবর্তন নামক মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই প্রক্ষোভের বিস্তার ঘটে[১] এবং পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির উপর নির্ভর করে এই অনুবর্তনের প্রকৃতি ও রূপ।

শিক্ষাগত বৈষম্য (Educational Difference)

শিক্ষার ব্যাপক অর্থ গ্রহণ করলে যে কোন অর্জিত বৈষম্যকেই শিক্ষাগত

১। পৃঃ ১২৪ দ্বিতীয় খণ্ড

বৈষম্য বলা যেতে পারে। কেননা পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে যে আচরণগত বা চিন্তাগত পরিবর্তন দেখা দেয় তাকেই শিক্ষা বলে। কিন্তু সাধারণ ভাষণে আমরা শিক্ষাকে একটি সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করি। এই অর্থে কোন বিশেষ বিষয়ে সুসংবদ্ধ এবং সুপরিকল্পিত জ্ঞান অর্জনকেই শিক্ষা বলা হয়। বিশেষ করে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম সন্তোষজনকভাবে আয়ত্ত করাকেই শিক্ষা নাম দেওয়া হয়ে থাকে।

শিক্ষার এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর প্রভেদ দেখা যায়। কোন ব্যক্তি উচ্চশিক্ষিত, কেউ অল্পশিক্ষিত, আবার কেউ বা একেবারেই নিরক্ষর। শিক্ষার ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে এই বৈষম্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভর করে শিক্ষালাভের সুযোগ সুবিধার উপর। যে সকল দেশে শিক্ষাদান এখনও রাষ্ট্রদায়িত্বের অন্তর্গত হয় নি সে সকল দেশে শিক্ষাগত বৈষম্য প্রচুর। প্রগতিশীল দেশগুলিতে বিশেষ একটি মান পর্যন্ত শিক্ষাগ্রহণকে বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করে তোলায় সেখানে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাগত বৈষম্য কম। তবে উচ্চ-শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বত্রই প্রচুর বৈষম্য দেখা যায়। তার কারণ হল যে সকল প্রকার উচ্চশিক্ষাই ব্যয়বহুল ও পর্যাপ্ত মানসিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। আর অর্থগত সঙ্গতি ও মানসিক শক্তি উভয় দিক দিয়েই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বৈষম্য খুব বেশী দেখা যায় বলে শিক্ষাগত বৈষম্যও প্রচুর হয়ে থাকে। অর্থগত বৈষম্যের কারণেই ভারত প্রভৃতি অনগ্রসর দেশগুলিতে শিক্ষার বৈষম্য এত বেশী।

তাছাড়া শিক্ষা এখন বহুমুখী হয়ে যাওয়ার ফলে শিক্ষাগত বৈষম্যের পরিমাণ আরও বেড়ে গেছে। সাধারণ সাহিত্যধর্মী বিদ্যা ছাড়াও বিভিন্ন শিল্প, অঙ্কন, পূর্তবিদ্যা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, নৃত্য, যন্ত্রবিদ্যা. ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয় আজকাল পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে শিক্ষাগত পার্থক্য স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছে।

অন্যান্য অর্জিত বৈষম্য (Other Acquired Differences)

অর্জিত বৈষম্যের তালিকা এতেই শেষ হল না। উপরের প্রধান প্রধান অর্জিত বৈষম্যগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি গৌণ বৈষম্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, নীতিগত বৈষম্য (Ethical Difference), মনোভাব-গত বৈষম্য (Attitudinal Difference), অভ্যাসগত বৈষম্য (Habitual Difference), ইত্যাদি। নীতিগত বৈষম্য বলতে ভালমন্দ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ধারণার যে বিভিন্নতা দেখা যায় তাকেই

বোঝায়। একজনের কাছে যেটা উচিত অপরের কাছে সেটা অনুচিত হতে পারে। এই নীতিগত বৈষম্য থেকেই জন্মায় আদর্শগত বৈষম্য।

মনোভাবগত বৈষম্যের গুরুত্বও কিছু কম নয়। প্রায়ই দেখা যায় কোন একটি বিশেষ বস্তু, ব্যাপার বা ঘটনা সম্পর্কে একটি সুনির্দিষ্ট মনোভাব আমাদের মধ্যে গড়ে ওঠে। এই মনোভাব যেমন বিরূপ বা অনুকূল হতে পারে তেমনি আবার মাত্রা বা তীব্রতার দিক দিয়েও কম বেশী হতে পারে। যেমন, বাল্যবিবাহ, ডিভোর্স, সহশিক্ষা প্রভৃতি বিতর্কমূলক বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন মনোভাব গড়ে ওঠে। এই মনোভাবটি বহুলাংশে পরিবেশের দান, তবে এর উপর সহজাত মনঃপ্রকৃতির কিছুটা প্রভাব আছে। এই মনোভাবের দিক দিয়ে যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায় এটা সর্বজনবিদিত সত্য। আমাদের আচরণের স্বরূপ বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে আমাদের এই মনোভাব।

বিভিন্ন পরিবেশে ব্যক্তি বিভিন্ন অভ্যাস আহরণ করে থাকে। যেমন, যে ব্যক্তি গরম দেশে থাকে, সে দৈনিক স্নান করে, এমন কি একাধিকবারও করে। আর যে ব্যক্তি শীতল দেশে বাস করে তার কাছে স্নান করাটা নিত্যকর্ম নয়। এই রকম বিভিন্ন পরিবেশে বাস করার ফলে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন অভ্যাস গড়ে ওঠে। একে বলে অভ্যাসগত বৈষম্য।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রভাব
(Effects of Individual Difference)

ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিটি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অবদান। এই নীতিটি নানা দিক দিয়ে আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রাকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। দুটি ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির প্রভাব বিশেষভাবে অনুসৃত হয়। সে দুটি হল—শিক্ষা এবং বৃত্তিনির্বাচন।

শিক্ষায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি

গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সকল শিক্ষার্থীরই মানসিক ক্ষমতা এক বলে ধরে নেওয়া হত এবং একই সঙ্গে একই পদ্ধতিতে সকলকে শিক্ষা দেওয়া হত। এই ধারণা ও ব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত হয়েছে দলগত শিক্ষার প্রথা, অর্থাৎ বহু শিক্ষার্থীকে এক সঙ্গে একটি ক্লাশে রেখে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি। শিক্ষক যখন একটি ক্লাশে পড়ান তখন তিনি ধরে নেন যে ক্লাশের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা সমান এবং তার ফলে তিনি তাঁর শিক্ষণপ্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের জন্য কোনরূপ তারতম্য করেন না।

ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি থেকে জানা গেছে যে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতা, মনোভাব রুচি ইত্যাদিও বিভিন্ন। কেউ হয়ত একবার শুনেই একটি পড়া বুঝতে পারে, আবার কেউ হয়ত একই কথা বার বার না শুনলে বুঝতে পারে না। কারও হয়ত সাহিত্য পড়তে ভাল লাগে আবার কারও হয়ত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে মন চায়। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই ধরনের মৌলিক পার্থক্যের জন্য আজকাল দলগত শিক্ষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তিগত শিক্ষাদানের স্বপক্ষে একটা ব্যাপক আন্দোলন সুরু হয়েছে। এই থেকেই আমাদের গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় নানারূপ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রথমত, বহুশতাব্দী ধরে প্রচলিত একই ধরনের সাহিত্যধর্মী পাঠক্রমের স্থানে বহুমুখী পাঠক্রম পৃথিবীর সব দেশেই আজ প্রবর্তিত হয়েছে। তার ফলে যে সব ছেলেমেয়ের সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে অনুরাগ থাকে, তারা তাদের রুচিমত ও সামর্থ্যানুযায়ী শিক্ষালাভ করতে পারে। দ্বিতীয়ত, অনেক প্রগতিশীল দেশে ক্লাশরুমের বৈষম্যবিহীন শিক্ষাদানের পরিবর্তে সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যক্তিমুখী শিক্ষাদানের প্রথা প্রবর্তিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হল ডাল্টন প্ল্যান, মরিসন প্ল্যান ও উইনেটকা প্ল্যান। এগুলিতে ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদার প্রতি যতদূর সম্ভব সুবিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে একই ক্লাশের ছেলেমেয়েদের মানসিক শক্তি অনুযায়ী তিনটি দলে ভাগ করে তাদের বিভিন্ন প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়ার প্রথা প্রচলিত আছে। একে ত্রি-ধারা (Three-stream) প্রথা বলা হয়। তৃতীয়ত, পূর্বে কেবলমাত্র সাহিত্য, ভাষা এবং কয়েকটি অমূর্তধর্মী (Abstract) বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য কোন বিষয়কে পাঠক্রমের অন্তর্গত করা হত না। ফলে মুষ্টিমেয় ছেলেমেয়েই শিক্ষায় প্রকৃত পারদর্শিতা দেখাতে পারত। কিন্তু ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করার ফলে সাহিত্যধর্মী বিষয়গুলি ছাড়াও বহু ব্যবহারিক বিষয়কে এখন শিক্ষার পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে। যন্ত্রশিল্প, পূর্তশিল্প, নানা কারিগরিবিদ্যা, অঙ্কন, সঙ্গীত, পণ্য-বিক্রয়, বাণিজ্যবিদ্যা ইত্যাদি যে সকল শিক্ষণীয় বিষয় পূর্বে নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হত আজ সেগুলি শিক্ষার ক্ষেত্রে পূর্ণ মর্যাদা লাভ করেছে এবং সেগুলিকে ব্যাপকভাবে স্কুল-কলেজের পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

বৃত্তি-নির্বাচনে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি

বৃত্তি-নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতির প্রভাব বোধ করি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বৃত্তি বলতে বোঝায় এমন কোন বিশেষ ধরনের কাজ

যার সুষ্ঠু সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তি তার জীবিকা অর্জন করতে পারে। এক দিক দিয়ে যেমন কাজটির সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক সম্পাদন দরকার, তেমনই দরকার ব্যক্তির নিজস্ব সন্তুষ্টি বা তৃপ্তিবোধ। যেখানে এ দুটি বস্তু এক সঙ্গে মিলিত হয়েছে বুঝতে হবে সেখানেই ব্যক্তির বৃত্তি-নির্বাচন সফল হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ব্যক্তি এমন একটি বৃত্তি বেছে নিয়েছে যেটির প্রতি তার স্বাভাবিক অনুরাগ বা আসক্তি নেই এবং যেটি নিয়মিতভাবে অনুসরণ করতে তাকে যথেষ্ট ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করতে হচ্ছে। ফলে কিছুদিন পরে একঘেয়েমি, যান্ত্রিকতা, বিরক্তি, অতৃপ্তি ও হতাশায় ব্যক্তির বৃত্তিমূলক জীবন তিক্ত হয়ে ওঠে। তাছাড়া কাজের দিক দিয়েও এ ধরনের ব্যক্তির কাছ থেকে পূর্ণ ও সুষ্ঠু সম্পাদন কখনই পাওয়া যেতে পারে না। ফলে নিয়োগকর্তা ও নিযুক্ত ব্যক্তি দু'জনই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার যদি বৃত্তির নির্বাচন ব্যক্তির পছন্দ ও সামর্থ্য অনুযায়ী হয় তবে সে বৃত্তি সম্পন্ন করে ব্যক্তি যেমন নিজেও সন্তুষ্টি ও তৃপ্তি লাভ করে, তেমনই নিয়োগকারীর প্রতিও সে সুবিচার করতে পারে। এক কথায় বৃত্তিমূলক সঙ্গতিবিধানের (Vocational adjustment) পিছনে আছে ব্যক্তির নিজের সামর্থ্য ও আগ্রহ। বৃত্তির অপ-নির্বাচনের অর্থ হল এই অতি-প্রয়োজনীয় সঙ্গতিবিধানের অভাব এবং তা থেকে দেখা দেয় নিয়োগকারীর ক্ষতি, ব্যক্তির নিজস্ব অতৃপ্তি ও হতাশা এবং সমগ্র জাতীয় উৎপাদনের অবনতি।

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যে সকল বিভিন্ন প্রকৃতির বৈষম্য দেখা যায় সেগুলির মধ্যে মানসিক শক্তির বৈষম্য সব চেয়ে বেশী ব্যক্তির বৃত্তি-নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। সহজ ও নিম্নশ্রেণীর কতকগুলি শিল্পমূলক কাজ ছাড়া অধিকাংশ বৃত্তির সম্পাদনেই বুদ্ধির স্বাভাবিক মান (যাকে আমরা ১০০ বুদ্ধ্যঙ্ক বলে বর্ণনা করেছি) এক প্রকার অপরিহার্য। যাদের বুদ্ধির মান এর চেয়ে কম তারা সাধারণ ও প্রচলিত কোন বৃত্তিমূলক কাজই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে না। বৃত্তিটি যতই জটিল ও সূক্ষ্মধর্মী হতে থাকবে ততই বুদ্ধির মানও উন্নত হওয়া দরকার। কোন কোন বৃত্তিতে সাধারণ বুদ্ধির মানের চেয়ে বেশী বুদ্ধি স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়োজন। যেমন, আইন বিদ্যা, শিক্ষকতা, ব্যবসা-পরিচালন, শাসন-সংক্রান্ত কার্যাদি, সংবাদপত্র-সম্পাদনা, ডাক্তারী প্রভৃতি বৃত্তিতে সাফল্য লাভ করতে হলে উচ্চ মানের বুদ্ধি অত্যাবশ্যক। তেমনি আবার মোটর চালনা, যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কার্যাদি, জরীপের কাজ, ফ্যাক্টরির কাজ, সীবন শিল্প, মৃৎশিল্প, ভাস্কর্য, বয়নশিল্প, যোদ্ধৃবৃত্তি, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি নানা জীবিকা আছে

যাতে উচ্চ মানের বুদ্ধি না থাকলেও মোটামুটি সাফল্য লাভ করা চলে।

বুদ্ধি বা সাধারণ মানসিক শক্তির পর আসে মনের বিশেষ শক্তি। যারা লেখাপড়ার কাজে থাকতে চায় বা সাহিত্য-চর্চা, শিক্ষকতা, সংবাদপত্র-সম্পাদনা ইত্যাদিকে পেশা করতে চায় তাদের মধ্যে v বা ভাষামূলক শক্তি বিশেষভাবে থাকা একান্ত আবশ্যক। যারা আবার অঙ্কশাস্ত্র ঘটিত বৃত্তি যেমন, এ্যাকাউণ্টেন্সী, পরিসংখ্যান, ব্যাঙ্ক-বীমা-সংক্রান্ত হিসাব প্রভৃতি কাজে যেতে চায় তাদের *n* বা গাণিতিক শক্তি বিশেষভাবে থাকা আবশ্যক। তেমনি যারা যন্ত্রপাতিঘটিত বৃত্তি গ্রহণ কবার ইচ্ছা রাখে তাদের *m* বা যন্ত্রমূলক শক্তি থাকা অপরিহার্য। উপযুক্ত বিশেষধর্মী-মানসিক শক্তির অধিকারী না হয়ে যারা এই ধরনের কোন বিশেষধর্মী বৃত্তি নির্বাচন করে তাদের পক্ষে বৃত্তির ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করা নিতান্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে। সাধারণত দেখা যায় যে পিতামাতা বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনেরা যখন ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ বৃত্তি নির্বাচন করেন, তখন তাঁরা ছেলেমেয়েদের পছন্দ বা সামর্থ্যের কথা ভাবেন না এবং প্রায়ই তাঁরা নিজেদের পছন্দ, অতৃপ্ত বাসনা, সমাজের চাহিদা, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন ইত্যাদি অবাস্তব কারণগুলির দ্বারা পরিচালিত হন।

মানসিক শক্তি ছাড়া মনঃপ্রকৃতিগত বৈষম্যের প্রভাবও বৃত্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট। কোন কোন বৃত্তিতে বিশেষ ধরনের মানসিক সংগঠন থাকা অপরিহার্য এবং দেখা গেছে যে অন্যান্য গুণ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র অনুপযোগী মানসিক সংগঠনের জন্য ব্যক্তি তার কাজে সাফল্যলাভ করতে পারে না। যেমন, যে ব্যক্তিকে কোন একটি বহুবিভাগসম্পন্ন দোকানের পরিচালনা করতে হবে বা বড় কোন হোটেলের অভ্যর্থকের কাজ করতে হবে বা কোন বিরাট ফ্যাক্টরীর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, তার মনঃপ্রকৃতি হওয়া উচিত ধীর, স্থির ও শান্ত। এখন এই ধরনের বৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অন্যান্য গুণের অধিকারী হয়েও যদি রুক্ষ মেজাজের বা মাথাগরম প্রকৃতির লোক হন তবে তাঁর পক্ষে তাঁর বৃত্তিতে সাফল্যলাভ করা একপ্রকার অসম্ভবই হয়ে উঠবে।

কোন উদ্দীপকের আবির্ভাবের পর তার প্রতি আমাদের সাড়া দিতে বা উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হবেই। একে প্রতিক্রিয়া কাল (Reaction Time or RT) বলা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াকাল বিভিন্ন—কারও কম, কারও বেশী। যারা রেলগাড়ী বা বড় বড় মেসিন চালানোর কাজ করতে চায় তাদের প্রতিক্রিয়া কাল কম হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। যাদের প্রতিক্রিয়া কাল বেশী তারা হঠাৎ একটি কাজ

দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করতে পারে না। চলন্ত মোটর বা রেলগাড়ীর সামনে হঠাৎ অতর্কিতে একজন পথচারীকে এসে পড়তে দেখে চালক যত তাড়াতাড়ি ব্রেক কষতে পারবে ততই পথচারীটির বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। যে চালকের প্রতিক্রিয়া কাল দীর্ঘ তার ক্ষেত্রে ইচ্ছা ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ব্রেক কষতে দেরী হবে। অতএব যে সকল বৃত্তিতে দ্রুত কাজ সম্পন্ন করাটা দরকার সে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া কাল যত অল্প হয় ততই ভাল এবং যাদের প্রতিক্রিয়া কাল দীর্ঘ তাদের এই ধরনের কাজে নিযুক্ত করা কখনই উচিত নয়।

প্রক্ষোভগত ও সমাজগত বৈষম্য বৃত্তির ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। বিশেষ একটি পরিবেশে মানুষ হওয়ার পর যদি ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নতুন পরিবেশে কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে হয় তবে তার প্রক্ষোভমূলক ও আচরণমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সেই নতুন পরিবেশের প্রায়ই সংঘাত লাগে এবং তার বৃত্তিমূলক সঙ্গতি নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্য ব্যক্তির স্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেই তার বৃত্তির নির্বাচন যতই সীমাবদ্ধ থাকে তত তার পক্ষে মঙ্গলকর। তবে যেহেতু প্রক্ষোভগত ও সমাজগত বৈষম্যগুলি অর্জিত সেহেতু সেগুলি পরিবেশের চাপে প্রয়োজনমত পরিবর্তিত হয়ে যেতেও পারে।

বৃত্তি নির্বাচনে ব্যক্তিগত বৈষম্যের প্রভাব এত বেশী বলে আধুনিক কালে বৃত্তিমূলক পরিচালনা বা নির্দেশ দান (Vocational Guidance) যে কোন উন্নত সমাজব্যবস্থার একটি বড় অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। বুদ্ধির অভীক্ষা ছাড়াও ব্যক্তির বিশেষধর্মী শক্তি ও বিভিন্ন রুচির প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য নানা বিশেষ অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ করে বিশেষ ব্যক্তির পক্ষে কোন বৃত্তিটি নির্বাচনীয় সে সম্বন্ধে ছাত্র অবস্থাতেই তাকে আজকাল মূল্যবান নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে।

সাত

শিখন প্রক্রিয়া (Learning Process)

প্রত্যেক প্রাণীকেই তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য পরিবেশের সদা পরিবর্তনশীল বিভিন্ন শক্তিগুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। তার জন্যই তাকে সম্পন্ন করতে হয় নানাবিধ আচরণ। প্রকৃতি অবশ্য প্রাণীমাত্রকেই কতকগুলি প্রাথমিক আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা আগে থেকেই দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান এবং সেগুলির সাহায্যে সে কতকগুলি অতিপ্রযোজনীয় এবং মৌলিক চাহিদা মিটিয়ে নিতে পারে। এগুলিকে আমরা প্রবৃত্তিজাত আচরণ বলে বর্ণনা করেছি।

শিখনের প্রয়োজনীয়তা

কিন্তু প্রবৃত্তিজাত আচরণগুলির সংখ্যাও যেমন অল্প, তেমনই পরিবেশের বৈচিত্র্যময় ও অসংখ্য শক্তিগুলির সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে খাপ খাওয়ানর পক্ষেও সেগুলি নিতান্তই অপর্যাপ্ত। ফলে যখনই পরিবেশ পরিবর্তিত ও জটিল হতে থাকে তখনই প্রকৃতিদত্ত এই সহজাত আচরণের ভাণ্ডারটি নিঃশেষিত হয়ে যায় এবং প্রাণীকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। তখনই সুরু হয় প্রকৃত জীবনযুদ্ধ। যে প্রাণী পরিবেশের উপযোগী নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে পারে সেই টিঁকে থাকে, আর যে পারে না সে সরে দাঁড়ায়। পরিবেশের উপযোগী এই নতুন আচরণ আয়ত্ত করাকেই আমরা শিখন (Learning) বলে থাকি।

শিখনের জীবন ব্যাপকতা

শিখনের সুরু জন্ম থেকে, এমন কি শিশুর মাতৃগর্ভে থাকার সময় থেকেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে মাতৃগর্ভের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়ানর জন্য গর্ভস্থ শিশুকেও নতুন ও পরিবর্তিত আচরণ সম্পন্ন করতে হয়। শিখনের স্থায়িত্বও সারা জীবনব্যাপী, মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত। যতই ক্রমবিবর্তনের উন্নততর ধাপে যাওয়া যাবে ততই শিখন-প্রক্রিয়ার ব্যাপকতা দেখা যাবে। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রবৃত্তি-জাত আচরণের প্রভাব বেশী হলেও শিক্ষা-প্রসূত আচরণেরও দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া যায়। মানুষের ক্ষেত্রে শিখনের প্রভাব চরমতম। যে কোন মানুষের দৈনন্দিন আচরণের তালিকাটি পরীক্ষা করলে

শিখনের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা পাওয়া যাবে। এই তালিকা থেকে যদি শিক্ষাজাত আচরণগুলি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া যায় তবে রক্ত সঞ্চালন, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ, পরিপাচন প্রভৃতি নিছক মৌলিক শরীরতত্ত্বমূলক আচরণগুলি এবং খাওয়া, ঘুমান, চলা-ফেরা প্রভৃতি কয়েকটি অতি সাধারণ প্রাথমিক সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। এই জন্য এক কথায় বলা চলে যে শিখন প্রক্রিয়া ও মানব অস্তিত্ব পরস্পর সমব্যাপী।

শিখনের স্বরূপ (Nature of Learning)

শিখন প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে আমরা কতকগুলি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। এই বৈশিষ্ট্যগুলি থাকলেই প্রকৃত শিখন সংঘটিত হয়। সেগুলি হল এই।

১। আচরণের পরিবর্তন

শিখনের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল যে এর দ্বারা ব্যক্তি কোন নতুন আচরণ সম্পন্ন করার যোগ্যতা অর্জন করে। যেমন, একটি ছোট ছেলে হঠাৎ দুধের বাটিতে হাত দিতে তার হাতটা পুড়ে গেল এবং সে ব্যথা পেল। পরে দেখা গেল যে সে আর কিছুতেই দুধের বাটিতে হাত দিচ্ছে না। এই যে পুরাতন আচরণের পরিবর্তন এবং নতুন আচরণের সম্পাদন একেই শিখন বলা হয়।

২। নতুন অভিজ্ঞতা

আচরণের পরিবর্তন আবার নির্ভরশীল আর একটি বৈশিষ্ট্যের উপর। সেটি হল ব্যক্তির একটি নতুন অভিজ্ঞতা। ব্যক্তির এই পুরাতন আচরণের পরিবর্তে নতুন আচরণ সম্পাদনের পিছনে আছে নতুন একটি অভিজ্ঞতা। অতএব শিখনের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা বলতে পারি যে কোন নতুন অভিজ্ঞতা থেকে সঞ্জাত আচরণের পরিবর্তন বা নতুন আচরণ সম্পাদনের নামই শিখন।

৩। বিশেষ গতিপথ

শিখনের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল যে শিখনঘটিত আচরণের একটি বিশেষ গতি-পথ থাকবে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই শিখন থেকে আচরণের যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার একটা বিশেষ গতিপথ আছে এবং সেই গতিপথ প্রাণীর মধ্যে সঞ্জাত চাহিদা বা প্রেষণার তৃপ্তি এনে দেয়। যেমন, আদিম মানুষ ক্ষুধার

খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য পশু শিকার, মাছ ধরা, কৃষিকার্য প্রভৃতি একের পর এক নতুন আচরণ শিখেছিল। এই আচরণগুলি এমন একটি নির্দিষ্ট গতিপথ ধরে এগিয়েছিল যার দ্বারা মানুষের খাদ্য সংগ্রহরূপ চাহিদা বা প্রেষণার তৃপ্তি হওয়া সম্ভব হয়েছিল।

৪। আচরণের উৎকর্ষসাধন

শিখনের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল যে শিখনের ফলে ব্যক্তির পুরাতন আচরণ শুধু যে বদলে যায় তাই নয়, তার উৎকর্ষসাধনও ঘটে। যখন প্রাণীর বর্তমান আচরণটি পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের পক্ষে অপর্যাপ্ত বা অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হয় তখনই সেই পুরাতন আচরণটিকে বাতিল করে উন্নত আচরণ শেখার দরকার হয়। অতএব পুরাতন সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টার উৎকর্ষসাধনকে শিখনের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষণ বলা চলে। শিখনকে এই দিক দিয়ে ক্রমোন্নতির প্রক্রিয়াও বলা হয়।

৫। অভ্যাস বা অনুশীলন

শিখনের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল যে শিখনের সঙ্গে কিছু পরিমাণে অভ্যাস বা অনুশীলন থাকবেই। পুরাতন অনুপযোগী আচরণকে বাতিল করে নতুন উপযোগী আচরণ শিখতে হলে অভ্যাস বা বার বার প্রচেষ্টার দরকার হয়। যেমন সাঁতার কাটা, পড়া তৈরী করা, টাইপ করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে একই কাজ বার বার করতে হয়। এদিক দিয়ে 'শিখনকে অভ্যাসের মাধ্যমে আচরণ বা কার্যের পরিবর্তন' বলে বর্ণনা করা যায়। শিখনের এই সংজ্ঞা দিয়েছেন ম্যাকগেওক (Mcgeoch)।[১] অভ্যাসের সাহায্যে অনুপযোগী, অসংহত, অপ্রয়োজনীয় ও অস্পষ্ট আচরণকে সুসংহত, উপযোগী ও কার্যকর করে তোলা হয়। অবশ্য এমন কতকগুলি শিখনের ক্ষেত্র দেখা যায় যেখানে অনুশীলন বা অভ্যাসের কোন প্রয়োজন হয় না। যে সব বস্তু আমরা প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতিতে শিখি সেগুলি আয়ত্ত করতে অভ্যাস বা অনুশীলন অপরিহার্য। যেমন, টাইপ করতে শেখা, সাঁতার কাটতে শেখা প্রভৃতির ক্ষেত্রে অভ্যাস ও অনুশীলন না হলে শিখন স্থায়ী হয় না। কিন্তু যে সব বস্তু আমরা অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শিখি সেগুলির ক্ষেত্রে অনেক সময় কোন অভ্যাস বা অনুশীলনের দরকার হয় না। যেমন, কোন কবিতা বা নিবন্ধের অর্থ উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে অভ্যাস বা অনুশীলন ছাড়াও শিখন সম্ভব হয়ে থাকে। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য মানসিক স্তরে অনুশীলন থাকে।

---

1. **Learning is modification of behaviour through practice—Mcgeoch.**

৬। নতুনত্ব

প্রত্যেক শিখনেরই আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল নতুনত্ব। যে অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির শিখন ঘটে সেটি যেমন প্রকৃতিতে নতুন, তেমনই সেই অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তির মধ্যে যে আচরণ দেখা দেয় সেটিও পূর্বের আচরণের তুলনায় আংশিক বা পূর্ণভাবে নতুন হয়ে থাকে।

৭। পরিণমন (Maturation)

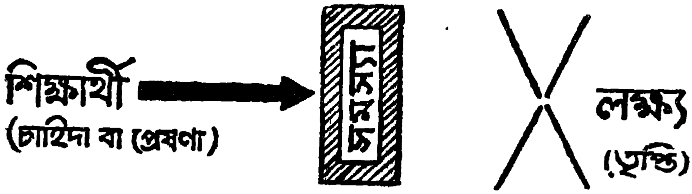
পরিণমন হল ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ফল। শিখন একটি ব্যক্তির দেহগত ও মনোগত প্রক্রিয়া। অতএব শিখনের সম্পাদন দেহ ও মন উভয়ের পরিণতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উপযুক্ত পরিণমন না ঘটলে অনেক ক্ষেত্রে শিখন সম্ভব না হতেও পারে। যেমন, ছবি আঁকতে হলে বা কিছু লিখতে হলে ব্রাশ বা পেন্সিল যেভাবে ধরতে হয় শিশুর আঙ্গুলগুলি এক বছর বয়সের আগে সেভাবে পরিণত হয়ে ওঠে না। তেমনই তর্কশাস্ত্র বুঝতে হলে বিচারকরণের শক্তির দরকার। কিন্তু ১০।১১ বছরের আগে শিশুর মধ্যে প্রকৃত বিচারকরণের ক্ষমতা দেখা দেয় না।

৮। প্রেষণা (Motivation)

প্রেষণা শিখনের আর একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। প্রেষণা হল প্রাণীর অভ্যন্তরীণ স্পৃহা বা চাহিদা। এই স্পৃহা বা চাহিদা থাকলেই তবে শিখন হবে, নতুবা নয়। বিনা প্রেষণায় কোন শিখনই সম্ভব নয়।

৯। সমস্যা

শিখনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে প্রত্যেক শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গেই একটা সমস্যামূলক পরিস্থিতি থাকবেই এবং সেই সমস্যামূলক পরিস্থিতির চাপেই প্রাণীকে বর্তমান আচরণের পরিবর্তন করে নতুন আচরণের আশ্রয় নিতে হয়। সমস্যা



[শিখনের সমস্যার অপরিহার্যতা]

হল শিখনের একটি অপরিহার্য সর্ত। বিনা সমস্যায় কোন কিছু শেখার কথা ওঠে না।

সমস্যামূলক পরিস্থিতি বলতে সেই অবস্থাকে বোঝায় যেখানে পুরাতন বা

অভ্যস্ত আচরণের দ্বারা ব্যক্তির পক্ষে লক্ষ্যে পৌঁছন আর সম্ভব হয় না এবং তার ফলে পরিবেশের সঙ্গে তার সহজ ও সুষ্ঠু সঙ্গতি নষ্ট হয়ে যায়। তখন তার পক্ষে সেই পুরাতন আচরণকে বর্জন করে পরিবেশের উপযোগী নতুন আচরণ আবিষ্কার ও আয়ত্ত করার প্রয়োজন হয়। যতক্ষণ ব্যক্তির পক্ষে পুরাতন বা অভ্যস্ত আচরণের দ্বারা সঙ্গতিবিধান সম্ভব হয় ততক্ষণ কোনরূপ সমস্যার উদয় হয় না। কিন্তু যেই সেই আচরণ তার পরিবেশের পক্ষে অনুপযোগী হয়ে ওঠে তখনই তার পক্ষে নতুন আচরণের আশ্রয় নেওয়ার বা এক কথায় শিখনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সমস্যা যতই জটিল হবে তার উপযোগী আচরণ আবিষ্কার করাও ততই দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ হয়ে উঠবে। সমস্যা ও তার উপযোগী আচরণ আবিষ্কার করার দুরূহতার মাত্রার বিচার করেই কোন শিখন-প্রক্রিয়াকে সরল বা জটিল বলে আমরা বর্ণনা করে থাকি।

শিখন প্রক্রিয়ার তিনটি সোপান

শিখনের উপরে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে আমরা শিখন প্রক্রিয়ার তিনটি সোপান বা স্তরের উল্লেখ করতে পারি। যথা—

১। সমস্যার প্রত্যক্ষণ।

২। উপযোগী আচরণের আবিষ্করণ।

৩। সেই আচরণের আয়ত্তীকরণ।

ব্যক্তি যখন কোনও সমস্যার সম্মুখীন হয় তখনই তার শিখনের সূত্রপাত হয়। সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার অর্থই হল ব্যক্তির বর্তমান আচরণটি তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে অপারগ বলে প্রমাণিত হয়েছে। ব্যক্তিকে তখন তার পুরাতন আচরণের জায়গায় নতুন ও অধিকতর কার্যকর আচরণ সম্পন্ন করতে হবে। অতএব দ্বিতীয় সোপানে ব্যক্তিকে এই নতুন বা পরিবর্তিত আচরণটি খুঁজে বার করতে হয়। কিন্তু কেবলমাত্র উপযোগী আচরণ আবিষ্কার করলেই শিখন শেষ হয় না। সেই নব আবিষ্কৃত আচরণটি ব্যক্তিকে আয়ত্ত করতেও হবে। এইটিই হল শিখনের তৃতীয় সোপান। এই সোপানেই অভ্যাস বা অনুশীলনের প্রয়োজন হয়। অবশ্য অভ্যাস বা অনুশীলন কতটা প্রয়োজন হবে তা নির্ভর করে শিখনের বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির উপর।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তত্ত্বের দিক দিয়ে শিখনের এই সোপানগুলি অপরিহার্য হলেও এগুলিকে সব সময়ে পরস্পর থেকে পৃথক করা যায় না। প্রায়ই দেখা

যায় যে এই সোপানগুলি এত দ্রুত সংঘটিত হয় যে একটি থেকে আর একটিকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হয় না।

শিখন ও পরিণমন (Learning & Maturation)

একটি শিশুকে পর্যবেক্ষণ করলে প্রথমেই যে বস্তুটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হল তার বৃদ্ধি বা বিকাশ। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাই যে শিশু ক্রমশ বাড়ছে। এই বৃদ্ধি বলতে অবশ্য অনেক কিছু বোঝায় যেমন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বৃদ্ধি, মানসিক ক্ষমতার বৃদ্ধি, আচরণের উন্নতি বা বিশেষীকরণ, নতুন আচরণ সম্পাদন সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা অর্জন ইত্যাদি।

এই বৃদ্ধি বা বিকাশের পিছনে আছে দুটি প্রক্রিয়া—শিখন (Learning, ও পরিণমন Maturation)। উভয় প্রক্রিয়ার ফলেই শিশুর বৃদ্ধি ঘটে থাকে এবং উভয় প্রক্রিয়া এত নিকট সম্পর্কে আবদ্ধ যে কোন কোন মনোবৈজ্ঞানিক দুটিকে অভিন্ন প্রক্রিয়া বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু দুটি প্রক্রিয়ার ফল মূলতঃ এক হলেও দুটির মধ্যে যথেষ্ট প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে।

পরিণমন বলতে বোঝায় সেই সব স্বাভাবিক স্বতঃপ্রবৃত্ত পরিবর্তন যা, ব্যক্তির মধ্যে অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ফলরূপে নিজে নিজেই দেখা দেয় এবং যার জন্য চর্চা, অনুশীলন, শিক্ষাদান ইত্যাদি কোন বিশেষ উদ্দীপকের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু শিখন এই ধরনের কোন অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি-প্রক্রিয়ার ফল থেকে জন্মায় না। তার জন্য প্রয়োজন হয় সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা, অনুশীলন, আয়ত্তীকরণ ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ সর্ত বা ঘটনা। যেমন, বিভিন্ন পরিবেশে মানুষ হলেও দেখা গেছে যে সকল শিশু একটি বিশেষ সময়ে একটি বিশেষ আচরণ করতে সমর্থ হয়। এর কারণ হল যে ঐ আচরণটি সম্পন্ন করতে পারার পিছনে আছে বিশেষ বিশেষ শারীরিক বৈশিষ্ট্যের বিকাশ যা সকল শিশুর ক্ষেত্রেই একই সময়ে ঘটে থাকে। কিন্তু শিখন নির্ভর করে বিশেষধর্মী প্রচেষ্টা ও পারিবেশিক শক্তিসমূহের প্রকৃতির উপর এবং এগুলি বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন হওয়ার ফলে বিভিন্ন শিশুর শিখনের মধ্যে এত পার্থক্য দেখা যায়। প্রত্যেক শিখনই বিশেষ একটি অভিজ্ঞতা থেকে জাত এবং অভিজ্ঞতার পার্থক্য অনুযায়ী শিখনও পৃথক হয়। কিন্তু পরিণমন কোনরূপ অভিজ্ঞতা-নির্ভর না হওয়াতে এবং পূর্ণভাবে শরীরের অভ্যন্তরীণ বিকাশ থেকে প্রসূত হওয়ার ফলে সকল শিশুর ক্ষেত্রে তা মোটামুটিভাবে একই প্রকৃতির হয়ে থাকে।

যেমন ১৫ মাসে সাধারণত শিশু একা একা চলতে পারে। এটি একটি পরিণমন প্রক্রিয়ার ফল। সেই জন্য সব দেশের ছেলেমেয়েরা—তা তারা যে ধরনের সামাজিক ও শিক্ষামূলক পরিবেশেই মানুষ হোক্ না কেন, ১৫ মাসের সময় একা একা চলতে পারবেই। কিন্তু সাঁতার কাটতে পারা বা গাছে উঠতে পারা বা পড়তে লিখতে পারা ইত্যাদি হল শিখনের উদাহরণ। এই সব আচরণগুলি আয়ত্ত করতে হলে বিশেষ পরিস্থিতি, প্রচেষ্টা, অনুশীলন ইত্যাদির প্রয়োজন এবং ঐ বিশেষ বিশেষ সর্তাদি উপস্থিত না থাকলে শিশুর পক্ষে ঐগুলি শেখা সম্ভব হয় না। তাছাড়া ঐ বিশেষ সর্তগুলি উপস্থিত থাকলেও সেগুলির প্রকৃতির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকতে পারে। সেই জন্যই এই সব আচরণের দিক দিয়ে শিশুতে শিশুতে এত বৈষম্য।

পরিণমন ও বিশেষ শিক্ষণ (Maturation & Specific Training)

পরিণমন ও শিক্ষণের (Training) মধ্যে প্রকৃত সম্পর্ক নির্ণয়ের জন্য মনোবিজ্ঞানীরা বহুবিধ পরীক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। এই পরীক্ষণগুলির মূল উদ্দেশ্য হল দেখা যে শিক্ষণের দ্বারা পরিণমনের কাজ সম্পন্ন করা কিংবা পরিণমনের কাজকে ত্বরান্বিত করা যায় কিনা।

হিলগার্ড (Hilgard) একদল ছেলেমেয়েকে (পরীক্ষণমূলক দল) বোতাম লাগান, কাঁচি দিয়ে কাটা, সিঁড়িতে চড়া প্রভৃতি কাজগুলি ১২ সপ্তাহ ধরে নিপুণভাবে শেখালেন। আর একটি দলকে (নিয়ন্ত্রিত দল) কোন রকম শিক্ষণই দিলেন না। ১২ সপ্তাহ পরে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে পরীক্ষণমূলক দলটি নিয়ন্ত্রিত দলের চেয়ে এই কাজগুলিতে সব দিক দিয়ে উন্নত হয়ে উঠেছে। তারপর ১ সপ্তাহ ধরে নিয়ন্ত্রিত দলকে ঐ কাজগুলি শেখান হল এবং ১ সপ্তাহ শিক্ষণের শেষেই দেখা গেল যে নিয়ন্ত্রিত দলটি ঐ কাজগুলিতে পরীক্ষণমূলক দলটির সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ পরীক্ষণমূলক দলটি ১২ সপ্তাহের বিশেষ শিক্ষণের ফলে যা শিখেছিল নিয়ন্ত্রিত দলটি তা ১ সপ্তাহে শিখে ফেললো। এর কারণ হল যে ঐ কাজগুলি সম্পন্ন করতে যে শারীরিক ও সঞ্চালনমূলক বিকাশের প্রয়োজন সেগুলি যখনই স্বাভাবিক পরিণমন প্রক্রিয়ার ফলে দেখা দিল তখনই শিশু স্বাভাবিকভাবেই ঐ আচরণগুলি সম্পন্ন করতে সমর্থ হল। বিশেষভাবে শিক্ষা দিলে কোন শিশু ঐ আচরণগুলি আগে শিখতে পারে বটে, কিন্তু যে শিশু কোনরূপ শিক্ষা আগে লাভ করেনি সে শিশুও যথাসময়ে পরিণমনের ফলে ঐ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিশুর সমকক্ষ হয়ে উঠবে। অবশ্য

উপরের পরীক্ষণটিতে ব্যবহৃত আচরণগুলি পুরোপুরি পরিণমনজাত নয় ,বলেই নিয়ন্ত্রিত দলের ক্ষেত্রেও কিছুটা শিখনের প্রযোজন হয়েছে।

ষ্ট্রেয়ার (Strayer) তাঁর একটি পরীক্ষণে দেখেন যে সমকোষী যমজের একটিকে ৩৫ দিন ধরে শিক্ষা দেওয়ার ফলে একটি শব্দমালায় সে যতটা উৎকর্ষ লাভ করতে পারল, অপরটি মাত্র ২৮ দিনের শিক্ষায় তার সমকক্ষ হয়ে গেল। দু'জনে সমকোষী যমজ বলে দু'জনেরই মানসিক শক্তি অভিন্ন। অতএব দ্বিতীয় যমজের ক্ষেত্রে শিখনের স্বল্পতা সত্ত্বেও প্রথম যমজের সমান হয়ে যাওয়াটা নিঃসন্দেহে পরিণমন প্রক্রিযার ফল।

ম্যাকগ্রও (Mcgraw) এই রকম যমজ পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে হামা দেওয়া, চলা. হাত-পা নাড়া প্রভৃতি যে সব প্রক্রিয়া পরিণমনের উপর নির্ভর-শীল সে সব প্রক্রিয়া চর্চা বা অনুশীলনের দ্বারা মোটেই প্রভাবিত হয় না এবং শিখনের সাহায্য ছাড়াই যথাসময়ে সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে। যেমন, সাধারণত ১৫ মাসে ছেলেমেয়েরা চলতে শেখে। এখন ধরা যাক একটি ১২ মাসের ছেলেকে বিশেষ শিক্ষণের সাহায্যে চলতে শেখান হল কিন্তু অপর একটি ১২ মাসের ছেলেকে কোনও বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হল না। কিন্তু দু'জনেরই যখন ১৫ মাস বয়স হবে তখন দেখা যাবে যে দ্বিতীয় ছেলেটি কোন-রূপ শিক্ষণ ছাড়াই প্রথম শিশুটির মতই চলতে পারছে।

কিন্তু যে সব আচরণ স্বাভাবিক বৃদ্ধির অন্তর্ভুক্ত নয় সে সব আচরণে শিক্ষণের প্রভাব যথেষ্টই। যেমন সাঁতার কাটা, গাছে চড়া, স্কেটিং করা, লাফান ইত্যাদি আচরণগুলি সম্পন্ন করা শিক্ষণের উপর নির্ভর করে।

এই সব পরীক্ষণ থেকে সাধারণ সিদ্ধান্ত হল যে পরিণমন প্রক্রিয়া শিখন থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া এবং শিক্ষণের সাহায্যে পরিণমন প্রক্রিযাকে ত্বরান্বিত করার কোন বাস্তব উপকারিতা নেই এবং তার দ্বারা সময় ও শ্রমের অযথা অপব্যয়ই হয়ে থাকে।

আবার অপর পক্ষে দেখা যাচ্ছে যে শিখন প্রক্রিয়া পরিণমনের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। কেননা যে আচরণ শিশুকে শেখান হবে তার জন্য যে সকল শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির সহায়তা অপরিহার্য সেগুলি পূর্বে না ঘটে থাকলে শিখন সম্ভব হতেই পারে না। যেমন, সাঁতার কাটা শেখার জন্য বিশেষ কতকগুলি দৈহিক ও সঞ্চালনমূলক আচরণ সম্পন্ন করতে পারা একান্তভাবে প্রয়োজন এবং যতক্ষণ না শিশু তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার ফলে এই

বিশেষ আচরণগুলি সম্পন্ন করার ক্ষমতা অর্জন করছে ততক্ষণ তার পক্ষে সাঁতার কাটা শেখা সম্ভব নয়।

পরিণমন ও বয়স

আবার এই স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিশুর বয়সের নিকট সম্পর্ক আছে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ বয়সে শিশুর বিশেষ বিশেষ বৃদ্ধি দেখা দেয় এবং তার ফলে শিশু বিশেষ বিশেষ আচরণ সম্পন্ন করতে সমর্থ হয়। অতএব এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে প্রত্যেকটি আচরণ শেখার বিশেষ বিশেষ সময় বা বয়স আছে।

শিশু যত বড় হয় তত তার ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলি বিকাশলাভ করতে থাকে এবং সে ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর আচরণ করতে সমর্থ হয়। এ কথা শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার আচরণের ক্ষেত্রে সত্য। যেমন, শিশুর যত বয়স বাড়ে তত তার বিচারকরণের (Reasoning) শক্তিও বাড়তে থাকে। ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশুরা ৮ থেকে ১১ বৎসর বয়সের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ বুঝতে শেখে।

শিশুর শিখনের সাধারণ ক্ষমতাও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। সেইজন্য তার বিভিন্ন বয়সের সাধারণ ক্ষমতার মান অনুযায়ী তার পাঠক্রম নির্ধারিত করা উচিত; তা বলে একথা ভাবা ভুল যে, শৈশবে শিক্ষাদানের কোন উপকারিতা নেই। বরং বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে পরবর্তীকালে শিক্ষাদানের চেয়ে প্রথম শৈশবে শিক্ষাদানের ফল অপেক্ষাকৃত বেশী ও স্থায়ী হয়।

পাঠক্রম ও মানসিক বয়স

পাঠক্রমে কোন্ বয়সে কি কি শিক্ষণীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হবে তা নির্ণয় করা উচিত শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়স বিবেচনা করে। বিশেষ করে অমূর্ত বিষয় শিখন, সমস্যা সমাধান, প্রতীক ব্যবহার ইত্যাদি আচরণগুলি শেখার উপযোগী সময় নির্ধারণের সময়গত বয়সের চেয়ে মানসিক বয়স অনেক নির্ভুল মাপকাঠি। একটি পরীক্ষণে ফস্টার (Foster) বিভিন্ন মানসিক বয়স সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের সামনে কয়েকটি গল্প পড়ে শোনালেন। প্রতিটি গল্প একবার করে শোনাবার পর গল্পটির এক জায়গায় হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি তাদের প্রত্যেককে গল্পটি নিজে থেকে শেষ করতে বললেন। দেখা গেল যে যাদের মানসিক বয়স ৩ বছরের কম তারা মোটেই গল্পটি মনে রাখতে পারে না।

আর ৩ বছরের উপর থেকে সুরু করে প্রায় ৬ বছরের মানসিক বয়স সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের বেলায় গল্প মনে রাখার ক্ষমতা বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়।

মরফেট (Morphett) এবং ওয়াসবার্ন (.Washburne) পরীক্ষণের সাহায্যে কত মানসিক বয়সে ছেলেমেয়েদের পঠন (Reading) সুরু করা উচিত তা নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। তাঁরা ৫ থেকে ৮ বৎসরের মানসিক বয়স সম্পন্ন ছেলেমেয়েদের ৬ সপ্তাহ ধরে পঠনের শিক্ষা দেবার পর তাদের পরীক্ষা করে দেখেন যে কোন্ বয়সে শতকরা কতজন ছেলেমেয়ে সাফল্য-জনকভাবে পঠনে সমর্থ হল। এই পরীক্ষণ থেকে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে ৫ বছরের কম মানসিক বয়স সম্পন্ন ছেলেমেয়েরা পঠনে সমর্থই নয় আর ৫½ বৎসর মানসিক বয়সের কিছু কিছু ছেলেমেয়ে, ৬ বৎসরের ৫০% এবং ৬½ বৎসরের ৭০%'এর বেশী ছেলেমেয়ে সাফল্যজনকভাবে পঠনে সমর্থ হয়। এ থেকে আমরা এই সিদ্ধান্ত করতে পারি যে স্কুলে পঠন সুরু করার উপযুক্ত মানসিক বয়স হল ৬½ বৎসর। বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় শিখনের উপযুক্ত মানসিক বয়সও এইভাবে বার করার চেষ্টা হয়েছে। এই সব পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে বড় বড় যোগ অঙ্ক কষার সবচেয়ে উপযোগী মানসিক বয়স হল ৮ বছর ২ মাস, দশমিকের ভাগ কষার উপযোগী মানসিক বয়স হল ১৩ বছর ৫ মাস, ক্ষেত্রফলের অঙ্ক কষার উপযোগী মানসিক বয়স হল ১২ বছর ৩ মাস ইত্যাদি।

বিশেষ শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

যদিও অভ্যন্তরীণ বৃদ্ধি বা পরিণমনের কাজ শিখনের উপর নির্ভরশীল নয়, তবু বহু পরীক্ষণ থেকে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে পরিণমনের সঙ্গে শিখনকে যুক্ত করতে পারলে ফল ভালই হয়ে থাকে। বিশেষ করে এমন অনেক আচরণ আছে যেগুলি যৌথভাবে শিখন ও পরিণমনের উপর নির্ভর করে। সেই সব আচরণ শেখার ক্ষেত্রে যদি পরিণমন প্রক্রিয়ার সঙ্গে শিখনকে যুক্ত করা যায় তাহলে আচরণটি অনেক ভালভাবেই আয়ত্ত করা যায়।

ডুসেনবেরী (Dussenberry) একটি পরীক্ষণ থেকে দেখতে পান যে ছেলেমেয়েরা কতদূরে একটি বল ছুঁড়তে পারে তা নির্ভর করে তাদের বয়স এবং শিক্ষণ উভয়ের উপর। দুটি ৩ থেকে ৭ বছরের ছেলের দলকে বল ছুঁড়তে দিয়ে দেখা হল কত দূরে তারা বলটি ছুঁড়তে পারে। তারপর একটি দলকে

(পরীক্ষণমূলক দল) ৩ সপ্তাহের জন্য বল ছোঁড়া শেখানো হল এবং অপর দলটিকে (নিয়ন্ত্রিত) কোন শিক্ষণই দেওয়া হল না। তারপর আবার ঐ দুটি দলকেই বল ছুঁড়তে দেওয়া হল এবং দেখা গেল যে শিক্ষণপ্রাপ্ত দলটি অপর দলের চেয়ে ভালভাবে বল ছুঁড়তে পারছে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে বল ছোঁড়া কাজটি পরিণমনের উপর নির্ভরশীল হলেও উপযুক্ত শিক্ষণ তার সঙ্গে যুক্ত করতে পারলে কাজটি আরও ভালভাবে সম্পন্ন হতে পারে। হিক্স (Hicks) অনুরূপ একটি পরীক্ষণ থেকে একই ধরনের সিদ্ধান্তে আসেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিণমনের গুরুত্ব অনেকখানি। শিশুর শিক্ষা এমনভাবে পরিকল্পিত হবে যে তার পরিণমনজনিত বৃদ্ধির সঙ্গে যেন শিক্ষার পূর্ণ সংগতি বর্তমান থাকে। শিখন প্রক্রিয়া শিশুর দৈহিক ও মানসিক বৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। অতএব যদি শিশুকে এমন শিক্ষা দেওয়া হয় যা তার পরিণমন বা স্বাভাবিক বৃদ্ধির আয়ত্তের বাইরে তবে সে শিক্ষা যে কেবলমাত্র ব্যর্থই হবে তা নয় শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে তা ক্ষতিকরও হবে।

শিখন ও প্রেষণা (Learning & Motivation)

শিখনের সঙ্গে প্রেষণার সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। বিনা প্রেষণায় কোন শিখন হতে পারে না। ছোটই হোক আর বড়ই হোক সব শিখনই জন্মায় প্রাণীর প্রচেষ্টা থেকে, আর প্রচেষ্টামাত্রেরই সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন হয় একটা অভ্যন্তরীণ শক্তি বা উদ্যম। এই অভ্যন্তরীণ শক্তি বা উদ্যমকে আমরা প্রেষণা নাম দিতে পারি। প্রেষণা কোন বাইরের বস্তু নয় যা শিক্ষার্থীকে শিখতে বাধ্য করার জন্য তার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। প্রেষণা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ বস্তু এবং শিখনমাত্রেরই অপরিহার্য উপকরণ।

প্রেষণাকে আমরা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ অবস্থা বলে বর্ণনা করতে পারি। প্রেষণা আবার দু'শ্রেণীর হতে পারে—মানসিক (Mental) ও শরীরতত্ত্বমূলক (Physiological)। ব্যক্তির মধ্যে এই বিশেষ অভ্যন্তরীণ অবস্থাটি যখন দেখা দেয় তখন তার মধ্যে একটি উত্তেজনা (tension) জাগে এবং যতক্ষণ না তার সেই উত্তেজনা দূর হয় ততক্ষণই সেই উত্তেজনা ব্যক্তিকে বিশেষ পথে নিয়ে যায় এবং বিশেষভাবে আচরণ করতে তাকে বাধ্য করে। সাধারণত স্বাভাবিক অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে সব দিক দিয়ে একটা শান্ত সমতাপূর্ণ অবস্থা থাকে। তাকে সাম্যাবস্থা (Homoestasis) বলা হয়। যখন ব্যক্তির মধ্যে কোন প্রেষণা জাগে তখন তার এই অভ্যন্তরীণ সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং

তার মধ্যে দেখা দেয় একটি অস্বস্তিকর ও উত্তেজনাময় অবস্থা। ব্যক্তি তখন প্রেষণার তৃপ্তির দ্বারা তার সেই লুপ্ত সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করে। ম্যাকগেওকের (Mcgeoch) ভাষায় প্রেষণা হল ব্যক্তির এমন একটি অবস্থা যা বিশেষ একটি কাজের অনুশীলনের দিকে ব্যক্তিকে পরিচালিত করে বা তাকে কাজটির সঙ্গে পরিচিত করে এবং যা ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণের পর্যাপ্ততার এবং কাজটির সম্পাদনের একটা সংজ্ঞাদান করে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির সমস্ত আচরণের পেছনেই অপরিহার্যভাবে আছে এই প্রেষণার কাজ।

শিখন ও উদ্‌বোধক (Learning & Incentive)

কেবলমাত্র প্রেষণা থাকলেই আবার শিখন হয় না। প্রেষণার সঙ্গে আর একটি বস্তুর থাকা একান্ত প্রয়োজন। সেটি হল উদ্‌বোধক (Incentive)। উদ্‌বোধক হল সেই বস্তু বা অবস্থা যা পেলে বা যেখানে পৌঁছতে পারলে প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে। যেমন, ক্ষুধা হল প্রেষণা, খাদ্যবস্তু হল উদ্‌বোধক। খাদ্য পেলে ক্ষুধাকাঙ্ক্ষা প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে এই দুটি বস্তু যখন একসঙ্গে মিলিত হয় তখনই শিখন ঘটতে পারে, নইলে নয়। এইজন্য বলা হয় যে শিখন সম্ভব হয় একমাত্র প্রেষণা-উদ্‌বোধকের মিলিত পরিস্থিতিতেই।[1]

অভ্যন্তরীণ উদ্‌বোধক (Intrinsic Incentive)

শিখনের বিষয়বস্তু যখন শিক্ষার্থীর নিকট অর্থপূর্ণ বলে মনে হয় তখন শিক্ষার্থী সেটি শেখার জন্য স্বাভাবিক প্রেষণা বোধ করে। সেই বস্তুটি শেখার জন্য সে নিজে থেকেই প্রচেষ্টা করে এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সেটা সে শেখে। এ ক্ষেত্রে কোন বাহ্যিক বস্তুর সাহায্যে তার মধ্যে প্রেষণা জাগানর প্রয়োজন হয় না। অর্থাৎ এখানে শিক্ষণীয় বস্তুটি নিজেই শিক্ষার্থীর কাছে উদ্‌বোধকরূপে কাজ করে। একেই বলে অভ্যন্তরীণ উদ্‌বোধক।

অভ্যন্তরীণ প্রেষণার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সে ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বস্তুটিই একমাত্র উদ্‌বোধক এবং শিক্ষণীয় বস্তুর জন্য শিক্ষার্থীর চাহিদাও স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে থাকে।

বাহ্যিক উদ্‌বোধক (Extrinsic Incentive)

কিন্তু নানা কারণেই দেখা যায় যে প্রায়ই শিক্ষার্থীর মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ প্রেষণার অভাব রয়েছে। অর্থাৎ তখন সে শিক্ষণীয় বস্তুটি শেখার জন্য কোন

---

1. **Learning is a function of Motivei-ncentive condition.**

স্বাভাবিক চাহিদা বোধ করে না। ফলে তাকে শিক্ষাদানের জন্য নানারূপ বাহ্যিক উদ্‌বোধকের সাহায্য নিতে হয়। প্রচলিত কয়েকটি বাহ্যিক উদ্‌বোধকের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

নিন্দা ও প্রশংসা—এই বাহ্যিক উদ্‌বোধকের সাহায্যে শিক্ষার্থীকে শিখতে প্ররোচিত করার পন্থা বহুপ্রাচীন ও সর্বদেশেই প্রচলিত। শিক্ষক ও অন্যান্য বয়ঃপ্রাপ্তদের প্রশংসা পাওয়া ও তাঁদের নিন্দা এড়ানোর জন্য শিক্ষার্থী নিজে ইচ্ছা অনুভব না করলেও চাপে পড়ে বা বাধ্য হয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে।

শাস্তি ও পুরস্কার—এই উদ্‌বোধক দুটি নিন্দা ও প্রশংসারই মূর্তরূপ। এদের ব্যবহার বহু প্রাচীন ও সর্বজনীন। তবে আধুনিক ব্যাপক গবেষণায় দেখা গেছে যে শাস্তির চেয়ে প্রশংসা বেশী কার্যকর।

প্রতিযোগিতা—অন্যান্য সঙ্গীদের প্রতিযোগিতায় হারিয়ে দেবার স্পৃহা শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখনের প্রেষণা সৃষ্টি করে এবং বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই প্রতিযোগিতার চাপে শিক্ষার্থী নতুন কিছু শিখতে অনুপ্রাণিত হয়। এই উদ্‌-বোধকটি কিন্তু স্বাস্থ্যকর সামাজিক পরিবেশ গঠনের বিরাট প্রতিবন্ধক এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে হিংসা, রাগ, ঘৃণা প্রভৃতি অবাঞ্ছনীয় মনোভাবের সৃষ্টি করে।

সাফল্য সম্বন্ধে সচেতনতা অনেক ক্ষেত্রে শিখনের উদ্‌বোধকরূপে কাজ করে থাকে। বহু গবেষণা থেকেও দেখা যায় যে শিক্ষার্থী যতই নিজের সাফল্য সম্বন্ধে সচেতন হয় ততই তার শিক্ষায় আগ্রহ বেড়ে যায়।

এছাড়া সামাজিক সমর্থন, আত্মস্বীকৃতি, আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতির চাহিদা, নতুন কিছু সৃষ্টি করার আগ্রহ, জয় করার স্পৃহা এমন কি যৌন বা বাৎসল্য অনুভূতিও অনেক সময় শিখনের উদ্‌বোধকরূপে কাজ করে থাকে।

অসংখ্য গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে বাহ্যিক প্রেষণা সকল সময় কার্যকর হয় না এবং তা থেকে প্রসূত শিক্ষা প্রায়ই যান্ত্রিক ও ত্রুটিপূর্ণ হয়। বিশেষ করে নিন্দা-প্রশংসা, শাস্তি-পুরস্কার, প্রতিযোগিতা প্রভৃতি উদ্‌বোধকগুলি সন্তোষজনক শিখনের পক্ষে মোটেই সহায়ক নয়। একমাত্র অভ্যন্তরীণ প্রেষণা অর্থাৎ শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও শিক্ষণীয় বস্তুর প্রতি চাহিদাই শিখনকে সম্পূর্ণ ও সার্থক করে তুলতে পারে। এইজন্যই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় সকল প্রকার বাহ্যিক উদ্‌বোধককে বাদ দেওয়া হয়েছে এবং শিক্ষার্থীকে তার সত্যকারের আগ্রহ ও প্রেষণার সাহায্যে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

শিক্ষায় প্রেষণার ত্রিবিধ কাজ

(Three-fold Role of Motive in Education)

শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার কাজকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—

(১) প্রেষণা আচরণের পিছনে উদ্যম বা শক্তি জোগায়।

(২) প্রেষণা ব্যক্তির আচরণ প্রবণতার নির্বাচন বা নির্ধারণ করে।

(৩) প্রেষণা ব্যক্তির আচরণের গতিপথ নির্দেশ করে।

প্রত্যেক আচরণের সম্পাদনেই প্রয়োজন উদ্যম বা শক্তি। প্রেষণার প্রথম কাজ হল ব্যক্তির অভ্যন্তরস্থ উদ্যমকে জাগান এবং পরিবেশের উপযোগী আচরণের সৃষ্টি করা। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি জৈবিক প্রেষণা শরীরের অভ্যন্তরস্থ মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিকে সক্রিয় করে তোলে এবং ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় আচরণটি সম্পন্ন করতে প্রবুদ্ধ করে।

বাইরের বিভিন্ন উদ্দীপক ব্যক্তির ক্ষেত্রে উদ্‌বোধকরূপে কাজ করে এবং তার অভ্যন্তরস্থ প্রেষণার সঙ্গে মিলিত হয়ে তাকে কাজে প্রবৃত্ত করে এবং তার কাজের প্রকৃতি নির্ধারিত করে। বিশেষ করে প্রশংসা, নিন্দা, ভর্ৎসনা, পুরস্কার, শাস্তি, অর্থ, খাদ্য ইত্যাদি হল এমন কয়েকটি উদ্‌বোধক যা সর্ব সমাজে ব্যবহৃত হয় ব্যক্তির মধ্যে প্রেষণা উদ্বুদ্ধ করার জন্য। অবশ্য ব্যক্তি কতটা এই সব উদ্‌বোধকের দ্বারা প্রভাবিত হবে তা অনেকখানি নির্ভর করে ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা, বিচারকরণ, প্রত্যাশা, অনুমান ইত্যাদির উপর।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে এই উদ্যম সৃষ্টি করাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। শিক্ষায় স্বাভাবিক প্রেষণার অভাব দেখলে প্রায়ই পুরস্কার, শাস্তি, প্রশংসা, নিন্দা, ইত্যাদি নানা শক্তিশালী উদ্‌বোধকের সাহায্য নেওয়া হয়। মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এটি সম্পূর্ণ ভুল শিক্ষানীতি। এই সব উদ্‌বোধকের দ্বারা সাময়িকভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যে উদ্যম সৃষ্টি করা গেলেও সে উদ্যম কখনও স্থায়ী হয় না। কিন্তু অপর পক্ষে যদি শিক্ষণীয় বস্তুটিকে শিক্ষার্থীর কাছে সত্যকারের আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তাহলে সেই বস্তুটিই তার কাছে উদ্‌বোধকরূপে কাজ করবে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে স্থায়ী প্রেষণা সৃষ্টি করবে। শিক্ষণীয় বস্তুটিকে আকর্ষণীয় করে তোলার পন্থা হল বস্তুটির অর্থ ও সার্থকতা সম্বন্ধে শিক্ষার্থী যাতে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। সাধারণত স্কুলে পরীক্ষায় পাশ মার্ক পাওয়া, প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি উন্নত স্থান অধিকার করা, পুরস্কার পাওয়া প্রভৃতি উদ্‌বোধকগুলির দ্বারা শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। এগুলির দ্বারা বাস্তবক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রচেষ্টার সৃষ্টি

করা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষণীয় বস্তু বা কাজটি যদি শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় বা সার্থকতাসম্পন্ন বলে মনে না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর সে শিক্ষা সত্যকারের কার্যকর হয় না। গতানুগতিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার্থীর সামনে প্রকৃত লক্ষ্যটি (অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তু বা কাজটি) উপস্থাপিত না করে স্কুল মার্ক, শ্রেণীতে উচ্চস্থান, পুরস্কার ইত্যাদি নানা কৃত্রিম লক্ষ্য স্থাপন করা হয় এবং তার ফলে সে সব বিদ্যালয়ে শিক্ষা যান্ত্রিক ও অসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রেষণার দ্বিতীয় কাজ হল আমাদের আচরণপ্রবণতার নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণ করা। প্রেষণাই আমাদের নির্দেশ দেয় যে কোথায় এবং কখন আমরা সাড়া দেব, কোথায় এবং কখন আমরা সাড়া দেব না। তাছাড়া বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কিভাবে সাড়া দেওয়া উচিত তাও নির্ধারিত করে দেয় আমাদের প্রেষণা। এর অর্থ হল যে যখনই আমাদের মধ্যে কোন একটি বিশেষ প্রেষণার সৃষ্টি হয় তখন কেবল যে আমরা অভ্যন্তরীণ উত্তেজনামূলক পরিস্থিতির চাপে সক্রিয় হয়ে উঠি তাই নয়, আমরা যে সব কাজ সে সময় সম্পন্ন করি সেগুলিও আমাদের কাছে বিশেষভাবে নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে ওঠে। আমাদের কর্মপ্রবণতার এই নির্বাচন ও নিয়ন্ত্রণের পেছনে আছে আমাদের ঐ বিশেষ প্রেষণাটি।

মানব আচরণের প্রকৃতি হল নির্বাচনধর্মী। অর্থাৎ আমরা যে সব আচরণ করি সেগুলি আগে থেকেই সুনির্বাচিত থাকে। বিভিন্ন লোক যখন একই খবরের কাগজ পড়ে তখন তারা প্রত্যেকেই প্রকৃতপক্ষে কাগজের বিভিন্ন অংশ পড়ে। বিভিন্ন লোক যখন একটি সিনেমার ছবি দেখে বা একটি দৃশ্য উপভোগ করে তখন তারা ছবি বা দৃশ্যটির বিভিন্ন অংশ বা দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই নির্বাচনমূলক আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতার পেছনে আছে আমাদের প্রত্যেকের প্রেষণার বিভিন্নতা।

অতএব যখন ক্লাশে শিক্ষক সব ছেলেকে একটি পড়া দেখিয়ে বলেন যে এটা পড় তখন তাঁর নির্দেশটি স্পষ্টই অসম্পূর্ণ ও ক্রটীপূর্ণ। কেননা এই ধরনের নির্দেশের ফলে এবং প্রেষণার বৈষম্যের জন্য পাঠ্যবিষয়টির বিভিন্ন অংশের প্রতি বিভিন্ন শিক্ষার্থীর মনোযোগ যাবে এবং যদি শিক্ষক পরিষ্কারভাবে পঠনীয় বস্তুটিকে সুনির্দিষ্ট করে না দেন তবে বিভিন্ন শিক্ষার্থী প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন বস্তু শিখবে এবং তার ফলে শিক্ষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে।

প্রেষণার এই আচরণ-নির্বাচনের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে অতীত

শিখনের উপর। ছোট ছেলে ক্ষুধার্ত হলে বাড়ীর যেখানে খাবার থাকে সে সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হয়। তার কারণ হল যে সে অতীতে এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছে যে ঐ বিশেষ জায়গায় গেলে খাবার পাওয়া যাবে।

প্রেষণামূলক নির্বাচনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল যে প্রাণী তার চাহিদার তৃপ্তির জন্য নানা বিভিন্ন প্রকারের আচরণ করে যায় এবং শেষ পর্যন্ত যে আচরণের ফলে তার চাহিদার তৃপ্তি হয় সেই আচরণটিই সে গ্রহণ করে, বাকী আচরণগুলিকে সে ত্যাগ করে।

প্রেষণার তৃতীয় কাজ হল ব্যক্তির আচরণকে বিশেষ পথে পরিচালিত করা। কোন বিশেষ লক্ষ্যে পৌছতে হলে কেবলমাত্র আচরণ সম্পন্ন করলেই হবে না, আচরণকে এমন পথে নিয়ে যেতে হবে যাতে বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌছান যায় এবং তা থেকে প্রেষণার তৃপ্তি ঘটে। যেমন, কোন ব্যক্তির মধ্যে তৃষ্ণা জাগার ফলে সক্রিয়তা দেখা দিল এবং সে জন্য সে আচরণ সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত হল। কিন্তু তার পক্ষে অনির্দিষ্ট বা অপরিকল্পিত আচরণ করলেই চলবে না। তার আচরণ যদি জলের দিকে পরিচালিত না হয় তাহলে তার তৃষ্ণা কখনই মিটবে না। সে জন্য ব্যক্তির চাহিদার বাঞ্ছিত তৃপ্তির জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত লক্ষ্যের অভিমুখী আচরণ সম্পন্ন করতে শেখা।

শিক্ষার ক্ষেত্রে এ তথ্যটিরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। শিক্ষাকে কার্যকর করতে হলে প্রথমেই দেখতে হবে যে শিক্ষার্থী যেন তার লক্ষ্যটি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা গঠন করতে পারে। লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ণ ও স্পষ্ট ধারণা থাকলে শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা লক্ষ্যের উপযোগী হবে এবং অনর্থক অপ্রয়োজনীয় আচরণ করে সে সময় ও শ্রমের অপব্যয় করবে না।

গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুকে যা শেখান হয় তার লক্ষ্য সম্বন্ধে তার মধ্যে কোন স্পষ্ট ধারণা জন্মায় না। যেমন, নামতা মুখস্থ করান, শব্দরূপ ধাতুরূপ মুখস্থ করান, বানান শেখান, ব্যাকরণের নিয়মকানুন আয়ত্ত করান, বিভিন্ন গাণিতিক ফরমূলা মুখস্থ করান ইত্যাদি প্রচলিত শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াগুলি তাদের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে এতই সুদূর ও সম্পর্কহীন যে শিক্ষার্থীরা এগুলির প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে কোনরূপ স্পষ্ট ধারণাই করতে পারে না। তার ফলে তারা এই প্রক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করে যন্ত্রের মত উদ্দেশ্যহীনভাবে।

শিক্ষার্থীকে যখন কোন বিশেষ উক্তির ব্যাখ্যা করতে দেওয়া হয় বা কোন গদ্যাংশের সারমর্ম লিখতে দেওয়া হয় তখনও শিক্ষার্থীদের কাছে এই কাজগুলির প্রকৃত লক্ষ্য কি তা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় না। আবার অনেক সময় শিক্ষাপ্রক্রিয়াগুলির লক্ষ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এমন সব লক্ষ্যের কথা বলা হয় যা শিক্ষার্থীর কাছে নিতান্তই অস্পষ্ট, অবাস্তব এবং তার বর্তমান জীবনের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। লক্ষ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর স্পষ্ট ও পূর্ণ ধারণা না হওয়ার ফলে তার শিক্ষামূলক প্রচেষ্টাগুলি অনিয়ন্ত্রিত, অসংহত ও যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। এই ত্রুটি দূর করতে হলে যখনই কোনরূপ প্রচেষ্টা বা কাজ সম্পন্ন করতে শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেওয়া হবে তখনই তার প্রকৃত লক্ষ্যটি কি সে বিষয়ে শিক্ষার্থীকে পরিষ্কার ধারণা গঠন করতে সাহায্য করতে হবে। এই কারণেই আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীকে এই রকম অর্থহীন ও বিচ্ছিন্ন আচরণ করতে না দিয়ে সমগ্র কাজটিই তার সামনে উপস্থাপিত করা হয় যাতে সে তার সমস্ত প্রচেষ্টারই প্রকৃত লক্ষ্য কি সে সম্বন্ধে পূর্ণ ও পরিষ্কার ধারণা গঠন করে নিতে পারে।

কেবলমাত্র লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গঠিত হলেই হবে না। শিক্ষার্থী যাতে সেই লক্ষ্যের উপযোগী আচরণ করতে পারে সেটা দেখাও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। অনেক সময় এমন হয় যে শিক্ষার্থী তার লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন থাকলেও কোন্ আচরণের মাধ্যমে সে লক্ষ্যে পৌঁছন যায় সে সম্বন্ধে তার পরিষ্কার জ্ঞান থাকে না এবং তার ফলে সে উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো আচরণ করে চলে। এই জন্য শিক্ষকের কর্তব্য হল বিভিন্ন আচরণের মধ্যে থেকে শিক্ষার্থী যাতে সর্বাপেক্ষা কার্যকর আচরণটি বেছে নিতে পারে সে সম্বন্ধে তাকে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া। ডিউইর মতে যাতে শিশুর প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতাই তার কাছে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া শিক্ষকের প্রধানতম কর্তব্য।

বিদ্যালয়ে প্রেষণা ও উদ্বোধকের স্থান
(Motives & Incentives in School)

বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাগ্রহণের পেছনে নানা বিভিন্ন প্রকৃতির প্রেষণার প্রভাব দেখা যায়। এই বিভিন্ন প্রেষণাগুলির কিছু সহজাত, কিছু অর্জিত। শিশু যখন জন্মায় তখন সে কতকগুলি জৈবিক চাহিদা নিয়ে জন্মায়। কিন্তু যত সে বড় হতে থাকে তত তার মধ্যে নতুন নতুন চাহিদা দেখা দেয়। যেমন, আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা, সামাজিক চাহিদা, অভিজ্ঞতা [illegible] [illegible] সাফল্য

আত্মসম্মান, আদর্শবোধ ইত্যাদি। এইগুলিই তার সমগ্র আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই প্রাথমিক বা মৌলিক প্রেষণাগুলি থেকে কালক্রমে নানা বিশেষধর্মী প্রেষণা ও উদ্‌বোধক শিশুর মধ্যে জন্মগ্রহণ করে। শিশু যখন বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে তখন তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে এই অসংখ্য প্রেষণা ও উদ্‌বোধক। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষা-প্রচেষ্টাকে প্রধানত নিম্নলিখিত প্রেষণা ও উদ্‌বোধকগুলি প্রভাবিত করে থাকে।

(ক) জ্ঞান, উপলব্ধি ও কৌশল আহরণ করে নিজের আগ্রহের তৃপ্তিসাধন করার ইচ্ছা শিক্ষার্থীর মধ্যে বিশেষ শক্তিশালী প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে। এই জন্যই শিশু আর সকলের সঙ্গে মিশে কোন একটি বিশেষ কাজ সম্পন্ন করে বা নিজে পড়াশোনা করে বা কোন শিল্প বা কোন কলার মধ্যে দিয়ে নিজের সৃজনীশক্তির প্রকাশ করে।

(খ) অতীত শিক্ষণকে নিজের আগ্রহতৃপ্তি বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজে লাগান শিক্ষার্থীর মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রেষণা। যেমন, কোন শিশু লিখতে শিখে তার বন্ধুকে একটা চিঠি লিখল বা নিজের কোন অভিজ্ঞতা বা পরীক্ষণের উপর কোন ব্যক্তি একটি প্রবন্ধ লিখল।

(গ) কোন দুরূহ কাজ আয়ত্ত করা বা কোন শক্ত সমস্যার সমাধান করার ইচ্ছাও শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক শক্তিশালী প্রেষণা। এই প্রেষণায় প্রবুদ্ধ হয়েই শিক্ষার্থীরা কঠিন বিষয়বস্তু বুঝতে চেষ্টা করে, গাণিতিক সমস্যার সমাধান করে বা কোন শক্ত কাজ বা উদ্যোগ শেষ করে। শিক্ষার্থীর এই প্রেষণাকে শিক্ষকেরা শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে লাগাতে পারেন। তবে তাঁদের একটা বিষয়ে সতর্ক হতে হবে যে শিক্ষার্থীকে যে সকল কাজ করতে দেওয়া হবে সেগুলি যেন তার শক্তিসামর্থ্যের উপযোগী হয়।

(ঘ) শিক্ষার্থী যে জ্ঞান ও কৌশল আহরণের দিক দিয়ে প্রতিদিন এগিয়ে চলেছে এই সচেতনতাও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা বড় প্রেষণা রূপে কাজ করে থাকে। যদি শিশু বোঝে যে পড়ায় বা হাতের লেখায় বা কোন শিল্পকাজে সে উন্নতি করে চলেছে, তাহলে স্বভাবতই তার কাজে সে উৎসাহ পাবে এবং আরও বেশী করে সে চেষ্টা করবে।

(ঙ) শিক্ষার্থী যে তার নিজের [illegible] সম্ভাবনা ও শক্তিগুলির বৃদ্ধি [illegible] নিজেকে আরও [illegible] অভিব্যক্ত করতে [illegible] সেই [illegible] উপলব্ধি [illegible] এই [illegible] শিক্ষার্থীর মধ্যে [illegible] করে প্রেষণার [illegible]

এই ধরনের প্রেষণা বিশেষভাবে দেখা দেয় যখন শিক্ষার্থী কোন বিশেষধর্মী কাজে পারদর্শিতা লাভ করে।

(চ) কৌতূহল এবং তার চারপাশের পৃথিবীকে জানার আকাঙ্খাও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা প্রবল প্রেষণা রূপে কাজ করে। এই প্রেষণার পরিতৃপ্তি হয় বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, সাহিত্য প্রভৃতি পাঠের মাধ্যমে এবং নানা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে দিয়ে।

(ছ) শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষার্থী যাঁকে ভালবাসে বা শ্রদ্ধা করে তাঁর সঙ্গে নিজেকে অভেদীকরণ (Identification), নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা বোধ ইত্যাদিও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে।

(জ) সহপাঠী, শিক্ষক, পিতামাতা প্রভৃতির প্রশংসা ও অনুমোদন পাবার ইচ্ছাও একটি শক্তিশালী প্রেষণা।

(ঝ) তেমনই সহপাঠী, শিক্ষক, পিতামাতা প্রভৃতির নিন্দা ও সমালোচনা এড়াবার ইচ্ছাও আর একটি শক্তিশালী প্রেষণা।

(ঞ) ব্যক্তিগত ও দলগত প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভের ইচ্ছা শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রবল প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে এবং সাধারণ বিদ্যালয়ে নানা প্রতিযোগিতায় পুরস্কারের লোভ ইত্যাদির দ্বারা প্রেষণাকে উদ্বুদ্ধ করা হয়ে থাকে।

(ট) দলগত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার আকাঙ্খাও বহুক্ষেত্রে সমান কার্যকর প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে।

(ঠ) বিদ্যালয়ে নিজের স্থান, সাফল্য ও প্রাপ্য সমাদর শিক্ষার্থীর মধ্যে একটা নিরাপত্তার অনুভূতি এনে দেয় এবং তার প্রচেষ্টার পিছনে এই অনুভূতি প্রেষণা জুগিয়ে থাকে।

(ড) তেমনই আবার যদি বিদ্যালয়ে সহপাঠীদের মধ্যে শিক্ষকদের দৃষ্টিতে শিক্ষার্থী তার নিজের স্থান বজায় রাখতে না পারে তবে সে তার এই নিরাপত্তা হারাবে। নিরাপত্তা হারাবার এই ভয়ই শিক্ষার্থীকে নিন্দনীয় এবং অবাঞ্ছিত কাজ থেকে বিরত রাখে।

(ঢ) প্রচলিত বিদ্যালয়ে শাস্তিও একটি শক্তিশালী প্রেষণারূপে কাজ করে থাকে। শারীরিক শাস্তি থেকে সুরু করে ক্লাশ থেকে বার করে দেওয়া, ভর্ৎসনা, বিদ্রূপ, সমালোচনা ইত্যাদি নানা মনোবৈজ্ঞানিক শাস্তিও শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে।

উপরে যে প্রেষণাগুলির বর্ণনা দেওয়া হল সেগুলি কিশোরদের, শিক্ষার্থীদের মধ্যেই বিশেষ করে দেখা যায়। প্রেষণাগুলির প্রকৃতি দেখলেই বোঝা যাবে যে

বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিস্থিতি থেকেই এই প্রেষণাগুলির উদ্ভব হয়েছে এবং শিক্ষার্থীদের সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করে এই প্রেষণাগুলিই।

প্রেষণা ও শিক্ষকের কর্তব্য (Teacher and Motivation)

অতএব সুশিক্ষকের সর্বপ্রথম কর্তব্য হল এই প্রেষণাগুলিকে পর্যবেক্ষণ করা এবং বিচক্ষণতার সঙ্গে এগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত কর্মপ্রচেষ্টার সৃষ্টি করা। এমন কতকগুলি প্রেষণা আছে যেগুলিকে অতিমাত্রায় উদ্বুদ্ধ করা শিক্ষার্থীর মানসিক সাম্য বা ব্যক্তিসত্তার বিকাশের পক্ষে ক্ষতিকর। যেমন, বিদ্যালয়ে তার নিজস্ব স্থান বা সহপাঠীদের সম্মান বা শিক্ষকদের সমাদর হারাবার ভয় দেখিয়ে শিক্ষার্থীকে সাধ্যমত প্রচেষ্টা করতে বাধ্য করা যেতে পারে কিন্তু এই সব ভয় যদি অতিরিক্ত মাত্রায় শিক্ষার্থীর মন জুড়ে থাকে তাহলে দুশ্চিন্তা, দুর্বলতা, দ্বিধা, সন্দেহ প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক কর্মপ্রচেষ্টা ও মানসিক সাম্য বিশেষভাবে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা আছে। বিশেষ করে যে সব শিক্ষার্থী নিজেদের সামর্থ্যে পূর্ণ বিশ্বাসী নয় তাদের মধ্যে এই থেকে নিম্নতাবোধ ও আত্মগ্লানি দেখা দেয়। কিন্তু অপরপক্ষে যদি শিশুর নিরাপত্তার অনুভূতিকে সযত্নে উদ্বুদ্ধ করা যায় অর্থাৎ যদি শিক্ষকদের স্নেহ, সহপাঠীদের সমর্থন, স্কুলে তার নিজস্ব অধিকার ইত্যাদি সম্বন্ধে তার সচেতনতা এবং আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা যায় তাহলে একদিক দিয়ে যেমন তাকে প্রচেষ্টা করতে প্রবুদ্ধ করা যাবে তেমনই তার মধ্যে মানসিক পরিতৃপ্তিও আনা সম্ভব হবে। পুরস্কার ও শাস্তি এবং সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য।

শিখনের শ্রেণীবিভাগ : জ্ঞান ও কৌশল
(Types of Learning : Knowledge & Skill)

আমাদের শিখনের বিষয়বস্তুটিকে মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করতে পারা যায়—জ্ঞান (Knowledge) এবং কৌশল (Skill)। জ্ঞান বলতে সেই সব বিষয়বস্তুকে বোঝায় যেগুলি শিখতে প্রধানত মানসিক শক্তিরই প্রয়োজন হয়, দৈহিক শক্তির প্রয়োগ অত্যন্ত অল্প বা প্রয়োজন হয় না বললেই চলে। যেমন, কোন ভাব (Idea) বা চিন্তা (Thought) বা তথ্য (Fact) শেখার সময় আমাদের প্রধানত উপলব্ধি বা বোঝার ক্ষমতার উপর নির্ভর করতে হয়। দৈহিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার সেখানে নামমাত্র। কোন কবিতা পড়ে তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা, কোন গদ্যাংশের সারাংশ লেখা, কোন [illegible]

অর্থ বোঝা বা কোন ঘটনা বা বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে তথ্য আহরণ করা—এ সবই জ্ঞানমূলক শিখনের পর্যায়ে পড়ে। এ সব ক্ষেত্রে চোখ, মুখ, কান, ইত্যাদি অঙ্গের সাহায্য লাগলেও শিখন কাজটির অধিকাংশই আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রস্থানীয় মস্তিষ্কের সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে। এইজন্য এই শ্রেণীর কাজগুলিকে কেন্দ্রীয় আচরণ (Central Activity) বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে।

তেমনই, শিকার করা, কার্পেট বোনা, ঘর তৈরী করা, দৌড়ান, সাঁতার কাটা, ক্রিকেট খেলা, টাইপ করা ইত্যাদি অসংখ্য কাজের নাম করা যায় যেগুলি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের উপরই বিশেষ করে নির্ভর করে এবং যেগুলিতে প্রকৃত মস্তিষ্কের সক্রিয়তা অপেক্ষাকৃত অল্প বললেই চলে। এই কাজগুলি স্নায়ুতন্ত্রের প্রান্তস্থিত বিভিন্ন অংশগুলির দ্বারা সম্পন্ন হয় বলে এগুলিকে সাধারণত আমরা প্রান্তীয় আচরণ (Peripheral Activity) বলে বর্ণনা করে থাকি।

অবশ্য একথা মনে রাখতে হবে যে এমন কোন কাজ নেই যা পুরোপুরি মানসিক বা পুরোপুরি দৈহিক। সব কাজ সম্পন্ন করতেই আমাদের দেহ ও মন দুয়েরই সাহায্য লাগে, তবে কোনটিতে হয়ত দৈহিক সক্রিয়তার পরিমাণ বেশী, আর কোনটিতে মানসিক সক্রিয়তার প্রয়োগ বেশী থাকে।

এমন শিখন বলতে বোঝায় আমাদের আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন। জ্ঞানমূলক কিছু শেখার মধ্যে দিয়েই হোক্ বা কৌশলমূলক কিছু শেখার মধ্যে দিয়েই হোক্ যখনই আমাদের বর্তমান আচরণের স্থানে আমরা নতুন কোন আচরণ সম্পন্ন করি তখনই তাকে শিখন বলা হয়। অতএব সে দিক দিয়ে জ্ঞানমূলক শিখন এবং কৌশলমূলক শিখন উভয়ের মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই।

তবে এ দু'ধরনের শিখনের মধ্যে পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে। জ্ঞানমূলক কিছু শিখনের সময় বিষয়বস্তুটির অন্তর্নিহিত অর্থ ও তার বিভিন্ন অংশগুলির সম্পর্ক উপলব্ধি করাটাই প্রধানতম কাজ এবং ফলে অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই এ ধরনের শিখন সম্পন্ন হয়ে থাকে। অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োগের সময় আমাদের দুটি মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়—পৃথক্‌করণ (Abstraction) ও সামান্তীকরণ (Generalisation)। জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলি পৃথক করে নিয়ে সেগুলি থেকে সামান্য সত্য বা সূত্র গঠন করাই হল এই ধরনের বিষয়বস্তু শেখার প্রকৃত পদ্ধতি।

তেমনই কৌশলমূলক শিখনের ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োগের অবকাশ আছে। সেখানেও আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সঞ্চালনমূলক পরিবর্তন আনাটাই শিখনের মূল কাজ। সেইজন্য কৌশল শিখনের সময় আমাদের প্রচেষ্টা ও ভুলের পদ্ধতির

(Trial-and-arror) উপরই বিশেষ নির্ভর করতে হয়। যেমন সাঁতার কাটা, মোটর গাড়ী চালান, টাইপ করা ইত্যাদি ধরনের কৌশল আয়ত্ত করতে গেলে বার বার প্রচেষ্টা ও-ভুলের মধ্যে দিয়ে আমাদের এগোতেই হয়।

তবে কৌশল শেখার সময় যে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োগ একেবারেই নেই তা মনে করা ভুল। নিতান্ত প্রাথমিক স্তরের কৌশল ছাড়া আর সকল প্রকার কৌশলের ক্ষেত্রেই বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করা কৌশলটি পূর্ণভাবে আয়ত্ত করার পক্ষে অপরিহার্য। সেজন্য জটিল ও উন্নত স্তরের কৌশল শেখার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্দৃষ্টির সংমিশ্রণ দ্রুত ও সার্থক শিখন এনে থাকে। অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োগ করার মত মানসিক শক্তি যাদের নেই তাদের সমস্ত কৌশলই নিছক প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে শিখতে হয় এবং তার ফলে দীর্ঘ সময় ও অতিরিক্ত পরিশ্রম লাগে।

জ্ঞানমূলক বিষয় শেখার সময়ও মাঝে মাঝে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি অনুসরণ করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। যেখানে বিষয়বস্তুটি পূর্ণভাবে উপস্থাপিত করা যায় না বা যেখানে বিষয়বস্তুটির বিভিন্ন অংশের মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্পর্কগুলি কোন গঠনমূলক অসম্পূর্ণতার জন্য স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না সে সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত মানসিক শক্তি বা বুদ্ধি। যারা উপযুক্ত পরিমাণ বুদ্ধি থেকে বঞ্চিত তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তু আহরণ করতে পারে না। আর যে সব ক্ষেত্রে তারা পারে সে সব ক্ষেত্রে তারা প্রচেষ্টা ও-ভুলের পদ্ধতির সাহায্যেই সে জ্ঞান আহরণ করে থাকে। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় যে এ ধরনের জ্ঞান ভবিষ্যতে যান্ত্রিক, অর্থহীন ও অকেজো হয়ে দাঁড়ায়।

তাছাড়া জ্ঞান ও কৌশলের শিখনের মধ্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। কৌশল শিখনের ক্ষেত্রে চর্চা বা অনুশীলনের বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। কেননা সমস্ত কৌশলেই ,ব্যক্তিকে কোন না কোন প্রকারের দৈহিক আচরণদ্বারা আয়ত্ত করতে হয় এবং বার বার চর্চা বা অনুশীলন ছাড়া দৈহিক আচরণ স্থায়ীভাবে আয়ত্ত করা যায় না। জ্ঞানমূলক শিখনের ক্ষেত্রে চর্চা বা অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা কম। অবশ্য যে সব জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তুকে তথ্যের পরিমাণ বেশী সেখানে বার বার অনুশীলন বা চর্চা অপরিহার্য।

তথ্য আহরণের জন্য জ্ঞানমূলক বিষয়বস্তু শেখানোর সময় শিক্ষকদের দেখা উচিত যে শিক্ষার্থী যেন তার অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগের দ্বারাই বস্তুটি শেখার চেষ্টা

করে, প্রচেষ্টা ও-ভুলের পদ্ধতির প্রয়োগ করে অযথা সময় ও শ্রমের অপব্যয় না করে। অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োগ করতে হলে শিক্ষার্থীকে পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ এ দুটি মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ভাল করে অবহিত হতে হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষক সুপরিচালনার দ্বারা শিক্ষার্থীকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারেন।

তেমনই কৌশল শেখার সময়ও নিছক প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির উপর নির্ভর না করে শিক্ষার্থী যাতে প্রয়োজনমত অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োগ করতে পারে সে বিষয়ে তাকে সাহায্য ও পরিচালনা করাও শিক্ষকের কর্মসূচীর অন্তর্গত।

শিখন-প্রক্রিয়া ও শিক্ষা

শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে শিখনের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা শিশুর শিক্ষা শিখন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে হলে শিখন-প্রক্রিয়ার সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলির সমাধান করতে হবে। বস্তুত শিখন-প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানের একটি বৃহৎ অংশ গড়ে উঠেছে।

আট

শিখনের বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of Learning)

শিখনের স্বরূপ সম্বন্ধে মতভেদের বিশেষ অবকাশ না থাকলেও শিখন-প্রক্রিয়াটি কিভাবে সম্পন্ন হয় এ সম্বন্ধে একাধিক মতবাদ পাওয়া যায়। শিখন-প্রক্রিয়ার উপর কম করে ৯টি বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত আছে।

অনুষঙ্গবাদ ও গেষ্টাল্টবাদ
(Associationism and Gestalt School)

মনোবিজ্ঞানের সূত্রপাত থেকে যে বিশেষ মতবাদটি মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য ও প্রক্রিয়ার সংব্যাখ্যান ও সূত্রগঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে সেটি অনুষঙ্গবাদ (Associationism) নামে পরিচিত। পূর্ব উনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশশতাব্দীর একটি বড় অংশ এই অনুষঙ্গবাদ মনোবিজ্ঞানের উপর একপ্রকার একাধিপত্য করে এসেছে বলা চলে। বিংশশতকের দ্বিতীয় দশকে এই অনুষঙ্গবাদের সম্পূর্ণ একটি বিপরীত মতবাদ ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। এই মতবাদটিকে গেষ্টাল্ট মতবাদ নাম দেওয়া যেতে পারে। মৌলিক নীতির দিক দিয়ে অনুষঙ্গবাদ ও গেষ্টাল্ট মতবাদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। অনুষঙ্গবাদের মতে আমরা শিখন পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন উদ্দীপককে বিভিন্ন ও বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিই। গেষ্টাল্ট মতবাদের মতে শিখনের ক্ষেত্রে আমরা সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটিকে আমাদের সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে সাড়া দিই, বিচ্ছিন্ন উদ্দীপককে বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিই না। শিখনের প্রচলিত বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে আমরা এখানে চারটি প্রধান তত্ত্ব বা মতবাদের আলোচনা করব। সেগুলি হল—

১। থর্নডাইকের সংযোজনবাদ (Thorndike's Connectionism)

২। গেষ্টাল্টদলের অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন (Insightful Learning of the Gestaltists)

৩। প্যাভলভের অনুবর্তনবাদ (Pavlov's Theory of Conditioning)

৪। শিখনের 'ফিল্ড' মতবাদ (Field Theory of Learning)

এই চারটি মতবাদের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি অনুষঙ্গবাদের উপর ভিত্তি করে গঠিত। প্রথম মতবাদটি বিশেষভাবে প্রাচীন অনুষঙ্গবাদের মৌলিক

নীতির অনুসরণে পরিকল্পিত। তৃতীয়টিও যে অনুষঙ্গবাদভিত্তিক এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই, তবে এই মতবাদে যান্ত্রিক অনুষঙ্গের উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ তত্ত্ব দুটি আবার সম্পূর্ণভাবে গেস্টাল্ট মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। উভয়ক্ষেত্রেই গেস্টাল্টবাদের মৌলিক নীতিটি গ্রহণ করা হয়েছে। তবে চতুর্থ তত্ত্বটি সম্পূর্ণ আধুনিক এবং পুরাতন গেস্টাল্টতত্ত্বের উন্নত রূপ বিশেষ। এই চারটি শিখনের তত্ত্ব নীচে বর্ণনা করা হল।

১। থর্নডাইকের সংযোজনবাদ
(Thorndike's Connectionism)

থর্নডাইকের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ-স্থাপনই হল শিখন। যা কিছু আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাগাতে পারে তাই হল উদ্দীপক আর কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ানুভূতির উত্তরে আমরা যে সাড়া দিই তাই হল প্রতিক্রিয়া। থর্নডাইকের ব্যাখ্যায় এই উদ্দীপকের আবেদন এবং তারউত্তরে দেওয়া সাড়া বা প্রতিক্রিয়া এই দুটির মধ্যে যখন নির্ভুল যোগসূত্র স্থাপিত হয় তখনই শিখন হয়। যেমন, মনে করা যাক, আমার সামনে একটি বোর্ডে ৫টি সুইচ আছে। আর আছে একটা আলো। বলা হল যে ঐ ৫টি সুইচের মধ্যে বিশেষ একটি সুইচ টিপলে আলোটি জ্বলে উঠবে। আমি প্রথম সুইচটি টিপলাম আলো জ্বলল না। দ্বিতীয়টি টিপলাম তখনও আলো জ্বলল না কিন্তু যেই তৃতীয়টি টিপলাম আলোটি জ্বলে উঠল। এবার আমি জানলাম যে তৃতীয় সুইচটি টিপলে আলোটি জ্বলে। অর্থাৎ আমি শিখলাম কিভাবে আলোটি জ্বালাতে হয়। এটি একটি শিখনের দৃষ্টান্ত। এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিখন হল না, কেননা সেখানে উদ্দীপকের (আলো) সঙ্গে নির্ভুল প্রতিক্রিয়ার (তৃতীয় সুইচটি টেপার) সংযোজন হয় নি। কিন্তু তৃতীয়বারে উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোজন নির্ভুল হয়েছে এবং সেইজন্য সেক্ষেত্রে শিখনও সম্ভব হয়েছে।

উপরের উদাহরণটি শিখনের সরলতম ক্ষেত্র। একটি জটিল উদাহরণ নেওয়া যাক। মনে করা যাক একটি ছেলেকে একটি বীজগণিতের অঙ্ক কষতে দেওয়া হয়েছে। অঙ্কটি বিশেষ একটি ফরমুলার প্রয়োগ করে করা যায়। ছাত্রটি তার জানা ফরমুলাগুলি একটির পর একটি প্রয়োগ করতে করতে ঠিক ফরমুলাটির প্রয়োগ করতেই অঙ্কটি হয়ে গেল। যতক্ষণ সে ঠিক ফরমুলাটি প্রয়োগ করেনি ততক্ষণ তার উদ্দীপক (অঙ্কটি) ও প্রতিক্রিয়ার (ফরমুলার প্রয়োগ) মধ্যে নির্ভুল

সংযোজন হয়নি। আর যেই সে ঠিক ফরমুলাটি প্রয়োগ করতে পারল সঙ্গে সঙ্গে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোজনও ঠিক হল এবং তার শিখনও ঘটল।

অতএব দেখা যাচ্ছে যখনই উদ্দীপকের সঙ্গে ঠিক তার উপযোগী প্রতিক্রিয়াটি সংযুক্ত করা হবে তখনই শিখন সম্ভব হবে। আর যতক্ষণ উদ্দীপকের সঙ্গে উপযুক্ত প্রতিক্রিয়ার সংযোগ ঘটবে না ততক্ষণ শিখনও হবে না। এইজন্যই থর্নডাইকের মতে শিখন হল উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন (Stimulus-Response Bond বা S—R Bond) করা ছাড়া আর কিছু নয়।

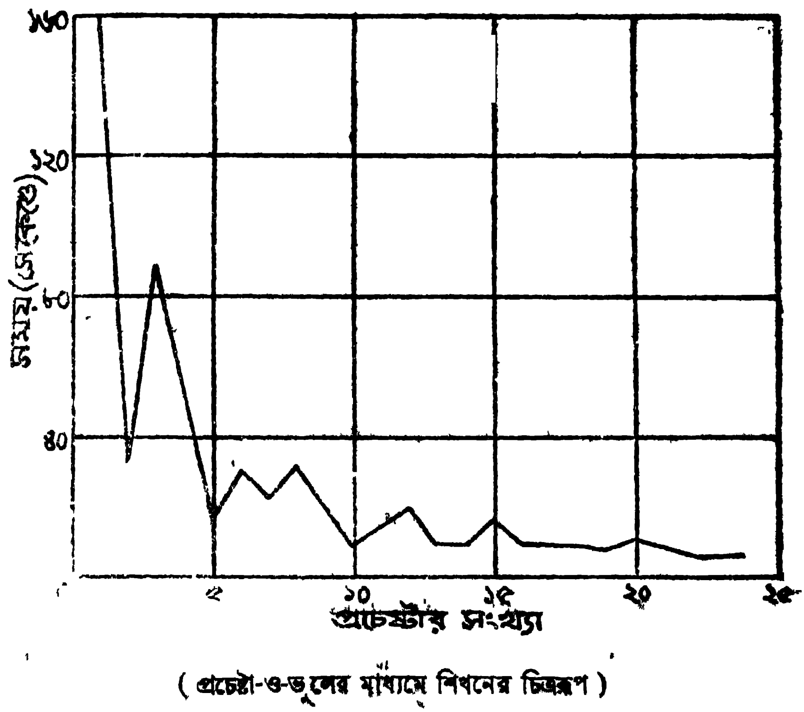
এই উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সংযোগের মাধ্যমে শিখনের যে তত্ত্বটি থর্নডাইক দিলেন সেটি যে অনুষঙ্গবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অনুষঙ্গবাদের মৌলিক নীতি হল যে আমাদের প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়াই প্রত্যক্ষণ, সংবেদন, প্রতিরূপ প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক এককের সংযোগ থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে। থর্নডাইকের সংযোজনবাদ অনুযায়ী শিখনও এই ধরনের মানসিক এককের সংযোগ থেকে সৃষ্টি হয়েছে বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি (Trial-and-error Method)

উপরে বর্ণিত শিখনের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করেই থর্নডাইক তাঁর শিখন পদ্ধতির নাম দিলেন প্রচেষ্টা-ও-ভুলের (Trial-and-error) পদ্ধতি। অর্থাৎ প্রাণী শেখে বার বার চেষ্টা ও ভুল করতে করতে। কোন কিছু শিখতে হলে উদ্দীপকের উপযোগী নির্ভুল প্রতিক্রিয়াটি অনেকগুলি ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে প্রাণীকে খুঁজে বার করতে হয়। যেমন, সুইচটি টিপে আলো জ্বালার বেলায় একটির পর একটি সুইচ টিপে দেখতে হয়েছে কোন্ সুইচটিতে ঠিক আলো জ্বলে বা অঙ্ক কষার ক্ষেত্রে ছেলেটিকে পর পর ফরমুলাগুলি প্রয়োগ করে কোন্ ফরমুলাটির প্রয়োগে অঙ্কটি ঠিক হয় তা খুঁজে বার করতে হয়েছে। যথার্থ নির্ভুল প্রতিক্রিয়া সংখ্যায় একটি, অথচ ভুল প্রতিক্রিয়া সংখ্যায় অগণিত। এই অগণিত ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে যেটি নির্ভুল প্রতিক্রিয়া সেটিকে খুঁজে বার করতে হলে বার বার তাকে চেষ্টা করতে হবে এবং তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই সে বার বার ভুল করবে। এইভাবে চেষ্টা করতে করতে এবং ভুল করতে করতে যখনই সে নির্ভুল প্রতিক্রিয়াটি খুঁজে বার করতে পারবে তখনই তার শিখন সম্ভব হবে। সেইজন্য থর্নডাইকের মতে সব শেখাই হল প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা।

প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের প্রমাণ হিসাবে থর্নডাইকের একটি

প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের উল্লেখ করা যায়। একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে একটি খাঁচার মধ্যে রুদ্ধ করে খাঁচার বাইরে খাবার রাখা হল। খাঁচাটার দরজার এমন একটি ছিটকিনি লাগান ছিল যাতে আস্তে চাপ দিলেই দরজাটা দিয়ে নিজে খুলে যায়। বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে খাবারে পৌছনর জন্য বার বার চেষ্টা করতে লাগল। বেশ কিছুক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ও বিশৃঙ্খলভাবে চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ ছিটকিনিটির উপর তার পা পড়ে যায় এবং তার ফলে দরজাটা খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরিয়ে তার অভীষ্ট খাবারে গিয়ে পৌছয়। দ্বিতীয় দিনেও তাকে ঠিক ঐভাবে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা



(প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের চিত্ররূপ)

হয় এবং বাইরে খাবার রেখে দেওয়া হয়। সেবারও বিড়ালটি ঐভাবে এলো-মেলো চেষ্টা করতে করতে হঠাৎ খাঁচার দরজা খুলে খাবারে গিয়ে পৌছয়। কিন্তু দেখা যায় যে দ্বিতীয় দিনে, প্রথম দিনের তুলনায় মোট ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যা কম হয় এবং খাঁচা থেকে বেরোবার মোট সময়ও কম লাগে। তৃতীয় দিনেও বিড়ালটিকে একইভাবে খাঁচায় বন্ধ করে রাখা হয় এবং ঐভাবে তার সামনে খাবার ঝুলিয়ে রাখা হয়। সেদিনও ঐ একইভাবে কি ...

উদ্দেশ্যহীন চেষ্টা করার পর বিড়ালটি খাঁচা থেকে বেরোতে সমর্থ হয়। তবে তৃতীয় দিনে তার খাঁচা থেকে বেরোতে দ্বিতীয় দিনের চেয়ে আরও কম সময় লাগে এবং ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যাও কম হয়। এইভাবে পরীক্ষাটি চালিয়ে নিয়ে গেলে দেখা যায় যে যতই দিন যাচ্ছে ততই বিড়ালটির ভুল প্রচেষ্টার সংখ্যা কম হয়ে আসছে এবং খাঁচা থেকে বেরোতে আগের দিনের চেয়ে সময়ও কম লাগছে। শেষকালে এমন এক দিন এল যখন দেখা গেল বিড়ালটি আর একটিও ভুল প্রচেষ্টা করল না। খাঁচায় তাকে বন্ধ করা মাত্রই সে দরজা খুলে বেরিয়ে আসতে পারল। অর্থাৎ সেদিনই বিড়ালটির শিখন সম্পূর্ণ হল। বিড়ালটি বার বার প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে উদ্দীপকের সঙ্গে ঠিক প্রতিক্রিয়াটির সংযোজন করতে সমর্থ হল।

বিড়ালটির এই প্রচেষ্টা ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের অগ্রগতির একটা আনুমানিক চিত্ররূপ আগের পৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

থর্নডাইকের শিখনের সূত্র

(Thorndike's Laws of Learning)

থর্নডাইক শিখন-প্রক্রিয়া নিয়ে তাঁর দীর্ঘ গবেষণার উপরে ভিত্তি করে শিখনের কতকগুলি সূত্র উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর দেওয়া সূত্রের সংখ্যা আটটি—তিনটি মুখ্য সূত্র এবং পাঁচটি গৌণ সূত্র।

তিনটি মুখ্য সূত্র (Three Major Laws)

থর্নডাইকের মতে শিখনের তিনটি মুখ্য সূত্র হল—১। প্রস্তুতির সূত্র। ২। অনুশীলনের সূত্র এবং ৩। ফললাভের সূত্র। নীচে এই সূত্রগুলির বর্ণনা দেওয়া হল।

১। প্রস্তুতির সূত্র (Law of Readiness)

শিখনের জন্য প্রয়োজন বিশেষ একটি উদ্দীপকের সঙ্গে তার উপযোগী প্রতিক্রিয়াটিকে সংযুক্ত করার জন্য শিক্ষার্থীর প্রস্তুতি। যখন শিক্ষার্থীর এই প্রস্তুতি থাকে তখন শিখন সন্তোষ আনে, আর যখন শিক্ষার্থীর এই প্রস্তুতি থাকে না তখন শিখন বিরক্তির সৃষ্টি করে। এই জন্যই শিশু যখন কোন কাজ করতে উন্মুখ হয় তখন যদি তাকে বাধা দেওয়া হয় সে তাতে বিরক্ত হয়। শিক্ষার্থীর যে কাজ করতে তার মন চায় না সে কাজ জোর করে করাতে গেলেও তার বিরক্তি আসে। কিন্তু যে কাজ সে করার জন্য তৈরি সে কাজ তাকে করতে দিলে সে তৃপ্তি পায়।

২। অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise)

একটি বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়াকে যদি বার বার সংযুক্ত করা যায় তবে সে দুটির মধ্যে একটা সংযোগ বা বন্ধন সৃষ্ট হবে। আর বিপরীতক্রমে একটি উদ্দীপক ও তার প্রক্রিয়াটির মধ্যে যদি বেশ কিছুদিন সংযোজন না করা হয় তবে এ দুয়ের মধ্যে পূর্বস্থাপিত সংযোগ বা বন্ধন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসবে। এক কথায় অনুশীলন উদ্দীপক-প্রক্রিয়ার বন্ধনীকে দৃঢ় করে, অনুশীলনের অভাব তাকে শিথিল করে তোলে।

৩। ফলভোগের সূত্র (Law of Effect)

উদ্দীপক প্রতিক্রিয়ার সংযোজনের ফল শিক্ষার্থীর কাছে হয় সন্তোষজনক হবে, নয় বিরক্তিকর হবে। যদি সংযোগের ফল সন্তোষজনক হয় তবে সে সংযোগে দৃঢ়বদ্ধ হবে আর সংযোগের ফল যদি বিরক্তিকর হয় তবে সংযোগ [illegible] হয়ে উঠবে। যেমন, বিড়ালটির ভুল প্রচেষ্টাগুলির বেলায় উদ্দীপক ও [illegible]য়ার সংযোজনের ফল তার কাছে বিরক্তিকর হয়েছিল, কেননা সেগুলির [illegible]সে তার অভীষ্ট খাদ্য পায় নি। সেজন্য ভুল প্রচেষ্টার একটিও সে [illegible]য়তে শিখল না কিন্তু দরজা-খোলা-রূপ নির্ভুল প্রচেষ্টাটির ফল তার কাছে সন্তোষজনক হয়েছিল। সেইজন্যই ঐ ক্ষেত্রে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজনটি তার কাছে স্থায়ী হয়ে দাঁড়াল। অর্থাৎ সে দরজা খুলতে পারার কৌশলটি স্থায়ী ভাবে শিখল। থর্নডাইকের মতে এই ফলভোগের সূত্রটি শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঁচটি গৌণ সূত্র (Five Minor Laws)

শিখনের তিনটি মুখ্য সূত্র ছাড়াও থর্নডাইক আরও পাঁচটি সূত্র গঠন করেন। এইগুলি উপরের তিনটি মুখ্য সূত্রের মত অত গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে এগুলি শিখনের গৌণ সূত্র নামে পরিচিত। সেগুলি হল এই—

১। একই উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে বিবিধ প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Multiple Response to the Same Stimulus)

অনেকগুলি ভুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে থেকে বিশেষ একটি নির্ভুল প্রতিক্রিয়াকে বেছে নেওয়াই হল শিখন। অতএব শিখনের জন্য প্রাণীর একটি বিশেষ উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে নানারকম প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করার ক্ষমতা থাকা চাই। এই প্রতিক্রিয়ার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য যত বাড়বে ততই তার শিখন সফল হয়ে উঠবে।

২। মানসিক অবস্থা বা মনোভাবের সূত্র
(Law of Attitude, Set or Disposition)

শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মনোভাব বা মানসিক অবস্থার উপর তার শিখন নির্ভর করে এবং শিখনটি তৃপ্তিকর না বিরক্তিকর, তাও নির্ধারিত হয় তার দেহমনের তৎকালীন অবস্থার দ্বারা।

৩। আংশিক প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Partial Activity)

কখন কখন উদ্দীপক বা শিখন-পরিস্থিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ সমগ্র ও অভীষ্ট প্রতিক্রিয়াটির জন্ম দিতে পারে।

৪। সদৃশীকরণ বা উপমানের সূত্র
(Law of Assimilation or Analogy)

পূর্ব-পরিচিত শিখন-পরিস্থিতির অনুরূপ কোন পরিস্থিতিতে পড়লে, প্রাণী সাধারণত পূর্বে সম্পাদিত প্রতিক্রিয়াই অনুসরণ করে থাকে।

৫। অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (Law of Asssociative Shifting)

সময় সময় যে উদ্দীপকের যে প্রতিক্রিয়া সেই উদ্দীপক থেকে অন্য আর একটি উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়াটি সঞ্চালিত হয়ে যেতে পারে। যেমন, কোন কিছু খাবার সময় জিভে লালাক্ষরণ হওয়াটা স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু খাবার দেখলে বা খাবারের নাম শুনলে জিভে যে জল আসে সেটা হল প্রতিক্রিয়ার অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের ফল। বিখ্যাত রুশ শরীরতত্ত্ববিদ্ প্যাভলভ এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response) এবং তার উপর দীর্ঘ গবেষণার ফলে তিনি এই ধরনের অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করেছেন। 'অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়াকে' আমরা শিখনের স্বতন্ত্র মতবাদরূপে গ্রহণ করেছি এবং পরবর্তী পরিচ্ছেদে আমরা এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করব। "অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়াকে" তত্ত্বটি আবিষ্কারের সম্মান সর্বসম্মতিক্রমে প্যাভলভকে দেওয়া হলেও একথা অনস্বীকার্য যে থর্নডাইক প্যাভলভের আগেই এই তত্ত্বটির শিখনমূলক গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন।

শিক্ষার ক্ষেত্রে থর্নডাইকের মতবাদ

উপরে বর্ণিত শিখনের সূত্রগুলি থেকে আমরা শিক্ষার ক্ষেত্রে

বিশেষভাবে প্রযোজ্য এমন কতকগুলি অতি মূল্যবান সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারি। সেগুলি হল এই—

প্রথমত, শিখন নির্ভর করছে শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতির উপর। প্রস্তুতি বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক প্রক্ষোভঘটিত প্রভৃতি সমস্ত দিকগুলির একটা সামগ্রিক উন্মুখতা। যে শিখনের জন্য শিক্ষার্থী প্রস্তুত নয় সে শিখন ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই প্রস্তুতি আবার দু'শ্রেণীর হতে পারে। প্রথম, জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি অর্থাৎ যে বস্তুটি শিক্ষার্থী শিখতে চলেছে সেটি শেখার উপযোগী পূর্বজ্ঞান তার থাকা প্রয়োজন। উদাহরণ-স্বরূপ, যে ছাত্রকে জ্যামিতির উপপাদ্য শেখান হচ্ছে দেখতে হবে যে সে কোণ, ত্রিভুজ ইত্যাদি কাকে বলে তা আগেই জানে কি না। দ্বিতীয় হল প্রক্ষোভঘটিত প্রস্তুতি। শিখনের পদ্ধতি, বিষয়বস্তু প্রভৃতির দিক দিয়ে শিক্ষার্থীর অনুকূল প্রক্ষোভ থাকাও একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, শিখনের ফল যেন শিক্ষার্থীর নিকট তৃপ্তিকর হয়। বিরক্তিকর শিখন স্থায়ী হয় না। একমাত্র সেই শিখনই স্থায়ী হয় যার ফল শিক্ষার্থীর কাছে তৃপ্তিকর বলে প্রমাণিত হয় এবং একমাত্র সেই শিক্ষার জন্যই শিক্ষার্থী স্বাভাবিক প্রেরণা বোধ করে। এইজন্য এমনভাবে শিখনকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীকে সাফল্যের আনন্দের জন্য দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে থাকতে না হয়। শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি সুদীর্ঘ হয় তবে সেটিকে একসঙ্গে শিখতে দিলে শিক্ষার্থীর পক্ষে সাফল্যের আনন্দ পাওয়াটা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠবে এবং ফলে তার প্রচেষ্টাও বাধাপ্রাপ্ত হবে। সেইজন্য শিক্ষার বিষয়বস্তু দীর্ঘ হলে সেটিকে এমনভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তার প্রচেষ্টার মাঝে মাঝে সাফল্যের আনন্দ পায় এবং তার ফলে তার শিখন সুখকর ও সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

তৃতীয়ত, অনুশীলনের উপর শিখন বিশেষভাবে নির্ভরশীল। অতএব যাতে শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় বিষয়টি বার বার চর্চা বা অভ্যাসের মাধ্যমে শেখে সেদিকে সর্বদা দৃষ্টি রাখতে হবে। সেইজন্য শিখনের বিষয়বস্তুটিকে নিয়ন্ত্রিত এবং সুবিভক্ত করে দিতে হবে যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে পাঠ অনুশীলন করতে অযথা কোন অসুবিধা না হয়। মনে রাখতে হবে যে এই বার বার প্র[illegible] এবং [illegible]অনুশীলনের একটা বড় উপকরণ হল শিক্ষার্থীর শিখন সম্বন্ধে তৃপ্তিবোধ [illegible] খুব সহজেই

[illegible]র্থত, প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য ও বিবিধতা শিখনকে [illegible] না থেকে বলা দু'য়ের মধ্যে [illegible] শিক্ষার্থী গতানুগতিক ও পুরাতন [illegible] সম্পর্ক আছে

করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং যাতে সে নতুন ও বৈচিত্র্যময় প্রতিক্রিয়া আবিষ্কার করতে পারে সেজন্য তাকে উৎসাহ ও নির্দেশ দিতে হবে।

পঞ্চমত, শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক জানাটা শিক্ষার্থীর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে শিক্ষণীয় বস্তুটির এমন কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকতে পারে যেগুলি সমগ্র পরিস্থিতিটিকেই নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে এবং যেগুলি সম্বন্ধে সচেতনতা সমস্যাটিকে সহজে সমাধান করতে সাহায্য করে। এগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর জ্ঞান থাকলে শিখন কার্য অনায়াসে ও দ্রুত সম্পন্ন হয়ে যায়। অতএব যাতে শিক্ষার্থী শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির অন্তর্নিহিত সম্পর্ক অনুধাবন করতে শেখে তার ব্যবস্থা করা দরকার।

থর্নডাইকের সংযোজনবাদের সমালোচনা

(নানা মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইকের সংযোজনবাদ এবং তাঁর শিখনের সূত্রগুলির বিরূপ সমালোচনা করেছেন।) অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই থর্নডাইকের সূত্রগুলিকে শিখনের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে সূত্রগুলি যদিও বাহ্যত প্রযোজ্য বলে মনে হয়, তবুও ভাল করে বিচার করলে সেগুলির মধ্যে প্রচুর অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে। [illegible]দের সমালোচনার প্রধান প্রধান বক্তব্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

প্রথমত, থর্নডাইকের অনুশীলনের সূত্র অনুযায়ী কোন কিছু বার বার অভ্যাস বা চর্চা করলে সে বস্তুটির শিখন স্থায়ী হয়। এ কথাটি আংশিকভাবে সত্য। কেননা কেবলমাত্র অভ্যাস বা চর্চা করলেই স্থায়ী শিখন হতে পারে না। তার সঙ্গে আগ্রহ, মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলিও থাকা দরকার। আর যেখানেই এই অত্যাবশ্যক বস্তুগুলির অভাব সেখানে নিছক অভ্যাস মোটেই কার্যকর হয় না। এক কথায় অনুশীলনের সাফল্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও অসংখ্য বস্তুর প্রভাব এবং তার একটার অভাবেই [illegible] অনুশীলন সত্ত্বেও শিখন সফল না হতেও পারে। আবার অপর দিকে বিন্দুমাত্র অভ্যাস বা চর্চা ছাড়াই বহু অভিজ্ঞতা স্থায়ীভাবে আমাদের মনে ছাপ রেখে যায়। যেমন, আনন্দ-শোক বা উত্তেজনাপূর্ণ কোন ঘটনার অভিজ্ঞতা। বিশেষ করে [illegible]কার্য যে থর্নডাইক কিছু শিখি তখন আমাদের কোনরূপ অনুশীলনের উপলব্ধি করেছিলেন এর দেখা যাচ্ছে অনুশীলন শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ নয়।

[illegible]র ক্ষেত্রে [illegible]নবাদের স্বপক্ষে প্রায়ই শিক্ষনের একই [illegible] হয়ে থাকে। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী শিক্ষার [illegible]

স্নায়ুমণ্ডলীতে বিশেষ বিশেষ স্নায়ুগুলির মধ্যে সংযোগস্থাপনই হচ্ছে শিখন। থর্নডাইক যাকে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোগ বলেন শরীরতত্ত্বের ব্যাখ্যায় সেটি হল দুটি নিউরনের মধ্যে সংযোগ স্থাপন। সাধারণত দুটি নিউরনের সন্নিকর্ষ স্থলে (Synapse) এই সংযোগ প্রক্রিয়াকে বাধা দেবার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। বার বার একই কাজ অনুশীলন করলে এই বাধা দূর হয়ে যায় এবং একটি স্থায়ী স্নায়ুমূলক সংযোজন স্থাপিত হয় এবং তার ফলেই শিখন সংঘটিত হয়।

শিখনের এই শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা আজকাল অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানীই মানতে রাজী নন। ল্যাস্‌লে (Lashley), ফ্রানজ (Franz), ক্যামেরন (Cameron) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গবেষকগণ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে স্নায়ুমূলক সংযোজনের মাধ্যমে শিখন প্রক্রিয়ার সঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

থর্নডাইকের ফললাভের সূত্রটিরও নানারূপ সমালোচনা হয়েছে। এই সূত্র অনুযায়ী আচরণের ফল তৃপ্তিকর হলে সে আচরণটি দৃঢ়বদ্ধ হয়, আচরণের ফল বিরক্তিকর হলে সে আচরণ বিলুপ্ত হয়ে যায়। ওয়াটসন প্রমুখ আচরণবাদীরা (Behaviourist) এই সূত্রটির তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তার কারণ হল যে এই সূত্রটি ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত আর আচরণবাদীরা মানসিক অনুভূতির সাহায্যে কোন কিছুরই ব্যাখ্যা মেনে নিতে রাজী নন। তাঁরা প্রধানত অনুশীলন (Exercise) এবং আচরণের সাম্প্রতিকতার (Recency) সাহায্যেই শিখনের ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন।

অন্যান্য মনোবিজ্ঞানীরা ফললাভের সূত্রটির বিরোধিতা করেন আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে। তাঁদের মতে সুখ বা দুঃখের অনুভূতি যদি কোন আচরণের শিখন বা বিলুপ্তির কারণ হয়ে থাকে, তবে সে অনুভূতিটি নিশ্চয়ই ঐ আচরণটির সম্পাদনের পূর্বে ঘটবে। কেননা, কারণ সর্বদাই কার্যের আগে ঘটে থাকে। অথচ এই ক্ষেত্রে শিখন রূপ আচরণটি ঘটছে আগে, তার পরে ঘটেছে দুঃখ বা সুখের অনুভূতি। অতএব এখানে সুখ বা দুঃখের অনুভূতিকে শিখন হওয়া বা না হওয়ার কারণ বলা চলে না।

তাছাড়া দুঃখের অনুভূতি যে সব সময়ই আচরণের বিলোপ ঘটায় একথাও ঠিক নয়। বহু গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে কষ্টদায়ক অভিজ্ঞতা খুব সহজেই এবং দীর্ঘদিন মনের মধ্যে সন্নিবদ্ধ থাকে। এই সকল আলোচনা থেকে বলা যেতে পারে যে শিখন এবং সুখ-দুঃখের অনুভূতির মধ্যে যদিও সম্পর্ক আছে এই দু'য়ের মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ স্থাপন করা যায় না।

অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে থর্নডাইকের সূত্রগুলি কেবল ত্রুটিপূর্ণই নয়, সেগুলিতে শিখন-প্রক্রিয়ার বহু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যও অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। যেমন, শিখনের একটা বড় অঙ্গ হল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর সচেতনতা। কিন্তু থর্নডাইকের সূত্রগুলিতে তার কোন স্থান নেই। তাছাড়া শিখন প্রক্রিয়ায় প্রক্ষোভের ভূমিকাও একটা বড় স্থান অধিকার করে থাকে, কিন্তু তারও কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা থর্নডাইকের সূত্রগুলিতে পাওয়া যায় না।

থর্নডাইক নিজেও তাঁর সূত্রগুলির অসম্পূর্ণতা উপলব্ধি করেছিলেন এবং পরে তাঁর প্রদত্ত তিনটি সূত্রের সঙ্গে আর একটি সূত্র যোগ করে দিয়েছিলেন। এই সূত্রটির নাম হল অন্তর্ভুক্তির সূত্র (Law of Belongingness)। এই সূত্রের অর্থ হল যে শিখন তখনই সম্ভব হবে যখন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পারস্পরিক অন্তর্ভুক্তির একটা সম্বন্ধ থাকবে অর্থাৎ যখন দুটি ঘটনাই একটি বিশেষ সম্বন্ধের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। থর্নডাইকের এই সূত্রটি কিন্তু নানা দিক দিয়ে বেশ অনির্দিষ্ট প্রকৃতির ও অস্পষ্ট।

গেষ্টাল্টবাদী (Gestaltist) মনোবিজ্ঞানীরা থর্নডাইকের সংযোজনবাদ এবং তাঁর প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের তত্ত্বটির তীব্র সমালোচনা করেছেন। থর্নডাইকের মতে শিখন হল একটি বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে একটি বিশেষ প্রতিক্রিয়ার মিলন ঘটানো। প্রাণী যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হয় তখন সে সেই পরিস্থিতি থেকে একটির পর একটি উদ্দীপক বেছে নেয় এবং একটির পর একটি প্রতিক্রিয়া দিয়ে তার সাড়া দেয়। এইভাবে সাড়া দিতে দিতে হঠাৎ ঠিক উদ্দীপকটির সঙ্গে ঠিক প্রতিক্রিয়াটির সংযোজন ঘটে যায় এবং তখনই শিখন সংঘটিত হয়। একেই বলা হয়েছে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোজন (S—R Bond)।[১]

গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা শিখনের এই ব্যাখ্যাটিকে মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতা (Psychological atomism) বলে সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে সমস্যামূলক পরিস্থিতির অন্তর্গত উদ্দীপকগুলিকে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে সাড়া দিই না। আমরা শিখনের সমগ্র পরিস্থিতিটিকে আমাদের সমগ্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিয়ে থাকি। এই সাড়া দেবার সময় আমরা ঐ পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ হৃদয়ঙ্গম করি এবং তাদের অন্তর্নিহিত প্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলিকে

১। পৃঃ ১০৬

পুনরায় সংগঠিত করে নিই। গেষ্টাল্টবাদীদের মতে সমস্যাটির এই অভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ নিরূপণ এবং উদ্দীপকগুলির সংগঠন সাধনের মাধ্যমেই যথার্থ শিখন ঘটে থাকে।

২। শিখনের গেষ্টাল্ট মতবাদ
(Gestalt Theory of Learning)

গেষ্টাল্ট কথাটি একটি জার্মান শব্দ। এর অর্থ হল গঠন বা কাঠামো বা সম্পূর্ণ আকার (Form or Structure or Configuration)। মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে এই মতবাদটি মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতার প্রতিক্রিয়ারূপে দেখা দিয়েছে। যে সব মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া বা সত্তাগুলিকে বিশ্লেষণ করে ঐ প্রক্রিয়া বা সত্তাগুলির প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় বলে বিশ্বাস করেন তাঁদেরই গেষ্টাল্টবাদীরা মনোবৈজ্ঞানিক আণবিকতাবাদী বলে সমালোচনা করে থাকেন। বলা বাহুল্য অনুষঙ্গবাদী মনোবিজ্ঞানীরাই তাঁদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। অনুষঙ্গবাদীরা মানব মনের প্রক্রিয়াগুলিকে বিশ্লেষণ করে সংবেদন, প্রত্যক্ষণ, প্রতিরূপ প্রভৃতি মানসিক এককগুলির পরিকল্পনা করেছেন এবং এই মানসিক এককগুলিকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করলে পূর্ণ মানসিক প্রক্রিয়াগুলির যথার্থ স্বরূপ জানা যায় বলে তাঁরা দাবী করেন।

কিন্তু গেষ্টাল্টবাদীদের মত অনুযায়ী আমাদের প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু সর্বদাই এমন একটা অবিচ্ছিন্ন সমগ্র সত্তা, যাকে বিশ্লেষণ করলে বা যার অংশগুলিকে পৃথকভাবে বিচার করলে আমরা সেই সমগ্র সত্তাটিকে কখনই জানতে পারি না। সমগ্র সত্তাটি কেবলমাত্র অংশগুলির যোগফল নয়, যোগফলের উপরেও অতিরিক্ত আরও কিছু। যেমন, মনে করুন, আপনি একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছেন। এই দৃশ্যটির অন্তর্গত গাছপালা, ফুল, পাখী, পশুগুলিকে পর পর যোগ করে দিলেই আপনার অভিজ্ঞতার সেই সমগ্র সত্তাটিকে পাওয়া যাবে না। ঐ অংশগুলি ত আপনার অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকবেই তার উপরেও থাকবে অতিরিক্ত আরও কিছু। সমগ্র সত্তার এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁরা মনে করেন যে বিভিন্ন অংশগুলির সংগঠন (Organisation) থেকে এই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি দেখা দেয়। এক কথায় বিশেষ কোন শিখন পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলি যে নিজেদের মধ্যে একটা সংগঠনের সৃষ্টি করে সেইটিকেই গেষ্টাল্টবাদীরা গঠন বা কাঠামো বা পূর্ণ আকার নাম দিয়ে থাকেন।

অতএব কোন সমস্যার সমাধান করতে হলে ঐ সমস্যামূলক পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলিকে জানলেই চলবে না, ঐ অংশগুলির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সংগঠনটি আছে তার যথার্থ স্বরূপটি উপলব্ধি করতে হবে। থর্নডাইক যে বলেছেন উদ্দীপকগুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে পৃথক পৃথক প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিয়ে আমরা সমস্যার সমাধানে পৌঁছই এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। আসলে যা ঘটে তা ঠিক বিপরীত। যখন আমরা কোনও শিখন পরিস্থিতির সম্মুখীন হই তখন আমরা সমগ্র সমস্যাটিকে আমাদের সমগ্র প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দিই এবং এই সাড়া দেবার সময় পরিস্থিতির অন্তর্গত বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে যে সংগঠন সাধন করি তারই ফলে সমাধান দেখা দেয় এবং আমাদের শিখন সম্পন্ন হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে গেষ্টাল্টবাদীদের মতে থর্নডাইক বর্ণিত প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখার প্রক্রিয়াটি আসলে অবাস্তব। প্রাণী যে শিখনের সময় অন্ধ অর্থহীন প্রচেষ্টা করে না, তা নয়। কিন্তু সে সব বিভিন্ন ও অন্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রকৃত শিখন ঘটে না। প্রকৃত শিখন দেখা দেয় একমাত্র সামগ্রিক ও লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট প্রচেষ্টার মাধ্যমে। বস্তুত প্রাণীর প্রচেষ্টা সব সময়ই সমগ্র পরিস্থিতির উদ্দেশ্যে প্রসৃত এবং সেগুলিকে এক একটি বিচ্ছিন্ন প্রতিক্রিয়া বলে মনে করলে ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে শিখনের সময় প্রাণী তার সমগ্র সত্তা দিয়ে সমগ্র সমস্যাটির উদ্দেশ্যে সমগ্র প্রতিক্রিয়া করে থাকে।

থর্নডাইক খাঁচায় বন্ধ বিড়ালের শিখন নিয়ে যে পরীক্ষা করেছিলেন তাতে পরিস্থিতিটি এমন ছিল যে বিড়ালের পক্ষে সমস্যার সমগ্র রূপটি উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না। ফলে অন্ধ উদ্দেশ্যহীন প্রচেষ্টা করা ছাড়া তার আর অন্য কোন উপায় ছিল না। কিন্তু যদি পরিস্থিতিটি প্রাণীর কাছে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত থাকে তবে সে কখনই অন্ধ, যান্ত্রিক বা উদ্দেশ্যহীন চেষ্টা করবে না। তখন তার প্রচেষ্টা স্বভাবতই সামগ্রিক, লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠবে।

প্রসিদ্ধ গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানী কোহ্‌লার (Kohler) শিম্পাঞ্জীর শিখন নিয়ে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষণ করেন এবং তিনি সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছেন যে যান্ত্রিক বা অন্ধ পদ্ধতিতে প্রাণী কখনই কিছু শেখে না। তাঁর বহু প্রখ্যাত পরীক্ষণের মধ্যে একটির বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

একটা শিম্পাঞ্জীকে বড় একটা খাঁচায় বন্ধ করে খাঁচার বাইরে কিছু কলা রাখা হল। খাঁচার মধ্যে রাখা হল দুটো লম্বা বাঁশের টুকরো। কলাগুলি খাঁচা থেকে এতটা দূরে ছিল যে কেবলমাত্র হাত বাড়িয়ে বা যে কোন একটি মাত্র

বাঁশের টুকরো দিয়ে সেগুলির নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু বাঁশের একটি টুকরোর মধ্যে যদি আর একটি টুকরো ঢুকিয়ে দেওয়া যায় তবে তা থেকে যে লম্বা বাঁশটি পাওয়া যাবে তা দিয়ে কলাগুলির নাগাল সহজেই পাওয়া যায়। বাঁশের টুকরো দুটিও এমনভাবে বেছে নেওয়া হয়েছিল যে একটি আর একটির মধ্যে সহজেই ঢুকে যায়। প্রথমে শিম্পাঞ্জীটি হাত বাড়িয়ে এবং পরে বাঁশের টুকরো দুটি পৃথকভাবে ব্যবহার করে নানা পন্থায় কলাগুলির নাগাল পাবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু সেভাবে কিছুতেই সে কলাগুলির নাগাল পেল না। তখন সে বাঁশের টুকরো দুটো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে সুরু করলো এবং এইভাবে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ একটি টুকরোর মধ্যে আর একটি টুকরো ঢুকে গিয়ে টুকরো দুটি মিলে একটি লম্বা বাঁশে পরিণত হল। মুহূর্তের মধ্যে শিম্পাঞ্জীটির মধ্যে এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। সে আর তখন বিন্দুমাত্র ইতস্তত বা উদ্দেশ্যহীন চেষ্টা না করে সেই লম্বা বাঁশটির সাহায্যে কলাগুলি হস্তগত করল।

অন্তর্দৃষ্টি (Insight)

সমস্যাটির সমাধানের এই যে হঠাৎ উপলব্ধি, কোহলার এর নাম দিয়েছেন অন্তর্দৃষ্টি (Insight)। তাঁর মতে সমস্যার সমাধান বা শিখন অনেকটা বিদ্যুৎ-চমকানোর মত প্রাণীর মনকে হঠাৎ আলোকিত করে তোলে এবং তখন প্রাণীর সেই সমাধানটি আয়ত্ত করতে আর বিন্দুমাত্র সময় লাগে না, এবং এইভাবে তার যে শিখন হয় তা সে পরে সহজে ভোলেও না। শিখনের সময় ভুল প্রচেষ্টা বা অন্ধ প্রতিক্রিয়া যে একেবারে ঘটে না তা নয়। কিন্তু কোহ্লারের মতে তা থেকে সত্যকারের শিখন ঘটে না। শিখন ঘটে একমাত্র অন্তর্দৃষ্টির আবির্ভাবে এবং তাতে ভুল প্রচেষ্টাগুলির কোনও অবদান বা ভূমিকা থাকে না। অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ সম্বন্ধে গেষ্টাল্টবাদীরা শিখন পরিস্থিতিটির সংগঠন ও তার বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্কের উপলব্ধির উপর বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে যখনই প্রাণী শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারে এবং তাদের সামগ্রিক প্রকৃতি অনুযায়ী সংগঠন করে উঠতে পারে তখনই দেখা দেয় অন্তর্দৃষ্টি।

সাধারণত শিখন পরিস্থিতিটি নানা প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বস্তু দিয়ে সমাবৃত থাকে। যখনই শিক্ষার্থী শিখন পরিস্থিতিটির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারে এবং সেগুলিকে একটি অর্থপূর্ণ সংগঠনে রূপান্তরিত

করতে পারে তখনই অপ্রাসঙ্গিক বস্তুগুলি নিজে নিজেই দূরে সরে যায়,এবং সমস্যার সমাধানটিও শিক্ষার্থীর কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে।

গেষ্টাল্টবাদীদের মতে অন্তর্দৃষ্টির জাগরণের জন্য দুটি মানসিক প্রক্রিয়ার বিশেষভাবে প্রয়োজন হয়। সে দুটি হল পৃথকীকরণ (Abstraction) ও সামান্যীকরণ (Generalisation)। শিখন পরিস্থিতির মধ্যে যেগুলি অপ্রাসঙ্গিক ও অবাস্তব সেগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে কেবলমাত্র প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে বেছে নেওয়ার নাম পৃথকীকরণ এবং পরে সেই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে কোন সামান্যধর্মী সূত্র তৈরী করার নাম সামান্যীকরণ। শিখন পরিস্থিতি থেকে যখন শিক্ষার্থী পৃথকীকরণের ও সামান্যীকরণের সাহায্যে অন্তর্নিহিত সাধারণ সূত্রগুলি উপলব্ধি করতে পারে তখনই অন্তর্দৃষ্টি জাগে এবং শিখন সংঘটিত হয়।

গেষ্টাল্টবাদীদের মতে শিখন প্রক্রিয়া কতকগুলি সোপানের মধ্যে দিয়ে সংঘটিত হয়। সেগুলি হল এই—

প্রথম, শিক্ষার্থী সমস্যাটির সম্পূর্ণ পরিস্থিতিটি সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষণ করে।

দ্বিতীয়, সমগ্র সমস্যাটির উদ্দেশ্যে সে সমগ্রভাবে প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করে।

তৃতীয়, সমস্যাটির অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সে সংগঠন সাধন করে এবং তার জন্য তাকে পরিস্থিতিটির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করতে হয়। এই পর্যায়ে শিক্ষার্থী নিজে, তার লক্ষ্য এবং এ দুয়ের অন্তর্বর্তী বাধা—এ তিনটি বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে।

চতুর্থ, সমস্যা বা বিষয়টির অন্তর্নিহিত মৌলিক তত্ত্ব বা সূত্রগুলি শিক্ষার্থী পৃথকীকরণ এবং সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে উপলব্ধি করে। এই ধাপেই সমস্যার সমাধানটি শিক্ষার্থীর মধ্যে বিদ্যুৎচমকের মত দেখা দেয় এবং একেই গেষ্টাল্টবাদীরা অন্তর্দৃষ্টি বলে বর্ণনা করেছেন। অতএব দেখা যাচ্ছে গেষ্টাল্ট-বাদীরা সার্থক শিখনের জন্য প্রত্যক্ষণ, সম্বন্ধনির্ণয়ন, সংগঠন, পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ এ ক'য়টি প্রক্রিয়ার উপরই জোর দিয়ে থাকেন।

শিক্ষায় গেষ্টাল্ট তত্ত্বের প্রয়োগ

গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া শিখনের এই নতুন ব্যাখ্যা আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচুর প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে বিদ্যালয়ে প্রচলিত শিক্ষণ পদ্ধতির সংস্কারসাধন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজকাল গেষ্টাল্ট মতবাদের মৌলিকতত্ত্বটি ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। শিক্ষায় গেষ্টাল্ট মতবাদের প্রয়োগের কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল।

প্রথমত, স্কুল কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থায় এতদিন অনুসৃত বিশ্লেষক বা অংশ-মূলক পদ্ধতির স্থানে সংশ্লেষক বা সমগ্র পদ্ধতির ব্যাপক প্রচলন সুরু হয়েছে। আগে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীকে ঐ অংশগুলি পৃথকভাবে শেখানোর প্রথা প্রচলিত ছিল। এরই নাম ছিল বিশ্লেষক পদ্ধতি। এতে শিক্ষার্থী বিষয়বস্তুটির সমগ্র রূপটি দেখতে পেত না এবং তার ফলে তার প্রচেষ্টা হত সম্পূর্ণ শিক্ষক পরিচালিত, অন্ধ এবং যান্ত্রিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে শিক্ষার্থীকে বীজগণিতের সম্পূর্ণ একটা সমস্যার সমাধান করতে না দিয়ে প্রথমেই বিচ্ছিন্ন ফরমুলাগুলি তাকে শেখান হত। ফরমুলাগুলি যেহেতু সমগ্র সমস্যাটির কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ ছাড়া কিছুই নয়, সেহেতু সেগুলি শিক্ষার্থীর কাছে অর্থহীন এবং অবাস্তব মনে হত। আধুনিক সংশ্লেষক বা সমগ্র পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সামনে আগে সমগ্র সমস্যাটি তুলে ধরা হয় এবং তার পর সেই সমস্যাটি বিশ্লেষণ করার সময় প্রয়োজনীয় ফরমুলাগুলি শেখান হয়ে থাকে। অর্থাৎ আগে বিশ্লেষণ থেকে যাওয়া হত সংশ্লেষণে। আজকাল সংশ্লেষণ থেকে যাওয়া হয় বিশ্লেষণে, তারপর আবার সংশ্লেষণে। অর্থাৎ সংশ্লেষণ—বিশ্লেষণ—পুনঃ-সংশ্লেষণ—এই হল আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির অনুক্রম। আধুনিক শিক্ষণপদ্ধতিতে ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, সমাজবিজ্ঞান, গণিত—এ সবই শেখানোর সময় প্রথমে পাঠ্যবস্তুটির একটা সমগ্র রূপ শিক্ষার্থীর সামনে ধরা হয় এবং পরে সেটিকে ছোট ছোট অংশে বিশ্লেষণ করে সেই অংশগুলির ব্যাখ্যা করা হয়। আধুনিক যুগের শিক্ষণ পদ্ধতির আমূল পরিবর্তনের মূলে আছে গেষ্টাল্টবাদীদের এই নতুন সংব্যাখ্যান।

দ্বিতীয়ত, গেষ্টাল্ট মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা আসে অন্তর্দৃষ্টি থেকে। অন্তর্দৃষ্টি দেখা দেয় সমস্যার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্বন্ধের উপলব্ধি থেকে। অতএব শিক্ষার্থীর মধ্যে এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের ক্ষমতা যাতে ভাল ভাবে বিকশিত হয় সেটি সর্বাগ্রে দেখতে হবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রদত্ত সমস্যাটির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ অনুসন্ধানের অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে এবং তাকে এই সম্বন্ধ নির্ণয়ের কৌশল আয়ত্ত করতে সাহায্য করে শিক্ষক তার শিখনকে সহজ ও দ্রুত করে তুলবেন।

তৃতীয়ত, গেষ্টাল্টবাদীদের মতে সম্বন্ধ নির্ণয় ছাড়াও পৃথকীকরণ ও সামান্যীকরণ প্রক্রিয়া দুটি অন্তর্দৃষ্টি জাগরণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। 'পৃথকীকরণের অর্থ হল অপ্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে প্রাসঙ্গিক এবং সাধারণ

বৈশিষ্ট্যগুলিকে পৃথক করে নেওয়া এবং সামান্যীকরণের অর্থ হল সেই বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে সামান্য বা সর্বজনীন তত্ত্ব গঠন করা। অতএব শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে কার্যকর করে তুলতে হলে শিক্ষার্থীকে এই অত্যাবশ্যক মানসিক প্রক্রিয়া দু'টি সম্পন্ন করতে শেখাতে হবে।

চতুর্থত, শিক্ষাদানের সময় মনে রাখতে হবে যে অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা থেকে শিখন হয় না। শিখন হল অন্তর্দৃষ্টি থেকে সঞ্জাত এক ধরনের মানসিক উপলব্ধি বিশেষ। অতএব শিক্ষার্থী যাতে অনর্থক অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা করে তার উদ্যম ও সময় নষ্ট না করে সেদিকে শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

পঞ্চমত, শিখনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অতএব শিখনের পরিস্থিতি যেন শিক্ষার্থীর কাছে পূর্ণভাবে উন্মুক্ত থাকে আর তার লক্ষ্য সম্বন্ধেও ধারণা যেন তার কাছে পরিষ্কার থাকে।

ষষ্ঠত, শিখন প্রক্রিয়ার অগ্রগতি যেন শিক্ষার্থীর বোধশক্তি ও গ্রহণ ক্ষমতার সঙ্গে সুষমভাবে সংহতিবদ্ধ থাকে। শিখনের সাফল্য নির্ভর করে সমস্যার বিভিন্ন অংশগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ উপলব্ধির উপর। অতএব শিখনের প্রক্রিয়াটি এমন গতিতে এগোবে যাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে এই সম্বন্ধগুলি উপলব্ধি করা সম্ভব হয় এবং তার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ সহজ হয়ে ওঠে।

সবশেষে আসে শিক্ষার্থীর অনুভূতিমূলক ও জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি। প্রথম, শিক্ষার্থী যেন শিক্ষণীয় বস্তুটি গ্রহণের জন্য তার নিজের জ্ঞানের দিক দিয়ে প্রস্তুত থাকে অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুটি শেখার মত যথেষ্ট পূর্বজ্ঞান যেন তার মধ্যে থাকে। দ্বিতীয়ত, অনুভূতি বা প্রক্ষোভের দিক দিয়েও সে যেন শিক্ষাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকে। শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভ যদি প্রতিকূল হয় তবে তার শিখন বিলম্বিত বা অবরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে। গেস্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে সকল পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া সব সময় সামগ্রিক ধরনের। সে যে প্রতিক্রিয়া করে তা সে করে তার সম্পূর্ণ সত্তা দিয়ে। অতএব সুষ্ঠু শিখনের জন্য তার দেহমনের সর্বাঙ্গীণ প্রস্তুতি অবশ্য প্রয়োজনীয়।

প্রচেষ্টা-ও-ভুল পদ্ধতি এবং অন্তর্দৃষ্টিমূলক-শিখনের তুলনা

(Trial-and-Error and Insightful Learning Compared)

থর্নডাইকের প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং গেস্টাল্টবাদীদের অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন পদ্ধতির মধ্যে কতকগুলি মৌলিক প্রকৃতির পার্থক্য আছে। দুটিই

শিখনের পদ্ধতি হলেও মৌলিক নীতি, অন্তর্নিহিত সংগঠন এবং গতিধারার দিক দিয়ে দু'য়ের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। যেমন—

প্রথমত, অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী শিখনের পরিস্থিতি বা সমস্যাটিকে সমগ্রভাবে সাড়া দেয়। কিন্তু প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে শিখন পরিস্থিতি বা শিখন সমস্যাটির অন্তর্গত উদ্দীপকগুলিকে বিচ্ছিন্ন ও পৃথকভাবে সাড়া দেওয়া হয়। গেষ্টাল্টবাদীদের মতে সমগ্র শিখন পরিস্থিতিটির যথাযথ সংগঠন থেকেই সার্থক শিখন দেখা দেয়। প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে উদ্দীপকের সঙ্গে নির্ভুল প্রতিক্রিয়ার সংযোগ ঘটলেই শিখন হয়। একেই উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া সংযোজন (S—R Bond) বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে প্রাণীর প্রচেষ্টাগুলি হয় অন্ধ, যান্ত্রিক ও উদ্দেশ্যহীন। বিশৃঙ্খলভাবে চেষ্টা করতে করতে প্রাণী আকস্মিকভাবে নির্ভুল আচরণটি সম্পন্ন করে ফেলে এবং তার ফলেই সমস্যাটির সমাধান দেখা দেয়। ঐ বিশেষ একটি আচরণ ছাড়া প্রাণীর আর সব আচরণই অর্থহীন। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন পরিস্থিতিতে প্রাণীর প্রত্যেকটি আচরণই সুপরিকল্পিত, লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ও অর্থপূর্ণ।

তৃতীয়, প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে প্রাণীকে শিখতে হয় একটি বদ্ধ পরিস্থিতিতে (Closed situation)। বদ্ধ পরিস্থিতির অর্থ হল যেখানে প্রাণী সমগ্র শিখন পরিস্থিতিটি দেখতে পায় না। তার কাছে শিখন পরিস্থিতিটির মাত্র একটি অংশ উদ্ঘাটিত থাকে। যেমন খাঁচায় বদ্ধ বিড়ালের ক্ষেত্রে হয়েছিল। এক কথায় তার শিখন প্রক্রিয়ার লক্ষ্যটিই তার কাছে অজ্ঞাত বা অনুদ্ঘাটিত থাকে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন প্রক্রিয়ার শিক্ষার্থীকে শিখতে হয় উন্মুক্ত পরিস্থিতিতে (Open situation)। এখানে শিক্ষার লক্ষ্যটি শিক্ষার্থীর কাছে পুরোপুরি ব্যক্ত থাকায় তার পক্ষে যান্ত্রিক বা উদ্দেশ্যহীন আচরণ করার কোন সম্ভাবনা থাকে না, তার প্রচেষ্টা মাত্রেই লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ও উদ্দেশ্যপূর্ণ হয়।

চতুর্থত, প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে কোনরূপ উন্নত মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয় না। নিছক বার বার প্রচেষ্টা ও অনুশীলনের মাধ্যমেই শিখন লাভ করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখনের ক্ষেত্রে কতকগুলি উন্নত মানসিক প্রক্রিয়ার সাহায্য অপরিহার্য। যেমন, সমস্যাটির বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করণ, পৃথকীকরণ, সামান্যীকরণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলির সাহায্যেই সেখানে সমস্যার সমাধান করা হয়। এই

উন্নত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির জন্য অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন অনেক দ্রুত এবং অল্প আয়াসে সম্পন্ন হয়। অপরপক্ষে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখনের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টাগুলি নিছক শারীরিক স্তরে সংঘটিত হয় বলে সময় এবং পরিশ্রম দুইই প্রচুর পরিমাণে লাগে।

পঞ্চম, অন্তর্দৃষ্টিমূলক শিখন উন্নত মানসিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল বলে উচ্চবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই এটি বিশেষ কার্যকর। নিম্নশ্রেণীর প্রাণী বা স্বল্প-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতির ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য। সেইজন্য তাদের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির ব্যবহার অধিক দেখা যায়।

৩ : অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া মতবাদ

(Theory of Conditioned Response)

অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া মতবাদটি সম্পূর্ণ শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাপারের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিখ্যাত রুশ শরীরতত্ত্ববিদ্ প্যাভলভকে এই মতবাদের স্রষ্টা বলা চলে, যদিও এ তত্ত্বটির সঙ্গে প্রাচীন অনুষঙ্গবাদী মনোবিজ্ঞানীরা বহু আগে থেকেই পরিচিত এবং বহু বিভিন্ন রূপ ও সংগঠনে মনোবিজ্ঞানীদের আলোচনায় এই তত্ত্বটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। থর্নডাইকের 'অনুষঙ্গমূলক সঞ্চালনের' সূত্রটি মূলত এই তত্ত্বটির সঙ্গে অভিন্ন।[১] প্যাভলভের পূর্বে বেকটেরেভ (Bechterev) নামে একজন রাশিয়ান মনোবিজ্ঞানী অনুবর্তন প্রক্রিয়া নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করেন। কিন্তু প্যাভলভই অনুবর্তনের সূত্র ও তত্ত্বগুলির যথার্থ গ্রন্থনা ও সংব্যাখ্যান করেন বলে তাঁর নামের সঙ্গেই অনুবর্তন তত্ত্বটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যেই কতকগুলি বিশেষ উদ্দীপককে কতকগুলি বিশেষ প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দেবার ক্ষমতা জন্ম থেকেই থাকে।

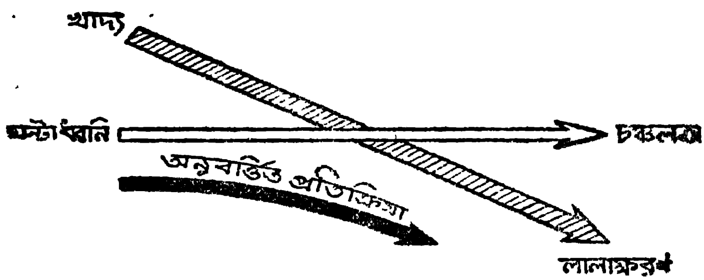


[স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১'র স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্র-১ কৃত্রিম উদ্দীপক উ-২'তে অনুবর্তিত হয়েছে]

এই উদ্দীপকগুলিকে আমরা স্বাভাবিক উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়াগুলিকে

১। পৃঃ ১১০

স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া বলে বর্ণনা করতে পারি। যেমন ক্ষুধার্ত কুকুরের ক্ষেত্রে খাবার দেখলে লালাক্ষরণ হওয়াটা হল একটি স্বাভাবিক উদ্দীপক ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। তেমনই ছোট শিশুর ক্ষেত্রে উচ্চশব্দ শুনলে ভয় পাওয়া বা যে কোন মানুষের ক্ষেত্রেই আচরণগত বাধা পেলে রেগে যাওয়া ইত্যাদিও হল এই রকম স্বাভাবিক উদ্দীপক ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ। এই প্রতিক্রিয়াগুলি সহজাত ও পূর্বনির্দিষ্ট এবং এগুলি অর্জিত বা শিক্ষাপ্রসূত নয়। এখন যদি ঐ ধরনের একটা স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গে বা ঠিক আগে বা ঠিক পরে একটি কৃত্রিম উদ্দীপককে বার বার উপস্থাপিত করা হয় তবে ঐ স্বাভাবিক উদ্দীপকের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি দ্বিতীয় বা কৃত্রিম উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ তখন স্বাভাবিক উদ্দীপকটি ছাড়াই ঐ কৃত্রিম উদ্দীপকটি ঐ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘটাতে সমর্থ হবে। মনে করা যাক স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১'র উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্র-১ পাওয়া যায়। এখন যদি একটি কৃত্রিম উদ্দীপক উ-২, (যার প্রতিক্রিয়া হল কৃত্রিম প্রতিক্রিয়া প্র-২) বার বার ঐ স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১'র সঙ্গে উপস্থাপিত করা যায়,

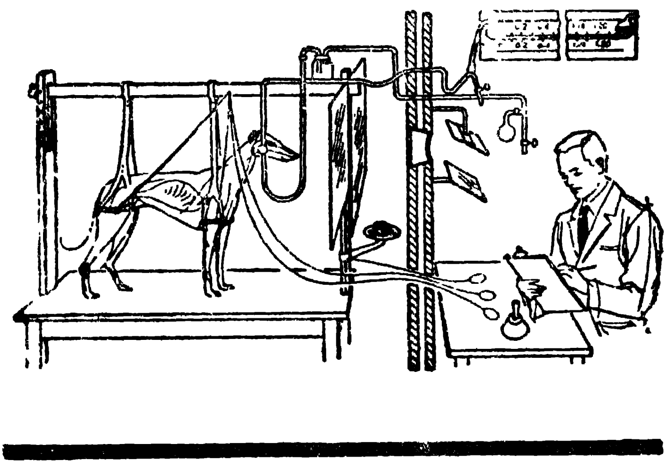


[খাদ্যরূপ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া লালাক্ষরণ ঘন্টাধ্বনি-রূপ উদ্দীপকে অনুবর্তিত হয়ে যাচ্ছে]

তবে দেখা যাবে যে স্বাভাবিক উদ্দীপক উ-১ ছাড়াই কৃত্রিম উদ্দীপক উ-২'র উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া প্র-১ সম্পাদিত হচ্ছে। অর্থাৎ এখানে স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে কৃত্রিম উদ্দীপকে প্রতিক্রিয়াটি সঞ্চালিত বা অনুবর্তিত হল। এইভাবে কৃত্রিম উদ্দীপকের উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দিয়ে সাড়া দেওয়াই হল এক প্রকারের শিখন প্রক্রিয়া। প্যাভলভ এই ধরনের শিখনের নাম দিয়েছেন অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response)।

কুকুরের লালাক্ষরণ নিয়ে প্যাভলভ প্রতিক্রিয়া-সঞ্চালনের উপর যে গবেষণা সম্পন্ন করেন, তা তাঁকে মনোবিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ করে রেখেছে।

খাদ্য দেখলে কুকুরের স্বাভাবিকভাবেই লালাক্ষরণ হয় এবং ঘন্টার শব্দ শুনলে চঞ্চলতা বা অস্থিরতা রূপ প্রতিক্রিয়াটি তার মধ্যে দেখা দেয়। এখন যদি কুকুরটিকে খাদ্য দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঘণ্টা বাজান হয় তাহলে দেখা যাবে যে কিছুকাল পরে খাদ্য না দিয়ে কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজালেই লালাক্ষরণ হতে সুরু করেছে। এখানে লালাক্ষরণরূপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘণ্টাবাজান রূপ কৃত্রিম উদ্দীপকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেল। প্রতিক্রিয়াটির এই স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে কৃত্রিম উদ্দীপকে সঞ্চালিত হওয়াকে 'অনুবর্তন' (Conditioning) বলা হয় এবং যে প্রাণীর ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তন ঘটল তাকে অনুবর্তিত (Conditioned) প্রাণী বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীরা এই অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া তত্ত্বের দ্বারাই সকল প্রকার শিখন-



[প্যাভলভের কুকুরের উপর অনুবর্তন প্রক্রিয়ার পরীক্ষণ]

প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তাঁদের মতে ব্যক্তির অভ্যাস, পছন্দ, অপছন্দ মনোভাব, ভয় ঘৃণা প্রভৃতি সবই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জন্মলাভ করে থাকে। শিশুর অতি সরল প্রক্ষোভের কাঠামোটি পরিণত অবস্থায় যে অতি-জটিল প্রক্ষোভের সংগঠনে পরিণত হয় তার মূলেও আছে এই অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি।

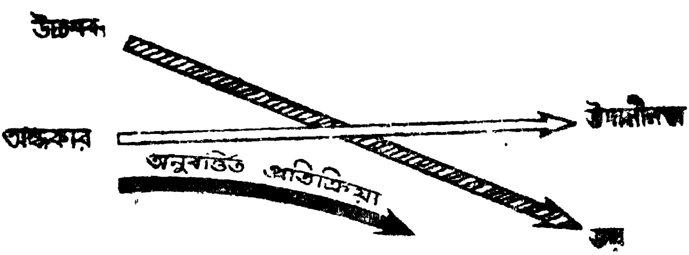
প্রক্ষোভের অনুবর্তন (Conditioning of Emotion)

বস্তুত প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে অনুবর্তনের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর প্রাথমিক প্রক্ষোভ সংখ্যায় যেমন অল্প তেমনই সংগঠনের দিক দিয়েও অতি

সরল। কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তির প্রক্ষোভ সংখ্যাতীত এবং অত্যন্ত জটিল। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রক্ষোভের এই বহুধাভবন ও জটিলতাপ্রাপ্তি অনুবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে হয়ে থাকে। প্রক্ষোভের অনুবর্তন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা সম্পন্ন করেন বিখ্যাত আচরণবাদী ওয়াটসন। নীচে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের বর্ণনা দেওয়া হল।

ওয়াটসন তাঁর নানা পরীক্ষণ থেকে এ সিদ্ধান্তে আসেন যে নবজাতকের ভয় জাগাতে পারে মাত্র দুটি উদ্দীপক—উচ্চশব্দ এবং হঠাৎ পড়ে যাওয়া। কিন্তু সে যখন বড় হয় তখন দেখা যায় যে তার ভয় কেবল ঐ দুটি উদ্দীপকে সীমাবদ্ধ থাকে না, বহু বিভিন্ন উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়ে যায়। তার এই প্রক্ষোভের জটিলতা ও বিস্তার সংঘটিত হয় অনুবর্তন প্রক্রিয়াটির দ্বারাই। আর্থার নামে একটি ছোট ছেলেকে একটি লোমওয়ালা কুকুর দিয়ে দেখা গেল যে সে একটুও ভয় পায় না বরং হাত দিয়ে সেটি ধরে। কিন্তু উচ্চ শব্দ শুনলেই সে স্বাভাবিকভাবেই ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে। এইবার তাকে ঐ লোমওয়ালা কুকুরটি দেবার সময় খুব জোরে পেছন থেকে শব্দ করা হল। আর্থার কুকুরটি ধরেই ভয়ে ফেলে দিল। এইরকম আর্থার যতবারই কুকুরটি নিতে হাত বাড়ায় ততবারই জোরে একটা শব্দ করা হয় আর সেই শব্দ শুনে সে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠে। শেষে দেখা গেল যে শব্দ করা না হলেও কেবলমাত্র ঐ লোমওয়ালা কুকুরটি দেখলেই আর্থার ভয় পেয়ে কেঁদে উঠছে। অর্থাৎ উচ্চশব্দ থেকে সৃষ্ট স্বাভাবিক ভয়টি অনুবর্তিত হয়ে লোমওয়ালা কুকুরে সঞ্চালিত হয়ে গেছে।

বস্তুত ছোট শিশুর ক্ষেত্রে ভয় এইভাবে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বস্তু থেকে বহু বিভিন্ন বস্তুতে ছড়িয়ে পড়ে। অন্ধকারকেও ছোট শিশু প্রথম প্রথম ভয় করে না, কিন্তু পরে অনুবর্তনের ফলে অন্ধকারে ভয় সঞ্চালিত হয়ে যায়। রাত্রে অন্ধকার ঘরে হঠাৎ কোন শব্দ শুনে ঘুমন্ত শিশুর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং সে ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে। এইভাবে অন্ধকারের মধ্যে শব্দ শুনে ভয়

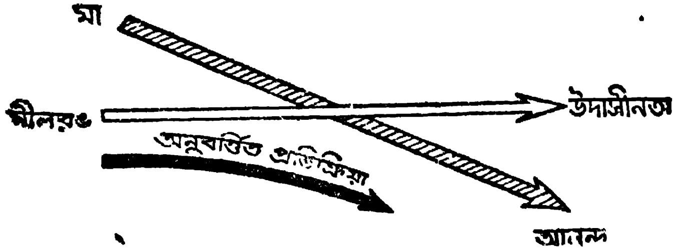


['উচ্চশব্দ' রূপ উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়া 'ভয়' অনুবর্তন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে 'অন্ধকার' রূপ উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়ে যাচ্ছে]

পেতে পেতে শিশু অন্ধকারকেই পরে ভয় করতে শুরু করে। এইভাবে ভয়ের প্রতিক্রিয়াটি তার উচ্চ শব্দরূপ স্বাভাবিক উদ্দীপক থেকে সঞ্চালিত হয়ে অন্ধকারে

অনুবর্তিত হয়ে গেল। একটি অনুবর্তিত বস্তু থেকে ভয় আবার আর একটি নতুন বস্তুতে অনুবর্তিত হতে পারে। সেখান থেকে আবার আর একটি নতুন বস্তুতে— এই ভাবে এক বস্তু থেকে অসংখ্য বস্তুতে শিশুর ভয় ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে।

কেবল ভয় নয়, শিশুর ঘৃণা, বিরক্তি, পছন্দ-অপছন্দ প্রভৃতি মনোভাবগুলিও এইরূপে অনুবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট হয়। যেমন, অঙ্ক শিক্ষার পদ্ধতি বা অঙ্কের শিক্ষকের আচরণ যদি শিশুর কাছে বিরক্তিকর হয় তবে ঐ পদ্ধতি বা শিক্ষকের প্রতি বিরাগ অঙ্কশাস্ত্রে (যার প্রতি আগে তার বিরাগ ছিল না) সঞ্চালিত হয়ে যায় এবং শিশু পরে অঙ্ককে এড়িয়ে চলে। শিশুর আনন্দ, ভালবাসা, প্রীতিও এইভাবে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক বস্তু থেকে আর এক বস্তুতে সঞ্চালিত হয়। যেমন, শৈশবে শিশুর মা প্রায়ই নীলরঙের কাপড় পরতেন এবং সেই পরিচ্ছদেই শিশুর আদর যত্ন পরিচর্যা করতেন। ফলে দেখা



[মা'র প্রতি স্বাভাবিক আনন্দবোধ কালক্রমে মা'র পোষাকের নীলরঙে অনুবর্তিত হয়েছে]

গেল যে মায়ের প্রতি শিশুর আনন্দবোধ কালক্রমে নীলরঙে সঞ্চালিত হয়ে গেছে এবং সে বড় হয়ে নীল রঙ পছন্দ করতে সুরু করেছে।

অপানুবর্তন (Deconditioning)

কোন স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া কৃত্রিম উদ্দীপকে অনুবর্তিত হবার পর নানা কারণে সেই অনুবর্তন লোপ পেতে পারে। অর্থাৎ তখন কৃত্রিম উদ্দীপকের উত্তরে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি আর প্রকাশ পায় না। যেমন, কুকুরের ক্ষেত্রে ঘণ্টার শব্দে লালাক্ষরণ হওয়া-রূপ অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি পরে কোন কারণে বন্ধ হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ তখন ঘণ্টাধ্বনি শুনে কুকুরের লালাক্ষরণ আর না হতে পারে। অনুবর্তন একবার ঘটার পর এইভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়াকে অপানুবর্তন (Deconditioning) বলা হয়।

অনুবর্তনের পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে স্বাভাবিক উদ্দীপকটি যদি দীর্ঘ কাল কৃত্রিম উদ্দীপক থেকে বিচ্যুত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ যদি কৃত্রিম উদ্দীপকের সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্দীপকটিকে দীর্ঘকাল উপস্থাপিত না করা হয় তাহলে ক্রমশ অনুবর্তন শিথিল হয়ে যেতে থাকে এবং শেষে এমন একটা সময় আসে

যখন অনুবর্তনের সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটে। যেমন, খাবার দেওয়া আর ঘণ্টা বাজানো একসঙ্গে সম্পন্ন করার ফলে দেখা গেল যে কিছুকাল পরে খাবার ছাড়াই কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজলেই কুকুরটির লালাক্ষরণ হয়। অর্থাৎ লালাক্ষরণ প্রতিক্রিয়াটি ঘণ্টা বাজানোর সঙ্গে অনুবর্তিত হয়ে গেছে। কিন্তু যদি দীর্ঘকাল খাবার না দিয়ে কেবলমাত্র ঘণ্টা বাজিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যাবে লালাক্ষরণের পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছে এবং শেষ পর্যন্ত এমন একটা সময় এসেছে যখন ঘণ্টা বাজালে আর লালাক্ষরণ হয় না। অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াটির অনুবর্তন লুপ্ত হয়েছে বা এক কথায় তার অপানুবর্তন ঘটেছে।

পুনরুপস্থাপনের সূত্র (Law of Reinforcement)

কিন্তু যখন লালাক্ষরণ এইভাবে কমে আসে তখন যদি মাঝে মাঝে স্বাভাবিক উদ্দীপকটি উপস্থাপিত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে আবার আগের মতই লালাক্ষরণ হতে সুরু হয়েছে। অর্থাৎ অনুবর্তন আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি সক্রিয় থাকার সময় যদি কৃত্রিম উদ্দীপকটির সঙ্গে স্বাভাবিক উদ্দীপকটিকে মাঝে মাঝে উপস্থাপিত করা যায় তবে অনুবর্তনের দৃঢ়তা বজায় থাকে এবং অপানুবর্তন ঘটে না। অনুবর্তনকে বজায় রাখার জন্য প্যাভলভ স্বাভাবিক উদ্দীপকটির এই মাঝে মাঝে উপস্থাপনের নাম দিয়েছেন পুনরুপস্থাপন (Reinforcement) প্রক্রিয়া। বস্তুত থর্নডাইকের ফললাভের সূত্র (Law of Effect) এবং প্যাভলভের পুনরুপস্থাপনের সূত্র (Law of Reinforcement) এ দুটি মূলত অভিন্ন। শিখনের স্থায়িত্ব যে প্রাণীর তৃপ্তিবোধের উপর নির্ভর করে এই মূলকথাই উভয় সূত্রের বক্তব্য।

শিক্ষায় অনুবর্তন প্রক্রিয়া

(Role of Conditioning in Education)

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব যে কত গভীর তা আমরা সহজে ধারণ করতে পারি না। শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির ক্রমবিকাশে অনুবর্তনের অবদান যেমন ব্যাপক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমত, শিশুর ভাষাশিক্ষায় অনুবর্তন প্রক্রিয়ার প্রভাব প্রচুর। শিশু তার প্রাথমিক অভিজ্ঞতা রাজ্যের বিভিন্ন বস্তুর নামগুলি শেখে অনুবর্তন প্রক্রিয়ারই মাধ্যমে। প্রথম প্রথম শিশু কেবলমাত্র অর্থহীন কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করে। কিন্তু ক্রমশ সে দেখে যে বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করলে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি তার প্রতি সাড়া দেয় বা বিশেষ বিশেষ বস্তু তার কাছে এগিয়ে দেওয়া

হয়, যেমন মা-ম্-ম্ বললে মা তার কাছে আসেন, জ-জ বললে তাকে জল দেওয়া হয়। এই ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে স্বাভাবিকভাবেই ঐ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে ঐ বিশেষ বিশেষ শব্দ শিশুর কাছে সংশ্লিষ্ট বা অনুবর্তিত-হয়ে যায়। পরে ঐ ব্যক্তি বা বস্তুটি দেখলে বা বোঝাতে গেলে তার ঐ শব্দটি মনে হয় এবং সে তখন ঐ শব্দটি উচ্চারণ করে। এইভাবেই সে মাকে 'মা' বলতে জলকে 'জল' বলতে শেখে। শিশু যে বিভিন্ন বস্তুর নামকরণ শেখে তা এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই শিশু বিশেষণ, ক্রিয়া প্রভৃতি অন্যান্য শব্দের অর্থও শিখে থাকে।

দ্বিতীয়ত, শিশুর বহু মৌলিক আচরণ অনুবর্তন প্রক্রিয়ার ফলজাত। যে সকল অভ্যাস শিশু অজ্ঞাতে আহরণ করে সেগুলির অধিকাংশই যে অনুবর্তনের মাধ্যমে অর্জিত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যেমন সকালে ঘুম থেকে ওঠা, বিশেষ সময়ে খাওয়া, পড়তে বসা বা শুতে যাওয়া ইত্যাদি। তা ছাড়া সামাজিক আদব-কায়দা, শিষ্টাচার প্রভৃতি অত্যাবশ্যক আচরণগুলিও অনুবর্তনের মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েরা শিখে থাকে।

তৃতীয়ত, প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে অনুবর্তনের প্রভাব সব চেয়ে বেশী। বহু ক্ষেত্রে কোন কিছুর প্রতি পছন্দ, অপছন্দ, ভয়, ঘৃণা আনন্দ, অনুরাগ প্রভৃতি অনুবর্তনের দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে। স্কুলের বহু ছেলেমেয়ের কাছে গণিত এবং ইংরাজী প্রায়ই বিশেষ বিরাগ এবং ভীতির বস্তু হয়ে দাঁড়াতে দেখা যায়। এই প্রতিকূল মনোভাব নিছক অনুবর্তনের ফল। প্রথম যখন শিশু বিষয় দুটি শিখতে যায় তখন তার যথেষ্টই আগ্রহ থাকে। কিন্তু শিক্ষকের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণ পদ্ধতি বা অতিরিক্ত শাসন বা শাস্তিদান প্রভৃতি থেকে যে স্বাভাবিক বিরাগ এবং ভীতি শিশুর মনে জন্মায়, সেগুলি কিছু কাল পরে ঐ বিষয় দুটিতে অনুবর্তিত হয়ে যায় এবং সে ঐ বিষয় দুটিকে এড়িয়ে যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব অনুকূল বা প্রতিকূল হওয়াটা নির্ভর করছে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার উপর। সুতরাং যাতে শিক্ষণ-পদ্ধতির ত্রুটী বা অন্য কোন অপ্রাসঙ্গিক কারণ থেকে সঞ্জাত প্রতিকূল প্রক্ষোভ শিক্ষণীয় বিষয়, শিক্ষক, স্কুল প্রভৃতির প্রতি অনুবর্তিত হয়ে ঐগুলির প্রতি তার মনকে বিরূপ না করে তোলে সেদিকে পিতামাতা ও শিক্ষকমাত্রেরই সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত। স্কুলে সংঘটিত কোন অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত স্কুলটার উপর শিশুর বিরাগের সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে। সু-অভ্যাসের মত কু-অভ্যাসও অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুবর্তন থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে।

অসতর্কতা, অমনোযোগ, বানান ভুল প্রভৃতি ক্ষেত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাদের মূলেও অনুবর্তন প্রক্রিয়ার প্রচুর প্রভাব আছে। আমরা নিজেরাই সময় সময় অজ্ঞতাবশত শিশুর মধ্যে অবাঞ্ছিত অনুবর্তন সৃষ্টি করে থাকি। যেমন, শিক্ষার্থী পরীক্ষার খাতায় কোন ভুল করলে আমরা লাল কালি দিয়ে দাগ দিয়ে থাকি। আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল ঐ ভুলটির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কিন্তু সাধারণভাবে লাল রঙের প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ভীতি (এও অবশ্য আর একটি অনুবর্তনের ফল)। ফলে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ ভুলগুলি শিশুর কাছে ভীতির বিষয় হয়ে দাঁড়ায় এবং সে নিজের অজ্ঞাতেই ঐ ভুলগুলিকে শোধরাবার চেষ্টা না করে সেগুলিকে এড়িয়ে যায়। যাতে শিশুর মধ্যে এই শ্রেণীর অবাঞ্ছিত অনুবর্তনের সৃষ্টি না হয় সেদিকে সচেতন থাকা শিক্ষকের একান্ত কর্তব্য। অপর পক্ষে শিক্ষক পরিবেশের উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের দ্বারা শিক্ষার্থীর মধ্যে বাঞ্ছিত অনুবর্তনও সৃষ্টি করতে পারেন। সমাজ-জীবনের রীতি-নীতি, ভদ্রতা, লৌকিকতা, স্বাস্থ্যকর অভ্যাস, উদার মনোভাব, মনোযোগের অভ্যাস, মিথ্যার প্রতি ঘৃণা, সহযোগিতা, বন্ধুপ্রীতি, দল-বিশ্বস্ততা প্রভৃতি নানা বাঞ্ছিত গুণ নিয়ন্ত্রিত এবং সুপরিকল্পিত অনুবর্তনের মাধ্যমে শিশুকে শেখান যেতে পারে।

৪। শিখনের ফিল্ড তত্ত্ব (Field Theory of Learning)

অতি সাম্প্রতিক কালে মনোবিজ্ঞানের যে নতুন শাখাটি মনীষী-মহলে বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে সেটি ফিল্ড সাইকোলজি' নামে খ্যাত। জার্মান মনোবিজ্ঞানী কার্ট লুইন (**Kurt Lewin**) মনোবিজ্ঞানের এই নতুন শাখাটির উদ্ভাবক। প্রকৃতির দিক দিয়ে ফিল্ড তত্ত্বটি আধুনিক গেস্টাল্ট মতবাদের সমগোত্রীয় এবং মৌলিক ধারণার দিক দিয়ে দুটি তত্ত্বের মধ্যে প্রচুর মিল আছে। তবু মানব আচরণের সংব্যাখ্যানের দিক দিয়ে ফিল্ড তত্ত্বের এমন কতকগুলি অভিনবত্ব আছে যার জন্য এটিকে একটি স্বতন্ত্র মতবাদরূপে আজকাল সকল মনোবিজ্ঞানীই গ্রহণ করে থাকেন। কার্ট লুইন অবশ্য শিখনের উপর কোন স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ তত্ত্ব দিয়ে যান নি। সাধারণভাবে মানব আচরণ এবং বিশেষ করে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ব্যর্থতা, প্রেষণা প্রভৃতির সমস্যা নিয়েই তিনি বিশদ গবেষণা করেন। বরং শিখন সম্বন্ধে কোন আলোচনা তাঁর পুস্তকে স্থান পায়নি। কিন্তু মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের যে পরিকল্পনাটি তিনি উপস্থাপিত করেছেন সেটিকে ভিত্তি করে আমরা শিখনের একটি 'ফিল্ড তত্ত্ব' গঠন করতে পারি।

মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের স্বরূপ

(Nature of Psychological Field)

শিখনের ফিল্ড তত্ত্ব বুঝতে হলে কাকে ফিল্ড বলে তা বোঝা সব আগে দরকার। ফিল্ড বলতে কার্ট লুইন একটি মনোবিজ্ঞানমূলক সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকে বোঝাচ্ছেন যার মধ্যে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকে। এক কথায় ব্যক্তি এবং তার সঙ্গে সহ-অবস্থিতি বিভিন্ন শক্তিগুলি নিয়ে যে পরিবর্তনশীল মনোবিজ্ঞানমূলক ক্ষেত্রটি রচিত হয়ে থাকে সেইটিকেই ফিল্ড বলা হয়।

ফিল্ডের পরিসীমা ব্যক্তির পরিবেশের পরিসীমার সঙ্গে অভিন্ন। তবে পরিবেশ বলতে ব্যক্তির চারপাশে যে বস্তুসমষ্টি আছে তাকেই বোঝায় না। পরিবেশ বলতে সেই সব বস্তু ও শক্তির সমষ্টিকে বোঝায় যা ব্যক্তির বর্তমানের চাহিদা, উপলব্ধি ও আগ্রহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ব্যক্তির পরিবেশে এমন অনেক বস্তু থাকতে পারে যার সঙ্গে ব্যক্তির এই মুহূর্তে কোন সম্পর্ক নেই। অতএব সে বস্তুগুলি তার মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেবলমাত্র সেই সব বস্তু ও শক্তি দিয়েই ব্যক্তির এই মুহূর্তের ফিল্ড তৈরী হবে যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

ফিল্ড তত্ত্ব অনুযায়ী ব্যক্তির সমস্ত আচরণই এই মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ড থেকে সৃষ্ট হবে এবং সম্পূর্ণভাবে ফিল্ডটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে অর্থাৎ ঐ মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডটির অন্তর্গত ব্যক্তি নিজে এবং তার সঙ্গে যে সব বস্তু অবস্থিত সে সবই একসঙ্গে মিলে ব্যক্তির আচরণের জন্ম দেয়। ব্যক্তির জীবন সংশ্লিষ্ট অতীতের কোন শক্তি বা ভবিষ্যতের কোন সম্ভাবনা তার আচরণকে কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ বা নির্ধারণ করে না। তার সমস্ত আচরণ পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় বর্তমান কালের এই মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডটির দ্বারা।

অস্তিবাচক ও নেতিবাচক শক্তি

(Positive & Negative Valence)

কোন বস্তু বা ব্যক্তি ফিল্ডের অন্তর্ভুক্ত কিনা তা নির্ভর করে বস্তুটি ব্যক্তির চাহিদার সঙ্গে কতটা সম্পর্কযুক্ত তার উপর। যে বস্তুগুলি ব্যক্তির চাহিদা মেটাতে সক্ষম সেগুলিকে অস্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্তু আর যে বস্তুগুলি তার চাহিদা মেটাতে পারে না সেগুলিকে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্তু বলে বর্ণনা করা হয়। এ দু'ধরনের বস্তু ব্যক্তির মধ্যে দু'ধরনের আচরণ সৃষ্টি করে। অস্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্তু ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি করে 'আকর্ষণ' অর্থাৎ ব্যক্তি তার

দিকে এগিয়ে যায়, আর নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্তু ব্যক্তির মধ্যে সৃষ্টি করে 'বিকর্ষণ' অর্থাৎ ব্যক্তি সেই বস্তু থেকে দূরে সরে আসে। ব্যক্তির লক্ষ্যে পৌছানর পথে যে কোন বাধাই এই রকম নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বস্তু। তবে ব্যক্তি যতক্ষণ না বাধাটির সম্মুখীন হচ্ছে বা সেটিকে দূর করার চেষ্টা করছে ততক্ষণ সেটির মধ্যে কোন নেতিবাচক শক্তির সৃষ্টি হয় না। যখনই ব্যক্তি তার লক্ষ্যে পৌছানর জন্য বাধাটি দূব করাব চেষ্টা করবে তখন সেটি তার কাছে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠবে।

শিখনের ফিল্ড (Field of Learning)

শিখনের পরিস্থিতিও এই ধরনেব একটি বিশেষধর্মী মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের সৃষ্টি করে। এই ফিল্ডে ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছবার চেষ্টা কবে কিন্তু এক বা একাধিক বাধা তার লক্ষ্যে পেঁৗছানর পথে প্রতিরোধের সৃষ্টি করে। এখানে লক্ষ্যটি হল এমন বস্তু যা তার চাহিদার তৃপ্তি আনতে পারে। অতএব সেটি হল তার কাছে অস্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন এবং ফিল্ডের অন্তর্গত যে সকল বস্তু তার লক্ষ্যে পৌছানর প্রচেষ্টায় তাকে সাহায্য করে সেগুলি তার কাছে অস্তিবাচক শক্তিসম্পন্ন। এই বস্তুগুলি ব্যক্তির মধ্যে 'আকর্ষণমূলক' আচরণ সৃষ্টি করে। কিন্তু যে বস্তু বা বস্তুগুলি তার সেই লক্ষ্যে পৌছানর পথে বাধার সৃষ্টি করে সেই বস্তুটি বা বস্তুগুলি তার কাছে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। এই বস্তু বা বস্তুগুলি ব্যক্তির মধ্যে 'বিকর্ষণমূলক' আচরণের সৃষ্টি করে। অর্থাৎ ব্যক্তি সেগুলি দূব করার চেষ্টা করবে বা সেগুলিকে এড়িয়ে যাবে। এই বিভিন্নধর্মী শক্তিগুলির সমন্বয়ে যে মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডটি তৈরী হয় সেই ফিল্ডটিই ব্যক্তির শিখনমূলক আচরণধারার জন্ম দেবে।

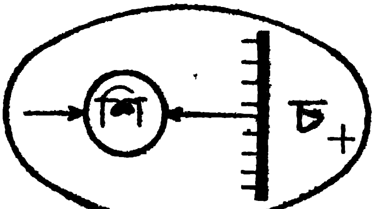
ফিল্ডের পুনর্গঠন (Re-structure of Field)

লুইনের মতে যখন একটি বিশেষ ধরণের আচরণের দ্বারা ব্যক্তির পক্ষে তার লক্ষ্যে পৌছান সম্ভব হয়ে উঠছে না অর্থাৎ বর্তমানের ফিল্ডটি যখন তার চাহিদার তৃপ্তি আনতে পারছে না তখন সে সেই ফিল্ডের পুনর্গঠন করে অর্থাৎ ফিল্ডের শক্তিগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে নেয় এবং তারই ফলে ফিল্ডের অন্তর্গত নেতিবাচক শক্তিগুলিকে সে পরাভূত করে, নয় সাফল্যের সঙ্গে এড়িয়ে যায়। ফিল্ডের এই পুনর্গঠন বা পুনর্বিন্যাস থেকেই আসে শিখন বা সমস্যার সমাধান।

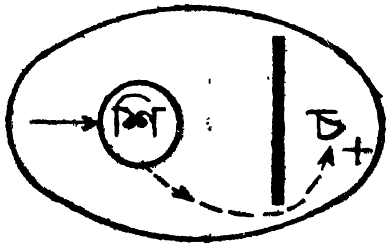
একটি শিখনের সরল দৃষ্টান্ত দিয়ে ফিল্ডের পুনর্গঠনের ঘটনাটি বোঝান যায়। শিশুর সামনে রয়েছে একটি টেবিলে চকোলেট আর মাঝখানে রয়েছে

একটি বেঞ্চ। এখানে চকোলেটটি শিশুর চাহিদা মেটাতে সমর্থ অতএব অস্তি-বাচক শক্তিসম্পন্ন এবং শিশু তার দিকে এগিয়ে যাবার আকর্ষণ বোধ করছে। কিন্তু মাঝখানের বেঞ্চটি তার পথে বাধা সৃষ্টি করছে এবং সেইজন্য সেটি তার কাছে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এই যে ফিল্ডটি (চিত্র—১) তৈরী হয়েছে এতে শিশুর পক্ষে লক্ষ্যে পৌছান শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে অর্থাৎ তার শিখন সম্ভব হচ্ছে না।

শিখন পরিস্থিতিতে মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের পুনর্গঠন।



চিত্র—১



চিত্র—২

[প্রথম চিত্রে শিশু চকোলেটের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে কিন্তু মধ্যবর্তী বেঞ্চটি তার উপর নেতিবাচক শক্তির প্রয়োগ করে তার আচরণকে প্রতিরুদ্ধ করছে। দ্বিতীয় চিত্রে শিশু তার ফিল্ডের পুনর্গঠন করছে। তার ফলে নেতিবাচক শক্তিসম্পন্ন বেঞ্চটিকে এড়িয়ে সে তার লক্ষ্য চকোলেটে পৌছচ্ছে।]

কিন্তু শিশু কিছুক্ষণ সোজাপথে চকোলেটে পৌঁছবার চেষ্টা করার পর (এখানে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিও থাকতে পারে) হঠাৎ চকোলেটে যাবার ঘোরাপথটি আবিষ্কার করে এবং সেই পথে চকোলেটে পৌছয় (চিত্র—২)। এইভাবে সে তার সমস্যার সমাধান করে এবং তার শিখন ঘটে। এখানে প্রকৃতপক্ষে শিশুটি তার পূর্বের মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডটির পুনর্গঠন এবং নতুন একটি মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের সৃষ্টি করে এবং তাই থেকেই তার সমস্যার সমাধান দেখা দেয়। বলা বাহুল্য এই সমাধানটি আসে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। অতএব আমরা বলতে পারি যে মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের পুনর্গঠন থেকেই শিখন আসে।

শিখনের এই ফিল্ড থিয়োরির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে হবে। প্রথম, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষণার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রেষণা জাগলে ব্যক্তির মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয় এবং তার ফলেই ব্যক্তি আচরণ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। দ্বিতীয়, মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের পুনর্গঠনের একটি প্রয়োজনীয় সোপান হল

অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ এবং এই প্রক্রিয়াগুলির সুষ্ঠু সম্পাদন থেকেই ফিল্ডের পুনর্গঠন হয়। এই অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণের সময় প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি থাকতে পারে। এখানে গেষ্টাল্ট তত্ত্বের সঙ্গে ফিল্ডতত্ত্বের একটি মৌলিক পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। গেষ্টাল্টবাদীরা শিখনের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের ভূমিকা একেবারেই স্বীকার করেন না। তবে ফিল্ডের পুনর্গঠনের সঙ্গে সঙ্গে আকস্মিকভাবে যে সমস্যার সমাধান দেখা দেয়, তার মূলে আছে ব্যক্তিব মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ। এই ক্ষেত্রে অবশ্য গেষ্টাল্টতত্ত্ব ও ফিল্ডতত্ত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

শিখনের বিভিন্ন তত্ত্বের সমন্বয়ন

শিখনের যে তত্ত্বগুলির আমরা আলোচনা করলাম সেগুলিব সমর্থকগণ দাবী করেন যে তাঁদের সমর্থিত পদ্ধতিটির মাধ্যমেই একমাত্র শিখন সংঘটিত হয়ে থাকে এবং অন্য কোন পদ্ধতিতে শিখন হয় না। যেমন, থর্নডাইকের মতে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমেই সব শিখন হয়। গেষ্টাল্টবাদীদের মতে, একমাত্র অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমেই সব শিখন হয়, আবার আচবণবাদীরা বলেন যে সকল শিখনই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঘটে থাকে। প্রকৃতপক্ষে আলোচিত এই তিনটি পদ্ধতিতেই শিখন সংঘটিত হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিখন পদ্ধতির সাহায্যে শিখন হয়ে থাকে। আর কখন কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ পদ্ধতিটি কার্যকর হবে তা নির্ভর করে তিনটি বস্তুব উপব। যথা,—প্রথম, শিখনেব বিষয়বস্তুটির স্বরূপের উপব; দ্বিতীয়, শিখন-পরিস্থিতির প্রকৃতির উপব এবং সবশেষে শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার উপর।

অতি-প্রাথমিক, সরল এবং সহজ প্রকৃতিব শিখন কাজগুলি প্রাণী শেখে অনুবর্তনের মাধ্যমে। শিখন-পদ্ধতিরূপে অনুবর্তন প্রক্রিয়াটি যান্ত্রিক, স্বতঃপ্রসূত এবং সম্পূর্ণভাবে প্রাণীর ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। অনুবর্তন প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রাণী নতুন আচরণ, অভ্যাস, মনোভাব, ভাবধারা প্রভৃতি তার অজ্ঞাতসারে শিখে থাকে।

যে সকল ক্ষেত্রে শিখন-পরিস্থিতিটি শিক্ষার্থীর কাছে বদ্ধ (closed) ও অনির্দিষ্ট এবং যেখানে শিখনের লক্ষ্যটি পরিষ্কারভাবে শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে না সে সকল ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শিখে থাকে। কিন্তু যখন শিখন-পরিস্থিতিটি শিক্ষার্থীর কাছে উন্মুক্ত এবং লক্ষ্যটি তার পূর্ণভাবে জানা থাকে তখন শিক্ষার্থী শেখে অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। কৌশল শিখনের ক্ষেত্রে শিখন পরিস্থিতিটি বদ্ধ থাকায় ব্যক্তিকে সকল প্রকার

কৌশলই আয়ত্ত করতে হয় প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে। যেমন টাইপ করা, মটরগাড়ী চালান, সাঁতার কাটা, কোন শিল্পকাজ করা প্রভৃতি কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে বার বার প্রচেষ্টা করতে হয় এবং বার বার ভুল করার মধ্যে দিয়ে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীর শিখন সম্পন্ন হয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা এবং অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে শেখা—এদুটি পদ্ধতির মধ্যে মূলগত পার্থক্য খুবই অল্প। তাঁরা বলেন যে প্রথম ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের প্রক্রিয়াটি মূর্ত, প্রকাশিত এবং বাহ্যিক আচরণের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঐ প্রচেষ্টা-ও-ভুলের প্রক্রিয়াটিই সংঘটিত হয়, তবে তা থাকে অমূর্ত, অপ্রকাশিত এবং মানসিক স্তরে সীমাবদ্ধ।

এই সত্যটি শিখনের ফিল্ড থিয়োরির ক্ষেত্রে বিশেষ করে প্রমাণিত হয়। ফিল্ডের পরিবর্তন বা পুনর্গঠনের সময় প্রচেষ্টা-ও-ভুলের প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু যে মুহূর্তে ফিল্ডের পুনর্গঠন শেষ হয় তখনই অন্তর্দৃষ্টির জাগরণ ঘটে। এইজন্য ফিল্ড থিয়োরিকে এদিক দিয়ে আমরা প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং অন্তর্দৃষ্টি-মূলক পদ্ধতির সমন্বয়ন বলে বর্ণনা করতে পারি।

প্রাণীর মানসিক ক্ষমতার উপর শিখনের পদ্ধতি অনেকখানি নির্ভর করে। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে কাজটি অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে সম্পন্ন করে, অপেক্ষাকৃত অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি সেই একই কাজ প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। কোন মানুষ পথে যেতে যদি সম্মুখে কোন বাধা দেখে তবে সে সেটা ঘুরে পার হয়ে যাবে কিন্তু মনুষ্যেতর প্রাণী সেই ক্ষেত্রে বার কয়েক সেই বাধায় ধাক্কা খেয়ে তার কিছুক্ষণ পরে সেই বাধাটা ঘুরে যেতে পারবে। এখানে মানুষের উন্নত বিচারশক্তি থাকার জন্য তাকে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতির সাহায্য নিতে হল না, কিন্তু মনুষ্যেতর জীবের উচ্চ মানসিক ক্ষমতা না থাকার জন্য তাকে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মধ্যে দিয়ে শিখতে হল।

ওয়াসবার্নের সমন্বয়ন

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ওয়াসবার্ন (Washburne) শিখনের তিনটি বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় আনার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে যদি শিখন প্রক্রিয়াটিকে তার উৎপত্তি বা সৃষ্টির দিক থেকে বিচার করা যায় তাহলে আমরা পরম্পরাসম্পন্ন বা আনুক্রমিক কতকগুলি ঘটনা বা সোপান দেখতে পাব। সেগুলি হল—

১। সম্পর্কস্থাপন (Orientation) ২। পরিবেশ পরীক্ষণ (Exploration)
৩। সম্প্রসারণ (Elaboration) ৪। পরিস্ফুটন (Articulation)
৫। সরলীকরণ (Simplification) ৬। যান্ত্রিকীকরণ (Automatisation)
৭। পুনঃ সম্পর্কস্থাপন (Reorientation)

সম্পর্কস্থাপন বলতে বোঝায় সমস্যাটির স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করা। এইটি শিখন প্রক্রিয়ার প্রথম সোপান। তার পরের সোপানে ব্যক্তি সমস্যাটির সমাধানের জন্য তার সম্ভাব্য পন্থা ও উপায়গুলি পরীক্ষণ করে। তৃতীয় সোপানে সমস্যা সম্বন্ধে সে নিজের জ্ঞানকে সম্প্রসারিত করে এবং তার সমাধানের পদ্ধতিকে উন্নত করে তোলে। চতুর্থ বা পরিস্ফুটনের স্তরে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছানর উপায়টিকে আরও সুনির্দিষ্ট এবং সুশৃঙ্খলভাবে গঠিত করে। সরলীকরণের স্তরে অবাস্তব ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে সে বাদ দেয়। যান্ত্রিকীকরণের স্তরে সমস্যা সমাধানেব উপযোগী আচরণটি বার বার সম্পন্ন করে সেটিকে সে পূর্ণভাবে আয়ত্ত করে। শেষ স্তরে নতুন শেখা আচবণ ও অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তি সাধারণ সূত্রগুলি সামান্যীকরণ (Generalisation) প্রক্রিয়ার সাহায্যে আহরণ করে। এইভাবেই তার শিখন শেষ হয়।

এখন ওয়াসবার্নের মতে যে সব মনোবিজ্ঞানী উপরের প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে এই সামান্যীকরণ বা সম্পর্কগঠন প্রক্রিয়াটির উপর জোর দেন তাঁরাই বলেন যে সব শিখনই সম্পন্ন হয় অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে। আর যে সব মনোবিজ্ঞানী পরিবেশ পরীক্ষণ, সম্প্রসারণ, পরিস্ফুটন ইত্যাদি প্রক্রিয়ার উপর জোর দেন তাঁরা শিখনকে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি বলে বর্ণনা করে থাকেন। আর যাঁরা সরলীকরণ ও যান্ত্রিকীকরণ প্রক্রিয়ার উপর জোর দেন তাঁরা শিখনকে নিছক অনুবর্তন প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করেন।

শিখনের দ্বি-উপাদান তত্ত্বঃ মাওরার

(Mowrer's Two-Factor Theory of Learning)

প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং অন্তর্দৃষ্টির পদ্ধতি—এ দু'শ্রেণীর শিখন মূলগত অভিন্ন বলে অনেক মনোবিজ্ঞানী শিখনের কেবলমাত্র দুটি মৌলিক শ্রেণী বিভাগকে স্বীকার করে থাকেন। যেমন, মাওরার (Mowrer) সমস্ত শিখনকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—অনুবর্তন (Conditioning) বা উদ্দীপকের প্রতিস্থাপন (Stimulus Substjt tion) এবং (২) সমস্যা সমাধান (Problem

Solving) বা প্রতিক্রিয়ার প্রতিস্থাপন (Response Substitution)। অনুবর্তনের ক্ষেত্রে একই প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক পরিবর্তিত হয়ে নতুন উদ্দীপক হয়। যেমন, লালাক্ষরণরূপ প্রতিক্রিয়ার প্রথমে উদ্দীপক ছিল 'খাদ্য', পরে অনুবর্তনের ফলে প্রতিক্রিয়া হল 'ঘণ্টাধ্বনি'। সেইজন্য অনুবর্তনকে উদ্দীপকের প্রতিস্থাপন বা উদ্দীপকের 'বদলে যাওয়া' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

'সমস্যা সমাধান' নামক শিখন বলতে মাওরার প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি এবং অন্তর্দৃষ্টির পদ্ধতি উভয়কেই বুঝিয়েছেন। এ দুধরনের শিখনের ক্ষেত্রেই উদ্দীপক এক থাকে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া বদলে নতুন প্রতিক্রিয়া হয়ে যায়। যেমন, বিড়াল বা শিম্পাঞ্জী উভয়ের ক্ষেত্রেই 'খাদ্যই' ছিল একমাত্র উদ্দীপক। কিন্তু শিখনের ফলে এই উদ্দীপকের উত্তরে তাদের প্রতিক্রিয়া বদলে গিয়েছিল। সেজন্য এই শ্রেণীর শিখনকে প্রতিক্রিয়ার উপস্থাপন বা প্রতিক্রিয়ার 'বদলে যাওয়া' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ ধরনের শিখনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল যে এর মধ্যে একটা সমস্যার উপস্থিতি এবং প্রাণীর সে সম্বন্ধে সচেতনতা থাকা।

মাওরারের মতে অভ্যাস, জ্ঞান, ভাষার বোধ, অঙ্গমূলক কৌশল ইত্যাদি ইচ্ছামূলক কাজগুলি সমস্যা সমাধান-রূপ শিখনের পর্যায়ে পড়ে। এই কাজগুলি সাধারণত আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুমণ্ডলীর সাহায্যে সম্পন্ন করে থাকি।

অনুবর্তনধর্মী শিখনের পর্যায়ে পড়ে সমস্ত প্রক্ষোভমূলক শিখন, যেমন ভালবাসা, রাগ, ভয়, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদি। তাছাড়া আগ্রহ, পছন্দ, অপছন্দ মনোভাব ইত্যাদিও ব্যক্তি অর্জন করে অনুবর্তনের মাধ্যমে।

অনুবর্তনধর্মী শিখনকে ব্যাখ্যা করার জন্য প্রয়োজন হয় সান্নিধ্যের সূত্রটি (Law of Contiguity), তেমনই সমস্যা-সমাধানমূলক শিখনকে ব্যাখ্যা করতে ফললাভের সূত্রটি (Law of Effect) অপরিহার্য।

টাটল-'র শিখনের শ্রেণীবিভাগ
(Tuttle's Classification of Learning)

টাটল (Tuttle) নামে আর একজন মনোবিজ্ঞানীও শিখনকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। যথা (১) জ্ঞানমূলক (Intellectual) শিখন—এতে পড়ে কৌশল শিক্ষা, তথ্য, মুখস্থ করা, বিচার করা ইত্যাদি এবং (২) প্রক্ষোভমূলক (Emotional) শিখন-এর অন্তর্গত হল মনোভাব, কাজের প্রেষণা, আগ্রহ, নৈতিকবোধ, সৌন্দর্যবোধ, রুচি ইত্যাদির গঠন। টাটলের এই বিভাজনটি মাওরারের বিভাজনেরই অনুরূপ।

কার্যকর শিখনের সর্তাবলী

(Conditions of Effective Learning)

শিখনের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ আলোচনা করে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সমস্ত শিখন প্রচেষ্টাই সব সময়ে কার্যকর হয় না। শিখনের কার্যকারিতা নানা বিভিন্ন সর্তের উপর নির্ভর করে। আর যদি সেই বিশেষ সর্তগুলি পূর্ণ না হয় তাহলে সময় ও পরিশ্রমের অযথা অপচয় হয়, সার্থক শিক্ষা হয় না। মনোবিজ্ঞানীরা যে যে সর্তগুলি কার্যকর বা সার্থক শিখনের পক্ষে অপরিহার্য বলে মনে করেন তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল।

১। প্রস্তুতি

প্রস্তুতি বলতে বোঝায় শিক্ষার যে স্তর বা মান অনুযায়ী শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণ করছে তার জন্য পর্যাপ্ত মানসিক পরিণতি, অন্যান্য উপযোগী ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় পূর্ব অভিজ্ঞতা। এটা হল জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি। এ ছাড়াও প্রয়োজন প্রক্ষোভমূলক প্রস্তুতি। অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুটি শেখার উপযোগী অনুকূল প্রক্ষোভ শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকা চাই।

২। প্রেষণা

কার্যকর শিখনের সঙ্গে প্রেষণার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। প্রেষণাই শিখনের প্রচেষ্টাকে জাগায়, তাকে সক্রিয় রাখে, তার গতিপথ নির্দিষ্ট করে দেয় এবং তার তীব্রতার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করে। বস্তুত প্রেষণা শিখনমাত্রেরই অপরিহার্য সর্ত। অবশ্য প্রেষণার সঙ্গে থাকা চাই শিক্ষার্থীর নিজের সাফল্য বা ফললাভ সম্বন্ধে সচেতনতা। বস্তুত, প্রেষণা এবং শিখনের ফল সম্বন্ধে সচেতনতা এই দুটি বস্তু এক সঙ্গে মিলে শিখন প্রচেষ্টার প্রকৃতি ও পরিমাণকে নির্ধারিত করে।

৩। শিখন পরিচালন

যাতে শিক্ষার্থী তার লক্ষ্যটি ভাল করে চিনতে পারে, তার প্রতি মনোযোগ দিতে পারে এবং তাতে পৌছানর চেষ্টা করতে পারে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে যথাযথ পরিচালনা করা প্রয়োজন। তা ছাড়া লক্ষ্যে পৌছানর জন্য সর্বাপেক্ষা কার্যকর প্রচেষ্টা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া এবং শিক্ষার্থীর অগ্রগতি অনুযায়ী তার প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করাও শিখন পরিচালনার অন্তর্গত। উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে শিক্ষার্থী ভুল প্রচেষ্টা করতে পারে এবং তার ফলে শিখন বিলম্বিত, এমন কি না হতেও পারে।

৪। কার্যকর প্রচেষ্টা সম্পাদনের সুবিধা

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে সর্বজনীন বা মৌলিক তত্ত্বটি সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে শিক্ষার্থী আহরণ করে। সেই পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে বর্তমান সমস্যার উপযোগী প্রচেষ্টার উদ্ভাবন করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ। পরিবেশ যদি অনুকূল না হয় এবং পূর্ব আহরিত অভিজ্ঞতা যদি সমস্যা সমাধানের উপযোগী না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর পক্ষে কার্যকর শিখন লাভ করা সম্ভব হয় না।

৫। অনুশীলন বা বারবার প্রচেষ্টা

সমস্যার বিশ্লেষণ, বিভেদীকরণ অধিকতর কার্যকব প্রতিক্রিয়ার উদ্ভাবন ও সমন্বয়নের জন্য লক্ষ্য-উদ্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত প্রচেষ্টা বাব বার সম্পন্ন করা কার্যকর শিখনের অন্যতম সর্ত।

৬। ফলের প্রত্যক্ষণ

নিজের প্রতিটি প্রচেষ্টার ফলাফল প্রত্যক্ষণ করা এবং পূর্বগামী প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে অনুগামী প্রচেষ্টার ত্রুটি সংশোধন করা সার্থক শিখনের জন্য অপরিহার্য।

৭। শিখন সঞ্চালনের ব্যবস্থা

আগেকার শিখন পরিস্থিতি থেকে পাওয়া সিদ্ধান্তগুলিকে সম্প্রসারিত করা এবং সেগুলির বাস্তবে প্রয়োগের মাধ্যমে শিখন-সঞ্চালনের ব্যবস্থা করাও সার্থক শিখনের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

৮। শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

সমস্যার অর্থ ও স্বরূপ, শিখনের তত্ত্ব ও পদ্ধতির তুলনামূলক উপকারিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা সার্থক শিখনেব আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সর্ত।

৯। মানসিক স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উপযোগী মানসিক অবস্থা

আত্মবিশ্বাস, প্রফুল্লতা, মানসিক সাম্য, উদ্বেগহীনতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলিও কার্যকর শিখনের অত্যাবশ্যক অঙ্গ। মানসিক অসুস্থতা, দুশ্চিন্তা, বিকৃত মনোভাব ইত্যাদি সার্থক শিক্ষার পথে গুরুতর বাধার সৃষ্টি করে থাকে। এইজন্য আধুনিক কালে শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যেব প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া শিক্ষাসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ বলে গৃহীত হয়েছে।

শিখন সর্তাবলীর শিক্ষায় গুরুত্ব

বলা বাহুল্য উপরে বর্ণিত সার্থক শিখনের সর্তগুলি যে শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কেননা, কেবল শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। সে শিক্ষা সত্যই শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে কার্যকর হল কিনা তা দেখাও তাঁর একান্ত কর্তব্য। এইজন্য যাতে শিক্ষার্থীর শিখনের ক্ষেত্রে উপরের সর্তগুলি ঠিকমত পালিত হয় সে বিষয়ে শিক্ষককে সচেতন থাকতে হবে। একটি উদাহরণের সাহায্যে শিখনের এই সর্তাবলীর বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগিতা বোঝান যায়।

ধরা যাক, শিক্ষার্থীকে 'সিন্ধুসভ্যতার বিকাশ পড়ানো হচ্ছে। এ বিষয়টির সুষ্ঠু শিখনের জন্য প্রথমেই প্রয়োজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানমূলক প্রস্তুতি। অর্থাৎ মানব সভ্যতা সম্বন্ধে ধারণা এবং সভ্যতার বিভিন্ন উপাদানের অর্থ ও মূল্য হৃদয়ঙ্গম করার উপযোগী মানসিক পরিণতি শিক্ষার্থীর রয়েছে কিনা তা দেখতে হবে। তাছাড়া শিক্ষার্থীর প্রক্ষোভ শিক্ষাগ্রহণের অনুকূল কিনা তাও পরীক্ষা করতে হবে। এক কথায় শিক্ষণীয় বিষয়টি গ্রহণ করার মত মানসিক ও প্রক্ষোভিক প্রস্তুতি শিক্ষার্থীর আছে কি না শিক্ষককে তা প্রথমে দেখতে হবে। এই উভয় প্রকার প্রস্তুতি থাকলেই শিখন কার্যকর হবে, নইলে নয়।

দ্বিতীয় ধাপে দেখতে হবে যে শিক্ষার্থী ঐ বিশেষ বিষয়বস্তুটি শেখার জন্য যথেষ্ট প্রেষণা বা আগ্রহ অনুভব করছে কিনা। মানবগোষ্ঠীর একজন সদস্য-রূপে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের বিবরণ জানার ইচ্ছা যাতে স্বাভাবিক-ভাবেই শিক্ষার্থীর মধ্যে দেখা দেয় তার আয়োজন করতে হবে শিক্ষককেই।

তৃতীয় সর্তটি হল যথাযথ শিখন-পরিচালনা। কি ভাবে কোন্ পথে এবং কোন্ কোন্ উপাদানের সংগঠনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থী সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে জানতে পারবে সে সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া আবশ্যক। অভিজ্ঞ শিক্ষকের পরিচালনার সাহায্যে শিক্ষার্থী তার সমস্যা সমাধানের উপযোগী প্রচেষ্টা করতে সমর্থ হবে। সিন্ধুসভ্যতার অবস্থিতি, সেখানকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার বিভিন্ন তথ্য, তাদের ব্যবহৃত নানা উপকরণ ও সামগ্রী থেকে শিক্ষার্থী সে যুগের অধিবাসীদের সামাজিক, ধর্মীয় ও কৃষ্টিমূলক দিকগুলির বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হবে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষার্থীর বার বার প্রচেষ্টা বা অনুশীলনেরও প্রয়োজন। একই বস্তু বার বার দেখতে হবে, পরীক্ষা করতে হবে, তাদের অন্তর্নিহিত মৌলিক তত্ত্বগুলির অনুশীলন করতে হবে এবং

বার বার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাদের প্রাসঙ্গিক ও মৌলিক সূত্রগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।

এই প্রচেষ্টা ও অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষার্থী দেখতে পাবে যে অনেক নতুন নতুন তত্ত্বের সঙ্গে যে পরিচিত হচ্ছে এবং অনেক নতুন নতুন তথ্য সে শিখতে পাবছে। তার ফলে শিক্ষার্থী তার নিজের প্রচেষ্টার ফলাফলের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে। যত নতুন তথ্য সে জানবে ও শিখবে ততই তার মধ্যে আরও বেশী করে জানার ও শেখার আগ্রহ দেখা দেবে। তার লব্ধ সিদ্ধান্তগুলি থেকে তিন প্রকারের শিখন-সঞ্চালন হতে পারে, যথা—বর্তমান ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ, নতুন শেখা ধারণাগুলি থেকে সামান্য-সূত্র গঠন করা এবং বর্তমান শিখনকে পরবর্তী শিখনের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত করা।

শিখনের সার্থকতা সব শেষে নির্ভর করবে শিক্ষার্থীর মানসিক সুস্থতা, আত্মবিশ্বাস এবং স্বাস্থ্যকর মনোভাবের উপর।

নয়

মুখস্থকরণের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বা মুখস্থকরণ প্রক্রিয়ার পরিমিততা

(Effective Method of Memorising Or Economy of Memorisation)

মুখস্থ করা (Memorising) শিখন প্রক্রিয়ারই একটি বিশেষ প্রকারমাত্র। শব্দ বাক্য প্রভৃতি ভাষামূলক বিষয়বস্তুর শিখনকে মুখস্থ করা বলে। স্কুল কলেজের শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখস্থ প্রক্রিয়াটির বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে এবং কোন্ কোন্ পদ্ধতির ব্যবহারে অল্পায়াসে ও অল্প সময়ে মুখস্থ করা যায় সে সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানীরা ব্যাপক পরীক্ষণ সম্পন্ন করে নানা মূল্যবান তথ্য উপস্থাপিত করেছেন।

মুখস্থকরণও এক প্রকারের শিখন হওয়ার ফলে পূর্বগামী অধ্যায়ে বর্ণিত সার্থক শিখনের সর্তগুলিও মুখস্থকরণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। তবে দেখা গেছে যে কতকগুলি বিশেষ পদ্ধতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে মুখস্থকরণে আয়াস ও সময় দুইই কম লাগে। যে যে পদ্ধতি অবলম্বন করলে বিশেষ বিশেষ শিক্ষণীয় বস্তু মুখস্থ করতে শ্রম ও সময়ের সাশ্রয় হয় সেগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

সমগ্র পদ্ধতি এবং অংশ পদ্ধতি

(Whole Method & Part Method)

শিক্ষণীয় বস্তুটি মুখস্থ করার সময় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বার বার পড়ে সেটিকে মুখস্থ করা যায়। এই পদ্ধতিটিকে বলা হয় সমগ্র পদ্ধতি (Whole Method)। আবার ঐটিকে কয়েকটি ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিয়ে সেগুলিকে আলাদা আলাদা মুখস্থ করে পরে একসঙ্গে গ্রথিত করে সমস্ত বস্তুটি আয়ত্ত করা যায়। এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে বলা হয় অংশ পদ্ধতি (Part Method)। ব্যাপক পরীক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে ক্ষেত্রভেদে উভয় পদ্ধতিরই কার্যকারিতা আছে এবং কোন্ পদ্ধতিটি কখন প্রযোজ্য তা শিক্ষণীয় বস্তুটির প্রকৃতি ও দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে।

ক। সমগ্র পদ্ধতি (Whole Method)

সাধারণভাবে বলা চলে যে যখন বিষয়বস্তুটি অর্থপূর্ণ হয় এবং যখন তার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে সম্পর্কগত সংহতি থাকে তখন সমগ্র পদ্ধতিই প্রকৃষ্ট উপায়। গেষ্টালট মনোবিজ্ঞানীদের মতে সার্থক শিখন শিক্ষণীয় বস্তুটির অন্তর্নিহিত সম্পর্কগুলি উপলব্ধি করার উপর নির্ভর করে। অতএব যদি বস্তুটি সমগ্রভাবে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা না হয় তাহলে তার পক্ষে সেটি শেখা শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। এইজন্য আধুনিক স্কুলকলেজের শিক্ষণব্যবস্থায় সমগ্র পদ্ধতি অনুসরণ করার স্বপক্ষে সকলে মত দিয়ে থাকেন। দেখা গেছে যে যদি বিষয়বস্তুটির মৌলিক নীতিগুলি শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে সেটি শেখা তার পক্ষে খুবই সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

কিন্তু নিছক সমগ্র পদ্ধতির উপর নির্ভর করে থাকলে সব ক্ষেত্রেই শিখন পূর্ণাঙ্গ হয় না। সমগ্র পদ্ধতির সাহায্যে শেখা বিষয়বস্তুটির মূল অর্থ ভালভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব হলেও বিষয়বস্তুটির আকৃতিগত শিখন সব সময় ভালভাবে হয় না। বিশেষ করে যেখানে বিষয়বস্তু বেশ দীর্ঘ সেখানে সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা যেমন শক্ত হয়ে ওঠে, তেমনই সম্পূর্ণ বিষয়বস্তুটির সুষ্ঠু শিখনও ঘটে না। তাছাড়া অর্থহীন বিষয়বস্তু, কৌশল প্রভৃতি শিখনের ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ এক প্রকার অসম্ভব বললেই চলে। যেমন, অর্থহীন শব্দতালিকা মুখস্থ করা, সাঁতার কাটা বা টাইপ করা প্রভৃতি শিখনের ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতি কার্যকর হয় না। সেইজন্য সমগ্র পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে প্রকৃষ্ট পদ্ধতি হলেও অনেক ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

খ। অংশ পদ্ধতি (Part Method)

যখন শিখনের বিষয়টি অর্থহীন, পারস্পরিক সম্পর্কশূন্য ও বিচ্ছিন্ন বস্তুসমষ্টি হয় তখন সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা চলে না। তখন সেটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে আয়ত্ত করাই মুখস্থকরণের প্রকৃষ্ট পন্থা। যেমন, যদি অর্থহীন কতকগুলি শব্দের একটা তালিকা মুখস্থ করতে হয় তবে অংশ পদ্ধতি গ্রহণ করতেই হবে। এখানে সামগ্রিক রূপ বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যাবলী উপলব্ধির কথা ওঠে না। কারণ বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলি এখানে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কহীন। এ ক্ষেত্রে শব্দগুলি পৃথক পৃথক শেখাই একমাত্র উপায়। তাছাড়া কৌশলশিক্ষা বা দক্ষতা আহরণের ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ কেবল কার্যকরই নয়, অনেক সময় অপরিহার্যও। যেমন, টাইপ করতে শেখা, গাড়ী

চালাতে শেখা, হাতের লেখা ভাল করা, পিয়ানো বাজাতে শেখা, ইত্যাদির ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতির প্রয়োগ করা ছাড়া উপায় নেই। এই সব ক্ষেত্রে বিষয়-বস্তুটির বিভিন্ন অংশ স্বতন্ত্রভাবে শেখাই একমাত্র উপায়। অনেক দক্ষতা শিখনের ক্ষেত্রটি সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা সম্ভব হয়ই না। সেখানে প্রক্রিয়াটির বিভিন্ন অংশ পৃথকভাবে শেখা অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

গ। মধ্যগ পদ্ধতি (Mediating Method)

সমগ্র পদ্ধতি তখনই অনুসরণ করা যাবে যখন শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুটির দৈর্ঘ্য মোটামুটি আয়ত্তাধীন হবে। কিন্তু যদি শিক্ষণীয় বস্তুটি অত্যন্ত দীর্ঘ হয় তবে কেবলমাত্র সমগ্র পদ্ধতির প্রয়োগে সেটি শেখা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় আবার সে সব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অংশ পদ্ধতির উপর নির্ভর করলে শিখন কার্যকর হয় না। কারণ অংশ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুটির অর্থ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের উপলব্ধি হয় না এবং তার ফলে শিখন হয়ে দাঁড়ায় অসম্পূর্ণ, যান্ত্রিক ও শ্রমসাপেক্ষ। সেই জন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা সমগ্র ও অংশ এই দুটি পদ্ধতিকে সম্মিলিত করে একটি তৃতীয় পদ্ধতির পরিকল্পনা করেছেন।

এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে মধ্যগ পদ্ধতি। এই মধ্যগ পদ্ধতিতে প্রথমে সমগ্র পদ্ধতি দিয়ে মুখস্থকরণ সুরু করা হয় এবং পরে অংশ পদ্ধতিতে যাওয়া হয়। বিষয়বস্তুটি অতি দীর্ঘ হলে দেখা গেছে সে সমগ্র পদ্ধতির অনুসরণ করলে বস্তুটির প্রথম দিকটি এবং শেষের দিকটি ভাল করে শেখা হয় কিন্তু মাঝামাঝি স্থানগুলি অবহেলিত থেকে যায়। সেইজন্য মধ্যগ পদ্ধতিতে বিষয়বস্তুটির অন্তর্গত যে যে অংশগুলি অধিক দুরূহ বা সম্পূর্ণ নতুন বলে মনে হয় সেগুলিকে আলাদা বেছে নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে অংশ পদ্ধতির সাহায্যে শেখা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটি মূলত সমগ্র পদ্ধতিরই একটি প্রকারভেদ। তবে এর অভিনবত্ব হল যে এখানে বস্তুটির বিশেষ বিশেষ অংশ শেখার জন্য অংশ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। দীর্ঘ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি বিশেষভাবে কার্যকর।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সমস্ত অর্থপূর্ণ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে সমগ্র পদ্ধতি প্রযোজ্য, ভাষাবর্জিত ও অর্থহীন বিষয়বস্তু এবং কৌশল শিক্ষার ক্ষেত্রে অংশ পদ্ধতি কার্যকর এবং অতিদীর্ঘ বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে মধ্যগ পদ্ধতি অনুসরণীয়।

২। আবৃত্তি পদ্ধতি ও পঠন পদ্ধতি
(Recitation Method & Reading Method)

বিষয়বস্তুটি যতক্ষণ না সম্পূর্ণ আয়ত্ত হচ্ছে ততক্ষণ সেটি বার বার পড়ে শেখাকে পঠন পদ্ধতি (Reading Method) বলা হয়। আর বিষয়বস্তুটি কিছুক্ষণ পড়ার পর বই বন্ধ করে আবৃত্তি করে দেখা যে সেটি কেমন তৈরী হয়েছে এবং দরকার বোধ হলে বই খুলে নিজের ভুলগুলি নিজেই সংশোধন করে নেওয়া এবং এভাবে আবৃত্তি ও সংশোধন প্রক্রিয়ার সাহায্যে সমগ্র বস্তুটি আয়ত্ত করাকে আবৃত্তি পদ্ধতি (Recitation Method) বলা হয়। বহু পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে সাধারণ পঠন পদ্ধতি নানা কারণে অনেক বেশী কার্যকর। এতে সময় ও শ্রম দুইই অপেক্ষাকৃত কম লাগে। পঠন পদ্ধতির তুলনায় আবৃত্তি পদ্ধতির এই উৎকর্ষের কারণগুলি হল—

(ক) কোথায় কোথায় শিখন দুর্বল হচ্ছে তা শেখার সময় জানা যায় এবং সেজন্য সেগুলির উপর বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া যায়।

(খ) ভুল শেখাগুলি স্থায়ীভাবে দৃঢ়বদ্ধ হবার আগেই সেগুলির সংশোধন করা যায়।

(গ) শিখনের প্রতি পদে নিজের অগ্রগতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান পাওয়া যায়। তার ফলে শিখনে উৎসাহ ও আগ্রহ বাড়ে।

(ঘ) আবৃত্তির মাধ্যমে শেখার ফলে বস্তুটির শিখন ও প্রয়োগ দুইই একসঙ্গে সম্পন্ন হয় এবং ভবিষ্যতে লব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগের সময় কোনরূপ অসুবিধা হয় না।

পরীক্ষণের ফলে দেখা গেছে যে অর্থপূর্ণ এবং অর্থহীন উভয় প্রকার বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেই আবৃত্তি পদ্ধতি সাধারণ পঠন পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক কার্যকর।

৩। স-বিরাম পদ্ধতি ও অ-বিরাম পদ্ধতি
(Distributed or Spaced Methed & Undistributed or Massed Method)

শিক্ষণীয় বস্তুটি আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম একটানা পড়ে এবং মাঝে কোনরূপ বিরতি না দিয়ে শিক্ষার্থী সেটি আয়ত্ত করতে পারে। একে অ-বিরাম পদ্ধতি (Undistributed or Massed Method) বলা হয়। আবার কিছুক্ষণ একটানা পড়ে তারপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে, আবার কিছুক্ষণ পড়ে আবার

কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে এভাবে শিখে শিক্ষার্থী বস্তুটি আয়ত্ত করতে পারে। এই পদ্ধতিটিকে স-বিরাম পদ্ধতি (Distributed or Spaced Method) বলা হয়ে থাকে।

বহু পরীক্ষণ থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে স-বিরাম পদ্ধতি অ-বিরাম পদ্ধতির চেয়ে অনেক কার্যকর। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক একটি কবিতা এক-টানা পড়ে অর্থাৎ অ-বিরাম পদ্ধতিতে মুখস্থ করতে ১ ঘণ্টা সময় লাগলো। এখন যদি ১৫ মিনিট পড়ে, তারপর ৫ মিনিট বিশ্রাম করে, আবার ১৫ মিনিট পড়ে আবার ৫ মিনিট বিশ্রাম করে—এভাবে মাঝে মাঝে অল্প বিরতি দিয়ে কবিতাটি শেখা যায় তবে দেখা যাবে যে অ-বিরাম পদ্ধতিতে পড়ার মোট সময় ও পরিশ্রমের চেয়ে স-বিরাম পদ্ধতির ক্ষেত্রে সময় ও পরিশ্রম দুইই কম লেগেছে।

অ-বিরাম পদ্ধতির সঙ্গে তুলনায় স-বিরাম পদ্ধতির উৎকর্ষের কারণ হল যে এই পদ্ধতিতে শিখন কাজটির মাঝে মাঝে বিরতি দেওয়ার জন্য পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ[১] কম হয় এবং তার ফলে সংরক্ষণ দ্রুত ও স্থায়ী হয়। কিন্তু অ-বিরাম পদ্ধতিতে শিখনের মাঝে কোনরূপ ছেদ বা বিরতি না থাকার জন্য পশ্চাদ্মুখী প্রতিরোধ প্রবল হয়ে ওঠে এবং দ্রুত ও স্থায়ী সংরক্ষণে বাধার সৃষ্টি হয়। এই জন্য স-বিরাম পদ্ধতিতে শিখলে অ-বিরাম পদ্ধতির চেয়ে ভাল ও দ্রুত ফল পাওয়া যায়।

৪। *অতি-শিখন* (Over-learning)

সংরক্ষণকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে অর্থাৎ শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি বহুদিন মনে রাখার দরকার পড়ে তবে অতি-শিখন আবশ্যক। বিষয়বস্তুটি আয়ত্ত হয়ে যাবার পরও যদি সেটি আরও কিছুক্ষণ শিখে যাওয়া যায় তবে তাকে অতি-শিখন বলে। অতি-শিখন করা বিষয়বস্তু সহজে ভোলা যায় না এবং পরে সেটি যান্ত্রিক স্মৃতির রূপ নেয়। যেমন, ব্যক্তির নিজের নাম বা যে সহরে বা রাস্তায় সে বাস করে তার নাম, নিজের নিকট আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের নাম প্রভৃতির অতি-শিখন হয় বলে ব্যক্তি কখনও এগুলি ভোলে না।

৫। *অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতি* (Insightful Method)

শিখনের এই পদ্ধতিটি গেষ্টাল্ট মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শিক্ষণীয় বস্তুটির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ এবং তার সামগ্রিক রূপটি যদি উপলব্ধি করা যায় তাহলে শিখন দ্রুত ও স্থায়ীভাবে সংঘটিত হয়। এই পদ্ধতিটিকে গেষ্টাল্ট মতবাদের অনুসরণে

১। পৃঃ ১৩২ (প্রথম খণ্ড)

অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতি বলা যায়। আর যদি যান্ত্রিক পন্থায় উদ্দেশ্যবিহীন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শেখার চেষ্টা করা হয় তবে সে শিখন আয়াসবহুল ও বিলম্বিত হয়। যেমন, কোহ্লারের শিখনের উপর পরীক্ষণে শিম্পাঞ্জীটি অন্তর্দৃষ্টিমূলক পদ্ধতিতে শিখতে পেরেছিল বলে তার শিখন দ্রুত ও স্থায়ী হয়েছিল। কিন্তু থর্নডাইকের পরীক্ষণে বিড়ালটির শিখন যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংঘটিত হওয়ায় তার শিখন বিলম্বিত ও শ্রমসাপেক্ষ হয়েছিল।[১]

৬। ছন্দ ও সুর

ছন্দ ও সুরের মাধ্যমে কোন কিছু মুখস্থ করলে শিখন দ্রুত ও স্থায়ী হয়। এইজন্য গদ্যের চেয়ে কবিতা অনেক দ্রুত ও আরও ভালভাবে মুখস্থ হয়। এমন কি অর্থহীন বস্তুর সুর বা ছন্দের মধ্যে দিয়ে সহজে ও অবিলম্বে শেখা যায়। যেমন, সুর করে নামতা মুখস্থ করার প্রথা প্রাচীনকাল থেকে সব দেশেই প্রচলিত। শিশু-বিদ্যালয়ে কবিতার মধ্যে দিয়ে বর্ণ-পরিচয় শেখানর প্রথাও একপ্রকার সর্বজনীন।

৭। স্মৃতি-সহায়ক কৌশলাদি (Mnemonic Devices)

সময় সময় কোন প্রতীক, চিহ্ন, শব্দ বা সংখ্যার সাহায্যে বিশেষ একটি বিষয়বস্তু মনে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে। এগুলিকে স্মৃতি-সহায়ক কৌশল (Mnemonic Devices) বলা হয়। যখন আমাদের কোন সংখ্যার লম্বা সারি মনে রাখতে হয় তখন আমরা মনে রাখার সুবিধার জন্য সংখ্যাগুলির মধ্যে নানা রকম কৃত্রিম সম্বন্ধের কল্পনা করে নিই। অনেক সময় শিক্ষণীয় শব্দ, অক্ষর, সংখ্যা প্রভৃতির সঙ্গে বাইরের বা অপ্রাসঙ্গিক কোন বস্তুর কৃত্রিম অনুষঙ্গ (Association) রচনা করে নিয়ে সেগুলি আমরা মনে রাখার চেষ্টা করি। ইতিহাসের তারিখ, টেলিফোন বা বাড়ির নম্বর এ সকল মনে রাখার জন্য আমরা প্রায়ই এই ধরনের কৃত্রিম কৌশলের সাহায্য নিয়ে থাকি।

এই ধরনের কৌশলগুলি সময় সময় স্মৃতির সহায়ক হলেও প্রায়ই এত জটিল ও কষ্টকল্পিত হয়ে ওঠে যে স্মৃতির সাহায্য করা দূরে থাকুক, এগুলি তখন সহজ এবং স্বাভাবিক সংরক্ষণের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

১। পৃঃ ১১৬   ২। পৃঃ ১১৭

শিখনের সঞ্চালন (Transfer of Training)

শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটি বহু প্রাচীন কাল থেকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে অতি-গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। মধ্যযুগ পর্যন্ত সকল দেশেই এই তত্ত্বটির উপর ভিত্তি করেই পাঠক্রম রচনা করা হত। শিখন সঞ্চালনের এই তত্ত্বটির বিস্তারিত আলোচনা করার আগে আমাদের আরও দু'টি প্রাচীন মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। সে দুটি হল—মানসিক শক্তিবাদ (Faculty Psychology) এবং মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব (Theory of Formal Discipline or Mental Discipline)। এ দুটি মতবাদই আধুনিক মনোবিজ্ঞানে ভুল বলে পরিত্যক্ত হয়েছে।

মানসিক শক্তিবাদ (Faculty Psychology)

এই মতবাদ অনুযায়ী আমাদের মন কতকগুলি বিভিন্নধর্মী শক্তি দিয়ে গঠিত। সেই শক্তিগুলি হল স্মৃতি, বিচারকরণ, অনুমান, ইচ্ছা, কল্পনা, বুদ্ধি ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকটি মনের মধ্যে স্বতন্ত্রভাবে ও নিজের নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে এবং আমরা যে সব বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করি সেগুলি এই শক্তিগুলিরই সাহায্যে করে থাকি। এই শক্তিগুলির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে অনুশীলন বা চর্চার দ্বারা এগুলিকে অধিকতর শক্তিশালী করে তোলা যায় এবং অনুশীলন বা চর্চার অভাবে এগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে এই শক্তিবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। তার প্রধান কারণ হল যে এই মতবাদে যেগুলিকে শক্তি বলে বর্ণনা করা হয়েছে তার অনেকগুলিই সত্যকারের শক্তি নয় : সেগুলি হয় মানসিক প্রক্রিয়া, নয় অন্য কোনও ধরনের মানসিক বৈশিষ্ট্য। যেমন চিন্তন, অনুমানকরণ, কল্পন ইত্যাদি হল বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক প্রক্রিয়া মাত্র। তা ছাড়া মনের মধ্যে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন ও সুনির্দিষ্ট স্বতন্ত্র সত্তাসম্পন্ন কোন শক্তি নেই। মনের যে সকল শক্তি আছে সেগুলির অধিকাংশই জটিল ও মিশ্রপ্রকৃতির। আধুনিক ফ্যাক্টরবাদী মনোবিজ্ঞানীরা অনেকটা প্রাচীন শক্তিবাদীদের মতই মনের অনেকগুলি ফ্যাক্টর বা উপাদানের কল্পনা করেছেন এবং সেদিক দিয়ে তাঁদের ব্যাখ্যার সঙ্গে প্রাচীনপন্থী মানসিক শক্তিবাদীদের বেশ কিছুটা মিল দেখা যায়। কিন্তু সে মিল

নিতান্তই বাহ্যিক। প্রকৃতপক্ষে মৌলিক প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের শক্তি বা ফ্যাকালটির সঙ্গে আধুনিক ফ্যাক্টরের প্রচুর পার্থক্য আছে।

মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব

(Theory of Formal Discipline or Mental Discipline)

প্রাচীনকালে এই মানসিক শক্তিবাদ থেকেই পরে জন্মলাভ করেছিল 'মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব' নামে আর একটি প্রসিদ্ধ মতবাদ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী স্মৃতি, মনোযোগ, বিচারকরণ, প্রত্যক্ষণ প্রভৃতি মনের বিভিন্ন শক্তিগুলি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের পাঠের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন, গণিতের চর্চায় বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে, তর্কবিদ্যা পড়লে বিচারশক্তি বাড়ে, ব্যাকরণ পড়লে স্মৃতিশক্তি তীক্ষ্ণ হয়, সাহিত্য চর্চা করলে সৌন্দর্যবোধ পুষ্ট হয় ইত্যাদি। প্লেটো থেকে সুরু করে উনবিংশ শতকের অনেক শিক্ষাবিদ্ই মনে করতেন যে বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের এইভাবে মনের বিশেষ বিশেষ শক্তিকে অধিকতর উন্নত বা শক্তিশালী করার ক্ষমতা আছে এবং এই যুক্তির উপর নির্ভর করেই আবহমানকাল ধরে বিভিন্ন দেশের পাঠক্রমে বহু অপ্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার প্রথা প্রচলিত হয়ে এসেছে। কিন্তু শক্তিবাদের অসারতা প্রমাণিত হওয়া থেকেই মানসিক শৃঙ্খলার সূত্রটিও পরিত্যক্ত হয়েছে।

শিখন সঞ্চালনের তত্ত্ব (Theory of Transfer of Training)

মানসিক শৃঙ্খলার সহগামীরূপে 'শিখন সঞ্চালনের' তত্ত্বটি দেখা দেয়। এই তত্ত্বটির মূল বক্তব্য হল যে পূর্ববর্তী শিখন পরিস্থিতি থেকে পরবর্তী শিখন পরিস্থিতিতে শিখন সঞ্চালিত হয়ে থাকে। যেমন, এক ব্যক্তি প্রথমে 'ক' বিষয়বস্তুটি শিখল, তারপর 'খ' বিষয়বস্তুটি শিখল। এখন শিখন সঞ্চালনের তত্ত্ব অনুযায়ী 'খ' বিষয়বস্তুটির শিখনে 'ক' বিষয়বস্তুটির শিখন কিছুটা সঞ্চালিত হবে। অর্থাৎ 'ক' বিষয়বস্তুর শিখন 'খ' বিষয়বস্তুর শিখনকে কিছুটা প্রভাবিত করবে। এই প্রভাবিত করা আবার প্রকৃতিতে দু'রকম হতে পারে। যদি প্রথম বিষয়বস্তুর শিখন দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর শিখনকে সাহায্য করে তাহলে তাকে অস্তিবাচক সঞ্চালন (Positive Transfer) বলা হয় আর যদি প্রথম বিষয়বস্তুর শিখন দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর শিখনে বাধার সৃষ্টি করে তাহলে তাকে নেতিবাচক সঞ্চালন (Negative Transfer) বলা হয়। আবার যদি প্রথম বিষয়

বস্তুর শিখন দ্বিতীয় বিষয়বস্তুর শিখনকে সাহায্য বা প্রতিরোধ কিছুই না করে তাহলে তাকে শূন্য বা অনির্দিষ্ট সঞ্চালন (Nil or Indefinite Transfer) বলা হয়।

মনে করা যাক একজন শিক্ষার্থী প্রথমে একটি ইংরাজী কবিতা শিখল। তারপর সে শিখল একটি বাংলা কবিতা। এখন যদি ইংরাজী কবিতার শিখন তার বাংলা কবিতার শিখনকে সাহায্য করে বা সহজ করে তোলে তাহলে বুঝতে হবে যে এখানে অস্তিবাচক সঞ্চালন হয়েছে। কিন্তু যদি ইংরাজী কবিতার শিখন তার বাংলা কবিতার শিখনকে কঠিন করে তোলে তাহলে বুঝতে হবে তার নেতিমূলক সঞ্চালন হয়েছে। আর যদি প্রথম কবিতার শিখন তার দ্বিতীয় কবিতার শিখনকে সাহায্য বা প্রতিরোধ কিছুই না করে তাহলে বুঝতে হবে যে শিক্ষার্থীর কোন সঞ্চালন হয় নি বা অনির্দিষ্ট সঞ্চালন হয়েছে।

বর্তমানে নানা গবেষণার ফলে মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটি সরাসরি পরিত্যক্ত হলেও শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটি কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়নি। প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীরা অবশ্য বিশ্বাস করতেন যে শিখনের সঞ্চালন একটি সর্বজনীন ঘটনা এবং সর্বক্ষেত্রেই সমানভাবে ঘটে থাকে, কিন্তু বর্তমানে ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিখন সঞ্চালন সর্বজনীন ঘটনা নয় এবং সব ক্ষেত্রে সমানভাবে ঘটে না। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ সর্তাধীনে এক পরিস্থিতি থেকে অপর পরিস্থিতিতে যে বিভিন্ন মাত্রায় শিখনের সঞ্চালন ঘটে থাকে একথা আজ প্রমাণিত হয়েছে।

শিখন সঞ্চালনের উপর গবেষণা

মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্ব ও শিখন সঞ্চালন নিয়ে প্রথম পরীক্ষণ করেন প্রসিদ্ধ আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস। তাঁর পরীক্ষণটি শিখন সঞ্চালনের ক্ষেত্রে আদর্শ পরীক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি প্রথমে ভিক্টর হিউগোর লেখা 'স্যাটির' কাব্য থেকে ১৫৮টি লাইন মুখস্থ করে নিজের মুখস্থ করার ক্ষমতা অর্থাৎ কত সময়ে তিনি কতটা মুখস্থ করতে পারেন তার একটি মান নির্ধারিত করেন। তারপর তিনি প্রতিদিন ২০ মিনিট করে মিলটনের 'প্যারাডাইস লষ্ট' থেকে শিখে ৩৮ দিন ধরে তাঁর মুখস্থ ক্ষমতার চর্চা করেন। তারপর তিনি আবার 'স্যাটির' থেকে আগের অংশের পরবর্তী ১৫৮টি লাইন মুখস্থ করে দেখেন যে তাঁর মুখস্থকরণের ক্ষমতার কোন উন্নতি হয়েছে কিনা। কিন্তু দেখা গেল যে এই পরের ১৫৮টি লাইন মুখস্থ করতে তাঁর প্রথম বারের চেয়ে বেশী সময়ই লেগেছে।

জেমস আরও চারজন ভদ্রলোককে দিয়ে ঐ একই পরীক্ষাটি স্বতন্ত্রভাবে করান এবং ঐভাবে পরীক্ষণ করে তাঁরাও ঐ একই সিদ্ধান্তে উপনীত হন।

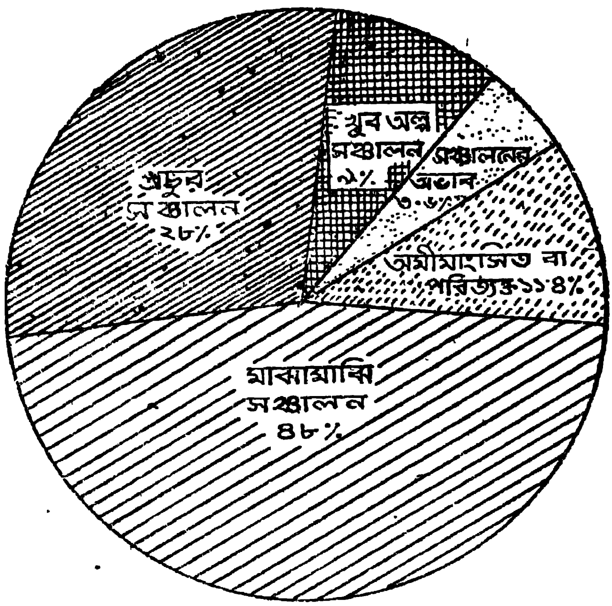
জেমসের এই পরীক্ষণ থেকে দুটি বস্তু প্রমাণিত হয়। প্রথমত, প্রাচীন ও বহুল প্রচলিত মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটি সম্পূর্ণ ভুল। মুখস্থ করার চর্চা করলে যে মুখস্থ শক্তি বাড়ে, মানসিক শৃঙ্খলায় এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত হল। দেখা গেল যে জেমস ৩৮ দিন ধরে মুখস্থ বিদ্যার চর্চা করা সত্ত্বেও তাঁর মুখস্থ করার শক্তি একটুও বাড়েনি, বরং কমে গেছে। বস্তুত, উইলিয়ম জেমসের এই পরীক্ষণটি মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটিকে শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত করে। জেমসের পরে আরও অনেকে অনুরূপ পরীক্ষণ করে প্রমাণ করেছেন যে মানসিক তত্ত্বটির কোন বাস্তবতা নেই।

দ্বিতীয়ত, জেমসের পরীক্ষণ শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটিরও বিরুদ্ধে যায়। তাঁর পরীক্ষণ থেকে এটাও প্রমাণিত হচ্ছে যে এক শিখন পরিস্থিতি থেকে আর এক শিখন পরিস্থিতিতে কোন সঞ্চালন হয় না। জেমসের ক্ষেত্রে প্রথম ১৫৮ লাইনের শিখন থেকে দ্বিতীয় ১৫৮ লাইনে শিখনের কোন সঞ্চালন ঘটে নি। কেননা দ্বিতীয় বারে প্রথম বারের চেয়ে সময় বেশীই লেগেছিল। এক কথায় শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটিও ভুল বা এক ক্ষেত্র থেকে অপর ক্ষেত্রে শিখন সঞ্চালিত হয় না।

কিন্তু জেমসের পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা শিখন সঞ্চালনের তত্ত্বটি একেবারে অবাস্তব বলে বাতিল করে দেন নি। গত ৫০ বৎসরে এই তত্ত্বটির উপর প্রায় ২০০টির উপর পরীক্ষণ সম্পাদিত হয়েছে এবং তা থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির, এমন কি পরস্পরবিরোধী বহু তথ্য মনোবিজ্ঞানীদের হস্তগত হয়েছে। এই সকল তথ্য পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে শিখনের সঞ্চালন প্রকৃতি ও পরিমাপের দিক দিয়ে নানা রকমের হতে পারে। পরিমাণের দিক দিয়ে সঞ্চালন হতে পারে তিন রকম—প্রচুর, মাঝামাঝি এবং অল্প। প্রকৃতির দিক দিয়ে তেমনই সঞ্চালন হতে পারে তিন রকম—অস্তিমূলক (Positive), নেতিমূলক (Negative) এবং শূন্য বা অনির্দিষ্ট (Nil or Indefinite)।

১৮৯০ সাল থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত শিখন-সঞ্চালনের উপর বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীরা যে সব বিভিন্ন পরীক্ষণ সম্পন্ন করেন সেগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী ওরাটা (Orata) তৈরী করেন। এই বিবরণী থেকে জানা যায় যে এই পরীক্ষণগুলির মধ্যে প্রচুর শিখন সঞ্চালন হয়েছে শতকরা ২৮টি ক্ষেত্রে, মাঝামাঝি সঞ্চালন হয়েছে শতকরা ৪৮টি ক্ষেত্রে, খুব অল্প সঞ্চালন হয়েছে শতকরা ৯টি

ক্ষেত্রে, নেতিমূলক সঞ্চালন বা সঞ্চালনের অভাব ঘটেছে শতকরা ৩'৬ ক্ষেত্রে এবং বাকী শতকরা ১১'৪টি ক্ষেত্রে সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা



[ওয়াটা কর্তৃক সংগৃহীত শিখন-সঞ্চালনের পরীক্ষণগুলির চিত্র-বিবরণ]

সম্ভব হয় নি। অতএব দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষণের ফলাফল থেকে বিচার করলে কোন কোন ক্ষেত্রে যে অস্তিবাচক শিখন সঞ্চালন হয় সেটা স্বীকার করতেই হবে, যদিও প্রকৃতি ও পরিমাণের দিক দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঞ্চালনের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য থাকতে পারে।

স্কুল-পাঠ্যবিষয়ে সঞ্চালন (Transfer in School-Subjects)

স্কুল-পাঠ্য বিষয়গুলিতে কি পরিমাণে সঞ্চালন হয় এ নিয়ে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। স্কুলের পাঠক্রমে অনেক বিষয়বস্তু পূর্বে অন্তর্ভুক্ত করা হত যেগুলির স্বপক্ষে একমাত্র যুক্তি ছিল যে সেগুলির শিখন সঞ্চালনের মাধ্যমরূপে কাজ করার শক্তি আছে। স্কুল-পাঠ্য বিষয়গুলিতে কি ধরনের সঞ্চালন হয় তার উপর গবেষণা থেকে পাওয়া কয়েকটি সিদ্ধান্ত নীচে দেওয়া হল।

পূর্বে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরে ব্যাকরণ পাঠের একটা বিরাট মূল্য দেওয়া হত এবং দাবী করা হত যে মানসিক শৃঙ্খলাসৃষ্টিতে ব্যাকরণের প্রচুর ক্ষমতা আছে। কিন্তু ব্রিগসের (Briggs) শিখন সঞ্চালনের উপর পরীক্ষণ থেকে দেখা যায় যে

একমাত্র সাদৃশ্য ও বৈষম্য ধরতে পারার ক্ষমতা ছাড়া আর অন্য কোন গুণ ব্যাকরণ পাঠ থেকে সঞ্চালিত হয় না। অর্থাৎ ব্যাকরণ পাঠের সঞ্চালন ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ।

গণিতের শিক্ষা থেকে গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা সঞ্চালিত হয় এই ছিল এতদিনের প্রচলিত ধারণা। উইঞ্চের (Winch) পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে গাণিতিক বিচারকরণের ক্ষমতা কেবল গণিত শিক্ষার উপর নির্ভরশীল নয় অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা থেকেও পাওয়া যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে সঞ্চালন অনির্দিষ্ট প্রকৃতির।

মাধ্যমিক পাঠস্তরে মানসিক যোগ্যতার বৃদ্ধির উপর বিভিন্ন স্কুল-বিষয়গুলির অধ্যয়নের কোনরূপ সঞ্চালনমূলক প্রভাব আছে কিনা এ নিয়েও প্রচুর পরীক্ষণ হয়েছে। দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীর মানসিক যোগ্যতার বৃদ্ধিতে স্কুল-পাঠ্য বিষয়গুলির বিশেষ কোন প্রভাব নেই, সত্যকারের যার প্রভাব আছে সেটি হল শিক্ষার্থীর বুদ্ধির।

মাধ্যমিক পাঠস্তরে গণিত, বিজ্ঞান, প্রভৃতির ক্ষেত্রে অবশ্য প্রচুর অস্তিবাচক সঞ্চালনের প্রমাণ পাওয়া গেছে। তবে এই সব সঞ্চালন কেবলমাত্র ঐ বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে, অন্য কোন বিষয়ে সঞ্চালিত হয় না।

থর্নডাইক স্কুলে ল্যাটিন শিক্ষার কোনরূপ সঞ্চালন-মূল্য আছে কি না তা দেখার জন্য ব্যাপক পরীক্ষণ চালান। তাঁর পরীক্ষণের ফল থেকে দেখা গেছে যে শিখন-সঞ্চালনের দিক দিয়ে ল্যাটিন শিক্ষার যথার্থই দাম আছে। যে-সব শিক্ষার্থী ল্যাটিন শিখেছে তারা, যে সব শিক্ষার্থী ল্যাটিন শেখেনি তাদের চেয়ে অনেক দিক দিয়ে বেশী উন্নত হয়। যেমন, তারা ল্যাটিন ভাষা-প্রসূত ইংরাজী শব্দের বানান ভাল পারে ইত্যাদি। তবে এই সঞ্চালন প্রথম দু-এক বৎসর থাকে। পরে দেখা যায় যে ল্যাটিন-জানা ও ল্যাটিন না-জানা উভয় প্রকার শিক্ষার্থীই প্রায় সব বিষয়েই সমান পারদর্শী হয়ে উঠেছে। এই পরীক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি সংস্কৃত-ভিত্তিক ভাষাগুলির শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষা শেখার উল্লেখযোগ্য সঞ্চালন মূল্য থাকবে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে শিখন-সঞ্চালন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সত্যই ঘটে থাকে। তবে এ থেকে এ সিদ্ধান্ত যেন না করা হয় যে এটি একটি সর্বজনীন ঘটনা। কেননা শিখন-সঞ্চালন বাস্তবিক ঘটলেও দেখা গেছে সঞ্চালনের পরিমাণ প্রায় ০% থেকে সুরু করে ৯২.৯% পর্যন্ত হতে পারে। আবার অনেক ক্ষেত্রে নেতিমূলক সঞ্চালনও হয়ে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটিকে কোনক্রমেই বাস্তব ঘটনারূপে গ্রহণ করা যায় না। তবে শিখন সঞ্চালন যে একটি বাস্তব ঘটনা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শিখন সঞ্চালনের বিভিন্ন তত্ত্ব

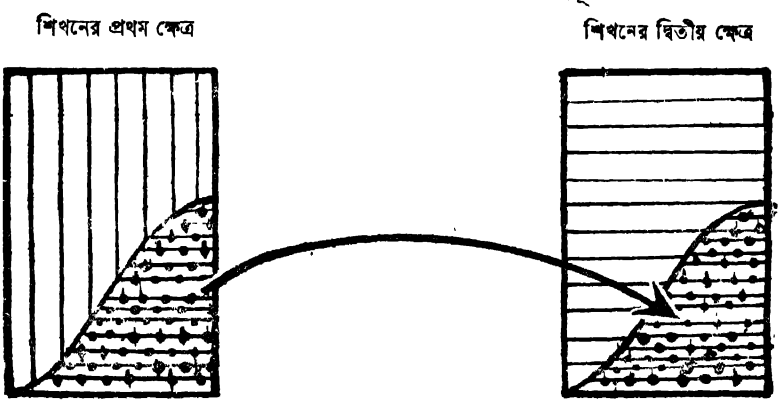
(Theories of Transfer of Training)

শিখন-সঞ্চালন কেন ঘটে এ নিয়ে প্রচুর পরীক্ষণ চালান হয়েছে এবং সঞ্চালনের ব্যাখ্যারূপে আমরা তিনটি প্রধান তত্ত্বের সন্ধান পাই। সেগুলি হল— ১। অভিন্ন উপাদানের তত্ত্ব, ২। সামান্যীকরণের তত্ত্ব এবং ৩। অভিস্থাপনের তত্ত্ব বা গেষ্টাল্ট তত্ত্ব।

১। অভিন্ন উপাদানের তত্ত্ব

(Theory of Identical Elements)

এই তত্ত্বটি থর্নডাইকের দেওয়া। তাঁর মতে একটি মানসিক প্রক্রিয়া আর একটি মানসিক প্রক্রিয়াকে ততটুকু প্রভাবিত করতে পারে যতটুকু অভিন্ন উপাদান এ দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকে। অর্থাৎ পূর্বগামী শিখন পরিস্থিতি এবং অনুগামী শিখন পরিস্থিতি এ'দুয়ের মধ্যে যে যে ব্যাপার বা অংশটুকু অভিন্ন সেই ব্যাপারটিই বা অংশটুকুরই পূর্বগামী পরিস্থিতি থেকে অনুগামী পরিস্থিতিতে সঞ্চালন ঘটবে। থর্নডাইক সঞ্চালন প্রক্রিয়াটির একটি শরীরতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যাও দেন।



[থর্নডাইকের 'অভিন্ন তত্ত্বের' চিত্ররূপ। দুটি শিখন ক্ষেত্রের কেবলমাত্র অভিন্ন অংশটুকুরই সঞ্চালন হয়েছে।]

তাঁর মতে শিখন ঘটার সময় দুটি ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে যতটুকু এক এবং অভিন্ন স্নায়ুমূলক সংযোজন সংঘটিত হয় ততটুকুই শিখন-সঞ্চালন ঘটে থাকে। থর্নডাইকের

এই অভিন্ন উপাদান তত্ত্বের সমর্থকদের মতে শিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, মনোভাব, এমন কি উদ্দেশ্যের অভিন্নতা থাকলেও এক পরিস্থিতি থেকে আর এক পরিস্থিতিতে সঞ্চালন ঘটবে।

অভিন্ন উপাদানের সঞ্চালনের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মনে করা যাক একটি ছেলে নীচের গুণ অঙ্কটি প্রথমে কষল।

৩৪৮৯৩৭৭৫৪ X ৪২৬৯

তারপর তাকে আর একটি গুণ অঙ্ক কষতে দেওয়া হল।

৭৬০৯৩৭৩১৪ X ৯০৬৯৫

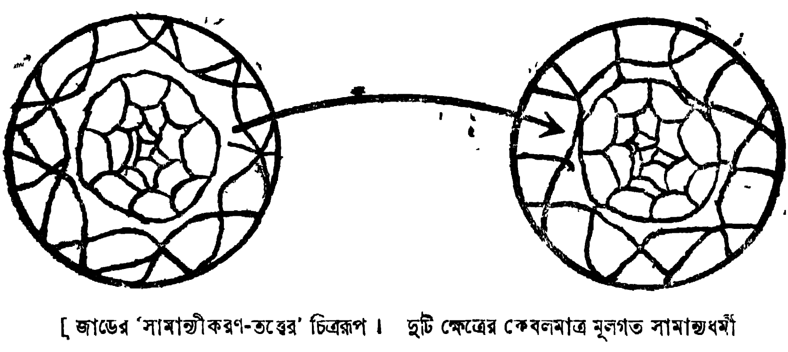
এখন এই দুটি অঙ্ক পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে দুটি অঙ্কেই নীচের অংশটি অভিন্ন আছে। যথা—

৯৩৭ X ৬৯

ফলে প্রথম অঙ্কটি কষার পর দ্বিতীয় অঙ্কটি কষার সময় শিক্ষার্থীর ঐ বিশেষ অভিন্ন অংশটির ক্ষেত্রে সঞ্চালন হবে। অন্যান্য অংশের ক্ষেত্রে কোনও সঞ্চালন ঘটবে না। অর্থাৎ দ্বিতীয় অঙ্কটিতে ঐ অংশটি কষার সময় তার পূর্বের শিখন তাকে সাহায্য করবে এবং তার কাজ সহজসাধ্য ও দ্রুত হয়ে উঠবে।

২। সামান্যীকরণের তত্ত্ব (Theory of Generalisation)

থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদান তত্ত্বটির সমালোচনা করে জাড (Judd) বলেন যে উপাদানের অভিন্নতার জন্য শিখনের সঞ্চালন হয় না। প্রকৃতপক্ষে



[জাডের 'সামান্যীকরণ-তত্ত্বের' চিত্ররূপ। দুটি ক্ষেত্রের কেবলমাত্র মূলগত সামান্যধর্মী সূত্রগুলির সঞ্চালন হয়েছে।]

সঞ্চালন নির্ভর করে ব্যক্তি নিজে তার অভিজ্ঞতার কতটা সামান্যীকরণ করতে পারল তার উপর। অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের অর্থ হল ব্যক্তির বিভিন্ন অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে থেকে অবাস্তব বৈশিষ্ট্যগুলি বাদ দিয়ে সেগুলির

অন্তর্নিহিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি পৃথক করে নিয়ে সেগুলি সম্বন্ধে একটি সামান্য ধারণা গঠন করা। তাঁর মতে যে যত বেশী তার অভিজ্ঞতা থেকে এই রকম সামান্য ধারণা বা সূত্র গঠন করতে পারে তার ক্ষেত্রে তত বেশী সঞ্চালন হয়ে থাকে।

জাডের এই মতবাদের সমর্থনে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের (১৯০৮) উল্লেখ করা যায়। এই পরীক্ষণে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর ছ'দল ছেলেকে (একটি পরীক্ষণ-মূলক দল আর একটি নিয়ন্ত্রিত দল)[১] জলের ১২ ইঞ্চি নীচে রাখা একটা লক্ষ্যের (Target) প্রতি তীর ছুঁড়তে বলা হয়। জলের নীচে কোন বস্তু রাখলে আলোর প্রতিসরণের (Refraction) জন্য বস্তুটি ঠিক যে জায়গায় অবস্থিত সেখানে দেখা যায় না। সেখান থেকে একটু দূরে অবস্থিত বলে মনে হয়। আলোর প্রতিসরণের এই রহস্যটুকু জানা না থাকার জন্য ঐ দু'দল ছেলেই লক্ষ্য-ভেদে একই প্রকারের ভুল করল। এর পর পরীক্ষণমূলক দলটিকে আলাদা করে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রতিসরণের মূলতত্ত্বটি তাদের কাছে বর্ণনা করা হল। নিয়ন্ত্রিত দলটিকে এ সম্বন্ধে কিছুই বলা হল না। তারপর এই দু'দলকেই আবার ঐ ভাবে জলের ৪ ইঞ্চি তলায় রাখা আর একটি লক্ষ্যে ঐ একইভাবে তীর ছুঁড়তে বলা হল। দেখা গেল যে পরীক্ষণমূলক দলটি, অর্থাৎ যারা প্রতি-সরণের রহস্য সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছে, তারা প্রথম বার অপেক্ষা লক্ষ্যভেদে অনেক কম ভুল করল, অথচ নিয়ন্ত্রিত দলটি অর্থাৎ যারা প্রতিসরণ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান অর্জন করতে পারে নি তারা আগের বারের মতই প্রচুর ভুল করল। হেনড্রিকসন ও শ্রোভার (১৯৪১) জাডের ঐ একই পরীক্ষণ অষ্টম শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের উপর প্রয়োগ করে অনুরূপ ফল পান।

এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে প্রথম দলটির ক্ষেত্রে প্রচুর সঞ্চালন হয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রে কোনরূপ সঞ্চালনই হয়নি। জাডের মতে প্রথম দলটির এই সাফল্যের মূল কারণ হল যে প্রতিসরণের মূলনীতিটি তাদের জানা থাকার জন্য তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিসরণ সম্বন্ধে একটি সামান্য ধারণা বা সূত্র গঠন করতে পেরেছিল এবং তার ফলে তারা লক্ষ্যভেদে অনেক কম ভুল করেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় দলটির প্রতিসরণ সম্বন্ধে কোন ধারণা না থাকায় তারা সমস্যাটি সম্বন্ধে কোন অন্তর্নিহিত সূত্র গঠন করার সুযোগ পায়নি এবং তার ফলেই তারা প্রচুর ভুল করেছিল। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে যেখানে ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতা থেকে সামান্য সূত্র গঠনে সমর্থ হয় সেখানেই সঞ্চালন হয়।

১। পৃঃ ২৫ (প্রথম খণ্ড)

জাডের এই পরীক্ষায় থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদানের তত্ত্বটি অসার বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা এখানে দু'দল ছেলের ক্ষেত্রেই প্রথমবারের লক্ষ্যভেদ ও দ্বিতীয়বারের লক্ষ্যভেদ এই দুই শিখন পরিস্থিতির মধ্যে উপাদানের প্রচুর অভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রে কোনরূপ সঞ্চালন হয়নি, অথচ প্রথম দলটির ক্ষেত্রে প্রচুর সঞ্চালন হয়েছে। উপাদানের অভিন্নতা যদি সঞ্চালনের কারণ হত তাহলে দ্বিতীয় দলটির ক্ষেত্রেও সঞ্চালন হত। তার কারণ দুটি ক্ষেত্রেই অভিন্ন উপাদান প্রচুর পরিমাণে বর্তমান। অতএব প্রথম দলটির ক্ষেত্রে যে সঞ্চালন হয়েছিল তার কারণ দুটি পরিস্থিতির মধ্যে উপাদানের অভিন্নতা নয়, প্রথম পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা থেকে দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে সামান্য সূত্র গঠন বা সামান্যীকরণই প্রকৃত কারণ।

৩। অভিস্থাপন তত্ত্ব বা গেষ্টাল্ট মতবাদ (Transposition Theory or Gestalt Theory)

গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীরা তাঁদের সমগ্রতা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে শিখন সঞ্চালনের একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এটিকে অভিস্থাপন তত্ত্ব বলেই বর্ণনা করা হয়।

তাঁদের মতবাদ অনুযায়ী আমাদের অভিজ্ঞতার কোন বিষয়বস্তুই তার অংশগুলির নিছক সমষ্টি নয়, তাদের সমষ্টির উপরেও আরও কিছু এবং সেই অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্যটি তার বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে যোগ করে বা বিশ্লেষণ করে পাওয়া যাবে না। কোন কিছু শেখার অর্থ হল অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে বস্তুটির এই অন্তর্নিহিত সমগ্র রূপটিকে উপলব্ধি করা এবং এভাবে যে শিখন ঘটে সে শিখনই সত্যকারের শিখন। এই ধরনের শিখনের ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক এবং স্থায়ী সঞ্চালন ঘটে থাকে। গেষ্টাল্টবাদীরা প্রথম শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ-ধারাটির পরবর্তী শিখন পরিস্থিতিতে অভিস্থাপনকে (Transposition) সঞ্চালন বলে থাকেন।

কোহ্‌লারের পরীক্ষণে দেখা গিয়েছিল যে শিম্পাঞ্জী যখন দুটি বাঁশ একসঙ্গে জুড়ে কলার ছড়ার নাগাল পেয়েছিল তখন তার শিখন হয়েছিল অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে এবং সেইজন্য ঐ শিখনটি একবার আয়ত্ত হবার পর তা স্থায়ীভাবে তার মধ্যে সঞ্চালিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে যখনই তাকে ঐ ধরনের সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে ফেলা হয়েছিল তখনই দেখা গেছল যে ঐ কৌশলটি অবলম্বন করতে তার একটুও দেরী বা দ্বিধা হয়নি।[১]

১। পৃঃ ১১৬

শিম্পাঞ্জীটির ক্ষেত্রে এই সঞ্চালনের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে গেষ্টাল্টবাদীরা বলেন যে শিম্পাজীটি তার প্রথম দিনের শিখন পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির (যেমন খাঁচা, কলা, দুটি বাঁশের খণ্ড প্রভৃতি) মধ্যে যে পারস্পরিক সম্বন্ধটি হৃদয়ঙ্গম করেছিল সেই সম্বন্ধটিই সে দ্বিতীয় দিনে অনুরূপ পরিস্থিতিতে অভিস্থাপন করল এবং তার ফলেই সমস্যার সমাধান মুহূর্তেই হয়ে গেল। অতএব এখানে প্রকৃত পক্ষে পূর্বেকার শিখন পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত সম্বন্ধ-ধারাটিরই সঞ্চালন হয়েছে। এই কারণে প্রথম শিখন পরিস্থিতির সম্বন্ধ-ধারাকে দ্বিতীয় শিখন পরিস্থিতিতে অভিস্থাপন করতে পারাকেই গেষ্টাল্টবাদীরা সঞ্চালন বলে থাকেন।

গেষ্টাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের এই ব্যাখ্যাটি বলতে গেলে থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদান সূত্রের ঠিক বিপরীত। থর্নডাইকের মতে সঞ্চালন ঘটাতে গেলে বিষয়-বস্তুটির অভ্যন্তরস্থ অংশগুলির সঙ্গে পূর্বে শেখা বিষয়ের অংশগুলির অভিন্নতা খুঁজে বার করতে হবে। আর গেষ্টাল্টবাদীদের মতে সঞ্চালন ঘটাতে গেলে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে তার সমগ্র রূপটির প্রতি মনোযোগ দিতে হবে। এমন কি তাঁদের মতে সমগ্রকে উপলব্ধি করতে হলে অংশ থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিতে হবে, কারণ অংশের প্রতি মনোযোগ দিলে সমগ্রের উপলব্ধির পথে অন্তরায়ই সৃষ্টি হবে। বলা বাহুল্য জাড্ডের সামান্যীকরণ মতবাদের সঙ্গে মৌলিক তত্ত্বের দিক দিয়ে এই মতবাদটির প্রচুর মিল আছে।

বিভিন্ন তত্ত্বের সমালোচনা

থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদানের মতবাদ তাঁর শিখনের সাধারণ সূত্রগুলির উপরই প্রতিষ্ঠিত। তাঁর সংব্যাখ্যানে শিখন হল স্নায়ুমণ্ডলীতে নিউরনগুলির মধ্যে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত সংযোজনগুলি ছাড়া কোন নতুন সংযোজন সৃষ্টি করা, আর সঞ্চালন তখনই হয় যখন একই স্নায়ু সংযোজন দুটি বিভিন্ন শিখন পরিস্থিতিতে সংঘটিত হয়। (অর্থাৎ ল্যাটিন শেখার পর যদি ইংরাজী শব্দ শিখতে সুবিধা হয় তবে বুঝতে হবে যে ল্যাটিন শেখার সময় মস্তিষ্কে যে ধরনের স্নায়ু-সংযোজন ঘটেছিল ঠিক সেই ধরনের স্নায়ু-সংযোজনই ইংরাজী শেখার সময় পুনরাবৃত্ত হল। অতএব থর্নডাইকের মতে শিখনের সঞ্চালন একই অভিজ্ঞতার বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।)

থর্নডাইকের তত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রথমত বলা চলে যে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে কেবলমাত্র স্নায়ু-সংযোজনের সাহায্যে শিখনের ব্যাখ্যা পর্যাপ্ত নয়, অতএব সঞ্চালনের ব্যাখ্যাও এই একই কারণে অসম্পূর্ণ থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, জাড্ডের

পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে অভিন্ন উপাদানের জন্য সব সময়ই সঞ্চালন ঘটে না। তাঁর প্রসিদ্ধ পরীক্ষণে দ্বিতীয় দলটির বেলায় উপাদান অভিন্ন থাকা সত্ত্বেও কোনও সঞ্চালন ঘটেনি। তৃতীয়ত, অনেক পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে উপাদানের অভিন্নতা থেকে সঞ্চালন ত হয়ই নি বরং তা সঞ্চালনের পরিপন্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে একথা স্বীকার্য যে কোন কোন শিখনের ক্ষেত্রে অভিন্ন উপাদানের জন্যই সঞ্চালন হয়ে থাকে। বিশেষ করে অভ্যাস গঠন, দৈহিক প্রক্রিয়া, ভাষা-শিক্ষা, শিশুর প্রাথমিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ইত্যাদির ক্ষেত্রে অভিন্ন উপাদানই সঞ্চালন ঘটানোর কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু অমূর্ত বা ধারণামূলক বিষয়বস্তু শিখনের ক্ষেত্রে উপাদানের অভিন্নতার জন্য কোন রকম সঞ্চালন হয় না। সেখানে জাডের সামান্যীকরণ বা গেষ্টাল্টবাদীদের অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে সঞ্চালন ঘটে বলা চলে।[১১]

জাডের অভিজ্ঞতার সামান্যীকরণের তত্ত্ব অনুযায়ী সঞ্চালনের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর কোন মূল্য নেই। সমস্ত নির্ভর করছে শিখনের পদ্ধতির উপর। বুদ্ধির যথাযথ প্রয়োগ, বিজ্ঞানসম্মত পন্থার অনুসরণ, অভিজ্ঞতা থেকে অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক অংশগুলি বাদ দিয়ে সাধারণ ও প্রাসঙ্গিক অংশগুলিকে পৃথকীকরণ ইত্যাদি পদ্ধতির উপর নির্ভর করছে অভীষ্ট সঞ্চালনের প্রকৃতি। এই পদ্ধতিগুলির সাফল্য আবার বিশেষভাবে নির্ভর করছে মনোযোগ, পর্যবেক্ষণ, বিচারকরণ প্রভৃতি মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নত সম্পাদনের উপর। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সুষ্ঠু সঞ্চালন ঘটাতে গেলে বিজ্ঞানসম্মত শিখন পদ্ধতির অনুসরণ, বুদ্ধির প্রয়োগ এবং পর্যবেক্ষণ, চিন্তন, বিচারকরণ প্রভৃতি উন্নত মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উৎকর্ষসাধন বিশেষভাবে প্রয়োজন।

গেষ্টাল্ট মতবাদটিও জাডের মতবাদের সমধর্মী। তবে জাডের তত্ত্বে কেবলমাত্র পদ্ধতির উপরই জোর দেওয়া হয়েছে, বিষয়বস্তুর গঠন বা প্রকৃতির উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। কিন্তু গেষ্টাল্টবাদে বিষয়বস্তু এবং পদ্ধতি এ দু'য়ের উপরই সমান জোর দেওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তুটির সামগ্রিক উপলব্ধি সঞ্চালনের পক্ষে অপরিহার্য, অতএব সুষ্ঠু শিখনের প্রথম সর্ত হল সমগ্র সমস্যাটির উপস্থাপন। বিষয়বস্তুটিকে যদি আংশিক উপস্থাপিত করা হয় তবে শিখন সন্তোষজনক হবে না, সঞ্চালনও নয়। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা হবে সমগ্রধর্মী, অংশগত নয়। বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধের

উপলব্ধি এবং একটি অবিচ্ছিন্ন সামগ্রিক সত্তার জ্ঞানই হল অন্তর্দৃষ্টি জাগানোর একমাত্র উপায়। অতএব সম্বন্ধমূলক চিন্তন ও বিষয়বস্তুটির সামগ্রিক সত্তার উপলব্ধি এই দুটিই হল সঞ্চালন ঘটানোর প্রধানতম পন্থা।

শিখন-সঞ্চালন ও শিক্ষক

মার্সেল এক জায়গায় বলেছেন যে আমরা শিখন-সঞ্চালনকে কি ভাবে নিই তার উপর নির্ভর করছে আমাদের শিক্ষাদানের প্রতি মনোভাব। কথাটি খুবই সত্য। যদি শিক্ষক মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বে বিশ্বাসী হন তবে তিনি ধরে নেবেন যে মনের বিভিন্ন শক্তিগুলিকে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠের দ্বারা উন্নত করা যায় এবং সকল ক্ষেত্রেই সঞ্চালন স্বাভাবিকভাবে হয়ে থাকে। তাঁর কাছে শিখন পদ্ধতির ভাল মন্দের কোন দাম নেই, কেননা মনের উৎকর্ষ নির্ভর করছে বিশেষ বিশেষ বিষয় শিক্ষার উপর এবং তিনি একমাত্র মানসিক ৎকর্ষসাধনের যুক্তিতেই অনেক বিষয়কে পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত দেবেন।

কিন্তু যদি মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটির উপর শিক্ষকের বিশ্বাস না থাকে, তাহলে তিনি যেমন শিক্ষণপদ্ধতিকে যতটা সম্ভব কার্যকর করে তোলার চেষ্টা করবেন তেমনই আবার চেষ্টা করবেন শিক্ষণীয় বিষয়গুলি থেকে শিক্ষার্থীরা যাতে সর্বাধিক উপকার লাভ করে তার জন্য। অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি ক্ষেত্রে কি ধরনের সঞ্চালন হয় সে সম্বন্ধে ভাল করে জেনে শিক্ষণীয় বিষয়-গুলিকে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ উপকারে যথাযথভাবে নিয়োগ করাটাই তাঁর কাজ হয়ে দাঁড়াবে।

মনোবিজ্ঞানের গবেষণার উপর নির্ভর করলে আধুনিক শিক্ষকের মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বটি গ্রহণ করা কখনই উচিত নয়। অবশ্য শিখন-সঞ্চালনের বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে কোন কোন পাঠ্যবিষয়ের 'মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উৎকর্ষ সাধন করার কিছুটা ক্ষমতা আছে। কিন্তু এই উৎকর্ষ সাধন এতই অনির্দিষ্ট, বিশেষধর্মী এবং সংকীর্ণ সে তার উপর ভিত্তি করে মানসিক শৃঙ্খলার তত্ত্বকে একটি সাধারণ সূত্র বলে গ্রহণ করা খুবই ভুল হবে।

তবে শিখন-সঞ্চালনকে একটি বাস্তব প্রক্রিয়া এবং শিক্ষণপদ্ধতির সহায়ক উপকরণরূপে গ্রহণ করা খুবই চলতে পারে। সুবিবেচনার সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করলে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠ্যবিষয়টির সর্বাধিক সঞ্চালন ঘটাতে

পারেন। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষক কি কি পদ্ধতি অনুসরণ করবেন তার একটি নির্দেশ নীচে দেওয়া হল।

প্রথম, কোন্ কোন্ বিষয় থেকে কি ধরনের সঞ্চালন হয় সে সম্বন্ধে শিক্ষকের নির্দিষ্ট ও নির্ভুল জ্ঞান থাকা প্রথমেই দরকার। প্রাচীনকাল থেকেই শিক্ষকদের মধ্যে সঞ্চালন সম্বন্ধে কতকগুলি ভ্রমাত্মক ধারণা থেকে গেছে। আধুনিক শিক্ষকের সঞ্চালনের প্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণভিত্তিক হবে। এর জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্র-পরিচালিত ব্যাপক গবেষণা এবং তার ফলাফল সম্বন্ধে শিক্ষকদের নিয়মিত অবহিত করার ব্যবস্থা।

দ্বিতীয়, পাঠ্যবিষয়টির সংগঠন সুপরিকল্পিত হওয়া চাই। সঞ্চালন ঘটাতে গেলে পাঠ্যবিষয়টির মধ্যে অন্তর্নিহিত সুসংহতি এবং অঙ্গগত ঐক্য থাকবে যার ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে ঐ বিষয়টির মূলগত ধারণা বা তত্ত্বগুলি অনুধাবন করতে কষ্ট হবে না। গেষ্টাল্টবাদীর ভাষায় পাঠ্যবিষয়টির সমগ্র রূপটি শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে।

তৃতীয়, শিক্ষার্থী যাতে পাঠ্যবিষয়ের বাহ্যিক, অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক অংশগুলিকে বাদ দিতে শেখে এবং তার মধ্যে নিহিত প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যগুলি খুঁজে বার করতে পারে, শিক্ষকের তা দেখা দরকার। বস্তুত সঞ্চালন নির্ভর করছে পাঠ্যবিষয়টির মূলগত অতিপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি আবিষ্কার করার উপর। এই প্রক্রিয়াটিরই নাম দেওয়া হয়েছে সামান্যীকরণ। অবশ্য কেবলমাত্র বিষয়টির মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলি জানলেই চলবে না, সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ কি তা জানাও সার্থক সঞ্চালনের পক্ষে অপরিহার্য। এইজন্য গেষ্টাল্টবাদীরা সম্বন্ধমূলক চিন্তনকেই শিখন সঞ্চালনের একমাত্র মাধ্যম বলে বর্ণনা করেছেন।

চতুর্থ, শিক্ষণীয় বিষয়টির এই মূলগত তত্ত্বগুলি অনুধাবন করার জন্য প্রয়োজনীয় মানসিক প্রক্রিয়াগুলির অভ্যাস দরকার। যেমন, মনোযোগদানের অনুশীলন, পর্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণ, সাদৃশ্য ও পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষমতা অর্জন, বিচার-করণের নিয়মাবলী জানা, প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক বস্তু চিনতে পারা ইত্যাদি প্রক্রিয়াগুলি যাতে শিক্ষার্থী ঠিকমত সম্পন্ন করতে পারে শিক্ষকের তা দেখা এবং সেগুলি সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত সুপরিচালনা দেওয়া কর্তব্য।

এগার

প্রক্ষোভের স্বরূপ (Nature of Emotion)

রাগ, হিংসা, আনন্দ, ভয় প্রভৃতি শব্দের দ্বারা আমরা মনের যে বিশেষ বিশেষ অবস্থাকে বুঝিয়ে থাকি তাকেই প্রক্ষোভ (Emotion) বলে। প্রক্ষোভের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিক্ষুব্ধ বা উত্তেজিত হওয়া। যে কোন প্রক্ষোভঘটিত পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তার তিনটি দিক দেখতে পাই। (১) বাহ্যিক আচরণ (২) অভ্যন্তরীণ আচরণ বা প্রতিক্রিয়া এবং প্রক্ষোভমূলক অনুভূতি বা সচেতনতা।

কোন প্রক্ষোভের প্রভাবাধীন হলে প্রাণীমাত্রেই কতকগুলি বাহ্যিক আচরণ সম্পন্ন করে থাকে। যেমন, ভয় পেলে মানুষ পালায়, রাগ করলে হাত-পা ছোড়ে বা আক্রমণ করে ইত্যাদি। এই আচরণগুলির একটি লক্ষণ হল যে এগুলি সাধারণভাবে সংহতিনাশক অর্থাৎ প্রাণী যখন প্রক্ষোভের বশবর্তী হয়ে কোন আচরণ করে তখন তার আচরণধারার মধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় যে সংহতি থাকে তা নষ্ট হয়ে যায়।

শরীরতত্ত্বের দিক দিয়ে প্রক্ষোভ কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তনের সমষ্টি মাত্র। এই দৈহিক পরিবর্তন অবশ্য নানা রকমের হতে পারে, যেমন, রক্তচলাচলঘটিত, গ্রন্থিঘটিত, স্নায়ুঘটিত, পেশীঘটিত ইত্যাদি। সাধারণ ভাষণে আমরা যেমন বিভিন্ন প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির মধ্যে পার্থক্য করে থাকি, প্রক্ষোভজাত দৈহিক প্রতিক্রিয়াগুলির মধ্যে কিন্তু তেমন কোন সুনির্দিষ্ট পার্থক্য নেই। বরং শারীরিক প্রতিক্রিয়ার একটি সাধারণ রূপ আছে যেটা সকল রকম প্রক্ষোভের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। তবে প্রক্ষোভের বিভিন্নতা অনুযায়ী কেবলমাত্র মাত্রা এবং বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এই শারীরিক প্রক্রিয়াগুলি বিভিন্ন প্রক্ষোভের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ নেয়। প্রক্ষোভজাত দৈহিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে সংহতিনাশক বলে বর্ণনা করার কারণ হল যে দেহের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলি এগুলির দ্বারা বেশ ব্যাহত হয়। তবে প্রথম প্রথম সংহতিনাশক হলেও পরবর্তী আচরণের মধ্যে প্রক্ষোভ যথেষ্ট সংহতি এনে থাকে এবং এই প্রক্ষোভই প্রাণীর কাজের পেছনে প্রেষণা বা কর্মশক্তি জুগিয়ে থাকে।

প্রত্যেক প্রক্ষোভ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে থাকে ঐ প্রক্ষোভটি সম্বন্ধে প্রাণীর সচেতনতা। এই সচেতনতার কেন্দ্রে থাকে একটা অনুভূতি, যেটা হয় সুখকর, নয় দুঃখকর হয়ে থাকে। সাধারণত প্রক্ষোভ জাগলে এই অনুভূতি তীব্রভাবে দেখা দেয়।

প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ

প্রক্ষোভমূলক অবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি পর্যবেক্ষণ করলে আমরা প্রক্ষোভ জাগরণের একাধিক কারণের সন্ধান পাই।

পারিবেশিক উত্তেজনা ব্যক্তির মধ্যে বহু প্রক্ষোভের সৃষ্টি করিয়ে থাকে। দেখা গেছে যে উচ্চশব্দ, আলোর ঝলকানি, হঠাৎ ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা প্রভৃতি আকস্মিক, অস্বাভাবিক ও অতি তীব্র পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভ জাগাতে পারে। এগুলিকে সেইজন্য প্রক্ষোভের সহজাত উদ্দীপকরূপে গণ্য করা হয়। কিন্তু এগুলি শৈশবেই বিশেষভাবে কার্যকর থাকে। শিশু যত বড় হতে থাকে ততই নানা নতুন নতুন শেখা বস্তু তার প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ হয়ে ওঠে, যেমন, অন্ধকার, উঁচু, খোলা বা বন্ধ জায়গা, কুদর্শন মানুষ, পশু ইত্যাদি। পরিণত বয়সে প্রক্ষোভের কারণগুলি অধিকাংশই সামাজিক প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং অপর ব্যক্তির সামান্য কথা, মন্তব্য, আচরণ বা ইঙ্গিতই আমাদের প্রক্ষোভ জাগানর পক্ষে যথেষ্ট হয়ে ওঠে।

পারিবেশিক উত্তেজনার চেয়ে প্রক্ষোভ-জাগরণের আরও শক্তিশালী কারণ-রূপে কাজ করে পারিবেশিক উত্তেজকগুলি সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা এবং সে সম্বন্ধে চিন্তা। যেমন, একজনের মন্তব্য বা আচরণ আমাদের মনে প্রক্ষোভ জাগাতে যতটা না পারুক, তার চেয়ে অনেক বেশী পারে সে সম্বন্ধে আমাদের মানসিক জল্পনা কল্পনা। অনেক সময়ে এই মানসিক আলোড়ন থেকে ধীরে ধীরে প্রক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। বয়ঃপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ সৃষ্টি প্রায় এই ভাবেই হয়ে থাকে। অবশ্য এই ধরনের প্রক্ষোভ সৃষ্টির পেছনে থাকে মনের একটা পূর্বসৃষ্ট প্রক্ষোভমূলক সংগঠন যেটা অতীতের সমশ্রেণীর অভিজ্ঞতা থেকেই গঠিত হয়ে থাকে।

গ্রন্থিজনিত উত্তেজনাকেও প্রক্ষোভ সৃষ্টির একটা কারণ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। এই গ্রন্থিজনিত উত্তেজনা অবশ্য সংঘটিত হয় প্রক্ষোভ জাগরণের ফলেই। কিন্তু একবার গ্রন্থিগুলি উত্তেজিত হয়ে উঠলে সেগুলি প্রক্ষোভকে তীব্রতর করতে সাহায্য করে। অর্থাৎ গ্রন্থিজাত উত্তেজনা একাধারে প্রক্ষোভ

জাগরণের ফল এবং কারণও। এন্‌ডোক্রিন বা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলি থেকে যে রস নির্গত হয় সেগুলি যে প্রক্ষোভের জাগরণ এবং পরিবর্ধনের পক্ষে অপরিহার্য তা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া

প্রাণীর উপর প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া তীব্রতা ও বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে নানা শ্রেণীর হতে পারে। সামান্য উত্তেজনাবোধ থেকে সুরু করে পরিপূর্ণভাবে আত্মসংযমের বিলোপ পর্যন্ত প্রক্ষোভের ফলরূপে দেখা দিতে পারে। এই প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি অবশ্য নির্ভর করে প্রক্ষোভের মাত্রার উপর এবং প্রক্ষোভ যখন তীব্রতম হয়ে ওঠে তখন এমন হতে পারে যে প্রাণী সম্পূর্ণভাবে নিজের আচরণের উপর কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলে এবং পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের কোনও সামর্থ্যই তখন তার আর থাকে না, যেমন, খরগোসের বাচ্চা যখন বাঘের সামনে বা হরিণ যখন অজগর সাপের সামনে পড়ে তখন তারা এত ভয় পেয়ে যায় যে তারা চলার শক্তি হারিয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে, ছুটে পালাতে আর পারে না।

শরীরতত্ত্বমূলক প্রতিক্রিয়া

প্রক্ষোভের সময় নানারকম অন্তর্দৈহিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন রক্তের চাপ, নাড়ীর স্পন্দন, নিশ্বাস-প্রশ্বাস, গ্রন্থিরস নিঃসরণ, পরিপাচনক্রিয়া (Digestive function) প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন ঘটে। বর্তমানে এই পরিবর্তনগুলি নিখুঁতভাবে মাপার জন্য নানারূপ জটিল ও সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি প্রস্তুত হয়েছে। যেমন, নাড়ীর স্পন্দন মাপার যন্ত্রের নাম স্ফিগমোগ্রাফ (Sphygmograph), রক্তের চাপ মাপার যন্ত্রের নাম স্ফিগমোম্যানোমিটার (Sphygmomanometer), নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পরিমাপের যন্ত্রের নাম নিউমোগ্রাফ (Pneumograph) ইত্যাদি।

পরিপাচন ক্রিয়ার উপর প্রক্ষোভের প্রতিক্রিয়া বেশ উল্লেখযোগ্য। ক্যাননের (Cannon) পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে প্রক্ষোভের তীব্রতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাকস্থলীর কাজ ও পরিপাচন-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। খুব রেগে গেলে বা খুব উত্তেজিত হলে খাদ্য হজমের কাজ স্থগিত থাকে।

গ্রন্থিরস (Hormone) নিঃসরণ প্রক্ষোভের জাগরণের একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। অ্যাড্রেনালিন (Adrenalin) নামক গ্রন্থিরসটি রাগ, উত্তেজনা প্রভৃতি প্রক্ষোভের জাগরণের সময় নির্গত হয় এবং ব্যক্তিকে বিভিন্ন শারীরিক উত্তেজনাকর কাজ করার শক্তি যোগায়।

প্রক্ষোভের সময় হৃদ্‌পিণ্ড, মস্তিষ্ক প্রভৃতি স্থানে রক্তপ্রবাহের মধ্যে বেশ পরিবর্তন দেখা যায়। রাগ, উত্তেজনা প্রভৃতির ক্ষেত্রে যেমন রক্তপ্রবাহের গতি বেড়ে যায় তেমনই আনন্দ, তৃপ্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে রক্তের চাপ কমে আসে।

সাইকোগ্যালভানোমিটার (Psychogalvanometer) নামক একটি যন্ত্রের সাহায্যে প্রক্ষোভের তীব্রতা এবং উত্তেজনার স্বরূপ মাপা হয়ে থাকে। প্রাণী-দেহ মৃদু বিদ্যুৎপ্রবাহ কতটা সহ্য করতে পারে তা এই যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। দেখা গেছে যে প্রক্ষোভের বিভিন্নতা অনুযায়ী প্রাণীর সাইকো-গ্যালভানোমূলক প্রতিক্রিয়া (Psychogalvanic Response or P. G. R.) ভিন্ন হয়ে থাকে। আজকাল প্রক্ষোভের পরিমাপে সাইকোগ্যালভানো প্রতিক্রিয়ার ব্যাপক সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে।

মস্তিষ্ক তরঙ্গেও (Brain waves) প্রক্ষোভ জাগরণের সময় প্রচুর পরিবর্তন দেখা যায়। সাধারণ অবস্থায় মস্তিষ্কে আলফা তরঙ্গের আবর্তন প্রতি সেকেণ্ডে ৮ থেকে ১২ বার হয়, কিন্তু প্রক্ষোভের সময় মস্তিষ্ক-তরঙ্গের আবর্তনের হার সেকেণ্ডে ৮ বারের নীচে নেমে যায়।

সামাজিক প্রতিক্রিয়া

প্রক্ষোভজাত প্রতিক্রিয়ার উপর সামাজিক প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভয় পেয়ে ছুটে পালান, আনন্দিত হলে জোরে চীৎকার করা, রাগ করলে আক্রমণ করা ইত্যাদি প্রতিক্রিয়াগুলি স্বাভাবিক হলেও সামাজিক অনুশাসনের চাপে পড়ে নানা রূপ গ্রহণ করে। লোক-নিন্দা, সমালোচনা, সমাজের তিরস্কার শাস্তিদান প্রভৃতির ভয়ে ব্যক্তি তার প্রক্ষোভমূলক আচরণগুলিকে প্রায়ই পরিবর্তিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে এবং পরিবেশের উপযোগী সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করে। এই থেকেই জন্মলাভ করেছে মানুষের অন্তহীন আচরণ-বৈচিত্র্য। বস্তুত প্রক্ষোভমূলক পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতিবিধানের জন্যই মানুষ নানা বিচিত্র আচরণধারার সাহায্য নিয়ে থাকে।

অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী (Autonomic Nervous System)

প্রক্ষোভঘটিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে দৈহিক প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা যায় তার পেছনে আছে বিশেষ একটি স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ। এটির নাম অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী। এই স্নায়ুমণ্ডলীটি মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড থেকে বার হয়ে শরীরের নানা গ্রন্থি, হৃদ্‌যন্ত্র, পাকস্থলী, মাংসপেশী, দেহচর্ম প্রভৃতির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে স্নায়বিক উত্তেজনা এই স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে

গ্রন্থি, হৃদ্‌যন্ত্র প্রভৃতিতে পৌঁছয় এবং ঐগুলিকে সক্রিয় করে তোলে। অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীর আবার দুটি ভাগ আছে সিমপ্যাথেটিক (Sympathetic) এবং প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক (Parasympathetic)। এই দুটি ভাগের কাজ কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। সিম্‌প্যাথেটিক বিভাগটি সাধারণত দেহাংশগুলিকে উত্তেজিত করে তোলে এবং প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক বিভাগটি সেগুলিকে প্রশমিত করে। যেমন, সিম্‌প্যাথেটিক বিভাগটির সক্রিয়তার ফলে হৃদ্‌স্পন্দন বৃদ্ধি পায়, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত হয়, কিডনীতে সঞ্চিত শর্করা মুক্ত হয়ে রক্তে প্রবেশ করে, রক্ত সঞ্চালনের গতি বৃদ্ধি পায় এবং শরীরের মধ্যে নানা উত্তেজনামূলক পরিবর্তন ঘটে। প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয়ে উঠলে হৃদ্‌স্পন্দনের বেগ কমে আসা, শরীরের উত্তাপ স্বল্প হওয়া, রক্ত-প্রবাহ মন্থর হওয়া ইত্যাদি প্রশমনমূলক পরিবর্তনগুলি শরীরের মধ্যে দেখা দেয়। যে সকল গ্রন্থিরস শরীরের উত্তেজনামূলক কাজের পক্ষে সহায়ক সেগুলি সিম্‌প্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডলীর উত্তেজনায় নির্গত হয়ে থাকে। যেমন, অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে যে রস নির্গত হয় তার নাম অ্যাড্রেনালিন। এই অ্যাড্রেনালিন ব্যক্তিকে উত্তেজনামূলক কাজ করার উদ্যম ও সামর্থ্য জুগিয়ে থাকে। তেমনই যে সকল গ্রন্থিরস শরীরের শান্ত অবস্থার পক্ষে সহায়ক সেগুলি প্যারাসিম্‌প্যাথেটিকের সক্রিয়তার সময় নিঃসৃত হয়ে থাকে। সাধারণভাবে যদিও সিম্‌প্যাথেটিক বিভাগের সক্রিয়তা উত্তেজনাধর্মী এবং প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক বিভাগের সক্রিয়তা প্রশমনধর্মী তবুও কোন কোন ক্ষেত্রে সিম্‌প্যাথেটিক বিভাগকেও প্রশমন বা অবদমনের কাজ করতে দেখা গেছে। যেমন, পাকস্থলীর বিভিন্ন প্রশমনধর্মী কাজগুলির সুষ্ঠু-সম্পাদন সিম্‌প্যাথেটিক বিভাগের সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে।

দৈহিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে প্রক্ষোভকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম বাঞ্ছামূলক (Appetitive) বা বৃদ্ধিমূলক (Vegetative) প্রতিক্রিয়া। আর দ্বিতীয়, আকস্মিক (Emergency) বা প্রস্তুতিমূলক (Preparatory) প্রতিক্রিয়া। প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা যৌন উত্তেজনা প্রভৃতি ঘটিত প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া। আর দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হল রাগ, ভয় প্রভৃতি জনিত প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াগুলি। যখন এক শ্রেণীর প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়া সক্রিয় হয় তখন অপর শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াগুলি নিরুদ্ধ থাকে। প্রথম শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে প্যারাসিম্‌প্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তির মধ্যে একটা তৃপ্তি ও প্রশান্তির ভাব দেখা দেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিক্রিয়ার

ক্ষেত্রে সিম্প্যাথেটিক বিভাগটি সক্রিয় হয় এবং ব্যক্তির মধ্যে বর্ধিত মাত্রার উত্তেজনা ও সক্রিয়তা দেখা দেয়। পলায়ন বা আক্রমণ উভয় প্রকার পরিস্থিতির জন্যই তখন সে দেহে ও মনে প্রস্তুত হয়ে ওঠে। এই জন্য এই শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াকে আকস্মিক বা প্রস্তুতিমূলক আচরণ বলা হয়ে থাকে।

প্রক্ষোভের উত্তেজনায় ক্ষেত্রে পাকস্থলীতে পরিপাচন-ক্রিয়া যে বন্ধ হয়ে যায় সেটা পরীক্ষণ-প্রমাণিত সত্য। পশুর আহারের সময় তাকে ক্রুদ্ধ বা ভয়গ্রস্ত করে দেখা গেছে যে সে সময় তার পাকস্থলীর কাজ সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে গেছে।

সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুবিভাগের সক্রিয়তার সঙ্গে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থিরসের নিঃসরণের নিকট যোগাযোগ আছে। বস্তুত রাগ, ভয় প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে সকল শারীরিক উত্তেজনা দেখা দেয় সেগুলি প্রধানত এই অ্যাড্রেনালিন গ্রন্থিরসের নিঃসরণের জন্যই ঘটে থাকে। ক্যাননের (Cannon) ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে এই তথ্যটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে।

প্রক্ষোভের বিভিন্ন তত্ত্ব (Theories of Emotion)

প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও কার্য নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক জল্পনা হয়েছে এবং এই সম্বন্ধে একাধিক তত্ত্বও প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সেগুলির মধ্যে কয়েকটির বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

১। ম্যাক্‌ডুগালের প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভ তত্ত্ব (McDougall's Theory of Instinct-Emotion)

ম্যাক্‌ডুগাল প্রক্ষোভকে প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থলীয় প্রেষণামূলক শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেকটি সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে থাকে একটি করে প্রক্ষোভ এবং সেটি জাগলে তবে ঐ বিশেষ প্রবৃত্তিটি সক্রিয় হয়ে ওঠে। তিনি মোট ১৭টি প্রবৃত্তি এবং তাদের সহগামী ১৭টি প্রক্ষোভের একটা তালিকা দিয়েছেন।[১]

২। জেমস-ল্যাংগ তত্ত্ব (James-Lange Theory)

প্রসিদ্ধ আমেরিকান দার্শনিক-মনোবিজ্ঞানী উইলিয়াম জেমস ১৮৮৪ সালে এবং ড্যানিস শরীরতত্ত্ববিদ্ ল্যাংগ (Lange) ১৮৮৫ সালে প্রক্ষোভমূলক প্রক্রিয়ার একটি নতুন সংব্যাখ্যান দেন। এইটিই বর্তমান জেমস-ল্যাংগ তত্ত্ব নামে পরিচিত।

জেমস-ল্যাংগ তত্ত্বটিতে প্রক্ষোভের একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সাধারণ লৌকিক বিচারে প্রক্ষোভ সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করা

১। পৃঃ ৩২ (প্রথম খণ্ড)

হয় এই নতুন তত্ত্বটিতে ঠিক তার বিপরীতভাবে প্রক্ষোভের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি প্রক্ষোভঘটিত অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি স্তর বা সোপান পাই। যথা, (১) প্রক্ষোভ জাগাতে সমর্থ এমন উদ্দীপক বা পরিস্থিতি, (২) কোন বিশেষ প্রক্ষোভের অনুভূতি, যেমন, রাগ হওয়া বা আনন্দ হওয়া এবং (৩) শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং বাহ্যিক আচরণাদি, যেমন রক্তের চাপ বৃদ্ধি পাওয়া, হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত হওয়া, হাত-পা ছোঁড়া, পালান, হাসা, কাঁদা, চিৎকার করা ইত্যাদি।

প্রক্ষোভের লৌকিক সংব্যাখ্যান অনুযায়ী প্রথমে আসে উদ্দীপক বা পরিস্থিতি, তারপর মনে জাগে ঐ প্রক্ষোভের অনুভূতি এবং সব শেষে দেখা দেয় শারীরিক প্রতিক্রিয়া। যেমন, প্রথমে ব্যক্তিটি একটি বাঘ দেখল (উদ্দীপক), তারপর তার মনে ভয় জাগল (প্রক্ষোভের অনুভূতি) এবং সব শেষে তার হৃদ্‌স্পন্দনের গতিবেগের বৃদ্ধি রোমহর্ষণ, মাংসপেশীর সঙ্কোচন ইত্যাদি বাহ্যিক আচরণগুলি দেখা দিল (শারীরিক প্রতিক্রিয়া)। অর্থাৎ লৌকিক সংব্যাখ্যানে প্রক্ষোভমূলক অভিজ্ঞতার বিভিন্ন স্তরগুলির অনুক্রম হল নিম্নরূপ।

উদ্দীপক—>প্রক্ষোভের অনুভূতি—>শারীরিক প্রতিক্রিয়া

কিন্তু জেমস্‌-ল্যাংগের মতে ঐ সোপানগুলির অনুক্রম সম্পূর্ণ অন্য রকম। তাঁদের ব্যাখ্যায় প্রথমে আসে উদ্দীপক, তার পরে দেখা দেয় শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং সবশেষে ঘটে প্রক্ষোভের অনুভূতি। অর্থাৎ জেমস-ল্যাংগের ব্যাখ্যায় প্রক্ষোভমূলক বিভিন্ন স্তরগুলির অনুক্রম হল এইরূপ—

উদ্দীপক—>শারীরিক প্রতিক্রিয়া—>প্রক্ষোভের অনুভূতি

জেমস-ল্যাংগের ভাষায় আমরা ভয় পেলে পালাই না। পালাই বলে ভয় পাই। রেগে গিয়ে যে আক্রমণ করি, তা নয়। আক্রমণ করি বলেই রেগে যাই। দুঃখ অনুভব করি বলে যে কাঁদি তা নয়, কাঁদি বলেই দুঃখ পাই; অর্থাৎ জেমস-ল্যাংগের মতে প্রক্ষোভের অনুভূতি শারীরিক প্রতিক্রিয়ার কারণ নয়, তার ফল। উপযুক্ত উদ্দীপক দেখা দিলে মস্তিষ্কে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সেই স্নায়বিক উত্তেজনা অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে শরীরের নানা জায়গায় গিয়ে পৌঁছয়। ফলে গ্রন্থি, রক্তবহানালী, মাংসপেশী প্রভৃতিতে নানা শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা দেওয়ার ফলে আবার স্নায়বিক উত্তেজনা স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে দিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছয় এবং তার ফলে আমরা রাগ, দুঃখ, আনন্দ ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি অনুভব করি। এক কথায় এই

তত্ত্ব অনুযায়ী শারীরিক প্রতিক্রিয়ার সমষ্টিগত রূপকেই আমরা লৌকিক ভাষণে প্রক্ষোভ নাম দিয়ে থাকি। অর্থাৎ প্রক্ষোভ শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মানসিক অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়।

জেমস তাঁর দেওয়া প্রক্ষোভের এই অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থনে কতকগুলি যুক্তির উল্লেখ করেন, যেমন—

(ক) কোন বিশেষ প্রক্ষোভ সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় যদি আমাদের চেতনা থেকে সকল প্রকার দৈহিক অনুভূতিকে বাদ দেওয়া যায় তবে দেখা যাবে যে প্রক্ষোভের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। যা থাকে সেটা কেবল মাত্র এক ধরনের উত্তেজনাবিহীন নিরপেক্ষ জ্ঞানমূলক অভিজ্ঞতা, তাকে কোনভাবেই প্রক্ষোভ বলা চলতে পারে না। জেমসের মতে দেহসম্পর্কবিহীন প্রক্ষোভ বলে কোন বস্তু হয় না।

(খ) মানসিক বিকৃতিগ্রস্ত রুগীদের ক্ষেত্রে বাইরের কোন কারণ ছাড়াই প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয়ে থাকে, যেমন হিষ্টিরিয়া বা ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রাগ, আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি প্রক্ষোভ কোন বাহ্যিক কারণ ছাড়াই ব্যক্তির মনে জাগতে পারে। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে কেবলমাত্র দৈহিক অবস্থা থেকেই প্রক্ষোভ জন্মাতে পারে।

(গ) শারীরিক প্রতিক্রিয়া বা বাহ্যিক অভিব্যক্তির মাত্রা বাড়ালে প্রক্ষোভের তীব্রতাও বাড়ে। রাগের সময় যত চেঁচামেচি করা যায় তত রাগ বেড়ে যায়, ভয়ের সময় পালালে ভয় আরও বেশী হয়। তাছাড়া দেখা গেছে যে অভিনয়ের সময় নিছক বাহ্যিক অভিব্যক্তির সাহায্যেই অভিনেতারা নিজেদের মনে প্রক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারেন।

(ঘ) তেমনই প্রক্ষোভকে অভিব্যক্ত হতে না দিলে প্রক্ষোভ নিজে নিজেই লোপ পায়। রাগের সময় রাগকে অভিব্যক্ত হতে না দেওয়াই হল রাগ থামানোর প্রকৃষ্ট উপায়।

জেমস-ল্যাংগ তত্ত্ব অনুযায়ী কোন শারীরিক প্রতিক্রিয়ার মানসিক সচেতনতার নামই প্রক্ষোভ। বিশেষ বিশেষ উদ্দীপক বা পরিস্থিতিতে যে দৈহিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয় তার সম্বন্ধে মনের মধ্যে অনুভূতি থেকেই প্রক্ষোভ জাগে। অতএব এই তত্ত্ব অনুযায়ী শারীরিক উত্তেজনা ও প্রক্ষোভ একই ঘটনার নামান্তর মাত্র।

জেমস-ল্যাংগ তত্ত্বের সমালোচনা

এই তত্ত্বটির অভিনবত্ব মনোবিজ্ঞানের জগতে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি করে

এবং প্রক্ষোভের উপর বহু আধুনিক গবেষণার জনক হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য আধুনিক পরীক্ষণগুলি থেকে যে সব সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে সেগুলি জেমস-ল্যাংগের তত্ত্বটির বিরুদ্ধেই যায়।

আমরা দেখেছি যে প্রক্ষোভঘটিত শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলির পিছনে আছে অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীর কাজ। এই স্নায়ুমণ্ডলী বেয়ে উত্তেজনা শরীরের অভ্যন্তরস্থ বিভিন্ন গ্রন্থি, মাংসপেশী প্রভৃতিতে পৌছয় বলেই শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলি দেখা দেয়।

এখন এই অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলী এবং মস্তিষ্কের মধ্যে যে সংযোগ সেটিকে যদি কোনরূপে ছিন্ন করে দেওয়া যায় বা কোন আকস্মিক ঘটনায় যদি সেটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে শরীরের অভ্যন্তরস্থ মাংসপেশী, গ্রন্থি ইত্যাদিগুলি আর সক্রিয় হয়ে উঠবে না এবং তার ফলে প্রক্ষোভঘটিত কোন শারীরিক প্রতিক্রিয়া আর ঘটতে পারবে না। সুতরাং জেমস-ল্যাংগের তত্ত্বটি যদি সত্য হয় তাহলে কোন প্রাণীর অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীটিকে যদি তার প্রধান মস্তিষ্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায় তাহলে তার প্রক্ষোভের অনুভূতি আর জাগবে না। এই তত্ত্ব অনুযায়ী শারীরিক প্রতিক্রিয়া থেকেই প্রক্ষোভ জেগে থাকে এবং মস্তিষ্ক থেকে অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীটি যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা হলে শারীরিক প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হবার কোন সম্ভাবনা আর থাকে না। কিন্তু বহু পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীটি মস্তিষ্ক থেকে বিছিন্ন করে দেওয়া সত্ত্বেও প্রাণীর মধ্যে প্রক্ষোভের যথেষ্ট অনুভূতিই দেখা দেয়।

সেরিংটন (Sherrington) একটি কুকুরের শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রপাতির সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের যোগাযোগ ছিন্ন করে দেন। ফলে কুকুরটির ক্ষেত্রে কোনরূপ দৈহিক উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেল যে কুকুরটি স্পষ্টই ভয়, রাগ ইত্যাদির চিহ্ন প্রকাশ করতে সমর্থ হল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রক্ষোভের বাহ্যিক প্রকাশ অন্তর্দৈহিক যন্ত্রাদির সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে না। এই পরীক্ষণটি অবশ্য আংশিকভাবে জেমস-ল্যাংগের তত্ত্বের বিরুদ্ধে যায়। কেননা যেহেতু কুকুরটির মনে যে সত্যই ভয়, রাগ ইত্যাদি প্রক্ষোভগুলি জেগেছিল তার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না সেহেতু এ পরীক্ষণটি সম্পূর্ণভাবে জেমস-ল্যাংগের তত্ত্বটিকে অপ্রমাণিত করতেও পারছে না।

ক্যানন (Cannon) একটি বিড়ালের সিমপ্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডলীটি বিচ্ছিন্ন করে দেন এবং তার ফলে অন্তর্দৈহিক যন্ত্রপাতিগুলির সক্রিয়তা একেবারে বন্ধ

হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে কুকুর দেখলে বিড়ালটির মধ্যে আগে যেমন রাগের চিহ্নগুলি প্রকাশ পেত পরেও ঠিক তেমনই প্রকাশ পাচ্ছে।

মানুষের ক্ষেত্রেও প্রায় একই ধরনের সিদ্ধান্ত পাওয়া গেছে। একজন চল্লিশ-বৎসর বয়স্কা মহিলা একবার ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং ফলে তাঁর সিম্প্যাথেটিক স্নায়ুমণ্ডলী ও মস্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রেও দেখা গেল যে মহিলাটির মধ্যে দুঃখ, আনন্দ, বিরাগ ইত্যাদি প্রক্ষোভ-গুলির অনুভূতি ঠিক পূর্বের মতই রয়েছে।

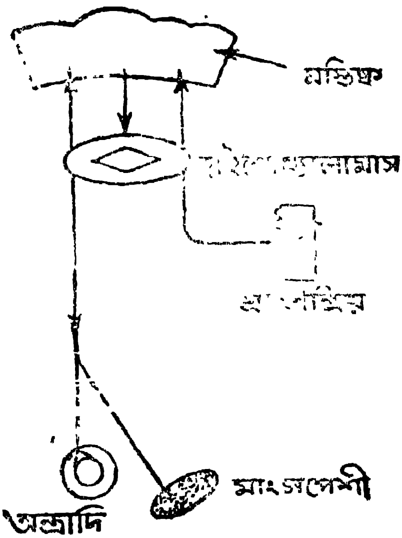
উপরের পরীক্ষণগুলি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে শারীরিক প্রতিক্রিয়া এবং মানসিক অনুভূতি এ দুটি এক বস্তু নয় এবং প্রথম থেকে দ্বিতীয়টি প্রসূতও নয়।

আর একটি পরীক্ষণেও জেমস-ল্যাংগের তত্ত্বটির অসম্পূর্ণতা প্রকাশ পায়। কৃত্রিম প্রক্রিয়ার সাহায্যে শারীরিক উত্তেজনা সৃষ্টি করে দেখা গেল যে তা থেকে প্রক্ষোভ জাগে কিনা। ব্যক্তির শরীরে এ্যাড্রেনালিন (Adrenalin)প্রবেশ করিয়ে দিয়ে কৃত্রিম দৈহিক উত্তেজনার সৃষ্টি করা হল। কিন্তু দেখা গেল যে সে উত্তেজনা থেকে ভয়, রাগ প্রভৃতি কোন সুনির্দিষ্ট প্রক্ষোভ সত্যকারের মনে অনুভূত হয় না। অতএব সিদ্ধান্ত করা যায় যে শারীরিক উত্তেজনা প্রক্ষোভ জাগরণের কারণ নয়।

ক্যাননবার্ডের থ্যালামাসমূলক তত্ত্ব (Cannon-Bard's Thalamic Theory)

প্রক্ষোভের উপর আধুনিককালে যে তত্ত্বটি প্রসিদ্ধি লাভ করেছে সেটি হল ক্যানন-বার্ডের থ্যালামাসমূলক তত্ত্ব। এই তত্ত্বটিকে জেমস-ল্যাংগের মৌলিক বক্তব্যটির বিরোধিতা করা হয়েছে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে উত্তেজনা গিয়ে পৌঁছয় মস্তিষ্কে এবং মস্তিষ্ক থেকে পৌঁছয় মস্তিষ্কের নিম্নভাগে অবস্থিত থ্যালামাস নামক একটি স্থানে। ক্যাননের মতে থ্যালামাসটি (আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে থ্যালামাসের অন্তর্গত হাইপো-থ্যালামাসটি) স্নায়বিক উত্তেজনার সমন্বয়ের ক্ষেত্র বিশেষ। এখান থেকে উত্তেজনার কিছুটা চলে যায় মস্তিষ্কে এবং সেখানে গিয়ে প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ণয় করে। অর্থাৎ রাগ, না আনন্দ, না ভয় কোন্ ধরনের প্রক্ষোভ ব্যক্তি অনুভব করবে তা মস্তিষ্ক নির্ধারিত করে দেয়। আবার কিছুটা উত্তেজনা থ্যালামাস থেকে নেমে আসে অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীতে এবং সেখান থেকে শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রপাতি, মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে। তার ফলেই নানা-প্রকার শারীরিক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই তত্ত্বটি ক্যানন এবং বার্ড যুগ্মভাবে

প্রকাশ করেন বলে এর নাম ক্যানন-বার্ড তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বে থ্যালামাসের সক্রিয়তার মাধ্যমে প্রক্ষোভের বর্ণনা করা হয়েছে বলে এই তত্ত্বটিকে প্রক্ষোভের থ্যালামাসমূলক তত্ত্বও (Thalamic Theory of Emotion) বলা হয়। একথা অবশ্য প্রমাণিত হয়েছে যে প্রক্ষোভ থেকে যে শারীরিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তা থেকে সঞ্জাত উত্তেজনা আবার স্নায়ুপথ বেয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছয়



[প্রক্ষোভের উপর ক্যানন-বার্ড তত্ত্বের চিত্ররূপ]

এবং সেখানে জাগরিত প্রক্ষোভের অনুভূতিকে তীব্রতর করে তোলে। অতএব শারীরিক উত্তেজনা প্রক্ষোভকে জাগাতে না পারলেও তাকে যে তীব্র বা বর্ধিত করতে সাহায্য করে একথা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন।

প্রক্ষোভের উৎপত্তি ও বিকাশ

প্রাথমিক প্রক্ষোভের স্বরূপ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। সংখ্যা ও তীব্রতা উভয় দিকে দিয়েই পরিণত ব্যক্তির প্রক্ষোভ নবজাত শিশুর চেয়ে যে অনেক বেশী এটি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা। অতএব নবজাতক জন্মের সময় কতগুলি এবং কি প্রকৃতির প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায় এবং কেমন করে সেই প্রাথমিক প্রক্ষোভগুলি ধীরে ধীরে জটিল ও বহুমুখী হয়ে ওঠে তা নিয়ে বহু ব্যাপক পরীক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে।[১]

১। পৃঃ ২১—পৃঃ ২৭

১৯২০ সালে ওয়াটসন শিশুদের পর্যবেক্ষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসেন যে নবজাতক জন্মের সময় মাত্র তিনটি মৌলিক প্রক্ষোভ নিয়ে জন্মায়, যথা, ভয়, রাগ এবং আনন্দ। ভয় আবার জাগাতে পারে মাত্র দুটি উদ্দীপক, যেমন, উচ্চশব্দ এবং হঠাৎ পড়ে যাওয়া। রাগ জাগাতে পারে যে উদ্দীপকটি সেটি হল দৈহিক প্রতিরোধের সৃষ্টি এবং আনন্দ জাগাতে পারে আদর করা, হাত বুলানো ইত্যাদি। কিন্তু পরে শারমান (Sherman) প্রমাণ করেছেন যে এই তিনটি প্রক্ষোভের অভিব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য ধরা সম্ভব হয় না যদি না আগে থেকে ঐ উদ্দীপকের স্বরূপটি আমাদের জানা থাকে।

•

অনেক মনোবিজ্ঞানী আবার একটিমাত্র প্রাথমিক প্রক্ষোভের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন। আরউইন (Irwin) এই মৌলিক প্রক্ষোভটির নাম দিয়েছেন সামগ্রিক সক্রিয়তা (Mass Activity)। ব্রিজেসের (Bridges) মতে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভটির নাম দেওয়া যায় উত্তেজনা (Excitement)। একথা অবশ্য সত্য যে ছোট শিশুর প্রক্ষোভমূলক আচরণগুলির মধ্যে পার্থক্য করা খুবই শক্ত এবং দেখা গেছে যে যদি উদ্দীপকের প্রকৃত স্বরূপ না জানা থাকে তবে কেবলমাত্র শিশুর প্রতিক্রিয়া দেখে বিভিন্ন দর্শক কারণরূপে বিভিন্ন প্রক্ষোভের উল্লেখ করে থাকেন। সেইজন্য বলা চলে যে নবজাতকের প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার কোন বিশেষ রূপ বা সুনির্দিষ্ট অভিব্যক্তি নেই এবং সেটা রাগ, কি আনন্দ, কি ভয় থেকে উৎপন্ন একথা আচরণ দেখে বলা শক্ত।

একটি শিশুভবনে নবজাতক থেকে সুরু করে দু'বৎসর বয়সের বহু শিশুর প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে ব্রিজেস শৈশবে প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশের একটি বিবরণী দিয়েছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে নবজাতকের মধ্যে জন্মের সময় প্রক্ষোভ বলতে একটা সাধারণধর্মী উত্তেজনা ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু দু'তিন মাসে তার মধ্যে আনন্দ এবং অস্বাচ্ছন্দ্য পরিষ্কাররূপে দেখা দেয়। তার পরের তিন মাসে অস্বাচ্ছন্দ্য বিশেষায়িত হয়ে রূপ নেয় রাগ, বিরক্তি এবং ভয়ে এবং ১২ মাসের সময় আনন্দ বিশেষায়িত হয়ে উচ্ছ্বাস এবং ভালবাসায় পরিণত হয়। হিংসা এবং ছোটদের প্রতি ভালবাসা জাগে ১৫ মাসের সময়। যদিও বয়স অনুযায়ী এই সময়ের বিভাগকে সর্বজনীন বলে ধরে নেওয়া যায় না, তবুও এই বিবরণী থেকে প্রক্ষোভের ক্রমবিকাশের একটি মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়।

প্রাথমিক ও মিশ্র প্রক্ষোভ

(Primary and Secondary Emotions)

ম্যাক্‌ডুগাল প্রক্ষোভকে প্রাথমিক ও মিশ্র এই দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তাঁর মতে প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রস্থলে একটি বিশেষ প্রক্ষোভ আছে। মানুষের ক্ষেত্রে এই সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা সতেরটি। অতএব ম্যাক্‌ডুগালের মতে এই সতেরটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রগত সতেরটি প্রক্ষোভ প্রাথমিক প্রক্ষোভের পর্যায়ে পড়ে।

আবার একটি প্রাথমিক প্রক্ষোভ অন্য একটি বা একাধিক প্রক্ষোভের সঙ্গে মিশে নতুন একটি প্রক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে। এই নতুন প্রক্ষোভগুলির তিনি নাম দিয়েছেন মিশ্র প্রক্ষোভ। যেমন, ম্যাক্‌ডুগালের মতে কৃতজ্ঞতা হল মমতা এবং হীনমন্যতার মিশ্রণ, প্রশংসা হল বিস্ময় ও হীনমন্যতার মিশ্রণ, ঘৃণা হল ক্রোধ, বিরক্তি ও ভয়ের মিশ্রণ, লজ্জা হল হীনমন্যতা ও আত্মগরিমার মিলিত রূপ ইত্যাদি। এইভাবে ম্যাক্‌ডুগাল মানব-মনের সমস্ত জটিল প্রক্ষোভেরই একটা বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

জটিল প্রক্ষোভগুলির মধ্যে যে একাধিক মৌলিক প্রক্ষোভের প্রভাব পাওয়া যায় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ম্যাক্‌ডুগালের বিবরণ মত এত পরিষ্কার ও সহজভাবে যে সেগুলিকে বিশ্লেষণ করা যায় এ কথা আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন না। তাছাড়া প্রাথমিক প্রক্ষোভ বলতে ম্যাক্‌ডুগাল যা বোঝাতে চান সেই ধরনের একেবারে অমিশ্র প্রক্ষোভ বলেও কিছু আছে কিনা সন্দেহ। বস্তুত পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সব প্রক্ষোভই অল্প-বিস্তর মিশ্রধর্মী।

প্রক্ষোভ ও শিক্ষা (Emotion & Education)

(শিক্ষার উপর প্রক্ষোভের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতির দিক দিয়ে প্রক্ষোভ ও শিক্ষা বিপরীতধর্মী অর্থাৎ প্রক্ষোভ হল অনুভূতিমূলক আর শিক্ষা হল জ্ঞানমূলক। তবুও দু'য়ের মধ্যে সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। কারণ কোন জ্ঞানই বিশেষ কোনও অনুভূতি ছাড়া ঘটে না। তাছাড়া প্রক্ষোভের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হল যে প্রক্ষোভই আমাদের সকল কাজের পিছনে প্রেষণা বা শক্তি জোগায়।) ম্যাক্‌ডুগালের সংব্যাখ্যানে আমাদের সকল কাজের পেছনে আছে প্রবৃত্তির সক্রিয়তা এবং প্রবৃত্তির কেন্দ্রে আছে একটি ইচ্ছামূলক ও অনুভূতিমূলক শক্তি এবং এটিকেই আমরা সাধারণত প্রক্ষোভ বলে থাকি।

(বস্তুত শরীরতত্ত্বের দিক দিয়ে প্রক্ষোভের জাগরণের ফলে শরীরের অভ্যন্তরস্থ অটোনমিক স্নায়ুমণ্ডলীটি সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং বিভিন্ন গ্রন্থি থেকে রস নিঃসরণ হয়। এই রস বা হর্মোনগুলিই আমাদের শরীরকে প্রয়োজনমত উত্তেজিত ও কর্মক্ষম করে তোলে এবং তার ফলেই আমরা শারীরিক প্রচেষ্টা করতে সমর্থ হই। অতএব প্রক্ষোভের জাগরণ শিক্ষায় সাফল্যের জন্য অপরিহার্য)

(অবশ্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সকল প্রকার প্রক্ষোভই অনুকূল নয়। এমন কতকগুলি প্রক্ষোভ আছে যেগুলি নিঃসংশয়ে শিখন প্রক্রিয়ার প্রতিকূল অর্থাৎ সেগুলি জাগলে শিখন প্রক্রিয়াটি ব্যাহত হবেই, যেমন, রাগ, ভয়, বিরক্তি, দুঃখ, হীনমন্যতা ইত্যাদি। আবার তেমনই কতকগুলি প্রক্ষোভ আছে যেগুলি শিখনের পরম সহায়ক, যেমন, আনন্দ, বিস্ময়, কৌতূহল, সৃজনীস্পৃহা, আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা ইত্যাদি। অবশ্য সময় সময় হীনমন্যতা, রাগ, ভয় প্রভৃতিও কিছু পরিমাণে শিখন-প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে থাকে, তবে তা স্বাভাবিক পন্থায় নয় এবং মোটের উপর ঐগুলি উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী করে থাকে।)

দ্বিতীয়ত, (অনুকূলই হোক্ আর প্রতিকূলই হোক্ প্রক্ষোভ যদি অতি তীব্র হয়ে ওঠে তবে শিখন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবেই। প্রক্ষোভের প্রেষণা-শক্তি ততক্ষণ কার্যকর থাকে যতক্ষণ প্রক্ষোভ তার স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। প্রক্ষোভ অতি তীব্র হলে দৈহিক ও মানসিক সাম্য উভয়ই নষ্ট হয়ে যায়। তখন স্বাভাবিক ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে কাজ করা ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব হয় না।) এই প্রসঙ্গে ড্রেভারের প্রক্ষোভের অবরোধের তত্ত্বের (Baulking Theory of Emotion) উল্লেখ করা যায়। প্রক্ষোভ জাগ্রত না হলে যেমন কোনও কাজ করার প্রেষণা জাগে না, তেমনই যদি প্রক্ষোভ অতিরিক্ত মাত্রায় জাগ্রত হয়ে ওঠে তাহলে শিশুর সাধারণ কর্মক্ষমতার মান নীচু হয়ে যায় এবং যতটুকু করা তার পক্ষে সাধ্য তাও সে করে উঠতে পারে না। (এই জন্য শিক্ষাদানকালে শিক্ষকের সব সময়ে দেখা কর্তব্য যে শিশুর প্রক্ষোভ যেন অতি মাত্রায় তীব্র না হয়ে ওঠে।)

তৃতীয়ত, (বিস্মরণের একটা বড় কারণ হল প্রাক্ষোভিক প্রতিরোধ। আনন্দ, ভয়, বিরক্তি প্রভৃতি যে কোন প্রক্ষোভই যখন অতি তীব্র হয়ে ওঠে তখন মনে করা, মনোযোগ দেওয়া, সুশৃঙ্খল চিন্তা করা ইত্যাদি মানসিক কাজগুলি ব্যক্তির পক্ষে সম্পন্ন করা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। অথচ এই প্রক্রিয়াগুলি যে কোন বস্তুর শিখনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

চতুর্থ, শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে আনন্দ বা তৃপ্তিরূপ প্রক্ষোভের বিশেষ ভূমিকা আছে। শিশু যখন শেখে তখন যদি সে তার শেখার মধ্যে আনন্দ বা তৃপ্তি

বোধ করে তাহলে তার শিক্ষা দ্রুত ও কার্যকর হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে যদি শেখার সময় সে অতৃপ্তি বা নিরানন্দ বোধ করে তাহলে তার শিক্ষা মন্থর এবং অনেক সময় নিষ্ফল হয়ে ওঠে। থর্নডাইকের প্রসিদ্ধ ফলভোগের সূত্রটি (Law of Effect) এই তথ্যটিরই পোষকতা করে। কোনও কাজ করার সময় যদি শিশু মাঝে মাঝে সাফল্যের আনন্দ লাভ করে তাহলে তার প্রচেষ্টা যে দ্রুত সাফল্য আনে এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে একঘেয়েমি ও বিরক্তি দূর করে এ তথ্যটি বহু পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার সুসম্পাদনের জন্য প্রয়োজন (১) যাতে শিশুর মনে অনুকূল প্রক্ষোভ জাগে তা দেখা, (২) যাতে প্রতিকূল প্রক্ষোভ শিশুর শিক্ষা প্রচেষ্টায় বাধার সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে যত্ন নেওয়া, (৩) যাতে প্রক্ষোভ কখনই স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে না যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা, এবং (৪) যাতে শিশু শেখার মধ্যে মধ্যে সাফল্যের আনন্দ বা তৃপ্তি বোধ করে তার আয়োজন করা।

বার

কয়েকটি প্রধান প্রক্ষোভ (Some Major Emotions)

মানব আচরণের উপর প্রক্ষোভের প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর। মানুষ যুক্তিধর্মী বলে গর্ববোধ করলেও তার অধিকাংশ আচরণ কিন্তু প্রক্ষোভের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। অতএব শিক্ষার্থীর আচরণকে ভালভাবে বুঝতে হলে বিভিন্ন প্রক্ষোভের প্রকৃতি ও কাজ সম্বন্ধে ঘনিষ্ঠ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। নীচে কয়েকটি প্রধান প্রধান মানব প্রক্ষোভের বর্ণনা দেওয়া হল।

রাগ (Anger)

বৈচিত্র্য ও তীব্রতার দিক দিয়ে রাগ নানা শ্রেণীর হতে পারে। সামান্য বিরক্ত হওয়া থেকে সুরু করে রেগে আগুন হয়ে যাওয়া সবই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। হিংসার ক্ষেত্রে এই রাগই ভয়ের সঙ্গে, কখনও কখনও বা দুঃখের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে : ঘৃণায় থাকে রাগ এবং ভয়।

অতি শৈশবে শিশুর রাগ হয় প্রধানত যখন তার কাজে বা ইচ্ছায় কেউ বাধা দেয়। কিন্তু পরে বড় হলে তার ইচ্ছা, পরিকল্পনা, সম্মান, কার্যাবলী প্রভৃতিতে সত্যকার বাধাদান ছাড়াও কেবলমাত্র বাধাদানের আশঙ্কাও রাগের সৃষ্টি করে। রাগ মানেই হচ্ছে একপ্রকার মানসিক দুর্বলতা। ব্যক্তির নিজের সম্পর্কে আশা এবং তার প্রকৃত যোগ্যতা—এ দু'য়ের মধ্যে যত বেশী পার্থক্য বা বৈষম্য দেখা দেবে তত বেশী তার রাগের কারণ ঘটবে।

শৈশবে রাগের প্রকাশ থাকে সর্বদৈহিক। সমস্ত দেহ দিয়েই শিশু প্রথম প্রথম রাগ প্রকাশ করে কিন্তু সে যত বড় হয় ততই তার রাগের অভিব্যক্তি-গুলি বিশেষধর্মী ও সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। পরিণত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাগের প্রকাশ নিছক রক্তচক্ষুতে বা ভ্রূকুঞ্চনে পর্যবসিত হতে পারে।

ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক উভয় ক্ষেত্রেই ক্রোধের প্রকাশ ক্ষতিকর। রাগের সময় অ্যাড্রেনালিনের নিঃসরণ, দৈহিক যন্ত্রপাতির অস্বাভাবিক কর্মতৎপরতার বৃদ্ধি, অতিরিক্ত শর্করার নিঃসরণ এবং পরিপাচনক্রিয়ার স্থগিতভবন ইত্যাদি দেহের সাম্যভাবকে নষ্ট করে দেয়। তেমনই মনের সমতা ও স্বাস্থ্যের উপরও রাগের প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর।

মনোবিজ্ঞানীরা শিশুর কোন্ বয়সে কি কি কারণে রাগ জন্মায় তার একটা বিবরণ দিয়েছেন। শিশুর ইচ্ছা, প্রচেষ্টা বা কর্মপ্রয়াসের উপর যখনই কোন-রকম বাধা বা প্রতিরোধ আরোপিত হয় তখনই তার মধ্যে রাগ দেখা দেয়। প্রথম শৈশবে রাগ দৈহিক কারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। শরীরের সঞ্চালনে বাধা, শারীরিক অস্বস্তি, স্নান, খাওয়া, পোষাক পরা ইত্যাদি সাধারণ কাজে অসামর্থ্যবোধ প্রভৃতি কারণই খুব শৈশবে শিশুর রাগের সৃষ্টি করে থাকে। যেমন, ঠিকমত মুখে খাবার তুলতে না পারলে বা পোষাক না পরতে পারলে শিশুর মধ্যে রাগ দেখা দেয়।

তাছাড়া নিজের অক্ষমতা বা অসুবিধা ভাষায় প্রকাশ করতে পারে না বলে শিশুর রাগ আরও বেড়ে যায়। শিশু যদি বোঝে যে তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না তাহলেও সে রেগে যায়।

আর একটু বড় হলে নানা মানসিক ও প্রাক্ষোভিককারণে শিশুর রাগ দেখা দেয়। নিজের কোন সম্পত্তি বা অধিকারের সামগ্রীতে যদি কেউ হস্তক্ষেপ করে তাহলে সে রেগে যায়। সমবয়সীদের সঙ্গে খেলনা নিয়ে এ সময়ে প্রায় মারামারি লেগে থাকে। যদি তাকে কোন কাজ করতে বাধ্য করা হয় বা তার কোনও কাজ বা খেলায় বাধার সৃষ্টি করা হয় তাহলেও রাগ দেখা দিয়ে থাকে। শিশুকে বকাবকি করলে বা শাস্তি দিলে তার রাগ হয়। নিজে যদি কোন ভুল করে ফেলে বা যদি কোন খেলনা বা বস্তু ঠিকমত ব্যবহার করতে না পারে তাহলেও সে রেগে ওঠে। শিশুর রাগমাত্রেরই একটা সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য হল যে যখন সে কোন না কোন রকম বাধ্যতামূলক চাপ অনুভব করে তখনই সে রেগে যায়। যেমন, কোন কাজ করতে বা না করতে তাকে বাধ্য করা হচ্ছে, কিংবা কোন ইচ্ছাকে সে দমন করতে বাধ্য হচ্ছে, কিংবা জোর করে তাকে কোন অসুবিধা অনুভব করান হচ্ছে ইত্যাদির ক্ষেত্রে শিশুর স্বভাবতই রাগ জন্মায়।

পরিণত ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাগ সৃষ্টির প্রধান কারণগুলি হল, ইচ্ছার দমন, কাজে বাধাদান, আচরণের দোষ ধরা, সমালোচনা করা, বিরক্ত করা, বক্তৃতা দেওয়া বা লম্বা উপদেশ দেওয়া, অপ্রীতিকর তুলনা করা ইত্যাদি। তাছাড়া অবহেলিত হওয়া, ভর্ৎসিত হওয়া, অপরের হাস্য বা বিদ্রূপের পাত্র হওয়া, অন্যায়ভাবে শাসিত হওয়ার বোধ জন্মান, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়া প্রভৃতি ঘটনাগুলিও পরিণত বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে রাগসৃষ্টির প্রবল কারণরূপে

কাজ করে থাকে। পরে যখন তার আগ্রহ ক্রমশ গৃহের পাঁচিল ডিঙিয়ে বাইরের সমাজে সঞ্চালিত হয় তখন বহির্জগতে নানা প্রতিবন্ধক ও অসুবিধা তাকে প্রতিপদে বিরক্ত করে তুলতে থাকে।

প্রাক্‌যৌবনে এই প্রতিবন্ধকের পরিমাণ ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং ছেলে-মেয়েদের রাগও সেইভাবে বেড়ে চলে। এই বয়সে রাগের একটা সাধারণ কারণ হল যে তাদের মনে এই ধারণা জন্মায় যে তারা অন্যায়ভাবে শাসিত বা ভর্ৎসিত হচ্ছে। তাছাড়া ছেলেমেয়েদের নিজেদের ঈপ্সিত লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছনর ক্ষমতা—এ দু'য়ের মধ্যে ব্যবধানই হল এই বয়সে রাগের আর একটি বড় কারণ। এ ব্যবধান যত বাড়তে থাকে তত তাদের রাগের তীব্রতা বাড়ে।

আরও পরিণত বয়সে ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গ রাগের প্রধান উদ্দীপকরূপে কাজ করে থাকে। এই ব্যর্থতা বা আশাভঙ্গ নানা কারণে ঘটতে পারে। ব্যক্তির নিজের সুখ-সুবিধা, প্রিয়জনের আনন্দ ও উন্নতি, সামাজিক স্বীকৃতি, অর্থ, মান ও প্রতিপত্তির কামনা প্রভৃতি ব্যক্তির নানা মৌলিক প্রয়োজনের তরঙ্গ বহির্জগতের রূঢ় বাস্তবের শৈলে ধাক্কা লেগে ব্যক্তির কাছে ফিরে আসে এবং তার ফলে ব্যক্তির মধ্যে রাগের সৃষ্টি হয়।

রাগের প্রকাশও শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম প্রথম নিচক শারীরিক অভিব্যক্তিতেই রাগ সীমাবদ্ধ থাকে। তারপর যত শিশু বাইরের পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয় ততই সে তার রাগের বহি-প্রকাশকে সঙ্কুচিত করতে বাধ্য হয়। তার ফলে রাগের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি নিয়ন্ত্রিত ও পরিবর্তিত হয়ে নানা বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। ক্রমশ চীৎকার, কান্না, হাত পা ছোঁড়া প্রভৃতি শৈশবের আচরণগুলি সংযত হয়ে মার্জিত ও সমাজসম্মত আকার নেয়।

তবে সময় সময় রাগের কিছু উপকারিতাও দেখা যায়। রাগ ব্যক্তির আলস্য, ঔদাসীনতা ও নিরুৎসাহ প্রভৃতি দূর করে দিয়ে তাকে কাজে প্রবৃত্ত করতে পারে। কখনও কখনও শিশুর রাগ দেখে পিতামাতা বা শিক্ষক প্রভৃতি নিজেদের ব্যবহারের ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হতে পারেন। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাগ ব্যক্তির এবং তার পরিবেশের আর সকলের পক্ষে অমঙ্গলকরই হয়ে থাকে।

বার বার রাগ হতে হতে শেষে রাগ অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। তখন শিশুর পক্ষে রাগকে সংযত করা দুরূহ হয়ে ওঠে। এইজন্য শিশুর রাগের

কারণটি আগে থেকে দূর করতে হবে এবং যাতে শিশুর রাগ অভ্যাসে পরিণত না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে।

অবশ্য সব সময় শিশুর রাগকে জোর করে দমন করা উচিত নয়। যেখানে ব্যর্থতা থেকে রাগ হয় সেখানে ব্যর্থতা দূর করার কোন ব্যবস্থা না করে কেবল মাত্র রাগ দমন করলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণই হয়। সেজন্য শিশুর রাগকে অসামাজিক পথে অভিব্যক্ত হতে না দিয়ে সমাজসম্মত পথে যাতে প্রকাশ পায় তার ব্যবস্থা করাই হল সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়।

শিশুর রাগের কারণগুলি যাতে না থাকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রথম দরকার। অনর্থক তার আচরণ বা ইচ্ছায় বাধা সৃষ্টি না করা উচিত। যে সকল কাজ শিক্ষার্থীর কাছে রুচিকর নয় সেগুলি তাকে করতে না দেওয়াই ভাল। দুরূহ কাজ, একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি, অনর্থক প্রতিরোধ সৃষ্টি, অসম্ভব দাবী ইত্যাদি যতদূর সম্ভব বর্জন করা উচিত। শিশুকে হুকুম করা বা তার অসাফল্য নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করা একেবারে বর্জনীয়। তাছাড়া জোর করে বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে শিশুর কাছে থেকে কাজ আদায় করার প্রথাটিও অতি ক্ষতিকর।

শিক্ষার্থীর রাগের চিকিৎসা করতে গিয়ে নিজে রেগে যাওয়াটা সব চেয়ে ক্ষতিকর। যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে ও সংযতভাবে শিক্ষার্থীর রাগের কারণ নির্ণয় করা এবং সহানুভূতি ও বিবেচনার সঙ্গে তার মীমাংসা করাই পিতামাতা ও শিক্ষকের কর্তব্য।

ভয় (Fear)

রাগের মত ভয়ও মাত্রা ও প্রকাশের দিক দিয়ে নানা প্রকারের হতে পারে। সামান্য আশঙ্কা বোধ করা থেকে সুরু করে ভয়ে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতেও পারে। শিশুর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে উচ্চ শব্দ বা হঠাৎ পড়ে যাওয়া এ দুটি কারণই একমাত্র ভয় জাগাতে পারে। কিন্তু পরিণত মানুষের ক্ষেত্রে ভয় জাগাতে সক্ষম এমন উদ্দীপক সংখ্যায় যেমন প্রচুর, প্রকৃতিতেও তেমনি তারা বহুবিধ।

বিভিন্ন পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে যে শিশুর ভয় জাগরণের উৎস তিন রকমের। প্রথম, কতকগুলি ভয় শিক্ষাপ্রসূত বা অভিজ্ঞতাপ্রসূত। স্বাভাবিক ভয়ের কারণগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে অনেক ক্ষেত্রে অবাস্তব বিষয়েতেও ভয় সঞ্চালিত হয়ে যায়। যেমন উচ্চশব্দ বা অন্ধকারের সঙ্গে সংযুক্ত

থাকার ফলে শিশু অনেক নির্দোষ বস্তুকেও ভয় করতে শেখে। দ্বিতীয়, ভীত ব্যক্তিকে অনুকরণ করে শিশু অনেক ক্ষেত্রে নতুন নতুন বস্তুকে ভয় করতে শেখে। যেমন, ভূমিকম্প, ঝড়বৃষ্টি ইত্যাদিকে শিশু ভয় করতে শেখে তার মা-বাবা, বড় ভাই বোনদের ভীতিমূলক আচরণ দেখে। ভয়ের তৃতীয় উৎস হল অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা। যেমন ডাক্তার, দাঁতের ডাক্তার, হাসপাতাল, বড় বড় জন্তু, রুক্ষদর্শন মানুষ ইত্যাদির সংস্পর্শে এসে শিশু ঐ সব বস্তুকে ভয় করতে শেখে। অপ্রীতিকর স্বপ্ন থেকেও ঐ ধরনের ভয় জেগে থাকে।

ভয়ের উদ্দীপক যতই বিভিন্ন হোক্ না কেন, এক কথায় বলা চলে যে যখনই প্রাণীর সঙ্গতিবিধানের সামর্থ্যের চেয়ে উদ্দীপকের চাহিদা আকস্মিক ভাবে বেড়ে যায় তখনই প্রাণীর মধ্যে ভয় জাগে। পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি-বিধানের অক্ষমতা সম্বন্ধে প্রাণীর সচেতনতার নামই ভয়। শৈশবে এই অক্ষমতা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়মূলক বা দৈহিক সঙ্গতিবিধানে সীমাবদ্ধ থাকে, পরে শিশু যত বড় হয় ততই তার ভয় দৈহিক সঙ্গতিবিধানের গণ্ডী ছেড়ে সামাজিক সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে সঞ্চালিত হয়। সাধারণত ভয় দু'শ্রেণীর। কারণজাত (Rational) ও অকারণ (Irrational)। অনেক ভয় প্রকৃত ও বাস্তব কারণ থেকে জন্মায়, আবার অনেক ভয় মিথ্যা বা অবাস্তব কোন ধারণা বা বিশ্বাস থেকে গঠিত হয়ে থাকে। তবে কারণজাতই হোক্, আর অকারণই হোক্, ভয় মাত্রেই শিশুর অভিজ্ঞতা থেকে জন্মায়।

ওয়াটসন ব্যাপক পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে ভয় হচ্ছে একটি সহজাত প্রক্ষোভ এবং মাত্র দুটি উদ্দীপকই নবজাতকের মধ্যে ভয় জাগাতে সমর্থ হয়। প্রথমটি হল উচ্চশব্দ, দ্বিতীয়টি হল হঠাৎ ভারসাম্য হারান। নবজাতক এই দুটি কারণ ছাড়া অন্য কিছুতে ভয় পায় না। তবে যত সে বড় হয় তার ভয় এই দুটি উদ্দীপক থেকে আরও অন্যান্য উদ্দীপকে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার (Conditioning) মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়ে যায়।

প্রথম প্রথম শিশুর ভয় নিছক মূর্তবস্তু এবং তার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু তিন চার বছর বয়স থেকেই কাল্পনিক এবং দূরবর্তী নানা উদ্দীপকে তার ভয় সঞ্চালিত হয়ে যায়। এই সময় শিশুর ভয়মূলক উদ্দীপকের সংখ্যা অগণিত হয়ে ওঠে। আর একটু বড় হলে তার এই অমূলক ভয়ের কারণগুলি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয় এবং প্রকৃত বস্তু বা বাস্তব পরিস্থিতিতে ভয় কেন্দ্রীভূত হয়ে ওঠে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই শৈশবকালীন ভয়ের কারণগুলি

একেবারে দূর হয় না এবং বহু পরিণত ব্যক্তির মধ্যে অন্ধকার, উচ্চশব্দ, ভূত-প্রেত প্রভৃতি শৈশবকালীন ভয়ের উদ্দীপকগুলি কার্যকর থেকে যায়।

দশ বার বছরের শিশুর মধ্যে বাস্তব বস্তুর চেয়ে মানসিক বা অবাস্তব বস্তুর প্রতি ভয় বেশী জাগতে দেখা যায়। ভূত প্রেত ইত্যাদি দৈব বা অপ্রাকৃত বস্তু, দৈত্য দানব প্রভৃতি নানা কাল্পনিক প্রাণী, মৃত্যু, আঘাতপ্রাপ্তি, বজ্রপাত, বিদ্যুৎ, নানা গল্পে পড়া বা শোনা বা সিনেমায় দেখা বিভিন্ন ভীতিকর চরিত্র প্রভৃতির প্রতি ভয় তার মধ্যে জন্ম নেয়।

শিশু আর একটু বড় হলে ভয়ের কারণ ব্যক্তিগত স্তর থেকে সামাজিক স্তরে উন্নীত হয়ে যায়। তখন শিশু অপরের নিন্দা, বিরাগ বা সামাজিক লাঞ্ছনা প্রভৃতিকে শারীরিক বিপদের চেয়ে বেশী ভয় করতে সুরু করে।

শৈশবকালীন ভয়ের মধ্যে অন্ধকারের ভয় একটি প্রধান স্থান অধিকার করে। ওয়াটসনের মতে উচ্চশব্দ থেকে অনুবর্তিত হয়ে অন্ধকারেতে শিশুর ভয় সঞ্চালিত হয়ে যায়। শৈশবকালের আর একটি ভয় হল একা একা থাকা বা পরিত্যক্ত হবার ভয়। শিশুর অসহায়ত্ব ও দুর্বলতাই তাকে পূর্ণভাবে অপরের উপর নির্ভরশীল করে তোলে এবং তাই থেকেই একা থাকা বা পরিত্যক্ত হবার ভয়টা তার মধ্যে বিশেষ করে দেখা দেয়। ফ্রয়েডের মনঃ-সমীক্ষণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী শৈশবকালে শিশুর মধ্যে পিতা কর্তৃক অঙ্গহানির একটা ভয় দেখা দেয়। অতি শৈশবে মার প্রতি শিশুর যৌন আসক্তি জন্মায় এবং সে ভয় পায় যে তার এই অবৈধ কামনার শাস্তিস্বরূপ পিতা তার যৌনাঙ্গের ক্ষতি করবেন। ফ্রয়েড এই শৈশবকালীন ভীতির নাম দিয়েছেন কাস্ট্রেশান কমপ্লেক্স (Castration Complex)।

প্রক্ষোভ হিসাবে ভয় নিকৃষ্টতম ও অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই প্রক্ষোভটি মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত করে ও ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের পথে বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ভয়ের প্রভাব ধ্বংসমূলক। সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্য থেকে ভয় জন্মায়। কিন্তু ভয় বাড়তে থাকলে সেই অসামর্থ্য আরও বেড়ে যায় এবং যতটুকু সঙ্গতিবিধান ব্যক্তির আয়ত্তাধীন ততটুকু করাও তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

ভয় ব্যক্তির মানসিক দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসকে নষ্ট করে দেয়। ভীত ব্যক্তি সব চেয়ে বেশী করুণা করে নিজেকেই। ভয় থেকে মুক্তি পাবার পর ব্যক্তির মধ্যে প্রায়ই আত্মগ্লানি বা আত্মতাচ্ছিল্য দেখা যায়।

ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলি অনেক ক্ষেত্রে ভয়ের জন্য পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না। ফলে মনের মধ্যে দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতা চিরস্থায়ীভাবে থেকে যায়।

এই সকল কারণে শিশুর মধ্যে যাতে ভয় বাসা বাঁধতে না পারে সেদিকে সযত্ন লক্ষ্য রাখা উচিত। শৈশবে যাতে নানা প্রকৃতির অকারণ ও অবাস্তব ভয় এসে শিশুর মনকে দুর্বল না করে ফেলে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য। শিশুর অভিজ্ঞতাগুলিকে ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত করা এবং কোন আকস্মিক আঘাতধর্মী (Trauma) অভিজ্ঞতা যাতে শিশুকে ভয়গ্রস্ত না করে সেদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

দুশ্চিন্তা ভয়ের সহগামী। বহু অবাস্তব ভয় পরিণত বয়সে দুশ্চিন্তার রূপ নিয়ে দেখা দেয় এবং সুস্থ মানসিক প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। এই ধরনের অবাস্তব ভয় (Phobia) মানসিক শক্তি ও সহজাত সম্ভাবনাগুলিকে নষ্ট করে দেয় এবং অনেক সময় মনোবিকারের কারণও হয়ে ওঠে।

কারও কারও মতে ভয়ের উপকারিতাও আছে। উদাহরণস্বরূপ, ভয় মানুষকে দুঃসাহসিক কাজ থেকে বিরত করে, অপরাধ থেকে নিবৃত্ত করে, সমাজ-নির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত আচরণ করতে বাধ্য করে এবং নিয়মানুবর্তী ও অনুগত করে তোলে।

একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে অন্যায় বা অবাঞ্ছিত কাজ থেকে নিবৃত্ত করার ব্যাপারে ভয়ই প্রবলতম উপকরণ। সামাজিক সংগঠনের শৃঙ্খলা ও নিয়মকানুন বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভয় যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরোধক রূপে কাজ করে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সমাজে প্রচলিত অনুশাসন ও বিধি-নিষেধগুলি এবং সেগুলির সঙ্গে সংযুক্ত শাস্তির প্রতি বিরাগ ও পুরস্কারের প্রতি প্রলোভন শিশুর মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই অসামাজিক কাজের প্রতি ভীতি জাগিয়ে তোলে এবং পরে এই ভীতিই তাকে সমাজ অনুমোদিত পথে জীবন কাটাতে বাধ্য করে। অসাধুতা, অপহরণ, প্রবঞ্চনা, স্বার্থপরতা, প্রভৃতি অসামাজিক আচরণ থেকে শিশু সমাজের নিন্দা বা শাস্তির ভয়ে বিরত থাকে।

এই মতের মধ্যে যথেষ্ট সত্য থাকলেও শিশুর মধ্যে ভয় জাগানো বা তাকে ভয়গ্রস্ত করে বাঞ্ছিত আচরণ করতে বাধ্য করার পক্ষে এটিকে কোন মতেই যুক্তি বলে গ্রহণ করা যেতে পারে না।

স্বাভাবিক সহজ পথে যদি শিশুর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করা না হয় তবে ভয় দেখানোর মত অস্বাভাবিক পন্থার সাহায্য নেওয়া সম্পূর্ণ অসঙ্গত। তাছাড়া মনের উপর ভয়ের অমঙ্গলকর প্রভাব এত বেশী যে কোন মতেই শিশুর মনে ভয়ের পরিপোষণকে সমর্থন করা যায় না।

তবে সামাজিক শাস্তি, নিন্দা প্রভৃতির প্রতি ভয়কে কিছুটা সমর্থন করা যায়। এই ধরনের ভয়ের সাহায্যে আমাদের সমাজজীবনে শৃঙ্খলা বজায় রাখা হয়ে থাকে। কিন্তু যুক্তির দিক দিয়ে দেখতে গেলে শিশুর মধ্যে সামাজিক আদর্শের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা উচিত সামাজিক সচেতনতা ও দলপ্রীতি জাগরণের মাধ্যমে, ভয় বা অন্য কোন অস্বাভাবিক পন্থার সাহায্যে নয়।

আনন্দ (Pleasure, Joy and Delight)

আনন্দও সামান্য তৃপ্তির অনুভূতি বা আরামবোধ থেকে সুরু করে উদ্দাম উচ্ছ্বাসের রূপ নিতে পারে। আনন্দ আসে ব্যক্তির চাহিদার তৃপ্তি থেকে। প্রাণীদেহের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য জন্ম থেকেই কতকগুলি জৈবিক চাহিদা বা প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই চাহিদাগুলির তৃপ্তি প্রাণীর অস্তিত্ব বজায় রাখাকে সম্ভব করে তোলে এবং ফলে তার মনে আনন্দ অনুভূত হয়। ক্ষুধা, যৌন চাহিদা, বিশ্রাম বা নিদ্রার চাহিদা, দেহের সংরক্ষণমূলক চাহিদা ইত্যাদির তৃপ্তি থেকেই আনন্দের প্রাথমিক উৎপত্তি।

শিশু যত বড় হয় ততই এই প্রাথমিক উদ্দীপকগুলি থেকে তার আনন্দের বোধ ক্রমশ অন্যান্য উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়। প্রথম প্রথম সে যে সকল তুচ্ছ ঘটনা বা বস্তু থেকে আনন্দ পেত, একটু বড় হলে সেগুলি তার কাছে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমশ সে যতই তার চতুষ্পার্শের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ওঠে ততই তার আনন্দের উৎসেরও প্রকৃতি বদলে যায়। সে তখন অপরের প্রশংসা, সামাজিক স্বীকৃতি, সমর্থন, বন্ধুত্ব প্রভৃতি নানা উৎস থেকে আনন্দ আহরণ করে।

সামাজিক জীবনে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর চাহিদা আর দৈহিক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ থাকে না, ধীরে ধীরে নানা মানসিক ও সামাজিক ব্যাপারে সঞ্চালিত হয়ে যায়। ফলে দৈহিক চাহিদার তৃপ্তির চেয়ে এই সব নতুন মানসিক ও সামাজিক চাহিদার তৃপ্তিতে সে অধিকতর আনন্দ লাভ করে। নানা পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শিশুর আনন্দ জন্মের প্রথম দিকে

থাকে সম্পূর্ণ আত্ম সীমিত। সে তখন বাইরের জগৎ থেকে আনন্দ আহরণ করতে শেখে না। ছ'মাস বয়সে এই আনন্দ থেকে জন্ম নেয় উচ্ছ্বাস (Elation)। তখন শিশুর আনন্দের কারণরূপে থাকে নিছক দৈহিক ও ইন্দ্রিয়মূলক পরিতৃপ্তি। কিন্তু ১০।১১ মাস বয়স থেকে দেখা যায় সে মা, বাবা, ভাই, বোন প্রভৃতি বহির্জগতের লোকদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এ সময় থেকে তার মানসিক বা সামাজিক চাহিদার বোধ জাগতে থাকে বলা চলতে পারে এবং ক্রমশ তার এই মানসিক চাহিদাগুলির তৃপ্তিই তার আনন্দের একটা বড় উৎস হয়ে দাঁড়ায়।

ছোট শিশুর আনন্দের প্রধান কারণ হল শারীরিক সুস্থতা ও স্বাচ্ছন্দ্য। তাছাড়া যতই সে নতুন কাজ করতে সমর্থ হয় ততই তার আনন্দ আরও বেড়ে ওঠে। মুখে শব্দ করা, চেঁচান, হামাগুড়ি দেওয়া, হাঁটা, দাঁড়ান ইত্যাদি কাজগুলি করায় সে প্রচুর আনন্দ পায়। জেরসিল্ডের পরীক্ষণে দেখা গেছে যে যখন শিশুর কাছে কোন কাজ শক্ত বলে মনে হয় বা কোন কাজ করতে সে বাধার সম্মুখীন হয় তখন তার আনন্দ আরও বেড়ে ওঠে। তাছাড়া যখন সে অন্যান্যদের সঙ্গে খেলাধূলা করে তখনও সে প্রচুর আনন্দ পায়। শিশুর আনন্দ প্রকাশের রূপ হল হাসি, তার সঙ্গে শব্দ করা, হাত পা ছোঁড়া, মাথা নাড়া ইত্যাদিও।

শিশু আর একটু বড় হলে নিঃসঙ্গ সম্পর্কহীন বস্তুর চেয়ে যে সব পরিস্থিতিতে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গ সে পায় সেই সব পরিস্থিতি থেকে সে বেশী আনন্দ পেতে সুরু করে। অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সে খেলাধূলা করে আনন্দ পায়। এই সময় থেকে শিশু কমিক, কার্টুন বা হাসির ছবি দেখে আনন্দ পেতে শেখে। অপরকে বিরক্ত করে বা অপ্রতিভ করে বা অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলেও সে আনন্দ পায়।

যখন সে আরও বড় হয় তখন সে অদ্ভুত কিছু দেখলে বা শুনলে হাসে এবং নিজেও রসিকতা করতে শেখে। নিজের সাফল্যে বা নিজেকে উন্নত প্রমাণ করে সে আনন্দ পায়। যে সব কাজ করা নিষিদ্ধ সেই সব কাজ করতে বা তা নিয়ে আলোচনা করেও সে আনন্দ লাভ করে। এই বয়সে উচ্চ বা মৃদু হাসি হল আনন্দের সাধারণ প্রকাশ। আনন্দের সময় সমস্ত শরীরের মধ্যে একটা শিথিল বা শ্লথ ভাব অনুভূত হয়।

প্রাপ্তযৌবনের ক্ষেত্রে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা তার আনন্দবোধকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। যেমন, সক্রিয়তার চাহিদা, সৃজন বা উদ্ভাবনের

চাহিদা, জানবার চাহিদা, দায়িত্ব গ্রহণের চাহিদা, সঙ্গী বা সঙ্গিনীর চাহিদা ইত্যাদি চাহিদাগুলির তৃপ্তি তার আনন্দের প্রধান উদ্দীপক হয়ে দাঁড়ায়।

ব্যক্তির উপর মঙ্গলকর প্রভাবের দিক দিয়ে প্রক্ষোভগুলির মধ্যে আনন্দ সর্বোত্তম। দেহমনের সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি এবং মানসিক স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার দিক দিয়ে আনন্দের প্রভাব সবচেয়ে বেশী।

শিশুর ক্রমবর্ধমান চাহিদাগুলি যদি যথাযথ তৃপ্তি লাভ করে তবে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সুষ্ঠু ও স্বাস্থ্যময় হবে। আর যদি কোন কারণে কোন চাহিদা অবদমিত হয় তবে তা তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিপর্যস্ত করে তুলবে। শিশুদের মধ্যে যত রকম আচরণমূলক অসঙ্গতি দেখা যায় সে সকলেরই মূলে আছে তার প্রয়োজনীয় চাহিদার অতৃপ্তি।

শিক্ষায় আনন্দের প্রভাব খুব গুরুত্বপূর্ণ। থর্নডাইকের শিখনের ফললাভের সূত্র থেকে দেখা যায় যে আনন্দ বা তৃপ্তিলাভ শিখনকে সম্ভবপর ও স্থায়ী করে। শাস্তি এবং পুরস্কারের উপর যতগুলি গবেষণা হয়েছে তা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে আনন্দ বা তৃপ্তি হচ্ছে শিক্ষার পরম সহায়ক। যে শিখনে শিশু তৃপ্তি বা আনন্দ পায় তা সে স্বাভাবিক ও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে গ্রহণ করে আর যেখানে সে আনন্দ পায় না তা সে পরিহার করে।

এই থেকেই জন্মেছে আধুনিক কালের শিক্ষাকে শিশুর আগ্রহ-ভিত্তিক করে তোলার আন্দোলন। শিশুর শিক্ষা জন্ম নেবে শিশুর চাহিদা থেকেই। একমাত্র চাহিদাভিত্তিক শিক্ষাই শিশু স্বেচ্ছায় গ্রহণ করবে, কেননা সে শিক্ষা হবে শিশুর আনন্দের স্বাভাবিক উৎস।

ভালবাসা (Affection and Love)

ভালবাসা হল আনন্দের প্রতিক্রিয়া। কোন ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি ভালবাসা জন্ম নেয় ঐ বস্তু বা ব্যক্তি সম্পর্কে আনন্দকর অভিজ্ঞতা বা প্রতিক্রিয়া থেকে। সাধারণত ছোট শিশুর শারীরিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যারা যত্ন নেয়, যারা তার সঙ্গে খেলাধূলা করে, যারা তাকে কোন না কোন উপায়ে আনন্দ দান করে তাদের প্রতি তার ভালবাসা জন্মায়। বস্তুর সম্বন্ধেও একই কথা। যে সব বস্তু থেকে সে কোন রকম আনন্দ পায় সেই সব বস্তুকে সে ভালবাসে। প্রকৃতপক্ষে ভালবাসা মাত্রেই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। বস্তু ও ব্যক্তি থেকে সঞ্জাত আনন্দ ঐ বস্তু বা ব্যক্তিতে অনুবর্তিত হয় এবং তার প্রতি শিশুর ভালবাসা সৃষ্টি করে।

শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশে যে প্রক্ষোভটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে সেটি হল এই ভালবাসা। ভালবাসা প্রক্ষোভটি দ্বিমুখী—অপরের কাছ থেকে তার ভালবাসা পাবার আকাঙ্খা এবং অপরের প্রতি তার ভালবাসার অনুভূতি। শিশু যখন প্রথম পৃথিবীতে আসে তখন সে থাকে সম্পূর্ণ অক্ষম, অসহায় ও অপরের সাহায্য ও যত্নের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। এই সময় শিশুর মনের স্বাস্থ্যময় সংগঠনের জন্য প্রয়োজন তার প্রতি বড়দের যথেষ্ট মনোযোগ, সস্নেহ যত্ন, আদর, ভালবাসা ইত্যাদি। যে শিশু উপযুক্ত পরিমাণে এই ভালবাসা পায় তার ব্যক্তিসত্তা স্বাস্থ্যময় ও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে। আর যে শিশু কোন কারণে এই ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় তার মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাহত হয় এবং তার ব্যক্তিসত্তা দুর্বল ও অসংহত হয়ে ওঠে। আবার তেমনই অপর পক্ষে শিশুকে অতিরিক্ত আদর দিলে বা ভালবাসা দেখালে বিপরীত ফল হয়ে থাকে। শিশুর প্রতি মাতাপিতার ভালবাসা অনেক সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায় এবং তার স্বনির্ভর হবার পথে বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে ওঠে। তাছাড়া অতিরিক্ত আদর, যত্ন বা স্নেহের আবহাওয়ায় শিশু মানুষ হলে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ থেকে যায় এবং বহু ভ্রান্তিমূলক ও বিকৃত মানসিক ধারণা তার মনে বাসা বাঁধে। ফলে যখন সে বড় হয় তখন তার পক্ষে বাস্তব পরিবেশে সঙ্গতিবিধান করা একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে। সাধারণত পিতামাতার একমাত্র সন্তানের ক্ষেত্রে এ ধরনের পরিস্থিতি বা অবস্থার সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতএব শিশুকে ভালভাবে মানুষ করতে হলে যেমন তার প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ, যত্ন ও ভালবাসা দরকার তেমনই দেখা উচিত যে এগুলি যেন স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে না যায়। ভালবাসা যেন তার স্বাস্থ্যময় ও স্বাভাবিক ব্যক্তিসত্তা গঠনের সহায়ক হয়ে ওঠে, প্রতিবন্ধক না হয়ে দাঁড়ায়।

শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্কটিও যেন পারস্পরিক ভালবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষকের প্রকৃত কর্তব্য নিছক শিক্ষাদানে সীমাবদ্ধ থাকবে না। সত্যকারের সহানুভূতি ও ভালবাসার মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীকে নিকট আত্মীয়ের স্তরে উন্নীত করা শিক্ষকের কর্তব্যের প্রধান অঙ্গ। কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য নয়, শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াটিকে কার্যকর ও আয়াসহীন করে তোলার জন্যও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কটি পারস্পরিক প্রীতি ও অনুরাগের ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

বিকাশমান শিশুর মানসিক চাহিদাগুলির মধ্যে নিরাপত্তার চাহিদা এবং

আত্মস্বীকৃতির চাহিদা হল দুটি প্রধান চাহিদা এবং এগুলির তৃপ্তি হয় শিশু যখন বোঝে যে সে অপরের ভালবাসা এবং অনুরাগের পাত্র।

শিশু যেমন অপরের ভালবাসা চায় তেমনই সে অপরকে ভালবাসতেও স্বাভাবিক প্রেরণা অনুভব করে। দেখা গেছে যে এক বছর বয়স থেকেই শিশুর মধ্যে বড়দের প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পায় এবং বছর দেড়েক বয়স থেকেই অন্যান্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতিও তার অনুরাগ জন্মায়।

পাঁচ ছ'মাস বয়স থেকে শিশু তার পরিবারের ব্যক্তিদের ভালবাসতে শেখে। এই সময় থেকে সুরু হয় তার সামাজিক সংযোগ। যতই সে বিভিন্ন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং সুখের অভিজ্ঞতা লাভ করে তত বেশীসংখ্যক ব্যক্তিকে সে ভালবাসতে শেখে। একটা দ্রষ্টব্য বিষয় হল যে শিশুর ভালবাসা মুখ্যভাবে ব্যক্তিকে নিয়েই গড়ে ওঠে, গৌণভাবে গড়ে ওঠে জড়বস্তু নিয়ে। বার্হামের পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, যখন কোন জড়বস্তুর প্রতি শিশুর ভালবাসা জন্মায় তখন সেটিকে সে প্রকৃতপক্ষে তার কোন প্রিয় ব্যক্তির প্রতীক বা বিকল্প বলে মনে করে। এর পরের ধাপে সে তার পরিবারের গণ্ডীর বাইরের ব্যক্তিদের ভালবাসতে শেখে। এসব ব্যক্তিরাই তাকে তার বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে সাহায্য করে। শিশু এদেরই তার 'বন্ধু' বলে মনে করে।

শিশু যত বড় হতে থাকে তত সে বাইরের ছেলেমেয়ে ও বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি অনুরক্ত হতে থাকে। বাড়ীর গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরের বস্তু বা ব্যক্তির উদ্দেশ্যে শিশুর ভালবাসার এই সঞ্চালন তার সামাজিক জীবনবিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ সোপান। সুষ্ঠু সমাজজীবনের বিকাশের জন্য গৃহের প্রতি শিশুর প্রাক্ষোভিক আসক্তি হ্রাস পাওয়া একান্ত দরকার।

এর পরের স্তরে শিশুর ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা ধীরে ধীরে অ-ব্যক্তিতে সঞ্চালিত হয়। স্কুল, ক্লাব, অন্যান্য সামাজিক সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংঘ, খেলার দল প্রভৃতি শিশুর আন্তরিক ভালবাসার বস্তু হয়ে ওঠে এবং ক্রমশ দলের প্রত্যেকটি সদস্যের সঙ্গে তার একটা প্রীতি ও সৌহার্দ্যের বন্ধন গড়ে ওঠে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিশুর এই ভালবাসার মূল্য অনেকখানি। বিদ্যালয়, শিক্ষক, শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিক্ষার লক্ষ্য প্রভৃতি সকলের প্রতিই যদি শিশুর আন্তরিক আসক্তি না জন্মায় তবে শিক্ষার উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হবেনা। শিক্ষা-প্রচেষ্টার প্রাথমিক লক্ষ্যই হল সমস্ত শিক্ষা-প্রক্রিয়াটির উপর শিশুর আন্তরিক অনুরাগ বা আসক্তি সৃষ্টি করা।

যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর ভালবাসা যৌনস্তরে উন্নীত হয়। অবশ্য ফ্রয়েডের সংব্যাখ্যানে শিশুর ভালবাসা প্রথম থেকেই যৌনধর্মী। এই সময় সঙ্গী বা সঙ্গিনীর প্রতি ছেলেমেয়েদের বিশেষ আসক্তি দেখা দেয় এবং পরিবার-গঠনের অভিলাষ ধীরে ধীরে তাদের মনে বাসা বাঁধে। এই সময়ে ছেলেমেয়েদের পরিণত মনে জাতীয়তাবোধ, দেশভক্তি, প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি জন্মায় এবং এই বহুমুখী আসক্তি ও অনুরাগ তাদের ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার প্রকৃতি নির্ধারণ করে।

তের

মনঃসমীক্ষণ (Psychoanalysis)

মনঃসমীক্ষণ মনোবিজ্ঞানের একটি শাখা হলেও পরিকল্পনা, পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে প্রচলিত সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে এর বিরাট পার্থক্য। এটিকে প্রধানত মানব আচরণের বিজ্ঞান বলা চলতে পারে, যদিও আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীদের (Behaviourist) সঙ্গে কোন দিক দিয়েই এর কোন মিল পাওয়া যায় না। বরং আরও নির্ভুলভাবে বলতে গেলে এটিকে সঙ্গতিবিধানের মনোবিজ্ঞান (Psychology of adjustment) নাম দেওয়া যায়। অর্থাৎ বিভিন্ন পারিবেশিক পরিস্থিতিতে মানুষ কি ভাবে সঙ্গতিবিধানের চেষ্টা করে তার বৈজ্ঞানিক কারণ-নির্ণয়ই মনঃসমীক্ষণের প্রধান কাজ। সাধারণ মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে মনঃসমীক্ষণের সব চেয়ে বড় পার্থক্য হল এই যে সাধারণ মনোবিজ্ঞানে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে তাদের পরিবেশ থেকে বিচ্যুত করে নিয়ে পৃথকভাবে তাদের বিশ্লেষণ করা হয় এবং সেইভাবে তাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা হয়। কিন্তু মনঃসমীক্ষণে মানব আচরণকে তার পারিবেশিক শক্তিগুলির সমন্বয়েই বিচার করা হয় এবং তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তার সংব্যাখ্যান দেওয়া হয়।

ভিয়েনাবাসী মনোব্যাধির চিকিৎসক সিগমুণ্ড ফ্রয়েড এই নবীন মনোবিজ্ঞানের জনক। বস্তুত মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা পদ্ধতি থেকেই মনঃসমীক্ষণ জন্ম লাভ করেছে এবং এর পুষ্টি ও বিকাশও ঘটেছে ঐ মনোব্যাধির চিকিৎসাগারেই। হিস্টিরিয়া ও অন্যান্য মানসিক বিকারের চিকিৎসা করতে গিয়ে তিনি মানব মনের গভীর অন্তঃস্থলে এমন কতকগুলি বৈচিত্র্যের সন্ধান পেলেন যাতে মানব আচরণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য এক নতুন সংব্যাখ্যান নিয়ে তাঁর সামনে দেখা দিল। এই নতুন ব্যাখ্যাকে ভিত্তি করে ফ্রয়েড প্রবর্তিত করলেন এক অভিনব মনশ্চিকিৎসার পদ্ধতি এবং গড়ে তুললেন তাঁর অধুনা প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষণের চমকপ্রদ সৌধটি।

দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে ফ্রয়েড তাঁর অদ্ভুত প্রতিভা ও কর্মক্ষমতার সাহায্যে মনঃসমীক্ষণের বিভিন্ন তত্ত্বগুলির বাস্তব রূপ দিয়ে যান। তাঁর জীবিতদশাতেই তিনি নিজে তাঁর তত্ত্বগুলির মধ্যে প্রচুর পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বহু অনুগামীও তাঁর তত্ত্বগুলির মধ্যে নানারূপ পরিবর্তন

ও পরিবর্ধন করে নিজেদের প্রয়োজন মত স্বতন্ত্র মনোবিজ্ঞানের শাখার সৃষ্টি করেছেন। আমরা বর্তমান আলোচনায় ফ্রয়েডের নিজস্ব মতগুলির একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করব। তবে ফ্রয়েডের প্রথম দিকের তত্ত্বগুলি এখানে বর্জন করা হল এবং তার পরবর্তীকালের সংব্যাখ্যানগুলিরই বর্ণনা প্রধানত দেওয়া হল।

প্রাণশক্তি ও মরণশক্তি (Eros and Thanatos)

মনঃসমীক্ষণ একটি পুরোপুরি গতিশীল বিজ্ঞান এবং এতে অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং প্রেষণার সাহায্যেই মানব-আচরণের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। ফ্রয়েডের মতে সমস্ত মানসিক সক্রিয়তার মূলে আছে দুটি আদিম শক্তি। একটির তিনি নাম দিয়েছেন প্রাণশক্তি (Eros)। এটি হল জীবন এবং ভালবাসার শক্তি। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, নিজের এবং অপরের প্রতি ভালবাসা, আত্মসংরক্ষণ এবং জাতি সংরক্ষণের চাহিদা। এরস বা প্রাণশক্তির পাশাপাশি রয়েছে আর একটি আদিম শক্তি। এটি প্রকৃতিতে এরসের বিপরীতধর্মী এবং ফ্রয়েড তার নাম দিয়েছেন মরণশক্তি বা থ্যানাটস (Thanatos)। এরস যেমন প্রাণীকে বেঁচে থাকার শক্তি যোগায় তেমনই থ্যানাটস প্রাণীকে তার অপরিহার্য লক্ষ্য মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। ফ্রয়েডের মতে প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে যেমন আছে বাঁচার ইচ্ছা তেমনই তার পাশাপাশি আছে তার মরণের ইচ্ছা। এই দুয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই আমাদের সমস্ত আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয়। মরণশক্তির প্রকাশ আবার দু'রকমের হতে পারে, যখন এই শক্তিটি অন্তর্মুখী হয় তখন আত্ম-নির্যাতন, আত্মহত্যা ইত্যাদির রূপ নেয়। আবার যখন এটি বহির্মুখী হয়ে ওঠে তখন ধ্বংস বা মরণের রূপে প্রকাশ পায়। নিষ্ঠুরতা, আক্রমণমূলক আচরণ, বিনাশ বা ধ্বংসের প্রচেষ্টা ইত্যাদি মারণাত্মক প্রবণতাগুলি মরণশক্তিরই বহির্মুখী প্রকাশ।

ফ্রয়েডের এই সংব্যাখ্যান থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে তিনি বার্গস প্রভৃতির মত একজন জীবনী-শক্তিবাদী (Vitalist)। বস্তুত জীবনী-শক্তিবাদীর সঙ্গে তাঁর মতের মৌলিক মিলও যথেষ্ট আছে। ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁর পরিকল্পিত জীবন প্রেষণা (Elan Vital) বা বার্নাড শ'র পরিকল্পিত জীবনী শক্তির (Life Force) সমগোত্রীয় হল ফ্রয়েডের এই প্রাণশক্তির পরিকল্পনাটি। কিন্তু প্রাণশক্তি ও মরণশক্তি দুটিকে পরস্পরবিরোধী শক্তিরূপে ফ্রয়েডের এই পরিকল্পনার মধ্যে সত্যই অভিনবত্ব আছে। এর দ্বারা মানব মনের মধ্যে যে মৌলিক অন্তর্বিরোধিতা আছে তার একটা বৈজ্ঞানিক সংব্যাখ্যান পাওয়া যায়।

প্রাণশক্তির অন্তর্নিহিত মূলশক্তির নাম দিয়েছেন তিনি লিবিডো (Libido)। এই লিবিডো হল তেজ ও উদ্যমের আধার। ফ্রয়েডের পরিকল্পনায় এই লিবিডোই হল ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, বৃদ্ধি এবং পরিণতির একমাত্র নিয়ন্ত্রক। এটি একটি পুরোপুরি মানসিক বা অতি-দৈহিক শক্তি। দেহগত শক্তি, পুষ্টি বা অন্যান্য দৈহিক শক্তির সঙ্গে একে মিশিয়ে ফেললে চলবে না।

প্রত্যেক ব্যক্তি সমান পরিমাণ বা সমান প্রকৃতির লিবিডো নিয়ে জন্মায় না। কারও এই তেজোভাণ্ডার থাকে কম, আবার কারও থাকে বেশী। আবার লিবিডোর বিকাশ প্রচেষ্টা নানা বিভিন্ন পথ ধরে এগোতে পারে এবং লিবিডোর গতিপথের উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিক স্বাভাবিকতা বা অস্বাভাবিকতা। অতএব ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর পরিমাণ, তার গতিধারা এবং তার উপর পরিবেশের প্রতিক্রিয়া এইগুলির উপরই নির্ভর করে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ ও সংগঠন।

ফ্রয়েডের মতে এই লিবিডোর প্রকৃতি সম্পূর্ণ যৌনমূলক অর্থাৎ লিবিডোর সকল বিকাশ প্রচেষ্টাই ব্যক্তির যৌনকামনা তৃপ্তির প্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয়। ফ্রয়েডের এই সংব্যাখ্যান বহুযুগের প্রতিষ্ঠিত মানব-চিন্তার জগতে বিরাট এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। তাঁর মতে প্রাণীর বিকাশ বা বৃদ্ধির মূলগত যে তেজ বা শক্তি তা যৌনকামনার অভিব্যক্তির সঙ্গে অভিন্ন। অবশ্য যৌনতাকে ফ্রয়েড প্রচলিত সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করেন নি। তিনি যৌনতা বলতে সকল রকম আসক্তিকেই বুঝিয়েছেন। যৌনতার অন্তর্গত হল ব্যক্তির সুখ-অন্বেষণের সর্ববিধ প্রচেষ্টা। আত্ম-প্রীতি, পিতামাতা-বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আকর্ষণ, মানব জাতির প্রতি প্রেম এবং ব্যাপক অর্থে ভালবাসা বলতে যত রকম আসক্তিকে বোঝায় সে সকলই ফ্রয়েডের যৌনতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। কিন্তু তা বলে যৌনতার সংকীর্ণ অর্থটিও এখানে বাদ যাচ্ছে না। দৈহিক মিলন বা প্রজনন-ক্রিয়া যে লিবিডোর মুখ্য লক্ষ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

লিবিডোর অগ্রগতি বা ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ
(Progress of libido or development of personality)

ফ্রয়েডের পরিকল্পনায় লিবিডো একটি চলমান তেজপ্রবাহ। জন্মের মুহূর্ত থেকে এর চলা সুরু হয় এবং নানা পথ ধরে এটি তার পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে। শিশুর ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশ লিবিডোর অগ্রগতিরই সমার্থক।

লিবিডো বা ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের তিনটি প্রধান স্তর আছে :

প্রথম, শৈশব (Infancy), এর স্থায়িত্ব জন্ম থেকে পাঁচ-ছ বৎসর বয়স পর্যন্ত।

দ্বিতীয়, প্রসুপ্ত কাল (Latent period), এর স্থায়িত্ব পাঁচ-ছ বৎসর বয়স থেকে বার বা তের বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং

তৃতীয়, যৌবনাগম, (Adolescence) যার স্থায়িত্ব আঠারো থেকে কুড়ি বৎসর বয়স পর্যন্ত।

এই স্তর তিনটির মধ্যে ফ্রয়েডের মতে শৈশবের গুরুত্বই সবচেয়ে বেশী। এই সময় লিবিডোর মধ্যে নানা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়।

১। শৈশব (Infancy)

জন্মের সময় শিশুর লিবিডো থাকে অসংহত ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায়। কিন্তু খুব শীঘ্রই লিবিডো তার নিজস্ব আশ্রয় বা অবস্থান খুঁজে নেয়। কিন্তু লিবিডোর এই অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে না। শিশু বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার লিবিডোও ক্রমাগত স্থান পরিবর্তন করে চলে। লিবিডোর অবস্থান প্রথমে থাকে শিশুর মুখে। এটিকে মৌখিক-রতি স্তর (Oral-erotic stage) বলা হয়। এই সময় শিশু তার মুখের সক্রিয়তা থেকেই যৌন আনন্দ লাভ করে থাকে। ঠোঁট ও জিভ দিয়ে চোষা, কামড়ান, চিবানো ইত্যাদি মৌখিক কার্য থেকে সে এই স্তরে লিবিডোর তৃপ্তি আহরণ করে। এই মৌখিক রতিরই শেষের দিকে আসে মৌখিক-ধর্ষণমূলক স্তর (Oral-sadistic stage)। এই স্তরটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল শিশুর ধ্বংসমূলক মনোভাব। এই সময় সে যা পায় তাই ভাঙা বা নষ্ট করার একটা প্রবণতা সে অনুভব করে।

মৌখিক-রতি স্তরের পরে আসে পায়ু-রতি স্তর (Anal erotic stage)। এই সময় মুখ থেকে পায়ুতে তার লিবিডো আশ্রয় নেয়। এই স্তরে প্রথম প্রথম মল-নিঃসরণ প্রক্রিয়ায় শিশু আনন্দ পায়। কিন্তু শেষের দিকে নিজের দেহের মধ্যে মল-সংরক্ষণে তার লিবিডো-তৃপ্তি ঘটে। ফ্রয়েডের মতে পরবর্তী জীবনে অনেক ব্যক্তির মধ্যে যে অস্বাভাবিক কৃপণতা বা অর্থ, বস্তু প্রভৃতি সংরক্ষণের অতিরিক্ত প্রবণতা দেখা যায় তা এই স্তরের লিবিডোর সংবন্ধন থেকেই সৃষ্টি হয়।

পায়ু-স্তরের পর আসে লৈঙ্গিক (Phallic) স্তর। এই সময় শিশু যৌন-ইন্দ্রিয়ের সুখদানের ক্ষমতা আবিষ্কার করে। এই স্তরের পূর্ব পর্যন্ত শিশুর যৌনতা অস্বাভাবিক ক্ষেত্রগুলিতে ঘুরে বেড়ায়। এই লৈঙ্গিক স্তর থেকেই শিশুর লিবিডো তার স্বাভাবিক বিকাশের গতিপথ অনুসরণ করে। কিন্তু

লৈঙ্গিক স্তরেই লিবিডোর সংগঠন সম্পূর্ণ হয় না। লিবিডোর পরিণতি ও সংগঠন পূর্ণতা লাভ করে যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে।

২। প্রসুপ্ত কাল (Latent Period)

শৈশবের শেষে শিশুর যৌন আচরণে এক আকস্মিক ছেদ বা বিরতি দেখা দেয়। তখন শিশুর বাহ্যিক অভিব্যক্তিতে কোন রকম যৌন সচেতনতা আর প্রকাশ পায় না। তার সব আচরণ পূর্ণভাবে যৌন-বিবর্জিত হয়ে ওঠে। এই সময়টিকে যৌনতার প্রসুপ্ত কাল (Latent Period) বলা হয়। এই সময় যৌনতা শিশুর মনের নিম্নতম স্তরে নিহিত অবস্থায় থাকে এবং বাইরে তার কোনও প্রকাশ দেখা যায় না। কিন্তু এ অবস্থাতেও যৌনতার অগ্রগতি বা ক্রমবিকাশ বন্ধ হয় না। নিহিত থাকা অবস্থাতেই তার যথারীতি বিকাশ হয়ে যায়। যৌবনাগমে এই প্রসুপ্ত কালের সমাপ্তি ঘটে।

৩। যৌবনাগম (Adolescence)

এই সময় লিবিডো তার বিভিন্ন ও অস্বাভাবিক অবস্থানগুলি ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে জননেন্দ্রিয়ে এসে বাসা বাঁধে। এই স্তরকে উপস্থ (Genital) স্তর বলা হয় এইখানেই লিবিডোর বৈচিত্র্যময় যাত্রার শেষ হয় এবং তার চরম লক্ষ্য প্রজননক্রিয়ার প্রচেষ্টায় এসে লিবিডো সুসংহত ও কেন্দ্রীভূত হয়।

(ক) সংবন্ধন (Fixation)

এত হল লিবিডোর স্বাভাবিক অগ্রগতির বিবরণ। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে লিবিডোর ক্রমবিকাশ স্বাভাবিক পথ ছেড়ে অস্বাভাবিক পথও অনুসরণ করে। লিবিডো তার চলার পথে শৈশবে যে সকল বিচিত্র যৌনতৃপ্তির উৎসে সাময়িক-ভাবে অবস্থান করে কোন কোন ক্ষেত্রে এই সব উৎস ত্যাগ করে লিবিডো আর এগোতে পারে না। এই ঘটনাকে লিবিডোর সংবন্ধন (Fixation) বলা হয়। অবশ্য সম্পূর্ণ লিবিডোটি কখনও কোন ক্ষেত্রে সংবন্ধিত হয় না, হয় তার কিছুটা অংশ। বাকী অংশটুকু সামনের দিকে এগিয়ে চলে। কিন্তু এই সংবন্ধনের ফলে লিবিডো দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং সংবন্ধিত লিবিডোর প্রভাব তাঁর পরিণত ব্যক্তিসত্তাকে একদিকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনই তার লিবিডোর বিভাজনের ফলে তার স্বাভাবিক জীবনবিকাশের প্রচেষ্টা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফ্রয়েডের মতে বহু মানসিক বিকারের মূলেই আছে শৈশবের কোন অস্বাভাবিক যৌন উৎস-স্থলে লিবিডোর এই ধরনের সংবন্ধন।

(খ) প্রত্যাবৃত্তি (Regression)

এই প্রসঙ্গে লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি (Regression) নামক আর একটি প্রক্রিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরিণত বয়সে কোন মানসিক আঘাত বা দুঃসহ ব্যর্থতার ফলে

প্রবহমান লিবিডো চলার পথে বাধা পায় এবং তার পুরানো শৈশবের অবস্থান-স্থলে ফিরে এসে আশ্রয় নেয়। একে লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি বলে। মানসিক বিকারের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি প্রায়ই ঘটে থাকে। উদাহরণস্বরূপ হিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত রুগীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ঐ ব্যক্তি বাস্তবজীবনে কোনও দুরূহ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে না পেরে শৈশবের অবাস্তব কল্পনার আশ্রয় নিয়েছে, এমন কি শিশুসুলভ আচরণও করতে সুরু করেছে। তার লিবিডো বর্তমান বাস্তবের কাছে পরাজয় স্বীকার করে শৈশবের কল্পনাময় ও অবাস্তব সুখের দিনগুলিতে ফিরে গেছে। অবশ্য লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তিকে সম্ভব করে তোলে লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন। যার মধ্যে যত বেশী সংবন্ধিত লিবিডো আছে তার ক্ষেত্রে প্রত্যাবৃত্তি তত সহজে ঘটে। হিষ্টিরিয়া রোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তির লিবিডো শৈশবে ঈডিপাস কমপ্লেক্সে সংবন্ধিত হয়ে থাকে এবং পরিণত বয়সে কোনও মানসিক আঘাত পেয়ে তার লিবিডো সেই শৈশবের সংবন্ধন-স্থলে আবার প্রত্যাবৃত্ত করে।

লিবিডোর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তার আসক্তির বিষয় বা পাত্রের মধ্যেও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথম প্রথম লিবিডোর আসক্তি থাকে বিষয়হীন অবস্থায় এবং কেবলমাত্র দৈহিক সুখানুভূতিতেই তার তৃপ্তি সীমাবদ্ধ থাকে। এখানেই স্বতঃরতি স্তরের (Auto-erotic stage) সুরু।

এই সময় কোন বিশেষ বিষয়ে লিবিডোর তৃপ্তি সংযুক্ত থাকে না, নিছক দেহগত সুখই তখন শিশুর কাম্য। কিন্তু যখন ধীরে ধীরে তার সত্তার (অহমের) বিকাশ হতে সুরু করে তখন লিবিডো অহমের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। এটি হল স্বতঃরতি স্তরেরই পরিণত রূপ। একে প্রাথমিক নার্সিসত্তা (Primary Narcissism) বলা হয়। নার্সিসতা কথাটি এসেছে গ্রীক পৌরাণিক চরিত্র নার্সিসাসের কাহিনী থেকে। নার্সিসাস জলেতে নিজের ছায়া দেখে তাকেই ভালবেসে ফেলেছিল। অতএব নার্সিসতা কথাটির অর্থ হল আত্মরতি।

এই প্রাথমিক আত্মরতি অহংসত্তার বিকাশে যথেষ্ট সাহায্য করে এবং তা চিরকালই ব্যক্তির মধ্যে কিছু না কিছু মাত্রায় থেকে যায়। যদিও অতিরিক্ত আত্মরতি কখনই কাম্য নয়, তবু কিছু পরিমাণে আত্মরতি ব্যক্তির সবল ব্যক্তিসত্তা গঠনে সর্বদাই আবশ্যক। এই প্রাথমিক নার্সিসতার স্তরে যাদের লিবিডোর সংবন্ধন বা প্রত্যাবৃত্তি ঘটে তারা আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। যৌবনাগমে নার্সিসতার দ্বিতীয় স্তর দেখা দেয়। এই সময় প্রাপ্তযৌবন বালকবালিকারা নতুন করে নিজেদের ভালবাসতে সুরু করে।

লিবিডো-আসক্তির তৃতীয় স্তরে লিবিডো অহংকে ছেড়ে দিয়ে বাইরের বিষয়ে সংযুক্ত হয়। শিশুর আসক্তির প্রথম বিষয়বস্তু হল তার পিতা বা মাতা। এর সুরু হয় লৈঙ্গিক স্তরে। পিতামাতার প্রতি শিশুর আসক্তি থেকেই জন্মায় ঈডিপাস কমপ্লেক্স [১]

চেতন, প্রাক্‌চেতন ও অচেতন

(Conscious, Preconscious and Unconscious)

ফ্রয়েডের পূর্বে চেতন মন ছাড়া অন্য কোন মনের কথা মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণা বা আলোচনায় স্থান পায় নি। ফ্রয়েডই প্রথম দেখালেন যে মনের অজ্ঞাত অংশটি জ্ঞাত অংশের চেয়ে কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ ত নয়ই, বরং মানব-আচরণের প্রকৃতি ও গতি নির্ধারণে অচেতন মনই চেতন মনের চেয়ে অনেক বেশী প্রভাবশালী। তাঁর পরিকল্পনায় মনের তিনটি বিভাগ আছে, যথা, চেতন, প্রাক্‌চেতন ও অচেতন।

আমাদের যে মনটির সঙ্গে বাস্তব জগতের সম্পর্ক এবং যে মনটির প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমরা সচেতন, মনের সেই বিভাগটিকে চেতন (Conscious) বলা হয়। এই চেতন মন অচেতনের তুলনায় আয়তনে অনেক ছোট এবং প্রায় অচেতনের সাত ভাগের একভাগের মত। তাছাড়া চেতন প্রক্রিয়ার একটা বড় অংশই অচেতন প্রক্রিয়ার প্রভাব থেকে জন্মলাভ করে থাকে। চেতনের ঠিক নীচেই হল প্রাক্‌চেতনের (Preconscious) স্থান। এটি যদিও সাধারণ অবস্থায় আমাদের সচেতনের গণ্ডীর বাইরে তবু চেষ্টা করলে প্রাক্‌চেতনের বিষয়বস্তুগুলিকে চেতন মনে আনা যায়। যে সকল ঘটনা আমাদের মনে নেই অথচ চেষ্টা করলে আমরা মনে করতে পারি সেইগুলিরই অবস্থান হল প্রাক্‌-চেতনে। অবশ্য প্রাক্‌চেতনের সমস্ত ঘটনাই যে সহজে মনে করা যায় তা নয়, এমন অনেক ঘটনা আছে যা মনে করতে যথেষ্ট কষ্ট বা অসুবিধা হতে পারে।

প্রাক্‌চেতনের নীচে অবস্থিত হল অচেতন (Unconscious)। মনের অধিকাংশ জায়গা জুড়েই অচেতনের অবস্থান। অচেতনের চিন্তা ও ধারণাগুলি সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের পরিসীমার বাইরে হলেও আমাদের সচেতন চিন্তা ও আচরণের নিয়ন্ত্রণে সেগুলির প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

চেতন মনে যেমন আছে শৃঙ্খলা ও সংহতি, অচেতনে তেমনই আছে বিশৃঙ্খলা ও অসংহতি। অচেতন প্রক্রিয়াকে অসঙ্গতিপূর্ণ, শিশুসুলভ ও আদিম

১। পৃঃ ২০৩—পৃঃ ২০৪

বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অচেতনের প্রধান অধিবাসী হল নগ্ন কামনা-বাসনা, প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের দল। এগুলি আসে দুটি উৎস থেকে। প্রথম হল এমন কতকগুলি চিন্তা বা কামনা যেগুলি পূর্বে চেতন মনেই ছিল, কিন্তু পরে সেখান থেকে তাদের অসামাজিক প্রকৃতির জন্য অবদমিত হয়ে অচেতনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর চিন্তা ও কামনাগুলি হল সহজাত, জন্ম থেকেই অচেতনের অধিবাসী এবং কখনও তারা চেতনের স্তরে ওঠে না। দ্বিতীয় শ্রেণীর অচেতন বস্তুগুলির ইউঙ (Jung) নাম দিয়েছেন জাতিগত অচেতন



[ফ্রয়েডীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী মনের বিভিন্ন স্তর-বিভাগ]

(Racial Unconscious or Archetype)। এগুলি আদিম মানুষের মন থেকে বংশধারার মধ্যে দিয়ে আমাদের মনে সঞ্চালিত হয়ে থাকে।

ইদম্ অহম্ ও অধিসত্তা (Id, Ego and Super-Ego)

এ ছাড়া ফ্রয়েড মনের আরও তিনটি বিশেষ অধিবাসীর পরিকল্পনা করেছেন। সে তিনটি হল ইদম্, অহম্ এবং অধিসত্তা।

ইদম্ হল পূর্ণমাত্রায় অচেতন। এটি লিবিডোর আদিম আশ্রয়স্থল এবং ব্যক্তির সমস্ত প্রবৃত্তিমূলক কামনার পেছনে শক্তি ও উদ্যম জোগায়। এ ছাড়া চেতন মনে যত অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক ইচ্ছা জাগে সেগুলিও অবদমিত হয়ে ইদমে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ইদম্ প্রকৃতিতে অতি আদিম, বন্য। সে পুরোপুরি অনুসরণ করে সুখভোগের নীতি (Pleasure Principel)। অর্থাৎ সে চায় দুঃখকে এড়িয়ে যেতে এবং কেবলমাত্র সুখকে পেতে। সে সমাজ, শিক্ষা, নীতি কোন কিছুরই ধার ধারে না। ইদম্ মূর্তিমতী কামনা, মানুষের নগ্ন বাসনার প্রতিচ্ছবি। তার মধ্যে কোন যুক্তি নেই, বিচারবুদ্ধি নেই, নৈতিক ভালমন্দের জ্ঞান নেই। আদিম মানব মনের সে প্রতীক। সে চায় আনন্দ, তার কামনা-বাসনার পরিতৃপ্তি, তা সে ভাল হোক্, মন্দ হোক্, সমাজ-অনুমোদিত হোক্, আর নাই হোক্—সেদিকে তার কোন দৃষ্টি নেই।

ইদম্ ব্যক্তির কামনা-বাসনার আধার হলেও বাস্তবের সঙ্গে তার কোন যোগাযোগ নেই। ফলে সে সরাসরি তার কোন ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে না। তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে একমাত্র ইগো বা অহম্।

অহমের কিছুটা চেতন, আবার কিছুটা অচেতন। জন্মের সময় অহম থাকে অতি দুর্বল, কিন্তু শিশু যত বড় হয় ততই বাস্তবের সংস্পর্শে এসে অহম্ পুষ্ট হতে থাকে। অহমের চেতন অংশটি বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ রেখে চলে, আর তার অচেতন অংশটি ইদমের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখে। ইদম্ অনুসরণ করে সুখভোগের নীতি কিন্তু অহম্ পরিচালিত হয় বাস্তব নীতির (Reality Principle) দ্বারা। অহম্ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং যুক্তিধর্মী। সে বোঝে যে তাকে সমাজে অস্তিত্ব বজায় রাখতে হলে বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে হবে। সে জন্য বাস্তবের অনুশাসন মেনে চলাই তার নীতি এবং এই নীতির জন্যই সে ইদমের সমস্ত দাবী পূর্ণ করতে পারে না। বস্তুত ইদমের তৃপ্তি মানে অহমেরই তৃপ্তি, কিন্তু বাস্তবের চাপে অহম্ বাধ্য হয় ইদম্‌কে দাবিয়ে রাখতে, তার কামনাকে অতৃপ্ত রাখতে। তবে যদি অহম্ বোঝে যে ইদমের কোন বিশেষ ইচ্ছা পূর্ণ করলে তাকে কোনও সমালোচনা বা শাস্তি ভোগ করতে হবে না তখন সেই ইচ্ছা সে পূর্ণ করতে দ্বিধা করে না।

মনের এই সংগঠনের তৃতীয় অধিবাসীটি হল অধিসত্তা। কিছুটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নীতিবোধ ও বিধিনিষেধের ধারণা এবং কিছুটা পিতামাতার কাছ থেকে অর্জন করা নৈতিক শিক্ষা, এই দু'য়ে মিলে তৈরী হয়েছে অধিসত্তা। অধিসত্তার বেশীর ভাগই অবস্থিত অচেতনে এবং সেই জন্য

অহমের চেয়ে অধিসত্তা ইদমের অবাঞ্ছনীয় ও অসামাজিক কামনা-বাসনা সম্বন্ধে বেশী খবর রাখে। অধিসত্তার সর্বপ্রধান কাজ হল অহমের কাজের সমালোচনা করা এবং তার তিক্ত সমালোচনার দ্বারাই সে ইদমের বাসনাগুলিকে দমন করতে অহম্‌কে বাধ্য করে। আমরা প্রচলিত ভাষণে যাকে বিবেক বলি অধিসত্তা বলতে অনেকটা তাকেই বোঝায়।

উপরের বর্ণনায় আমরা ব্যক্তির ইগো বা অহম্‌সত্তার যে ছবিটি পেলাম সেটি সত্যই খুব সুখকর নয়। অহম্‌কে সর্বদা একাধিক বিপরীতধর্মী শক্তির সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। ফ্রয়েডের ভাষায় অহম্‌কে একসঙ্গে তিনটি প্রভুর সেবা করতে হয়, যথা, বাস্তব, ইদম্‌ ও অধিসত্তা। প্রথমত, অহম্‌কে তার সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বাস্তবের অনুশাসন, বিধিনিষেধ প্রভৃতি মেনে চলতে হয়। দ্বিতীয়ত, ইদমের কামনা-বাসনাগুলির তৃপ্তির জন্য তাকে নানা কৌশল ও ছলনার আশ্রয় নিতে হয়। আর সবশেষে অধিসত্তার কঠোর সমালোচনার চাপে তাকে তার নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। এক কথায় এই তিনটি শক্তিকে অক্ষুণ্ণ ও শান্ত রেখে অহম্‌কে চলতে হয়। যতক্ষণ অহম্‌ এই ত্রিবিধ শক্তির মধ্যে সুসমন্বয় সাধন করে চলতে পারে ততক্ষণ তার মানসিক সাম্য বজায় থাকে। যে মুহূর্তে এই শক্তিগুলির মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় নষ্ট হয়ে যায় সেই মুহূর্তেই দেখা দেয় মানসিক বিপর্যয়। ফ্রয়েডের মতে মানসিক বিকারগ্রস্ত রুগী হল এমন ব্যক্তি যার অহম্‌ কোন কারণবশত এই তিনটি পরস্পরবিরোধী শক্তির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে সমর্থ হয় নি।

কমপ্লেক্স (Complex)

কমপ্লেক্স কথাটির সাধারণ অর্থ হল মানসিক জটিলতা। ফ্রয়েড কমপ্লেক্স কথাটি ব্যবহার করেছেন এক ধরনের বিশেষ মানসিক সংগঠনকে বোঝাতে। যখন কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে আমাদের মনের মধ্যে একটি স্থায়ী জটিল সংগঠনের সৃষ্টি হয় তখন তাকে কমপ্লেক্স বলা হয়। এই জটিল মানসিক সংগঠনের দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এটি প্রক্ষোভাত্মক, অর্থাৎ কোন কমপ্লেক্স সক্রিয় হয়ে উঠলে ব্যক্তি বিশেষ একটি প্রক্ষোভের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয়, কমপ্লেক্স মাত্রেই ব্যক্তির আচরণের নিয়ন্ত্রক অর্থাৎ কমপ্লেক্স ব্যক্তির আচরণকে বিশেষ পথে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে। ব্যক্তির মধ্যে যখন কোন কমপ্লেক্স সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন ব্যক্তির আচরণ বিশেষ একটি গতিপথ অনুসরণ করে থাকে।

ফ্রয়েডের মতে কমপ্লেক্সের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে। সেটি হল অচেতনধর্মিতা। অর্থাৎ ব্যক্তি তার নিজের কমপ্লেক্স সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র

সচেতন থাকে না এবং কমপ্লেক্সের প্রভাবে সে যে আচরণ করে তার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই থাকে না। কমপ্লেক্স ব্যক্তির অচেতন মনের গভীর তলদেশে নিহিত থাকে এবং তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই তার সচেতন আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। ফ্রয়েডের মতে অচেতনধর্মিতাই কমপ্লেক্সের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হয় অবদমন থেকে। যখন ব্যক্তির মনে এমন কোন চিন্তা বা ইচ্ছা দেখা দেয় যেটি তার অর্জিত শিক্ষা বা সামাজিক মান বা ধর্মবোধের বিচারে অবাঞ্ছনীয় বলে মনে হয় তখন সে সেটিকে তার অচেতন মনে অবদমিত করে এবং তার ফলে সেটি সে সম্পূর্ণ ভুলে যায়। কিন্তু এই চিন্তা বা ইচ্ছা তার অচেতনের গভীর তলদেশে কমপ্লেক্স বা একটি জটিল সংগঠনের রূপ নিয়ে বাস করে এবং যখনই সুযোগ পায় তখনই সেটি তার সচেতন স্তরে উঠে এসে তার আচরণকে প্রভাবিত করে।

ব্যক্তির অচেতনে নির্বাসিত অবস্থায় থাকলেও কমপ্লেক্স তার কর্মশক্তি বিন্দুমাত্র হারায় না এবং প্রক্ষোভ-নিষিক্ত অবস্থায় প্রবল এক শক্তির উৎসরূপে তার অচেতনের অন্তঃস্থলে অভিব্যক্ত হবার সুযোগের প্রতীক্ষা করে। কমপ্লেক্স মাত্রেই কোন না কোন মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে জন্ম নিয়ে থাকে। সেই জন্য যখনই কমপ্লেক্সের প্রভাবে ব্যক্তি বিশেষ কোন আচরণ করে তখনই তার সেই আচরণে তার মনের সেই পুরো অন্তর্দ্বন্দ্বটি প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এই জন্য কমপ্লেক্সজাত আচরণ কখনও স্বাভাবিক প্রকৃতির হয় না।

এ থেকে আমরা কমপ্লেক্সের আর একটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই; কমপ্লেক্সের মধ্যে সব সময়েই একটি অবাঞ্ছনীয়তা থাকবে। কেননা সচেতন সত্তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত ইচ্ছা বা চিন্তা থেকেই কমপ্লেক্স জন্মে থাকে। এই কারণেই কমপ্লেক্সের সচেতন মনে প্রবেশাধিকার নেই, তাকে চিরকালই অচেতনে বাস করতে হয়।

যে কোন বিষয় বা ঘটনাকে ঘিরেই কমপ্লেক্সের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন, একটি শিশু বার কয়েক অঙ্কে ফেল করার ফলে অঙ্ককে ঘিরে তার মধ্যে একটি কমপ্লেক্স তৈরী হল। ফলে যখনই অঙ্কের প্রসঙ্গ ওঠে বা নিজে অঙ্ক করার চেষ্টা করে তখন তার মধ্যে ভীতিময় একটি অনুভূতি দেখা দেয় এবং সেই ব্যাপারে তার আচরণও কিছুমাত্রায় অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই ধরনের ব্যক্তিগত কমপ্লেক্স ছাড়াও কতকগুলি সর্বজনীন কমপ্লেক্স দেখা যায়। সেগুলির মধ্যে হীনমন্যতার কমপ্লেক্স (Inferiority Complex) উল্লেখযোগ্য। যখন কোন

ক্রটি অক্ষমতা বা অসাফল্যের জন্য ব্যক্তি নিজেকে ছোট বা হেয় বলে মনে করে তখন তার মনোভাবকে হীনমন্যতার কমপ্লেক্স বলা হয়। তেমনই অপর পক্ষে নিজেকে অপরের চেয়ে কোনও দিক দিয়ে বড় মনে করলে ব্যক্তির সেই মনোভাবকে উচ্চতাবোধের কমপ্লেক্স (Superiority Complex) বলা হয়। এ ছাড়া ফ্রয়েড আরও কয়েকটি সর্বজনীন কমপ্লেক্সের কথা বলেছেন। সেগুলির মধ্যে ঈডিপাস কমপ্লেক্স, কাস্ট্রেসন কমপ্লেক্স প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ঈডিপাস কমপ্লেক্স (Oedipus Complex)

শিশুর লিবিডো যখন প্রথম নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছেড়ে বাইরের বিষয় বা পাত্রের দিকে পরিচালিত হয়, তখন তার প্রথম আসক্তির পাত্রী হন তার মা। লিবিডোর পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই আসক্তি ক্রমশ যৌনমূলক হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন নানা কারণে শিশু বুঝতে পারে যে এই যৌন আসক্তি অনুচিত এবং সে তখন সেটিকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। এই বুঝতে পারার মূলে আছে শিশুর উপর তার পিতার প্রভাব। যেমন করেই হোক শিশু বুঝে নেয় যে মার প্রতি যৌনমূলক অধিকার আছে একমাত্র পিতারই এবং মার প্রতি তার নিজের যৌন কামনা একান্ত অসঙ্গত।

ফলে সে তার কামনাকে অবদমিত করে এবং এই অবদমিত কামনাটি কমপ্লেক্সের রূপে তার মনে বাসা বাঁধে। এই কমপ্লেক্সটির নাম দেওয়া হয়েছে ঈডিপাস কমপ্লেক্স। এই কমপ্লেক্সটির নামকরণ হয়েছে গ্রীসদেশের একটি পৌরাণিক কাহিনীর অনুসরণে। ঈডিপাস ছিল থিব্সের রাজার ছেলে। তাকে শৈশবে এক পাহাড়ে ফেলে আসা হয় এবং একজন রাখাল তাকে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করে। বড় হয়ে ঈডিপাস বিরাট একজন যোদ্ধা হয়ে দাঁড়ায় এবং শেষ পর্যন্ত একদিন তার পিতার রাজ্য আক্রমণ করে। যুদ্ধে ঈডিপাস নিজের পিতাকে হত্যা করে ও তখনকার প্রথামত নিজের মাকে বিবাহ করে, অবশ্য এসবই সে করে তার মা ও বাবার আসল পরিচয় না জেনেই।

অতএব ঈডিপাস কমপ্লেক্স বলতে বোঝায় মার প্রতি ছেলের যৌনমূলক আসক্তিকে। মনে রাখতে হবে যে শিশুর এই ইচ্ছাটি সম্পূর্ণ তার অচেতন মনের। তার চেতন মনে তার মার প্রতি কোনরূপ যৌনমূলক আসক্তির কথা সে জানেই না। মার প্রতি তার এই আসক্তি প্রকাশ পায় মার আদর ও মনোযোগ চাওয়া কিংবা মার কাছে শোওয়া প্রভৃতি ইচ্ছার মধ্যে দিয়ে। প্রথম প্রথম মনে করা হত যে শিশুর এই আসক্তি বোধ করি তার মায়ের

দৈহিক সত্তার প্রতি উদ্দিষ্ট, কিন্তু পরে ব্যাপক পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশু তার অচেতন মনের অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে তার মার একটি প্রতিরূপ তৈরী করে নেয় এবং তার সমস্ত আসক্তি গড়ে ওঠে তার অচেতনের সেই মাতৃ-মূর্তিকে (Imago) ঘিরেই। তার মায়ের প্রতি যত এই যৌন আসক্তি বেড়ে চলে ততই সে তার পিতাকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে এবং শেষ পর্যন্ত পিতার প্রতি বিদ্বেষ, তাঁর দৈহিক ক্ষতি এমন কি তাঁর মৃত্যুকামনাও শিশুর চিন্তার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে।

ছেলের যেমন মায়ের প্রতি আসক্তি দেখা দেয় ঠিক সেই রকম আসক্তি দেখা দেয় মেয়ের তার বাবার প্রতি। মেয়ে তার বাবার সঙ্গ কামনা করে এবং মাকে তার ভালবাসার প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে। বাবার প্রতি মেয়ের এই আসক্তিকে প্রথম ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স নাম দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে ছেলেমেয়ে উভয়েরই এই যৌনমূলক মনোভাবকে ঈডিপাস কমপ্লেক্স নাম দিয়েই বোঝান হয়ে থাকে।

অধিসত্তার অনেকখানি ঈডিপাসেরই অবদান। মায়ের প্রতি আসক্তি শিশুর মনে পিতার সম্বন্ধে একটি বিরাট ভীতির সৃষ্টি করে। শিশু মনে করে তার এই আসক্তির জন্য পিতা তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন এমন কি তার যৌনাঙ্গছেদন করতেও পারেন। ফ্রয়েড এই মনোভাবের নাম দিয়েছেন কাস্ট্রেসন কমপ্লেক্স (Castration Complex)। পিতার সম্বন্ধে এই ভীতিবোধ তাকে পিতার প্রতি অনুগত ও বাধ্য করে তোলে। পরে যখন শিশু বড় হয় তখন তার উপর ঈডিপাস কমপ্লেক্সের প্রভাব ধীরে ধীরে কমে যায় এবং পিতার সম্বন্ধে তার অস্বাভাবিক ভীতিবোধও চলে যায়। কিন্তু পেছনে থেকে যায় সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ ও নৈতিক আদর্শের প্রতি একটি স্বতঃপ্রসূত আনুগত্য। তারই নাম অধিসত্তা বা সুপার-ইগো।

প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism)

অহম্‌কে তিনটি বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সর্বদাই সঙ্গতিবিধান করে চলতে হয়, যথা, ইদম্‌ অধিসত্তা ও বাস্তব। কিন্তু ইদমের অধিকাংশ ইচ্ছাই বাস্তবের বিরোধী এবং অধিসত্তার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত। তার ফলে প্রায়ই এমন একটি জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন অহমের অবস্থা বেশ সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে। তখন অহম্‌কে আত্মরক্ষার জন্য কতকগুলি বিশেষ কৌশলের শরণাপন্ন হতে হয়। অহম্‌ নিজের আত্মরক্ষার জন্য এই কৌশলগুলির উদ্ভাবন করে বলে এগুলিকে প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism) বলা হয়।

প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির উদ্দেশ্য দু'প্রকারের হতে পারে। প্রথম, অবদমিত ইচ্ছাগুলির অভিব্যক্তির বিরুদ্ধে অহমের আত্মরক্ষার প্রয়াস। আর দ্বিতীয়, ইদমের ইচ্ছাগুলিকে আংশিক তৃপ্তিদানের আয়োজন। এইজন্য এইগুলিকে সঙ্গতিবিধানের কৌশল (Adjustment Mechanism) নামও দেওয়া হয়ে থাকে।

১। অবদমন (Repression)

প্রতিরক্ষণ কৌশলগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় অবদমনের।

ইদমের কামনাগুলি তৃপ্তিলাভের জন্য নিয়তই তাদের আবেদন নিয়ে অহমের কাছে হাজির হয়। কিন্তু সেগুলির অসামাজিক ও নীতিবিরোধী প্রকৃতির জন্য অহমের পক্ষে সেগুলির তৃপ্তিসাধন করা সম্ভব হয় না। তখন সেগুলিকে হয় আংশিক ও কৃত্রিম তৃপ্তি দিতে হয় কিংবা সেগুলিকে সম্পূর্ণ দাবিয়ে রাখতে হয়। এই দাবিয়ে রাখার কাজটিকে অবদমন বলে। সময় সময় চেতন মনেও এই ধরনের সমাজবিরোধী বা নীতিবিরুদ্ধ ইচ্ছা দেখা দেয়। তখনও অহম্ সেই ইচ্ছাটিকে তার অচেতনে অবদমিত করতে বাধ্য হয়। অবদমনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এটি একটি অচেতন প্রক্রিয়া এবং যে ইচ্ছা বা চিন্তাকে ব্যক্তি অবদমিত করে সে সম্বন্ধে পরে তার আর কোন সচেতনতা থাকে না। সেই ইচ্ছা বা চিন্তাটি চেতন স্তর থেকে নেমে অচেতনে এসে বাসা বাঁধে এবং ফলে ব্যক্তি সেই বিষয়টি সম্পূর্ণ ভুলে যায়।

কিন্তু অচেতনে অবদমিত হলেও এই ইচ্ছা বা কামনাগুলি তাদের শক্তি বা ক্ষমতা একটুও হারায় না। অনেকটা টাইম বোমার মত সেগুলি অচেতনে নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে এবং সময় ও সুযোগ পেলেই বিস্ফোরিত হয়। এই অবাঞ্ছিত এবং প্রত্যাখ্যাত ইচ্ছাগুলিকে দাবিয়ে রাখার জন্য অহম্‌কে সেগুলির উপর একটি বাধা চাপিয়ে দিতে হয়। এই বাধাকে সেন্সর (Censor) নাম দেওয়া হয়েছে। সেন্সরের কাজ হল ইদমের তৃপ্তিকামী ইচ্ছাগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা। যে ইচ্ছাগুলি সেন্সরের বিচারে তৃপ্তিদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় সেগুলিকে সেন্সর চেতন মনে প্রবেশের অধিকার দেয় এবং যেগুলি তার বিচারে অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয় সেগুলিকে সে জোর করে দাবিয়ে রাখে। এক কথায় সেন্সর অবদমিত ইচ্ছাগুলির পাহারাদাররূপে কাজ করে।

অবদমনের কাজে অধিসত্তার ভূমিকা প্রচুর। যদিও অধিসত্তা সরাসরি অবদমন করতে পারে না এবং অবদমন করাটা একমাত্র অহমেরই কাজ, তবু সেন্সরের প্রকৃতি নির্ধারণে অধিসত্তার অবদান সব চেয়ে বেশী। কোন্ ইচ্ছাটি

চেতনে স্থান পাবার যোগ্য আর কোনটি নয় এটির চরম নিয়ন্ত্রক হ'ল অধিসত্তা এবং এই অধিসত্তারই অনুশাসন অনুযায়ী সেন্সর পরিচালিত হয়।

প্রকৃতির দিক দিয়ে অবদমন হ'ল চরমতম এবং নিকৃষ্টতম কৌশল। কেননা এই পন্থায় ইদম্ সম্পূর্ণ অতৃপ্ত থেকে যায় এবং তার ফলে ইদম্-অহমের দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসা দেখা দেয় না। অবদমন যখন অতিরিক্ত হয়ে ওঠে তখন ইদম্-অহমের অন্তর্দ্বন্দ্ব তীব্রতম রূপ ধারণ করে এবং তার ফলে ব্যক্তির মানসিক স্থৈর্য যে কোন মুহূর্তে বিপর্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। অধিকাংশ মানসিক বিকারের কারণই হ'ল অতৃপ্ত ইচ্ছার অতিরিক্ত অবদমন।

২। প্রতিক্রিয়া সংগঠন (Reaction Formation)

কখনও কখনও কোন অবদমিত ইচ্ছাকে অস্বীকার করার জন্য ব্যক্তি সেই ইচ্ছার বিপরীত মনোভাবটি প্রকাশ করে বা বিপরীত আচরণ সম্পন্ন করে। এই কৌশলটিকে প্রতিক্রিয়া সংগঠন বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, অবদমিত যৌন-ইচ্ছা যৌন-ভীতির রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। ঈডিপাস কমপ্লেক্স বা কাস্ট্রেসন কমপ্লেক্স থেকে জাত পিতার প্রতি বিদ্বেষ প্রতিক্রিয়া-সংগঠনের ফলে পিতার জন্য অতিরিক্ত উদ্বেগে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

৩। অপব্যাখ্যান (Rationalisation)

যখন আচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য বা কারণের পরিবর্তে তার চেয়ে ভাল বা সমাজ অনুমোদিত কোন উদ্দেশ্য বা কারণ উপস্থাপিত করা হয় তখন সেই কৌশলটিকে অপব্যাখ্যান বলা যেতে পারে। এই কৌশলের দ্বারা অহম্ তার আচরণটির সত্যকার উদ্দেশ্য বা কারণটি প্রকাশ করার অবাঞ্ছিত কাজ থেকে রেহাই পায়। অবশ্য এই প্রকৃত কারণটি গোপন রেখে অন্য একটি কারণ উপ-স্থাপিত করার কাজটি সম্পূর্ণ অচেতন ভাবেই অহমের দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। যে কারিগর তার নিজের অকর্মণ্যতার জন্য তার যন্ত্রপাতির দোষ দেয় বা যে নর্তকী তার নৃত্যকলায় অজ্ঞতার দায়িত্ব উঠানের উপর চাপায়, সেই কারিগর বা নর্তকী নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য অপব্যাখ্যানেরই আশ্রয় নিচ্ছে। আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তা ও আচরণে আমরা এই ধরনের বহু অপব্যাখ্যানের সাহায্য নিয়ে থাকি।

৪। প্রতিক্ষেপণ (Projection)

প্রতিক্ষেপণ অপব্যাখ্যানেরই একটি বিশেষ রূপ মাত্র। এই কৌশলটিকে

ব্যক্তি তার ইদমের অতৃপ্ত কামনাই বাইরের জগতের উপর প্রতিক্ষিপ্ত করে। যেমন, কোনও স্ত্রীর স্বামীর প্রতি অচেতন মনে নিহিত ঘৃণাটি প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে স্ত্রীর মনে এই ধারণা সৃষ্টি করতে পারে যে তার স্বামীরই তার প্রতি আসক্তি নেই বা স্বামীই তাকে ঘৃণা করে। মানসিক বিকৃতির অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রুগী নিপীড়নের বিভ্রান্তিতে (Delusion Persecution) ভোগে। অর্থাৎ তার ধারণা হয় যে সকলেই তার উপর নির্যাতন করছে। প্রকৃতপক্ষে তার অভ্যন্তরস্থ ধ্বংসাত্মক কামনাটি বাইরের জগতে প্রতিক্ষিপ্ত হয়ে তার মধ্যে নিপীড়নমূলক বিভ্রান্তির রূপ নিয়েছে।

৫। উন্নীতকরণ (Sublimation)

সঙ্গতিবিধানের কৌশলগুলির মধ্যে উন্নীতকরণ সর্বোৎকৃষ্ট। কেননা এই প্রক্রিয়াটির দ্বারা অহমের পক্ষে ইদমের অতৃপ্ত কামনার আংশিক তৃপ্তি দেওয়া সম্ভব হয়। ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর সকল কামনার লক্ষ্যই যৌনমূলক। কিন্তু নানা ক্ষেত্রে ব্যক্তি সামাজিক অনুশাসনের চাপে লিবিডোর যৌনমূলক লক্ষ্যটিকে নিরুদ্ধ করে সেটিকে অন্যপথে পরিচালিত করতে বাধ্য হয়। এই প্রক্রিয়ার দ্বারা ঐ চাহিদাটির অবশ্য আংশিক তৃপ্তি দেওয়া সম্ভব হয়। একেই উন্নীতকরণ বলা হয়। কোন কামনাকে তার নিম্নশ্রেণীর লক্ষ্য থেকে সরিয়ে এনে কোন উচ্চশ্রেণীর লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করাই হল উন্নীতকরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য-নিরুদ্ধ যৌনশক্তি তখন সৃজনমূলক নানা কাজের মধ্যে দিয়ে তৃপ্তি লাভ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যৌন-মিলনের ইচ্ছা উন্নীত হয়ে ক্লাব, পার্টি, সহনৃত্য প্রভৃতির মাধ্যমে নর-নারীর অবাধ মেলামেশায় পরিণত হয়েছে, আক্রমণাত্মক কামনা বক্সিং, কুস্তি ও অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলার রূপ নিয়েছে ইত্যাদি। দেখা গেছে যে এইভাবে যৌনতা-মুক্ত (Desexualised) লিবিডো শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি, সামাজিক কার্যাবলী, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, হবি প্রভৃতি আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজের তৃপ্তি খুঁজে নেয়।

৬। অভেদীকরণ (Identification)

এটিও ইদমের কামনাকে আংশিক তৃপ্তি দেবার একটি পন্থাবিশেষ। এই কৌশলে ব্যক্তি অপরের সত্তা বা অপরের কৃতিত্বের সঙ্গে নিজের সত্তাকে বা নিজের কৃতিত্বকে অভিন্ন বলে মনে করে তৃপ্তি পায়। শৈশবে শিশু তার পিতার সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে তৃপ্তি লাভ করে। আমরাও যে আমাদের পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব নিয়ে গর্ববোধ করি সেটিও একটি অভেদীকরণের দৃষ্টান্ত।

৭। প্রত্যাবৃত্তি (Regression)

লিবিডো যখন বাস্তবের কোন বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না তখন সে বর্তমানকে ত্যাগ করে অতীতের শৈশবে ফিরে যায় এবং শৈশবের যে সকল আচরণে সে আনন্দ পেত সেই সকল আচরণ সম্পন্ন করে সে তার সঙ্গতিবিধানের সমস্যার সমাধান করে। হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি মনোবিকারের ক্ষেত্রে এই রকম লিবিডোর প্রত্যাবৃত্তি প্রায়ই ঘটে থাকে।[১] দেখা গেছে যে প্রত্যাবৃত্তির ফলে মানসিক বিকারের রুগী নিজের হাতে খাবার খেতে পারছে না বা নিজে পোষাক পরতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার বর্তমান পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে না পেরে তার শৈশবের আচরণে প্রত্যাবর্তন করেছে।

৮। অবাস্তব কল্পনা এবং দিবাস্বপ্ন

(Fantasy & Day-dreaming)

যে সকল ইচ্ছা বাস্তবে তৃপ্ত হয় না সেগুলিকে কল্পনা বা দিবাস্বপ্নের মাধ্যমে ব্যক্তি আংশিক তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। অবদমিত বাসনাকে তৃপ্তিদানের এই কৌশলটি খুবই সহজ এবং সকলেরই আয়ত্তাধীন। অনেক সময় অতৃপ্ত যৌন-কামনাও অযৌন রূপ নিয়ে দিবাস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে নিজেদের তৃপ্তি খুঁজে নেয়।

৯। রূপান্তরকরণ (Conversion)

কখনও কখনও অবদমিত ইচ্ছা কোনও বিশেষ শারীরিক অভিব্যক্তির রূপ নিয়ে দেখা দেয়। তখন তাকে রূপান্তরকরণ বলা হয়। যেমন, রূপান্তরিত হিষ্টিরিয়ার (Conversion Hysteria) ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে কোনও শারীরিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিশেষ একটি মানসিক দ্বন্দ্বের সমাধান ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ, একটি মেয়ে দীর্ঘদিন তার অসুস্থ পিতার সেবা করতে করতে বিরক্ত হয়ে ওঠে। অথচ পিতার প্রতি তার স্বাভাবিক কর্তব্যবোধ একটুও ক্ষুণ্ণ হয় না। ফলে তা থেকে জন্ম নেয় মানসিক দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে মেয়েটির একটি হাত পক্ষাঘাতে অকর্মণ্য হয়ে গেছে। এখানে তার পিতাকে সেবা করার অনিচ্ছাটি শারীরিক লক্ষণ নিয়ে তার মধ্যে দেখা দিল।

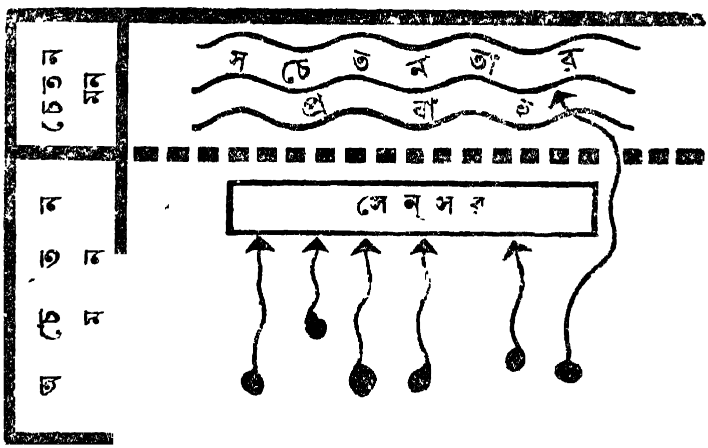
মনোবিকারের কারণ (Causes of Neurosis)

লিবিডো তার সহজ অগ্রগতির পথে কোন কারণে বাধা পেয়ে যদি তার শৈশবের কোন সংবন্ধনের (Fixation) স্থানে ফিরে আসে তাহলে ব্যক্তির মধ্যে মনোবিকার (Neurosis) দেখা দেয়। লিবিডোর এই প্রত্যাবৃত্তির

১। পৃঃ ১৯৬

(Regression) ফলে ব্যক্তি বাস্তবের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে এবং শৈশবের যে সকল আচরণ বা পন্থার দ্বারা তার লিবিডো তৃপ্তি পেত সেই সকল আচরণ বা পন্থার সে আবার আশ্রয় নেয়। লিবিডোর এই প্রত্যাবর্তনের কারণ হল ব্যক্তির জীবনের কোন আঘাতাত্মক বা ব্যর্থতামূলক অভিজ্ঞতা। এটিকে আমরা মনোবিকারের প্রত্যক্ষ কারণ বলব।

কিন্তু আঘাতাত্মক বা ব্যর্থতামূলক ঘটনা ব্যক্তির জীবনে নিয়তই ঘটে থাকে। কিন্তু সকলের ক্ষেত্রেই মনোবিকার দেখা দেয় না। তার ব্যাখ্যা হল যে আঘাতাত্মক ঘটনা বা ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা হল মনোবিকারের প্রত্যক্ষ কারণ। কিন্তু তাছাড়াও মনোবিকারের আর একটি অপ্রত্যক্ষ কারণ আছে। সেটি হল ব্যক্তির মনোবিকারমূলক প্রবণতা। ব্যক্তির মনের মধ্যে এমন একটি



[চেতন মনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত কামনাগুলি অচেতনে অবদমিত হয় এবং সেখান থেকে সেগুলি সচেতনে উঠে আসার জন্য বার বার চেষ্টা করে। কিন্তু সেন্সর তাদের উপরে ওঠার সে প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। কোন কোন অবদমিত কামনা কৌশলে সেন্সরকে এড়িয়ে সচেতন স্তরে পৌঁছয়।]

অবস্থা বা প্রবণতা জন্ম থেকেই সৃষ্ট হয়ে থাকে যেটি কোন কারণে বাধাপ্রাপ্ত হলে তার লিবিডো শৈশবের সংবদ্ধনের স্থলে প্রত্যাবৃত্ত করে। এই অপ্রত্যক্ষ কারণটি না থাকলে কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ কারণ থেকেই মনোবিকারের সৃষ্টি হয় না।

এই অপ্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে প্রধানত অন্তর্ভুক্ত হল লিবিডোর অতিরিক্ত শৈশবকালীন সংবদ্ধন, যার ফলে ব্যক্তির জীবন-সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় লিবিডোর পরিমাণ কম হয়ে যায় এবং কোনরূপ মানসিক আঘাত বা ব্যর্থতাকে

সহ্য করতে লিবিডো অক্ষম হয়ে পড়ে। তাছাড়া শৈশবকালীন যৌনতৃপ্তির ক্ষেত্রগুলিতে লিবিডো সংবন্ধিত থাকার ফলে ব্যক্তির অচেতনে সকল সময়ই একটা দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। শৈশব স্তরে সংবন্ধিত লিবিডো চায় তৃপ্তি কিন্তু পরিণত মনের অহম্ তাকে সে তৃপ্তি দিতে পারে না। ফলে অহম্‌কে জোর করে সেই শৈশবকালীন কামনাগুলিকে অবদমিত করতে হয়। তার ফলেও বেশ কিছুটা লিবিডো ব্যয়িত হয়ে যায় এবং বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় লিবিডোর পরিমাণ আরও কমে যায়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে লিবিডোর শৈশবকালীন সংবন্ধন, অহমের সঙ্গে সেই সংবন্ধিত লিবিডোর দ্বন্দ্ব এবং তার ফলে অহম্ কর্তৃক শৈশবকালীন কামনাগুলির অবদমন—এ সবে মিলে ব্যক্তির মনে সৃষ্টি করে এমন একটি পরিস্থিতি যেটি মনোবিকার সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল। অপ্রত্যক্ষ কারণের মধ্যে প্রধান হল উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া এই মনোবিকারমূলক প্রবণতা। এই অপ্রত্যক্ষ কারণগুলির সঙ্গে যখন আঘাতাত্মক অভিজ্ঞতা-রূপ প্রত্যক্ষ কারণটি সংযুক্ত হয় তখনই দেখা দেয় মনোবিকার।

এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে মনোবিকারও ব্যক্তির এক প্রকার সঙ্গতিসাধনের প্রচেষ্টা, যদিও সে প্রচেষ্টা সুষ্ঠু বা সার্থক নয়। অহম্ যখন দেখে যে ইদমের অবদমিত আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সে আর দাবিয়ে রাখতে পারছে না, অথচ সেগুলির তৃপ্তি দেওয়ার অর্থ হবে চরম বিপর্যয়কে ডেকে আনা তখন মনোবিকারের মাধ্যমে সে সেগুলির তৃপ্তি দেয়। যেমন, অবৈধ যৌনকামনাকে প্রকাশ্য পন্থায় পূর্ণ তৃপ্তি দেওয়ার চেয়ে অহম্ সেগুলিকে হিস্টিরিয়ার লক্ষণের মধ্যে দিয়ে আংশিক তৃপ্তি দেওয়া অনেক নিরাপদ বলে মনে করে। এক কথায় মনোবিকার হল চরম বিপর্যয়কে এড়াবার জন্য অহমের আংশিক বিপর্যয়কে বরণ করার একটা প্রয়াসমাত্র।

মনোবিকারের চিকিৎসা (Treatment of Neurosis)

ফ্রয়েডের মতে মনোবিকারের একমাত্র চিকিৎসা হচ্ছে প্রত্যাবৃত্ত লিবিডোর আশ্রয়স্থল খুঁজে বার করা এবং সেই সংবন্ধনের বন্ধন থেকে তাকে মুক্ত করা। এর জন্য প্রয়োজন রুগীর বিস্মৃত শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা-বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রবেশ করা এবং তার লিবিডোর সংবন্ধনের স্থানগুলি আবিষ্কার করা। ফ্রয়েডের মতে লিবিডোর এই শৈশবকালীন আসক্তির স্থানগুলি যে মুহূর্তে রুগীর নিকট জানা হয়ে যাবে সেই মুহূর্তে তার মনোবিকারও দূর হয়ে যাবে। ইয়ুং'র (Jung) মতে কিন্তু মনোবিকারের চিকিৎসার জন্য এই শৈশবকালীন আসক্তি-স্থল খুঁজে

বার করার কোন প্রয়োজন নেই। তাঁর মতে যে বাস্তব বা কাল্পনিক বাধায় প্রতিহত হয়ে লিবিডো প্রত্যাবৃত্ত হয় সেইটি দূর করে দিলেই মনোবিকারও দূর হয়ে যায়।

অবাধ অনুষঙ্গ (Free Association)

শৈশবের লিবিডো-আসক্তির ক্ষেত্রগুলি খুঁজে বার করা স্বাভাবিকভাবে সম্ভব নয়। কেননা সেই অভিজ্ঞতাগুলি সচেতন মন কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ফলে অচেতন মনে অবদমিত অবস্থায় বাস করে। সাধারণ পন্থায় চেষ্টা করলেও ব্যক্তি তার সেই অতীতের স্মৃতিগুলিকে তার চেতন মনে ফিরিয়ে আনতে পারে না।

প্রথম প্রথম সম্মোহন প্রক্রিয়ার সাহায্যে এই অতীত অভিজ্ঞতাগুলিকে অচেতন স্তর থেকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করা হত। কিন্তু পরে ফ্রয়েড সম্মোহন প্রক্রিয়াটি ত্যাগ করে অবাধ-অনুষঙ্গ পদ্ধতির প্রবর্তন করলেন। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তিকে তার মনের উপর কোনরূপ বাধা আরোপ না করে তার সমস্ত চিন্তা বিনা দ্বিধায় ব্যক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

একটি নির্জন ঘরে শান্ত পরিবেশে কেবলমাত্র মনঃসমীক্ষকের উপস্থিতিতে ব্যক্তিকে একটি আরাম কেদারায় শুইয়ে দেওয়া হয় এবং তার পরে তাকে কোনরূপ দ্বিধা বা সঙ্কোচ না করে যা তার মনে আসে অবিকল সে সব কথা বলে যেতে বলা হয়। প্রথম প্রথম ব্যক্তি তার বর্তমান ও চেতন মনের চিন্তার কথাগুলিই বলে যায়। কিন্তু ক্রমশ সে ধীরে ধীরে তার বিস্মৃত অতীতে এবং অচেতন মনের শৈশবকালীন অভিজ্ঞতায় চলে যায় এবং তার সেই বিবরণের মধ্যে দিয়ে তার অতীতের অপূর্ণ কামনা ও অবদমিত অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলি আত্মপ্রকাশ করে। মনঃসমীক্ষক এই সকল তথ্য থেকে তার মানসিক দ্বন্দ্বের নিখুঁত একটি ছবি পান এবং তাই থেকে তার মনোবিকার দূর করার উপায় নির্ধারণ করে দিতে পারেন। এই পদ্ধতিটিকে ফ্রয়েড অবাধ অনুষঙ্গ (Free Association) নাম দিয়েছেন। কেননা এখানে ব্যক্তির এক চিন্তা থেকে আর এক চিন্তায় অনুষঙ্গ স্থাপনে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করা হয় না। ব্যক্তির চিন্তাধারা তার সহজ ও অবাধিত অগ্রগতির পথ ধরে এগোতে পারে। যদিও এ পদ্ধতিতে অনুষঙ্গ যথেষ্ট অবাধিত তবু এটিকে সম্পূর্ণ অনিয়ন্ত্রিত বা বাধাহীন বলা চলে না, কারণ চিকিৎসকের উপস্থিতি ও তাঁর নির্দেশ দান, পরিস্থিতির বৈচিত্র্য, নিজের রোগ সম্বন্ধে সচেতনতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলি ব্যক্তির অনুষঙ্গকে প্রচুর পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে।

বর্তমানে মনঃসমীক্ষণের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল এই অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতিটি। এই পদ্ধতির সাহায্যে ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীরা মনোবিকারের কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসায় অত্যন্ত সন্তোষজনক ফল লাভ করেছেন। তবে একথাও সত্য যে এই পদ্ধতিটি যথেষ্ট আয়াসবহুল এবং অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ। বিশেষধর্মী শিক্ষণ ছাড়া এই পদ্ধতিটি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা দুরূহ।

অচেতনের মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষক

(Psychology of Unconscious and Teacher)

পূর্বে মন বলতে একমাত্র সচেতন মনকেই বোঝাত। শিশুর কাজকর্ম আচরণ সবই মনে করা হত তার সচেতন মনের চিন্তা বা ইচ্ছা থেকে প্রসূত। অতএব তার সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যাও যেমন তার সচেতন মনের ক্রিয়াকলাপের দ্বারা দেওয়া হত তেমনই তার আচরণের সংশোধন বা পরিবর্তনের জন্যও তার এই সচেতন মনেরই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সংশোধিত বা পরিবর্তিত করার চেষ্টা করা হত। উদাহরণস্বরূপ, যদি একটি ছেলে মিথ্যা কথা বলত তাহলে শিক্ষক মনে করতেন যে সে তার মনের অসৎ কোন ইচ্ছা বা শাস্তি এড়াবার জন্য বলছে। কোন ছেলে যদি চুরি করত তাহলে মনে করা হত যে সে লোভের বশবর্তী হয়ে চুরি করছে। আবার যদি কোন ছেলে ক্লাশ থেকে পালাত তাহলে শিক্ষক মনে করতেন যে সে নিশ্চয় পড়াশোনায় অমনোযোগী বা অসৎ সঙ্গের প্রভাবে সে পড়ায় অবহেলা করছে। এই সব দুষ্কৃতকারীদের সংশোধনের জন্যও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করা হত। অর্থাৎ যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে তার মনের অসৎ ইচ্ছাকে দমন করার বা তার মনের ভয় দূর করার চেষ্টা করা হত। যে ছেলে চুরি করত তাকে তার লোভ দমন করার শিক্ষা দেওয়া হত বা যাতে সে চুরি করার সুযোগ না পায় তার ব্যবস্থা করা হত। তেমনই যে ছেলে ক্লাশ পালাত সে ছেলে যাতে ক্লাশ পালাবার সুযোগ আর না পায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হত। শিক্ষকদের এই সংশোধনমূলক প্রচেষ্টায় ২টি বস্তুর সাহায্য ব্যাপকভাবে নেওয়া হত—শাস্তি এবং পুরস্কার। যাতে ছেলেমেয়েদের দুষ্প্রবৃত্তির দিকে প্রবণতা না দেখা দেয় সেজন্য শাস্তি এবং পুরস্কারকে অস্ত্ররূপে সর্বত্রই ব্যবহার করা হত।

কিন্তু যেদিন থেকে আমরা অচেতন মনের অস্তিত্বের কথা জানতে পারলাম সেদিন থেকেই আমরা বুঝতে পারলাম যে মানব আচরণের যে ব্যাখ্যা এতদিন

আমরা দিয়ে এসেছি সে ব্যাখ্যা নিতান্তই ভুল ও অসম্পূর্ণ। আমাদের আচরণের প্রকৃত নিয়ন্ত্রক আমাদের অচেতন মনই, আমাদের সচেতন মন নয়। শিশুর সচেতন মনের কোন চাহিদা বা ইচ্ছা পূর্ণ না হলে তা অবদমিত হয়ে যায় তার অচেতন মনে এবং সেখানে সেটি সৃষ্টি করে অন্তর্দ্বন্দ্বের। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তার সচেতন মনে প্রতিফলিত হয় না বটে, কিন্তু তার সচেতন আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং বহুক্ষেত্রে তার সচেতন চিন্তাধারা, আচরণ, মনোভাব প্রভৃতির প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত করে।

যেমন, যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে সে নিছক অসৎ ইচ্ছায় বা শাস্তির ভয়ে যে তা বলছে তা না হতেও পারে। হয়ত তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা স্বাভাবিক পথে তৃপ্ত না হওয়ায় সে মিথ্যা কথা বলে অপরের কাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছে। তেমনই যে ছেলে চুরি করছে সেও হয়ত তার অতৃপ্ত সঞ্চয়ের চাহিদা কিংবা প্রত্যাখ্যাত স্বীকৃতির চাহিদাকে তৃপ্ত করার জন্য চুরি করছে। যে ছেলে ক্লাশ পালাচ্ছে সেও হয়ত ক্লাশে তার কৌতূহল তৃপ্তির যথেষ্ট উপাদান না পাওয়ায় বাইরে বেড়িয়ে পড়েছে তার কৌতূহল তৃপ্তির জন্য। এই সব ছেলেমেয়েদের আধুনিক মনোবিজ্ঞানে অপসঙ্গতি-সম্পন্ন (Maladjusted) শিশু বলা হয়ে থাকে। এরা স্বাভাবিক পন্থায় নিজেদের চাহিদার তৃপ্তি করতে না পেরে অস্বাভাবিক পথ গ্রহণ করে সেই চাহিদার পরিতৃপ্তি পেতে। এতদিন এই সব ছেলেমেয়েদের আচরণের ব্যাখ্যা গতানুগতিক পন্থাতেই দিয়ে আসা হয়েছে এবং তাদের সংশোধনের চেষ্টাও হয়েছে বাহ্যিক উপায়ে। কিন্তু সে সব চিকিৎসা হয়েছে নিছক লক্ষণভিত্তিক (Symptomatic)। অর্থাৎ সেখানে কেবলমাত্র তাদের লক্ষণগুলি দূর করার চেষ্টাই হয়েছে, প্রকৃত রোগ নিরাময় করার চেষ্টা হয় নি। যে ছেলে ক্লাশ থেকে পালাচ্ছে বা চুরি করছে তাকে কড়া শাসনে রাখলে হয়ত ঐ কাজগুলি সে আর করতে পারবে না, কিন্তু তাকে তার চাহিদার তৃপ্তি হবে না বা মনের অন্তর্দ্বন্দ্বও দূর হবে না। ফলে তার অতৃপ্ত চাহিদা অপর কোনও অস্বাভাবিক পথে প্রকাশিত হবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু বর্তমানে শিশুর অচেতন মন সম্পর্কে বিশদ জ্ঞানলাভ করার পর থেকে শিক্ষকেরা শিশুদের সমস্যামূলক আচরণের সত্যকারের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা করতে পারেন। তাঁরা এখন বুঝেছেন যে শিশুর অপসঙ্গতির যে মূল কারণটি তার অচেতনের গভীরতায় নিহিত আছে যতক্ষণ সেটিকে দূর করা না হচ্ছে ততক্ষণ শিশুর অপসঙ্গতিও দূর হবে না। ফলে আজকাল শিশুর সমস্যামূলক আচরণের চিকিৎসা হয়ে দাঁড়িয়েছে মূলগত, নিছক লক্ষণগত নয়।

সমস্যাসম্পন্ন শিশুকে আজকাল আর শাস্তি-পুরস্কারের সাহায্যে বা নৈতিক বিধি-নিষেধের কড়া বাঁধনে বেঁধে সংশোধন করার চেষ্টা করা হয় না, তাদের সমস্যাগুলির প্রকৃত স্বরূপ চিকিৎসকের দৃষ্টি নিয়ে বোঝার চেষ্টা করা হয় এবং রোগের মূল কারণটি খুঁজে বার করে সেটিকে দূর করার ব্যবস্থা করা হয়। এই কারণেই আজকাল প্রতিটি প্রগতিশীল বিদ্যালয়ে শিশুদের সমস্যা সমাধানের জন্য শিশু-পরিচালনাগারের (Child Guidance Clinic) সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। স্কুলের পরিবেশে যাতে শিশুদের বিভিন্ন মৌলিক চাহিদাগুলি তৃপ্তিলাভ করে এবং যাতে শিশু সুসঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে বড় হয়ে ওঠে তার জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়া হয়।

বস্তুত অচেতন মনের আবিষ্কার মানব-মনের বহু শতাব্দীর বন্ধ দরজা আজ খুলে দিয়েছে। শিক্ষক আজ শিশুর মনের বহু জটিল ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন। মানুষের বহু আচরণই বাহ্যত নির্দোষ বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে কোন অন্তর্নিহিত অসামাজিক চাহিদা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে সেগুলি জন্মে থাকে। অনেক সময় অচেতনে অবদমিত কমপ্লেক্সও আমাদের বহু আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এই সব আচরণগুলিকে মনঃসমীক্ষণে প্রতিরক্ষণ কৌশল (Defence Mechanism) বলা হয়[১]। এই কারণে শিশুর কোন আচরণকেই আজকাল আর তার বাহ্যিক লক্ষণ বা স্বরূপের দ্বারা বিচার না করে তার অন্তর্নিহিত গুপ্ত কারণ বা উদ্দেশ্যটিকে খুঁজে বার করে তার পরিপ্রেক্ষিতে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

অচেতনের মনোবিজ্ঞান যেমন একদিকে সাধারণ সমস্যামূলক আচরণের ব্যাখ্যা দেয় তেমনই গুরুতর মনোবিকারের কারণেরও সন্ধান দিয়ে থাকে। ফ্রয়েডের অসংখ্য পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে মনোবিকারের কারণ নিহিত থাকে ব্যক্তির অচেতনে। লিবিডোর সংবন্ধন, প্রত্যাবৃত্তি, শৈশবকালীন আঘাতাত্মক (Traumatic) অভিজ্ঞতা ইত্যাদি মানসিক ঘটনাগুলি যে মনোবিকারের প্রকৃত কারণ, এ সত্যের সঙ্গে শিক্ষক আজ পরিচিত হয়েছেন। ফলে যাতে শিশুর জীবনে এই ধরনের কোন অবাঞ্ছিত ঘটনা না ঘটে সেদিকে তিনি যত্ন নিতে পারেন।

শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশ তার অচেতন মনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। অচেতনের অধিবাসী অসংখ্য অসামাজিক কামনাবাসনার তৃপ্তির তাগাদা এবং

১। পৃঃ ২০৬

বাস্তব জগতের অনুশাসন ও দাবীর মধ্যে যতটুকু এবং যেভাবে ব্যক্তি সামঞ্জস্য-বিধান করতে পারে ততটুকু এবং সেইভাবে তার ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে। এই প্রয়োজনীয় তথ্যটুকু শিক্ষকের জানা থাকলে তিনি উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সৃষ্টি করে শিশুর ব্যক্তিসত্তাকে সুষ্ঠু বিকাশের পথে পরিচালিত করতে পারেন।

এছাড়াও মনঃসমীক্ষণের কাছ থেকে আমরা আরও অনেক মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। এই সব তথ্য আধুনিক শিক্ষকের কাজকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণের সুবিপুল অবদান থেকে তার কিছুটা আভাষ পাওয়া যাবে।

শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণের অবদান
(Contribution of Psycho-Analysis to Education)

শিক্ষার নতুন সংব্যাখ্যান ও আধুনিক পদ্ধতির নির্ণয়ে মনঃসমীক্ষণের দান যত বেশী মনোবিজ্ঞানের অন্য কোন শাখার দান বোধ করি তত বেশী নয়।

মনঃসমীক্ষণের গবেষণায় মানব মনের কতকগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অথচ এত দিন অজানা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের সন্ধান আমরা পেয়েছি এবং তার ফলে শিশুকে মানুষ করা ও শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের প্রচলিত ধারণাগুলি একেবারে বদলে গেছে। প্রত্যক্ষভাবে হোক্ আর পরোক্ষভাবে হোক্, পূর্ণভাবে হোক্ আর আংশিকভাবেই হোক্, সব দেশের শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যেই মনঃসমীক্ষণের মৌলিক তথ্যগুলি অনুপ্রবেশ করেছে এবং সবক্ষেত্রেই প্রচুর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছে।

শিক্ষা ও তার সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে মনঃসমীক্ষণ কোন্ কোন্ দিক দিয়ে প্রভাবিত করেছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে দেওয়া হল।

১। শৈশবের গুরুত্ব (Impo.tance of Infoncy)

মনঃসমীক্ষণের সব চেয়ে বড় দান হল শৈশবের উপর গুরুত্ব স্থাপন। আগে মনে করা হত যে শৈশবের কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব ব্যক্তির পরিণত জীবনে থাকে না। কিন্তু বর্তমানে মনঃসমীক্ষণের নানা গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে শৈশবই জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাল এবং ভবিষ্যৎ ব্যক্তিসত্তার অধিকাংশ সংগঠনটিই প্রস্তুত হয়ে যায় তার জীবনের প্রথম ক'বছরের মধ্যে। অতএব শিশু তার শৈশবে যাতে কোনরূপ আঘাতাত্মক (Traumatic) অভি-জ্ঞতা না পায় এবং যাতে তার ক্রমবিকাশ স্বাস্থ্যময় ও অভীষ্ট পথ ধরে এগোতে পারে সেটা দেখাই শিক্ষার প্রধান কাজ।

২। আচরণ সমস্যার নতুন ব্যাখ্যা (New Interpretation of Problem Behaviour)

শিক্ষার্থীদের সমস্যামূলক আচরণ এবং দুষ্কৃতির একটি নতুন ব্যাখ্যা মনঃসমীক্ষণ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। পূর্বে শিক্ষার্থীদের অপরাধ-ধর্মী বা নীতিবিরোধী আচরণগুলিকে সাধারণ গতানুগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা হত এবং সেগুলির প্রতিকারও করা হত গতানুগতিক প্রথা অনুযায়ী। যেমন, কেউ মিথ্যা কথা বললে তাকে শাস্তি বা পুরস্কারের সাহায্যে সত্য কথা বলতে প্ররোচিত করা হত। কেউ ক্লাশ থেকে পালালে ভবিষ্যতে যাতে সে আর ক্লাশ থেকে না পালাতে পারে তার জন্য কড়া নজর রাখা হত ইত্যাদি। কিন্তু এই ধরনের চিকিৎসাগুলি সম্পূর্ণ লক্ষণভিত্তিক (Symptomatic)। অর্থাৎ এ পদ্ধতিতে রোগের লক্ষণেরই চিকিৎসা করা হয়, প্রকৃত রোগের চিকিৎসা করা হয় না। কিন্তু সত্যকারের রোগের চিকিৎসা করতে হলে যেতে হবে রোগের মূলে, যেখানে দেখা যাবে যে কোন বিশেষ মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব বা কোন অবদমিত কামনা শিশুকে ঐ ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ করতে বাধ্য করছে এবং ঐ অপরাধ প্রবণতা তখনই দূর হবে যখন শিশুর ঐ মানসিক দ্বন্দ্বের মীমাংসা বা তার অপূর্ণ কামনা তৃপ্তিলাভ করবে। লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসায় রোগের লক্ষণ দূর হয় কিন্তু রোগ দূর হয় না।

যে ছেলে মিথ্যা কথা বলছে বা চুরি করছে, হয়ত সেটা সে করছে তার অতৃপ্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার বাসনাকে পরিতৃপ্ত করতে। সে হয়ত লেখাপড়ায় ভাল ফল দেখাতে পারছে না, তার ফলে সহপাঠীদের কাছ থেকে তার কাম্য স্বীকৃতি সে পাচ্ছে না। আর তার জন্যই সে মিথ্যা কথা বলে, বা চুরি করার মাধ্যমে আত্মস্বীকৃতি পাবার চেষ্টা করছে। অতএব এই ছেলেটির চিকিৎসা করতে হলে তার মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রথমে দূর করতে হবে এবং তার জন্যে সে যাতে স্বাভাবিক উপায়ে সকলের কাছে স্বীকৃতি পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিশুদের সমস্যামূলক আচরণের এই নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি থেকেই জন্ম নিয়েছে মনশ্চিকিৎসার (Psychiatry) আধুনিক শাস্ত্রটি এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিধির (Mental Hygiene) পরিকল্পনাটি।

৩। মানসিক নির্ধারণ-বাদ (Psychic Determinism)

মনঃসমীক্ষকদের দেওয়া মানসিক সংগঠনের পরিকল্পনাটিও শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। বিশেষ করে অচেতনের নতুন পরিকল্পনাটি

মানব আচরণের ব্যাখ্যায় আমূল পরিবর্তন এনেছে। ব্যক্তির আচরণ যে কেবলমাত্র তার মনের চিন্তা, ইচ্ছা এবং ধারণা থেকেই জন্মায় না, বরং তার প্রত্যেকটি আচরণের চরম নির্ণায়ক ও নির্ধারক হল তার অচেতন মনের অদৃশ্য শক্তিগুলি—এই অভিনব তথ্যটি আজ আমাদের হস্তগত হওয়ায় শিক্ষার পদ্ধতির রাজ্যেও যুগান্তর দেখা দিয়েছে। এই তত্ত্বটির নাম দেওয়া হয়েছে মানসিক নির্ধারণবাদ (Psychic Determinism)। এই নতুন তত্ত্বটির পরিপ্রেক্ষিতে মানব আচরণের স্বরূপ নির্ণয়ও সম্পূর্ণ নতুন রূপ ধারণ করেছে।

৪। মানসিক দ্বৈততা (Mental Duality)

মনঃসমীক্ষণের আর একটি অবদান হল মানব মনের চিরন্তন দ্বৈততাকে ব্যক্ত করা। মানুষের মনে বহু সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শক্তি পাশাপাশি থেকে তার সমস্ত বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করছে। এরূপ হল জীবন ও ভালবাসার শক্তি, তার পাশেই রয়েছে থ্যানাটস, ধ্বংস ও মৃত্যুর শক্তি। ইদ্ অন্ধ ও যুক্তিহীন, নগ্ন কামনার প্রতিমূর্তি, তার পাশে থেকে কাজ করছে অহম্—আমাদের বাস্তব-সচেতন মন ও বিচারবুদ্ধির বাহক। অতএব মানুষের আচরণের মধ্যে বৈষম্য ও স্ববিরোধিতা থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং এই বিপরীতধর্মী প্রবণতাগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখাই হচ্ছে শিক্ষার কাজ।

৫। শৈশবকালীন যৌনতা (Infantile Sexuality)

শৈশবকালীন যৌনতার তত্ত্বটি মনঃসমীক্ষণের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। শৈশবে শিশুর ব্যক্তিসত্তা নির্ণয়ে যৌনশক্তির প্রভাবই যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—এ মূল্যবান তথ্যটি প্রথম মনঃসমীক্ষণই উপস্থাপিত করে। অবশ্য ফ্রয়েডীয় সংব্যাখ্যানে মানব আচরণের সকল স্তরেই যৌনতা একমাত্র শক্তি। এই মতবাদটি আজ সর্বজনস্বীকৃত না হলেও, মানব আচরণের নির্ণায়ক রূপে যৌনতা যে একটি প্রবল শক্তি এ কথাটি আজকাল সকলেই স্বীকার করে থাকেন। এই জন্যই আধুনিক শিক্ষা পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর যৌন চাহিদাকে আর অবহেলা করা হয় না এবং নানা বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে সেটির তৃপ্তির আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই একই কারণে যৌন-শিক্ষাও আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে।

৬। আবেগমূলক শক্তি (Emotional Forces)

মনঃসমীক্ষণে প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, অনুভূতি প্রভৃতি আবেগধর্মী শক্তিগুলির

উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সাধারণ প্রচলিত মনোবিজ্ঞানে যুক্তিমূলক ইচ্ছা, অভ্যাস, রিফ্লেক্স প্রভৃতিকেই আচরণের প্রধান উৎস বলে মনে করা হয়। কিন্তু মনঃসমীক্ষণের ব্যাখ্যায় প্রকৃতপক্ষে ঐগুলির মানব আচরণ নির্ধারণে বিশেষ ক্ষমতা নেই এবং বাস্তবক্ষেত্রে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ আবেগমূলক শক্তিগুলিই যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে অবদমিত করে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

৭। অচেতন প্রেষণা (Unconscious Motivation)

আমাদের আচরণের পিছনে যে প্রেষণা বা ইচ্ছা থাকে সেটির প্রকৃত স্বরূপ যে প্রায়ই আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকে এই তথ্যটি মনঃসমীক্ষণের আর একটি দান। এর অর্থ হল যে আমাদের বহু আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় অচেতন প্রেষণার দ্বারা। যেমন, প্রতিক্ষেপণ, অন্যব্যাখ্যান প্রভৃতি প্রতিরক্ষণ কৌশল-গুলির ক্ষেত্রে আমাদের আচরণের প্রকৃত উৎস নিহিত থাকে আমাদের অচেতনের কোন অজ্ঞাত কামনায়।

৮। অবদমন (Repression)

অবদমনের তথ্যটিও শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক অনুশাসন, মাতাপিতার নিয়ন্ত্রণ, শাস্তির ভয় ইত্যাদি কারণে শিশু তার ইচ্ছাকে অবদমিত করতে বাধ্য হয় এবং তার ফলে তার অচেতনে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব যখন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে এবং তার শিক্ষা বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। এইজন্য সার্থক শিক্ষা পরিকল্পনার প্রথম কর্মসূচী হল শিশুর ইচ্ছাকে যতদূর সম্ভব পূর্ণ করার ব্যবস্থা করা এবং যাতে প্রতিকূল পরিবেশের চাপে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি না হয় তা দেখা।

৯। অবাধ অনুষঙ্গ (Free Association)

সবশেষে শিক্ষায় মনঃসমীক্ষণের একটি বড় অবদান হল অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতি এবং তার অন্তর্নিহিত মৌলিক তত্ত্বটি। মনঃসমীক্ষণই প্রথম পরীক্ষণের সাহায্যে প্রমাণ করে দেয় যে সকল প্রকার মানসিক বিকারের মূলে আছে অচেতনের অবদমিত বাসনা এবং সেটিকে একমাত্র অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতির সাহায্যেই মুক্ত করা সম্ভব হতে পারে।

১০। যৌন-শিক্ষা (Sex Education)

মনঃসমীক্ষণের আধুনিক আবিষ্কার থেকেই সাম্প্রতিককালে যৌনশিক্ষাকে প্রাপ্তযৌবনদের পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার স্বপক্ষে ব্যাপক আন্দোলন দেখা

দিয়েছে। সব দেশের শিক্ষাবিদেরা উপলব্ধি করেছেন যে যৌনতা শিশুর ব্যক্তিসত্তার বিকাশে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি এবং তার ফলে যৌনমূলক শিক্ষা দেওয়াটা শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

চোদ্দ

চিন্তন (Thinking)

যে প্রক্রিয়াগুলিকে আমরা সাধারণ ভাষণে মানসিক প্রক্রিয়া বলে বর্ণনা করে থাকি সেগুলির মধ্যে চিন্তন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। শিখনের সঙ্গে চিন্তনের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। আমরা যা শিখি তাই নিয়েই চিন্তা করি। তবে চিন্তন প্রক্রিয়াটি শেখা বস্তুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার নিজস্ব ক্ষমতার বলে সে শিখনের গণ্ডী ছাড়িয়ে বেরিয়ে যায় এবং সময় সময় নতুন বস্তু বা তথ্য উদ্ভাবনের (Inventing) পর্যায়ে গিয়ে ওঠে। তখন সেই চিন্তন থেকেই নতুন শিখন ঘটে থাকে।

যখন আমরা আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের যে কোন একটির মাধ্যমে কোন বস্তু সম্বন্ধে সরাসরি অভিজ্ঞতা লাভ করি তখন তাকে প্রত্যক্ষণ (Perception) বলি। প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুকে প্রত্যক্ষিত বস্তু (Percept) বলা যায়। একই বস্তু নিয়ে আমরা চিন্তন করি, আবার সেটিকে প্রত্যক্ষণও করি, কিন্তু চিন্তনের বিষয়বস্তু এবং প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য হল এই যে প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে একটি বাহ্যিক উদ্দীপকের প্রয়োজন হয় কিন্তু চিন্তন করতে তার প্রয়োজন হয় না। যেমন, সামনের টেবিলের উপর রাখা বইটি প্রত্যক্ষণ করতে হলে আমাকে চোখ খুলে সেটি দেখতে হবে, কিন্তু চিন্তনের ক্ষেত্রে চোখ বন্ধ করেই সেটি নিয়ে আমি চিন্তা করতে পারি।

অতএব চিন্তনের ক্ষেত্রে আমরা প্রকৃত বস্তুটির স্থানে অন্য একটি বস্তু দিয়ে কাজ চালাই। বই সম্বন্ধে চিন্তা করতে গিয়ে প্রত্যক্ষিত বইটির পরিবর্তে আমরা বইয়ের একটি প্রতীক (Symbol) বা চিহ্ন (Sign) নিয়েই উদ্দেশ্যসিদ্ধি করে থাকি। এই প্রতীক বা চিহ্নটি যদিও প্রত্যক্ষিত বস্তুটির মত নিখুঁত নয়, তবুও আমাদের কাজ চালানোর পক্ষে এটি যথেষ্ট।

মানবমনের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে কোন বস্তু তার প্রত্যক্ষের গোচরে না থাকলেও সেই বস্তুটিকে সে মনে মনে বহন করতে পারে এবং তার সাহায্যে তার প্রয়োজনমত আচরণ বা প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে। প্রত্যক্ষের গোচরীভূত নয় এমন কোন বস্তুর পরিবর্তে যে বস্তুটিকে আমরা মনে মনে বহন করি সেটিকে এক কথায় প্রতীক (Symbol) বলা চলে। এই প্রতীক নানা

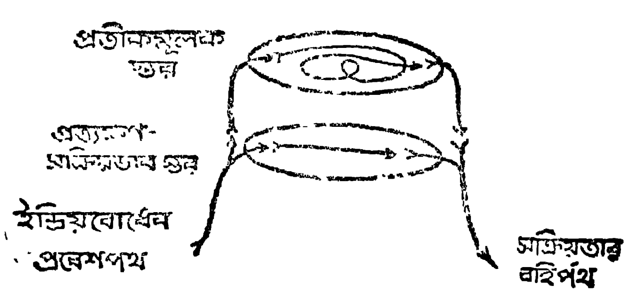
রকমের হতে পারে যেমন ধারণা, প্রতিরূপ, ভাষা ইত্যাদি। প্রত্যক্ষিত বস্তুর পরিবর্তে আমরা প্রতীকের ব্যবহার করি বলেই প্রত্যক্ষিত বস্তুর উদ্দেশ্যে আমরা সাধারণত যে ধরনের প্রতিক্রিয়া করে থাকি প্রতীকের প্রতিও আমরা অনেকটা সেই ধরনের প্রতিক্রিয়াই করে থাকি। প্রিয়জনকে দেখলে যেমন আনন্দ হয় তার সম্বন্ধে চিন্তা করলে বা তার ছবি মনে পড়লেও তেমনই আনন্দ হয়। অতএব চিন্তনকে আমরা সেই আচরণ বলে বর্ণনা করতে পারি যাতে প্রকৃত বস্তুর স্থানে তার প্রতীকের ব্যবহার করা হয়। কিংবা এক কথায় চিন্তন হল প্রতীকমূলক আচরণ।[1]

সাধারণ আচরণ ও প্রতীকমূলক আচরণ

সাধারণ আচরণ এবং চিন্তন বা প্রতীকমূলক আচরণের মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। সাধারণ আচরণের বেলায় প্রথমে হয় উদ্দীপকের প্রত্যক্ষণ, তা থেকে জাগে স্নায়ুঘটিত উত্তেজনা, সে উত্তেজনা গিয়ে পৌঁছয় মস্তিষ্কে, মস্তিষ্ক থেকে আবার উত্তেজনা নেমে আসে মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে এবং তখনই আচরণটি সম্পন্ন হয়। এই স্তরটিকে আমরা প্রত্যক্ষণ-সক্রিয়তামূলক স্তর বলতে পারি এবং এই স্তরে আচরণের সোপানগুলি হল নিম্নরূপ।

উদ্দীপন—>প্রত্যক্ষণ—>সক্রিয়তা।

প্রতীকমূলক স্তরটিকে এই প্রত্যক্ষণ-সক্রিয়তামূলক স্তরের উপর অধিষ্ঠাপিত দ্বিতীয় আর একটি স্তর বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই প্রতীকমূলক স্তরটি



[গিলফোর্ডের "General Psychology" নামক পুস্তক থেকে গৃহীত]

যখন সক্রিয় হয়ে ওঠে অর্থাৎ প্রাণী যখন চিন্তা করতে শুরু করে তখন নিম্নস্তরে বা প্রত্যক্ষণের স্তরে যে আচরণগুলি সংঘটিত হত সেগুলি তখন তার চিন্তার বা প্রতীকমূলক স্তরে অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু আচরণগুলি প্রত্যক্ষণমূলক স্তরে

---

1. Thinking is a symbolical behaviour.

সংঘটিত হয় না যেহেতু সেগুলির দৈহিক অভিব্যক্তি সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে এবং সম্ভবপর সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াগুলি ব্যক্তি একের পর এক তার চিন্তায় বা প্রতীকের মাধ্যমে সম্পন্ন করে যেতে পারে। তার ফলে এই বিভিন্ন বিকল্পগুলির দোষ-গুণ, সাফল্য-ব্যর্থতারও বিচার করা সম্ভব হয়, অথচ নিম্নস্তরের মত সেগুলির জন্য কোনরূপ দৈহিক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না বা উদ্যমও ব্যয়িত হয় না। একটি সমস্যার সমাধানে প্রতীকমূলক স্তরে যে বিভিন্নধর্মী আচরণগুলি আমরা সম্পন্ন করতে পারি সেগুলি যদি আমাদের বাস্তবে সম্পন্ন করতে হত তাহলে তাতে যে কেবলমাত্র প্রচুর সময়ই লাগত তা নয়, যে পরিমাণ অপ্রয়োজনীয় দৈহিক প্রচেষ্টা সম্পন্ন করতে হত সেটা একজনের পক্ষে সম্ভবপরই হয়ে উঠত না। এ ছাড়া এমন অনেক আচরণই চিন্তার মাধ্যমে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়, যেগুলি বাস্তবে সম্পন্ন করতে গেলে ব্যক্তিকে রীতিমত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হত।

সমস্যার সমাধানে সাধারণত বাস্তবে যে সব প্রচেষ্টা-ও-ভুলের আচরণের সাহায্য আমাদের নিতে হয়, চিন্তন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সেগুলি আমরা প্রতীকের সাহায্যে সম্পন্ন করতে পারি এবং তার ফলে প্রচুর উদ্যম ও প্রচেষ্টার অপচয় থেকে রেহাই পাই। চিন্তন এই জন্যই উন্নত, আয়াসহীন ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের প্রধান অস্ত্রস্বরূপ এবং বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতায় প্রাণীর পরম সহায়ক।

চিন্তনের প্রতীক (Symbols of Thinking)

চিন্তনের উপকরণ হল প্রতীক। প্রতীক নানা প্রকারের হতে পারে, যথা, পেশীঘটিত প্রস্তুতি (Muscular Set), প্রতিরূপ (Image), ধারণা (Concept) ভাষা (Language) ইত্যাদি।

পেশীঘটিত প্রস্তুতি (Muscular Set)

প্রতীকমূলক আচরণের সরলতম রূপের সন্ধান পাওয়া যায় বিলম্বিত প্রতিক্রিয়ার (Delayed reaction) পরীক্ষণগুলিতে। এই পরীক্ষণগুলি সাধারণত নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের নিয়েই করা হয়ে থাকে। প্রাণীটির সামনে কিছুটা দূরে তিনটি খাবারের বাক্স পাশাপাশি রাখা হয়। প্রাণীটিকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যাতে যে বাক্সটির উপর আলো জ্বালা হবে সেই বাক্সটির দিকেই সে খাবারের জন্য ছুটে যাবে। এবার প্রাণীটিকে একটি কাঁচের দেওয়ালের ওপাশে রাখা হল এবং তারপর একটি বাক্সের উপর আলোটা জ্বেলে নিবিয়ে দেওয়া হল। প্রাণীটিকে তখনই কিন্তু বাক্সের দিকে ছুটে যেতে দেওয়া হয় না।

কিছুক্ষণ ধরে রাখার পর প্রাণীটিকে ছেড়ে দেওয়া হল। এখন প্রাণীটিকে যদি ঠিক বাক্সটিতে পৌছতে হয় তবে তাকে মনে রাখতে হবে যে কোন্ বাক্সটির উপর আলোটা জ্বলেছিল। দেখা গেছে যে অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীরা কিছুক্ষণ সময়ের ব্যবধানেও ঠিক বাক্সটিতে গিয়ে পৌছতে পেরেছে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে যে প্রাণীটি আলো জ্বালায় কোন একটি বিশেষ প্রতীক মনে সংরক্ষণ করে রেখেছিল এবং পরে তিনটি বাক্সের মধ্যে থেকে প্রকৃত বাক্সটি সেই প্রতীকের সাহায্যেই সে খুঁজে বার করেছিল। মনোবিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই ক্ষেত্রে প্রাণী যে বস্তুটি প্রতীকরূপে তার মনে মনে বহন করে সেটি হল ঐ বিশেষ বাক্সটির দিকে ছুটে যাবার জন্য একটি দৈহিক পেশীঘটিত প্রস্তুতি। এই পেশীঘটিত প্রস্তুতির প্রতীকটি মনে মনে বহন করা ও পরবর্তী আচরণে সেটি প্রয়োগ করাকে চিন্তনের সরলতম রূপ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে এবং এ থেকে সিদ্ধান্ত করা হচ্ছে যে নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও চিন্তন প্রক্রিয়া বর্তমান আছে তবে তা অত্যন্ত সরলরূপে।

প্রতিরূপ (Image)

চিন্তনের আর একটি উল্লেখযোগ্য উপাদানের নাম প্রতিরূপ। প্রত্যক্ষিত বস্তুর ছবি বা অনুলিপিকে প্রতিরূপ বলা হয়। প্রত্যক্ষিত বস্তুর অনুকরণ হলেও প্রতিরূপ প্রকৃতিতে দুর্বল, অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। তবে স্পষ্টতা এবং সম্পূর্ণতার দিক দিয়ে প্রতিরূপ নানা শ্রেণীর হতে পারে। কোন বস্তু বা ঘটনার প্রতিরূপ আমাদের কাছে এত স্পষ্ট হতে পারে যে সেটি প্রত্যক্ষণের সমপর্যায়ের হয়ে দাঁড়ায় আবার কোন কোন প্রতিরূপ সে তুলনায় খুবই অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ থাকে।

প্রতিরূপের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Images)

যে কোন ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতাই প্রতিরূপের রূপ নিয়ে আমাদের মনে সংরক্ষিত হতে পারে। ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা পাঁচ রকমের হতে পারে। অতএব প্রতিরূপও পাঁচ রকমের হতে পারে, যথা, চাক্ষুষ (Visual, শ্রবণমূলক (Auditory), স্পর্শজ (Tactual), ঘ্রাণজ (Olfactory) এবং স্বাদজ (Gustatory)। এ ছাড়াও তাপমূলক (Thermal), বেদনামূলক (Pain) সঞ্চালনমূলক (Kinaesthetic) প্রভৃতি আরও কয়েক শ্রেণীর ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করে থাকি। অতএব সেগুলি থেকে প্রসূত প্রতিরূপগুলিও আমাদের চিন্তায় স্থান পায়। প্রতিরূপগুলি আবার সাধারণত মিশ্র অবস্থায় আমাদের মনে দেখা দেয়। যেমন, সমুদ্রের ঢেউয়ের প্রতিরূপের সঙ্গে

মিশে থাকতে পারে ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার শব্দ। বরফের দেশের ছবি মনে জাগলে শীতল স্পর্শের অনুভূতিটিও তার সঙ্গে মনে জাগে। গোলাপের কথা ভাবলে তার সুমিষ্ট গন্ধের প্রতিরূপটি আমাদের মনে জাগে। কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন প্রতিরূপের বহুল ব্যবহার।

যদিও সব রকম প্রতিরূপই সকলের মধ্যে আছে তবু প্রত্যেককেই তার অধিকাংশ চিন্তার কাজ সম্পন্ন করার জন্য কোনও বিশেষ প্রতিরূপের সাহায্য নেয়। সাধারণত বেশীর ভাগ লোকই চাক্ষুষ প্রতিরূপের উপর নির্ভর করে চিন্তন করে। কিন্তু আবার এমন লোক আছে যে হয় শ্রবণমূলক কিংবা স্পর্শজ বা অন্য কোন প্রতিরূপের উপর বেশী নির্ভরশীল। সাধারণত চিত্রকরেরা চাক্ষুষ প্রতিরূপ বা সুরকারেরা শ্রবণমূলক প্রতিরূপের উপরই নির্ভর করে থাকেন। কিন্তু এমন অনেক চিত্রকর আছেন যাঁরা চাক্ষুষ প্রতিরূপের তেমন সাহায্য নিয়ে কাজ করেন না। আবার অনেক সুরকারও শ্রবণমূলক প্রতিরূপের সাহায্য অপেক্ষাকৃত কম নেন।

অনুবেদন (After Image)

যখন কোন প্রত্যক্ষিত বস্তু আমাদের ইন্দ্রিয়ের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার পরও আমাদের মধ্যে বস্তুটির সংবেদন থেকে যায় তখন ঐ অভিজ্ঞতাকে অনুবেদন বলা হয়। ইংরাজীতে যদিও এই ধরনের অভিজ্ঞতাকে প্রতিরূপ বলে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তবু এটি আসলে প্রতিরূপ নয়। প্রকৃতপক্ষে এটি প্রত্যক্ষিত বস্তুর সংবেদনেরই বিলম্বনের একটি ক্ষেত্র। অর্থাৎ প্রকৃত বস্তুটিকে ইন্দ্রিয়ের সামনে থেকে অপসারিত করার পরও কিছুক্ষণের জন্য ব্যক্তির মধ্যে তার সংবেদনটি থেকে যায়।

সমবর্ণ এবং অসমবর্ণ অনুবেদন (Positive and Negative After Image)

অনুবেদন দু'শ্রেণীর হতে পারে, সমবর্ণ (Positive) এবং অসমবর্ণ (Negative)। যখন অনুবেদনে দৃষ্ট রঙগুলি প্রকৃত প্রত্যক্ষিত বস্তুটির রঙের সঙ্গে অভিন্ন থাকে তখন তাকে সমবর্ণ অনুবেদন বলা হয়। আর যখন অনুবেদনে দৃষ্ট রঙটি প্রত্যক্ষিত বস্তুটির রঙ না হয়ে তার প্রতিপূরক রঙ হয় তখন তাকে অসমবর্ণ অনুবেদন বলা হয়। নীচে অসমবর্ণ অনুবেদনের একটি পরীক্ষণ বর্ণিত হল।

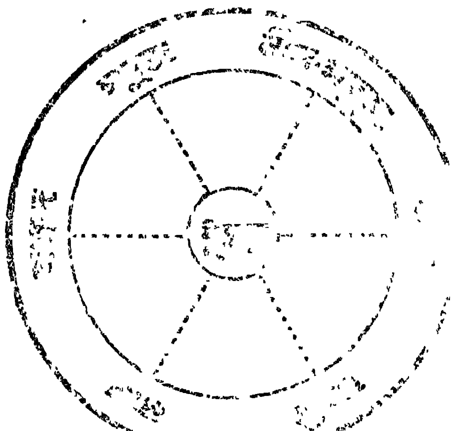
অসমবর্ণ অনুবেদন (Nagative After Image)

এক টুকরো গভীর লাল রঙের কাগজের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে যদি আমাদের দৃষ্টি সেখান থেকে সাদা দেওয়াল বা সাদা পর্দার

উপর সরিয়ে নিয়ে যাই তবে দেখা যাবে যে আমরা সেই লাল রঙের টুকরোটির পরিবর্তে সবুজে-নীলরঙের একটি টুকরো দেওয়াল বা পর্দাটির উপর দেখতে পাচ্ছি। এখানে লাল রঙের কাগজের টুকরোটি আমাদের সামনে না থাকা সত্ত্বেও ঐ বস্তুটির সংবেদন ঠিকই রইল কিন্তু প্রকৃত প্রত্যক্ষিত বস্তুটির রঙ অর্থাৎ লালের বদলে তার প্রতিপূরক রঙ অর্থাৎ সবুজে-নীল রঙটি দেখা গেল। এটি অসমবর্ণ অনুবেদনের একটি দৃষ্টান্ত। অসমবর্ণ অনুবেদনে সব সময় প্রতিপূরক রঙই দেখা যায়।

প্রতিপূরক রঙ (Complimentary Colour)

সূর্যের আলো যখন একটি আট-কোণওয়ালা কাচের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় তখন সাদা আলোটি ভেঙ্গে সাতটি রঙে পরিণত হয়। এই সাতটি রঙকে বর্ণালী (Spectrum) বলা হয়। এই রঙগুলির প্রত্যেকটির একটি করে প্রতিপূরক রঙ আছে। যখন দুটি রঙকে এক সঙ্গে মেশালে দুটিতে মিলে সাদা রঙের সৃষ্টি হয়, তখন সেই রঙ দুটিকে পরস্পরের প্রতিপূরক রঙ বলা হয়। যেমন, লাল এবং নীল-সবুজ রঙ পরস্পরের প্রতিপূরক। অর্থাৎ লাল এবং নীল-সবুজ রঙ



(প্রতিপূরক রঙের চক্রাকার তালিকা)

মিশে সাদা রঙ তৈরী করে। তেমনই হলদে ও নীল রঙ পরস্পরের প্রতিপূরক রঙ। উপরে প্রতিপূরক রঙগুলির একটি চক্রাকার তালিকা দেওয়া হল। চক্রে অবস্থিত বিপরীত রঙগুলি পরস্পরের প্রতিপূরক। অসমবর্ণ অনুবেদনে প্রত্যক্ষিত বস্তুর যা রঙ তার পরিবর্তে তার প্রতিপূরক রঙটি দেখা যায়।

প্রত্যক্ষিত বস্তুটির রঙ যদি সবুজ হয় তাহলে অসমবর্ণ অনুবেদনে বেগুনে রঙ দেখা যাবে। কিংবা প্রত্যক্ষিত বস্তুর রঙ নীল হলে অসমবর্ণ অনুবেদনে সেটি হলদে রঙে দাঁড়াবে। উপরে বর্ণিত পরীক্ষণের সাহায্যে এ ঘটনাগুলি প্রমাণিত করা যায়।

সমবর্ণ অনুবেদন (Positive After Image)

সমবর্ণ অনুবেদনের দৃষ্টান্ত কিন্তু খুব বেশী পাওয়া যায় না। খুব তীব্রভাবে যদি দৃষ্টিশক্তিকে উত্তেজিত করা যায় তবে সমবর্ণ অনুবেদনের সৃষ্টি হয়। পরিষ্কার একটি একশ-বাতির আলোর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকালে বা চোখ বন্ধ করলে ঠিক সেই সাদা আলোটির একটি সমবর্ণ প্রতিরূপ দেখা যাবে। সমবর্ণ অনুবেদন কিন্তু কয়েক সেকেণ্ডের বেশী স্থায়ী হয় না।

স্মৃতি প্রতিরূপ (Memory Image)

সাধারণত প্রত্যক্ষিত বস্তুর যে সব প্রতিরূপ আমরা মনে সংরক্ষণ করি এবং চিন্তন বা কল্পনের সময় যেগুলির বহুল ব্যবহার করি সেগুলিকেই স্মৃতি প্রতিরূপ (Memory image) নাম দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, কোন বন্ধুর কথা ভাবতে গিয়ে তার মুখখানা আমাদের চিন্তায় জেগে উঠলো। কিংবা নিজের বাড়ীর ছবিটি মনে জাগল বা আগ্রার তাজমহলের প্রতিরূপটি মনে ভেসে উঠল, ইত্যাদি। এইগুলিকে সাধারণ প্রতিরূপ বা স্মৃতি প্রতিরূপ বলা হয়।

প্রাথমিক স্মৃতি প্রতিরূপ (Primary Memory Image)

প্রতিরূপের এই শ্রেণী বিভাগটি জার্মান পদার্থতত্ত্ববিদ্ ফেকনারের (Fechner) সৃষ্ট। ফেকনারের মতে যখন আমরা দুটি ভারী জিনিস একটির পর একটি হাতে তুলে তাদের পরস্পরের ওজনের তুলনা করি তখন আসলে আমরা প্রথম বস্তুর একটি প্রতিরূপের সঙ্গে দ্বিতীয় বস্তুর প্রত্যক্ষণের তুলনা করে থাকি। প্রথম বস্তুর যে প্রতিরূপের সঙ্গে আমরা তুলনা করি ফেকনার তার নাম দিয়েছেন প্রাথমিক স্মৃতি প্রতিরূপ। ফেকনারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী প্রাথমিক স্মৃতি প্রতিরূপ এবং সাধারণ স্মৃতি প্রতিরূপের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে প্রথমটি দ্বিতীয়টি অপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট ও সম্পূর্ণ।

পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ (Recurrent Image)

একটি প্রতিরূপ যখন বার বার ঘুরে ঘুরে মনে এসে দেখা দেয় তখন তাকে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ বলা চলতে পারে। যেমন, অনুবীক্ষণের মধ্যে

দিয়ে অনেকক্ষণ খুব ছোট কোন বস্তু দেখলে পরে সেই বস্তুর ছবিটি বার বার চোখের সামনে আসা যাওয়া করে।

আইডেটিক প্রতিরূপ (Eidetic Image)

জার্মান মনোবিজ্ঞানী জীংস্কের (Jaensch) সাম্প্রতিক পরীক্ষণ থেকে একটি নতুন ধরনের প্রতিরূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। তিনি প্রতিরূপের পরীক্ষণ করতে গিয়ে দেখেন যে কোন কোন ছেলেমেয়ের সামনে থেকে প্রত্যক্ষিত বস্তুটি সরিয়ে নেওয়ার পরও তারা সেই বস্তুটির প্রতিরূপটি অতি নিখুঁত ও স্পষ্টভাবে মনে জাগিয়ে তুলতে পারে। যেমন, একটি ছেলেকে একটি ছবির দিকে কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে তাকিয়ে থাকতে বলা হল। তারপর তার সামনে থেকে ছবিটি সরিয়ে নেওয়া হল বা তাকে একটি সাদা পর্দার উপর দৃষ্টি ফেরাতে বলা হল। দেখা গেছে যে সে তখন ঐ অপসারিত ছবিটির একটি নিখুঁত প্রতিরূপ সেখানে দেখতে পায় এবং সেই প্রতিরূপ থেকে ঐ ছবিটির বর্ণনা করতে পারে। এই ধরনের প্রতিরূপকে আইডেটিক প্রতিরূপ বলা হয় এবং এই ধরনের ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আইডেটিক শ্রেণীর ব্যক্তি বলা হয়। সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষণের সময় যা দেখে তাই পরে স্মৃতি থেকে বলতে পারে এবং তাও সম্পূর্ণ বা পরিষ্কারভাবে বলতে পারে না। কিন্তু আইডেটিক শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা প্রকৃত প্রত্যক্ষণের সময় যা দেখেনি পরে ঐ বস্তুর প্রতিরূপ থেকে সেই সব বৈশিষ্ট্যেরও নির্ভুল বর্ণনা দিতে পারে। তারা ইচ্ছা করলে পূর্ব প্রত্যক্ষিত যে কোন বস্তুর প্রতিরূপকে মনে বা কোন পর্দার উপর জাগিয়ে তুলতে পারে এবং সেই প্রতিরূপ থেকে বস্তুটির যে সব খুঁটিনাটি বৈশিষ্ট্য সে আগে দেখেনি সেগুলিরও বর্ণনা করতে পারে।

সাধারণত আইডেটিক প্রতিরূপ ৬ থেকে ১২ বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। তবে সকল ছেলেমেয়েই এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়স বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই বৈশিষ্ট্যটিও চলে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এই প্রতিরূপ পরিণত বয়সেও থাকতে দেখা গেছে। জীংস্কের মতে আইডেটিক প্রতিরূপ দেখায় এই শক্তিটি এণ্ডোক্রিন গ্রন্থির (Endocrine gland) কোন সংগঠনমূলক বৈচিত্র্য থেকেই জন্মায়।

প্রতিরূপের ব্যবহার (Use of Images)

আগে মনে করা হত যে চিন্তন-প্রক্রিয়ার পক্ষে প্রতিরূপের ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে যে প্রতিরূপ ছাড়াও চিন্তন সম্ভবপর। বরং সমস্যামূলক বা তত্ত্বমূলক চিন্তা করতে হলে প্রতিরূপের ব্যবহার সুষ্ঠু চিন্তনের

পক্ষে বিঘ্নকরই। গণিত বা দর্শনের উন্নতশ্রেণীর সমস্যাগুলি নিয়ে চিন্তা করার সময় চিন্তা পরিপূর্ণভাবে প্রতিরূপবর্জিত (Imageless) হয়ে ওঠে।

তবে প্রতিরূপ যে চিন্তনের একটি অতিপ্রয়োজনীয় উপকরণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আমাদের দৈনন্দিন চিন্তার অবয়বটির অধিকাংশই গঠিত হয় প্রতিরূপের দ্বারা। কোন কিছুর প্রতিরূপ মনের মধ্যে জাগাতে মনের বিশেষ আয়াস লাগে না বলে প্রতিরূপের সাহায্যে চিন্তন প্রক্রিয়া সহজ, সুসাধ্য ও দ্রুত হয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিরূপমূলক চিন্তা নিখুঁত বা নির্ভুল হয় না। তার কারণ হল প্রতিরূপমাত্রেই অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ। এই জন্য চিন্তনের ক্ষেত্রে ভাষা, ধারণা প্রভৃতি অধিকতর নির্ভুল প্রতীকের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য।

গ্যাল্টনের পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশুদের চিন্তনে প্রতিরূপের ব্যবহার অত্যন্ত বেশী। কিন্তু পরিণত ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ করে যে সকল ব্যক্তি বুদ্ধি-নির্ভর কাজে ব্যাপৃত থাকেন তাঁদের মধ্যে প্রতিরূপের ব্যবহার উল্লেখযোগ্য নয়। সাধারণত যে সকল বৃত্তি প্রতিরূপের ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু দেখা গেছে যে সে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা প্রতিরূপের ব্যবহার মোটেই করেন না। যেমন, এমন অনেক চিত্রকর আছেন যাঁদের তেমন উল্লেখযোগ্য চাক্ষুষ প্রতিরূপই নেই বা এমন অনেক সুরকার পাওয়া যায় যারা যথেষ্ট শ্রবণমূলক প্রতিরূপ ছাড়াই তাঁদের কাজ চালিয়ে যান। এই সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিরা প্রতিরূপকে বাদ দিয়ে অন্য কোন প্রতীকের সাহায্য নিয়েই কাজ চালান।

ধারণা (Concept)

চিন্তনের আর এক শ্রেণীর প্রতীকের নাম হল ধারণা (Concept)। যখন আমরা একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত একাধিক বস্তুর সংস্পর্শে আসি তখন তাদের পারস্পরিক বৈষম্য সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত মিল বা অভিন্নতা সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরী করে নিই। যেমন, বহু বিভিন্ন আকৃতি, প্রকৃতি, জাতি ও বর্ণের গরু আমরা দেখে থাকি, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিভিন্ন গরুগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে সমভাবে বর্তমান এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আমরা খুঁজে পাই। এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা এক কথায় গো-ত্ব নাম দিতে পারি এবং এই থেকেই তৈরী হয় আমাদের গরু সম্বন্ধে ধারণা। গরুর এই ধারণাটি বিভিন্ন গরুর অন্তর্নিহিত সাদৃশ্যমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে তৈরী এবং সেই জন্য দেখা না দেখা সকল গরুর উপরই সমানভাবে প্রযোজ্য। এভাবে আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন বিষয়বস্তুগুলি সম্বন্ধে ধারণা গঠন করি।

কোন কিছুর ধারণা গঠন করতে হলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হয়, যথা, (১) পৃথকীকরণ (Abstraction) ও (২) সামান্যীকরণ (Generalisation)।

১। **পৃথকীকরণ** (Abstraction)

কোন বস্তু সম্বন্ধে ধারণা গঠন করতে হলে প্রথমে সেই জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুগুলির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণভাবে বর্তমান, অর্থাৎ যেগুলি সমভাবে সকলের মধ্যে থাকে সেগুলিকে পৃথক করে নিতে হবে এবং যে বৈশিষ্ট্যগুলি অ-সাধারণ বা অবাস্তব অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্যগুলি সকলের মধ্যে সমভাবে বর্তমান নয় সেগুলিকে বাদ দিতে হবে। এই প্রক্রিয়াটিকেই পৃথকীকরণ বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যেমন নানা দিক দিয়ে অমিল, তেমনই কয়েকটি অতি মৌলিক দিক দিয়ে তাদের মধ্যে মিল আছে। যেমন, মানুষে মানুষে যতই বৈষম্য থাকুক সব মানুষের মধ্যে দৈহিক সংগঠন, মৌলিক আচরণ, শরীরতত্ত্বমূলক বৈশিষ্ট্য, যুক্তিধর্মিতা, সামাজিক প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি সমানভাবে বর্তমান। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি থেকে পৃথক করে নেওয়াই হল ধারণা গঠনের প্রথম সোপান।

২। **সামান্যীকরণ** (Generalisation)

একই জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে পৃথক করে নেবার পর আমরা ঐ জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত সমস্ত বস্তুগুলির উপর ঐ সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি আরোপ করি অর্থাৎ ধরে নিই যে ঐ জাতীয় বা ঐ শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি বস্তুরই ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি থাকবে। একেই সামান্যীকরণ বলে। উদাহরণস্বরূপ, অনেক পৃথক পৃথক মানুষ দেখে আমরা মানুষের সাধারণ গুণগুলি পৃথক করে নিলাম। কিন্তু সব মানুষ আমরা দেখিনি বা দেখা সম্ভবও নয়। এই না-দেখা বাকী সমস্ত মানুষের উপর ঐ সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি প্রয়োগ করলাম। অর্থাৎ আমরা সিদ্ধান্ত করলাম যে পৃথিবীর সকল মানুষেরই ঐ সাধারণ গুণগুলি বর্তমান। অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়া (Conditioned response) হল এই সামান্যীকরণের অতি প্রাথমিক রূপ।

পৃথকীকরণের মাধ্যমে আমরা কতকগুলি সমজাতীয় অভিজ্ঞতার অধিকারী হই এবং সামান্যীকরণের সাহায্যে সেই অভিজ্ঞতারাশি থেকে একটি মৌলিক তত্ত্ব বা সূত্র আহরণ করি। এই দুটি প্রক্রিয়া মিলিত না হলে ধারণা গঠন সম্পূর্ণ হয় না।

চিন্তন ও ধারণা

ধারণা চিন্তনের অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। নিছক প্রতিরূপের সাহায্যে যে চিন্তন সে চিন্তন অসম্পূর্ণ, বিশৃঙ্খল ও অসংহত প্রকৃতির। তার দ্বারা কোন নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত বা মীমাংসায় পৌঁছান যায় না। প্রকৃত কার্যকর চিন্তন ধারণার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। আমরা যখন চিন্তা করি যে, 'মানুষ ঐশ্বর্য ভালবাসে' তখন আমরা এই চিন্তনটিতে মানুষ, ঐশ্বর্য ও ভালবাসা এ তিনটি কথার দ্বারা কোনও বিশেষ মানুষ, বিশেষ ঐশ্বর্য বা বিশেষ ভালবাসাকে বোঝাচ্ছি না। প্রকৃতপক্ষে আমরা সমস্ত মানুষ, সমস্ত ঐশ্বর্য ও সমস্ত ভালবাসাকে বোঝাচ্ছি। অর্থাৎ এই তিনটিই এখানে ধারণারূপে আমাদের চিন্তনে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ধারণার সাহায্য ছাড়া কোন অর্থপূর্ণ ও সুসম্পূর্ণ চিন্তনই সম্ভব হয় না। বস্তুত আমরা আমাদের যে কোন উন্নত চিন্তনেই ধারণার বহুল ব্যবহার করে থাকি। ধারণার সাহায্যে আমরা বহু বিচ্ছিন্ন বস্তুপুঞ্জকে একটিমাত্র অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। এই জন্যই সংক্ষিপ্ত একটি চিন্তনের মধ্যে দিয়ে আমরা অগণিত বস্তুরাশির সম্বন্ধে ভাবতে বা সিদ্ধান্ত গঠন করতে পারি। সেই কারণেই যে কোন উন্নত চিন্তনেই ধারণার ব্যবহার অপরিহার্য। শিশুর শিক্ষায় ধারণার স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যত বেশী ও নির্ভুল ধারণা শিশু গঠন করতে শিখবে ততই তার চিন্তন নির্ভুল ও কার্যকর হয়ে উঠবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ ধারণা গঠনের জন্য শিশুর সুষ্ঠু চিন্তন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে উঠেছে।

শিশুর ধারণার ক্রমবিকাশ

(Development of Concept in the Child)

শিশুর ক্ষেত্রে ধারণার সুরু হয় বিশেষ বিশেষ বস্তুর বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে। যেমন, প্রথমে সে শুনল তার বাড়ীর সামনের একটি শিউলী ফুলের গাছকে লোকে গাছ বলছে। তারপর আবার শুনল যে টবের গোলাপ ফুলের গাছটিকেও সকলে গাছ বলছে। আবার একদিন সে দেখল যে বিরাট একটি নিম গাছকেও আর সকলে গাছ বলে বর্ণনা করছে। যদিও তিনটি গাছই আকৃতিতে ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক তবু সে তাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেল এবং সেগুলির সাহায্যে সে গাছ সম্বন্ধে একটি ধারণা মনে মনে তৈরী করে নিল। তারপর যখন একদিন সে প্রথম একটি পদ্মফুলের গাছ দেখল তখন সে নিজে থেকেই সেটিকে গাছ বলে ধরে নিতে আর ইতস্তত করল না।

এভাবেই শিশু তার অভিজ্ঞতার অন্তর্গত বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে ধারণা গঠন করে।

ধারণা গঠন কেবলমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। বহু পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেও পৃথকীকরণের ক্ষমতা যথেষ্টই আছে।

ধারণা শিখনের পদ্ধতি

(Methods Of Learning Concept)

শিক্ষার একটি বড় অঙ্গ হল শিশুকে নির্ভুল ধারণা গঠন করতে শিক্ষা দেওয়া। বিশেষ করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের শিক্ষার অর্থই হল বিভিন্ন বস্তু সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে নির্ভুল ধারণা গঠন করতে সাহায্য করা। অতএব কিভাবে শিশুর মনে ধারণা সৃষ্টি করা যায় সে সম্বন্ধে শিক্ষকের যথেষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার। সাধারণভাবে ধারণা শিখনের তিনটি পদ্ধতির উল্লেখ করা যায়। যথা আরোহণ পদ্ধতি, অবরোহণ পদ্ধতি এবং মিশ্র পদ্ধতি।

আরোহণ পদ্ধতি (Inductive Method)

এই পদ্ধতিতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তু বা দৃষ্টান্ত শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে নিজে এবং স্বাভাবিকভাবেই তার ধারণা গড়ে নেয়। এখানে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন বস্তুর অভিজ্ঞতা থেকে একটি সামগ্রিক অভিজ্ঞতা অর্জন করা হচ্ছে বলে এই পদ্ধতিকে আরোহণ পদ্ধতি বলা হয়। ধারণা শিখন অন্যান্য শিখনের মত প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে সুরু হয় এবং অন্তর্দৃষ্টিতে গিয়ে শেষ হয়ে থাকে।

অবরোহণ পদ্ধতি (Deductive Method)

এই পদ্ধতিতে প্রথমে একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং তারপর তাকে ঐ শ্রেণীর অন্তর্গত বস্তুগুলিকে পৃথক পৃথকভাবে চিনতে সাহায্য করা হয়। এখানে সামগ্রিক অভিজ্ঞতা থেকে বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতায় যাওয়া হচ্ছে বলে এটিকে অবরোহণ পদ্ধতি বলা হয়। আমাদের অধিকাংশ শিখনই এই পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়ে থাকে। কিন্তু শিশুর ধারণা গঠনে কেবলমাত্র এই অবরোহণ পদ্ধতিটির উপর নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

মিশ্র পদ্ধতি (Mixed Method)

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা আরোহণ এবং অবরোহণ এই দুটি পদ্ধতি একসঙ্গে যুক্ত করে একটি মিশ্র পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। কোন একটি মাত্র পদ্ধতি

প্রয়োগ করার চেয়ে এই মিশ্র পদ্ধতির প্রয়োগ করা অনেক দিক দিয়ে ভাল। এই মিশ্র পদ্ধতিতে প্রথমে আরোহণ পদ্ধতির মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ বস্তুগুলি শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং শিক্ষক সেগুলির অন্তর্নিহিত সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর শিক্ষক অবরোহণ পদ্ধতির মাধ্যমে সেই ধারণাটিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করেন এবং তার ফলে শিক্ষার্থীর মনে ধারণাটি সম্বন্ধে পরিষ্কার ও বাস্তবধর্মী জ্ঞান জন্মায়।

ভাষা ও চিন্তন (Language and Thinking)

চিন্তনের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। চিন্তন প্রক্রিয়ার ব্যবহৃত প্রতীকগুলির মধ্যে ভাষার স্থান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। চিন্তনে ভাষার স্থান কোথায় তা জানতে হলে আমাদের প্রথমে ভাষার স্বরূপটি ভাল করে জানতে হয়।

ভাষার স্বরূপ (Nature of Language)

মনের ভাবকে বাইরে প্রকাশ করার মাধ্যম হল ভাষা। বর্তমানে আমাদের সভ্যতার অগ্রগতির প্রধানতম উপকরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভাষা। ভাষা সাধারণত তিনরকম হয়—কথিত ভাষা, লিখিত ভাষা ও ভঙ্গীগত ভাষা। ভাষা প্রকৃতপক্ষে একটি চিহ্ন মাত্র। আমরা যখন আগুন কথাটি বলি বা লিখি তখন আমরা আগুন নামক বস্তুটিকে একটি চিহ্ন দিয়ে জানাই। কথা বলার সময় আমরা শব্দমূলক চিহ্নের ব্যবহার করি, লেখার সময় তেমনই চাক্ষুষ কোন চিহ্ন প্রয়োগ করি। ভঙ্গীগত ভাষার বেলাতেও অঙ্গসঞ্চালনমূলক কোন চিহ্ন দিয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য জানাই।

প্রকৃতপক্ষে ভাষা বলতে বোঝায় চিন্তা বিনিময় করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রস্তুত চিহ্ন ব্যবহারের প্রণালীবিশেষ। এই চিহ্নের প্রকৃতির দিক দিয়ে ভাষাকে প্রধানত দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, প্রথম, স্বাভাবিক চিহ্নের ভাষা এবং দ্বিতীয় কৃত্রিম চিহ্নের ভাষা। স্বাভাবিক চিহ্নমূলক ভাষার ক্ষেত্রে উদ্দিষ্ট বস্তু এবং চিহ্নের মধ্যে সুস্পষ্ট একটি সম্বন্ধ পাওয়া যায়—যেমন দেখা যায় আদিম মানুষের ব্যবহৃত চিত্রলিপির ভাষায়। এই ধরনের ভাষায় যে বস্তুকে বোঝান হত তার একটি ছবি এঁকে দেওয়া হত। তেমনই আদিম মানুষের ব্যবহৃত ভঙ্গীমূলক ভাষাতেও উদ্দিষ্ট বস্তু বা প্রক্রিয়াটির অনুকরণ করা হয়। কৃত্রিম চিহ্নমূলক ভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু বস্তু ও তার চিহ্নের মধ্যে কোন সম্বন্ধ থাকে না। যেমন, আগুন কথাটির সঙ্গে আগুন বস্তুটির কোন আকৃতিগত সম্পর্ক

পাওয়া যায় না। এক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দটি নিতান্তই বাহ্যিক চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ধরনের নামগুলি নিছক কল্পনাপ্রসূত এবং দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে সর্বজনস্বীকৃত হয়ে উঠেছে।

কতকগুলি শব্দ আমাদের দৈহিক ভঙ্গী থেকে জন্মলাভ করেছে। যেমন হ্যাঁ বা না এই শব্দ দুটি আদিম মানুষের সর্বদৈহিক ভঙ্গীর একটি পরিবর্তিত ভাষা মূলক রূপ।

চিন্তায় ভাষার ব্যবহার

আমাদের ব্যবহারিক জীবনে ব্যক্তি, বস্তু, কার্য প্রভৃতিকে বোঝানর জন্যই ভাষার সৃষ্টি। বর্তমানে ভাষা আমাদের নিজস্ব সত্তা ও পরিবেশের সঙ্গে এমন নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেছে যে ভাষার সাহায্য ছাড়া এই পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তু সম্বন্ধেই আমরা আজ আর চিন্তা করতে পারব না।

মানব চিন্তার প্রতীকগুলির মধ্যে কার্যকারিতা ও ব্যবহারের দিক দিয়ে আর কোন প্রতীকই ভাষার সমকক্ষ নয়। আমাদের চিন্তনের প্রধানতম উপাদানই হল ভাষা। প্রতীকরূপে ভাষার বহুল ব্যবহারের একটি বড় কারণ হল এই যে ভাষা সহজেই অপরের বোধগম্য হয় এবং ভাব বিনিময়ের পক্ষে এটি একটি সহজতম মাধ্যম। তাছাড়া ভাষামূলক চিন্তার সব সময়েই একটি সামাজিক দিকও আছে।

আমাদের সাধারণ চিন্তা শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য প্রভৃতির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। ভাষাবিহীন চিন্তা যে হয় না, তা নয়। আমরা চেষ্টা করলে এমন বস্তুর চিন্তা করতে পারি যেটিকে কোনরূপ নাম বা ভাষা দিয়ে বোঝান যায় না। প্রতিরূপবর্জিত চিন্তার মত ভাষাবর্জিত চিন্তাও সম্ভবপর।

কিন্তু সাধারণ ক্ষেত্রে ভাষামূলক প্রতীকই চিন্তার প্রধানতম উপাদানরূপে কাজ করে থাকে। আজকের পৃথিবীর অধিকাংশ বস্তুকেই ভাষার সাহায্যে বর্ণনা করা হয় এবং সে ভাষা কথিত, লিখিত বা ভঙ্গীগত হতে পারে। বস্তুত আমাদের চিন্তার বেশীর ভাগই এই ভাষামূলক প্রতীকগুলির মানসিক প্রয়োগ ছাড়া আর কিছু নয়।

ভাষার সঙ্গে চিন্তার এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখে ওয়াটসন চিন্তাকে 'রুদ্ধ-স্বর-কথন' (Sub-vocal talking) বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে চিন্তন হল এক ধরনের 'কথা বলা' যাতে কণ্ঠস্বরের ব্যবহারকে অবদমিত করা হয়েছে। তাঁর এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে ছোট শিশু প্রথম প্রথম একা নিজে নিজে কথা বলে। কিন্তু শীঘ্রই পিতামাতা এবং সমাজের অন্য

সকলের চাপে পড়ে সে এই একা একা কথা কথা বলা বন্ধ করতে ,বাধ্য হয় বটে কিন্তু তার পরিবর্তে সে মনে মনে কথা বলা সুরু করে। ওয়াটসনের মতে এই 'মনে মনে কথা বলা'কেই আমরা চিন্তন বলে থাকি। ওয়াটসনের এই তত্ত্বের স্বপক্ষে কতকগুলি পরীক্ষণের উল্লেখ করা যায়। যেমন জিভ, গলা, স্বরযন্ত্র ইত্যাদি অঙ্গগুলিকে সূক্ষ্ম পরিমাপ যন্ত্রের দ্বারা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে চিন্তনের সময় এগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

গ্যালভানোমিটারের সাহায্যেও দেখা গেছে যে কথা বললে জিভ বা গলায় যে ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয় চিন্তা করার সময়ও ঠিক সে ধরনের পরিবর্তনই ব্যক্তির জিভে এবং গলায় সংঘটিত হয়ে থাকে।

ভাষার একটি বড় উপযোগিতা হল যে এটি আমাদের ধারণা তৈরী করতে সাহায্য করে। তাছাড়া বিভিন্ন ধারণার নামকরণও আমরা করি ভাষার সাহায্যে। মনে করা যাক 'বই' সম্বন্ধে কোন শিশুর ধারণা তৈরী হয়েছে, কিন্তু সেই ধারণাটি যদি সে ভাষায় প্রকাশ করতে না পারে বা তার বিভিন্ন দিকগুলি নিয়ে আলোচনা করতে না পারে তাহলে তার ঐ ধারণাটি অত্যন্ত অপরিণত থেকে যাবে। এই নামকরণ করা সম্ভব হয়েছে একমাত্র ভাষার জন্যই।

তাছাড়া যে সকল ধারণা অমূর্ত ও বস্তুবর্জিত সেগুলি ভাষার সাহায্য ছাড়া গঠন করাই যায় না। যেমন, স্বাধীনতা, সততা, দয়া ইত্যাদি। কতকগুলি ধারণার জন্য আবার বিশেষ প্রকৃতির ভাষার সাহায্য লাগে, যেমন বাইনো-মিয়াল সূত্রের মত গাণিতিক তত্ত্বগুলির ধারণা মনে রাখতে হলে সংখ্যামূলক বা বীজগাণিতিক চিহ্ন বা প্রতীকের সাহায্য নিতেই হবে। তেমনই রসায়ন শাস্ত্রেরও বিভিন্ন পদার্থের ধারণা মনে রাখতে হলে শব্দ বা সংখ্যার সাহায্য অপরিহার্য। আমাদের চিন্তায় ভাষার প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী এ থেকেই তা বোঝা যায়।

সবশেষে ভাষা যে কেবলমাত্র চিন্তনের বিষয়বস্তুকেই রূপ দেয় তা নয়, চিন্তনের প্রসার ও বিকাশের জন্যও ভাষার সাহায্য অপরিহার্য। ভাষার মত সমৃদ্ধ মাধ্যম থাকার জন্যই চিন্তনের এত অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। এই জন্যই ভাষাকে আমাদের চিন্তার প্রধানতম উপকরণ বলা হয়ে থাকে।

ভাষার অপূর্ণতা (Imperfection of Language)

কিন্তু চিন্তার প্রধান মাধ্যম হলেও ভাষার মধ্যে যথেষ্ট অপূর্ণতা আছে।

ভাষা আমাদের চিন্তনকে পুরোপুরি প্রকাশ করতে পারে না। সাধারণত আমরা আমাদের চিন্তনের বিষয়বস্তুগুলির নানারকম ভাষামূলক নাম দিই এবং ধরে নিই যে ঐ নামগুলিই আমাদের চিন্তনকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করছে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ বস্তুর ক্ষেত্রে ভাষার সে ক্ষমতা থাকলেও ভাষা আমাদের চিন্তনের সম্পূর্ণ প্রবাহটিকে প্রকাশ করতে পারে না। ভাষা কতকগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন শব্দ দিয়ে গঠিত কিন্তু আমাদের চিন্তন হল অবিচ্ছিন্ন ভাবপ্রবাহ। সেই কারণে আমাদের চিন্তনের প্রতিটি সূক্ষ্ম স্তর ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। যেমন, সূর্যের আলোর মধ্যে আমরা সাতটি রঙের কথাই ভাষার উল্লেখ করি। এমন কি মিশ্র রঙগুলির জন্য আমরা নীলচে-বেগুনী বা সবুজে হলুদ ইত্যাদি ভাষারও ব্যবহার করি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রঙের এমন অনেক অতিসূক্ষ্ম স্তর আছে যেগুলির উপযোগী কোন ভাষাই আমাদের অভিধানে নেই। অথচ সেগুলি সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও গঠিত হয় এবং সেগুলি নিয়ে আমরা চিন্তন করতে পারি। সেই রকম ধ্বনির ক্ষেত্রেও এমন অনেক সূক্ষ্ম স্তর আছে যেগুলি সম্বন্ধে আমরা ধারণা গঠন করে থাকি এবং যেগুলি নিয়ে আমরা চিন্তনও করতে পারি কিন্তু ভাষায় সেগুলির বৈশিষ্ট্যকে ব্যক্ত করতে পারি না। তেমনই স্পর্শ, গন্ধ, স্বাদ প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অতি সূক্ষ্ম স্তরগুলিকে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। এ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে ভাষা ধারণা গঠনের অত্যাবশ্যক উপাদান হলেও এমন অনেক ধারণা আছে যা ভাষার দ্বারা ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না।

শিশুর ভাষার বিকাশ

(Development of Language in Child)

ছোট শিশুর মধ্যে কেমন করে ভাষার বিকাশ হয় এই নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। এই পরীক্ষাগুলি থেকে দেখা গেছে যে শিশুর ভাষার বিকাশ কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্তরের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। এই রকম কয়েকটি প্রধান প্রধান স্তরের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

১। রিফ্লেক্স স্তর (Reflex Stage)

শিশু প্রথম থেকেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ শব্দ উচ্চারণ করবার ক্ষমতা নিয়ে জন্মায়। প্রথমে সে স্বরবর্ণগুলি উচ্চারণ করতে পারে, তার পর ম এবং ন এই দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ বলতে পারে। আর পরে সে প এবং ব বলতে পারে এবং তারপর ধীরে ধীরে বাকী বর্ণগুলি উচ্চারণ করতে পারে। এই স্তরে ভাষা

কথনের জন্য শিশুর কোনও প্রয়াস বা ইচ্ছা থাকে না। অনেকটা যান্ত্রিক-ভাবেই সে ঐ শব্দগুলি বলতে পারে। মুরের (Moore) পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে চার মাসের শিশু সব রকম শব্দই উচ্চারণ করতে পারে।

২। অনুকরণ-পুনরাবৃত্তির স্তর (Imitation-Repetition Stage)

দ্বিতীয় স্তরে শিশু বড়দের উচ্চারিত শব্দ তার অজ্ঞাতসারেই অনুকরণ করে উচ্চারণ করতে সুরু করে এবং একটি শব্দই বার বার উচ্চারণ করে যায়, যেমন মা-মা, মা-মা, কিংবা দা, দা, দা, ইত্যাদি। এই সময় যে শব্দ বা কথা সে শেখে তাই সে বার বার আবৃত্তি করে চলে। এই স্তরে (Conditioning)-প্রক্রিয়াটি বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং শিশু অনুবর্তনের মাধ্যমে অনেক নতুন নতুন শব্দ শেখে।

৩। অর্থবোধের স্তর (Comprehension Stage)

প্রায় ১ বৎসর বয়স থেকে শিশু শব্দের অর্থ বুঝতে শেখে। তখন সে একটি বিশেষ বস্তুর সঙ্গে একটি বিশেষ শব্দকে সংযুক্ত করতে পারে। এটিও অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে। যেমন, যখন সে দুধের বোতলে হাত দেয়, তখন মা বা অন্য সকলে দুধ কথাটি উচ্চারণ করেন। ফলে তখন সে শেখে ঐ বিশেষ বস্তুটির নাম-দুধ। এভাবে শিশু তার চারপাশের বস্তুর নাম শেখে এবং বিভিন্ন শব্দের দ্বারা কোন্ কোন্ বস্তু বা ঘটনাকে বোঝান হয় তাও শিখে থাকে।

৪। ভাষা-সচেতনতার স্তর (Language-Sense Stage)

এই স্তরে শিশু ভাষার ব্যবহার ও তার অসীম শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। সে দেখে যে বিশেষ শব্দের সাহায্যে কোন বিশেষ বস্তুকে সে সহজেই চিহ্নিত করতে পারে এবং তার মনের বক্তব্যও প্রকাশ করতে পারে। প্রায় দেড় বছর বয়স থেকে শিশু তার সামনে যে বস্তুটি অনুপস্থিত সেই বস্তুটিকে বিশেষ কোন শব্দ দিয়ে জ্ঞাপন করতে শেখে। যেমন- ক্ষিদে পেলে সে বলে- 'দুধ'। এই সময় থেকে সে নিজে ভাষার ব্যবহার করতে শেখে এবং অপরের ব্যবহৃত ভাষার অর্থ বুঝতে পারে।

৫। বাক্য কথন স্তর (Sentence Speaking Stage)

অনুপস্থিত বস্তুর পরিবর্তে বিশেষ শব্দের ব্যবহার থেকেই শিশু বাক্য বলার ক্ষমতাটি অর্জন করে। যখন সে বলে 'দুধ' বা 'ভাত' তখন সে প্রকৃতপক্ষে বলছে যে 'আমার ক্ষিদে পেয়েছে' বা 'আমি খেতে চাই।' এর পর থেকেই

সে কথার সঙ্গে কথা জুড়ে পূর্ণবাক্য ব্যবহার করতে শেখে। এর পরে সুরু হয় তার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পালা এবং তিন বছরের শিশু বেশ বলিয়ে কইয়ে হয়ে ওঠে। স্মিথের একটি হিসাবে দেখা যায় যে ১ বৎসরে শিশু ৪টি শব্দ শেখে, ২ বৎসরে শেখে ২৭২টি, ৩ বৎসরে ৮৯৬টি, ৪ বৎসরে ১৫৪০টি, ৫ বৎসরে ২০৭২টি, এবং ১২ বৎসরে ১৫০০০টি শব্দ বলতে শেখে।[1]

৬। **পঠন ও লিখন** (Reading and Writing)

পঠন ও লিখন বা চিত্রমূলক ভাষা ব্যবহারের জ্ঞান জন্মায় আরও কয়েক বছর পরে এবং সাধারণভাবে এই সময়টি নির্ভর করে শিশু যে সমাজে বাস করে সে সমাজের প্রচলিত প্রথা বা নিয়মের উপর। সাধারণত ছ'বছর বয়স থেকে শিশু পড়তে এবং সাত আট বছর বয়স থেকে লিখতে শিখে থাকে।

পনের

বিচারকরণ (Reasoning)

বিচারকরণ হল চিন্তনেরই একটি বিশেষ শ্রেণীমাত্র। চিন্তনের মাধ্যমে যখন কোন সমস্যার সমাধান করা হয় তখন তাকে বিচারকরণ বলা হয়। চিন্তন হল আবার প্রতীকমূলক আচরণ। অতএব যখন প্রতীকমূলক আচরণের মধ্যে দিয়ে কোন সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা করা হয় তখন তার নাম দেওয়া হয় বিচারকরণ।

প্রাণী যখন তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে অসমর্থ হয় তখনই সমস্যা দেখা দেয়। প্রতি সমস্যাই আবার দুটি বিভিন্ন স্তরে সমাধান করা যায়। প্রথম, প্রত্যক্ষণ-সক্রিয়তার স্তর ও দ্বিতীয়, প্রতীকমূলক স্তর।[১] যখন মূর্ত বস্তুর সাহায্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয় তখন সেটিকে প্রত্যক্ষণ-সক্রিয়তার স্তরে সমস্যার সমাধান বলা যেতে পারে। আর যখন নিছক প্রতীকের সাহায্য মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান করা হয় তখন সেটিকে প্রতীকমূলক স্তরে সমস্যার সমাধান বলা যেতে পারে। এই দ্বিতীয় পন্থায় সমস্যাটির সমাধান করাকেই বিচারকরণ বলে।

প্রত্যক্ষণ-সক্রিয়তার স্তরে যে সকল আচরণ আমরা মূর্তবস্তুর সাহায্যে সাধারণত সম্পন্ন করে থাকি সেগুলিই আমরা বিচারকরণে প্রতীকমূলক বস্তুর সাহায্যে মানসিক স্তরে পুনরনুষ্ঠিত করি।

বিচারকরণও এক ধরনের শিখন। কোন সমস্যা বিচারকরণের মাধ্যমে সমাধান করার পর প্রাণীর পুরনো আচরণ-পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সে তখন এই নতুন আচরণধারা অনুসরণ করে। বিচারকরণের মধ্যেও প্রচেষ্টা-ও-ভুলের প্রক্রিয়া এবং অন্তর্দৃষ্টি দুইই কাজ করে থাকে। তবে সাধারণ প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখার সঙ্গে বিচারকরণের পার্থক্য হল এই যে বিচারকরণে অতীত অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কার্যকর হয়। বিচারকরণের সময় ব্যক্তিকে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে কয়েকটি স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সেগুলি হল—

১। পৃঃ ২২১

১। সমস্যার স্তর

বিচারকরণের সুরু হয় সমস্যা দিয়ে। সমস্যা দেখা দিলেই কাজের স্বাভাবিক অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যায়। তখন ব্যক্তি সমস্যা সমাধানের জন্য চিন্তা করতে সুরু করে। এই থেকেই জন্মলাভ করে বিচারকরণের প্রক্রিয়াটি। সমস্যা না দেখা দিলে বিচারকরণের প্রয়োজন হয় না।

২। তথ্যানুসন্ধানের স্তর

বিচারকরণের দ্বিতীয় সোপানে সমস্যাটির সমাধানের জন্য ব্যক্তি একের পর এক সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত বা তথ্যগুলি অনুসন্ধান করে এবং একটি একটি করে সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখে।

৩। প্রকল্প গঠনের স্তর

পরের সোপানে সেই অনেকগুলি সম্ভাব্য সমাধান বা তথ্য থেকে ব্যক্তি একটি বিশেষ সমাধান বা তথ্য নির্বাচন করে নেয়। সেই নির্বাচিত সমাধান বা তথ্যটিকে প্রকল্প (Hypothesis) বলা হয়।

৪। প্রয়োগকরণ ও পরীক্ষণের স্তর

বিচারকরণের শেষ ধাপে ব্যক্তি সেই বিশেষ প্রকল্পটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে এবং তার যথার্থ্য পরীক্ষা করে দেখে। বলা বাহুল্য এই প্রয়োগ বা পরীক্ষণের কাজটি সম্পন্ন হয় মানসিক বা প্রতীকমূলক স্তরে। যদি প্রকল্পটি প্রয়োগ করে সমস্যাটির সমাধান হয় তাহলে বুঝতে হবে ঐটিই সমস্যাটির প্রকৃত সমাধান। আর যদি সমস্যাটি সমাধান না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে ঐ প্রকল্পটি ভুল এবং তখন ব্যক্তিকে আর একটি নতুন প্রকল্প গঠন করতে হয়। এইভাবে সম্ভাব্য সমাধানগুলি প্রয়োগ বা পরীক্ষণ করতে করতে আকস্মিকভাবে নির্ভুল সমাধানটি ব্যক্তির সামনে উপস্থিত হয়ে যায়। এখানে প্রথম দিকে বিচারকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হচ্ছিল প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতিতে কিন্তু সেটি শেষ হল অন্তর্দৃষ্টিতে, যখন সমাধানটি বিদ্যুতের ঝলকানির মত ব্যক্তির সামনে এসে দেখা দিল।

বিচারকরণের প্রয়োজন তখনই দেখা দেয় যখনই আমাদের প্রচলিত আচরণধারা পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ হয়ে পড়ে অর্থাৎ এক কথায় যখন সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা নানা কারণে দেখা দিতে পারে। প্রথমত, আমাদের দৈনন্দিন জীবনধারণের প্রচেষ্টায় নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে—যেমন, কেমন করে খাদ্য সংগ্রহ করা যাবে, কেমন করে যথেষ্ট আয়

করতে পারা যাবে, কেমন করে বিপদকে এড়িয়ে যেতে হবে ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, আমাদের স্বাভাবিক কৌতূহলও আমাদের সামনে বহু সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আমাদের মধ্যে জানবার ইচ্ছাটি সহজাত এবং নানা বিষয় জানার জন্যও আমরা প্রায়ই বিচারকরণের সাহায্য নিয়ে থাকি।

অনুমান (Inference)

বিচারকরণের একটি অপরিহার্য পন্থা হল অনুমান পদ্ধতি। জানা তথ্য থেকে অজানা তথ্যে যাওয়াকে অনুমান বলে। অনুমানের মাধ্যমেই আমরা পুরোনো সত্য থেকে নতুন সত্য আবিষ্কার করতে পারি। যেমন, পথে নেমে দেখলাম পথটি ভিজে। আকাশের দিকে তাকালাম, দেখলাম আকাশে মেঘ। সিদ্ধান্ত করলাম যে বৃষ্টি হয়েছে। এটি হল অনুমানের দৃষ্টান্ত। এখানে আমাদের কাছে পুরোনো সত্য হল 'পথ ভিজে' ও 'আকাশে মেঘ', আর নতুন সত্য হল 'বৃষ্টি হওয়াটা'। এই রকম আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়তই আমরা জ্ঞাত তথ্য থেকে অজ্ঞাত তথ্যের আবিষ্কার করে থাকি।

অতীত অভিজ্ঞতা ও বিচারকরণ

বিচারকরণে অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যও অপরিহার্য। বর্তমান সমস্যার সমাধানের জন্য দরকার অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ। অতীতের জ্ঞান যত বেশী হবে বিকল্প বা সম্ভাব্য সমাধানের সংখ্যাও তত বাড়বে। আর বিকল্প সমাধানের সংখ্যা যত বেশী হবে নির্ভুল বা প্রকৃত সমাধান খুঁজে বার করা ততই সহজ হবে। এজন্য তথ্য বা জ্ঞানের উপর যার যত বেশী অধিকার তার পক্ষে বিচার করা তত সহজ।

অনেক শিক্ষাবিদ্ আছেন যাঁরা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে তথ্য বা জ্ঞান আহরণের বিরোধিতা করে থাকেন। তাঁরা বলেন যে কেমন করে চিন্তা করতে হয় শিক্ষার্থীকে তা শেখালেই চলবে। তথ্য বা জ্ঞান যখন তার প্রয়োজন হবে তখন সে তা নিজেই আহরণ করে নিতে পারবে। কিন্তু দেখা গেছে যে এ ধরনের যুক্তি নিতান্ত ত্রুটিপূর্ণ। কোন নতুন জ্ঞান অর্জনের পেছনে আছে বিচারকরণের প্রক্রিয়া, আর সুষ্ঠু বিচারকরণের জন্য অপরিহার্য হল পর্যাপ্ত তথ্য বা প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অধিকার। অতএব যাঁরা তথ্য বা জ্ঞান আহরণের বিরোধিতা করেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীর বিচারকরণের সামর্থ্যকে দুর্বল করেই তোলেন।

অবশ্য কেবল অতীত অভিজ্ঞতা বা তথ্যের উপর অধিকার থাকলেই চলবে

না। তার সঙ্গে ব্যক্তির বিচারকরণের উপযোগী শক্তিও থাকা দরকার। এমন অনেককে দেখা যায় যাঁরা যথেষ্ট তথ্য বা জ্ঞানের অধিকারী হয়েও সুসঙ্গত বিচার করতে পারেন না। বুঝতে হবে তাঁদের বিচারকরণের শক্তি পর্যাপ্তভাবে নেই। উন্নত বিচারকরণের সামর্থ্য বুদ্ধির উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল এবং বুদ্ধি একটি প্রকৃতিদত্ত শক্তি। অতএব বিচারকরণের শক্তি ইচ্ছা করলেই বাড়ানো যায় না, তবে ব্যক্তি যথোপযোগী শিক্ষার দ্বারা তার বিচারকরণ পদ্ধতির উন্নতি করতে পারে।

বিচারকরণের সাফল্য নির্ভর করে অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগের নির্ভুল গতিপথের (direction) উপর। বর্তমান সমস্যার সমাধানে যখন অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করা হয় তখন সবচেয়ে বড় দ্রষ্টব্য হল যে এই অতীত অভিজ্ঞতার প্রয়োগটি যেন নির্ভুল গতিপথ ধরে এগিয়ে চলে। যদি বিচার-ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা প্রয়োগের গতিপথটি ত্রুটিপূর্ণ হয় তবে সেই অনুমান থেকে কখনই নির্ভুল সিদ্ধান্ত গঠন করা যায় না।

শিশুর বিচারকরণের বিকাশ

(Development of Reasoning in the Child)

মানসিক শক্তি পূর্ণ পরিণতি লাভ না করলে উন্নত শ্রেণীর বিচারকরণ কারও পক্ষে সম্ভব নয়। মনোবিজ্ঞানীদের মতে সাধারণ ছেলেমেয়েদের ১৫।১৬ বৎসরে মানসিক শক্তি পূর্ণতা লাভ করে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে বিচারকরণের শক্তিও পরিপূর্ণতা লাভ করে ১৫।১৬ বৎসর বয়সের সময়।

কিন্তু বিচারকরণের শক্তি আংশিকভাবে তার অনেক আগেই শিশুর মধ্যে দেখা যায়। তিন চার বৎসর বয়স থেকেই শিশু নানারূপ প্রশ্ন করে বড়দের উত্যক্ত করে তোলে। এতেই বোঝা যাচ্ছে যে ঐ সময়ে তাদের মধ্যে সমস্যা উপলব্ধি করবার ক্ষমতা জন্মেছে। ঐ সমস্যা উপলব্ধি থেকেই জাগে বিচারকরণের শক্তি। ছোট ছেলেমেয়েদের প্রায়ই নানা বিজ্ঞোচিত মন্তব্য বা উক্তি করতে শোনা যায়! আবার কখনও কখনও কোন বিষয় বা ঘটনা সম্বন্ধে তাদের নানা অবাস্তব ও হাস্যকর সিদ্ধান্ত গঠন করতেও দেখা যায়। এ সকলই বিচারকরণের প্রাথমিক প্রচেষ্টা।

তর্কবিজ্ঞানের 'ন্যায়' বা সিলজিসমের (Syllogism) আকারে বিচার করবার সামর্থ্য শিশুদের মধ্যে কবে থেকে দেখা দেয়—এ সম্বন্ধে ব্যাপক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে তিন চার বছর বয়স থেকেই শিশুরা সহজ 'ন্যায়'

থেকে সিদ্ধান্ত গঠন কবতে পারে। তবে যথাযথ যুক্তির প্রয়োগ করে বিচার কবার ক্ষমতা জন্মায় সাত আট বৎসর বয়স থেকে এবং এই ক্ষমতাটি অনেকটা আকস্মিকভাবেই তাদের মধ্যে দেখা দেয়। সাধারণ ভাষণে যাকে বিচার-করণের বয়স বলে বর্ণনা কবা হয় সেটি এই সাত আট বৎসর বয়স থেকেই সুরু হয় বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিচারকরণের শক্তির পরিণতি নির্ভর করে দুটি বস্তুর উপব—প্রথম, চিন্তার ধারা এবং পারস্পরিক সহজ উপলব্ধির উপর এবং দ্বিতীয়, চিন্তনের কতকগুলি বিশেষ অভ্যাস অর্জনের উপর।

ষোল

কল্পন (**Imagination**)

কল্পন হল একপ্রকার মানসিক প্রক্রিয়া। প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়াতেই আমরা কতকগুলি প্রতীকের ব্যবহার করে থাকি। যেমন, প্রতিরূপ, ভাষা, ধারণা ইত্যাদি। কল্পন হল সেই মানসিক প্রক্রিয়া যাতে প্রতিরূপেরই ব্যবহার সবচেয়ে বেশী এবং অন্যান্য উপাদান এতে থাকলেও সেগুলি সংখ্যা ও গুরুত্বের দিক দিয়ে যেমন স্বল্প তেমনই অপ্রধান।

যে সব বস্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি সেগুলির একটি আমরা মনের মধ্যে বহন করতে পারি। এগুলি হল প্রতিরূপ।[১] যেমন, যে ব্যক্তি তাজমহল দেখে বাড়ী ফিরলেন তিনি তাজমহলের একটি প্রতিরূপ মনের মধ্যে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। যখনই তিনি তাজমহল সম্বন্ধে চিন্তা করেন তখনই তাজমহলের প্রতিরূপটি তাঁর মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। এটি হল চাক্ষুষ প্রতিরূপের দৃষ্টান্ত। এভাবে আমরা আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয় থেকে জাত অভিজ্ঞতারও প্রতিরূপ মনে রাখতে পারি, যেমন, কোন শব্দ, গন্ধ, আস্বাদন বা পেশীসঞ্চালনের প্রতিরূপও আমরা মনে রেখে থাকি।

কল্পনের ক্ষেত্রে আমরা এই ধরনের বিভিন্ন প্রতিরূপকে একটির পর একটি পাশাপাশি রেখে এক ধরনের মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করি। যে ভদ্রলোক আগ্রা থেকে তাজমহল দেখে ফিরলেন তিনি ঘরে বসে বসে আগ্রার রাস্তা, টাঙাওয়ালা, তাজমহল ইত্যাদির প্রতিরূপগুলিকে একসঙ্গে জুড়ে ভাবতে পারেন যে তিনি আগ্রার পথ দিয়ে টাঙ্গায় চড়ে তাজমহল দেখতে যাচ্ছেন। এইটি হল কল্পন।

প্রতিরূপ মাত্রেই হল প্রত্যক্ষিত বস্তুর মানসিক রূপ অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রতিরূপই প্রত্যক্ষণ থেকে জন্ম নিয়েছে। কিন্তু প্রত্যক্ষণের সঙ্গে কল্পনের পার্থক্য হল এই যে কল্পনে আমরা আমাদের ইচ্ছামত প্রতিরূপগুলিকে সাজিয়ে প্রয়োজন মত মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করতে পারি। কিন্তু প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের অভিজ্ঞতা বাস্তবের প্রকৃতি ও নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত। যেমন, একটি গাছ মাটির উপর দাঁড়িয়েছ রয়েছে—এটি আমাদের প্রত্যক্ষিত অভিজ্ঞতা। প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতার ইচ্ছামত পরিবর্তন আমরা করতে পারি না। কিন্তু কল্পনের ক্ষেত্রে আমরা এই গাছটির প্রতিরূপ নিয়ে আমাদের ইচ্ছামত

১। পৃঃ ২২৩

মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করতে পারি। যেমন, গাছটি মাটির উপর চলে ফিরে বেড়াচ্ছে বা আকাশে উড়ছে ইত্যাদি আমরা কল্পনা করতে পারি। মনে রাখতে হবে যে কল্পনের ক্ষেত্রে আমরা যে সব প্রতিরূপের ব্যবহার করি সেগুলি কিন্তু আমাদের মন থেকে সৃষ্টি নয়। প্রতিরূপগুলি সব সময়েই যথার্থ প্রত্যক্ষণ থেকে উদ্ভূত; যা আমরা কখনও প্রত্যক্ষণ করিনি তার আমরা প্রতিরূপও সৃষ্টি করতে পারি না। তবে যে সব বস্তু আমারা প্রত্যক্ষণ করেছি সে সব বস্তুর প্রতিরূপগুলিকে স্বচ্ছন্দমত সাজিয়ে গুজিয়ে ইচ্ছামত কাল্পনিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করার ক্ষমতা আমাদের আছে। প্রতিরূপের এই ইচ্ছামত ব্যবহারই কল্পনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কল্পন ও স্মরণ (Imagination & Memory)

কল্পন ও স্মরণ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রতিরূপের ব্যবহার হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা যখন পূর্বে দেখা বা শেখা বস্তু মনে করি তখন আমরা সেগুলির প্রতিরূপকে উজ্জীবিত করি। যেমন, প্রয়োজন হলে আমাদের পরিচিত কোন বন্ধুর চেহারা বা কোন দৃশ্য বা বাড়ীর ছবি আমরা মনের মধ্যে প্রতিরূপের আকারে জাগিয়ে থাকি। একেই স্মৃতি ও বলে। কল্পনের ক্ষেত্রেও ঐ একই-ভাবে আমরা প্রতিরূপকে জাগিয়ে থাকি। তবে স্মৃতি কল্পনের মধ্যে পার্থক্য হল এই যে স্মৃতির সঙ্গে বাস্তবের অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ মিল আছে। অর্থাৎ যা প্রত্যক্ষ করি এবং যেমনভাবে প্রত্যক্ষ করি সেইটি সেভাবে চিন্তা করাকে স্মৃতি বলে। কিন্তু কল্পনের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের প্রতিরূপগুলিকে ইচ্ছামত সাজিয়ে গুজিয়ে নিয়ে অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করতে পারি। যেমন, আমাদের পূর্বে দেখা ঘোড়া এবং একজোড়া ডানার প্রতিরূপকে মনে জাগানোর নাম হল স্মরণ। আর ঘোড়াটার গায়ে দু'জোড়া ডানা লাগিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়া তৈরী করা হল কল্পন। এজন্য অনেকে স্মৃতিকে পুনরুৎপাদনমূলক (Reproductive) কল্পন এবং সাধারণ কল্পনকে উৎপাদনমূলক ও সৃজনমূলক (Productive) কল্পন বলে থাকেন। যে অভিজ্ঞতাগুলি আমরা একবার পূর্বে আহরণ করেছি সেগুলিকেই আবার হুবহু মনের মধ্যে উৎপাদন করা বা জাগান হল স্মৃতির কাজ। সেজন্য স্মৃতিকে পুনরুৎপাদনমূলক প্রক্রিয়া বলা হয়। কিন্তু প্রকৃত কল্পনায় আমরা প্রতিরূপগুলিকে ইচ্ছামত নতুন বিন্যাসে সংগঠিত করে নতুন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে থাকি। সেজন্য কল্পনাকে উৎপাদনমূলক বা সৃজনমূলক প্রক্রিয়া বলা হয়।

কল্পন ও স্মরণের মধ্যে একটি বড় পার্থক্যের কথা মনে রাখতে হবে। কল্পনের প্রধান উপাদান হল প্রতিরূপে। ভাষা, ধারণা প্রভৃতি অন্যান্য প্রতীক-গুলি উপদানরূপে কল্পনের ক্ষেত্রে কম ব্যবহৃত হয়। কিন্তু স্মৃতির ক্ষেত্রে প্রতিরূপের মত অন্যান্য প্রতীকগুলিই উপাদানরূপে যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বস্তুত ধারণা, ভাষা, সংখ্যা ইত্যাদি উপাদানগুলিই বহুল পরিমাণে স্মৃতির অবসব সংগঠনে প্রয়োজন হয়।

কল্পন ও চিন্তন (Imagination & Thinking)

কল্পনও হল এক শ্রেণীর চিন্তন। মানসিক প্রক্রিয়ার দিক দিয়ে উভয়েই অভিন্ন। আমরা যখন প্রকৃত বস্তুর পরিবর্তে তার কোন প্রতীক নিয়ে আচরণ করি তখন আমাদের সেই আচরণকে চিন্তন বলা হয়। কোন একটি বস্তুর পরিবর্তে যদি আমরা অন্য একটি বস্তুর ব্যবহার করি তাহলে দ্বিতীয় বস্তুটিকে প্রথম বস্তুর প্রতীক বলা হয়। আমরা যা প্রত্যক্ষ করি সেগুলির নানারূপ প্রতীক আমরা মস্তিষ্কে বহন করতে পারি। চিন্তনের ক্ষেত্রে প্রকৃত বস্তুগুলির পরিবর্তে এই ধরনের প্রতীকগুলি নিয়ে আমরা আচরণ করে থাকি। যেমন, একটি বই টেবিল থেকে হাত দিয়ে তোলা হল প্রকৃত আচরণ। কিন্তু আমরা যদি বই, টেবিল, হাত ইত্যাদি বস্তুগুলির প্রতীকের সাহায্যে মনেমনে ঐ একই কাজ সম্পন্ন করি তাহলে আমাদের আচরণটি হল চিন্তন। এই জন্য চিন্তনকে বলা হয় প্রতীকমূলক আচরণ (Symbolical behaviour)।

চিন্তনে ব্যবহৃত প্রতীক আবার নানা প্রকারের হতে পারে, যেমন প্রতিরূপ, ধারণা, ভাষা, সংখ্যা পেশীমূলক প্রস্তুতি ইত্যাদি। এই সব বিভিন্ন প্রতিরূপের সাহায্যে আমরা চিন্তন করে থাকি। যেহেতু চিন্তার ক্ষেত্রে প্রকৃত বস্তুর পরিবর্তে তার প্রতীকের সাহায্যে আমরা বিভিন্ন আচরণ সম্পন্ন করে থাকি সেহেতু চিন্তনের ক্ষেত্রে সময় ও শ্রমের প্রচুর সাশ্রয় হয়। এই জন্যই চিন্তন আমাদের এত উপকারে লাগে।

চিন্তন আবার নানা প্রকারের হতে পারে, যেমন কল্পন, বিচার-করণ, উদ্ভাবন ইত্যাদি। এগুলির মধ্যে কল্পন হল সেই চিন্তন যাতে প্রতিরূপগুলিকে ব্যক্তি তার ইচ্ছামত ব্যবহার করে নানা নতুন মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করে থাকে। সাধারণ চিন্তনের ক্ষেত্রে মানসিক অভিজ্ঞতাগুলি বাস্তবধর্মী হয়ে থাকে, অর্থাৎ মানসিক প্রতীকগুলি বাস্তব অনুযায়ী সাজানো হয়। কিন্তু কল্পনে মানসিক প্রতীকগুলিকে যথেচ্ছ সাজিয়ে খুসীমত মানসিক অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করা যায়।

চিন্তন ও কল্পনের মধ্যে এইটিই সব চেযে বড পার্থক্য। চিন্তন বাস্তব অনুগামী। কিন্তু কল্পন বাস্তব অনুগামী হতে বাধ্য নয়। ব্যক্তির ইচ্ছা মনোভাব, অনুভূতি অনুযায়ী প্রতিরূপগুলিকে যেমন খুশী সাজানোর স্বাধীনতা কল্পনে আছে, কিন্তু চিন্তনে নেই। তবে বাস্তব অনুগামী কল্পনও হতে পারে। তখন কল্পন ও চিন্তনে মৌলিক প্রকৃতির দিক দিয়ে বিশেষ পার্থক্য থাকে না। তাছাড়া চিন্তনের ক্ষেত্রে আমরা প্রতিরূপ ছাড়া অন্যান্য প্রতীকগুলিরই বহুল ব্যবহার করে থাকি। বরং চিন্তনের অগ্রগতির সঙ্গে প্রতিরূপের ব্যবহার ক্রমশ কমে আসে এবং উন্নত শ্রেণীর চিন্তনে প্রতিরূপকে বর্জনই করা হয়। কিন্তু কল্পনের উপাদান প্রধানত প্রতিরূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কল্পন যতই উন্নত হবে তার প্রতিরূপের ব্যবহারও তত সমৃদ্ধ ও বহুল হবে।

কল্পনের শ্রেণীবিভাগ (Types of Imagination)

কল্পনের প্রকৃতি অনুযায়ী অনেক মনোবিজ্ঞানী এর নানা শ্রেণীবিভাগ করেছেন। ড্রেভারের দেওয়া শ্রেণীবিভাগটি এখানে বর্ণিত হল।

প্রয়োগমূলক ও সৌন্দর্যবোধমূলক কল্পন

(Pragmatic and Aesthetic Imagination)

ড্রেভারের মতে সৃজনমূলক কল্পন দু'শ্রেণীর হতে পারে প্রয়োগমূলক (Pragmatic) এবং সৌন্দর্যবোধমূলক (Aesthetic)। প্রয়োগমূলক কল্পনে ব্যক্তির কল্পনা নতুন কিছু সৃষ্টি করলেও সে কল্পনা বাস্তব জগতের সঙ্গে সমতা রেখে অগ্রসর হয়। যেমন, কল্পনায় কোন ইঞ্জিনীয়ার একটি ব্রিজ তৈরী করছেন বা কোন স্থপতি একটি প্রাসাদ গড়ছেন। এ সকল ক্ষেত্রে কল্পন বাস্তবজগতের নিয়মকানুনগুলি পূর্ণভাবে মেনে চলতে বাধ্য হয়। কিন্তু সৌন্দর্যবোধমূলক কল্পনায় ব্যক্তির কল্পনা বহুলাংশে অবাধিত ও অনিয়ন্ত্রিত। যেমন কবিতা, গল্প বা উপন্যাস লেখা, কোন সৌন্দর্যময় শিল্প তৈরী করা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ব্যক্তির কল্পনা বাস্তবের নিয়মকানুন নিখুঁতভাবে মেনে চলতে বাধ্য নয়। এ দু'য়ের মধ্যে আর একটি বড পার্থক্য হল যে প্রয়োগমূলক চিন্তনে তৃপ্তি আসে যখন কল্পনের যে লক্ষ্য সে লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছান যায়। কিন্তু সৌন্দর্যবোধমূলক কল্পনে কল্পন-ক্রিয়ার সম্পাদনের সময়েই তৃপ্তি পাওয়া যায়।

ব্যবহারমূলক ও তত্ত্বগত কল্পন

(Practical and Theoretical Imagination)

প্রয়োগমূলক কল্পনাকে আবার ড্রেভার দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন, ব্যবহারমূলক (Practical) এবং তত্ত্বগত (Theoretical)। যে প্রয়োগমূলক কল্পন বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্যই সৃষ্ট হয় তাকে বলা যেতে পারে ব্যবহারিক প্রয়োগমূলক কল্পন। আর যে প্রয়োগমূলক কল্পনকে কোন বিশেষ তত্ত্ব আহরণ করার জন্য সৃষ্টি করা হয় তাকে বলা যেতে পারে তত্ত্বগত প্রয়োগমূলক কল্পন। ইঞ্জিনীয়ারের ব্রিজ তৈরীর কল্পনটি হল প্রথম শ্রেণীর কল্পনের উদাহরণ এবং বৈজ্ঞানিকের ক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞানমূলক তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য যে কল্পন সেটি হল দ্বিতীয় শ্রেণীর কল্পনের উদাহরণ।

শিল্পমূলক ও অবাস্তব কল্পন

(Artistic and Fantastic Imagination)

সৌন্দর্যবোধমূলক কল্পনও আবার দু'রকম হতে পারে, শিল্পমূলক (Artistic) এবং অলীক বা অবাস্তব (Fantastic)। যখন কোন চিত্রকর কল্পনায় একটি ছবি আঁকছেন বা ভাস্কর কল্পনায় কোন মূর্তি গড়ছেন তখন তাঁদের কল্পনকে শিল্পমূলক বলা চলে, কিন্তু নিছক তৃপ্তি পাবার উদ্দেশ্যে যখন ব্যক্তি উদ্দেশ্যহীন উদ্ভট কল্পনার জাল বুনে যায় তখন তার কল্পনকে অলীক বা অবাস্তব কল্পন বলা হয়।

শিক্ষা ও কল্পন (Education and Imagination)

মানবজীবনের সব স্তরেই কল্পনের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তবে শিশুর শিক্ষায় কল্পন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। শৈশবের মত যৌবনাগমেও চিন্তনের মধ্যে কল্পনের প্রাচুর্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরিণত বয়সেও কল্পনের প্রভাব অকিঞ্চিৎকর নয়।

গ্যাল্টন প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে শিশুর চিন্তন-প্রক্রিয়াটি প্রধানত কল্পনধর্মী হয়ে থাকে। প্রথম দিকে সে সমস্ত কিছুই চিন্তা করে প্রতিরূপের সাহায্যে। ধীরে ধীরে সে যত বড় হয় তত তার চিন্তায় প্রতিরূপের আধিক্য কমতে থাকে। যৌবনপ্রাপ্তির সময় থেকে আবার তার চিন্তায় কল্পনের প্রাধান্য নতুন করে দেখা দেয়। এ সময়ের কল্পন অবাস্তব ও দিবাস্বপ্নের গোত্রীয়। প্রাপ্তযৌবন ছেলেমেয়েরা তাদের বহুবিধ অতৃপ্ত কামনার

আংশিক তৃপ্তি আহরণ করে কল্পনার মধ্যে দিয়ে। পরিণত বয়সে এই দিবা-স্বপ্নের আধিক্য কমে এলেও কোন দিনই একেবারে চলে যায় না। সারাজীবন ধরে অল্পবিস্তর পরিমাণে দিবাস্বপ্ন প্রতিটি ব্যক্তির মনোরাজ্যকে প্রভাবিত করে এবং বাস্তবজীবনের ব্যর্থতা এবং অতৃপ্তির হতাশার মধ্যে তাকে আংশিক তৃপ্তি এবং আনন্দ দিয়ে থাকে।

শিক্ষার দিক দিয়ে কল্পনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর সৃজনধর্মিতা। বস্তুত কল্পনই হল সমস্ত উদ্ভাবনী বা সৃজনমূলক চিন্তনের ভিত্তি। কল্পন যখন সুনিয়ন্ত্রিত ও বাস্তব অনুগামী হয় তখন সেই কল্পন সত্যকারের নতুন জিনিস সৃষ্টি করতে পারে। বৈজ্ঞানিক বা শিল্পমূলক আবিষ্কার, সৌন্দর্যমূলক বস্তু সৃষ্টি, নতুন কবিতা বা উপন্যাস লেখা এ সকলেরই প্রথম সুরু তাদের সৃজকদের কল্পনার রাজ্যে। সেখানে তাদের সৃষ্টি পূর্ণতালাভ করলেই তারা বাস্তবে রূপলাভ করে। যে কল্পনাকে বাস্তবে কোন কিছু সৃষ্টি বা সংগঠনের জন্য প্রয়োগ করা যায় তাকেই প্রয়োগমূলক কল্পন বলা হয়। এই ধরনের কল্পন শিশুর চিন্তন প্রক্রিয়াকে সৃজনশীল ও উন্নত করে তোলে। অতএব শিশুর কল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করা এবং তাকে উন্মুক্ত পথে পরিচালন করা শিক্ষাপ্রক্রিয়ার একটি বড় অঙ্গ। যাকে আমরা প্রয়োগমূলক কল্পন বলে বর্ণনা করি সেই কল্পন শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করা সুশিক্ষার যে একটি বড় লক্ষ্য একথা বলাই বাহুল্য।

শিশুর প্রাথমিক কল্পন অবশ্য প্রয়োগমূলক নয়। তার প্রকৃতি প্রধানত অলীক ও অবাস্তব। বাস্তবের নিয়মকানুন, স্থান ও সময়ের সঙ্গতি কোন কিছুই তার কল্পন মানে না। মুক্ত বিহঙ্গের ন্যায় নিজের খুসীমত পথে নির্বাধ-গতিতে সে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যায়। এই সময়ে শিশুদের এই অবাস্তব কল্পন খোরাক পায় রূপকথার গল্পে—পক্ষীরাজ ঘোড়া, দুধসাগরের দেশ, ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমী প্রভৃতি কাল্পনিক কাহিনীতে। সবদেশেই শিশুদের মনস্তুষ্টির জন্য রূপকথা ও উপকথার গল্প শোনাবার প্রথার প্রচলন আছে।

কিন্তু আধুনিক প্রগতিপন্থী মনোবিজ্ঞানীরা শিশুদের রূপকথার গল্প বা অবাস্তব কাহিনী শোনাবার বিরোধিতা করেন। তাঁদের মতে রূপকথার গল্প শিশুকে বাস্তব থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় এবং তার মনে প্রকৃত জগৎ সম্বন্ধে এমন কতকগুলি অবাস্তব ধারণার সৃষ্টি করে যা তার ভবিষ্যৎ জীবন-প্রস্তুতির বিরাট পরিপন্থী হয়ে দাঁড়ায়। রূপকথা ও উপকথার গল্পে সাধারণত অতিপার্থিব বা দৈবশক্তির প্রচুর ব্যবহার দেখা যায় এবং এই সব গল্প শুনে শিশুর মনে এই বিশ্বাস

জন্মায় যে সে যদি কোন বিপদ বা সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতিতে পড়ে তবে দৈব-শক্তি তাকে সাহায্য করবে উদ্ধার পেতে। কিন্তু যখন সে প্রকৃত জীবনে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন হয় তখন তার শৈশবের এই ধারণা শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায় এবং তার ফলে সে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গতিবিধান করতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আশাভঙ্গের আঘাত তার মনকে দুর্বল করে এবং স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাসকে শিথিল করে তোলে।

প্রসিদ্ধ শিশু শিক্ষাবিদ্ মন্টেসরী এই মতেরই সমর্থক। তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুকে কোনরূপ রূপকথা বা কাল্পনিক গল্প শোনান নিষিদ্ধ। তিনি বলতে চান যে শিক্ষার কাজ হল শিশুকে তার শিশুসুলভ অবাস্তব রাজ্য থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে বাস্তব জগতের জন্য প্রস্তুত করা। তাঁর মতে শিশুর ইন্দ্রিয়মূলক অভিজ্ঞতাগুলিকে বাস্তবধর্মী শিক্ষার মধ্যে দিয়ে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে শিশু বড় হয়ে বাস্তবকে তার প্রকৃত স্বরূপে চিনতে পারে এবং তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সার্থকভাবে সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হয়।

শিশুর অবাস্তব কল্পনা এবং রূপকথা পঠনের বিরুদ্ধে মন্টেসরী প্রভৃতির এই অভিযোগের পিছনে যে যথেষ্ট মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রায়ই দেখা গেছে যে শৈশবের রূপকথার মায়াময় জগৎটি যখন পরিণত বয়সে বাস্তবের রূঢ় পরিবেশের সংঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তখন ব্যক্তির পক্ষে তা প্রচণ্ড আশাভঙ্গ ও মানসিক আঘাতের রূপ নেয়। অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তি এই অপ্রত্যাশিত আঘাত থেকে অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসতে পারে না এবং সারাজীবন ধরেই অতৃপ্ত ও বিপর্যস্ত জীবন যাপন করে চলে।

মনঃসমীক্ষণের সংব্যাখ্যানেও শৈশবের অবাস্তব কল্পনার আধিক্য ব্যক্তির পরিণত জীবনে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি যখন বাস্তবজীবনে কোন দুরূহ সমস্যা বা পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে সার্থকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না, তখন সে তার শৈশবের কল্পনার রাজ্যে ফিরে গিয়ে বাস্তবকে এড়িয়ে যায়। একে প্রত্যাবৃত্তি (Regression) বলা হয়। প্রাণশক্তির এই প্রত্যাবৃত্তি মানসিক স্বাস্থ্যের নাশক, সার্থক জীবন-গঠনের পরিপন্থী।

তা বলে অবাস্তব কল্পনা বা দিবাস্বপ্নের একেবারে কোনই উপকারিতা নেই একথা বলা চলে না। অতি শৈশবে শিশুর মনে এমন সব কামনা দেখা দেয় যেগুলির প্রকৃত রূপ আমাদের কাছে খুব সুস্পষ্টও নয় এবং যেগুলি পূর্ণ করা আমাদের সাধ্যও নয়। অথচ সেগুলির পরিতৃপ্তি না হলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য

ব্যাহত হয়ে ওঠে। শিশু তার এই সব অতৃপ্ত কামনা বাসনাগুলির আংশিক তৃপ্তি অবাস্তব কল্পনার মাধ্যমে আহরণ করে। শিশুর বহুমুখী বুদ্ধি প্রচেষ্টাকে এই ধরনের কল্পনা অনেকখানি সাহায্য করে এবং অনেক প্রাপ্তবয়স্কের মানসিক প্রক্রিয়াও এই কল্পনার মাধ্যমে পরিণতি লাভ করে।

সুনিয়ন্ত্রিত কল্পনা শিশুকে জীবনসমস্যা সমাধানে সাহায্য করে থাকে। কল্পনার সাহায্যে শিশু নানা প্রকল্প (Hypothesis) গঠন করতে পারে এবং সেই প্রকল্পগুলির সাহায্যে সে বাস্তব সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয়। দেখা গেছে যে প্রকল্প গঠনের সময় কল্পনার প্রয়োগ এক রকম অপরিহার্য। প্রকল্প গঠন করতে হলে কতকগুলি সম্ভাব্য সিদ্ধান্তের মধ্যে থেকে একটি বিশেষ সিদ্ধান্তকে বেছে নিতে হয়। তার জন্য প্রয়োজন সব কটি সম্ভাব্য উপায়কে কল্পনায় প্রয়োগ করে দেখা। এখানে মানসিক উপাদানের সাহায্যে বাস্তব ঘটনাটি অনুষ্ঠিত করতে কল্পনাই শিশুকে সমর্থ করে। কল্পনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এর সৌন্দর্যানুভূতির ধর্মটি। আমাদের মধ্যে যে সহজাত সৌন্দর্যভোগের স্পৃহা পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের মাধ্যমে তৃপ্তির অনুসন্ধান করে, অথচ সংকীর্ণ ও অবরুদ্ধ বাস্তব পরিবেশে পূর্ণ তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় সেই অতৃপ্ত সৌন্দর্যানুভূতির স্পৃহা একমাত্র কল্পনার মাধ্যমেই তার বাঞ্ছিত তৃপ্তি পেতে পারে। এই জন্য সুষ্ঠু কল্পনা ব্যক্তির পক্ষে তৃপ্তিকর, রুদ্ধ ক্ষোভের নির্মোচক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সহায়ক।

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে শিশুর লক্ষ্যহীন অবাস্তব কল্পনাকে লক্ষ্যসম্পন্ন বাস্তবধর্মী কল্পনায় পরিণত করাই শিক্ষার প্রধান কার্যসূচী। রূপকথার গল্প বা অবাস্তব কাল্পনিক কাহিনী শিশুকে একটি বিশেষ বয়স পর্যন্ত, (বড় জোর প্রাক্‌বিদ্যালয় সময় পর্যন্ত) পড়তে বা শুনতে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু তারপর তাকে ধীরে ধীরে কল্পনার জগৎ থেকে সরিয়ে আনতে হবে এবং বাস্তব জীবনের চিন্তাধারায় দীক্ষিত করতে হবে। তার উন্মেষকামী কল্পনাকে উপযুক্ত পরিচালনা ও সাহায্যের দ্বারা বাস্তবমুখী করে তুলতে হবে এবং যাতে তার কল্পনা ব্যবহারিক কাজে নিযুক্ত হতে পারে এবং তার জীবন সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারে সেভাবে তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

এই কল্পনা নিয়ন্ত্রণের একটি প্রধান উপায় হল বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর তার কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করা। শিশু যত বিভিন্ন ও বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার অধিকারী হবে তত তার কল্পনা বাস্তবধর্মী এবং কম উদ্ভট হয়ে

উঠবে। দেখা গেছে যে শিশু যত সঙ্কীর্ণ বা সীমাবদ্ধ পরিবেশে বাস করে তার কল্পনা তত বেশী অবাস্তব হয়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য ও বিবিধতা শিশুর কল্পনাকে গঠনমূলক ও ব্যবহারিক মূল্যসম্পন্ন করে তোলে।

এই জন্য শিশুর সমস্ত শিক্ষাকেই সক্রিয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। মৌখিক বর্ণনা বা পুস্তকলব্ধ ধারণা কোনটাই সত্যকারের বাস্তব জ্ঞান দিতে পারে না। ফলে শিশুর কল্পনা নানা বিকৃত ও অবাস্তব রূপ ধারণ করে। কিন্তু সক্রিয়তার মধ্যে দিয়ে যা শেখা যায় তাতে অবাস্তব কল্পনা গড়ে ওঠার কোন অবকাশ থাকে না। সেখানে বাস্তব অভিজ্ঞতা শিশুর কল্পনার প্রকৃতিকে দৃঢ় হস্তে নিয়ন্ত্রিত করে এবং তার গতিধারাকে প্রয়োগমূলক পথে পরিচালিত করে।

যেখানে যেখানে মৌখিক বর্ণনা বা পুস্তকলব্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভর করা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না সেখানে ইন্দ্রিয়সহায়ক উপকরণের (**Audio-visual aids**) সাহায্য নেওয়া উচিত। তাছাড়া ম্যাজিক ল্যান্টার্ন, ছবি, চার্ট, ম্যাপ, ফিল্ম ইত্যাদির সহায়তায় শিশুর কল্পনাকে বাস্তব পথে পরিচালিত করা যায়।

ইন্দ্রিয়ের উৎকর্ষ সাধনের (Sense training) সাহায্যেও কল্পনাকে বাস্তবধর্মী করে তোলা যায়। কল্পনার প্রধান বিষয়বস্তু যে প্রতিরূপ তা আসে ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে। মন্টেসরী প্রবর্তিত পন্থায় ইন্দ্রিয়গুলির উৎকর্ষসাধন করা হলে কল্পনা অবাস্তব বা উদ্ভট রূপ গ্রহণ করতে পারে না। তবে শিশুর মধ্যে চিন্তামূলক কল্পনাশক্তির বৃদ্ধির পক্ষে ইন্দ্রিয়চর্চা খুব বেশী কার্যকর হয় বলে মনে করা হয় না।

সতের

সেন্টিমেণ্ট (Sentiment)

সেন্টিমেন্ট কথাটি লৌকিক ভাষণে বহুদিন প্রচলিত থাকলেও মনোবিজ্ঞানে কথাটি প্রথমে প্রবর্তিত করেন স্যাণ্ড (Shand) নামক একজন মনোবিজ্ঞানী। তাঁর সংব্যাখ্যান অনুযায়ী বিশেষ কোন বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে যখন কোনও বিশেষ একটি প্রক্ষোভ সুসংহত সংগঠনের সৃষ্টি করে তখন তাকে সেন্টিমেন্ট বলে।

প্রত্যক ব্যক্তিই কতকগুলি সহজাত প্রবণতা নিয়ে জন্মায় এবং তার প্রাথমিক আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় এই প্রবণতাগুলির দ্বারা। এগুলিকে আমরা প্রবৃত্তি বা ইনস্টিংক্ট নাম দিয়ে থাকি। কিন্তু যত সে বড় হয় তত পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ায় ফলে তার সেই সহজাত প্রবণতাগুলি ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। প্রথম প্রথম তার প্রবণতাগুলি থাকে অনিয়ন্ত্রিত, অসংহত ও বিচ্ছিন্ন সত্তার রূপে। কিন্তু ক্রমশ সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংবদ্ধ হয়ে সুনিয়ন্ত্রিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ ধারণ করে। সেন্টিমেন্ট হল এই প্রক্ষোভ-মূলক প্রবণতাগুলিরই একটি সুসংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত রূপ।

যেমন, কোন কিছুকে ভালবাসা একটা প্রক্ষোভ। কিন্তু যখনই বিশেষ কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে এই ভালবাসার প্রক্ষোভটি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংগঠিত হয়ে ওঠে, তখনই ভালবাসার সেন্টিমেন্ট জন্ম নেয়। উদাহরণস্বরূপ, আমাদের জন্মভূমি বা আমাদের মাতৃভাষা বা নিজেদের প্রিয়জনদের ঘিরে আমাদের ভালবাসার সেন্টিমেন্টটি গঠিত হয়ে থাকে। তেমনই আবার কোনও ব্যক্তি বা বস্তুকে ঘিরে আমাদের ঘৃণার সেন্টিমেন্ট বা রাগের সেন্টিমেন্টেরও সৃষ্টি হতে পারে।

সেন্টিমেন্ট ও প্রক্ষোভ (Sentiment and Emotion)

✓ প্রক্ষোভ থেকেই সেন্টিমেন্ট জন্মায়। প্রক্ষোভের সুসংগঠিত রূপকেই সেন্টিমেন্ট বলা হয়। যেখানে বা যে বস্তুর প্রতি কোনও সুনির্দিষ্ট প্রক্ষোভ ব্যক্তি অনুভব করে না সেখানে বা সে বস্তুকে ঘিরে কোনও সেন্টিমেন্ট তৈরী হয় না। এই জন্য সেন্টিমেন্ট মাত্রেই কোন না কোন প্রক্ষোভের দ্বারা নিষিক্ত থাকে। যখনই সেন্টিমেন্টটি কার্যকর হয় তখনই ঐ বিশেষ প্রক্ষোভটি জেগে ওঠে।

প্রক্ষোভ সহজাত, কিন্তু সেন্টিমেন্ট অর্জিত। সেন্টিমেন্ট মনের একটি বিশেষ অর্জিত সংগঠন বা রূপ মাত্র যা বিশেষ কোন বস্তু বা ব্যক্তি বা ধারণা সম্বন্ধে

ব্যক্তিকে বিশেষ পন্থায় কাজ করতে প্রবুদ্ধ করে। প্রক্ষোভও ব্যক্তিকে বিশেষভাবে আচরণ করতে প্রবুদ্ধ করে, কিন্তু প্রক্ষোভের প্রভাব সাময়িক এবং ক্ষণস্থায়ী।

যখন প্রক্ষোভমূলক প্রবণতাগুলি সেন্টিমেন্টের রূপ নিয়ে সুসংগঠিত হয় তখন ব্যক্তির মানসিক সংগঠনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সেন্টিমেন্টের সেই বিষয়বস্তুটিকে ঘিরে ব্যক্তির মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট ও স্থায়ী আচরণধারা গড়ে ওঠে। ম্যাকডুগালের মতে প্রত্যেকটি সেন্টিমেন্টই কোন বিশেষ বস্তুর প্রতি ব্যক্তির একটি স্থায়ী প্রেষণামূলক মনোভাব যা ঐ বস্তুটির অভিজ্ঞতা থেকে জন্মে থাকে। বিশেষ কোন ব্যক্তি বিশেষ একটি পরিবেশে কি ভাবে আচরণ করবে তা নির্ভর করে ঐ পরিবেশ সম্পর্কে তার পূর্বগঠিত সেন্টিমেন্টের উপর। এই জন্য সেন্টিমেন্টকে আমরা আচরণের নিয়ন্ত্রক বলতে পারি।

পরিবেশের সংস্পর্শে আসার ফলে ধীরে ধীরে শিশুর প্রক্ষোভগুলি বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। সে কোন বস্তুকে ভালবাসে, কোনটিকে আবার ঘৃণা করতে শেখে। এখন এই বস্তুগুলিকে ঘিরে যদি তার ভালবাসা, ঘৃণা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি বার বার অভিব্যক্ত হতে থাকে তবে কিছুদিন পরেই সেই বিচ্ছিন্ন ও অসংহত প্রক্ষোভগুলি স্থায়ী ও সুসংহত সেন্টিমেন্টের রূপ ধারণ করে। সেন্টিমেন্ট বস্তু এবং ব্যক্তিকে ঘিরে যেমন তৈরী হয় তেমনই আবার ধারণাকে কেন্দ্র করেও সেন্টিমেন্ট তৈরী হয়। যেমন ধর্মের প্রতি কারও অনুরাগের সেন্টিমেন্ট থাকতে পারে আবার কারও বা বিরাগের সেন্টিমেন্ট থাকতে পারে। আমাদের সকলের প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির প্রতি ঘৃণার সেন্টিমেন্ট আছে।

সেন্টিমেন্ট ও প্রবৃত্তি (Sentiment and Instinct)

মানব আচরণের নিয়ন্ত্রকরূপে সেন্টিমেন্ট ও প্রবৃত্তি উভয়েরই ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রবৃত্তি হল সহজাত আচরণ-প্রবণতা এবং শিশুর জীবনের প্রাথমিক আচরণগুলি প্রবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রাথমিক সঙ্গতিবিধানের কাজগুলি শিশু কিভাবে সম্পন্ন করবে তা নির্ণয় করে শিশুর সহজাতপ্রবৃত্তিগুলি। কিন্তু শিশু যত বড় হতে থাকে তত তার মধ্যে নতুন নতুন আচরণ-প্রবণতা দেখা দেয়। পরিবর্তনশীল পরিবেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে ব্যক্তি এই নতুন আচরণগুলি সম্পন্ন করতে শেখে। তার এই নতুন আচরণ-প্রচেষ্টাগুলির

পিছনে থাকে নানা প্রকৃতির সেন্টিমেণ্ট। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির সম্পর্কে এসে তার মনে নানা ধরনের অনুভূতির সৃষ্টি হয় এবং সেগুলির সম্পর্কে সে বিশেষ বিশেষ পন্থায় আচরণ করতে শেখে। এই অর্জিত মানসিক সংগঠনগুলি হল সেন্টিমেণ্ট। অতএব দেখা যাচ্ছে যে প্রবৃত্তি হল সহজাত আচরণ-প্রবণতা, সেন্টিমেণ্ট হল অর্জিত আচরণ-প্রবণতা। তবে প্রবৃত্তিমূলক আচরণের মধ্যে ব্যক্তির জীবনের প্রাথমিক সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাই প্রধান। আর সেন্টিমেণ্ট-প্রসূত আচরণগুলি ব্যক্তির সামাজিক, সংস্কৃতিমূলক ও ব্যক্তিগত জীবনের বহুমুখী অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। শিশু যত বড় হয় তত তার প্রবৃত্তি পরিচালিত আচরণগুলি সংখ্যায় কমে আসে এবং সেন্টিমেণ্টই তার আচরণগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে সুরু করে। পিতামাতা, ভাইবোন, বন্ধু, স্কুলের সহপাঠী, শিক্ষক প্রভৃতিদের সংস্পর্শে সে যত আসে ততই তার মধ্যে নতুন নতুন সেন্টিমেণ্ট গড়ে ওঠে। তখন তার আচরণের উপর প্রবৃত্তির নিয়ন্ত্রণ থাকে নিতান্তই অল্প। সেই সময় তার আচরণকে প্রধানত নিয়ন্ত্রিত করে তার নবগঠিত সেন্টিমেণ্টগুলি।

তবে প্রবৃত্তি ও সেন্টিমেণ্ট দুইই প্রক্ষোভধর্মী। উভয়েরই প্রেষণাশক্তি জোগায় প্রক্ষোভ। কোনও বিশেষ প্রক্ষোভ জাগলেই প্রবৃত্তি কার্যকর হয়। তেমনই সেন্টিমেণ্টের শক্তি ও উদ্যম আসে কোনও বিশেষ প্রক্ষোভের জাগরণ থেকে। তবে সেন্টিমেণ্টের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ অনেক বেশী গভীর, স্থায়ী ও শক্তিশালী।

সেন্টিমেণ্ট ও কমপ্লেক্স (Sentiment and Complex)

সেন্টিমেণ্ট ও কমপ্লেক্স মানসিক সত্তার দিক দিয়ে অভিন্ন প্রকৃতির। উভয়েরই জন্ম প্রক্ষোভের সংগঠনে। উভয়েই কোন বস্তু, ব্যক্তি বা বিষয়কে ঘিরে সৃষ্টি হয়। উভয় ক্ষেত্রেই যখন ঐ বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণার উল্লেখ করা হয় বা তার চিন্তা মনে আসে তখনই প্রক্ষোভমূলক প্রচেষ্টা দেখা দেয় এবং ব্যক্তি একটি সুনির্দিষ্ট পন্থায় আচরণ করতে সুরু করে। কিন্তু তবু কতকগুলি দিক দিয়ে দু'য়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বর্তমান।

প্রথমত, ফ্রয়েডীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কমপ্লেক্স ব্যক্তির অচেতন মনের গুরুত্ব-পূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিশেষ। ব্যক্তির সচেতন মনে কমপ্লেক্স সৃষ্টিও হয় না এবং তার প্রভাব সম্পর্কে সে জ্ঞাতও থাকে না। সেইজন্য যখন সেই কমপ্লেক্সের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সে কোন বিশেষ আচরণ করে তখন সে তার কোনরূপ ব্যাখ্যা দিতে পারে না, অন্তত যে ব্যাখ্যা সে দেয় বা বিশ্বাস করে তা প্রকৃত নয়

কিন্তু সেন্টিমেন্ট ব্যক্তির জ্ঞাত মনের উপাদান এবং তার স্বরূপ ও তা থেকে সঞ্জাত আচরণ সম্বন্ধেও সে পূর্ণ ভাবেই সচেতন।

দ্বিতীয়ত, কমপ্লেক্সের মধ্যে একটি অস্বাভাবিকতার ছাপ আছে। যখন ব্যক্তির অহংসত্তার দ্বারা পরিত্যক্ত কোন চিন্তা বা কামনা তার অচেতনে অবদমিত হয়, তখনই কমপ্লেক্স জন্ম নেয়। কিন্তু সেন্টিমেন্ট স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যময় মানসিক প্রক্রিয়ার ফল এবং ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের পরম সহায়ক। সেন্টিমেন্ট মনের সুসমন্বয়নের উপকরণস্বরূপ, কমপ্লেক্স মানসিক সংহতির পরিপন্থী এবং মনের অস্বাভাবিক অবস্থার সূচক।

সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি ও বিকাশ

(Origin & Development of Sentiment)

কোনও সেন্টিমেন্ট নিয়ে শিশু জন্মায় না। পরিবেশের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকে সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি হয়। নবজাত শিশুর আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় নিছক তার প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের শক্তির দ্বারা। কিন্তু সে কিছুটা বড় হলেই তার মধ্যে সেন্টিমেন্ট সৃষ্টি হতে থাকে।

সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি হয় অভিজ্ঞতা থেকে। ড্রেভারের মতে নিছক প্রত্যক্ষণমূলক অভিজ্ঞতা থেকে সেন্টিমেন্ট জন্মায় না। সেন্টিমেন্ট জন্মায় যখন অভিজ্ঞতা চিন্তনমূলক স্তরে গিয়ে পৌঁছয়। বস্তু বা ব্যক্তি সম্বন্ধে শিশুর অভিজ্ঞতা যখন কেবলমাত্র প্রত্যক্ষণে সীমাবদ্ধ থাকে অর্থাৎ যখন সে ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা অর্জন ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না তখন সেন্টিমেন্ট তৈরী হতে পারে না, কিন্তু যখন তার পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু বা ব্যক্তিকে ঘিরে শিশু চিন্তা করতে শেখে তখনই তার মধ্যে সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি হতে সুরু হয়

শিশুর মনের বিকাশ ও বৃদ্ধির তিনটি বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করা যেতে পারে। এই তিনটি স্তর হল, প্রথম, প্রত্যক্ষণমূলক স্তর, দ্বিতীয়, চিন্তনমূলক স্তর এবং তৃতীয় বিচারমূলক স্তর। এই তিনটি স্তরের অনুভূতিরও তিনটি শ্রেণীবিভাগ করা যায়, যথা, প্রথমস্তরের অনুভূতি হল অসংহত প্রক্ষোভ, দ্বিতীয় স্তরের অনুভূতি হল সেন্টিমেন্ট এবং তৃতীয় স্তরের অনুভূতি হল আদর্শ জীবনতত্ত্বের অনুভূতি।

প্রত্যক্ষণমূলক স্তর

প্রথম স্তরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মনের বিভিন্ন সহজাত প্রবৃত্তির সহজ ও অবাধ সক্রিয়তা। মনোবিকাশের এই প্রাথমিক স্তরে মন বলতে এই প্রবৃত্তিগুলিরই সমষ্টিকে বোঝায়। প্রত্যক্ষভাবে যে সকল বস্তুর অভিজ্ঞতা শিশু অর্জন করে

এই স্তরে প্রবৃত্তিগুলি সেগুলির সঙ্গেই যুক্ত হয়ে যায়। এই স্তরের নাম প্রত্যক্ষণ-মূলক স্তর এবং অসংহত প্রক্ষোভ হল এই স্তরের একমাত্র অনুভূতি।

চিন্তনমূলক স্তর

দ্বিতীয় স্তরে হয় চিন্তনের সুরু। পূর্বের অসংহত প্রবৃত্তিগুলি ধীরে ধীরে গোষ্ঠিবদ্ধ হতে থাকে এবং তার ফলে মনের মধ্যে একটি একতা দেখা দেয়। বিচ্ছিন্ন প্রবৃত্তিগুলির পারস্পরিক সমন্বয়নের মাধ্যমে এমন একটি নতুন মানসিক একতার সৃষ্টি হয় যেটি ইতিপূর্বে একেবারে ছিল না। এই স্তরেই অসংহত প্রক্ষোভগুলি পরস্পরের সঙ্গে একতাবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে সেন্টিমেন্টের জন্ম দেয় এবং এই স্তরেই মনের স্বাভাবিক সংগঠন প্রথম দেখা দেয়।

বিচারমূলক স্তর

তৃতীয় স্তরে শিশুর মধ্যে বিচারকরণের শক্তি দেখা দেয়। এই সময় শিশু চিন্তনের সাহায্যে নানা সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয় এবং বিচারকরণের মাধ্যমে সে ভালমন্দ, ন্যায় অন্যায় নির্ণয় করে। সেই সঙ্গে মানসিক সংহতি বা সমন্বয়নের মাত্রা আরও একধাপ অগ্রসর হয় এবং দ্বিতীয় স্তরে যে সকল সেন্টিমেন্ট বা অর্জিত প্রবণতা শিশুর মধ্যে জন্মলাভ করেছিল সেগুলির মধ্যে আবার একটি ব্যাপকতর সংগঠন দেখা দেয় এবং সেন্টিমেন্টগুলি পরস্পরের সঙ্গে সুসংবদ্ধ হয়ে একটি সুসংগঠিত আকার ধারণ করে। এই বিচ্ছিন্ন সেন্টিমেন্ট-গুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে যে নতুন সেন্টিমেন্টটি সৃষ্ট হয় তাকেই বলা হয় অধিশাসক সেন্টিমেন্ট (Master Sentiment)। ম্যাক্‌ডুগাল এই সেন্টিমেন্টের নাম দিয়েছেন আত্মবোধের সেন্টিমেন্ট (Self-Regarding Sentiment)। সেন্টিমেন্ট মাত্রেই কোন না কোন বস্তুকে ঘিরে সৃষ্টি হয় এবং অধিশাসক সেন্টিমেন্টটি শিশুর নিজের অহংসত্তাকে ঘিরে সৃষ্ট হয়ে থাকে। এই বিচারমূলক স্তরে যে ব্যাপক মানসিক সংগঠনটি ঘটে থাকে তা থেকেই জন্ম নেয় মনের সুসম্পূর্ণ রূপটি। এই স্তরের অনুভূতি হল আদর্শবোধ বা জীবনতত্ত্বের অনুভূতি। এই স্তরেই শিশুর মধ্যে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন দেখা দেয় এবং এগুলি থেকেই শিশু তার নিজস্ব একটি জীবনদর্শন গঠন করে নেয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে মানসিক বিকাশের প্রত্যক্ষণমূলক স্তরে কোনরকম সেন্টিমেন্ট জন্মায় না। সেন্টিমেন্ট জন্মায় তখন যখন শিশু তার প্রক্ষোভের বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করতে শেখে। অতএব সেন্টিমেন্টের সৃষ্টির জন্য দুটি বস্তুর সহায়তা অপরিহার্য—প্রথম, বস্তুটি সম্বন্ধে মানসিক জ্ঞান বা উপলব্ধি

এবং দ্বিতীয়, বস্তুটির প্রতি প্রক্ষোভের জাগরণ। এ দুটি ঘটনা একত্রিত হলেই সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি হয়।

শিক্ষায় সেন্টিমেন্টের প্রভাব : আত্মবোধের সেন্টিমেন্ট

সেন্টিমেন্ট কথাটির পরিষ্কার সংব্যাখ্যান প্রথম দেন স্যাণ্ড। পরে ম্যাক্‌ডুগাল ড্রেভার প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা স্যাণ্ডের সংজ্ঞাটি গ্রহণ করেন। তাঁদের প্রদত্ত মানব-আচরণের সংব্যাখ্যানে সেন্টিমেন্টকে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে ম্যাক্‌ডুগালের প্রসিদ্ধ প্রবৃত্তি-প্রক্ষোভ তত্ত্বে শিশুর জীবন গঠনে সেন্টিমেন্টের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

ম্যাক্‌ডুগালের মতে শিশুর ব্যক্তিসত্তা গঠনে সেন্টিমেন্ট হল প্রবলতম শক্তি। জন্মের সময় শিশুর মানসিক কর্মপ্রবণতাগুলি অসংহত ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে অর্থাৎ তখন শিশুর ব্যক্তিসত্তা বলে কোন বস্তুই থাকে না। তার আচরণ তখন কেবল কতকগুলি অসংলগ্ন কর্মপ্রচেষ্টার সমষ্টিমাত্র। কিন্তু সেন্টিমেন্টের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এই অসংলগ্ন কর্মপ্রচেষ্টাগুলি ধীরে ধীরে সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে এবং সেই সময়েই শিশুর প্রক্ষোভমূলক প্রচেষ্টাগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে দানা বেঁধে ওঠে। এই সংগঠনের ফল থেকেই শিশুর সুসংহত মনের অস্তিত্ব প্রথম দেখা দেয়। এই কারণেই ম্যাক্‌ডুগাল প্রভৃতির মতে ব্যক্তিসত্তা সৃষ্টির প্রথম ও অতি প্রয়োজনীয় সোপান হল সেন্টিমেন্টের জন্ম।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিশুর নতুন নতুন অর্জিত আচরণগুলির প্রকৃত নিয়ন্ত্রক তার সেন্টিমেন্ট। পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি সম্বন্ধে যে ধরনের সেন্টিমেন্ট তার মনে গঠিত হবে তার আচরণধারাও সেই মত রূপ নেবে। উদাহরণস্বরূপ সহপাঠী, বিদ্যালয় ও লেখাপড়া সম্বন্ধে যদি তার প্রীতির সেন্টিমেন্ট গড়ে ওঠে সে তবে তার সহপাঠী, বিদ্যালয় ও লেখাপড়া সম্বন্ধে প্রীতিপূর্ণ আচরণ করবে। চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা প্রভৃতি সম্বন্ধে যদি তার মধ্যে ঘৃণার সেন্টিমেন্ট জাগে তাহলে সে ঐ কাজগুলি থেকে দূরে সরে যাবে ইত্যাদি। অতএব শিশুর সেন্টিমেন্টগুলি কি ধরনের রূপ গ্রহণ করল তা জানা শিক্ষকের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। কেবল তাই নয় যাতে শিশুর মধ্যে স্বাস্থ্যকর ও অনুকূল প্রক্ষোভের সৃষ্টি হয় তার আয়োজন করা শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় অঙ্গ। পরিবেশের সুপরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে বিচক্ষণ শিক্ষক শিশুর মধ্যে নানা বাঞ্ছিত সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি করতে পারেন।

নৈতিক সেন্টিমেণ্ট (Moral Sentiment)

শিশু বড হলে যে সব সেন্টিমেণ্ট তার ব্যক্তিসত্তাকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল নৈতিক সেন্টিমেণ্ট (Moral Sentiment)। শিশুর মানসিক বিকাশের দ্বিতীয় সোপানে শিশু শেখে ভালমন্দের বিচার করতে, অবশ্য তার ভাল মন্দের বিচারের পেছনে আছে সমাজের অনুশাসন। সমাজের অনুশাসন পিতামাতা ও অন্যান্য বয়স্কদের মাধ্যমে শিশুর উপর প্রযুক্ত হয়। সেই অনুশাসনের পরিপ্রেক্ষিতে সে শেখে কোন্ কাজটি সমাজ অনুমোদিত অর্থাৎ ভাল এবং কোন্ কাজটি সমাজ অনুমোদিত নয় অর্থাৎ মন্দ। এ ভাবে সে নিজের বিচারকরণের শক্তির প্রয়োগ করে ভাল-মন্দ, সৎ-অসৎ, সুন্দর-অসুন্দর প্রভৃতি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট মানসিক সংগঠন গড়ে তোলে। একেই নৈতিক সেন্টিমেণ্ট বলা হয়। শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে নৈতিক সেন্টিমেণ্টের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিশুর ভালমন্দ, ন্যায়-অন্যায়, করণীয়-অকরণীয় ইত্যাদির জ্ঞান তার সুশিক্ষার পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় তার ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশও এই নৈতিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে এবং সামাজিক জীবনের সাফল্য এই নৈতিকবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব দেখা যাচ্ছে যে নৈতিক সেন্টিমেণ্টের সুষ্ঠু গঠনটি শিশুর শিক্ষার পক্ষে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিশু একটু বড হলেই তার বিভিন্ন সেন্টিমেণ্টগুলির সমন্বয়সাধকরূপে দেখা দেয় আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট। ম্যাক্‌ডুগাল এরই নাম দিয়েছেন অধিশাসক সেন্টিমেণ্ট।

আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট (Self-Regarding Sentiment)

প্রত্যেক সেন্টিমেণ্টই কোন বিশেষ বস্তু, ব্যক্তি বা ধারণাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং প্রত্যেকটিরই একটি নিজস্ব সংগঠন ও স্বতন্ত্র গতিধারা আছে। এখন এই বিভিন্ন সেন্টিমেণ্টগুলির মধ্যে যদি পারস্পরিক সমন্বয় না থাকে তবে শিশুর আচরণ পরস্পরবিরোধী ও অসংলগ্ন হয়ে ওঠে। সেইজন্য ব্যক্তিসত্তা বিকাশের শেষ স্তরে দেখা দেয় এই আত্মবোধের সেন্টিমেণ্ট এবং এই সেন্টিমেণ্টকেই কেন্দ্র করে অন্যান্য সেন্টিমেণ্টগুলি একটি সুসংহত সংগঠন তৈরী করে। আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টটি জন্মলাভ করে শিশুর অহংসত্তাকে কেন্দ্র করে। যেহেতু শিশুর অভিজ্ঞতার সকল বস্তুই কোন না কোন দিক দিয়ে শিশুর অহংসত্তার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সেই হেতু শিশুর আর সব সেন্টিমেণ্ট স্বাভাবিক ভাবেই আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টের কর্তৃত্ব ও পরিচালনার অধীনস্থ হয়ে পড়ে।

শিশুর অহংসত্তার সচেতনতা থেকেই এই আত্মবোধের সেন্টিমেণ্টটি জাগে।

নবজাত শিশুর অহম্ সম্বন্ধে কোন বোধ থাকে না, কিন্তু যতই সে পৃথিবীর বিভিন্ন বস্তু এবং ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে ততই সে নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে এবং ক্রমশ অন্যান্য সেন্টিমেন্টের মতই তার সেই নিজস্ব সত্তাকে ঘিরে একটি গভীর প্রক্ষোভমূলক সংগঠন গড়ে ওঠে।

আত্মবোধের সেন্টিমেন্টটি সমগ্র মানসিক সংগঠনের কেন্দ্রস্বরূপ। বিভিন্নধর্মী সেন্টিমেন্টগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বৈষম্য দূর করে এই আত্মবোধের সেন্টিমেন্টই তাদের মধ্যে সংহতি আনে এবং ব্যক্তির নৈতিকবোধের প্রধানতম নির্ণায়ক ও নির্ধারক শক্তিরূপে কাজ করে থাকে।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই আত্মবোধের সেন্টিমেন্টটি শিশুর ব্যক্তিসত্তাগঠনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তি। সুষ্ঠু ও বাঞ্ছিত মানসিক বিকাশের জন্য এই সেন্টিমেন্টটির গঠন অত্যাবশ্যক। সেই জন্য যাতে যথা সময়ে এবং স্বাভাবিকভাবে শিশুর মধ্যে এই সেন্টিমেন্টটি দেখা দেয় তার ব্যবস্থা করাই সমগ্র শিক্ষা প্রচেষ্টার প্রধান উদ্দেশ্য।

শিশুর মধ্যে সুষ্ঠু অহংবোধ জাগরণের দুটি দিক আছে। একটি শিশুর সহজাত শক্তি ও সম্ভাবনাগুলির অবাধ বিকাশ এবং তার অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও ইচ্ছার তৃপ্তিসাধন। আর দ্বিতীয়টি, তার সামাজিক সচেতনতার সুষ্ঠু জাগরণ ও পরিপুষ্টি।

এই উভয় ক্ষেত্রেই শিক্ষক পিতামাতা প্রভৃতির অনেক কিছু করার আছে। শিশুর স্বাভাবিক কর্মপ্রচেষ্টাকে যদি ব্যাহত করা যায়, যদি তার স্বাধীন ইচ্ছায় বাধা দেওয়া হয়, যদি কঠিন শাসনমূলক পরিস্থিতিতে তাকে মানুষ করা হয় তবে অনিবার্যরূপে তার অহংবোধের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তার ফলে তার আত্মবোধের সেন্টিমেন্টটি সুষ্ঠুভাবে জাগতে পারে না। পরিণত জীবনে এই সকল শিশু দুর্বলমনা, অব্যবস্থিতচিত্ত ও উদ্যোগহীন ব্যক্তিরূপে বড় হয়ে ওঠে। অতএব শিশুর অহংবোধের অবাধিত বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন কোন ঘটনা বা পরিস্থিতি শিশুর জীবনে কখনই সৃষ্টি করা উচিত নয়।

এর পর আসে শিশুর সামাজিক সচেতনতা জাগরণের দিকটি। অহংবোধের সুষ্ঠু বিকাশের উপর শিশুর সামাজিক মনোভাবের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর অহম্ জাগে বাস্তবের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এবং এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ সামাজিক প্রকৃতির। শিশু যতই অন্যান্য ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং তাদের সঙ্গে নানা রকম আচরণ সম্পন্ন করে ততই তার মধ্যে এই সামাজিক বোধ জেগে ওঠে এবং সে নিজের অহম্

সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। সে ধীরে ধীবে বুঝতে শেখে যে তার এই সত্তাটি আর সকলের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র অস্তিত্বসম্পন্ন একটি বস্তু।

কিন্তু এই অহম্‌বোধের জাগরণেব সময় যদি শিশুর চতুষ্পার্শ্বের সামাজিক পরিবেশটি সত্যকারের সমাজধর্মী না হয় তাহলে শিশুর অহমের বিকাশ হয়ে ওঠে একমুখী, সমতাবিহীন, অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিময়। এই জন্য প্রযোজন শিশুব চাবপাশেব সমাজটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত কবা যাতে শিশুর প্রতিক্রিয়াগুলি সামাজিক আদর্শ ও মানের অনুগামী হয়। বাড়ীতে বা স্কুলে যেখানে শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলি অনুষ্ঠিত হয় সেখানে যাতে শিশু সত্যকারের সমাজধর্মী পবিবেশের সাহায্য পায় সেদিকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। স্কুলে যৌথ কর্ম-প্রচেষ্টা, খেলাধূলা, সম্মিলিত উদ্যোগ ইত্যাদিব মাধ্যমে শিশুদের উন্মেষমুখী অহংসত্তার স্বাস্থ্যময় বিকাশ ও পরিপোষণের ব্যবস্থা করা উচিত।

আঠার

ব্যক্তিসত্তা (Personality)

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিত্ব সকলের থাকে না। সাধারণত মনে করা হয় যে বিশেষ সৌভাগ্যবান মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেন এবং সেই ব্যক্তিত্বের জোরেই তাঁরা জীবনে সাফল্য ও সম্মান অর্জন করে থাকেন। সাধারণ মানুষ ব্যক্তিত্বরূপ মূল্যবান সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং তার ফলে সারা জীবন অসাফল্য ও অধীনতার মধ্যে তাদের কাটাতে হয়। ব্যক্তিত্বের এই সঙ্কীর্ণ ও লৌকিক ব্যাখ্যাটি কিন্তু মনোবিজ্ঞানে গ্রাহ্য নয়। মনোবিজ্ঞানের সংব্যাখ্যানে প্রত্যেক মানুষই ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিসত্তার অধিকারী, তা সে ব্যক্তিসত্তা দুর্বল হোক্ বা সবলই হোক্, সামাজিক হোক্ বা অসামাজিকই হোক্, স্বাভাবিকই হোক্ বা অস্বাভাবিকই হোক্। ব্যক্তিসত্তা মানবমাত্রেরই অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য, তবে বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিসত্তা বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দেয়।

ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞা

ব্যক্তিসত্তা বস্তুটির নিখুঁত সংজ্ঞা দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব বললেই চলে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের দেওয়া ব্যক্তিসত্তার বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র সংজ্ঞার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী অলপোর্ট (Allport) তাঁর ব্যক্তিসত্তার উপর লিখিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থে[1] ব্যক্তিসত্তার ৫০টি প্রচলিত সংজ্ঞার উল্লেখ করেছেন। এই সংজ্ঞাগুলির মধ্যে প্রচুর বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের সন্ধান পাওয়া যায়। অলপোর্ট এই প্রচলিত সমস্ত সংজ্ঞাগুলিকে বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিসত্তার একটি ব্যাপক সংজ্ঞা তৈরী করেছেন। সেটি হল এই—

'ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে তার যে অনন্য সঙ্গতিবিধান, সেই সঙ্গতিবিধানকে নির্ধারণ করে যে সব জৈব-মানসিক সত্তা, ব্যক্তির মধ্যে সেই সত্তাগুলির প্রগতিশীল সংগঠনের নামই ব্যক্তিসত্তা।'

এই সংজ্ঞাটিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা ব্যক্তিসত্তার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই। যেমন—

প্রথমত, ব্যক্তিসত্তা হল একটি চিরগতিশীল সংগঠন। সংগঠন বলতে

---

1. Personality—Gordon Allport

বোঝায় যে ব্যক্তিসত্তা নিছক কতকগুলি উপাদানের যোগফল নয়, সেগুলির পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল। তাছাড়া এই সংগঠনও চিরস্থায়ী, অপরিবর্তনীয় এবং অমোঘ নয়, এ হল সদাপরিবর্তনশীল, নিয়ত বিকাশমান ও বর্ধনধর্মী। যখন এই সংগঠন যথাযথ ভাবে সম্পন্ন হয় না তখনই অস্বাভাবিক ব্যক্তিসত্তা দেখা দেয়

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিসত্তার উপাদানগুলিকে জৈব-মানসিক সংগঠন (Psycho-physical System) বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জৈব-মানসিক কথাটির অর্থ হল যে এই উপাদানগুলি আংশিক মানসিক, আংশিক দৈহিক অর্থাৎ দেহ ও মন উভয়ের যুগ্ম প্রক্রিয়া থেকেই ব্যক্তিসত্তা জন্ম নেয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে ব্যক্তিসত্তা নিছক মানসিক বা নিছক দৈহিক কিছু নয়, উভয়ের সমন্বয়ে তৈরী একটি স্বতন্ত্র সত্তাবিশেষ। ব্যক্তির অভ্যাস, বিশেষধর্মী বা সাধারণধর্মী মনোভাব, সেন্টিমেন্ট, অন্যান্য মানসিক সংগঠন ইত্যাদি বস্তুগুলি জৈব-মানসিক সত্তার অন্তর্গত।

তৃতীয়ত, ব্যক্তিসত্তা বলতে কোন ব্যক্তির আচরণ বা কাজকে বোঝায় না। বরং ব্যক্তির আচরণ বা কাজের পেছনে যে সংগঠন বা সত্তাটি আছে তাকেই ব্যক্তিসত্তা বলা যেতে পারে। ব্যক্তিসত্তা যে সব উপকরণ দিয়ে তৈরী সেগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টাকে নির্ধারিত করে দেয়। অবশ্য ব্যক্তির এই সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা থেকেই ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ জানা যায়। এই জন্য উপরের সংজ্ঞাতে ব্যবহৃত 'নির্ধারণ করে' ক্রিয়াটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

চতুর্থত, ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে যে সব সঙ্গতিবিধান করে তার প্রত্যেকটি সময়, স্থান ও গুণের দিক দিয়ে অনন্য এবং অপরের সঙ্গে অতুলনীয়।

সব শেষে, ব্যক্তিসত্তাই নির্ধারিত করে পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতি বিধানের প্রচেষ্টাকে। সঙ্গতিবিধান কথাটি কেবলমাত্র প্রক্রিয়া রূপেই সত্য নয়, বিবর্তনের দিক দিয়েও সত্য। প্রাণী বিবর্তনের মূল কথাই হল সঙ্গতিবিধানের ক্রমোন্নতি। ব্যক্তির ভৌগোলিক ও আচরণমূলক, উভয় প্রকার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের সমস্ত প্রচেষ্টাই নিয়ন্ত্রিত হয় তার ব্যক্তিসত্তার দ্বারা। এই দিক দিয়ে ব্যক্তিসত্তাকে ব্যক্তির আত্মসংরক্ষণের প্রণালীবিশেষ বলে বর্ণনা করা যেতে পারে।

উপরের বিশ্লেষণ থেকে এ কথাটি স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে অলপোর্ট তাঁর ব্যক্তিসত্তার সংজ্ঞায় সঙ্গতিবিধান প্রক্রিয়াটির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন

আর সেই সঙ্গে যে সব বৈশিষ্ট্য বা উপাদান এই ব্যক্তিসত্তার বিকাশে উপকরণ-রূপে কাজ করে সেগুলির মাধ্যমেই তিনি ব্যক্তিসত্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এই ব্যক্তিসত্তার উপাদানগুলির তিনি নাম দিয়েছেন সংলক্ষণ (Traits)।

ব্যক্তিসত্তার সংব্যাখ্যান.

আবার অনেক মনোবিজ্ঞানী সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যক্তিসত্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ফ্রয়েড এবং অন্যান্য মনসমীক্ষণবাদীদের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। অলপোর্ট যেমন ব্যক্তিসত্তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন ব্যক্তি-সত্তার উপাদান বা সংলক্ষণের বৈচিত্র্যের দিকে দিয়ে, তেমনই ফ্রয়েড ব্যাখ্যা দিয়েছেন মানবমনের কর্মপ্রেরণা বা প্রেষণার (Motive) বিভিন্নতার দিক দিয়ে। ফ্রয়েড এবং তাঁর অনুগামীরা ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে প্রথমে মানব আচরণের উৎস বা প্রেষণার অনুসন্ধান করেছেন এবং সেই প্রেষণার বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে ব্যক্তিসত্তার বিচার করেছেন। ফ্রয়েড মানুষের প্রেরণামূলক শক্তিটির নাম দিয়েছেন লিবিডো। লিবিডো হল আবার যৌন-ধর্মী এবং শিশুর জন্মের পর থেকেই এই লিবিডো নানা যৌনমূলক পরিণতির মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয় এবং শেষে তার পূর্ণপরিণতিতে গিয়ে পৌছয়। শিশুর ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তার লিবিডোর শৈশবকালীন পরিভ্রমণের উপর। ব্যক্তিসত্তার বৈচিত্র্য, বৈশিষ্ট্য, স্বাভাবিকতা- অস্বাভাবি-কতা, সবই চরমভাবে নির্ধারিত হয় এই লিবিডোর ক্রমবিকাশের প্রকৃতির দ্বারা। এই জন্যই মনঃসমীক্ষকদের মতে ব্যক্তিসত্তার বিকাশে শৈশবকালীন অভিজ্ঞতার মূল্য এত বেশী।

ব্যক্তিসত্তার বিকাশ (Development of Personality)

জন্মের সময় শিশু কোনরূপ ব্যক্তিসত্তা নিয়ে জন্মায় না। তার মধ্যে থাকে কেবল বহুমুখী বৃদ্ধিপ্রচেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টাকে বাস্তবে রূপায়িত করার উপযোগী নানা প্রকৃতিদত্ত সাজসরঞ্জাম। তার দৈহিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক, সামাজিক, নৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকগুলি নিছক সম্ভাবনার রূপ নিয়ে তার মধ্যে নিহিত থাকে। তেমনই আর একদিক দিয়ে জন্মের মুহূর্ত থেকেই তার উপর ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে পরিবেশের বিভিন্ন ও বিচিত্র শক্তিগুলি। এক দিকে শিশুর বহুমুখী বৃদ্ধি-প্রচেষ্টা আর একদিকে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি—এ দু'য়ের মধ্যে যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয় তাই থেকে জন্ম লাভ করে ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা।

ব্যক্তিসত্তার এই গঠনের কাজটি কোনদিনই সম্পূর্ণ বা শেষ হয় না। পরিবেশের বৈচিত্র্য ও পরিবর্তন অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তার মধ্যে ছেদহীনভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দেখা দেয়। এক কথায় ব্যক্তিসত্তা স্থির বা নিশ্চল কোন বস্তু নয়, ব্যক্তিসত্তা একটি সদা বিকাশমান, পরিবর্তনশীল ও গতিধর্মী সত্তাবিশেষ।

যদিও পরিবর্তনশীল তবুও প্রত্যেকের ব্যক্তিসত্তার মধ্যেই একটি মূলগত স্থায়িত্ব আছে এবং তার উপর ভিত্তি করেই আমরা কোন ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে ধারণা গঠন করে থাকি। এই স্থায়িত্বটুকু না থাকলে আমাদের পক্ষে কারও ব্যক্তিসত্তা নিয়ে আলোচনা করাও সম্ভব হত না।

ব্যক্তিসত্তার বিকাশে দুটি প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কার্যকর। সে দুটি হল বিভেদীভবন (Differentiation) ও সমন্বয়ন (Integration)।

ক। **বিভেদীভবন** (Differentiation)

শিশু যখন জন্মায় তখন সে স্বতন্ত্রভাবে কোন বিশেষ একটি আচরণ সম্পন্ন করতে জানে না। সে তখন তার সমস্ত আচরণই সম্পন্ন করে তার সর্বদেহ দিয়ে এবং তার ফলে সমস্ত আচরণই হয়ে ওঠে সামগ্রিক প্রকৃতির। প্রাপ্তবয়স্কদের বিভিন্ন আচরণধারার মধ্যে সুনির্দিষ্ট বিভেদরেখা থাকার জন্য তারা বিভিন্ন আচরণ স্বতন্ত্রভাবে সম্পন্ন করতে পারে। কিন্তু সদ্যজাত শিশুর বিভিন্ন আচারণধারাগুলির তেমন কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা নেই এবং সেজন্য সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক অখণ্ড মিশ্র প্রকৃতির আচরণ সৃষ্টি করে। শিশু যত বড় হতে থাকে তত তার প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে তার আচরণও হয়ে ওঠে অনেক বেশী সুনির্দিষ্ট, নির্ভুল ও কার্যকর। সে তখন বিশেষ উদ্দীপককে বিশেষ প্রতিক্রিয়াটি দিয়ে সাড়া দিতে শেখে। এই প্রক্রিয়াটিকেই বিভেদীভবন বলা হয়। ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে এই প্রক্রিয়াটি হল প্রাথমিক সোপান স্বরূপ।

খ। **সমন্বয়ন** (Integration)

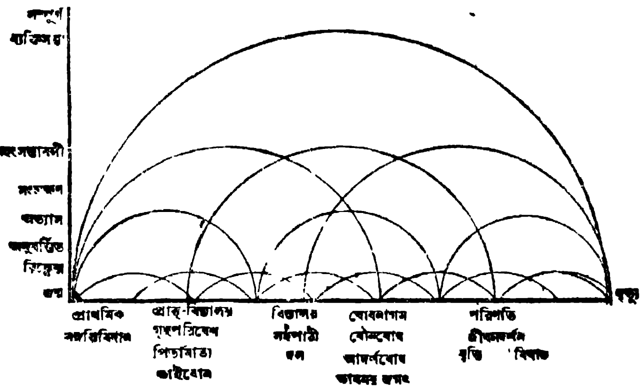
ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটি হল দ্বিতীয় সোপানস্বরূপ এবং এই প্রক্রিয়ার উপরেই ব্যক্তিসত্তার সুসম্পূর্ণ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত। যে সব বৈশিষ্ট্য ও উপকরণ নিয়ে শিশু জন্মায় সেগুলি ক্রমশ পরিবেশের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন মানসিক সংগঠনের রূপ গ্রহণ করে। প্রথম শৈশবে এই সংগঠনগুলি থাকে বিশৃঙ্খল ও অসংহত অবস্থায়। শিশু যত বড় হয় তত সেগুলি পরস্পরের সঙ্গে

ঐক্যবদ্ধ হয়ে সুশৃঙ্খল ও ব্যাপকতর সংগঠনের আকার নেয়। একেই সমন্বয়ন প্রক্রিয়া বলা হয়। এই সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটিও আবার একবারে সংঘটিত হয় না। ব্যক্তির মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে সমন্বয়ন ঘটতে ঘটতে সবশেষে ব্যক্তিসত্তার সৃষ্টিতে পৌঁছে এই সমন্বয়নের কাজটি শেষ হয়।

যে স্তরগুলির মধ্যে দিয়ে সমন্বয়ন প্রক্রিয়াটি অগ্রসর হয় সেগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

গ। অনুবর্তিত রিফ্লেক্স (Conditioned Reflex)

জীবনধারণের উপযোগী প্রাথমিক আচরণগুলি শিশু শেখে যান্ত্রিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। এইগুলিই হল শিশুর জীবনের



[ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের একটি চিত্ররূপ : অলপোর্টের অনুসরণে]

প্রথম শিখন। এই প্রক্রিয়াটির সাহায্যে শিশু নির্ধারিত উদ্দীপকের পরিবর্তে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন উদ্দীপকের প্রতি সাড়া দিতে সমর্থ হয়। এই অনুবর্তিত রিফ্লেক্সগুলিই হল শিশুর সহজতম সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা এবং এইগুলির সাহায্যেই শিশু পরিবর্তিত বা নতুন উদ্দীপকের প্রতি সাফল্যের সঙ্গে সাড়া দিতে পারে।

ঘ। অভ্যাস (Habit)

প্রথম অবস্থায় এই অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়াগুলি অসংহত ও অসংবদ্ধ অবস্থায় থাকে। পরে ধীরে ধীরে সেগুলির মধ্যে সমন্বয়ন দেখা দেয় এবং তাই থেকেই সৃষ্টি হয় বিভিন্ন অভ্যাস। একই উদ্দীপকের উদ্দেশ্যে বারবার অপরিবর্তিত এবং গতানুগতিক সাড়া দেওয়াকেই অভ্যাস বলে। এই অভ্যাস সৃষ্টিকেই সমন্বয়নের প্রথম স্তর বলা যেতে পারে।

ঙ। সংলক্ষণ (Traits)

সমন্বয়নের দ্বিতীয় স্তরে সৃষ্টি হয় নানা ধরনের মানসিক সংগঠন। এগুলি যেমন মোটামুটিভাবে স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়, তেমনি আর এক দিক দিয়ে এগুলি ব্যক্তির আচরণের প্রকৃতি এবং গতিপথ দুইই নির্ণয় করে। মানসিক সংগঠন অনেক প্রকারের হতে পারে। যেমন, মনোভাব, সেন্টিমেন্ট, কমপ্লেক্স, আগ্রহ ইত্যাদি। এই মানসিক সংগঠনগুলি গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির আচরণের মধ্যে সংহতি ও শৃঙ্খলা দেখা দেয়। এই সংগঠনগুলিকেই ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ বলা হয় এবং এইগুলিকেই প্রকৃত পক্ষে ব্যক্তিসত্তার একক রূপে বর্ণনা করা যায়।

চ। অহংসত্তাবলী (Selves)

সমন্বয়নের পরবর্তী স্তরে এই বিভিন্নধর্মী সংলক্ষণগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে সংহতি ও শৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রথম দিকে সংলক্ষণগুলি থাকে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর সম্পর্কশূন্য অবস্থায়। কিন্তু এই স্তর থেকে তাদের মধ্যে একটি সুসংগঠিত রূপ দেখা দিতে সুরু করে। এই সংহতি প্রথমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই ধরনের বিশেষ বিশেষ সংহতি ধারাকে কেন্দ্র করে এক একটি স্বতন্ত্র অহংসত্তার জন্ম হয়। কিন্তু শিশুর সমগ্র অহংবোধের মধ্যে তখনও সামঞ্জস্য ও একতা দেখা দেয় না। তার ফলে এই সময় শিশুর অহম্ সত্তা বিকশিত হলেও সেই অহংবোধ বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

ছ। ব্যক্তিসত্তা (Personality)

সমন্বয়নের শেষ স্তরে ব্যক্তিসত্তা গঠিত হয়। এই স্তরে বিভিন্ন ও স্বতন্ত্র অহংসত্তাগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি একক ও অখণ্ড অহংসত্তার সৃষ্টি করে। ইতিপূর্বে পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে সংগতিবিধানের জন্য ব্যক্তির মধ্যে যত বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া জন্ম নিয়েছিল এই পর্যায়ে সে সবগুলির মধ্যে একটি সংহতি দেখা দেয় এবং ব্যক্তির সকল প্রতিক্রিয়া একটি সামগ্রিক সুসংহত ও অর্থপূর্ণ রূপ ধারণ করে। এই সমন্বয়নের স্তরেই ব্যক্তিসত্তার বিকাশ তার পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছয়।

ব্যক্তিসত্তার বিকাশের সময়গত স্তর

ব্যক্তিসত্তার এই ধারাবাহিক ক্রমবিকাশকে শিশুর সময়গত বয়সের দিক দিয়ে কয়েকটি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। শিশুর জন্মের অব্যবহিত পর থেকেই তার অনুবর্তিত প্রতিক্রিয়াগুলির গঠন সুরু হয়। খাওয়া, শোওয়া,

চলা, কথা বলা জিনিসের নাম শেখা ইত্যাদি কাজগুলি শিশু শেখে অনুবর্তন প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে। অনুবর্তন প্রতিক্রিয়াব প্রাধান্য থাকে দু'তিন বছর পর্যন্ত।

তার পরের ধাপে শিশু যখন কিছুটা বড হয়, যেটিকে আমরা নার্সারী বা প্রাক্‌বিদ্যালয় স্তর বলতে পারি, তখন থেকে শিশুর মধ্যে নানা অভ্যাসের গঠন সুরু হয়। ভাষা আয়ত্ত করা, প্রাথমিক আচরণগুলি অনুষ্ঠান কবা, সামাজিক রীতিনীতি অনুসবণ কবা ইত্যাদি বিভিন্ন অভ্যাস শিশুব মধ্যে ধীবে ধীবে দেখা দেয়। এই সময় শিশুর ব্যক্তিসত্তা গঠনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে তার পরিবার ও পবিবারভুক্ত ব্যক্তিরা, বিশেষ কবে তার মা বাবা ভাই বোন প্রভৃতি।

এর পবেব স্তবে শিশুব চার পাঁচ বছব বয়স থেকে তার বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিযাগুলি ধীরে ধীরে পবিণতি লাভ কবে এবং শিশুর মধ্যে সৃষ্টি হয় সেন্টিমেন্ট, মনোভাব, আগ্রহ, কমপ্লেক্স প্রভৃতি নানা ধরনের মানসিক সংগঠন। বিশেষ বিশেষ বস্তু ও ব্যক্তিকে কেন্দ্র কবে শিশুর অনুরাগ, বিরাগ, আসক্তি, ঘৃণা, ভালবাসা প্রভৃতি গডে ওঠে এবং তাব আচরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষধর্মী ও সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে। এই স্তরে শিশু বাহিরের জগতের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং স্কুল, সহপাঠী, বন্ধু, শিক্ষক প্রভৃতি তার ব্যক্তিসত্তাব গঠনকে বিশেষভাবে নিযন্ত্রিত করে।

এব পবেব স্তরটি হল যৌবনাগমের স্তর। এই সময় শিশুব বিভিন্ন সংগঠনগুলি ধীরে ধীবে সুসংহত হয়ে ওঠে এবং তার মধ্যে অহংবোধ দেখা দেয়। কিন্তু তখনও তার অহংবোধের মধ্যে পূর্ণ সংহতিব অভাব থাকে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিসত্তাব গঠনে তার বহির্জগতেব চেয়ে তার মনোজগতের প্রভাবই অনেক বেশী। এই সময়ে নতুন নতুন ধারণা, আগ্রহ, মনোভাব, আশা ও কল্পনা তাব মানসিক সমন্বয়নকে বিশেষভাবে নিযন্ত্রিত কবে থাকে।

যৌবনাগমের শেষে ব্যক্তির মধ্যে আসে সব দিক দিযে পূর্ণ পরিণতি। এই সমযে তাব ব্যক্তিসত্তা পূর্ণভাবে বিকশিত হযে ওঠে। বহির্জগতের বহুবিধ অভিজ্ঞতাব মধ্যে দিয়ে ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সকল প্রকার প্রতিক্রিয়াই ধীবে ধীবে একটি সুসংহত, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ ধাবণ কবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক, নাগরিক কর্তব্য, দাম্পত্য জীবন, জীবিকা অর্জন, বিনোদনমূলক কাজকর্ম প্রভৃতি বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমষ্টির মধ্যে দিযে ব্যক্তিসত্তা ক্রমশ তার পূর্ণ পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছয়।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ (Personality Traits)

শিশুর বহুমুখী বুদ্ধিপ্রচেষ্টা পরিবেশের সংস্পর্শে এসে তার মধ্যে নানা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করে। এগুলিকে ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ (Porsonality Traits) বলা হয়। প্রতিটি সংলক্ষণেরই একটি মানসিক ও আচরণমূলক দিক আছে। যখন কোন সংলক্ষণ কার্যকর হয়ে ওঠে তখন মনের দিক দিয়ে সংলক্ষণটি কোন বিশেষ মনোভাব বা দৃঢ়বদ্ধ ধারণার সৃষ্টি করে এবং আচরণের দিক দিয়ে ব্যক্তির মধ্যে কোন বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট আচরণ ধারার জন্ম দেয়। যেমন, সামাজিকতা (Sociability) একটি ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ। এটি মনের দিক দিয়ে অপরের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ও প্রীতিময় মনোভাবের সৃষ্টি করে থাকে। আবার এই বৈশিষ্ট্যটিই আচরণের দিক দিয়ে সমাজের অন্যান্য ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গকামনার প্রচেষ্টারূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই রকম সমস্ত ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণেরই মানসিক এবং আচরণমূলক দুটি দিক আছে। এই জন্য এগুলিকে জৈব-মানসিক (Psycho-physical) সত্তা বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলি জন্মায় সহজাত প্রবণতা ও পারিবেশিক শক্তি এ দু'য়ের সংঘাতের ফল থেকে। যদিও কোন সংলক্ষণই চিরস্থায়ী বা একেবারে অচঞ্চল নয়, তবুও এগুলি মোটামুটিভাবে স্থায়ী ও অপরিবর্তনধর্মী এবং এগুলি থেকে যে সব আচরণ সৃষ্ট হয় সেগুলির মধ্যেও যথেষ্ট সামঞ্জস্য ও সঙ্গতি থাকে।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলিকে আমরা ব্যক্তিসত্তার একক বলে বর্ণনা করতে পারি। এগুলির দ্বারাই ব্যক্তিসত্তা গঠিত হয়ে থাকে। তবে কেবলমাত্র সংলক্ষণগুলির সমষ্টি বা যোগফলকে ব্যক্তিসত্তা বলে মনে করলে ভুল হবে। ব্যক্তিসত্তা হল এই সংলক্ষণগুলির নিছক সমষ্টির উপরেও অতিরিক্ত কিছু। ব্যক্তিসত্তা বলতে আমরা যে বস্তুটিকে বুঝি সেটি প্রকৃতপক্ষে প্রকাশ পায় এই বিভিন্নধর্মী সংলক্ষণগুলির সংগঠন থেকে। অর্থাৎ সংলক্ষণগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে যে সমগ্র ও সুসংহত সত্তাটির জন্ম দেয় তাকেই ব্যক্তিসত্তা বলা হয়ে থাকে।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলির পরিকল্পনা সামাজিক পরিমাপের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ যখন আমরা কোন লোককে গম্ভীর, আমুদে, স্বার্থপর বা বন্ধুবৎসল বলে বর্ণনা করি তখন আমাদের মন্তব্যের পেছনে থাকে সামাজিক আদর্শ সম্বন্ধে একটি বিশেষ সচেতনতা। এমন কি ব্যক্তিসত্তার পরিকল্পনাটিই সম্পূর্ণভাবে সামাজিক সংব্যাখ্যানের উপর

প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যক্তি কি প্রকৃতির তা আমরা সুনির্দিষ্টভাবে জানিনা বা জানতে চাইও না। আমরা তাকে বিচার করি সে যে ভাবে নিজেকে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করছে তাই থেকে। কোন লোক যদি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপরের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে তবে তাকে আমরা অভদ্র বা অমার্জিত বলে বর্ণনা করি, প্রকৃতপক্ষে সে যদি অন্য প্রকৃতিরও হয় তা হলেও আমাদের কাছে তা গ্রাহ্য নয়। ইংরাজী পার্সোনালিটি কথাটির উৎপত্তি গ্রীক শব্দ পার্সোনা (Persona) থেকে। পার্সোনার অর্থ হল মুখোস। প্রাচীন গ্রীসে যখন রূপসজ্জার তেমন কোন উন্নতি হয়নি তখন গ্রীক অভিনেতারা দর্শকদের কাছে নিজেদের ভূমিকা বা চরিত্রটির পরিচয় জানাবার জন্য বিশেষ বিশেষ ধরনের মুখোস পরত। অতএব পার্সোনালিটি কথাটির অর্থ হল ব্যক্তি যেভাবে নিজেকে অপরের নিকট প্রকাশ করে তাই।

ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এগুলির দ্বৈততা (Duality)। মানুষের অধিকাংশ সংলক্ষণই দ্বিমুখী-সত্তাবিশিষ্ট। যেমন, সামাজিকতা—অসামাজিকতা, প্রাধান্য—বশ্যতা, অন্তর্বৃততা—বহির্বৃততা ইত্যাদি। কোন সংলক্ষণই চরম অবস্থায় ব্যক্তির মধ্যে থাকে না। যেমন, সম্পূর্ণ সামাজিক বা সম্পূর্ণ অসামাজিক কোন লোকই হয় না। এ দু'য়ের মিশ্রিত রূপই সাধারণত মানুষের মধ্যে দেখা যায়। তবে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিকতার লক্ষণ অধিক পরিমাণে থাকলে তাকে সামাজিক বলা হয় আবার অসামাজিকতার লক্ষণ বেশী থাকলে তাকে অসামাজিক বলা হয়।

গিলফোর্ডের ব্যক্তিসত্তার ফ্যাক্টর

ব্যক্তির আচরণের পর্যবেক্ষণ থেকে ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির স্বরূপ নির্ণয়ের প্রথাই মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু সম্প্রতি উপাদান বিশ্লেষণ বা ফ্যাক্টর এ্যানালিসিস (Factor Analysis) নামে নতুন উদ্ভাবিত একটি গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে আরও নির্ভুল ও সুনির্দিষ্টভাবে ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির প্রকৃতি নির্ণয় করার চেষ্টা হচ্ছে। এই ফ্যাক্টর এ্যানালিসিস প্রক্রিয়ার সাহায্যে গিলফোর্ড ও তাঁর সহকর্মীরা ব্যক্তিসত্তার ১৩টি ফ্যাক্টরের সন্ধান পেয়েছেন। সেগুলি হল এই—১। সামাজিক অন্তর্বৃত্তি (Social introversion), ২। চিন্তামূলক অন্তর্বৃত্তি (Thinking introversion) ৩। বিষণ্ণতা (Depression), ৪। অস্থিরচিত্ততা (Cycloid tendency), ৫। চিন্তাহীনতা (Rhathymia), ৬। সাধারণ সক্রিয়তা (General activity) ৭। প্রাধান্য—বশ্যতা (Ascendance Submission), ৮। পৌরুষ-নারীত্ব

(Masculinity-Feminity), ৯। হীনতা (Inferiority), ১০। স্নায়ু-দুর্বলতা (Nervousness) ১১। বিষয়মুখিতা (Objectivity), ১২। সহযোগিতা (Co-operativeness), ১৩। অমায়িকতা (Agreeableness)।

ক্যাটেলের সংলক্ষণ তালিকা

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ক্যাটেলও (Cattel) ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণের একটি তালিকা দিয়েছেন। তিনি ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণ নির্ণয়ের জন্য নানা বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। ক্যাটেল ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন বাহ্যিক সংলক্ষণ (Surface traits) এবং উৎস সংলক্ষণ (Source traits)। বাহ্যিক সংলক্ষণ বলতে সেই সব সংলক্ষণকে বোঝায় যেগুলি ব্যক্তির আচরণে সরাসরি প্রকাশ পায়। যেমন, আবেগশীলতা হল একটি বাহ্যিক সংলক্ষণ। কোন ব্যক্তি যদি এই সংলক্ষণটির অধিকারী হয় তাহলে সেটি তার বাহ্যিক আচরণেই প্রকাশ পাবে। উৎস সংলক্ষণগুলি ব্যক্তির ভিতর নিহিত থাকে, বাইরে থেকে প্রকাশ পায় না। কিন্তু সেগুলি ব্যক্তির ব্যক্তি-সত্তাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং তার বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। যেমন, প্রভুত্বপ্রিয়তা হল একটি উৎস সংলক্ষণ। এটি সরাসরি ব্যক্তির কোন আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না, যদিও তার বহু আচরণের প্রকৃতি এই সংলক্ষণের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। ক্যাটেল তাঁর পরীক্ষণের ফলাফল থেকে ১২টি উৎস সংলক্ষণ এবং ২০টি বাহ্যিক সংলক্ষণের নাম দিয়েছেন।

এর পরে ক্যাটেল ফ্যাক্টর এ্যানালিসিস পদ্ধতির প্রয়োগ করে ১৬টি ফ্যাক্টরের সন্ধান পান। তাঁর বর্ণিত ১২টি উৎস সংলক্ষণের সঙ্গে আরও ৪টি সংলক্ষণ যোগ করে নীচের ফ্যাক্টরের তালিকাটি তিনি গঠন করেন। ক্যাটেলের দেওয়া তালিকাটিতে প্রায় প্রতিটি ফ্যাক্টরের দুটি করে বিপরীতধর্মী সংলক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—

১। প্রাক্ষোভিক চরমভাব—প্রাক্ষোভিক সংযতভাব (Cyclothymia—Schizothymia).

২। বুদ্ধি—ক্ষীণবুদ্ধিতা (General Intelligence—Mental Defect).

৩। প্রাক্ষোভিক স্থায়িত্ব—সাধারণ মনোব্যাধিপ্রবণতা (Emotional stability—General neuroticism).

৪। প্রভুত্ব—বশ্যতা (Dominance—Submission)।

৫। উচ্ছ্বাসপ্রবণতা—সংযত অভিব্যক্তি (Surgency—Desurgency).

৬। সুপরিণত চরিত্র—অপরিণত নির্ভরতাপ্রবণ চরিত্র (Positive character—Immature dependent character)

৭। দুঃসাহসিক সক্রিয়তা—অন্তর্বৃত্তি (Adventurousness—Introversion).

৮। প্রক্ষোভমূলক অনুভূতিপ্রবণতা—কঠিন পরিপক্কতা (Emotional sensitivity—Tough maturity).

৯। সন্দিগ্ধমনা চাপা—বিশ্বাসপরায়ণ খোলা মন (Paranoid schizothymia—Trustful accessibility).

১০। দায়িত্বহীন অসাংসারিকতা—ব্যবহারিক সচেতনতা (Bohemianism—Practical concernedness).

১১। কৃত্রিমতা—সরলতা (Sophistication—Simplicity).

১২। সন্দিগ্ধচিত্ততা—বিশ্বাসপ্রবণতা (Suspiciousness--Trustfulness)

১৩। পরিবর্তনপ্রিয়তা—রক্ষণশীলতা (Radicalism—Conservatism)

১৪। আত্মনির্ভরতা—সংকল্পহীনতা (Self-sufficiency—Lack of resolution).

১৫। ইচ্ছানিয়ন্ত্রণ এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা (Will control and character stability).

১৬। স্নায়বিক উত্তেজনা—(Nervous tension).

ব্যক্তিসত্তার টাইপ (Personality Types)

বহু প্রাচীনকাল থেকেই ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের নানা রকম প্রচেষ্টা হয়ে এসেছে। প্রাচীন পরিমাপের প্রচেষ্টাগুলি প্রধানত দুটি বস্তুর পর্যবেক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, প্রথম দেহগত বৈশিষ্ট্য এবং দ্বিতীয় মনঃপ্রকৃতির বিভিন্নতা।

প্রাচীনকালে প্রায়ই হাত, পা, মুখ, চোখ, কান, নাক, ভ্রূ প্রভৃতির গঠনবৈচিত্র্য বিচার করে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করা হত। যেমন, মহাভারতে ছদ্মবেশী অর্জুনের বর্ণনায় দেখা যায় যে আজানুলম্বিত বাহু, প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা ইত্যাদি প্রতিভাবান্ পুরুষের লক্ষণ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে। দেহগত বৈশিষ্ট্য বা মনঃপ্রকৃতিগত বিভিন্নতা অনুযায়ী ব্যক্তিসত্তার যে শ্রেণী-বিভাগ করা হয় তাকে সাধারণত ‘টাইপ’ (Type) বলা হয়ে থাকে।

গলের মস্তিকতত্ত্ব (Gall's Phrenology)

ব্যক্তিসত্তার টাইপের যে তত্ত্বটি সর্বপ্রথম প্রসিদ্ধি লাভ করে সেটি হল গলের (Gall) মস্তিষ্ক-তত্ত্ব (Phrenology)। এই তত্ত্ব অনুযায়ী মনের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে মিল রেখে মস্তিষ্কের মধ্যে বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্র আছে। এই কেন্দ্রগুলি মস্তিষ্কের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থিত এবং যে কেন্দ্রটি আকৃতিতে যত বড় হবে সেই কেন্দ্রসংশ্লিষ্ট বিশেষ মানসিক শক্তিটি তত প্রবল হবে। গল দাবী করতেন যে তিনি কোন ব্যক্তির মাথার পরীক্ষা করে বলতে পারেন যে তার কোন শক্তিকেন্দ্রটি আকৃতিতে কত বড়। উদাহরণস্বরূপ, মনোযোগ-রূপ মানসিক প্রক্রিয়াটির জন্য মস্তিষ্কে একটি নির্দিষ্ট শক্তিকেন্দ্র আছে এবং ঐ শক্তিকেন্দ্রটির উপরিভাগের মাথার খুলির গঠন পরীক্ষা করে গল বলতে পারতেন যে কোন বিশেষ ব্যক্তির মনোযোগের শক্তি কতটুকু। এই ভাবে বুদ্ধি, বিচারকরণ, স্মৃতি, কল্পন প্রভৃতি সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়াগুলিরই শক্তির পরিমাণ মস্তিষ্ক পরীক্ষা করে বলা যায় বলে গল দাবী করতেন। ব্যাপক পরীক্ষণ থেকে পরে প্রমাণিত হয়েছে যে গলের এই তত্ত্বটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও কল্পনাপ্রসূত এবং বর্তমানে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়েছে।

বিংশ শতাব্দীতে এই ধরনের দৈহিক বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি-সত্তার টাইপের নানা বিভাগের উল্লেখ করেন ইয়ুং (Jung), ক্রেৎসমার (Kretschmer), সেলডন (Sheldon), ষ্টিভেন্স (Stevens) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা। এই ধরনের কয়েকটি ব্যক্তিসত্তার টাইপের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

ইয়ুঙের টাইপ (Jung's Types)

প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইয়ুং (Jung) ব্যক্তিসত্তার একটি টাইপমূলক শ্রেণী-বিভাগ করেছেন। তিনি সমস্ত মানুষকেই দু'ভাগে ভাগ করেছেন—অন্তর্বৃত্ত (Introvert) ব্যক্তিসত্তাসম্পন্ন এবং বহির্বৃত্ত (Extrovert) ব্যক্তিসত্তা-সম্পন্ন। ফ্রয়েডের মত ইয়ুঙের মতে ব্যক্তির লিবিডো হল তার সম্পূর্ণ প্রাণশক্তির ধারক। এই লিবিডো যখন বাইরের দিকে উদ্দিষ্ট হয় অর্থাৎ যখন বাইরের ব্যক্তি, বস্তু, কাজকর্ম প্রভৃতিতে তার প্রাণশক্তি নিজের তৃপ্তি খুঁজে পায় তখন তার ব্যক্তিসত্তাকে বহির্বৃত্ত বলা হয়। আর যখন তার প্রাণশক্তি অন্তরাভি-মুখী হয় অর্থাৎ যখন দিবাস্বপ্ন, অবাস্তব কল্পনা, আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা প্রভৃতিতেই তার সমস্ত শক্তি ব্যাপৃত থাকে তখন তার ব্যক্তিসত্তাকে অন্তর্বৃত্ত বলা হয়। যে

ব্যক্তি বহির্বৃত হয় সে প্রকৃতিতে সমাজপ্রিয় ও সঙ্গকামী হয়ে থাকে। সে নানা বাহ্যিক আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে এবং সকলের সঙ্গে মেলামেশা, সামাজিক অনুষ্ঠান, দলমূলক কাজকর্ম ইত্যাদিতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে। এরাই সমাজসেবী, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতা প্রভৃতি হয়েথাকে। যে ব্যক্তি অন্তর্বৃত সে প্রকৃতিতে নিঃসঙ্গতাপ্রিয়, চিন্তাশীল এবং আত্মকেন্দ্রিক হয়। সামাজিক মেলামেশা থেকে সে যতটা পারে দূরে থাকে এবং নিজের মনেব অভ্যন্তবে এক নিজস্ব জগৎ তৈরী করে সেখানেই সে বাস করে।

মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে ইয়ুং এইভাবে দু'শ্রেণীতে ভাগ করলেও এই ধবনের সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ বাস্তবে পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায় তা হল এ দু'ধবনেরই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মিশ্রপ্রকৃতির ব্যক্তি। তবে কারও মধ্যে অন্তর্বৃতির মাত্রা বেশী থাকে কারও মধ্য বা বহির্বৃতির মাত্রা বেশী থাকে। সম্পূর্ণ অন্তর্বৃত বা সম্পূর্ণ বহির্বৃত এই দুই কাল্পনিক চরম ক্ষেত্রেব ঠিক মাঝখানে আমরা এমন এক শ্রেণীর ব্যক্তির অস্তিত্ব ধরে নিতে পারি যারা অর্ধেক অন্তর্বৃত এবং অর্ধেক বহির্বৃত। এই ধরনের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোককে আমরা উভবৃত (Ambivert) বলতে পারি। বাস্তবে এই উভবৃত ব্যক্তিসত্তাসম্পন্ন লোকই অধিকসংখ্যায় পাওয়া যায। এঁদের বৈশিষ্ট্য হল যে এঁরা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে অন্তর্বৃত, আবাব বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বহির্বৃত হয়ে ওঠেন।

ক্রেৎসমারের টাইপ (Kretschmer's Types)

ক্রেৎসমার ছিলেন একজন মানসিক ব্যাধিব চিকিৎসক। তিনি পর্যবেক্ষণ করে দেখেন যে বিশেষ বিশেষ মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী বিশেষ বিশেষ দৈহিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায়। যেমন, যারা সিজোফ্রেনিয়া রোগে আক্রান্ত তারা প্রায়ই লম্বা, রোগা, ওজনে হাল্কা ও সরু মুখসম্পন্ন ব্যক্তি হয়। আবার যারা ম্যানিক ডিপ্রেসিভ রোগের রোগী, তারা খর্বকায়, মোটাসোটা ও গোলাকার মুখবিশিষ্ট হয়ে থাকে। এর পর ক্রেৎসমার সুস্থ মানুষেব ব্যক্তিসত্তা পর্যবেক্ষণ করেন এবং দীর্ঘ পর্যবেক্ষণেব পব একটি নতুন ধরনের টাইপমূলক শ্রেণীবিভাগের প্রবর্তন করেন।

তাঁব মতে সমস্ত মানুষকে চারটি টাইপে ভাগ করা যায়, যথা—(১) পিকনিক (Pyknik), (২) এস্থেনিক (Aesthenic), (৩) হাইপোপ্লাস্টিক (Hypoplastic) এবং (৪) এথলেটিক (Athletic)। এই চার ধরনের টাইপেরই সুনির্দিষ্ট দৈহিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্য আছে।

পিকনিক টাইপের ব্যক্তিরা দেখতে খর্বকায়, মোটাসোটা এবং গোলাকার দেহবিশিষ্ট হন। মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এঁদের সাইক্লোথিম (Cyclothyme) বলা হয়। এঁদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এঁরা প্রক্ষোভের দিক দিয়ে চরমভাবাপন্ন হন, অর্থাৎ এঁরা যখন উত্তেজিত হন তখন অত্যন্ত বেশী মাত্রায় হন, আর যখন নিরুৎসাহ হন তখন চরমভাবে হন। এঁরা সহজেই আনন্দিত হন, আবার সহজেই বিষণ্ন হয়ে পড়েন। প্রকৃতিতে এঁরা মিশুকে, আবেগ-প্রবণ, বাস্তববাদী এবং সহিষ্ণু হয়ে থাকেন। এই সাইক্লোথিম শ্রেণীভুক্ত লোকেরা মানসিক বিকারগ্রস্ত হলে ম্যানিক-ডিপ্রেসিভ রোগে আক্রান্ত হন। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল, রাশিয়ার জননেতা ক্রুশ্চেভ প্রভৃতি হলেন পিকনিক সাইক্লোথিম টাইপের আদর্শ দৃষ্টান্ত।

এস্থেনিকরা আকৃতিতে দীর্ঘকায়, হাল্কা ও রোগা হয়ে থাকেন। মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এঁদের সিজোথিম (Schizothyme) বলা হয়। প্রক্ষোভের সৃষ্টি ও প্রকাশে এঁরা খুবই সংযত এবং প্রকৃতিতে এঁরা স্বাবলম্বী, সতর্ক, আদর্শবাদী, অসহিষ্ণু ও রুক্ষ হয়ে থাকেন। এঁরা প্রায়ই বাস্তব থেকে পালিয়ে গিয়ে নিজেদের অবাস্তব কল্পনার রাজ্যে আশ্রয় নিয়ে থাকেন। এই সিজোথিম শ্রেণীভুক্ত লোকেরাই যখন মানসিক বিকারগ্রস্ত হন তখন তাঁদের মধ্যে সিজোফ্রেনিয়া নামে রোগ দেখা দেয়। রাজা গোপালাচারী, কৃপালনী, জহরলাল, ইংলণ্ডের স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস প্রভৃতি হলেন এই টাইপের দৃষ্টান্ত।

হাইপোপ্লাস্টিকদের দৈহিক বৃদ্ধি অপরিণত অবস্থায় থাকে এবং সেই জন্য তাঁরা হীনমন্যতাবোধ (Sense of inferiority) থেকে ভুগে থাকেন।

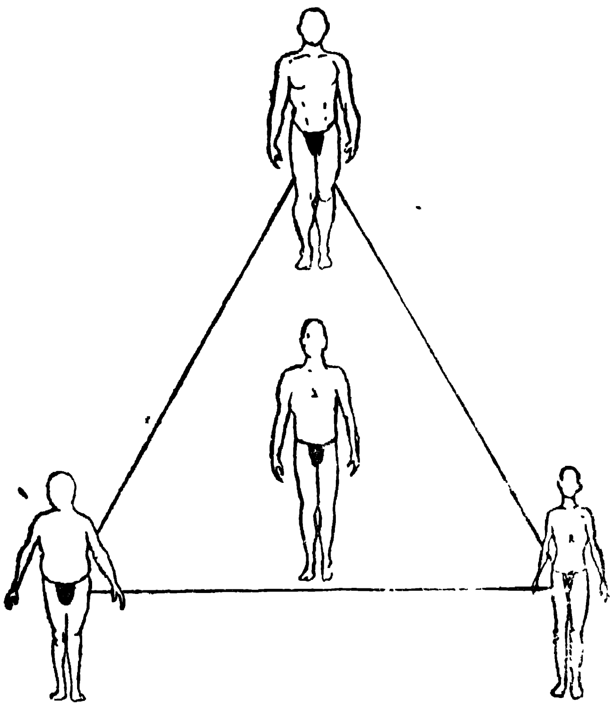
এথলেটিক টাইপের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিরাই ক্রেৎসমারের মতে দেহ ও মনের দিক দিয়ে স্বাভাবিক ও আদর্শ মানুষ। এঁরা দৈহিক গঠনের দিকে দিয়ে যেমন সমতাসম্পন্ন তেমনই প্রক্ষোভের সৃষ্টি ও প্রকাশের দিক দিয়েও এঁরা সাম্যভাবাপন্ন।

ক্রেৎসামারের এই শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে লৌকিক অভিজ্ঞতা ও ধারণার যথেষ্ট মিল পাওয়া যায়। কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগকে সুনির্দিষ্ট ও নিখুঁত বলে মেনে নিতে অনেক মনোবিজ্ঞানীরই আপত্তি আছে। কেননা বাস্তবক্ষেত্রে এ ধরনের সুনির্দিষ্ট শ্রেণীবিভাগ মানুষের মধ্যে দেখা যায় না।

সেলডনের টাইপ (Seldon's Types)

ক্রেৎসমারের মত ব্যক্তিসত্তার টাইপ নিয়ে আধুনিককালে ব্যাপক গবেষণা চালান সেলডন (Sheldon) এবং স্টিভেন্স (Stevens)। তাঁরা প্রায় ৪০০

যুবকের নগ্নদেহের ছবি পর্যবেক্ষণ করে তিনটি বিভিন্ন টাইপের নামকরণ করেন। (১) এণ্ডোমর্ফ (Endomorph), এঁরা আকৃতিতে গোলাকার, কোমলদেহ এবং উদরপ্রদেশের প্রাধান্যসম্পন্ন। (২) মেসোমর্ফ (Mesomorph), এঁরা প্রশস্ত স্কন্ধবিশিষ্ট, কঠিন এবং পেশীর প্রাধান্যসম্পন্ন এবং (৩) এক্টোমর্ফ (Ectomorph) এঁরা দুর্বল-দেহবিশিষ্ট, শীর্ণ এবং চর্ম ও স্নায়ুর প্রাধান্যসম্পন্ন।



সেলডনের ব্যক্তিসত্তার টাইপের ত্রিকোণ

বাঁ কোণে এণ্ডোমর্ফ, ডান কোণে এক্টোমর্ফ এবং সব উপরে মেসোমর্ফ। এই তিনটি কোণের ঠিক কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আদর্শ টাইপের মানুষ! যে কোন ব্যক্তি এই ত্রিকোণের কোন না কোন একটি জায়গায় পড়বেনই।

সেলডন প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি সাত মাত্রার স্কেলে পরিমাপ করেন। এই স্কেলেতে যে চরম এণ্ডোমর্ফ তার স্কোর দাঁড়াচ্ছে ৭১১ (অর্থাৎ এণ্ডোমর্ফিতে তার স্কোর ৭ মাত্রা, মেসোমর্ফিতে ১ মাত্রা, এক্টোমর্ফিতে ১ মাত্রা), চরম মেসোমর্ফের স্কোর হল ১৭১ (অর্থাৎ এণ্ডোমর্ফিতে তার স্কোর

১ মাত্রা, মেসোমর্ফিতে ৭ মাত্রা, এক্টোমর্ফিতে ১ মাত্রা) এবং চরম এক্টোমর্ফের স্কোর হচ্ছে ১১৭ (অর্থাৎ এণ্ডোমর্ফিতে তার স্কোর ১ মাত্রা, মেসোমর্ফিতে ১ মাত্রা, এক্টোমর্ফিতে ৭ মাত্রা)। বাস্তবে অবশ্য এই ধরনের চরম দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় না। প্রকৃত হিসাব ধরতে গেলে সাধারণ মানুষের স্কোর ৪৪৪-এর কাছাকাছি দাঁড়ায়। কিন্তু বাস্তবে যা দেখা যায় তাতে কোন একটি বিশেষ টাইপের দিকে প্রত্যেক ব্যক্তির কিছুটা ঝোঁক থাকে এবং অন্য দুটির প্রতি কম ঝোঁক থাকে। ফলে ৫২৩ বা ২৫১ বা ১৩৫ এই ধরনের স্কোরই সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে বেশী দেখা যায়। কোন ব্যক্তির এই দৈহিক পরিমাপকে তার সোমাটোটাইপ নাম দেওয়া হয়েছে।

এইবার সেলডন এই দৈহিক টাইপগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানসিক বৈশিষ্ট্যের তিনটি শ্রেণী বিভাগ করলেন এবং সেগুলির নাম দিলেন ১) ভিসেরোটনিক (Viscerotonic), (২) সোমাটোটনিক (Somatotonic) এবং (৩) সেরিব্রোটনিক (Cerebrotonic)। এই মানসিক টাইপগুলির প্রত্যেকটির তিনি ২০টি করে বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট করে দিলেন।

ভিসেরোটনিকদের মধ্যে পরিপাচনমূলক ও বৃদ্ধিমূলক ও কাজের প্রাধান্য থাকে। এঁরা দৈহিক আরামপ্রিয় হন, উৎসব, হৈ-চৈ, বাহ্যিক অভিব্যক্তি ভালবাসেন এবং একা থাকা পছন্দ করেন না। এঁরা সহিষ্ণু হন, স্নেহ প্রশংসা, মনোযোগের প্রত্যাশী হন এবং মনের আবেগ বিনা বাধায় প্রকাশ করেন।

সোমাটোটনিকদের মধ্যে উদ্যমশীল ও প্রচেষ্টামূলক কাজের প্রাধান্য দেখা যায়। এঁরা কাজে কর্মে, কথায়, ভঙ্গীতে প্রভুত্বপ্রিয় হন। এঁরা উত্তেজনাপূর্ণ ও অভিযানমূলক কাজ পছন্দ করেন। অপরের অনুভূতির প্রতি এঁরা উদাসীন এবং সরাসরি কাজ করার পক্ষপাতী। আচরণে এঁরা উদ্যমশীল, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও আক্রমণধর্মী।

সেরিব্রোটনিকদের মধ্যে সামাজিক সঙ্গতিবিধানের অভাব ও অবদমিত আচরণের প্রাধান্য দেখা যায়। এঁরা প্রায়ই ভয়ে ভয়ে সময় কাটান এবং সামাজিক মেলামেশা এড়িয়ে চলেন। এঁদের মধ্যে সাধারণত আত্মসংযম ও আত্মবিশ্বাসের অভাব দেখা যায়।

সেলডন পরীক্ষণের দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে তাঁর বর্ণিত দৈহিক টাইপ ও মানসিক টাইপের মধ্যে প্রচুর সঙ্গতি আছে। যেমন, মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে এণ্ডোমর্ফরা ভিসেরোটনিক টাইপের অন্তর্গত, মেসোমর্ফরা সোমাটো-টনিক টাইপের অন্তর্গত এবং এক্টোমর্ফরা সেরিব্রোটনিক টাইপের অন্তর্গত।

পরিসংখ্যানমূলক পদ্ধতিতে সহপরিবর্তনের (Correlation) মান নির্ণয় করে দেখা গেছে যে এণ্ডোমর্ফ ও ভিসেরোটনিকদের মধ্যে সহপরিবর্তনের মান ·৭৫, মেসোমর্ফ ও সোমাটোটনিকদের মধ্যে এই মান ·৮২ এবং এক্টোমর্ফ ও সেরিব্রোটনিকদের মধ্যে ·৮১।

আইসেঙ্কের ব্যক্তিসত্তা আয়তন (Eysenck's Personality Dimension)

প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মনোবিজ্ঞানী আইসেঙ্ক ব্যক্তিসত্তার বিশ্লেষণে আধুনিক পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগ করেন এবং তার উপর ভিত্তি করে এক নতুন ধরনের শ্রেণীবিভাগের প্রবর্তন করেন। তিনি পূর্বগামীদের মত ব্যক্তিসত্তাকে কয়েকটি নির্দিষ্ট টাইপে ভাগ করেন নি। তার পরিবর্তে তিনি দেখিয়েছেন যে ব্যক্তিসত্তার মধ্যে তিনটি ফ্যাক্টর বা আয়তন (Dimension) আছে। সেই আয়তন তিনটি হল—

(১) অন্তর্বৃত্তি-বহির্বৃত্তি (Introversion-Extroversion) (২) মনোব্যাধি প্রবণতা (Neuroticism) এবং (৩) মনোবিকার প্রবণতা (Psychoticism)।

এই তিন শ্রেণীর ব্যক্তিসত্তার আয়তনের মধ্যে কোন পারস্পরিক সম্বন্ধ নেই, অথচ এই তিনটি আয়তনই কম বেশী মাত্রায় সকলের মধ্যে বর্তমান। এই বিভাগ অনুযায়ী মনোব্যাধি বা মনোবিকারগ্রস্ত মানুষের সঙ্গে স্বাভাবিক মানুষের কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নেই। যে পার্থক্য পাওয়া যায় তা নিছক মাত্রাগত। এই তিনটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য ছাড়া আইসেঙ্কের মতে ব্যক্তিসত্তার মধ্যে আরও কতকগুলি সংকীর্ণ ফ্যাক্টর আছে, যেমন, রক্ষণশীলতা—প্রগতিশীলতা (Conservatism—Radicalism), সরলতা—জটিলতা (Simplicity-Complexity) এবং দৃঢ়চিত্ততা—কোমলচিত্ততা (Toughmindedness—Tendermindedness)।

ফ্রয়েডীয় টাইপ (Freudian Type)

ফ্রয়েড এবং তাঁর মনঃসমীক্ষণবাদের অনুগামীরা ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তাকে তার অভ্যন্তরীণ জীবনী-শক্তির বিচিত্র স্বরূপ ও গতিপথের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষ করে বহুমুখী পরিবেশের প্রভাবের ফলরূপে যে সব তৃপ্তি ও ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা ব্যক্তির জীবনে দেখা দেয় এবং যেগুলি ব্যক্তির যৌনতার বিকাশকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে সেই সব অভিজ্ঞতার উপরই মনঃসমীক্ষকেরা বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ফ্রয়েড ব্যক্তিসত্তার কতকগুলি টাইপের উল্লেখ করেছেন।

১। **মৌখিক রতিমূলক টাইপ** (Oral-Erotic Type)

এই টাইপটি আবার দু'রকমের হতে পারে, যথা—সক্রিয় দংশনকামী টাইপ (Active Biting Type) এবং নিষ্ক্রিয় চোষণকামী টাইপ (Passive Sucking Type)। মৌখিক সক্রিয় শ্রেণীর ব্যক্তিরা ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় রূপে অতিমাত্রায় চিবান ও কামড়ানোর আশ্রয় নিয়ে থাকে। এরা সাধারণত নিরাশাবাদী, সন্দিগ্ধমনা এবং হিংসাপরায়ণ হয়ে থাকে; কিন্তু মৌখিক নিষ্ক্রিয় টাইপের ব্যক্তিরা অপর পক্ষে ব্যর্থতা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য শিশুজনোচিত আচরণের আশ্রয় নেয়। এরা আশাবাদী, নির্ভরশীল ও অপরিণত চরিত্রসম্পন্ন হয়ে থাকে। এরা সাধারণত কাজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চায় এবং আশা করে যে অপরে তাদের যত্ন নেবে এবং তাদের প্রয়োজন মেটাবে।

২। **পায়ু-রতিমূলক টাইপ** (Anal-Erotic Type)

অতি-কৃপণতা, একগুয়েমী, শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি এই ধরনের ব্যক্তির মধ্যে চরম মাত্রায় দেখা দিয়ে থাকে। এই টাইপের মধ্যেও আবার দুটি বিভাগ আছে। প্রথমটি ধর্ষণকামী (Sadistic Type) আর দ্বিতীয়টি নিষ্ক্রিয় টাইপ (Passive Type)। প্রথম টাইপের লোকেরা অপরকে নির্যাতন করে বা কষ্ট দিয়ে আনন্দ পায়। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরের ব্যক্তিরা আত্মনির্যাতনেই আনন্দ পায়।

৩। **উপস্থ টাইপ** (Genital Type)

এই টাইপের মধ্যে আবার দুটি বিভাগ আছে। প্রথমটি লৈঙ্গিক টাইপ (Phallic Type)। এটি হল উপস্থ টাইপের প্রাথমিক বা অপরিণত স্তর। এই টাইপের ব্যক্তির চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হল প্রদর্শন-প্রবণতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দাম্ভিকতা, আত্মরতি ইত্যাদি।

দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে স্বাভাবিক উপস্থ টাইপের ব্যক্তিরা। উপস্থ টাইপের সুষ্ঠু বা সুপরিণত বিকাশ থেকেই স্বাভাবিক মানুষ দেখা দেয়। স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে যৌনতা কোন অস্বাভাবিক স্থলে সংবদ্ধ হয়ে থাকে না এবং স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হয়ে তার স্বাভাবিক পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সংযম, নির্ভরশীলতা ও

স্বাবলম্বন, আত্মপ্রিয়তা ও পরার্থপরতা প্রভৃতি বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সমতা দেখা যায়।

বলা বাহুল্য ফ্রয়েডের দেওয়া ব্যক্তিসত্তার শ্রেণীবিভাগটি অস্বাভাবিক মানুষকে ভিত্তি করেই গড়া। পুরোপুরি কোন একটি বিশেষ টাইপে পড়ে এমন ব্যক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। তবে এই শ্রেণীবিভাগগুলিতে ব্যক্তিসত্তাকে যে কতকগুলি অতি গভীর ও দৃঢ়বদ্ধ মানসিক প্রবণতার দিক দিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ (Measurement of Personality)

বহু প্রাচীনকাল থেকেই মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের প্রচেষ্টা চলে এসেছে। এই প্রচেষ্টাগুলি প্রধানত পর্যবেক্ষণ এবং সংব্যাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্যক্তির আচরণ, কথাবার্তা, কাজকর্ম, বিশেষ প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করে এবং সেগুলিকে যথাযথ ব্যাখ্যা করে ব্যক্তিসত্তা সম্বন্ধে ধারণা তৈরী করা হত। কিন্তু এতদিন এই পর্যবেক্ষণের পন্থাগুলি মোটেই বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। তাছাড়া আগে পর্যবেক্ষণের পরিস্থিতিকেও সুনিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব হত না। সব শেষে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির অভাবে লব্ধ ফলাফলের ব্যাখ্যাও মোটেই নির্ভুল এবং নির্ভরযোগ্য হত না। এই সব নানা কারণে ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের প্রাচীন পদ্ধতিগুলি নিতান্তই অসম্পূর্ণ ছিল।

আধুনিককালে ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের বহু আধুনিক পন্থা ও পদ্ধতির উদ্ভাবন ঘটেছে।

এই পদ্ধতিগুলিও পর্যবেক্ষণ এবং সংব্যাখ্যানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রাচীন পদ্ধতিগুলির সঙ্গে তুলনায় আধুনিক পদ্ধতিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি অনেক বেশী বিজ্ঞানভিত্তিক এবং ত্রুটিহীন। পর্যবেক্ষণের পদ্ধতিগুলিও বৈচিত্র্য এবং কার্যকারিতার দিক দিয়ে অনেক বেশী বিজ্ঞান-ভিত্তিক ও উন্নত হয়েছে। তাছাড়া আধুনিক সংব্যাখ্যান পদ্ধতিও আগের চেয়ে অনেক বেশী নৈর্ব্যক্তিক ও নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে। নীচে ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের কয়েকটি আধুনিক পদ্ধতির আলোচনা করা হল।

১। সাক্ষাৎকার (Interview)

ব্যক্তিকে সামনা সামনি সাক্ষাৎ করে তার অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার নাম সাক্ষাৎকার। ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের পদ্ধতিরূপে এটিই হল প্রাচীনতম। বর্তমানে বহু

অভিনব বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হলেও মনোবিজ্ঞানীরা সাক্ষাৎকারের মূল্য ও উপকারিতাকে মোটেই অস্বীকার করেন না।

তবে সাক্ষাৎকার মাত্রেই কার্যকর হয় না। কারণ, প্রথমত, যে ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার করা হচ্ছে তার উত্তরগুলি সত্য হওয়া না হওয়া তার উপর নির্ভর করছে। দ্বিতীয়ত, অনেক সময় ব্যক্তির সত্য উত্তর দেবার ইচ্ছা থাকলেও লজ্জা বা সঙ্কোচের জন্য নির্ভুল উত্তরটি সে সাক্ষাৎকারকের সামনে দিতে পারে না। তৃতীয়ত, সাক্ষাৎকারকের ব্যক্তিগত প্রভাব প্রচুর পরিমাণে সাক্ষাৎকারের ফলকে প্রভাবিত করে। দেখা গেছে যে সাক্ষাৎকারের সাফল্য তিনটি বস্তুর উপর নির্ভর করে। প্রথম, সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন কৌশলগুলি যেন সাক্ষাৎকারকের আয়ত্তে থাকে। দ্বিতীয়, যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হচ্ছে সে যেন সাক্ষাৎকারকের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে প্রস্তুত থাকে এবং তৃতীয়, সাক্ষাৎকারক যে প্রশ্নগুলির সাহায্যে ব্যক্তির নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন সেগুলি যেন সুচিন্তিত এবং কার্যকর হয়।

সাক্ষাৎকারের প্রধান ত্রুটি হল যে এর মধ্যে পরিমাপকের নিজস্ব প্রভাব খুব বেশী কাজ করে। বর্তমানে সেই জন্য সাক্ষাৎকারকে ব্যক্তিপ্রভাব-বর্জিত করার চেষ্টা হচ্ছে। সাক্ষাৎকারের প্রশ্নগুলির প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট করে এবং প্রশ্ন করার পদ্ধতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করে সাক্ষাৎকারের নির্ভরশীলতা বাড়াবার চেষ্টা চলছে।

২। কেস হিস্ট্রী পদ্ধতি (Case History Method)

ব্যক্তির অতীত আচরণ, শৈশবকালীন অভিজ্ঞতা, জীবন বিকাশের গতিধারা, শিক্ষা, বংশ-পরিচয় প্রভৃতি থেকে তার ব্যক্তিসত্তার একটি মোটামুটি ধারণা করা যায়। এই পদ্ধতিটি মনোব্যাধির চিকিৎসায় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১]

৩। রেটিং পদ্ধতি (Rating Method)

রেটিং পদ্ধতির মৌলিক নীতিটি হল কোন ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অপরের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। বহুপ্রকারের রেটিং পদ্ধতি প্রচলিত আছে। তার মধ্যে রেটিং স্কেল (Rating Scale) এবং সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি (Sociometric Method) বর্তমানে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

ক। রেটিং স্কেল (Rating Scale)

কোন ব্যক্তির সম্পর্কে কারও পর্যবেক্ষণের ফলাফল বা মতবাদকে সুসংহত

১। পৃঃ ১৯

পন্থায় প্রকাশ করার একটি বিশেষ প্রণালীকে রেটিং স্কেল বলে। শিক্ষক বা তত্ত্বাবধায়ক, সহপাঠী বা সহকর্মী প্রভৃতিরা রেটিং স্কেলের সাহায্যে কোন ব্যক্তি বা কোন দলভুক্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ করতে পারেন। অনেক সময় নিজেই নিজের রেটিং করা যায়।

রেটিং স্কেল পদ্ধতিতে যে কোন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে সেটির বিভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। একেই স্কেল বলা হয়। তারপর ঐ স্কেলের কোন্ পর্যায়ে বিশেষ কোন্ ব্যক্তির স্থান সেটা পরিমাপক নির্ণয় করেন। যেমন, সামাজিক রূপ বৈশিষ্ট্যটির নিম্নরূপ রেটিং স্কেল তৈরী করা যেতে পারে।

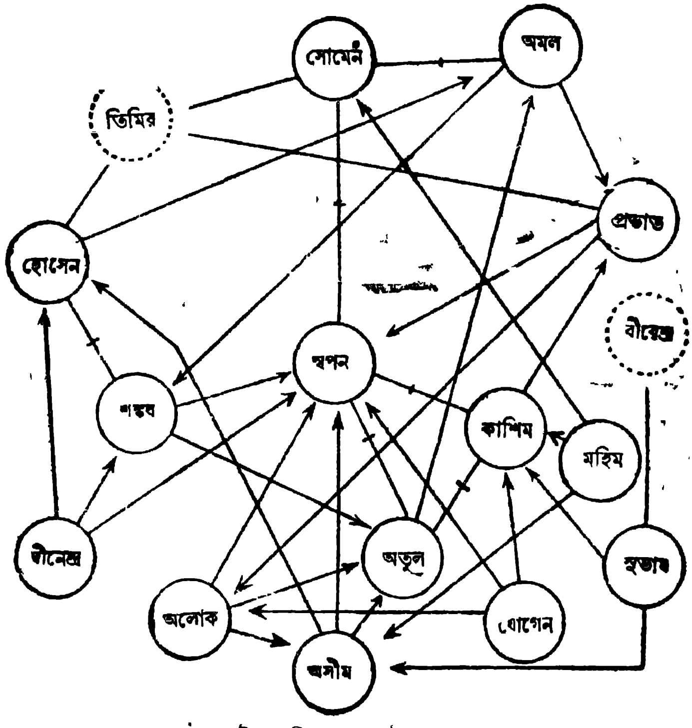
প্রঃ—লোকটি সামাজিক না অসামাজিক ?

	অতিরিক্ত সামাজিক	বেশ সামাজিক	মাঝামাঝি সামাজিক	বেশ অসামাজিক	অতিরিক্ত অসামাজিক
ক	...	×	..	...	...
খ	...	...	×	...	...
গ	...	...	...	...	×

উপরের স্কেলটিতে ক, খ, গ, এই তিন ব্যক্তির সামাজিকতার দিক দিয়ে কোথায় কার স্থান তা নিরূপণ করা হয়েছে। রেটিং স্কেলের মাত্রানুযায়ী বিভাগটি সাধারণত তিন, পাঁচ বা সাত সংখ্যার হতে পারে এবং সেইমত স্কেলটিকে তিন-মাত্রা (Three-point), পাঁচ-মাত্রা (Five-point) বা সাত-মাত্রার (Seven-point) স্কেল বলা হয়ে থাকে। উপরের দৃষ্টান্তটি একটি পাঁচ-মাত্রার স্কেল।

রেটিং স্কেল ব্যক্তিসত্তা-পরিমাপের সত্যকারের কোন নতুন পদ্ধতি নয়। এটি নিছক পর্যবেক্ষণকে ভিত্তি করে মতামত জ্ঞাপন এবং লিপিবদ্ধ করার একটি সুসংহত পন্থামাত্র। ফলে যে পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে রেটিং করা হয় তার চেয়ে এটি খুব বেশী কার্যকর হতে পারে না। বিশেষ করে যে বিষয়টি যত বেশী পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পাওয়া যায় সেই বিষয়েতেই রেটিং তত বেশী নির্ভরযোগ্য হয়. তাছাড়া একজনমাত্র পর্যবেক্ষকের রেটিং'র উপরও খুব বেশী নির্ভর করা যায় না। সেজন্য আজকাল রেটিং পদ্ধতিতে একের বেশীর পরিমাপকারী নিয়োগ করা হয়ে থাকে। যদি গড়ে অন্তত ৮ জন পরিমাপকারীর রেটিং নেওয়া যায় তবে ফলাফলটি নির্ভরযোগ্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। রেটিং পদ্ধতির আর একটি ত্রুটি 'হেলো' এফেক্ট' (Halo Effect) নামে পরিচিত। যখন কোন

ব্যক্তিব একটি সংলক্ষণের মান সম্পর্কে আগে থেকেই একটি ধারণা তৈরী হয়ে থাকে তখন তার অন্য কোন সংলক্ষণের রেটিং-এর বেলাতে সেই ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা তাব হয় বেশী নয় কম রেটিং করে ফেলি। একেই 'হেলো এফেক্ট' বলা হয়। এই 'হেলো এফেক্টে'র প্রভাব দূর করতে হলে কোন দলভুক্ত সমস্ত ব্যক্তিকে আগে একটিমাত্র সংলক্ষণেব উপর রেটিং করে নিতে হয়। তাব পরে সমস্ত ব্যক্তিকে আব একটি সংলক্ষণের উপর রেটিং এবং তাব পরে আর একটিব উপব এবং এইভাবে পর পব সব কটি সংলক্ষণেব উপব



[একটি সোসিওগ্রামের উদাহরণ]

রেটিং করতে হয়। এই পদ্ধতিতে রেটিং করলে একটি সংলক্ষণের রেটিং আর একটি সংলক্ষণের রেটিংকে বিশেষ প্রভাবিত করে না।

খ। সমাজমিতিমূলক পদ্ধতি (Sociometric Method)

ব্যক্তির জীবনধারণের প্রচেষ্টায় এবং তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে সামাজিক শক্তিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। সেই জন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানে সামাজিক সংগঠনের রূপ এবং বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে

ব্যক্তির নিজের স্থান পর্যবেক্ষণের জন্য নানা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি বিশেষ দলের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ক-বৈচিত্র্যকে একটি চিত্রের আকারে রূপ দেওয়া যেতে পারে। এই চিত্রটিকে সোসিওগ্রাম (Sociogram) বলা হয়। কোনও বিশেষ দলের সোসিওগ্রাম তৈরী করবার সময় দলের প্রত্যেকটি সদস্যকে প্রশ্ন করা হয় যে বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে সে দলের কাকে কাকে পছন্দ করে। যেমন, স্কুলের কোন বিশেষ ক্লাশের প্রত্যেকটি ছেলেকে প্রশ্ন করা হল যে কোন একটি কাজ করবার সময় তার সঙ্গী বা সহকর্মী রূপে সে ক্লাশের কাকে কাকে পছন্দ করে। তারা যে উত্তর দেবে তা থেকে বিভিন্ন ছেলেদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি চিত্ররূপ আঁকা যেতে পারে। আগের পাতায় এই ধরনের একটি সমাজমিতিমূলক চিত্র বা সোসিওগ্রাম দেওয়া হল।

ঐ সোসিওগ্রামটিতে কোন স্কুলের একটি বিশেষ ক্লাশের ছেলেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের চিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে। তীর ও সরল রেখাগুলির দ্বারা ছেলেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতিটি জ্ঞাপন করা হচ্ছে। দুটি ছেলের নাম তীর দিয়ে যুক্ত থাকলে এই বুঝতে হবে যে, যে ছেলেটির প্রতি তীরটি উদ্দিষ্ট তাকে অপর ছেলেটি পছন্দ করে। কিন্তু সেই ছেলেটি অপর ছেলেটিকে পছন্দ করে না। যেমন, উপরের ছবিতে হোসেন অমলকে পছন্দ করে কিন্তু অমল হোসেনকে পছন্দ করে না। আর যেখানে কেবলমাত্র একটি সরল রেখার দ্বারা দুটি নাম সংযুক্ত সেখানে বুঝতে হবে যে ছেলে দু'জনই পরস্পরকে পছন্দ করে। যেমন, সোমেন অমলকে পছন্দ করে, অমলও সোমেনকে পছন্দ করে।

সেই সোসিওগ্রাম থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে ক্লাশে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছেলে হচ্ছে স্বপন। স্বপনকে ৯টি ছেলে পছন্দ করে, কিন্তু স্বপন মাত্র কাশিম, অতুল আর সোমেনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে। ক্লাশের মধ্যে বীরেন্দ্র হল পরিত্যক্ত ছেলে। তাকে কেউই পছন্দ করে না। তিমিরের ক্ষেত্রটিও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। হোসেন, সোমেন এবং প্রভাত এই তিনটি মাত্র বন্ধু নিয়ে তিমির নিজস্ব একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করছে।

সমাজতত্ত্বের পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় সোসিওগ্রাম যে যথেষ্ট সাহায্য করে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া ব্যক্তিগত সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা সম্পর্কেও নানা তথ্য সোসিওগ্রাম থেকে সংগ্রহ করা যায়। দলের অন্তর্গত অন্যান্য সদস্যদের প্রতি ব্যক্তির কি মনোভাব এবং ব্যক্তির প্রতিও অন্যান্য সদস্যদের কি মনোভাব এই দু'ধরনের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যই আমরা সোসিওগ্রাম থেকে পেতে পারি।

৪। প্রশ্নাবলী (Questionnaire)

ব্যক্তিসত্তা পরিমাপের একটি বহুল প্রচলিত পদ্ধতি হল ব্যক্তিকে তার মনোভাব, মতবাদ, বিশ্বাস, আচরণ, অতীত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা। যখন ব্যক্তিকে সাক্ষাৎ করে সামনাসামনি প্রশ্ন করা হয় তখন তাকে সাক্ষাৎকার বলে। কিন্তু এ ধরনের সাক্ষাৎকারে প্রায়ই ব্যক্তির স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ থাকে এবং নানা কারণে ব্যক্তি স্বাভাবিক এবং সহজভাবে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু যদি সরাসরি প্রশ্ন করার পরিবর্তে ব্যক্তিকে প্রশ্নগুলি লিখিতরূপে দেওয়া যায় এবং তার পক্ষে অনুকূল পরিবেশে তাকে স্বাভাবিকভাবে লিখিত উত্তর দেবার সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে দেখা গেছে যে তাতে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য ফল পাওয়া যায়। গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের দিক দিয়ে এই ধরনের সুনিয়ন্ত্রিত পরিবেশে সুপরিকল্পিত প্রশ্নাবলী অনেক বেশী কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছে

তাছাড়া প্রশ্নাবলীতে প্রশ্নগুলি লিখিত অবস্থায় থাকার জন্য মৌখিক প্রশ্নের চেয়ে অনেক দিক দিয়ে সেগুলির বেশী উপকারিতা আছে। প্রথমত, প্রশ্নগুলির সংগঠনকে সুনিয়ন্ত্রিত বা আদর্শায়িত করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন লোকের উপর প্রশ্নগুলি প্রযুক্ত হওয়ার ফলে প্রতিটি প্রশ্নের কি ধরনের উত্তর পাওয়া যায় তারও একটি সুনির্দিষ্ট বিবরণী রাখা সম্ভব হয়।

(ক) নির্বাচনী প্রশ্নাবলী (Screening Questions)

কতকগুলি ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নাবলী নিছক নির্বাচন বা বাছাই করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলিকে নির্বাচনী প্রশ্নাবলী বলা হয়। বিশেষধর্মী মনোবৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ বা বিশেষপ্রকারের চিকিৎসার প্রয়োজন আছে এমন ব্যক্তিদের সাধারণ ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে বাছাই করে নেওয়ার জন্য এই ধরনের ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নাবলী ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর নির্বাচনী প্রশ্নাবলী প্রথম তৈরী করেন উডওয়ার্থ ১৯১৮ সালে। এটির নাম সাইকোনিউরটিক ইনভেন্টরি। এই প্রশ্নাবলীটির সাহায্যে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানে অসমর্থ ব্যক্তিদের স্বাভাবিক ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া সম্ভব হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই ধরনের অনেকগুলি নির্বাচনী প্রশ্নাবলী প্রস্তুত করা হয়।

(খ) ব্যক্তিসত্তানির্ণায়ক প্রশ্নাবলী (Personality Inventory)

ব্যক্তিসত্তার বিশেষ বিশেষ দিকগুলি পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে আর এক ধরনের প্রশ্নাবলী গঠন করা হয়ে থাকে। এগুলিকে আমরা ব্যক্তিসত্তা-নির্ণায়ক

প্রশ্নাবলী বলতে পারি। এই ধরনের প্রশ্নাবলীতে বিশেষ একটি বা একাধিক সংলক্ষণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিকে ভিত্তি করে প্রশ্ন তৈরী করা হয়। পরে সেই প্রশ্নগুলির উত্তর থেকে ঐ এক বা একাধিক সংলক্ষণ ব্যক্তির মধ্যে কি মাত্রায় আছে তা নির্ণয় করা হয়। একটি সুপরিচিত ব্যক্তিসত্তানির্ণায়ক প্রশ্নাবলীর নাম হল মিনেসোটা মাল্টিফেসিক পার্সোনালিটি ইনভেন্টরি (Minnesota Multiphasic Personality Inventory or MMPI)। এই প্রশ্নাবলীতে মোট ৫৫০টি উক্তি আছে। প্রতেকটি উক্তি এক একটি কার্ডে ছাপা থাকে। এই উক্তিগুলি পড়ে ব্যক্তিকে বলতে হয় যে উক্তিটি তার ক্ষেত্রে সত্য কি মিথ্যা।

ব্যক্তির দেওয়া উত্তরগুলি থেকে তার ব্যক্তিসত্তার নানা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্তমানে এই ধরনের অনেকগুলি ব্যক্তিসত্তানির্ণায়ক প্রশ্নাবলী তৈরী হয়েছে। তার মধ্যে বার্নরয়টার পার্সোনালিটি টেস্টটির নাম উল্লেখযোগ্য।

সাধারণত ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নাবলীর প্রশ্নগুলি একটি মুদ্রিত পুস্তিকার আকারে থাকে। কখন কখন স্বতন্ত্র কার্ডেও এগুলি মুদ্রিত হয়। এই প্রশ্নগুলির উত্তরে ব্যক্তিকে সাধারণত 'হঁা' বা 'না' বা 'জানিনা' এই তিনটির একটি উত্তর দিতে হয়।

৫। উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Factor Analysis)

ব্যক্তিসত্তার আধুনিকতম ও বিজ্ঞানসম্মত পরিমাপ পদ্ধতিটি ফ্যাক্টর এ্যানালিসিস নামক আধুনিক গাণিতিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতিটিতে ব্যক্তিসত্তাসূচক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহ-পরিবর্তনের মান নির্ণয় করে ব্যক্তিসত্তার মৌলিক উপাদানগুলির (Factors) প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতির প্রথম প্রয়োগ করেন গিলফোর্ড এবং তাঁর সহকর্মীরা। তাঁদের পর্যবেক্ষণ থেকে ব্যক্তিসত্তার ১৩টি মৌলিক উপাদানের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই মৌলিক উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে তাঁরা ব্যক্তিসত্তার নানারকম প্রশ্নাবলী রচনা করেন। তার মধ্যে একটি প্রখ্যাত প্রশ্নাবলীর নাম হল গিলফোর্ড-জিমারম্যান টেম্পারামেন্ট সার্ভে। এই অভীক্ষাটিতে উপাদান-বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাওয়া ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণগুলিকে ভিত্তি করে প্রশ্নাবলী রচনা করা হয়েছে। এতে প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যের উপর ৩০টি করে মোট ৩০০টি প্রশ্ন আছে। সেই দশটি বৈশিষ্ট্য হল

এই :—১। সাধারণ সক্রিয়তা (General activity)। সংযম (Restraint) ৩। প্রাধান্য (Ascendance) ৪। সামাজিকতা (Sociability) ৫। প্রক্ষোভ-মূলক স্থৈর্য (Emotional stability) ৬। বিষয়মুখিতা (Objectivity) ৭। বন্ধুত্ব (Friendliness) ৮। চিন্তাশীলতা (Thoughtfulness) ৯। ব্যক্তিগত সম্পর্ক (Personal relation) এবং ১০। পৌরুষ (Masculinity)।

ক্যাটেলও উপাদান বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে একটি ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা প্রস্তুত করেন। সেটি পার্সোনালিটি ফ্যাক্টর কোশ্চেনেয়ার (Personality Factor Questionnaire) নামে পরিচিত। ক্যাটেলের মতে ব্যক্তিসত্তার উপাদান ১৬টি। এই ১৬টি উপাদানকে ভিত্তি করে ক্যাটেলের প্রশ্নাবলীটি রচিত হয়েছে।[১]

৬। **বাধ্যতামূলক নির্বাচন পদ্ধতি** (Forced-Choice Technique)

এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির সামনে দুটি বিকল্পমূলক প্রশ্ন উপস্থাপিত করে তার মধ্যে থেকে একটিকে নির্বাচন করতে বলা হয়। কখনও কখনও আবার তিনটি বিকল্প দিয়ে বলা হয় যে ঐগুলির মধ্যে যেটি তার কাছে সব চেয়ে বেশী কাম্য এবং যেটি তার কাছে সব চেয়ে কম কাম্য—সেই দুটি নির্বাচন করতে। বিকল্প-গুলি এমন শ্রেণীর হওয়া চাই যাতে সেগুলি আকর্ষণীয়তার দিক দিয়ে একই স্তরের বলে মনে হয়। যেমন,

তুমি কোন্‌টি পছন্দ কর? নিম্ন বেতনে চিত্তাকর্ষক কাজ করতে, না, উচ্চ বেতনে একঘেয়ে কাজ করতে?

কিংবা, তুমি কোন্ ধরনের খ্যাতি পছন্দ কর? শান্ত বলে পরিচিত হতে, না, বন্ধুভাবাপন্ন বলে পরিচিত হতে?

তুমি কি ধরনের স্বামী পছন্দ কর? ধনী অথচ অশিক্ষিত, না, দরিদ্র কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত।

সাধারণ প্রচলিত ব্যক্তিসত্তার প্রশ্নাবলীর চেয়ে এই বাধ্যতামূলক-নির্বাচন পদ্ধতিতে অস্পষ্টতা ও অনির্দিষ্টতার স্থান অনেক কম।

৭। **প্রতিফলন অভীক্ষা** (Projective Test)

প্রতিফলন অভীক্ষাগুলিতে ব্যক্তিসত্তার পরিমাপের সম্পূর্ণ অভিনব পন্থার অনুসরণ করা হয়েছে। এতে ব্যক্তিকে এমন একটি কাজ করতে বা সমস্যা সমাধান করতে দেওয়া হয় যেটির গঠন অনির্দিষ্ট ও অসম্পূর্ণ প্রকৃতির এবং তার

১। পৃঃ ২৬২

ফলে সেটি সম্পন্ন বা সমাধান করতে গিয়ে ব্যক্তিকে বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়ার আশ্রয় নিতে হয়। এখানে অভীক্ষক আশা করেন যে ব্যক্তি তার এই স্বতঃপ্রণোদিত কাজগুলির মধ্যে দিয়ে নিজের ধারণা, মনোভাব, ইচ্ছা, ভয় দুশ্চিন্তা প্রভৃতির স্বরূপগুলি প্রকাশ করে ফেলবে। প্রতিফলন কথাটি অবশ্য ফ্রয়েডের কাছ থেকে নেওয়া। ফ্রয়েডের ব্যাখ্যায় প্রতিফলন কথাটির অর্থ হল নিজের কোন বৈশিষ্ট্য অপরের মধ্যে প্রতিফলিত হতে দেখা। এখানে অবশ্য কথাটি এই অর্থে নেওয়া হয়েছে যে ব্যক্তি এই অভীক্ষাগুলি সমাধান করার সময় তার আচরণের মধ্যে দিয়ে নিজের কতকগুলি অপ্রকাশিত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিসত্তার লক্ষণ বাইরে প্রতিফলিত বা প্রকাশিত করে ফেলে।

প্রথমত এই অভীক্ষাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলিতে যে সব কাজ দেওয়া হয় সেগুলির কোন নির্দিষ্ট সংগঠন বা রূপ থাকে না এবং তার ফলে এগুলির ক্ষেত্রে বহু বিভিন্ন প্রকারের প্রতিক্রিয়া সম্ভবপর। এই কাজগুলি সম্পন্ন করতে অভীক্ষার্থী তার কল্পনাশক্তির বাধাহীন প্রয়োগ করতে পারে এবং যে ভাবে সে ঐ অস্পষ্ট বহু-অর্থবোধক বস্তুগুলির ব্যাখ্যা করে তাই থেকে তার মনের অপ্রকাশিত বিভিন্ন দিকগুলির সন্ধান পাওয়া যায়।

দ্বিতীয়ত অভীক্ষাগুলিতে অভীক্ষার যথার্থ প্রকৃতি বা সংব্যাখ্যানের পদ্ধতিটি অভীক্ষার্থীর কাছ থেকে গোপন রাখা সম্ভব হয়। কেননা অভীক্ষক অভীক্ষার্থীর প্রদত্ত উত্তর বা প্রতিক্রিয়ার যে কি ধরনের বা কি ভাবে ব্যাখ্যা করবেন সে সম্পর্কে কিছুই তার জানা থাকে না। তার ফলে তার পক্ষে অভীক্ষার ফলাফলের উপর কোনরূপ সচেতন হস্তক্ষেপ করা সম্ভব হয় না।

তৃতীয়ত, এই অভীক্ষাগুলির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলির পরিমাপের প্রচেষ্টা সামগ্রিক প্রকৃতির। ব্যক্তিসত্তার কোন একটি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা এগুলির উদ্দেশ্য নয়। অভীক্ষার্থীর ব্যক্তিসত্তার একটি অখণ্ড রূপ বা তার মনের সংগঠনের একটি সম্পূর্ণ ধারণা এগুলি থেকে পাওয়া যায়। সেদিক থেকে এই অভীক্ষাগুলির একটি স্বতন্ত্র মূল্য আছে। কয়েকটি সুপ্রচলিত প্রতিফলন অভীক্ষার বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

ক। রর্স্যা ইঙ্কব্লট অভীক্ষা (Rorschach Inkblot Test)

প্রতিফলন অভীক্ষাগুলির মধ্যে সব চেয়ে প্রখ্যাত হল রর্স্যা ইঙ্কব্লট অভীক্ষাটি। এই অভীক্ষাটি সুইজারল্যাণ্ডবাসী হারম্যান রর্স্যা (Herman Rorschach) নামে একজন মনশ্চিকিৎসক উদ্ভাবন করেন।

একটি কাগজের উপর এক বিন্দু কালি রেখে যদি কাগজটিকে ঠিক ঐ বিন্দুটির মাঝামাঝি ভাঁজ করা হয় তাহলে ঐ বিন্দুটি থেকে কাগজটির উপর একটি কালির ছবি তৈরী হবে যার খণ্ডার্ধ দুটি মোটামুটি একই রকমের দেখতে



[রর্স্যা ইঙ্কব্লট টেস্টের একটি ছবি]

এই ধরনের দশটি কালির ছাপ নিয়ে রর্স্যার অভীক্ষাটি গঠিত। এই কালির ছাপগুলি একটির পর একটি ব্যক্তির সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং সেগুলি দেখে তার মনে যে সব ধারণা বা কল্পনার উদয় হয় সেগুলি তাকে বর্ণনা করতে বলা হয়। ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি এমনই অনির্দিষ্ট প্রকৃতির যে এগুলি ব্যক্তির মনে নানা বিভিন্ন ধরনের ভাব ও চিন্তার সৃষ্টি করে। ব্যক্তির নিজস্ব মানসিক সংগঠন, মনঃপ্রকৃতি, বিশ্বাস, দৃঢ়বদ্ধ ধারণা প্রভৃতির দ্বারাই এই ভাব ও চিন্তার স্বরূপ নিয়ন্ত্রিত হয়। সেই জন্য ছবিগুলি দেখে ব্যক্তি যে ব্যাখ্যা দেয় তা থেকে তার মানসিক সংগঠন, প্রবণতা, মনোভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় বলে মনোবিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন। বর্তমানে এই অভীক্ষাটি মনশ্চিকিৎসার উপকরণরূপে বহুল ব্যবহৃত হয়।

। কাহিনী-সংবোধন অভীক্ষা

(Thematic Apperception Test or TAT)

আর একটি অতি প্রচলিত প্রতিফলন অভীক্ষার নাম হল মারে (Murray)

৬ মর্গান (Morgan) কর্তৃক উদ্ভাবিত কাহিনী সংবোধনের অভীক্ষা। এই অভীক্ষাটি ১৯টি ছবি দিয়ে গঠিত। প্রত্যেকটি ছবির বিষয়বস্তু অনির্দিষ্ট প্রকৃতির এবং তার বহু রকমের ব্যাখ্যা হতে পারে। অভীক্ষার্থীকে এই ছবিগুলি একটি একটি করে দেওয়া হয় এবং সেগুলির উপর ছোট ছোট নিবন্ধ বা কাহিনী লিখতে বলা হয় অভীক্ষার্থী ঐ ছবিগুলির উপর যে ধরনের কাহিনী লেখে বা সেগুলির যে ধরনের ব্যাখ্যা সে দেয় তা থেকে তার অপ্রকাশিত মানসিক ইচ্ছা বা দ্বন্দ্বের স্বরূপ অভীক্ষকের নিকট ব্যক্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী কাহিনী সংবোধন অভীক্ষাও তৈরী হয়েছে। এটি শিশু সংবোধন অভীক্ষা (Children's Apperception Test) নামে পরিচিত।



[কাহিনী সংবোধন অভীক্ষার একটি ছবি]

গ। **শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা** (Word Association Test)

এই অভীক্ষাটি প্রতিফলন অভীক্ষাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। এতে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দ একটির পর একটি করে অভীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় এবং শব্দটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রথমেই যে শব্দটি বা চিন্তাটি অভীক্ষার্থীর মনে আসে সেইটি তাকে বলার নির্দেশ দেওয়া হয়। অভীক্ষার্থীর উত্তর দিতে যতটা সময় লাগে সেই সময় এবং প্রদত্ত উত্তরের প্রকৃতি এ দু'য়েরই বিচার করা হয়। যদি অভীক্ষার্থী উত্তর দিতে দেরী করে তাহলে সিদ্ধান্ত করা হয় যে সে তার প্রথম মনে আসা শব্দটি কোন কারণে বলতে চায় না। উত্তরের প্রকৃতি থেকে অভীক্ষার্থীর অচেতনে নিহিত কমপ্লেক্স এবং অবদমিত ইচ্ছার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ইউঙ্ (Jung) এই শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষার যথেষ্ট উন্নতিসাধন করেন। কেন্ট ও রোজানফ (Kent and Rosanoff) মনোব্যাধি চিকিৎসার উপকরণরূপে ব্যবহারের জন্য একটি বিশেষ শব্দানুষঙ্গ অভীক্ষা প্রস্তুত করেন।

ঘ। অন্যান্য প্রতিফলন অভীক্ষা

উপরের অভীক্ষাগুলি ছাড়াও প্রতিফলন অভীক্ষার শ্রেণীভুক্ত বহু বিভিন্ন ও বিচিত্র অভীক্ষা উদ্ভাবিত হয়েছে। যেমন, বাক্য সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা, রোজেনউইগের ব্যর্থতামূলক চিত্র, পর্যবেক্ষণ অভীক্ষা, অসম্পূর্ণ চিত্র অঙ্কন অভীক্ষা, ইত্যাদি। বাক্য সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষাটিতে এমন কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য অভীক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করা হয় যেগুলি বিভিন্ন উপায়ে সম্পূর্ণ করা যায়। এই সম্পূর্ণকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা ব্যক্তির মনোভাব, প্রবণতা ও মানসিক সংগঠনের একটি নির্ভরযোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। তেমনই আর একটি অভীক্ষায় কতকগুলি অসম্পূর্ণ চিত্র অভীক্ষার্থীকে সম্পূর্ণ করতে দেওয়া হয়। অভীক্ষার্থীর ছবিগুলি সম্পূর্ণকরণের প্রণালী পর্যবেক্ষণ করে তার মানসিক সংগঠন সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। রোজেনউইগের ব্যর্থতামূলক চিত্র পর্যবেক্ষণের অভীক্ষাটিতে কতকগুলি সাধারণ ব্যর্থতা বা আশাভঙ্গের ছবি দৃষ্টান্ত রূপে দেওয়া থাকে এবং সেগুলি দেখে অভীক্ষার্থীর মনে কি ধরনের মনোভাবের সৃষ্টি হয় তা তাকে বর্ণনা করতে বলা হয়।



সংবোধন অভীক্ষার একটি ছবি

প্রশ্নাবলী

1. Write an essay on Measuring Personality. (B Ed. 1953, '54)

Ans. (পৃঃ ২৮০—পৃঃ ২৯১)

2. What do you understand by the term 'Personality'? Show how the social environment influences the development of personality.

Ans. (পৃঃ ২৬২—পৃঃ ২৬৮)

উনিশ

চরিত্র (Character)

ব্যক্তিসত্তার মত চরিত্রের কোনও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়, যদিও চরিত্র কথাটি আমাদের লৌকিক ভাষণে বহু-ব্যবহৃত শব্দাবলীর অন্যতম।

প্রচলিত ভাষণে চরিত্র কথাটির বহু বিভিন্ন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হতে দেখা গেছে। অতএব প্রথমে চরিত্র শব্দটির অর্থের একটি পরিষ্কার সংব্যাখ্যান প্রয়োজন।

চরিত্র ও ব্যক্তিসত্তা (Character and Personality)

অনেক মনোবিজ্ঞানী চরিত্র ও ব্যক্তিসত্তাকে সমার্থক বলে গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে অলপোর্টের (Allport) ব্যাখ্যাটি উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্র একই বস্তুকে দুটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখার জন্য দেওয়া দুটি বিভিন্ন নাম। যখন কতকগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমাজ-অনুমোদিত মানের দিক দিয়ে ব্যক্তিসত্তার মূল্য নির্ধারণ করা হয় তখন আমরা তাকে চরিত্র বলি। আর যখন এধরনের কোনরূপ মূল্য নির্ধারণের প্রচেষ্টা থাকে না তখন আমরা ব্যক্তিসত্তা কথাটি ব্যবহার করে থাকি। এক কথায় চরিত্র হল মূল্য-নিরূপিত ব্যক্তিসত্তা এবং ব্যক্তিসত্তা হল মূল্য-নিরূপণহীন চরিত্র।[১]

বস্তুত চরিত্র ও ব্যক্তিসত্তাকে দুটি পৃথক সত্তা বলে মনে করা যায় না। দুটিই ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক বহুবিধ বৈশিষ্ট্যের সমষ্টিমূলক সংগঠনের নাম। তবে যখন এই বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে বিশেষ কতকগুলিকে আমরা স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করি এবং সেগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র সংগঠনটির মূল্য নির্ধারণ করি, তখনই চরিত্র কথাটি ব্যবহার করে থাকি। যে বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা চরিত্রের কথা উত্থাপন করি সেগুলি মূলত সামাজিক ও নৈতিক মানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সমাজের একজন সদস্যরূপে ব্যক্তির যে সকল রীতিনীতি মেনে চলা উচিত এবং প্রচলিত নৈতিক আদর্শের যে সকল অনুশাসন তার অনুসরণ করা উচিত সেগুলি সম্বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট মান বা আদর্শের ধারণা সকল সমাজেই আছে। এই সাধারণ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যখন ব্যক্তির আচরণ-বৈশিষ্ট্যের বিচার করি তখন আমরা চরিত্র কথাটি ব্যবহার করি। উদাহরণস্বরূপ, সততা বলতে আমরা যা বুঝি তা

১. Character is personality evaluated and personality is character devaluated – Allport

প্রকৃতপক্ষে এক বিশেষ শ্রেণীর আচরণের নাম। যখন ব্যক্তিসত্তার কোনরূপ মূল্য নির্ধারণের কথা ওঠে না তখন নিছক আচরণরূপে সততার অন্যান্য আচরণ থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্র কোন মূল্য নেই। কিন্তু যখনই সামাজিক বা নৈতিক আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এটির বিচার করা হয় তখনই সততা ব্যক্তির চরিত্রের একটি অতি-গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। অতএব দেখা যাচ্ছে চরিত্র বলতে আমরা ব্যক্তিসত্তার সেই পরিকল্পনাকে বুঝি যাতে বিশেষ কতকগুলি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দেওয়া হয় এবং ঐ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির সমগ্র সংগঠনের বিচার করা হয়। এই বিশেষ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলি সামাজিক ও নৈতিক আচরণের আদর্শের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত।

সুচরিত্রের স্বরূপ (Nature of Good Character)

অতএব দেখা যাচ্ছে যে বিশেষ কতকগুলি মান বা আদর্শের দিক দিয়ে যখন ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্যগুলির বিচার করা হয় তখন আমরা চরিত্র কথাটির ব্যবহার করে থাকি। উদাহরণস্বরূপ, প্রাধান্যপ্রিয়তা ব্যক্তিসত্তার একটি বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণ। এটিকে যখন সামাজিক পরিস্থিতি বা ব্যক্তির সঙ্গে তার আত্মীয়-বন্ধু প্রতিবেশী প্রভৃতির সম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করা হয় তখন আমরা এটিকে একটি সবল বা সুদৃঢ় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। তেমনই বশ্যতাপ্রবণতা বা হীনমন্যতা ব্যক্তিসত্তার আর একটি সংলক্ষণ। সামাজিক সম্পর্কের দিক দিয়ে বিচার করলে এটি হয়ে দাঁড়ায় একটি দুর্বল বা কোমল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

বৈশিষ্ট্যগুলিকে যখন ব্যক্তিসত্তার দিক দিয়ে বিচার করা হয় তখন সেগুলি ভাল কি মন্দ, কাম্য কি অকাম্য ইত্যাদি প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু যখনই সেগুলিকে চরিত্রের দিক দিয়ে বিচার করা হয় তখনই ভাল মন্দ, কাম্য অকাম্যের প্রশ্নটি বড় হয়ে ওঠে। এক কথায় ব্যক্তিসত্তার ধারণা হল নিছক অস্তিবাচক (Positive), কিন্তু চরিত্রের ধারণা হল মানমূলক (Normative)। এখন প্রত্যেক সমাজেই কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মানের দিক দিয়ে চরিত্রের বিচার করা হয়। যে যে বৈশিষ্ট্য এই মানগুলির দ্বারা অনুমোদিত সেগুলিকেই আমরা সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলি আর যে যে বৈশিষ্ট্য এই মানগুলির বিচারে পরিত্যক্ত সেগুলিকে আমরা অবাঞ্ছিত চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরে নিই। যদিও সুচরিত্রের ধারণা বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন তবু সাধারণ সভ্য মনুষ্যসমাজে সুচরিত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রচুর মিল আছে।

সাধারণত তিন প্রকার মানের দিক দিয়ে সুচরিত্রের বিচার করা হয়ে থাকে। যেমন, ব্যক্তির নিজস্ব মঙ্গলের দিক, সমাজের যৌথ মঙ্গলের দিক এবং নৈতিক মানের দিক। যে সব ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য এই ত্রিবিধ মানের যে কোন একটি মানের দিক দিয়ে কাম্য বলে বিবেচিত হবে সেই সব বৈশিষ্ট্যকে সুচরিত্রের সূচক বলে ধরা হয়ে থাকে। সুচরিত্র বিচারের এই তিন রকম মান এবং সেগুলির দ্বারা অনুমোদিত বৈশিষ্ট্যগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী নীচে দেওয়া হল।

১। **ব্যক্তির কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যাবলী**

এই বিভাগে সুচরিত্রের সেই সব বৈশিষ্ট্য অন্তর্গত যেগুলি ব্যক্তির নিজস্ব উন্নতি, পার্থিব সাফল্য, ব্যক্তিগত জীবনযাপন, সন্তুষ্টি ইত্যাদি অর্জনে ব্যক্তিকে সক্ষম করে থাকে। এই পর্যায়ে পড়ে সংকল্পের দৃঢ়তা, স্থিরচিত্ততা, মানসিক স্থৈর্য, প্রাক্ষোভিক সাম্য প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি। যে সব ব্যক্তির মধ্যে এই সব গুণ থাকে তাদের ব্যক্তিগত জীবন সুখময় ও তৃপ্তিদায়ক হয়ে ওঠে। অতএব এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে সুচরিত্রের সংলক্ষণ বলা চলে। এই বৈশিষ্ট্য-গুলির ঠিক বিপরীত হল দুর্বলচিত্ততা, মানসিক চাপল্য, প্রক্ষোভমূলক অসমতা, সংকল্পহীনতা ইত্যাদি।

২। **সমাজের কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যাবলী**

এই পর্যায়ে পড়ে সেই সব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যেগুলি সুষ্ঠু সমাজজীবন যাপনের জন্য একান্ত প্রয়োজন। বন্ধুপ্রীতি, দল-বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা, সহানুভূতি, স্বার্থত্যাগ, সামাজিক আনুগত্য ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলি ব্যক্তির মধ্যে থাকলে সামাজিক সংগঠন সুদৃঢ় হয় এবং সমাজজীবন সুন্দর ও স্বাস্থ্যময় হয়ে ওঠে। এই সামাজিক গুণগুলির বিপরীত হল স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, সামাজিক আনুগত্য বা বিশ্বস্ততার অভাব ইত্যাদি।

অনেক সময় ব্যক্তি-কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্য এবং সমাজ-কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিতে পারে। তখন দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টিকে সুচরিত্রের গুণ বলে ধরা হবে তা নির্ভর করে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ও অনুসৃত আদর্শের উপর। যেমন, যে সমাজে ব্যক্তিগত উন্নতির অবকাশ আছে সেখানে প্রাধান্যপ্রিয়তা বা আক্রমণধর্মিতা রূপ বৈশিষ্ট্যগুলি সুচরিত্রের লক্ষণ বলে বিবেচিত হবে কিন্তু যে সমাজে সামগ্রিক অস্তিত্ব বা সমন্বয়নকে বড় বলে ধরা

হয়ে থাকে সে সমাজে উপরের গুণগুলিকে অবাঞ্ছিত বলেই মনে করা হয়। তেমনই কোন সমাজে বহির্বৃত্তিকে কাম্যগুণ বলে ধরা হয়, আবার অন্য কোন সমাজে অন্তর্বৃত্তিকে ব্যক্তির পক্ষে কাম্য বলে মনে করা হয়ে থাকে। তবে আদর্শ সমাজে ব্যক্তির কল্যাণসাধক গুণাবলী ও সমাজের কল্যাণসাধক গুণাবলীর মধ্যে কোনও দ্বন্দ্ব থাকে না।

৩। নৈতিক মাননির্ণায়ক বৈশিষ্ট্যাবলী

ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণসাধক গুণগুলি ছাড়াও এমন কতকগুলি গুণকে সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয় যেগুলি নিছক নীতির দিক দিয়ে কাম্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। এগুলির ব্যবহারিক উপকারিতা থাকুক বা না থাকুক নীতিশাস্ত্রের আদর্শ বা মান অনুযায়ী এগুলি কাম্য এবং তার ফলে এগুলিকে সুচরিত্রের উপাদান বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে ব্যক্তির দিক দিয়ে বা সমাজের দিক দিয়ে এই গুণগুলির কিছু না কিছু মূল্য আছে। কিন্তু এগুলির স্বপক্ষে যুক্তিরূপে তাদের এই ধরনের বাস্তব মূল্যের উল্লেখ না করে তাদের পেছনে নীতিশাস্ত্রের সমর্থনকেই বড় বলে মনে করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রায় সমস্ত সমাজে সত্যবাদিতা বা সাধুতাকে সুচরিত্রের বৈশিষ্ট্য বলে ধরা হয়। এই গুণ দুটির সামাজিক বা ব্যক্তিগত মূল্য থাকুক আর না থাকুক এ দুটিকে সর্বত্রই কাম্য গুণ বলে মনে করা হয় নিছক এগুলির নৈতিক মূল্যের জন্য। দরিদ্র বা দুঃস্থের প্রতি দয়া, বিশ্বাস রাখা, কৃতজ্ঞতা বোধ করা সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করা, অতিথি-বৎসলতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি নীতির দিক দিয়ে বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। অসাধুতা, মিথ্যা কথা বলা, নিষ্ঠুরতা, কৃতঘ্নতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি এই পর্যায়ের কাম্য গুণের বিপরীত।

চরিত্রের বিকাশ (Development of Character)

চরিত্রের বিকাশ ব্যক্তিসত্তার বিকাশের নামান্তর। তবে স্বতন্ত্রভাবে চরিত্রের বিকাশ পর্যবেক্ষণ করার অর্থ হল এই যে শিশুর বিকাশ প্রক্রিয়ার কোন্ স্তরে এবং কিভাবে তার মধ্যে সামাজিক ও নৈতিক সচেতনতা জাগে তা নির্ণয় করা। চরিত্র যখন সামাজিক ও নৈতিক বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত তখন যতক্ষণ না এই বোধগুলি শিশুর মধ্যে জাগছে ততক্ষণ প্রকৃত চরিত্র বলে কোন কিছু সৃষ্টি হয়েছে বলা চলে না। এখানেই ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্রের মধ্যে আর একটি বড় পার্থক্য পাওয়া গেল। ব্যক্তিসত্তা ও চরিত্র কোনটিই সহজাত নয়,

উভয়েই শিশুর অর্জিত। উভয়ই অভ্যন্তরীণ উপকরণ ও বাহ্যিক শক্তিনিচয়ের সঙ্গে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফল থেকে জাত। তবে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসত্তা গঠনের কাজ সুরু হয়ে যায়। কিন্তু চরিত্র গঠনের কাজ সুরু হয় সেদিন থেকে যেদিন প্রথম তার মধ্যে সামাজিক মনোভাব ও নৈতিক ভালমন্দের বোধ দেখা দেয়। এই দিক দিয়ে বলা চলে যে ব্যক্তি-সত্তার আবির্ভাবের পরে দেখা দেয় চরিত্র।

সামাজিক ও নৈতিক বিচারবুদ্ধি শিশুর মধ্যে কখন দেখা দেয় এ নিয়ে নানা মতভেদ আছে। তবে প্রক্ষোভের উপর আলোচনার সময় আমরা দেখেছি যে প্রায় এক বছর বয়স থেকে শিশুর মধ্যে বড়দের প্রতি ভালবাসা জাগতে সুরু হয় এবং তার কয়েক মাস পর থেকেই সে অন্যান্য ছোট ছেলে-মেয়েদেরও ভালবাসতে সুরু করে। অতএব নিঃসন্দেহে একথা বলা চলে যে এই সময় থেকেই তার চরিত্রগঠনের কাজ সুরু হল। নৈতিক বিচারবোধ ঠিক কখন জন্মায় তা অবশ্য সঠিকভাবে বলা চলে না। এ সম্বন্ধে ম্যাকডুগালের একটি তত্ত্বের উল্লেখ করা যায়।

ম্যাকডুগাল প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা চরিত্র বিকাশের যে সংব্যাখ্যান দিয়েছেন তাতে মূলত প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের শক্তিকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তিনি সেন্টিমেন্টকে বা প্রক্ষোভমূলক সংগঠনকে ব্যক্তিসত্তার একক বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর দেওয়া চরিত্রের ক্রমবিকাশের চারটি স্তর আছে।

প্রথম স্তরে থাকে নিছক প্রবৃত্তির প্রাধান্য এবং সে সময় একমাত্র সুখ বা দুঃখের অনুভূতির দ্বারাই শিশুর সমস্ত আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই স্তরে ভাল, মন্দ, উচিত অনুচিত ইত্যাদি কোন বোধই শিশুর থাকে না। এই সময় কোন সামাজিক প্রভাবও শিশুর উপর কার্যকর হয় না।

দ্বিতীয় স্তরে সামাজিক পরিবেশের প্রভাব ধীরে ধীরে শিশুর উপর সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং তার প্রবৃত্তিমূলক আচরণগুলি সমাজের আরোপিত শাস্তি ও পুরস্কারের প্রভাবের দ্বারা ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকে। ম্যাকডুগালের মতে এই সময় শিশুর মনে নানারূপ সেন্টিমেন্ট জন্মলাভ করে এবং এই স্তরে সেন্টি-মেন্টগুলি প্রধানত বাড়ীঘর, মা-বাবা, খেলনা ইত্যাদি মূর্ত বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায়। এই সময় থেকেই শিশুর চরিত্র গঠনের সূত্রপাত হয় বলা চলে এবং শিশুর মনে করণীয় অকরণীয় ও ভালমন্দের জ্ঞান অল্প অল্প দেখা দেয়।

তৃতীয় স্তরে শিশুর উপর সামাজিক অনুশাসনের প্রভাব আরও প্রবল হয়ে

ওঠে এবং তখন সামাজিক নিন্দা বা প্রশংসাই বিশেষ করে শিশুর সমস্ত আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। এই স্তরে নানা অমূর্ত বস্তুকে ঘিরে শিশুর মনে সেন্টিমেন্টের গঠন সুরু হয় এবং ন্যায়বিচার, সততা, নিষ্ঠুরতা, সৌন্দর্য প্রভৃতি ধারণাকে ঘিরে সেন্টিমেন্ট জন্মায়। এই স্তরে চরিত্রগঠনের কাজটি আরও এক সোপান এগিয়ে যায় এবং শিশুর মধ্যে অমূর্ত ধারণার সাহায্যে আচার-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেখা দেয়। চরিত্র বিকাশের এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর।

চতুর্থ বা সর্বশেষ স্তরে নিছক আদর্শবোধের দ্বারাই শিশুর কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই সময় তার চরিত্রের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পূর্ণ সমন্বয়ন ঘটে এবং তার চরিত্রগঠনের কাজটিও পূর্ণ পরিণতি লাভ করে বলা চলে।

উপরের বর্ণনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তিসত্তা বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে সামাজিক বোধ ও ভালমন্দের জ্ঞান জাগতে থাকে এবং তৃতীয় স্তরে সেটি আরও পরিণত হয়ে ওঠে। এই তৃতীয় স্তরেই শিশুর নৈতিক আদর্শবোধ সুপরিণত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন তার আচরণ আর কেবলমাত্র সামাজিক শাস্তি-পুরস্কার বা নিন্দা-প্রশংসার উপর নির্ভরশীল থাকে না। তার পরিণত সামাজিক ও নৈতিক আদর্শবোধই তখন থেকে তার আচরণের প্রধান নিয়ন্ত্রক এবং নির্ণায়ক হয়ে ওঠে। অর্থাৎ এক কথায় তার চরিত্রগঠন পূর্ণতালাভ করে।

নৈতিক সেন্টিমেন্ট (Moral Sentiment)

ম্যাকডুগালের বর্ণিত ব্যক্তিসত্তা বিকাশের তৃতীয় স্তরে নানা অমূর্ত ধারণাকে ঘিরে সেন্টিমেন্ট তৈরী হয়। তাঁর মতে এই সময় শিশুর মনে নৈতিক সেন্টিমেন্ট (Moral Sentiment) নামে একটি বিশেষ সেন্টিমেন্ট জন্মায়। এই সেন্টিমেন্ট শিশুর মধ্যে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিতের ধারণা ইত্যাদি সৃষ্টি করে। এই নৈতিক সেন্টিমেন্ট যাদের মধ্যে দুর্বল থেকে যায় তাদের চরিত্রের দৃঢ়তা থাকে না। ম্যাকডুগাল নৈতিক সেন্টিমেন্টকে দ্বিমুখী বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ যদি কোন নৈতিক বস্তুর প্রতি আমাদের অনুরাগ জন্মায় তখন তার বিপরীতধর্মী বস্তুটির প্রতি আমাদের বিরাগ জন্মাবে। যেমন, সত্যভাষণকে যে ভালবাসে অসত্যভাষণকে সে ঘৃণা করে।

এই নৈতিক সেন্টিমেন্টটি মূলত জাগে সামাজিক জীবন-যাপনের মধ্যে দিয়ে। সম্পূর্ণ জনহীন প্রদেশে যে মানুষ হয়েছে তার মধ্যে কোনরূপ নৈতিক মান জন্মাতে পারে না। সমাজে বাস করা কালীন ব্যক্তি প্রচলিত নৈতিক গুণগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়, সেগুলির সম্বন্ধে আলোচনা শোনে, সেগুলির

বাস্তব উদাহরণের সঙ্গে তার সাক্ষাৎকার ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত নিজের আচরণের মধ্যে দিয়ে সেগুলিকে সে আহরণ করে নেয়। ম্যাকডুগালের ভাষায় শিশু যে সব ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করে তাঁদেরই সংস্পর্শ ও প্রভাব থেকে তার নৈতিক সেন্টিমেন্ট গঠিত হয়।

শিশু প্রথমে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে ভালবাসে। পরে ধীরে ধীরে সেই ব্যক্তির গুণ বা বৈশিষ্ট্যগুলিকেও সে ভালবেসে ফেলে। এও এক ধরনের অনুবর্তন প্রক্রিয়া। এভাবে মূর্তবস্তু থেকে অমূর্ত ধারণাগুলির প্রতি শিশুর সেন্টিমেন্ট সঞ্চালিত হয়ে যায়।

শিক্ষা ও চরিত্রগঠন

শিক্ষার পরিকল্পনায় চরিত্র গঠন যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে একথা বলা বাহুল্য। বহু শিক্ষাবিদ্ চরিত্র গঠনকেই শিক্ষার লক্ষ্য বলে বর্ণনা করে থাকেন। অবশ্য শিক্ষার লক্ষ্যের এই সংব্যাখ্যানটি অতি সংকীর্ণ হলেও চরিত্র গঠন যে শিক্ষা প্রক্রিয়ার একটি বড় অঙ্গ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

সুচরিত্র গঠনকে আমরা এক কথায় এই বলে বর্ণনা করতে পারি যে এটি হল ব্যক্তির মধ্যে এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করা যেগুলি ব্যক্তির নিজের দিক, তার সমাজের দিক এবং অনুমোদিত নৈতিক মানের দিক দিয়ে কাম্য বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। সুচরিত্রের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি যে তিন রকম ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণকে আমরা সুচরিত্রের লক্ষণ বলে বর্ণনা করে থাকি। সেগুলি হল ব্যক্তির কল্যাণসাধক গুণাবলী, সমাজের কল্যাণসাধক গুণাবলী এবং নৈতিক মাননির্ণায়ক গুণাবলী। এই তিন শ্রেণীর গুণ শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করাকেই সুচরিত্র গঠন বলা যেতে পারে। মানসিক দৃঢ়তা, স্থিরচিত্ততা, প্রাক্ষোভিক সমতা, আত্মসংযম প্রভৃতি গুণগুলি পড়ে ব্যক্তির কল্যাণসাধক গুণাবলীর পর্যায়ে, সহযোগিতা, বন্ধুপ্রীতি, স্বার্থত্যাগ, সামাজিকতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি পড়ে সমাজের কল্যাণসাধক গুণাবলীর পর্যায়ে এবং সততা, সত্যবাদিতা কৃতজ্ঞতা, আতিথেয়তা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি পড়ে নৈতিক মাননির্ণায়ক গুণাবলীর পর্যায়ে। অতএব সুচরিত্র গঠন বলতে বোঝায় শিশুর মধ্যে এই তিন রকম বৈশিষ্ট্য বিকশিত হতে সাহায্য করা। এদিক দিয়ে শিক্ষা প্রক্রিয়ার অবদান যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কেননা একমাত্র শিশুর শিক্ষার সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই তার মধ্যে গুণগুলি সৃষ্টি করা সম্ভবপর।

কিন্তু এই গুণগুলি আহরণ করতে শিশুকে কেমন করে সাহায্য করা যায় সেটিই হল শিক্ষার প্রকৃত সমস্যা। একদল শিক্ষাবিদ্ আছেন যাঁরা চরিত্র গঠনে নৈতিক অনুশাসনগুলির উপরই বিশেষ জোর দিয়ে থাকেন এবং এই গুণগুলির ব্যবহারিক উপকারিতার চেয়ে অনেক বড় বলে মনে করেন সেগুলির নিজস্ব অভ্যন্তরীণ মূল্যকে। তাঁদের মতে সৎ হওয়ার জন্যই মানুষ সৎ হবে। সৎ হওয়ার ব্যক্তিগত বা সামাজিক উপকারিতার মূল্য নিতান্তই নগণ্য। এ সকল ক্ষেত্রে নীতিশিক্ষা দেওয়াটা শিক্ষকের পক্ষে বেশ শক্ত হয়ে ওঠে, কেননা নৈতিক অনুশাসনের স্বপক্ষে শিশুকে কোনরূপ যুক্তি-নির্ভর ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না, অথচ বিকাশমান শিশুর মন অন্ধভাবে কোন কিছুই মেনে নিতে চায় না এবং সেজন্য প্রায়ই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

আধুনিক শিক্ষাবিদ্‌গণের ব্যাপক গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে অমূর্ত বা নিছক তত্ত্বমূলক বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া একান্ত কষ্টকর। প্রকৃত শিক্ষা আসে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। নৈতিক শিক্ষা যেখানে পূর্ণভাবে তত্ত্বনির্ভর সেখানে শিশুর নীতিবোধ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্টরূপে গঠিত হয়ে থাকে। এই কারণেই দেখা যায় যে আমাদের অধিকাংশ নৈতিক শিক্ষাই ব্যর্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি নৈতিক শিক্ষাকে শিশুর অভিজ্ঞতাভিত্তিক করে তোলা যায় তাহলে শিশুর কাছে সে শিক্ষা কার্যকর ও স্থায়ী হয়ে ওঠে।

এই কারণে নৈতিক অনুশাসনকে যদি ব্যক্তির নিজস্ব বা সামাজিক মঙ্গল-অমঙ্গল বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় তাহলে নীতিশিক্ষা দেওয়াটা অনেক বেশী সহজ হয়ে ওঠে। শিশুর মন যুক্তিধর্মী। তার নিজের বা সমাজের কল্যাণের কথা বললে সে সহজেই তা বুঝতে পারে এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতেও সে সম্মত হয়। যদি উচিত অনুচিতের মাপকাঠিটি ব্যক্তি ও সমাজের ভালমন্দের সঙ্গে এক করে ফেলা যায় তবে নীতিগত অনুশাসনগুলি মেনে চলতে শিশু আপত্তি করে না। কিন্তু যদি নিছক করণীয় বলে কোন কাজ শিশুকে করানোর চেষ্টা করা হয় তাহলে শিশুর মন সেটিকে মেনে নিতে চায় না এবং সমস্ত শিক্ষাই ব্যর্থ হয়ে ওঠে।

শিশুর সামাজিক ও নৈতিক বিচারবুদ্ধি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তার চারপাশের পরিণত ব্যক্তিদের প্রভাবের দ্বারা। শিশু যাকে শ্রদ্ধা করে বা ভালবাসে জ্ঞাতসারে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অজ্ঞাতসারে সে তার আচার-ব্যবহার ভাব চিন্তা, এমন কি চলন বাচনের ভঙ্গীও অনুকরণ করে থাকে। এই ব্যাপক

অনুকরণের ফলে শিশুর মনোভাব, দৃষ্টিভঙ্গী, ধারণা প্রভৃতি বহুলাংশে তার শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সমধর্মী হয়ে ওঠে এবং তার চরিত্রের ভবিষ্যৎ রূপটি এইভাবেই মূর্ত হয়ে ওঠে।

অতএব শিশুর চরিত্রগঠনের দায়িত্ব শিশুর পরিবেশের প্রত্যেকটি ব্যক্তিরই। শিশু যাতে অবাঞ্ছিত মনোভাব বা অস্বাভাবিক ধারণার অধিকারী না হয়ে ওঠে সে সম্বন্ধে শিক্ষক, পিতামাতা প্রত্যেকেরই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

সুচরিত্র গঠনের পন্থা (How to form good character)

শিশু যাতে সুচরিত্রের অধিকারী হয়ে উঠতে পারে সে সম্বন্ধে পিতামাতা শিক্ষকদের করণীয় কতকগুলি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা হল। যথা:—

১। পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ

শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত গুণগুলি সৃষ্টি করার একটি কার্যকর পন্থা হল শিশুর পরিবেশের নিয়ন্ত্রণ। অধিকাংশ ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণই পরিবেশের প্রভাবে সৃষ্ট এবং পুষ্ট হয়ে থাকে। সেই জন্য শিশুর পরিবেশকে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে তার মধ্যে বাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যগুলি স্বাভাবিক-ভাবেই গড়ে ওঠে।

২। আদর্শ আচরণ অনুষ্ঠান

সুচরিত্র গঠনের আর একটি উল্লেখযোগ্য পন্থা হল শিশুর সামনে আদর্শ আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। শিশুর মন অনুকরণধর্মী। তার আশপাশে বয়স্ক ব্যক্তিদের সে যা করতে দেখে তাই সে অনুকরণ করে। যে সমাজে বয়স্কদের আচরণ অনিয়ন্ত্রিত ও অসংযত সে সমাজে শিশুদের চরিত্রও অসংযত হয়ে ওঠে। অনেক সময় পিতামাতা বা অন্যান্য বয়স্ক ব্যক্তিরা শিশুর সামনে বিসদৃশ আচরণ করেন এবং তার ফলে তা বিশেষভাবে শিশুর সুচরিত্র গঠনের পরিপন্থী হয়ে ওঠে। অতএব শিশুর সামনে এমন আচরণ করতে হবে যা তাকে অভীষ্ট আচরণ সম্পন্ন করতে প্রবুদ্ধ করে।

৩। মহৎ ব্যক্তির জীবনী পাঠ

মহৎ ব্যক্তিদের জীবনকাহিনীও সুচরিত্র গঠনে যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। বিখ্যাত দার্শনিক, সমাজ-সংস্কারক, দেশপ্রেমিক, কর্মবীর প্রভৃতি ব্যক্তিদের জীবনী থেকে শিশুরা যথেষ্ট অনুপ্রেরণা লাভ করে এবং সেগুলি থেকে তারা বহু বাঞ্ছিত গুণ আহরণ করে থাকে।

৪। কল্যাণবোধ জাগরণ

সুচরিত্র গঠনের সবচেয়ে কার্যকর পন্থাটি হল শিশুর মধ্যে সত্যকারের কল্যাণবোধ জাগান। তার নিজের এবং তার সমাজের কল্যাণের জন্য কি ধরনের আচরণ করা উচিত এবং কি ধরনের আচরণ করা উচিত নয় এই সচেতনতা যদি তার মধ্যে জাগান যায় তাহলে অভীষ্ট আচরণগুলি তাকে শেখান শক্ত হয় না। কোন অবাস্তব নৈতিক মানের দোহাই দিয়ে বা কোন অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট আদর্শের কথা বলে শিশুকে প্রভাবিত করার চেয়ে তার নিজের বিচার বুদ্ধির সাহায্যে তার আচরণ নিয়ন্ত্রিত করা অনেক বেশী সহজ ও ফলপ্রসূ।

৫। বাস্তব উদাহরণ

নিছক বক্তৃতা বা উপদেশের মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষাদান ফলপ্রদ হয় না বরং প্রায় ক্ষেত্রেই বিপরীত ফল দেখা দেয়। একমাত্র বাস্তব আচরণের মধ্যে দিয়েই কার্যকর নৈতিক শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। মুখে দয়া বা ক্ষমা সম্বন্ধে হাজার কথা বলা অপেক্ষা দয়া বা ক্ষমার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত শিশুর মনকে অনেক বেশী প্রভাবিত করে।

দৃষ্টান্ত সকল সময়েই উপদেশের চেয়ে ভাল। সত্য কাহিনী, বাস্তব ঘটনা, ইতিহাসের দৃষ্টান্ত ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুকে কার্যকর নৈতিক শিক্ষা দেওয়া যায়।

৬। সামাজিক সচেতনতার সৃষ্টি

শিশুর মধ্যে সামাজিক বোধ সৃষ্টি করা সুচরিত্র গঠনের একটি কার্যকর পন্থা। শিশু যদি সমাজজীবনের মূল্য উপলব্ধি করতে পারে এবং যদি সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিদের প্রতি তার অনুরাগ ও আকর্ষণের সৃষ্টি হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সহযোগিতা, স্বার্থত্যাগ, দলপ্রীতি প্রভৃতি সুচরিত্রের গুণাবলী তার মধ্যে গড়ে ওঠে। বস্তুত সুচরিত্রের বহু গুণই সামাজিক সচেতনতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব যাতে শিশুর মধ্যে সমাজপ্রীতি, গোষ্ঠিবিশ্বস্ততা প্রভৃতি সামাজিক গুণগুলি সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হয় তার আয়োজন করা সুচরিত্র গঠনের প্রকৃষ্ট পন্থা।

৭। অন্তর্জাত শৃঙ্খলা

শৃঙ্খলাবোধ সুচরিত্র গঠনের একটি বড় সহায়ক শক্তি। তবে বহিঃশৃঙ্খলা উপকারের চেয়ে অপকার বেশী করে। সবচেয়ে কার্যকর হল স্বতঃপ্রণোদিত শৃঙ্খলাবোধ। শিশুর মধ্যে যাতে সহজ ও স্বাভাবিক শৃঙ্খলাবোধ প্রথম থেকেই

গড়ে ওঠে তার ব্যবস্থা করতে হবে। শৃঙ্খলাবোধ থেকে বহু কাম্য গুণ স্বাভাবিকভাবেই শিশুর মধ্যে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

৮। অমূর্ত ধারণার পরিহার

যে সকল গুণ শিশুর পক্ষে আহরণ করা উচিত বলে মনে করা হয় সেগুলিকে যেন তার কাছে কতকগুলি অমূর্ত ধারণার রূপে উপস্থিত করা না হয়। সেগুলির সামাজিক ও ব্যক্তিগত সার্থকতাটুকুও শিশুর কাছে পরিষ্কার করে দেওয়া প্রয়োজন।

৯। সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী

সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী, যৌথপ্রচেষ্টা, খেলাধূলা, সম্মিলিত উদ্যোগ ইত্যাদির মাধ্যমে অনেক অভীষ্ট আচরণবৈশিষ্ট্য শিশুকে শেখান যায়। এ ধরনের দলভিত্তিক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে শিশুর চরিত্রের ব্যক্তিগত ও সমাজগত উভয় দিকই স্বাস্থ্যময় পন্থায় গঠিত হয়ে ওঠে। শিশুর মধ্যে একদিক দিয়ে যেমন আত্মবিশ্বাস, স্বাবলম্বন, কর্মকুশলতা প্রভৃতি গুণ গড়ে ওঠে, আর একদিক দিয়ে তেমনই যৌথ কর্মপ্রবণতা, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলিও পরিপুষ্টি লাভ করে।

কুড়ি

অভ্যাস (Habit)

ছোটই হোক আর বড়ই হোক সাধারণত প্রত্যেক আচরণে দুটি বস্তুর প্রয়োজন হয়। একটি হল মানসিক প্রয়াস আর একটি মনোযোগ। একথা একমাত্র আমাদের সহজাত আচরণগুলির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। যেমন, শরীর-রক্ষণমূলক আচরণগুলি বা রিফ্লেক্সগুলি সম্পন্ন করতে আমাদের নিজস্ব কোন প্রচেষ্টা বা মনোযোগ লাগে না। সেগুলি যন্ত্রের মত নিজে নিজে সম্পন্ন হয়ে যায়। কিন্তু এগুলি ছাড়া সমস্ত শিক্ষা প্রসূত আচরণের ক্ষেত্রেই প্রচেষ্টা ও মনোযোগের প্রয়োগ অপরিহার্য।

অভ্যাসের স্বরূপ

কিন্তু সাধারণ আচরণও বার বার করতে করতে এমন একটি স্তরে গিয়ে পৌঁছয় যখন সেটি সম্পন্ন করতে আর মানসিক প্রয়াস বা মনোযোগের প্রয়োজন হয় না, রিফ্লেক্স বা অন্যান্য সহজাত আচরণের মতই সেটি নিজে নিজে সম্পন্ন হয়ে যায়। এই ধরনের আচরণকেই অভ্যাস নাম দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন, প্রথম যখন কেউ সাঁতার কাটতে বা টাইপ করতে শেখে তখন তাকে প্রচুর প্রয়াস ও মনোযোগ প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু যখন সাঁতার কাটা বা টাইপ করা তার অভ্যাসে পরিণত হয় তখন কোনরূপ প্রচেষ্টা বা মনোযোগের সাহায্য না নিয়েই সে অনায়াসে ঐ কাজগুলি অতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে। অতএব কোন আচরণ যখন বার বার সম্পন্ন করার ফলে এমন স্তরে গিয়ে পৌঁছয় যখন সেটি ব্যক্তির প্রচেষ্টা ও মনোযোগের সহায়তা ছাড়াই সম্পন্ন হতে পারে তখন তাকে অভ্যাস বলা হয়।

অভ্যাস হল আচরণের সুসম্পূর্ণ ত্রুটিহীন রূপ। এর কারণ হল কোন আচরণের যখন অতি-শিখন ঘটে তখনই সেটি অভ্যাসে পরিণত হয়। অভ্যাস প্রকৃতপক্ষে হল অতি-শেখা কোন আচরণ। আর অতি-শিখনের ফলে আচরণ মাত্রেই সমস্ত দোষ-মুক্ত হয়ে নিখুঁত হয়ে ওঠে। যেমন, প্রথম যখন ব্যক্তি সাঁতার কাটা শেখে তখন তার আচরণের মধ্যে প্রচুর অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি থাকে কিন্তু যখন সাঁতার কাটা তার অভ্যাসে দাঁড়ায় তখন তার আচরণ নিখুঁত, সাবলীল ও সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

সেই জন্যই অভ্যাস সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন পুনরাবৃত্তি বা বারবার প্রচেষ্টা। অধিকাংশ অভ্যাসই প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা। থর্নডাইকের প্রসিদ্ধ

অনুশীলনের সূত্রটির এখানে প্রয়োগ করে বলতে পারা যায় যে অভ্যাস গঠন নির্ভর করে আচরণের বার বার পুনরনুষ্ঠানের উপর।

অবশ্য এই পুনরনুষ্ঠান কাজটি আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে হতে পারে। কোন কোন অভ্যাস আমরা স্বেচ্ছায় গঠন করি- আবার কোন কোন অভ্যাস আমাদের অজ্ঞাতসারে নিজে নিজেই তৈরী হয়ে যায়। শেষোক্ত ধরনের অভ্যাসগুলি অনুবর্তন (Conditioning) প্রক্রিয়া থেকে জন্মায় এবং আমাদের দৈনন্দিন আচরণের একটি বড় অংশ অধিকার করে থাকে। কথা বলা, খাওয়া, শোওয়া, চলাফেরা, ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি কাযঘটিত যে সকল অভ্যাস আমাদের মধ্যে দেখা যায় তার অধিকাংশই অনুবর্তন-প্রসূত।

চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তার গঠনে অভ্যাসের ভূমিকা

কোন কোন মনোবিজ্ঞানীর ভাষায় চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তা অভ্যাসের সমষ্টি ছাড়া কিছুই নয়। উক্তিটি অনেকাংশে সত্য। অলপোর্টের ব্যাখ্যায় ব্যক্তিসত্তার বিকাশের প্রথম স্তরে শিশু অনুবর্তিত রিফ্লেক্সগুলি আহরণ করে এবং দ্বিতীয় স্তরে এই রিফ্লেক্সগুলি থেকে শিশুর মধ্যে দেখা দেয় তার স্থতি প্রয়োজনীয় অভ্যাসগুলি। এই অভ্যাসগুলি থেকেই পরে সৃষ্টি হয় ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন সংলক্ষণগুলি।[১]

অলপোর্টের বর্ণিত ব্যক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের ব্যাখ্যায় দেখা যাচ্ছে যে অভ্যাস হল ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণগুলির মৌলিক উপাদান। অর্থাৎ ব্যক্তির আচরণমূলক বৈশিষ্ট্যগুলি অভ্যাস থেকেই সৃষ্ট হয়ে থাকে। চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তা বলতে কতকগুলি বিশেষধর্মী বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থেকে সপ্রাপ্ত সংগঠনটিকে বোঝায়। অতএব যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলি অভ্যাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ব্যক্তির চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তা যে বহুলাংশে তার অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ এক ব্যক্তিকে বন্ধুবৎসল বা সৎ বলে বর্ণনা করার অর্থ হল যে ঐ ব্যক্তির তার বন্ধুদের সঙ্গে প্রীতিময় বা সততাপূর্ণ আচরণ করার অভ্যাস আছে। কিংবা কাউকে প্রবঞ্চক বা নিষ্ঠুর বলার অর্থই হল যে ঐ ব্যক্তির প্রবঞ্চনাপূর্ণ বা নিষ্ঠুর আচরণ করার অভ্যাস আছে। অতএব ব্যক্তির বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি বা ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন সংলক্ষণগুলি প্রত্যক্ষভাবে অভ্যাসের সঙ্গে বিজড়িত এবং সাধারণভাবে বলা চলে যে চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তার বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন অভ্যাসের রূপেই নিহিত থাকে।

১। পৃঃ ২৬৪

বস্তুত সাধারণ মানুষের অধিকাংশ আচরণই অভ্যাসজাত। তাকে যে ভাবে আমরা জানি বা চিনি তা মূলত তার অনুষ্ঠিত কতকগুলি সুনির্দিষ্ট আচরণ-ধারা থেকেই। আর এই সুনির্দিষ্ট আচরণধারাগুলির পশ্চাতে আছে তার অর্জিত কতকগুলি সুগঠিত অভ্যাসসমষ্টি। এই কারণে প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী উইলিয়ম জেমস মানুষকে কতকগুলি 'অভ্যাসের চলমান সমষ্টি' বলে বর্ণনা করেছেন।[১]

কিন্তু অভ্যাসকে চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলা চললেও একমাত্র উপাদান বলা ঠিক নয়। কেননা চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তা অভ্যাস ছাড়াও আরও অনেক বৈশিষ্ট্য দিয়ে গঠিত। তাছাড়া চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তা একটি নিয়ত পরিবর্তনশীল বস্তু কিন্তু অভ্যাস একটি একান্তভাবে যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। অতএব চরিত্র বা ব্যক্তিসত্তার পরিবর্তনধর্মী দিকটি স্বতন্ত্র উপাদান দিয়ে গঠিত। সামাজিক সচেতনতা, নৈতিক মান সম্পর্কে ধারণা, বিচার বুদ্ধি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের চরিত্রের স্বরূপ নিয়ন্ত্রণে গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং এগুলি কোন সময়েই আমাদের অভ্যাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। বরং এগুলি প্রয়োজন মত অভ্যাসকে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিবর্তিত করে।

অভ্যাস ও প্রবৃত্তি

অভ্যাসের সঙ্গে প্রবৃত্তির সম্বন্ধ অতি নিকট। জেমসের মতে প্রবৃত্তি থেকে অভ্যাস জন্মায় এবং অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে গেলে প্রবৃত্তি লুপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ তাঁর মতে প্রবৃত্তি হল অভ্যাসের জনক। তাছাড়া তাঁর মতে প্রবৃত্তিকে অবরুদ্ধ করা বা পরিবর্তিত করার শক্তিও অভ্যাসের আছে। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে অভ্যাসের ফলে প্রবৃত্তির সহজাত আচরণ প্রবণতা পরিবর্তিত, এমন কি লুপ্ত হয়েও গেছে।[২]

অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী

যখন কোন আচরণ যান্ত্রিকতার স্তরে গিয়ে পৌঁছয় তখন তাকে অভ্যাস বলে। যে কোন অভ্যাসের গঠন বিশেষ কতকগুলি নিয়মের উপর নির্ভরশীল। আমরা সেই রকম কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করতে পারি।

প্রথমত, প্রত্যেক অভ্যাস গঠনের পিছনেই একটি উপযুক্ত মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। কোন আচরণকে অভ্যাসে পরিণত করতে হলে যে প্রয়াস

১ Man is a walking bundle of habits—W. James.

২। পৃঃ ৫০ (প্রথম খণ্ড)

ব: প্রচেষ্টার প্রয়োজন হবে সেটি সম্পন্ন করার উপযোগী অনুকূল মানসিক অবস্থা ব্যক্তির অবশ্যই থাকবে। এই জন্যই যে সব আচরণ আমাদের কাছে তৃপ্তিকর বা সন্তোষজনক সেই সব আচরণ সহজেই অভ্যাসে পরিণত হয়। যে সব আচরণ আমাদের কাছে তৃপ্তিকর বা সুখপ্রদ নয় সেগুলিকে অভ্যাসে পরিণত করতে হলে যথেষ্ট মানসিক প্রচেষ্টার দরকার। সেই জন্য শিশুর মধ্যে কোন অভ্যাস গঠন করতে হলে তার মধ্যে সেই অভ্যাসের অনুকূল মানসিক প্রস্তুতি যাতে আগে গড়ে ওঠে তা দেখা প্রথমেই দরকার।

দ্বিতীয়ত, যে আচরণটি অভ্যাসে পরিণত হয় সেই আচরণটির সার্থকতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যক্তির মধ্যে আগে থেকেই সচেতনতা থাকবে। ব্যক্তির জ্ঞাত মনের কাছেই হোক্ আর অজ্ঞাত মনের কাছেই হোক্ ঐ আচরণটির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে সেটি অভ্যাসে পরিণত হতে পারে না। এই জন্য শিশুর মধ্যে কোন অভ্যাস গঠন করতে হলে ঐ আচরণটির সার্থকতা বা মূল্য সম্পর্কে শিশুকে প্রথমেই সচেতন করা দরকার। এই সার্থকতাবোধ বা সচেতনতাটি শিশুর মধ্যে জাগলেই আচরণটি সহজে অভ্যাসে পরিণত হয়।

তৃতীয়ত, পুনরনুষ্ঠান বা বার বার আচরণ সমস্ত অভ্যাসের ক্ষেত্রেই অপরিহার্য। প্রত্যেক অভ্যাসই প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা। শিশুর আচরণকে সহজসাধ্য, ত্রুটিহীন ও যান্ত্রিক করে তুলতে হলে তাকে ঐ আচরণটি বারবার অনুশীলন করতে দিতে হবে।

চতুর্থত, প্রত্যেক অভ্যাসের সংগঠনই অনুকূল পরিবেশের উপর নির্ভরশীল। অতএব শিশুর মধ্যে কোনও অভ্যাস গড়ে তুলতে হলে তার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

পঞ্চমত, অভ্যাস মাত্রেই এক ধরনের শিখন। থর্নডাইকের ফললাভের সূত্র অনুযায়ী যে অভ্যাসটি গঠনে ব্যক্তির মনে সন্তুষ্টি আসে সে অভ্যাস সহজে গঠিত হয়। এই জন্য শিশুর মধ্যে কোন অভ্যাস গঠন করতে হলে সেই অভ্যাসটির ফল যাতে শিশুর কাছে তৃপ্তিকর হয়ে ওঠে সেদিকে যত্ন নিতে হবে।

ষষ্ঠত, অনেক অভ্যাস নিছক যান্ত্রিক উপায়ে গঠিত হয়ে যায়। এই অভ্যাসগুলি প্রকৃতপক্ষে অনুবর্তন প্রক্রিয়া থেকে জন্মলাভ করে। আবার অনেক অভ্যাস আছে যেগুলি ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে এমন কি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গঠিত হয়ে যায়। শিশুর পরিবেশকে যথাযথ নিয়ন্ত্রিত করে সুপরিকল্পিত

অনুবর্তনের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে বাঞ্ছিত অভ্যাস সৃষ্টি খুব সহজেই করা যেতে পারে। সামাজিক রীতিনীতি, ভদ্রতা, শালীনতা প্রভৃতির অভ্যাস পূর্বকল্পিত অনুবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুকে শেখান যেতে পারে।

অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলীর গুরুত্ব

শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাস গঠনের এই নিয়মগুলির বিশেষ মূল্য আছে। বাঞ্ছিত অভ্যাসগঠন শিক্ষার একটি মূল্যবান অঙ্গ। শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন প্রকারের অভ্যাস শিশুর মধ্যে গঠন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেমন, শৈশবে শিশুর মধ্যে নানা আচরণমূলক অভ্যাস গঠন করতে হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে পড়তে পারা, লিখতে পারা শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারা, রেখাচিত্র আঁকতে পারা, গণনা করতে পারা ইত্যাদি শিক্ষামূলক অভ্যাসগুলি শিক্ষার অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য। উপরের অভ্যাস গঠনের নিয়মাবলী শিক্ষকের জানা থাকলে প্রয়োজনীয় অভ্যাসগুলি শিশুর মধ্যে গঠন করা তাঁর পক্ষে সহজ সাধ্য হয়ে উঠবে।

সু-পঠনের অভ্যাস-গঠন

উদাহরণস্বরূপ একটি শিশুর মধ্যে পঠনের অভ্যাস গঠন করতে হলে শিক্ষক নীচের উপায়গুলি অবলম্বন করতে পারেন। যথা—

প্রথমত, শুদ্ধ উচ্চারণের সঙ্গে কি করে পড়তে হয় তা শিশুকে শেখাতে হবে। যদি শিশু ভালভাবে পড়তে শেখে তাহলে স্বভাবতই তার মধ্যে পঠনের অভ্যাস গড়ে উঠবে। এ থেকে শিশুর মধ্যে পঠনের জন্যে মানসিক প্রস্তুতিও জন্মাবে।

দ্বিতীয়ত, উচ্চস্বরে ও নীরবে দু'ধরনের পঠন সম্পর্কে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে যখন যেমন প্রয়োজন সেইমত পঠনের সাহায্য সে নিতে পারে।

তৃতীয়ত, যখনই কোন কিছু সে পড়বে তখনই যেন সে পাঠ্যবস্তুটি সুন্দর করে পড়ে নেয়। এতে সে পঠনের তৃপ্তি অনুভব করতে পারবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশু তার পাঠ্য বিষয়টি অতি দ্রুত ও অযত্নের সঙ্গে পড়ে নিয়ে পাঠ্যবিষয়টির সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজগুলি প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়। তাতে পঠনের তৃপ্তি থেকে সে বঞ্চিত হয়। শিশু যাতে তার প্রতিটি পাঠ্যবস্তু সুন্দর করে আবৃত্তি করে পড়ে সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

চতুর্থত, পঠনের পশ্চাতে কেবল বিদ্যালয়ের পড়া তৈরী করার চাপ থাকলে চলবে না। শিশু যেন পড়ায় সত্যকারের আগ্রহ অনুভব করে। এর জন্য শিশুর মধ্যে সত্যকারের জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা বা কৌতূহল জাগিয়ে তুলতে হবে। কৌতূহলী শিশু যা দেখে তাই পড়ে। তার এই স্বাভাবিক কৌতূহলকে যথাযথ কাজে লাগিয়ে তার মধ্যে পঠনের অভ্যাস সৃষ্টি করতে হবে।

পঞ্চমত, শিশুর ক্রমবর্ধমান কৌতূহল যাতে তার পূর্ণ পরিতৃপ্তি পায় তার জন্য উপযুক্ত পঠন সামগ্রীর আয়োজন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিশুর পঠন উপযোগী পুস্তকাগার। শিশুর কৌতূহল একমুখী নয়, সর্বমুখী। অতএব তার সেই সর্বমুখী কৌতূহলকে তৃপ্ত করতে পারে এমন বিচিত্রধর্মী পঠনসামগ্রী যাতে শিশু পর্যাপ্ত পরিমাণে পায় তার আয়োজন পুস্তকাগারে রাখতে হবে।

শিক্ষা ও অভ্যাস (Education and Habit)

শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অভ্যাস নিজে একটি যান্ত্রিক আচরণ হলেও নতুন ও সৃজনমূলক আচরণমাত্রেই অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার অগ্রগতি অভ্যাসগঠন ছাড়া সম্ভব নয়। তাছাড়া দৈনন্দিন সাধারণ জীবনযাপনে অভ্যাসের অবদান সুপ্রচুর।

অভ্যাসের উপযোগিতা (Uses of Habit)

প্রথমত, আমাদের শিক্ষার সর্ববিধ অগ্রগতির বাহক হল অভ্যাস। পুরাতন আচরণগুলি অভ্যাসে পরিণত হলেই আমাদের পক্ষে নতুন আচরণ শেখার চেষ্টা করা ও তাতে মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে। অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন আচরণগুলির অভ্যাস গঠিত না হলে নতুন আচরণ শেখা সম্ভবই হয় না। প্রত্যেক আচরণেই যদি সকল সময় একই পরিমাণ প্রচেষ্টা ও মনোযোগ দিতে হত তাহলে আমাদের মানসিক শক্তির পক্ষে অধিকসংখ্যক আচরণ সম্পন্ন করা সম্ভব হত না এবং আমাদের অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধ হয়ে যেত। যেমন, শিশুর অক্ষর লেখার অভ্যাস গঠিত হলেই তার পক্ষে শব্দ লেখা সম্ভব হয়, শব্দ লেখার অভ্যাস গঠিত হলেই তার পক্ষে বাক্য লেখা সম্ভব হয় এবং বাক্য লেখা যখন অভ্যাসে পরিণত হয় তখনই তার পক্ষে মনের ভাষা অবাধে প্রকাশ করা এবং সাহিত্য-কবিতা ইত্যাদি রচনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে। যার অক্ষর লেখার অভ্যাস গঠিত হয় নি তার পক্ষে পরবর্তী কাজগুলি সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়ত, অভ্যাসের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে অভ্যাসমূলক আচরণ সহজসাধ্য ও আয়াসহীন। ব্যক্তির পক্ষে সাধারণ আচরণের চেয়ে অনেক কম পরিশ্রম ও প্রচেষ্টায় অভ্যাসমূলক আচরণ সম্পন্ন করা সম্ভব।

তৃতীয়ত, অভ্যাসের ক্ষেত্রে সময়েরও যথেষ্ট সাশ্রয় হয়ে থাকে। সাধারণ একটি আচরণ সম্পন্ন করতে যে সময়ের প্রয়োজন হয় তার চেয়ে অনেক কম সময় লাগে কোন অভ্যস্ত আচরণ সম্পন্ন করতে।

চতুর্থত, অভ্যাসমূলক আচরণমাত্রেই অনেক বেশী কার্যকর ও ত্রুটিহীন

হয়। সাধারণ অনভ্যস্ত আচরণের মধ্যে যেমন অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটি থাকতে পারে অভ্যাসলব্ধ আচরণে সে সম্পূর্ণতা ও ত্রুটি বহুলাংশে দূর হয়ে গিয়ে আচরণটি ত্রুটিহীন, নিখুঁত ও অনেক বেশী কার্যকর হয়ে ওঠে।

পঞ্চমত, অভ্যাস হল নতুন আচরণ আয়ত্তীকরণের জন্য অপরিহার্য সোপান বিশেষ। যে কোন নতুন আচরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হলে তার পূর্বগামী আচরণগুলিতে অভ্যস্ত হতে হয়।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষার অগ্রগতির জন্য অভ্যাস-গঠন অপরিহার্য। শিক্ষণীয় আচরণগুলি যতই অভ্যাসে পরিণত হবে শিক্ষার্থীর পক্ষে ততই নতুন শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হবে। এই সব কারণে অভ্যাসকে কেবলমাত্র একটি যান্ত্রিক আচরণ বলে গণ্য করা ভুল হবে। জন ডিউই অভ্যাস-গঠনকে ব্যক্তির ধারাবাহিক শিক্ষা-প্রবাহের একটি সক্রিয় অঙ্গ বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে যখন একটি অভ্যাসের সৃষ্টি হয় তখন সে অভ্যাস ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের মধ্যেই পরিবর্তন সৃষ্টি করে এবং তার পরবর্তী শিক্ষার প্রকৃতিও এই পরিবর্তনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে ওঠে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষাকে অভ্যাস দু'দিক দিয়ে সাহায্য করে। প্রথম, শিক্ষার্থীর প্রচেষ্টা ও মনোযোগের অপচয় বাঁচিয়ে তাকে নতুন শিক্ষাগ্রহণে সমর্থ করে এবং দ্বিতীয়, শিক্ষার্থীর মানসিক সংগঠনে পরিবর্তন এনে তার পক্ষে ভবিষ্যৎ শিক্ষাগ্রহণকে সহজ করে তোলে।

অভ্যাসের অপকারিতা (Abuses of Habit)

অভ্যাসের যেমন অনেকগুলি গুণ আছে তেমনই কতকগুলি গুরুতর দোষও আছে, যথা—

প্রথমত, অভ্যাস মাত্রেই একবার অর্জিত হলে সহজে দূর হতে চায় না। প্রয়োজনের সময় অভ্যাসের সৃষ্টি যেমন ব্যক্তির পক্ষে সহায়ক, তেমনই প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে সে অভ্যাস দূর করা একই রকম কষ্টকর।

দ্বিতীয়ত, অভ্যাস যান্ত্রিক প্রকৃতির এবং এর মধ্যে কোন অভিনবত্ব আনা যায় না। ব্যক্তির মধ্যে একবার সৃষ্ট হয়ে গেলে অভ্যাস তার গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করেই চলে।

তৃতীয়ত, যে অভ্যাস পুরোপুরি যান্ত্রিক অর্থাৎ যে অভ্যাস উদ্দেশ্যহীনভাবে আহরিত সে অভ্যাস শিক্ষার প্রতিবন্ধক। অনেক সময় ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা পরিকল্পনার চাপে এমন কতকগুলি অভ্যাস শিশু অর্জন করে যেগুলি সম্পূর্ণ

উদ্দেশ্যহীন ও যান্ত্রিক। সেগুলি শিশুর অগ্রগতির পথে পরম বিঘ্ন হয়ে ওঠে এবং শিক্ষার সহজ সম্পাদনে বাধার সৃষ্টি করে। অতএব দেখতে হবে, শিশু যখন কোন অভ্যাস আহরণ করে তখন যেন সে সেই অভ্যাসের সার্থকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন থাকে। উদ্দেশ্যহীন ও অন্ধভাবে অর্জিত অভ্যাস মানসিক শক্তি ও প্রচেষ্টার নিছক অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

পিতামাতা ও শিক্ষকদের অবহেলার জন্য শিশু এমন কতকগুলি অবাঞ্ছনীয় অভ্যাস আহরণ করতে পারে যেগুলি তার সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তা গঠনের পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর। যে সকল ছেলেমেয়ের শৈশবকালীন আচরণ গঠনের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় না তারা বড় হয়ে কথা বলা, পড়া, লেখা, পোষাক পরা, শারীরিক স্বাস্থ্যের নিয়মকানুন মানা ইত্যাদি আচরণগুলি সম্বন্ধে নানা ক্রটিপূর্ণ অভ্যাস অর্জন করে এবং বড় হয়ে সেগুলি পরিবর্তন করা তাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। যেমন, অশুদ্ধ উচ্চারণ করা, হাতের লেখা খারাপ হওয়া, ঠিক মত পড়তে না পারা, অপরের সঙ্গে উপযুক্ত আচরণ করতে না পারা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার নিয়মাদি না মানা ইত্যাদি অবাঞ্ছিত অভ্যাসগুলি বড়দের অবহেলার জন্যই শিশুরা আহরণ করে থাকে।

চিন্তনের অভ্যাস (Habit of Thinking)

এত গেল আচরণমূলক অভ্যাসের কথা। এছাড়া আরও দু'শ্রেণীর অভ্যাস আছে, যা শিশুর আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। সে দুটি হল চিন্তার অভ্যাস এবং ইচ্ছার অভ্যাস। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই দু'শ্রেণীর অভ্যাসের গুরুত্ব যথেষ্ট। কোন কিছু সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করার মধ্যেও প্রচুর প্রচেষ্টা এবং মনোযোগের প্রয়োজন হয়। চিন্তন হল প্রতীকমূলক আচরণ। বিভিন্ন প্রতীকগুলিকে সুসংহতভাবে ব্যবহার করার উপর সুষ্ঠু চিন্তন নির্ভর করে। চিন্তনের প্রক্রিয়ার উপর যার নিয়ন্ত্রণ নেই তার চিন্তা পরস্পরবিরোধী, অসংবদ্ধ ও অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু যদি চিন্তনের অভ্যাস গঠন করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে কোন রকম প্রয়াস ও মনোযোগ ছাড়াই তখন চিন্তা করা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া চিন্তনের মধ্যে যখন সামঞ্জস্য, সংহতি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা সম্ভব হয় তখনই চিন্তন কার্যটি অভ্যাসের পর্যায়ে উঠতে পারে। সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তা করার অভ্যাস থাকলে চিন্তন আয়াসহীন ও সার্থক হয়ে ওঠে।

ইচ্ছার অভ্যাস (Habit of Willing)

তেমনই, ইচ্ছা প্রয়োগের অভ্যাসও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইচ্ছা

প্রয়োগের অভ্যাস থাকলে দ্বিধা, অনিশ্চয়তা, সংশয় প্রভৃতির দ্বারা কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে না। প্রায়ই দেখা গেছে যে বিভিন্ন চিন্তার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ফলে ব্যক্তির পক্ষে সুনির্ধারিত কর্মসূচী অনুসরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ইচ্ছার অভ্যাসই একমাত্র ব্যক্তির ইচ্ছাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুনিশ্চিত পথে পরিচালিত করতে পারে। যে ব্যক্তির ইচ্ছা প্রয়োগের অভ্যাস নেই তার মধ্যে সংকল্পের দৃঢ়তা থাকে না এবং তার পক্ষে কোনও সুপরিকল্পিত ও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না।

কু-অভ্যাস দূর করার উপায়

সু-অভ্যাস যেমন উপকারী, কু-অভ্যাস তেমনই ক্ষতিকর। ব্যক্তির সদিচ্ছা থাকলেও কোন অভ্যাসের বশবর্তী হলে সে বাঞ্ছিত আচরণটি সম্পন্ন করতে পারে না বা অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে নিবৃত্ত হতে পারে না। এই জন্য অভ্যাসকে 'দ্বিতীয় স্বভাব' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শিশুর মধ্যে যাতে কু-অভ্যাসের সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত এবং যদি কোনও কারণে কোন অবাঞ্ছিত অভ্যাস তার মধ্যে সৃষ্ট হয়ে যায় তাহলে অবিলম্বে তা দূর করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

শিশুর কোন বিশেষ কু-অভ্যাস দূর করতে হলে নীচের উপায়গুলি অবলম্বন করা দরকার।

প্রথমত, অভ্যাসটির অপকারিতা সম্বন্ধে শিশুকে অবহিত করতে হবে। অভ্যাসটি যে দূর করা দরকার এই বোধটি তার মধ্যে প্রথমে জাগাতে হবে কোন অভ্যাস দূর করতে হলে সচেতন মানসিক প্রয়াসের প্রয়োজন এবং তা একমাত্র দেখা দিতে পারে যদি অভ্যাসটির অবাঞ্ছনীয়তা সম্পর্কে শিশুর মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি করা যায়।

দ্বিতীয়ত, কোন অভ্যাসকে নষ্ট করতে হলে যথেষ্ট মানসিক শক্তি বা ... প্রয়োজন। শিশু যাতে সেই ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য উপযুক্ত মানসিক দৃঢ়তা ও সংকল্প তার মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে। এই মানসিক দৃঢ়তা বা সংকল্প সহজে শিশুর মধ্যে সৃষ্টি করা যায় না। এর জন্য প্রয়োজন সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতা ও বিচক্ষণ সুপরিচালনা।

তৃতীয়ত, প্রত্যেক অভ্যাসগত আচরণই ব্যক্তির কাছে তৃপ্তিদায়ক। সেজন্য কোন মন্দ অভ্যাস দূর করতে হলে সেটিকে শিশুর কাছে বিরক্তিকর করে তুলতে হবে। অর্থাৎ শিশু যখন সেই অভ্যাসটি সম্পন্ন করবে তখন যেন তার মধ্যে

বিরক্তি বা অসন্তোষ জাগে। তার ফলে স্বাভাবিকভাবেই অভ্যাসটি দূরীভূত হবে। সমালোচনা, বোঝান, মনোবিজ্ঞানমূলক শাস্তি, নিন্দা ইত্যাদির সাহায্যে শিশুর মধ্যে এই বিরক্তি বা অসন্তোষের সৃষ্টি করা যায়। তবে এই উপকরণগুলি যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে ও সংযতভাবে ব্যবহার করতে হবে, কেননা এগুলির অতিরিক্ত বা অসংযত ব্যবহার কাম্য ফলের বদলে অকাম্য ফলেরই সৃষ্টি করে।

চতুর্থত, অভ্যাস মাত্রেই অনুবর্তন প্রক্রিয়ার ফল। অতএব যদি অভ্যাস সম্পাদনের মাঝে মাঝে বাধা দেখা দেয় তাহলে সে অভ্যাস দুর্বল হয়ে উঠে। এইজন্য শিশু যখন কোন অবাঞ্ছিত অভ্যাস সম্পন্ন করবে তখন তার আচরণে বাধার সৃষ্টি করা যেতে পারে। অনুবর্তন দূর করার একটি পন্থা হল অনুবর্তন থেকে জাত তৃপ্তি বা সন্তুষ্টির উৎসটি বন্ধ করা এবং তার ফলেই অপানুবর্তন দেখা দেবে। দেখতে হবে যে শিশু ঐ অভ্যাসটি থেকে যে তৃপ্তি আহরণ করে সেটি সে যেন আর করতে না পারে।

পঞ্চমত, কু-অভ্যাস দূর করার একটি প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে তার বিপরীত অভ্যাসটি গঠন করা। শিশুর যে অভ্যাসটি দূর করতে হবে তার বিপরীতধর্মী অভ্যাসটি যদি তার মধ্যে গঠন করা যায় তাহলে ঐ অবাঞ্ছিত অভ্যাসটি নিজে নিজেই চলে যাবে।

ষষ্ঠত, অনেক সময় বিশেষ বিশেষ পরিবেশের প্রভাবেই নানা অভ্যাস গড়ে ওঠে। এই সব ক্ষেত্রে পরিবেশের পরিবর্তন করাই অভ্যাসটি দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়।

সপ্তমত, সুপরিচালনা কু-অভ্যাস দূরীকরণ ও সু-অভ্যাস গঠনের অপরিহার্য উপকরণ। কোন্ ধরনের আচরণ শিশুর সাফল্যের পক্ষে সহায়ক এবং কোন্গুলি নয় সে সম্বন্ধে তার মনে দৃঢ়বদ্ধ ধারণার সৃষ্টি করতে হবে। উপযুক্ত সুপরিচালনার ফলে শিশু তার নিজের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করতে শিখবে এবং যে অভ্যাসটি সে মন্দ বলে মনে করবে সেটি সে নিজেই দূর করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করবে।

একুশ

কাজ ও ক্লান্তি (Work and Fatigue)

ব্যাপক অর্থে সকল আচরণই এক প্রকারের কাজ। কিন্তু সাধারণত আমরা 'কাজ' কথাটি একটা সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে থাকি। সেই সব আচরণকে আমরা কাজ বলে থাকি যেগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণ দক্ষতার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক কাজের ক্ষেত্রেই এই প্রয়োজনীয় দক্ষতার একটি নিম্নতম মান আছে এবং দক্ষতার সেই মান পর্যন্ত যতক্ষণ না পৌছান যাচ্ছে ততক্ষণ ঐ আচরণটিকে কাজ বলা হবে না।

কাজের সঙ্গে অভ্যাসের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। প্রতি কাজের মধ্যেই অভ্যাসের প্রয়োগ অপরিহার্য। এ দিক দিয়ে নানা মানসিক এবং শারীরিক অভ্যাসের বিভিন্ন মাত্রায় প্রযোগকেই কাজ বলা চলতে পারে।

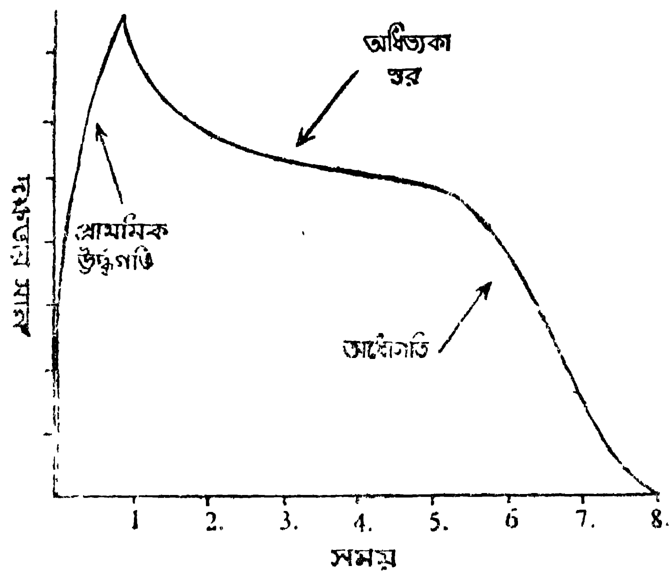
কাজ মাত্রেই শিখনের উপর নির্ভরশীল। কাজ সম্পন্ন করতে হলে প্রযোজন শারীরিক ও মানসিক অভ্যাসের প্রয়োগ এবং সেই শারীরিক ও মানসিক অভ্যাস আহরণে আমাদের সক্ষম করে শিখন। সেদিক দিয়ে শিখনের একটি নতুন সংজ্ঞা দেওয়া যায়, কাজের অনুমোদিত মান-সম্মত অভ্যাস গঠন করার নাম হল শিখন।

কাজের সম্পাদনে শারীরিক এবং মানসিক এই দু'ধরনের প্রচেষ্টারই প্রয়োজন হয়। সেজন্য অনেকে কাজকে শারীরিক ও মানসিক এই দু'শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এধরনের শ্রেণীবিভাগ সম্ভব নয়, কেননা শারীরিক ও মানসিক দু'ধরনের কাজের পেছনেই আছে স্নায়ুমূলক ও পেশীমূলক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ব্যবহার। তবে শারীরিক কাজ ও মানসিক কাজের মধ্যে একদিক দিয়ে পার্থক্য করা যেতে পারে। শারীরিক কাজে ব্যবহৃত প্রতিক্রিয়ক যন্ত্র ও পেশীগুলি মানসিক কাজে ব্যবহৃত প্রতিক্রিয়ক যন্ত্র ও পেশীগুলির তুলনায় আকৃতির দিক দিয়ে যেমন বড়, সংখ্যাতেও তেমনই বেশী। অতএব দেখা যাচ্ছে যে কাজ বলতে বোঝায় বিশেষ কোন দক্ষতামূলক আচরণ এবং সেই দক্ষতা আমরা লাভ করে থাকি শিখনের মাধ্যমে। কিন্তু প্রকৃত কাজের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে দক্ষতা আহরণ করলেই সেই দক্ষতার মান সব সময় বজায় রাখা যায় না। নানা কারণে কাজের দক্ষতা বিভিন্ন সময়ে কমতে বাড়তে থাকে। তাছাড়া কেবলমাত্র শিখনের মাত্রার দ্বারাই কাজের দক্ষতা নির্ধারিত হয় না, অনেক বিভিন্ন শক্তির প্রভাবের দ্বারাই কাজের দক্ষতা নিরূপিত হয়ে থাকে।

কাজের রেখাচিত্র (Work Curve)

কাজের দক্ষতার এই পরিবর্তনের একটি চিত্ররূপ দেওয়া যেতে পারে। এটিকে সাধারণত কাজের রেখাচিত্র (Work Curve) বলা হয়। এই রেখা-চিত্রটিকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এর সুনির্দিষ্ট তিনটি পর্যায় আছে। প্রথম, প্রাথমিক উর্দ্ধগতি (Initial Spurt), দ্বিতীয়, অধিত্যকা কাল (Plateau Period) এবং তৃতীয়, অধোগতি (Fall)।

প্রথমেই যখন কাজ সুরু হয় তখন ব্যক্তির দক্ষতা ও উৎকর্ষের একটা প্রাথমিক উর্দ্ধগতি (Initial Spurt) দেখা যায়। এই সময় কর্মী কাজ সুরু



কাজের রেখাচিত্র

করার আনন্দ ও উৎসাহে তার সবশক্তির প্রয়োগ করে এবং তার কাজের দক্ষতা তখন সর্বোচ্চ বিন্দুতে গিয়ে ওঠে। তারপর তার দক্ষতা ক্রমশ কমতে থাকে এবং শীঘ্রই সে এমন একটি বিন্দুতে এসে পৌঁছয় যখন তার দক্ষতার এই নিম্নগতি বন্ধ হয়ে যায় এবং তার দক্ষতা একটা সাম্যাবস্থা ধারণ করে। বেশ কিছু কাল ধরে এই অপরিবর্তিত অবস্থা বজায় থাকে। এই সময়টিকে অধিত্যকা কাল (Plateau Period) বলা হয়ে থাকে। এই সময়ে কাজের দক্ষতার মান কমেও না, বাড়েও না।

অনিত্যকা কালের শেষে দেখা দেয় অধোগতি (Fall)। এবার ধীরে ধীরে কাজের দক্ষতার মান নামতে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কাজটি শেষ হবার সময় আবার একটা আকস্মিক উর্ধ্বগতি দেখা দেয়। এটি ঘটে তখনই যখনই কর্মীরা বোঝে যে কাজের সমাপ্তি নিকটবর্তী এবং তাদের আর কাজ করতে হবে না। এই ঘটনাটিকে আমরা প্রান্তীয় উর্ধ্বগতি (End Spurt) বলতে পারি। এই ঘটনাটি অবশ্য সর্বজনীন ঘটনা নয় এবং যেখানে কর্মীরা কাজের সমাপ্তি সম্পর্কে সচেতন নয় সেখানে এই প্রান্তীয় উর্ধ্বগতি দেখা যায় না। প্রেষণার পরিবর্তনই হল কাজের শেষের দিকে এই দক্ষতার উন্নতির কারণ।

কাজের রেখাচিত্রের এই বৈশিষ্টগুলি প্রথম আবিষ্কার করেন ক্রেপেলিনের ছাত্র এ্যাক্সেল ওহর্ন (Axel Oehrn) ১৮৮৯ সালে। তিনি দশজন অধ্যাপক ও ছাত্রদের নানা রকম বিষয়বস্তু শেখার কাজ দেন এবং তাঁদের দক্ষতার পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করেন। তাঁর পরীক্ষণের ফলাফল থেকেই তিনি উপরের সিদ্ধান্তগুলি গঠন করেন।

প্রাথমিক উর্ধ্বগতির পর যে বিন্দুতে ক্লান্তির সুরু হয় সে বিন্দুকে চরম দক্ষতার বিন্দু বলা হয়। ওহর্ন দেখেন যে বিভিন্ন কাজে চরম দক্ষতার বিন্দু বিভিন্ন, যেমন, এই চরম দক্ষতার বিন্দু দেখা দেয় অর্থহীন শব্দশিক্ষার ক্ষেত্রে ১৪ মিনিট পরে, শ্রুতিলিখনের ক্ষেত্রে ২৬ মিনিট পরে, যোগ অঙ্কের ক্ষেত্রে ২৮ মিনিট পরে, পড়ার ক্ষেত্রে ২৮ মিনিট পরে, একটি একটি করে অক্ষর গোনার ক্ষেত্রে ৩৯ মিনিট পরে, তিনটি তিনটি করে অক্ষর গোনার ক্ষেত্রে ৫৯ মিনিট পরে এবং সংখ্যা শেখার ক্ষেত্রে ৬০ মিনিট পরে।

ক্লান্তি ও প্রেষণা

একবার কাজটি সুরু হলে কাজের দক্ষতার মান এবং কাজের রেখাচিত্রের প্রকৃতি দু'টি বস্তুর দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। সে দুটি হল ক্লান্তি এবং প্রেষণা। এছাড়া কাজের পরিবেশ, কর্মীদের মানসিক দৃঢ়তা প্রভৃতি বিষয়-গুলিও কাজের দক্ষতাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে থাকে। আগের পাতায় কাজের যে রেখাচিত্রটি দেওয়া হয়েছে সেটির সৃষ্টির পেছনে নানা মাত্রা এবং প্রকৃতির প্রেষণার প্রভাব কাজ করতে পারে।

ত্রিবিধ ক্লান্তি

ব্যক্তির উপর ক্লান্তির প্রভাব সর্বজনীন প্রকৃতির এবং সেজন্য এর প্রভাবের কাল, প্রকৃতি এবং পরিমাপ কতকগুলি সুনির্দিষ্ট সূত্র মেনে চলে। কাজ করার

সময় সমগ্র ব্যক্তিটির মধ্যে মনোবিজ্ঞানমূলক এবং শরীরতত্ত্বমূলক অবস্থায় যে পরিবর্তন ঘটে, আধুনিক মতবাদ অনুযায়ী তাকেই ক্লান্তি বলা হয়। কোন কাজ করতে করতে ব্যক্তির মধ্যে নানারকম মানসিক এবং দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের ফলে তার দক্ষতার মানের অবনতি ঘটে। একেই আমরা ক্লান্তি বলি। বিভিন্ন পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে ব্যক্তির মধ্যে তিন শ্রেণীর ক্লান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

(১) কাজের অনুভূতি বা ব্যক্তিগত বা মানসিক ক্লান্তি।
(২) দেহগত পরিবর্তন বা শারীরিক ক্লান্তি।
(৩) কাজের মানের অবনতি বা বস্তুমূলক ক্লান্তি।

১। কাজের অনুভূতি বা ব্যক্তিগত বা মানসিক ক্লান্তি

কিছুক্ষণ একটি কাজ করার পর কর্মীর মনে কাজ সম্পর্কে অনুভূতিটি ধীরে ধীরে বদলাতে থাকে। কাজের প্রথম দিকে তার মধ্যে যে আনন্দ বা উৎসাহের ভাবটি থাকে, সেটি যত সময় যায় তত কমে আসে। একেই আমরা ব্যক্তিগত বা মানসিক ক্লান্তি বা একঘেয়েমী বলে থাকি। পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে কাজের সুরু থেকেই ব্যক্তিগত ক্লান্তিবোধ সুরু হয়। তবে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ এবং মানসিক সংগঠনের উপর এই কাজের অনুভূতি বা ব্যক্তিগত ক্লান্তির মাত্রা নির্ভর করে। ব্যক্তিগত ক্লান্তির উপর নীচের পরীক্ষণ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য।

একটি পরীক্ষণে একশ জন লরীচালকের লরী চালানোর বিভিন্ন সময়ে ঐ কাজটি সম্পর্কে তাদের ব্যক্তিগত ক্লান্তি পরিমাপ করা হয়। দেখা যায় যে কাজের সুরুতে শতকরা ৬৬ জনের ঐ কাজটি সম্পর্কে সন্তোষজনক মনোভাব ছিল। ১ ঘন্টা থেকে ৯ ঘন্টার মধ্যে ৪৮ জন কাজটিকে ক্লান্তিকর মনে করে এবং ১০ ঘন্টা পরে মাত্র শতকরা ১৫ জন কোন ক্লান্তি অনুভব করে না। কিন্তু বাকী শতকরা ৮৫ জনের কাছেই কাজটি অল্পবিস্তর ক্লান্তিকর বলে মনে হয়। থর্নডাইকের আর একটি পরীক্ষণে ২৯ জন ব্যক্তিকে দু'ঘন্টার জন্য ছাপান লেখা সাজানোর ভার দেওয়া হল। প্রতি ২০ মিনিট অন্তর কাজটি করার সময় কর্মীদের তৃপ্তির গড়পড়তা স্কোর পাওয়া গেল এইরূপ—৪'১, ৪'০, ৩'৬, ৩'৪, ২'৮, ২'৬। এখানে দেখা যাচ্ছে যে যত সময় যাচ্ছে ততই কর্মীদের ব্যক্তিগত বা মানসিক ক্লান্তি বেড়ে চলেছে।

কাজের তৃপ্তির এই অবনতি কাজের প্রকৃতির উপর অনেকখানি নির্ভর করে। একে আমরা প্রেষণার প্রভাব বলে বর্ণনা করতে পারি। পফ্‌ক্লেনবার্জার

(Poffenberger) তাঁর একটি পরীক্ষণে চারটি বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের সময় কর্মীদের কাজের অনুভূতির পরিবর্তন পরিমাপ করেন। এই কাজ চারটি হল বুদ্ধির অভীক্ষা, বাক্যসম্পূর্ণকরণ, রচনাবিচার এবং যোগকরণ। দেখা গেছে যে এই চার প্রকারের কাজে অনুভূতির অবনতি বুদ্ধির অভীক্ষার ক্ষেত্রে হয় মাত্র ১'৩, বাক্য-সম্পূর্ণকরণে, হয় ২'৭. রচনাবিচারে হয় ২'৩ এবং যোগকরণে হয় ২'২। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ক্লান্তি কাজের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল.

২। দেহগত পরিবর্তন ও শারীরিক ক্লান্তি

প্রাচীন শরীরতত্ত্ববিদেরা ক্লান্তিকে শরীরের মধ্যে দূষিত পদার্থের সঞ্চয় থেকে জাত এক ধরনের রাসায়নিক অবস্থা বলে বর্ণনা করেছেন। তার কারণ হল যে তাঁরা দেখেছিলেন যে কাজের সময় স্নায়ুতন্ত্র থেকে কার্বনডাইঅক্সাইড এবং উত্তাপ নির্গত হয় এবং পেশীগুলির মধ্যে কার্বনডাইঅক্সাইড এবং ল্যাকটিক এ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়। কিন্তু আধুনিক পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এই কারণে শরীরের মধ্যে এমন কোন রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না যার দ্বারা কাজের দক্ষতা কমে যেতে পারে। বস্তুত আধুনিক শরীরতত্ত্বমূলক পরীক্ষণগুলি থেকে ক্লান্তির কোনরূপ সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। মানসিক কাজ এবং বিশ্রামের সময় শরীরে যে পরিবর্তন ঘটে তার সঙ্গে তুলনা করলে কাজের সময় একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হল হৃদ্‌স্পন্দনের গতি-বেগের বৃদ্ধি। হৃদ্‌স্পন্দনের এই দ্রুতগতির জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত ক্যালোরি। এই জন্য যারা বেশী কাজ করে তাদের ক্যালোরির অভাব পরিপূরণের জন্য অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ করতে হয়।

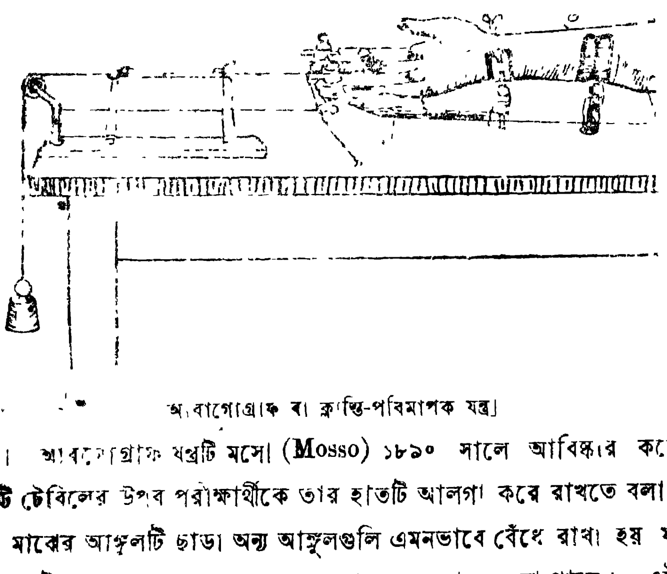
সাধারণ অবস্থায় কাজ করার সময় যে সব শারীরিক চাহিদা দেখা দেয় সেগুলি পূরণ করার ব্যবস্থা শরীরের মধ্যেই থাকে। যেমন, অতিরিক্ত অক্সি-জেনের চাহিদা মেটাবার জন্য নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের হার, রক্তের চাপ ও হৃদ্‌স্পন্দনের গতি প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়। হৃদ্‌স্পন্দনের হার বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য শরীরের মধ্যে অতিরিক্ত শর্করার নিঃসরণ নিজে নিজেই হয়। শরীরের উত্তাপের নিয়ন্ত্রণও নিজে নিজেই শরীরের যন্ত্রপাতির দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। অর্থাৎ এক কথায় কাজের সময় শারীরিক সাম্যাবস্থা (Homeostasis) অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা শরীরের মধ্যে থাকে। তবে কাজটি যদি অতিরিক্ত শ্রমসাধ্য হয় বা ব্যক্তির সহনশীলতা যদি কম হয় বা বাইরের উত্তাপ বা শৈত্য খুব বেশী বা খুব কম হয় তবে ব্যক্তির এই সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়ে যায় এবং তার মধ্যে ক্লান্তি দেখা দেয়।

ক্লান্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় কাজের মানের অবনতি এবং শেষ পর্যন্ত কাজটি বন্ধ হয়েই যায়।

৩। কাজের মানের অবনতি বা বস্তুমূলক ক্লান্তি

কোন কাজ বেশ কিছুক্ষণ ধরে করলে ধীরে ধীরে কাজের মানের অবনতি ঘটতে থাকে। একেই বস্তুমূলক ক্লান্তি বলা হয়। কাজের রেখাচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে কাজ সুরু হওয়ার পরেই কাজের পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে ওঠে। এটিকে আমরা প্রাথমিক উর্ধ্বগতি বলে বর্ণনা করেছি। এ সময় কর্মীর মধ্যে উদ্যম ও উদ্দীপনা অক্ষুণ্ণ অবস্থায় থাকে এবং কাজে হাত দেবার কিছু পরেই সে উৎসাহিত (Warming up) হয়ে ওঠে। এই উৎসাহের স্তরেই কর্মী কাজের সর্বোচ্চ মানের বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছয়। কিন্তু তার পর থেকেই কাজের মানের পতন ঘটে এবং কিছুটা পতনের পর কাজের মান বেশ কিছুক্ষণ অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে অর্থাৎ আর পতন হয় না। একেই অধিত্যকা কাল (Plateau Period) বলা হয়। এই অধিত্যকা কালের শেষে আবার কাজের মানের পতন সুরু হয়। ক্লান্তির পরিমাণ যদি খুব বেশী হয় তাহলে কাজ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।

কাজের অবনতির হার ও পরিমাণ সম্পর্কে বহু পরীক্ষণ করা হয়েছে। আরগোগ্রাফ (Ergograph) নামক যন্ত্রটির সাহায্যে এই ক্লান্তির পরিমাপ করা

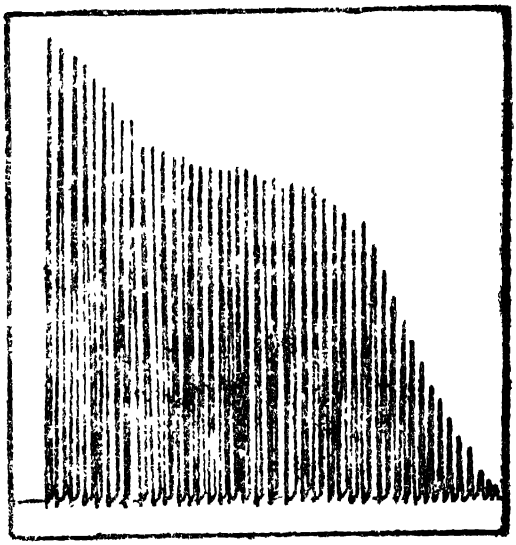


আরগোগ্রাফ বা ক্লান্তি-পরিমাপক যন্ত্র

যায়। আরগোগ্রাফ যন্ত্রটি মসো (Mosso) ১৮৯০ সালে আবিষ্কার করেন। একটি টেবিলের উপর পরীক্ষার্থীকে তার হাতটি আলগা করে রাখতে বলা হয় এবং মাঝের আঙুলটি ছাড়া অন্য আঙুলগুলি এমনভাবে বেঁধে রাখা হয় যাতে ঐ একটি আঙুল ছাড়া অন্য কোন আঙুল সে নাড়তে না পারে। এইবার

মাঝের আঙুলের সঙ্গে দড়ি দিয়ে একটি ভারি বস্তু বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এবং ব্যক্তিকে ঐ আঙুলটি দিয়ে ঐ বস্তুটি সামনের দিকে টানতে বলা হয়। একটি কিমোগ্রাফের সঙ্গে একটি ষ্টাইলাস সংযুক্ত থাকে এবং ঐ ষ্টাইলাসটির দ্বারা পরীক্ষার্থীর প্রতিটি টানের একটি চিত্ররূপ ঐ কিমোগ্রাফের উপর আঁকা হয়ে যায়। এই চিত্রটিকে আরগোগ্রাম (Ergogram) বলা হয়। নীচে একটি আরগোগ্রামের ছবি দেওয়া হল।

নীচের আরগোগ্রাম থেকে দেখা যাবে যে পরীক্ষার্থীর প্রথম দিকে টানগুলি বেশ লম্বা লম্বা ছিল কিন্তু যত সময় যাচ্ছে তত টানের দৈর্ঘ্য কমে আসছে এবং অবশেষে টান একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝামাঝি অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ টানের দৈর্ঘ্যটি প্রায় একই রয়েছে। এটি হল অধিত্যকা কাল। আরগোগ্রামও এক ধরনের কাজের রেখাচিত্র। সেই জন্য দেখা যাবে এতেও প্রাথমিক ঊর্ধ্বগতি, অধিত্যকার স্তর এবং ক্রমপতন—এই তিনটি পর্যায় পর পর রয়েছে। কাজের অবনতির হার ও পরিমাণ নানা কারণের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তির নিজস্ব কর্মক্ষমতা, প্রেষণা, মানসিক দৃঢ়তা, কাজের প্রকৃতি, কাজের সময় ও পরিবেশ প্রভৃতির দ্বারা



[আরগোগ্রাম বা ক্লান্তির রেখাচিত্র]

বস্তুমূলক ক্লান্তি বা কাজের অবনতি নিয়ন্ত্রিত হয়। এই বস্তুগুলি বিভিন্ন হওয়ার জন্য বস্তুমূলক ক্লান্তি বা কাজের অবনতি বিভিন্ন কাজের বেলায় বিভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে।

ক্লান্তির কারণ

ক্লান্তির কারণ বহুবিধ হতে পারে। সাধারণভাবে আমরা সেগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি। যথা—

(১) পারিবেশিক কারণ, (২) শারীরিক কারণ ও (৩) মানসিক কারণ।

১। পারিবেশিক কারণ

যে পরিবেশে কাজটি করা হয় কাজটির সম্পাদনের মান ও প্রকৃতির উপর সেই পরিবেশের প্রচুর প্রভাব থাকে। বিভিন্ন পরিবেশে একই কাজের সম্পাদনের মান বিভিন্ন হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক কাজের উপর পরিবেশের প্রভাব যথেষ্ট উল্লেখ্যযোগ্য। অত্যন্ত গরম, অত্যন্ত শীত বা গুমোট আবহাওয়ায় কোন কাজ ভালভাবে করা যায় না এবং ক্লান্তি সহজে আসে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক আবহাওয়ায় ক্লান্তি সহজে আসে না। তাছাড়া কাজের সম্পাদনের উপর আলো, হাওয়া, শব্দ ইত্যাদিরও যথেষ্ট প্রভাব আছে।

২। শারীরিক কারণ

স্বাভাবিক অবস্থায় অতিরিক্ত পরিশ্রম হলে শারীরিক ক্লান্তি দেখা যায়। আমাদের দেহের পরিশ্রম করার ক্ষমতার একটা সীমা আছে। কাজ করতে করতে যখন এই সীমায় পৌঁছান যায় তখন দেহের কর্মক্ষমতা কমে আসে এবং ক্লান্তি দেখা দেয়। বিশ্রামের পর আবার এই কর্মক্ষমতা ফিরে আসে।

তবে শরীরের অবস্থার উপরও শারীরিক ক্লান্তি অনেকখানি নির্ভর করে। যে ব্যক্তির প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশী তার ক্লান্তি দেরীতে দেখা দেয়। কিন্তু দুর্বল, অসুস্থ বা পুষ্টিহীন শরীর অতি সহজেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে।

৩। মানসিক কারণ

দেখা গেছে যে কোন কাজ করতে করতে এমন সময় আসে যখন কাজটি সম্পর্কে কর্মীর মধ্যে একঘেয়েমী বা বিরক্তিকর মনোভাব দেখা দেয়। প্রথম প্রথম কাজটি সম্পর্কে ব্যক্তির মনে তৃপ্তির মনোভাব থাকে কিন্তু পরে যত কাজটি এগোয় তত এই মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে বিরূপ এবং বিরক্তিকর মনোভাবের রূপ নেয়। একেই ব্যক্তিগত ক্লান্তি বলা হয়েছে। এই ক্লান্তি নানা কারণে দেখা দেয়।

প্রথমত, কাজটি করার পেছনে যে প্রেষণা থাকে তার উপরেই এই মনোভাবটি নির্ভর করে। যদি কাজের প্রেষণাটি অত্যন্ত তীব্র হয় তাহলে এই একঘেয়েমী ভাব সহজে দেখা দেয় না। কিন্তু প্রেষণা যদি দুর্বল বা কৃত্রিম হয় তাহলে কর্মীর কাছে সেই প্রেষণার আবেদন স্থায়ী হয় না এবং কিছুক্ষণ পরেই ক্লান্তি দেখা দেয়। আবার কাজটি যদি বহুক্ষণ চালিয়ে যাওয়া যায় তাহলে যথেষ্ট প্রেষণা থাকা সত্ত্বেও এমন একটা সময় আসে যখন ক্লান্তি দেখা দেবেই।

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক কাজের জন্যই প্রয়োজন প্রচেষ্টা। এই প্রচেষ্টা প্রকৃতিতে যেমন দৈহিক তেমনই মানসিকও। দৈহিক প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন হল দৈহিক প্রতিক্রিয়ক যন্ত্রগুলির যথাযথ প্রয়োগ। কিন্তু মানসিক প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজন

মানসিক প্রস্তুতি। এই মানসিক প্রস্তুতির স্বরূপ ও স্থায়িত্বের উপর ক্লান্তি নির্ভর করে। যদি মানসিক প্রস্তুতি দুর্বল হয় তবে কাজের মধ্যে শীঘ্রই ক্লান্তি দেখা দেয় আর যদি মানসিক প্রস্তুতি দৃঢ় হয় তাহলে ক্লান্তিও বিলম্বিত হয়। মানসিক প্রস্তুতি নির্ভর করে নানা বিষয়ের উপর। প্রথমত. কাজটির দ্বারা কর্মীর ব্যক্তিগত চাহিদা কতটুকু তৃপ্ত হচ্ছে তার উপর। যদি কাজটি ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা তৃপ্ত করতে পারে তাহলে কাজটির জন্য তার মানসিক প্রস্তুতি স্বাভাবিক ও সবল হয়ে থাকে, আর যদি কাজটি ব্যক্তির চাহিদার বহির্ভূত হয় অর্থাৎ অপরের দ্বারা তার উপর আরোপিত হয় তাহলে ব্যক্তির মানসিক প্রস্তুতি কৃত্রিম ও দুর্বল হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়, ব্যক্তির চাহিদা ছাড়াও আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানসিক প্রস্তুতিকে প্রভাবিত করে। সেগুলি হল কাজটি সম্পর্কে কর্মীর পছন্দ অপছন্দ, কাজের পরিবেশ সম্পর্কে কর্মীর মনোভাব ইত্যাদি।

ক্লান্তির মানসিক কারণের মধ্যে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেটিকে কাজের মোরেল (Morale) বা মানসিক দৃঢ়তা বলা হয়ে থাকে। প্রতি কাজেতেই ব্যক্তিকে তার ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করতে হয়। এই ইচ্ছাশক্তিই তার মনোযোগকে অটুট রাখে এবং তার উদ্যমকে ক্ষুণ্ণ হতে দেয় না। কাজের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য এই ইচ্ছাশক্তি বা মানসিক দৃঢ়তা অপরিহার্য। যতক্ষণ এই মানসিক দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ থাকবে ততক্ষণ ক্লান্তি সহজে দেখা দেবে না। আর যদি কোন কারণে এই মানসিক দৃঢ়তার অভাব হয় তাহলে ক্লান্তি ও অবসাদের ফলে কাজের অগ্রগতি বন্ধ হয়ে যাবে। বড় বড় কারখানার কর্মীদের মধ্যে এই মানসিক দৃঢ়তা অক্ষুণ্ণ রাখার একটা প্রধান উপায় হল কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট নিরাপত্তার বোধ সৃষ্টি করা। নিজের কাজ, নিজের বা আপন জনের ভবিষ্যৎ, নিজের স্বাস্থ্য বা শারীরিক মঙ্গল প্রভৃতি সম্পর্কে যদি কর্মীদের মধ্যে নিরাপত্তা-বোধের অভাব দেখা দেয় তাহলে এই মানসিক দৃঢ়তা স্বভাবতই কমে যায়।

ক্লান্তি অপনোদনের উপায়

শিক্ষার ক্ষেত্রে ক্লান্তির সূত্রগুলির বিশেষ গুরুত্ব আছে। শিখনও এক ধরনের কাজ এবং এতে যথেষ্ট পরিমাণে দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ক্লান্তি দেখা দেয়।

শিক্ষার্থীর শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করতে হলে দুটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে প্রথম. শিখন প্রক্রিয়ায় ক্লান্তিকে যতটা সম্ভব বিলম্বিত করা যায় তার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয়, ক্লান্তি দেখা দিলে অবিলম্বে তার অপনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

ক্লান্তিকে বিলম্বিত করতে হলে নীচের পন্থাগুলি অনুসরণ করতে হবে।

প্রথমত, ক্লান্তির আবির্ভাব ও মাত্রা দুইই নির্ভর করে প্রেষণার উপর। শিখনের ক্ষেত্রে যদি প্রেষণা দুর্বল হয় তাহলে সহজেই এবং খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্তি দেখা দেয়। আর যদি প্রেষণা সবল ও স্থায়ী হয় তাহলে ক্লান্তি সহজে দেখা দেয় না। অতএব শিক্ষার ক্ষেত্রে যদি ক্লান্তিকে বিলম্বিত করতে হয় তাহলে যাতে সুদৃঢ় ও স্থায়ী প্রেষণা শিক্ষার্থীর মধ্যে সৃষ্ট হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষণীয় বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর প্রেষণা যত গভীর হবে ক্লান্তি ততই বিলম্বিত হবে।

দ্বিতীয়ত, শিখনের পরিবেশ শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে যাতে অনুকূল হয় তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। অস্বস্তিকর বা অসুবিধাজনক পরিবেশে ক্লান্তি দ্রুত দেখা দেয়।

তৃতীয়ত, শিক্ষার্থীর শারীরিক অবস্থা শিখনের উপযোগী হওয়া উচিত। দেখতে হবে যে শিখনটি সম্পন্ন করতে যতটা শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করা প্রয়োজন শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য ততটা পরিশ্রম করার উপযোগী কিনা। যদি শিখন কাজটি শিক্ষার্থীর দৈহিক সামর্থ্যের বাইরে হয় তাহলে অতি শীঘ্রই ক্লান্তি দেখা দেবে। শারীরিক ক্লান্তি দেখা দিলেই মানসিক দক্ষতার মানও নেমে আসবে।

চতুর্থত, শিখনের বিষয়বস্তুটিকে শিক্ষার্থীর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। শিক্ষণীয় বস্তুটি যদি শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সৃষ্টি না করতে পারে তাহলে কিছুক্ষণ পরেই শিখন প্রক্রিয়াটি শিক্ষার্থীর কাছে একঘেয়ে ও নিরুদ্দীপক হয়ে ওঠে। একেই ব্যক্তিগত ক্লান্তি নাম দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তিগত ক্লান্তি দেখা দিলে মানসিক ক্লান্তিও অবিলম্বে দেখা দেয়।

পঞ্চমত, শিখন পদ্ধতিটি যদি বিজ্ঞানভিত্তিক না হয় তাহলেও ক্লান্তি দ্রুত দেখা দেয়। বিভিন্ন শিক্ষণীয় বিষয় শেখার পদ্ধতিও বিভিন্ন। যদি অনুপযোগী শিখন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহলে শিখন কষ্টকর ও আয়াসবহুল হয়ে ওঠে। তার ফলে ক্লান্তিও তাড়াতাড়ি দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, যে বিষয়বস্তুটি অন্তর্দৃষ্টিমূলক পন্থায় শেখা দরকার সেটি শেখার জন্য যদি প্রচেষ্টা-ও-ভুলের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তাহলে শিক্ষার্থী সহজেই ক্লান্ত হয়ে ওঠে।

অতএব উপযুক্ত শিখন পদ্ধতির নির্বাচন ক্লান্তিকে বিলম্বিত করার একটি প্রধান উপায়।

ষষ্ঠত, মানসিক তৃপ্তির অনুভূতি ক্লান্তিকে বিলম্বিত করার আর একটি উপকরণ। শিক্ষার্থী যদি শিখন কাজের মধ্যে মানসিক তৃপ্তি না পায় তাহলে তার ক্লান্তি সহজেই দেখা দেয়। কিন্তু শিখনের মধ্যে সে যদি তৃপ্তি পায় তবে কাজটি

কঠিন হলেও ক্লান্তি স্বাভাবিকভাবেই বিলম্বিত হয়। এই জন্য শিখন প্রক্রিয়াটিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত ও সুবিভক্ত করতে হবে যাতে শিক্ষার্থী যেন শিখন কাজটি সম্পন্ন করার মাঝে মাঝে সাফল্যের আনন্দ লাভ করে। যদি শিখন কাজটি এমনই সুদীর্ঘ ও প্রলম্বিত হয় যার ফলে সম্পূর্ণ শিখন কাজটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপ সাফল্যের আস্বাদ পাওয়া শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয় না, তাহলে সে ক্ষেত্রে অতি সত্বর কাজটি বিরক্তিকর হয়ে ওঠে ও ক্লান্তি সহজেই দেখা দেয়। অবশ্য দেখতে হবে যে শিখন প্রক্রিয়াটিকে এইভাবে বিভক্ত করার সময় বিভাগগুলি যেন স্বাভাবিক ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। শিখনের বিভাগগুলি কৃত্রিম বা কষ্টকল্পিত হলে শিখন আয়াসবহুল হয়ে ওঠে। ক্লান্তিকে বিলম্বিত করার পক্ষে সাফল্যের আনন্দ একটি শক্তিশালী উপকরণ।

সপ্তমত, কাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয় শ্রমের মাত্রানুযায়ী সমগ্র শিখন প্রক্রিয়াটি সুপরিকল্পিত হওয়া চাই অর্থাৎ ক্লান্তির সূত্র অনুযায়ী লঘু ও গুরু কাজগুলিকে যথাযথ বন্টন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ কাজ আরম্ভ হবার প্রথম দিকে শ্রমবহুল কাজগুলি দেওয়া উচিত। তারপর ক্রমশ ক্লান্তি সুরু হতে থাকলে লঘু কাজগুলি শিক্ষার্থীকে করতে দিতে হবে। এরপর কিছুক্ষণ কাজ চললে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য একটি সাময়িক বিরতি দেওয়া দরকার। বিরতির শেষে আবার গুরু কাজ দেওয়া যেতে পারে কিন্তু আবার ক্লান্তি দেখা দিলে লঘু কাজগুলি আবার বন্টন করতে হবে। দীর্ঘ সময় ধরে যেখানে শিখন চালানো হয় সেখানেই কার্যবন্টনের এই নীতিটি অনুসরণ করা উচিত। সাধারণত স্কুল-কলেজে পাঠদানের সময়-তালিকা রচনা করার সময় উপরের কার্যবন্টন নীতির অনুসরণ করা হয়।

বাইশ

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা (Educational Backwardness)

শিক্ষার বহু সমস্যার মধ্যে অনগ্রসরতার সমস্যাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রায়ই দেখা যায় যে স্কুলে নিয়মিত যোগদান করা সত্ত্বেও কোন কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে সমর্থ হয় না। এইসব ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে তারা তাদের সহপাঠীদেব চেয়ে লেখাপড়ায় বেশ পশ্চাৎপদ হয়ে আছে এবং যখন ক্লাশের অন্যান্য ছেলেমেয়েবা পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা অকৃতকার্য হয়ে একই ক্লাশে পড়ে থাকছে। কেউ কেউ দু-এক বছর চেষ্টা করাব পর হতাশ হয়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে।

এই সব ছেলেমেয়ের শিক্ষায় এই ধরনের অনগ্রসরতার বিশেষ গুরুতর কারণ থাকতে পাবে। তাদের সমস্যা বিদ্যালয়ে অন্যান্য ছেলেমেয়েদেব সমস্যাব সঙ্গে এক কবে ফেলা উচিত নয়। আর তাদের সমস্যাগুলির যথোচিত ব্যবস্থা না করতে পারলে এইসব ছেলেমেয়েদের শিক্ষাজীবন ত বটেই সমস্ত জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবাব সম্ভাবনা থাকে।

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা ও ক্ষীণবুদ্ধিতা

যে সব ছেলেমেয়ে ক্ষীণবুদ্ধি অর্থাৎ সাধারণ ছেলেমেয়েদেব চেয়ে কম বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় তারা লেখাপডায় যে অনগ্রসর হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ক্ষীণবুদ্ধি ছেলে তার বুদ্ধির স্বল্পতার জন্য লেখাপড়ায় প্রত্যাশিত ফল দেখাতে পারে না। তাদেব অনগ্রসরতা কোন সাময়িক বা অস্বাভাবিক কারণ থেকে জন্মায় না। বিশেষ পন্থার সাহায্যে ক্ষীণবুদ্ধিদের লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা কবা হলেও তাদেব অনগ্রসরতা পুরোপুরি কখনই দূর কবা যায় না। ক্ষীণ-বুদ্ধিজনিত অনগ্রসরতার সমস্যা এবং অস্বাভাবিক কারণজনিত অনগ্রসরতার সমস্যা দুটি সম্পূর্ণ পৃথক। অতএব যে সব ছেলেমেয়ে ক্ষীণবুদ্ধি তাদের অন-গ্রসরতার সমস্যা এই আলোচনার বিষয়বস্তু নয়।

অনগ্রসরতার প্রকৃতি

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা দু'শ্রেণীর হতে পারে। প্রথম সর্বাত্মক, দ্বিতীয় বিষয়-মূলক। যখন শিক্ষার্থী শিক্ষণীয় সব কটি বিষয়েতেই ক্লাশের অন্যান্য ছেলেদের তুলনায় পশ্চাৎপদ থাকে তখন তার ক্ষেত্রটিকে সর্বাত্মক অনগ্রসরতা বলা যায়। আর যখন

একটি বা একাধিক পাঠ্য বিষয়ে শিক্ষার্থী অনগ্রসর হয় তখন তার ক্ষেত্রটিকে বিষয়মূলক অনগ্রসরতা বলা যায়। সর্বাত্মক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে সব কটি বিষয়েতেই শিক্ষার্থী পশ্চাদ্‌পদ থাকে। কিন্তু বিষয়মূলক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে বিশেষ একটি বা দুটি বিষয়ে শিক্ষার্থী পশ্চাদ্‌পদ হয়। যেমন, ইংরাজীতে কিংবা অঙ্কে কিংবা অন্য কোন পাঠ্য বিষয়ে ক্লাশে অন্য সকলেব চেয়ে শিক্ষার্থী পেছিয়ে থাকতে পাবে।

অনগ্রসরতার কারণ (Causes of Backwardness)

শিক্ষামূলক অনগ্রসরতা নানা কারণে দেখা দিতে পাবে। আমরা দেখেছি যে ক্ষীণবুদ্ধিতার জন্য শিক্ষামূলক অনগ্রসবতা ঘটে থাকে। সেজন্য যখনই কোন অনগ্রসরতার ক্ষেত্র পাওয়া যাবে তখন প্রথমেই দেখতে হবে যে তার মূলে ক্ষীণবুদ্ধিতা আছে কি না। ক্ষীণবুদ্ধিতা থাকলে তাব শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র বিশেষধর্মী পদ্ধতি অনুসরণ কবতে হবে। ক্ষীণবুদ্ধিতা ছাড়া যদি অন্য কোন কারণে অনগ্রসরতা দেখা দেয় তবে তা দূর কবার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন কবা যেতে পারে। সর্বাত্মক অনগ্রসরতা কতকগুলি সাধারণ ঘটনা বা কারণ থেকে জন্মায়। নীচে সর্বাত্মক অনগ্রসরতার কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা হল।

সর্বাত্মক অনগ্রসরতার কারণ (Causes of General Backwardness)

(ক) দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য শিশু অনেক সময় লেখাপড়ায় অনগ্রসর হতে পাবে। স্বাস্থ্য দুর্বল হলে শিশু প্রয়োজন মত পর্যাপ্ত পরিশ্রম করতে পারে না এবং এজন্য সে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও পড়াশোনায় পেছিয়ে পড়তে পাবে।

(খ) অনেক সময় চোখ বা কানের অসুখের জন্য শিশু ক্লাশে অনগ্রসর হয়ে পড়ে। চোখে কম দেখলে শিশু ভাল করে বোর্ড দেখতে পায় না বা কানে কম শুনলে শিক্ষকের পড়া ভাল করে শুনতে পায় না। ফলে ক্লাশের অগ্রগতির সঙ্গে সে তাল রেখে চলতে পারে না। এই দোষগুলি যথাসময়ে দূর না করলে শিশুর লেখাপড়া বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

(গ) প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ অনগ্রসবতার একটি বড কারণ। কোন বিশেষ ঘটনা, আচরণ, ব্যক্তি বা পরিবেশের জন্য শিশুর মধ্যে প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধ দেখা দিতে পারে। তাব ফলে তার পড়াশোনা স্বাভাবিক পথে এগোয় না এবং সহজ ও প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় না।

(ঘ) অনেক সময়ে কোন স্থায়ী বা প্রলম্বিত রোগের জন্য শিশুর মধ্যে

অনগ্রসরতা দেখা দিতে পারে। বহুদিন কোন রোগে ভুগলে নানা কারণে লেখাপড়া ঠিকমত হয়ে ওঠে না এবং শিশু আর সকলের চেয়ে পেছিয়ে পড়ে।

(ঙ) কোন বিশেষ কারণে বিদ্যালয়ে বহুদিন অনুপস্থিত থাকলে শিশু ক্লাশের পড়ায় আর সকলের চেয়ে পেছিয়ে পড়ে। একবার বেশ খানিকটা পেছিয়ে পড়লে তার পক্ষে সেই অপঠিত অংশগুলি পূরণ করা সম্ভব হয় না। তার ফলে তার মধ্যে স্থায়ী অনগ্রসবতা দেখা দেয়।

(চ) শিশুর পক্ষে অনুপযোগী পাঠক্রম অনগ্রসরতার আর একটি কারণ। পাঠক্রমটি যদি শিক্ষার্থীর সামর্থ্যাতীত হয় বা তার বিশেষ চাহিদা মেটাতে সক্ষম না হয় তাহলে শিক্ষার্থীর কাছে সেটি বিরক্তিকর ও আয়াসবহুল হযে ওঠে এবং তার ফলে অনগ্রসরতা দেখা দেয়।

(ছ) প্রতিকূল পরিবেশের জন্য শিশুর মধ্যে অনেক সময় অনগ্রসরতা দেখা দেয়। বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আবহাওয়া যদি শিক্ষাগ্রহণের অনুকূল না হয় তাহলে সে শিক্ষা শিশুব কাছে বিরক্তিকর ও আয়াসবহুল হয়ে ওঠে। যে সব বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা অত্যন্ত নিপীড়নমূলক এবং শিক্ষাব্যবস্থা যান্ত্রিক সেখানে শিক্ষার্থীদের পক্ষে সাফল্যলাভ করা বেশ কষ্টকর হয়ে ওঠে।

(জ) অনুপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি অনগ্রসরতার আর একটি বড কারণ। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষক যে পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করেন সেটি মনোবিজ্ঞানের বিচারে নানাদিক দিয়ে খুবই ত্রুটিপূর্ণ এবং তার ফলে শিক্ষার্থীরা সে শিক্ষা ঠিকমত গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তাদের শিক্ষাগ্রহণ কার্যকর হয় না এবং পরীক্ষাতেও তারা ভালো ফল দেখাতে পারে না।

(ঝ) প্রতিকূল গৃহ পরিবেশকে অনগ্রসরতার একটা বড কারণ বলে ধরতে হবে। শিশু যে গৃহে মানুষ হয় এবং যে স্থানীয় পরিবেশে সে বড হয় এবং যে সব ছেলেমেয়ের সঙ্গে সে মেলামেশা করে, শিশুর ব্যক্তিসত্তার উপর ঐগুলির অপরিসীম প্রভাব দেখা যায়। মা, বাবা, ভাই বোন, বাইরের সঙ্গী সঙ্গিনীরা, প্রতিবেশী এদের প্রভাব যদি শিক্ষার অনুকূল না হয় তাহলে শিশু লেখাপড়ায় অনগ্রসর হয়ে দাঁড়ায়।

বিষয়মূলক অনগ্রসরতার কারণ (Causes of Subject Backwardness)

কোন বিশেষ একটি বিষয়ে যখন শিশু পশ্চাদ্‌পদ হয়ে পড়ে তখন তার ক্ষেত্রটিকে বিষয়মূলক অনগ্রসরতা বলা হয়। হয়ত দেখা গেল যে শিশু আর

সব বিষয়ে ভাল কিন্তু ইংরাজী বা অঙ্কে কাঁচা। সাধারণত বিষয়মূলক অনগ্রসরতা কতকগুলি বিশেষধর্মী কারণের জন্য দেখা দেয়। নীচে এই শ্রেণীর কয়েকটি কারণের উল্লেখ করা হল।

(ক) কোন বিশেষ কারণবশত বিষয়টির উপর শিশুর প্রথম থেকেই বিরাগ থাকতে পারে বা বিষয়টি শিশুর পছন্দমত না হতে পারে। সমস্ত শিক্ষার সাফল্য নির্ভর করে প্রক্ষোভমূলক সমতার উপর। যদি কোন কারণে বিষয়টির প্রতি শিশুর প্রক্ষোভমূলক বিরূপতার সৃষ্টি হয় তাহলে ঐ বিষয়টির প্রতি শিশুর প্রতিকূল মনোভাব দেখা দেবে এবং কালক্রমে সে ঐ বিষয়টিতে অনগ্রসর হয়ে উঠবে। এই ধরনের বিষয়মূলক বিরাগ নানা কারণে দেখা দিতে পারে। পিতামাতা-শিক্ষকের মনোভাব, পরিবেশের প্রভাব, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি ব্যাপারগুলি কোনও বিশেষ পাঠ্য বিষয়ের উপর শিশুর মনোভাবকে প্রভাবিত কবতে পারে।

(খ) শিক্ষণ পদ্ধতির ত্রুটির জন্য বহুক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিশু অনগ্রসর হয়ে ওঠে। অনেক সময় প্রচলিত শিক্ষণপদ্ধতি নানা দিক দিয়ে ত্রুটিপূর্ণ হয় এবং শিক্ষকের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও শিশুর শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শিক্ষাব ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক প্রথায় পদ্ধতিমূলক গবেষণা খুবই সাম্প্রতিক কালে সংঘটিত হয়েছে। এতদিন যে সব পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে এসেছে সেগুলিব মধ্যে বর্তমানে বহু ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা আবিষ্কৃত হয়েছে। বস্তুত ত্রুটি-পূর্ণ পদ্ধতির জন্য বহু শিশুর ক্ষেত্রে বিষয়মূলক অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমাদের দেশে ইংরাজী ও অঙ্কে বহু ছেলেমেয়ের অনগ্রসর হবার একটি বড় কারণ হল এ বিষয় দুটিতে অনুসৃত অবৈজ্ঞানিক শিক্ষণ পদ্ধতি।

(গ) অনেক সময় শিক্ষকের আচরণ বা মনোভাবের জন্য ঐ শিক্ষক যে বিষয়টি পড়ান সেই বিষয়টিতে শিক্ষার্থীর বিরাগ সৃষ্টি হতে পারে। কোনও বিশেষ বিষয়ের শিক্ষক যদি অনুপযোগী বা অবিচক্ষণ হন তাহলে শিক্ষার্থীরা ঐ বিষয়টির প্রতি প্রতিকূলভাবাপন্ন হয়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে ঐ বিষয়টিতে অনগ্রসরতা দেখা দেয়।

(ঘ) বিদ্যালয় পরিবেশের জন্যও শিশুদের মধ্যে বিষয়মূলক অনগ্রসরতা দেখা দিতে পারে। অসামাজিক আবহাওয়া, অতিরিক্ত শৃঙ্খলামূলক নিয়ম-কানুন প্রভৃতি কারণে শিশু কোনও কোনও বিশেষ বিষয়ে অনগ্রসর হয়ে পড়ে।

(ঙ) বিষয়মূলক অনগ্রসরতা সৃষ্টির আর একটি বড় কারণ হল প্রতিকূলধর্মী অনুবর্তনের সৃষ্টি। অর্থাৎ কোনও কারণে শিশুর মধ্যে ঐ বিশেষ বিষয়ের সঙ্গে বিরক্তি বা বিরাগ অনুবর্তিত হয়ে পড়তে পারে। এই অনুবর্তনের মূলে কোন

ব্যক্তির অনুদার আচরণ বা কোন বিশেষ আঘাতাত্মক ঘটনা বা বিদ্যালয় পরিবেশের কোন অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা থাকতে পারে।

(চ) বিশেষ কোন বিষয়ের ক্লাশে বহুদিন অনুপস্থিত থাকার ফলে ঐ বিষয়ে শিক্ষার্থী অনগ্রসর হয়ে উঠতে পারে।

অনগ্রসরতা দূর করার উপায়

অনগ্রসরতা দূর করতে হলে নীচের প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি অবলম্বন কবা উচিত।

নিরাময়মূলক পন্থা (Curative Measures)

প্রথমত, দেখতে হবে যে শিক্ষার্থীব অনগ্রসবতার প্রকৃত কারণটি কি এবং সেই কাবণটি দূব কবাই শিক্ষার্থী'র অনগ্রসরতা দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়। যেমন, যদি দেখা যায় যে শারীরিক অসুস্থতা ইন্দ্রিয়জনিত কোন দুর্বলতা বা প্রলম্বিত ব্যাধির জন্য অনগ্রসরতার সৃষ্টি হযেছে তাহলে ঐ বিশেষ কারণটি দূর করলেই শিক্ষার্থী'র অনগ্রসরতাও দূব হযে যাবে। যদি কোন শিক্ষার্থী'র ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বনের জন্য অনগ্রসবতা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে পদ্ধতির উন্নয়ন করলেই তাব অনগ্রসরতাও দূর হবে। সেই রকম যদি অনুপযোগী পাঠক্রম, প্রতিকূল পবিবেশ বা কোন ঘটনাজনিত বিরাগ প্রভৃতি কাবণে শিক্ষার্থীর মধ্যে অনগ্রসরতার সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে ঐ কাবণটি দূব করাই হল অনগ্রসরতা নিরাকরণের প্রধান উপায়।

যে সব ক্ষেত্রে প্রক্ষোভজনিত প্রতিবোধ থেকে অনগ্রসরতাব সৃষ্টি হয় সেই সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মন থেকে ঐ প্রতিরোধ দূর করতে হবে। পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রক্ষোভমূলক প্রতিরোধের কারণটি বাব করতে হবে এবং সেই কারণটি দূর করলেই শিক্ষার্থী'র মন থেকে প্রক্ষোভমূলক বিরূপতাও চলে যাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোন শিশুর বিদ্যালয় কিংবা শিক্ষকমণ্ডলী কিংবা লেখাপডার প্রতি মনে ঘৃণা বা ভয়, বিরাগের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে তার মন থেকে ঐ বিরূপ প্রক্ষোভটি দূর করতে পারলে শিক্ষার প্রতি তাব অনুকূল মনোভাব ফিরে আসবে।

প্রতিষেধমূলক পন্থা (Preventive Measures)

সাধারণভাবে শিক্ষার্থীরা যাতে লেখাপড়ায় অনগ্রসর না হয়ে ওঠে তার জন্য নীচের প্রতিষেধমূলক পন্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত।

(ক) শিশু যে গৃহে বড় হয় সেই গৃহ পরিবেশকে সমুন্নত করা উচিত। শিশুর শিক্ষা তার গৃহ পরিবেশের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে। তার প্রক্ষোভমূলক

সমতা তার গৃহের আবহাওয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। গৃহ পরিবেশ উন্নত হলে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য বজায় থাকবে এবং তার ফলে শিশুর মধ্যে অনগ্রসরতা দেখা দেবার সম্ভাবনা অনেক কম হবে। যে গৃহ কলহ, বিষাদ, দারিদ্র্য, অনাচার প্রভৃতির দ্বারা বিপর্যস্ত সে গৃহে শিশুর শিক্ষাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(খ) শিক্ষায় অনগ্রসরতা দূর করতে হলে শিক্ষণপদ্ধতিটিকে মনোবিজ্ঞানভিত্তিক করা সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। অধিকাংশ অনগ্রসরতাই ভুল শিক্ষণপদ্ধতির জন্য দেখা দিয়ে থাকে। অতএব শিক্ষার পদ্ধতিকে আধুনিক গবেষণাভিত্তিক ও মনোবিজ্ঞানসম্মত করা অনগ্রসরতা রোধ করার প্রধানতম পন্থা।

(গ) পাঠক্রমকে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও সামর্থ্য অনুযায়ী গড়ে তোলা অনগ্রসরতা দূর করার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন।

(ঘ) বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সমাজধর্মী করা এবং অন্তর্জাত শৃঙ্খলার প্রযোগ করা অনগ্রসরতা দূর করার আর একটি কার্যকর উপায়।

(ঙ) শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে প্রক্ষোভমূলক সমতা বজায় থাকে তার আয়োজন করা অনগ্রসরতা দূর করার প্রধান উপায়।

(চ) শিক্ষার অগ্রগতি দৈহিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। সেজন্য শিক্ষার্থীর স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষণের আয়োজন রাখা বিদ্যালয়ের কার্যসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ হওয়া উচিত।

(ছ) কোন শারীরিক বা ইন্দ্রিয়জনিত ত্রুটি থাকলে অবিলম্বে তার চিকিৎসা করা এবং তা দূর করার ব্যবস্থা করা দরকার।

(জ) দীর্ঘ অনুপস্থিতির জন্য শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে অনগ্রসর হয়ে পড়লে তার অপঠিত অংশ পূরণের জন্য তাকে বিশেষ ও স্বতন্ত্রভাবে সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঝ) কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি শিশুর বিরাগ থাকলে সেই বিরাগের কারণ খুঁজে বার করা ও ঐ কারণটি দূর করার ব্যবস্থা করা দরকার।

বিষয়মূলক অনগ্রসরতা ও ত্রুটি-নির্ণায়ক অভীক্ষা

(Subject Backwardness and Diagnostic Test)

বিষয়মূলক অনগ্রসরতার চিকিৎসা করতে হলে কোন বিশেষ বিষয়ের কোন্ কোন্ অংশে বা ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী প্রকৃতিপক্ষে পশ্চাদ্পদ সেটি প্রথমে খুঁজে বার করা দরকার। যেমন, মনে করা যাক শিক্ষার্থী যদি ইংরাজীতে কাঁচা হয় তাহলে দেখতে হবে যে সে ইংরাজীর কোন্ ক্ষেত্রটিতে কাঁচা।

অর্থাৎ দেখতে হবে যে সে বানানে কাঁচা, না ব্যাকরণে কাঁচা, না বাক্য গঠনে কাঁচা, না বিশেষ প্রয়োগবিধিতে কাঁচা ইত্যাদি। হয়তো ইংরাজীর এই বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে কতকগুলিতে সে ভালই কিন্তু আর কতকগুলিতে দুর্বল হওয়ার জন্য সে ইংরাজীতে ভাল ফল দেখাতে পারে না এই সব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অনগ্রসরতার প্রকৃত চিকিৎসা করার জন্য সে বিষয়-টির ঠিক কোন্ ক্ষেত্রটিতে কাঁচা সেটি নির্ভুলভাবে নির্ণয় করে ঐ বিশেষ ক্ষেত্রটির চিকিৎসা করা উচিত। নইলে শ্রম ও সময়ের অযথা অপচয় হবে।

এই সব বিশেষধর্মী ত্রুটি বা দুর্বলতা ধরার জন্য আজকাল এক নতুন ধরনের অভীক্ষা আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলিকে ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষা (Diagnostic Test) বলে। এই অভীক্ষার সাহায্যে কোন বিশেষ বিষয়ের ঠিক কোন্ অংশে বা কোন ক্ষেত্রটিতে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা তা ধরা যায় এবং সেই মত তার সংশোধন বা দূরীকরণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। বলা বাহুল্য এই পন্থাতেই অনগ্রসরতার প্রকৃত স্বরূপটি চিকিৎসকের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয় এবং সেটিকে সুনিশ্চিত এবং কার্যকরভাবে দূর করা সম্ভব হয়। বিশেষ করে বিষয়মূলক অনগ্রসরতার ক্ষেত্রে ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া একপ্রকার অপরিহার্য। আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অনগ্রসরতা দূর করার উপকরণরূপে ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষার বহুল প্রচলন হয়েছে। পঠন, গণিত, ইংরাজী, অঙ্ক প্রভৃতি যে সব বিষয়গুলিতে অনগ্রসরতা বিশেষ করে সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেগুলির উপর সুপরীক্ষিত ত্রুটিনির্ণায়ক অভীক্ষা গঠিত হয়েছে।

তেইশ

অপরাধপ্রবণতা (Delinquency)

শিক্ষাব ক্ষেত্রে আর একটি গুরুতর সমস্যা হল অপরাধপ্রবণতা। অনেক সময় দেখা যায় যে শিশু সহজ ও স্বাভাবিক পথে না গিয়ে নানাবকম অস্বাভাবিক ও অসামাজিক আচরণ করতে সুরু করেছে। প্রত্যেক সমাজেই আচরণের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট মান আছে। আর এইমান অনুযায়ী আচরণ করতে শিশুকে শেখানই সমস্ত দেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য। আচরণের এই মান থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়াকে অপরাধ আখ্যা দেওয়া হয়। খুব ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই আচরণেব মান থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকে সমস্যামূলক আচবণ (Problem Behaviour) বলা হয়। আর একটু বড ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই সামাজিক মান থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকে অপরাধপ্রবণতা (Delinquency) নাম দেওয়া হয়। প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে সামাজিক আচরণের মান থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকে দেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমে বিচার করা হয় এবং কোন আচরণ সেই আইন-বিরোধী হলেই তাকে আইনগত অপবাধ (Crime) নাম দেওয়া হয়। কিশোর অপরাধীদেব (Delinquent) স্বতন্ত্রভাবে বিচাব করাব পন্থা সবদেশেই প্রচলিত আছে এবং তাদের জন্য স্বতন্ত্র কিশোর বিচারালয়ও (Juvenile Court) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর কারণ হল, মনোবিজ্ঞানীবা বিশ্বাস করেন যে কিশোরদেব অপরাধ করার মূলে এমন কতকগুলি বাইরেব শক্তি কাজ করে যেগুলির জন্য কিশোরেরা নিজেরা দায়ী নয়। অতএব সাধারণ আইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী তাদেব অপরাধের শাস্তি না দিয়ে তাদেব এই মানসিক বিকৃতির প্রকৃত কাবণ কি তা খুঁজে বার করে সেটি দূর করার চেষ্টা করাই উচিত।

অপরাধপ্রবণতার কারণ (Causes of Delinquency)

বস্তুত, অপরাধপ্রবণতাকে নিছক শিক্ষামূলক সমস্যা না বলে একটি সমাজমূলক সমস্যা বলাই উচিত। কেননা অপরাধ প্রবণতার কারণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও পারিবেশিক শক্তি কিশোরদের মনে অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি করে থাকে। এই সামাজিক ও পারিবেশিক শক্তিগুলি শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতিকূল এবং এগুলির চাপেই

শিশুর ব্যক্তিসত্তা অস্বাভাবিক পথে বেড়ে ওঠে। যদি এই প্রতিকূল শক্তিগুলি কার্যকর না হত তাহলে শিশুর ব্যক্তিসত্তা স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠত।

অপরাধপ্রবণতার কারণগুলিকে আমরা চার শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা: বংশধারামূলক (Hereditary), পারিবেশিক (Environmental), সামাজিক (Social) এবং মনোবৈজ্ঞানিক (Psychological)।

বংশধারামূলক কারণ

বংশধারামূলক কারণ বলতে বোঝায় মাতাপিতা পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া কোন অপরাধপ্রবণতামূলক বৈশিষ্ট্য। অপরাধপ্রবণতা অবশ্য উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায় না। এটি একটি অর্জিত বৈশিষ্ট্য। পরিবেশের সংস্পর্শে এসে ব্যক্তি নানা কারণের জন্য অপরাধপ্রবণতা অর্জন করে থাকে। কিন্তু দেখা গেছে যে ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অপরাধপ্রবণতার একটা নিকট যোগাযোগ আছে। ব্যাপক পর্যবেক্ষণের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের মধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষীণবুদ্ধি পাওয়া যায়। অর্থাৎ যারা ক্ষীণবুদ্ধি হয় তাদেরই অপরাধ করার দিকে মন যায়। যাদের বুদ্ধি স্বল্প তারা সাধারণ মানুষের মত ন্যায় অন্যায়ের বিচার করতে সমর্থ হয় না এবং তার ফলে যে সব কাজ করতে সাধারণ ব্যক্তি ভয় পায় বা ইতস্তত করে ক্ষীণবুদ্ধি ব্যক্তি তা করে না। কোন্ কাজের কি ফল এবং সেই ফল কতটা তাদের পক্ষে ক্ষতিকারক তা বোঝার ক্ষমতা ক্ষীণবুদ্ধিদের থাকে না এবং সেই জন্যই অপরাধ করতে তাদের কোন দ্বিধা বা ভয় হয় না। দেবদূতেরা যেখানে পা দিতে ভয় পায় মূর্খরা সেখানে সবেগে এগিয়ে যায়। ক্ষীণবুদ্ধিতা একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং এই জন্য আমরা ক্ষীণবুদ্ধিতাকে অপরাধপ্রবণতার বংশধারামূলক কারণ বলে বর্ণনা করতে পারি।

পারিবেশিক কারণ

অপরাধপ্রবণতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নানা পারিবেশিক কারণ থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে। এই ধরনের কারণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

(১) গৃহের পরিবেশ শিশুর কাছে সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। অপরাধপ্রবণতার বহু কারণ এই পরিবেশের মধ্যে নিহিত থাকত দেখা গেছে। যে গৃহপরিবেশে শিশু বড় হয় সে পরিবেশ স্বাস্থ্যপ্রদ না হলে শিশুর ব্যক্তিসত্তাও দুর্বল ও বিপথগামী হয়ে ওঠে। অস্বাস্থ্যকর গৃহ পরিবেশ আবার নানাপ্রকার হতে পারে যেমন—

(ক) শিশু যদি অবহেলিত হয়। সাধারণত যে পরিবারে অনেকগুলি ভাইবোন থাকে সে পরিবারে সব কটি শিশু পূর্ণ যত্ন ও মনোযোগ পায় না।

(খ) শিশু যদি অতিরিক্ত নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ হয়।

(গ) শিশু যদি অতিরিক্ত আদর বা যত্নে পালিত হয়। সাধারণত শিশু যদি পিতামাতার একটি মাত্র সন্তান হয় তাহলে সে অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত মাত্রায় আদর-যত্ন লাভ করে এবং তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিসত্তার স্বাস্থ্যসম্পন্ন বিকাশ ব্যাহত হয়।

(ঘ) শিশু যদি বিপর্যস্ত গৃহে (Broken home) মানুষ হয়। দায়িত্বহীন স্বার্থপ্রিয় মা কিংবা অসচ্চরিত্র মদ্যপ বাবা বা বিবাহবিচ্ছেদের ফলে ভেঙে যাওয়া সংসার বা সর্বদা মা-বাবাব কলহে শান্তিহীন পরিবার প্রভৃতি কাবণ শিশুর স্বাভাবিক স্বাস্থ্যময় গৃহপবিবেশকে নষ্ট করে দিতে পারে। এই ধবনের বিপর্যস্ত গৃহে যে সব শিশু বড হয় তাদেব সহজেই অস্বাভাবিক আচরণের দিকে প্রবণতা দেখা দেয়।

(ঙ) অতিরিক্ত দারিদ্র্য বা অভাবের জন্যও সময় সময় অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়। সাধারণ মাত্রাব দাবিদ্র্য বা অভাববোধ অপরাধপ্রবণতা আনে না। কিন্তু যদি দারিদ্র্য মাত্রাতীত হয় তাহলে তা শিশুর প্রক্ষোভমূলক সংগঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং এই মানসিক নিপীডনেব ফলে শিশুব মন অপরাধ অনুষ্ঠানের দিকে ঝোঁকে।

(চ) অতিরিক্ত শৃঙ্খলা যেমন অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি করে তেমনই শৃঙ্খলার পূর্ণ অভাবও অপরাধপ্রবণতার কাবণ হয়ে উঠতে পাবে। স্বাধীনতা আর শৃঙ্খলাব অভাব এক কথা না। স্বাধীনতা সুপরিচালিত ও উদ্দেশ্যমূলক হলে তা বিপথগামী হয় না, কিন্তু অপরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যহীন স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার-আনে এবং শিশুকে অপরাধ অনুষ্ঠানের দিকে চালিত করে।

(ছ) শৃঙ্খলার অভাব যেমন ক্ষতিকর তেমনই ক্ষতিকর হল শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ। দেখা যায় এমন অনেক পিতা-মাতা আছেন যাঁরা এই মুহূর্তে শিশুকে খুব বকাবকি ও মারধোর করলেন বা কঠিন শাস্তি দিলেন, আবার পরমুহূর্তেই হয়ত তাকে প্রচণ্ড আদর-যত্ন করলেন বা উপহার-পুরস্কারে অভিভূত করে দিলেন। তাঁদের ধারণা যে বকাবকি মাবধোর করার পর আদর করলে সেই বকাবকি মারধোরের কোন ফল বা প্রভাব শিশুর উপর আর পরে থাকে না। কিন্তু তাঁদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বস্তুত এই ধরনের

বৈষম্যমূলক আচরণ শিশুর মনকে বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ করে এবং তাকে অপরাধপ্রবণ করে তোলে।

(জ) যদি গৃহ-পরিবেশ অস্বাস্থ্যকর ও শিশুর বৃদ্ধির সহজ গতিপথের প্রতিকূল হয় তাহলেও শিশু অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সুস্থ মনের জন্য প্রয়োজন সুস্থ দেহ এবং তার জন্য স্বাস্থ্যময় গৃহ পরিবেশ অপরিহার্য।

(২) গৃহ-পরিবেশের পরে আসে শিশুর বাইরের পরিবেশ। শিশু যে অঞ্চলে মানুষ হয়, যে ধরনের সঙ্গী-সাথীর সঙ্গে মেলামেশা করে, যে ধরনের প্রতিবেশীদের সঙ্গে বসবাস করে, সে সবেরও প্রচুর প্রভাব থাকে শিশুর ব্যক্তিসত্তা-গঠনের উপর। যদি তার বাসস্থানের পরিবেশ তার মানসিক স্বাস্থ্য গঠনের পরিপন্থী হয় তাহলে শিশু অপরাধপ্রবণ রূপে বড় হয়ে ওঠে। অসদ্‌সঙ্গীদের প্রভাবে শিশুর বিপথগামী হয়ে যাবার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। কিশোর বয়সে শিশুদের মধ্যে দল-বিশ্বস্ততা গভীরভাবে দেখা দেয় এবং দলের প্রভাব তাদের আচরণকে প্রচুর পরিমাণে প্রভাবিত করে থাকে। যদি এই সময় সে ভাল সঙ্গী-সাথীদের প্রভাবে না আসে তাহলে তার পক্ষে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠা খুবই সম্ভব।

(৩) শিশুর পরিবেশের মধ্যে বিদ্যালয়-পরিবেশ একটা বড় স্থান জুড়ে থাকে। দিনের একটা বেশ বড় অংশ শিশু বিদ্যালয়ে কাটায় এবং এই সময়ে সে বহু প্রভাবশালী শক্তির সংস্পর্শে আসে। শিক্ষকমণ্ডলী, সহপাঠী ও বন্ধু-বান্ধবের দল, বিদ্যালয়ের নিজস্ব নিয়মকানুন, আচারব্যবহার ও প্রথাদি শিশুর মানসিক সংগঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। যে সব বিদ্যালয়ে পরিবেশকে সত্যকারের সমাজধর্মী করে গড়ে তোলা যায় না, সে সব স্থানে শিশু একটি বিচ্ছিন্ন মানুষরূপে বড় হয়ে ওঠে এবং তার উপর বিদ্যালয়ের সংহতিমূলক কোন প্রভাব কার্যকর হয় না। এই সব শিশুরা স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও অসামাজিক হয়ে ওঠে। এদের মধ্যে সামাজিক চেতনা-বোধ দুর্বল হওয়ার জন্য অপরাধপ্রবণতাও সহজে দেখা দেয়।

সামাজিক কারণ

আধুনিক মনোবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্ববিদেরা কিশোর-অপরাধকে সামাজিক সমস্যা বলেই বর্ণনা করে থাকেন। বস্তুত সমাজের সংগঠন ও অভ্যন্তরীণ গঠনপ্রকৃতি, আচরণের অনুমোদিত মান, বিধিশৃঙ্খলার কাঠিন্য, নৈতিক আদর্শের স্বরূপ প্রভৃতির দ্বারাই ব্যক্তির আচরণ প্রচুর পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। বিশেষ করে সমাজের প্রচলিত নৈতিক মানের প্রতি প্রাপ্তবয়স্কদের কতটা আনুগত্য আছে তার উপর শিশুদেরও ভালমন্দ, উচিত, অনুচিতের

ধারণা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যে সমাজে নীতিগত আদর্শ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট 'বিধিনিষেধ নেই সে সমাজের কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতার আধিক্য দেখা যায়। এই জন্যই অসংবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় নানারকম দুর্নীতি ও অপরাধের প্রাচুর্য দেখা যায়। যুদ্ধ, অন্তর্বিপ্লব, প্রাকৃতিক বিপর্যয় প্রভৃতির জন্য যখন সমাজব্যবস্থা বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে তখন কিশোব এবং তরুণদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতাও প্রচুর পরিমাণে দেখা দেয়। এই সব কারণে স্বাভাবিকভাবেই এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে যখন কোন সমাজে কিশোরদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতার হার বেড়ে ওঠে তখন তার মূলে সামাজিক সংগঠনের কোন বিরাট ত্রুটি বা গলদ থাকবেই। সমাজসংগঠনের যোগসূত্রগুলি যখন দুর্বল হয়ে ওঠে তখন সেই দুর্বলতা অসংযম আদর্শহীনতার রূপ নিয়ে ব্যক্তিব মনে প্রতিফলিত হয়। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই স্বাভাবিক সমাজ সংগঠনের মধ্যে অল্পবিস্তর বিপর্যয় দেখা দিযেছিল। ভারতের মত সুদূর দেশেও ব্ল্যাক-মার্কেটিং, অতিবিক্ত লাভ, অন্যায়ভাবে মাল মজুত রাখা, প্রতাবণা, উৎকোচ গ্রহণ প্রভৃতি নানা অন্যায় এবং অনুচিত অসামাজিক কাজ প্রচুর পবিমাণে সংগঠিত হয়েছিল। এব ফলে আমাদের সমাজ সংগঠনে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছিল তা আমাদের দেশের কিশোর ও তরুণদের মধ্যে অপ-রাধপ্রবণতার মাত্রা যে প্রচুর পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মনোবৈজ্ঞানিক কারণ

অপরাধপ্রবণতাব একটি বড কারণ হল মনোবৈজ্ঞানিক অসঙ্গতি। প্রত্যেক শিশুরই কতকগুলি মৌলিক চাহিদা থাকে। বড হবার সঙ্গে সঙ্গে এই চাহিদা-গুলি সংখ্যা ও জটিলতার দিক দিয়ে প্রচুর বেড়ে ওঠে। শিশুর এই চাহিদাগুলি ঠিকমত তৃপ্ত না হলে তার মধ্যে অপসঙ্গতি (maladjustment) দেখা দেয়। যখন এই অপসঙ্গতি তীব্র আকার ধারণ করে তখন তা অপরাধপ্রবণতার রূপ নেয়। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে চুরি করা, মিথ্যা কথা বলা, ধ্বংসমূলক কাজকর্ম করা ইত্যাদির মূলে আছে কোন বিশেষ মনোবৈজ্ঞানিক চাহিদার অতৃপ্তি। এই সব ছেলেদের স্বাভাবিক পন্থায় চাহিদা মেটাতে না পেবে অপ-রাধমূলক আচবণের মধ্যে দিয়ে তাদের চাহিদা তৃপ্ত করাব চেষ্টা করে।

শিশুদের ক্ষেত্রে অপরাধপ্রবণতার একটা বড কারণ হল তাদের এই মানসিক চাহিদার অতৃপ্তি। ভালবাসার চাহিদা, নিবাপত্তার চাহিদা আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, সামাজিক পরিণতির চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা

ইত্যাদি মৌলিক চাহিদাগুলি শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের সুপরিণতির জন্য অপরিহার্য। কিন্তু নানাকারণে আমাদের সমাজে শিশুর এই প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলি অপূর্ণ থেকে যায় এবং তার ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় বিভিন্ন প্রকৃতির মানসিক অপসঙ্গতি। শিশু তার সেই অপসঙ্গতি দূর করার জন্য নানা ধরনের পরিপূরক আচরণের আশ্রয় গ্রহণ করে। এইগুলির মধ্যে অনেক আচরণই সমাজের অনুমোদিত মান ও আদর্শের বিচারে অসামাজিক ও অবাঞ্ছিত হয়ে ওঠে এবং লোকচক্ষুতে অপরাধ বলে পরিগণিত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সব ক্ষেত্রে শিশু অপরাধ করার জন্য অপরাধ করে না। সে অপরাধ করে তার মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য।

অপরাধপ্রবণতার শ্রেণীবিভাগ (Types of Delinquency)

অপরাধপ্রবণতা শিশুর মধ্যে বিভিন্ন রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে। সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত রূপগুলি শিশুদের মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়।

(ক) মিথ্যাভাষণ
(খ) অপহরণ
(গ) ক্লাশপালানো
(ঘ) শৃঙ্খলাভঙ্গতা
(ঙ) আক্রমণধর্মিতা
(চ) নেতিমনোভাব
(ছ) অবাধ্যতা
(জ) প্রতারণা
(ঝ) ধ্বংসমূলকতা
(ঞ) যৌন অপরাধ

এই সব অপরাধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ও মাত্রা নিয়ে দেখা দিয়ে থাকে। উপরের তালিকার অধিকাংশ আচরণই ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে দেখা যেতে পারে। কিন্তু সেগুলি মূলত পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে তাদের সঙ্গতিবিধানের অসামর্থ্যের জন্যই দেখা দেয় এবং সযত্ন চিকিৎসার দ্বারা বা অনেক সময় শিশু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি নিজে নিজেই চলে যায়। কিন্তু কিশোরদের মধ্যে যখন অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় তখন সেগুলিকে অতি যত্নের সঙ্গে চিকিৎসা করা প্রয়োজন। কিশোর বয়সের অপরাধীই বড় হয়ে ক্রিমিনাল (criminal) রূপে দেখা দেয়। এইজন্য সমাজের মঙ্গলের জন্যই অবিলম্বে অপরাধপ্রবণতার চিকিৎসা করা একান্ত আবশ্যক।

অপরাধপ্রবণতা দূর করার উপায়

অপরাধপ্রবণতা দূর করতে হলে আমাদের দু'ধরনের উপায় অবলম্বন করতে হবে। (১) প্রতিরোধমূলক (Preventive) এবং নিরাময়মূলক (Curative)। প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি আবার দু'রকমের হতে পারে। —ব্যক্তিমূলক (individual) এবং সমষ্টিমূলক (collective)।

প্রতিরোধমূলক পন্থা (Preventive Measures)

প্রতিরোধমূলক পন্থা বলতে বোঝায় শিশুর মনে যাতে প্রথম থেকেই অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি না হয় তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করা। যে সব কারণের জন্য অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় সেগুলিকে আগে থেকে দূর করাই এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা

যখন এই প্রতিরোধমূলক পন্থাগুলি শিশুর ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে প্রযুক্ত হয় তখন সেগুলিকে ব্যক্তিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা বলা যায়। এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হল নীচের পন্থাগুলি।

(ক) শিশুর গৃহ পরিবেশ উন্নত করা।

(খ) শিশু যাতে অবহেলিত বা প্রত্যাখ্যাত না হয় তা দেখা।

(গ) শিশুকে অতিরিক্ত আদর না দেওয়া।

(ঘ) বিপর্যস্ত পরিবারের ক্ষেত্রে শিশু যাতে স্বাস্থ্যকর পরিবেশে স্থান পায় তার ব্যবস্থা করা।

(ঙ) সাংসারিক অভাব, অনটন, পারিবারিক সমস্যা প্রভৃতি শিশুর মনকে যাতে স্পর্শ না করে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া।

(চ) শিশুর বাসস্থান যাতে স্বাস্থ্যকর হয়, শিশু যাতে পুষ্টিকর খাদ্য ও বিশ্রাম, ব্যায়াম ও শরীর সঞ্চালনের যথেষ্ট সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা।

(ছ) শিশুর নিত্যসঙ্গী ও খেলাধূলার সাথী, বন্ধুবান্ধব যাতে উচ্চ স্তরের হয় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া।

(জ) গৃহের শৃঙ্খলা ব্যবস্থা যাতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুনিয়ন্ত্রিত হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ সযত্নে বর্জন করা।

(ঝ) অপরাধপ্রবণতা দূর করতে হলে শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্য যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে সেদিকে সর্বাগ্রে সযত্ন দৃষ্টি দিতে হবে। মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হলে বিদ্যালয়ের পরিবেশকে সমাজধর্মী করে তুলতে হবে, সকল শিশুর চাহিদা মিটতে পারে এমন পাঠক্রমের প্রবর্তন করতে হবে, শিক্ষা-পদ্ধতিকে মনোবিজ্ঞান-ভিত্তিক করে তুলতে হবে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার আবহাওয়া সৃষ্টি করতে হবে এবং বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সহপাঠক্রমিক কাজকর্ম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সমষ্টিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা

সমষ্টিগত প্রতিরোধমূলক পন্থা বলতে সাধারণভাবে সামাজিক সংগঠনের

উন্নয়নকেই বোঝায়। এদিক দিয়ে বিচার করলে নীচের ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা উচিত।

(ক) সামাজিক আচার-ব্যবহার ও প্রথাপদ্ধতিগুলি যেন প্রগতিশীল হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সমতা রেখে সমাজ ব্যবস্থারও সংস্কার প্রয়োজন।

(খ) সমাজের সদস্যদের চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে আদর্শ বা মানের পরিবর্তন করতে হবে। প্রাচীন গতানুগতিক মানের প্রতি অন্ধ আসক্তি পরিত্যাগ না করলে বর্ধিষ্ণু কিশোর মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় আধুনিক ভাব ধারার সঙ্গে সমাজে পূর্ব প্রচলিত মানের সংঘাত দেখা দেওয়ার ফলে কিশোর মনে চাঞ্চল্য ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয় এবং তা থেকে অপরাধ-প্রবণতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

(গ) রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কারণে মানুষের জীবনে শঙ্কা ও নিরাপত্তাহীনতার বোধ যখন দেখা দেয় তখন প্রাপ্তবয়স্কদের মত কিশোর ও তরুণদের মনকেও সেই মনোভাব প্রভাবিত করে। এই সময় অনিশ্চয়তা, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা কিশোর মনের উপর এমন একটা মনোবৈজ্ঞানিক চাপের সৃষ্টি করে যার ফলে অপরাধপ্রবণতার দিকে তাদের মন চলে যায়।

বর্তমান পৃথিবীতে এ্যাটম বোমা, হাইড্রোজেন বোমা প্রভৃতি সর্বাত্মক মানব ধ্বংসের অস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যেই একটা সর্বব্যাপী আশঙ্কা ও অনিশ্চযতার ভাব দেখা দিয়েছে। আদিম বন্য পরিবেশ ছেড়ে মানুষ যেদিন সভ্য হয়েছিল সেদিন সে যে নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার বোধ অনুভব করেছিল আজ এইসব মারণ অস্ত্রের আবিষ্কারে তা মানুষের মন থেকে চলে যেতে বসেছে। ফলে বর্তমান জগতের সভ্য সমাজমাত্রেই এক সর্বজনীন ভীতি, দুশ্চিন্তা ও অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। এই সর্বব্যাপক অনিশ্চয়তা, ভীতি ও দুশ্চিন্তার চাপ কিশোর মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে এবং অনেক ক্ষেত্রে সেই চাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিশু অপরাধমূলক কাজ করে থাকে।

এইজন্য রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতা যাতে কিশোর মনকে স্পর্শ করতে না পারে তার জন্য তাদের সব সময় সংগঠনমূলক কাজে ব্যাপৃত রাখতে হবে। সুপরিকল্পিত পন্থায় নানা উন্নত অভিজ্ঞতার সাহায্যে কিশোরদের শিক্ষাসূচীকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে যাতে এই ধরনের চিন্তা বা মনোভাব তাদের মধ্যে সৃষ্টি না হয়।

(ঘ) সমাজের বিধিনিষেধ, শৃঙ্খলা-নিয়মকানুন কঠোর হোক্ বা শিথিল হোক্ তাতে কিশোর মনে কিছু এসে যায় না। কিন্তু সবচেয়ে যা বেশী কিশোর মনকে প্রভাবিত করে সেটি হল সেই নিয়মকানুন ও বিধিনিষেধের প্রতি সমাজের বয়স্কদের আনুগত্যের মাত্রা। যে সমাজে প্রাপ্তবয়স্করা সমাজের আদর্শ ও বিধিনিষেধের প্রতি বিশ্বস্ত সে সমাজে কিশোরদের মধ্যে অপরাধ-প্রবণতা কম দেখা যায়।

(ঙ) যদি বিশেষ কোন অপসঙ্গতির জন্য অপরাধপ্রবণতা দেখা দিয়ে থাকে তাহলে উপযুক্ত মনোশ্চিকিৎসকের সাহায্যে তার সেই মানসিক বিকলতা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে।

নিরাময়মূলক পন্থা (Curative Measures)

নিরাময়মূলক পন্থাগুলির মধ্যে নীচের কয়েকটির উল্লেখ করা যেতে পারে।

(ক) যদি প্রতিকূল পরিবেশের প্রভাবে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় তাহলে সেই পরিবেশের পরিবর্তন বা সংস্কারসাধন করতে হবে। অনুপযোগী পরিবেশ থেকে শিশুকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে অনুকূল পরিবেশে রাখলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

(খ) গৃহ পরিবেশ অনুপযোগী হলে সুপরিচালিত আবাসিক বিদ্যালয়ে শিশুকে রাখা যেতে পারে।

(গ) অপসঙ্গতির জন্য অপরাধপ্রবণতা দেখা দিলে সেই অপসঙ্গতির মনোবৈজ্ঞানিক কারণটি খুঁজে বার করতে হবে এবং তা দূর করার ব্যবস্থা করতে হবে। বিদ্যালয়ে শিশু যাতে যথাযথভাবে নিজেকে অভিব্যক্ত করার সুযোগ পায় এবং যাতে তার মৌলিক চাহিদাগুলি পরিতৃপ্ত হয় সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

(ঘ) সমাজধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি করা, বহুমুখী পাঠক্রমের প্রবর্তন করা, কর্মকেন্দ্রিক পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা, বিদ্যালয়ের কর্মসূচীতে বহুল পরিমাণে খেলাধূলা ও সম্মিলিত কাজ-কর্মের আয়োজন রাখা প্রভৃতি হল অপরাধ-প্রবণতা দূর করার কার্যকর উপায়।

(ঙ) বহু ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক কারণের জন্য শিশুর মনে অপসঙ্গতি দেখা দেয়। বিশেষ করে অতৃপ্ত চাহিদার ফলে শিশুর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য শিশু অপরাধপ্রবণ আচরণ সম্পন্ন করে।

অতএব এই ধবনের অপরাধপ্রবণতার চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই তার ঐ অন্তর্দ্বন্দ্বটি দূর কবতে হবে। যে চাহিদাটির অতৃপ্তির জন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে সেটিকে খুঁজে বার করতে হবে এবং তার পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

চব্বিশ

যৌথ মনোবিজ্ঞান (Group Psychology)

মনোবিজ্ঞান হল আচরণের বিজ্ঞান। ব্যক্তির আচরণের স্বরূপ, কারণ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করাই হল তার কাজ। মানব আচরণের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল এর অপরিসীম বৈচিত্র্য ও পরিবর্তনশীলতা। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানুষ যে বিভিন্ন আচরণ করে এটি একটি সর্বজনীন ঘটনা। দেখা গেছে যে একা বা সঙ্গহীন অবস্থায় ব্যক্তি যে ধরনের আচরণ করে তার সেই আচরণ এবং দলবদ্ধ অবস্থায় থাকার সময় তার যে আচরণ, এ দু'য়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তি যখন দলের দ্বারা প্রভাবিত হয় না তখন তার আচরণের প্রকৃতি এক প্রকারের হয়, আর যখন সে দলের দ্বারা প্রভাবিত হয় তখন তার আচরণ আর এক প্রকৃতির হয়ে দাঁড়ায়। দলবদ্ধ অবস্থায় থাকার সময় ব্যক্তির মানসিক ও প্রাক্ষোভিক সংগঠনের মধ্যে বিরাট একটি পরিবর্তন দেখা দেয়। তার ফলে তার মনোভাব, চিন্তাধারা, বিচারবুদ্ধি, নৈতিক মান, প্রক্ষোভ প্রভৃতি গুরুতরভাবে বদলে যায় এবং তার স্বাভাবিক আচরণধারার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে।

দলবদ্ধ মানুষের আচরণের প্রকৃতি সঙ্গহীন মানুষের আচরণের প্রকৃতি থেকে এতই পৃথক যে একই মনোবৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে এই দু'ধরনের আচরণের ব্যাখ্যা করা যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় যে সব নিয়মকানুন অনুযায়ী মানব আচরণ সম্পন্ন হয়, দলবদ্ধ অবস্থায় মানব আচরণে সে সব নিয়মকানুন প্রযোজ্য হয় না। তার ফলে দলবদ্ধ ব্যক্তির আচরণের ব্যাখ্যার জন্য নতুন এক মনোবিজ্ঞান সৃষ্ট হয়েছে। একেই যৌথ মনোবিজ্ঞান (Group Psychology) নাম দেওয়া হয়েছে।

কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একস্থানে সমবেত হলেই মনোবিজ্ঞানের ভাষায় তাকে দল বলা যায় না। কোন কর্মব্যস্ত দিনে বড় রাস্তার মোড়ে অফিস যাবার সময় বহুলোককে একসঙ্গে একই জায়গায় দেখা যায়। কিন্তু এই লোকের সমাবেশকে দল বলা যায় না। কেননা এই সমাবেশের প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে চলেছে। দলের অন্যান্য ব্যক্তির কাজ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু যখনই রাস্তায় কোন দুর্ঘটনার ফলে বা অন্য কোনও কারণে এই লোকগুলিই সেখানে সমবেত হবে তক্ষুনি তারা একটি মনোবিজ্ঞানমূলক দলের সৃষ্টি

করবে। কেননা তখন প্রতিটি ব্যক্তিরই চিন্তা, অনুভূতি, আচরণ ঐ দুর্ঘটনার বিষয়বস্তুটিকে কেন্দ্র করে সুসংবদ্ধ হয়ে উঠবে। যদিও তাদের এই সংহতি অগভীর এবং অল্পক্ষণ স্থায়ী এবং অচিরেই তারা নিজের নিজের কাজে চলে যাবে তবুও তারা অল্পক্ষণের জন্য একটি মনোবিজ্ঞানমূলক দল তৈরী করেছে। এই ধরনের দলকে জনতা (crowd) বলা হয়। স্থায়িত্বের দিক দিয়ে দল বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে। জনতার চেয়ে অধিকক্ষণ স্থায়ী দল হল কোন বক্তৃতা বা আলোচনায় শ্রোতার দল বা ছায়াছবি ও নাট্যাভিনয়ে দর্শকের দল। তার চেয়ে স্থায়ী দল হল ক্লাব, সাহিত্যমূলক বা কৃষ্টিমূলক সঙ্ঘ। তার চেয়ে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী দল হল পরিবার, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র ইত্যাদি।

নীচে মনোবিজ্ঞানমূলক দলের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির বর্ণনা দেওয়া হল।

১। পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে দলের মৌলিক ধর্ম হল দলের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া (Interaction)। যখন দুই বা তার বেশী ব্যক্তি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন তারা পরস্পর পরস্পরের উপর প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। একেই মনোবিজ্ঞানমূলক প্রতিক্রিয়া বলে। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রতিটি ব্যক্তিই কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে একটি বিশেষ পারস্পরিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এভাবেই প্রতিটি দল তৈরী হয়ে থাকে এবং এই পারস্পরিক সম্পর্কই হল প্রতিটি দলের মৌলিক ভিত্তি।

২। ছেদহীনতা

মনোবিজ্ঞানমূলক দলের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এর ছেদহীনতা (Continuity)। কোন বিশেষ জনসমাবেশ তখনই দল নাম পাবার যোগ্য হয় যখন তার মধ্যে ছেদহীনতা থাকে। অর্থাৎ দল গঠন করতে হলে জন-সমাবেশটিকে একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে স্থায়ী হতে হবে। যে সমাবেশের মধ্যে সময়গত স্থায়িত্ব বা ছেদহীনতা নেই সেই সমাবেশটিকে দল বলা চলে না।

মনোবিজ্ঞানমূলক দলের এই ছেদহীনতা দু'শ্রেণীর হতে পারে—বস্তুগত ছেদহীনতা এবং আকারগত ছেদহীনতা। যে সব ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে দল গঠন করে তারা যখন অপরিবর্তিত থাকে তখন তাকে বস্তুগত ছেদহীনতা বলে। যেমন, পরিবারের ছেদহীনতা বস্তুগত। কেননা পরিবারের অন্তর্গত যে সব ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে চলে, তারা মোটামুটি

ভাবে সব সময় অপরিবর্তিতই থাকে, বদলে যায় না। আবার যখন দলটির আকার ঠিক একই রকম থাকে কিন্তু দলের অন্তর্গত ব্যক্তিরা বদলে যায় তখন দলটির ছেদহীনতাকে আকারগত ছেদহীনতা বলে। যেমন ক্লাব, প্রতিষ্ঠান, সরকার প্রভৃতি সংগঠনগুলির ছেদহীনতা হল আকারগত ছেদহীনতা। এগুলির সদস্যেরা বদলে গেলেও এগুলির সংগঠনমূলক রূপ বা আকৃতি অক্ষুণ্ণ থাকে বলে দলের অস্তিত্ব ঠিকই বজায় থাকে।

৩। সমগোষ্ঠিতার অনুভূতি

প্রথমত, দলের প্রতি সদস্যদের মধ্যে একটি আত্মীয়তাবোধ বা সমগোষ্ঠিতার অনুভূতি থাকবে। অর্থাৎ সকল সদস্যই মনে করবে যে তারা প্রত্যেকেই একটি বিশেষ গোষ্ঠীর অন্তর্গত। একেই আধুনিক সমাজবিজ্ঞানে সমগোষ্ঠিতার অনুভূতি (We-feeling) বলা হয়। এই সমগোষ্ঠিতার অনুভূতির উপরই প্রতিটি গোষ্ঠী বা দলের সংহতি নির্ভর করে।

৪। লক্ষ্যের অভিন্নতা

দ্বিতীয়ত, প্রত্যেক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের অভিন্নতা থাকবেই। যখন বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে কোন বিশেষ লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে মিল দেখা যায় তখন তারা একত্রে সম্মিলিত দল গঠন করে। আত্মরক্ষা ও জীবনধারণের উদ্দেশ্য সকল মানুষের মধ্যে সমানভাবে বর্তমান বলেই সর্বত্র মানবীয় দল বা সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব হয়ে উঠেছে। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের একতা থেকেই নানারকম বিশেষধর্মী প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

৫। আচরণের অভিন্নত

তৃতীয়ত, লক্ষ্যের অভিন্নতার সঙ্গে সঙ্গে আসে আচরণের অভিন্নতা। কোন একটি গোষ্ঠীর অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির মৌলিক আচরণগুলির মধ্যে প্রচুর সমতা দেখতে পাওয়া যায়। এর মূলে আছে অচেতন এবং সচেতন উভয়বিধ অনুকরণ প্রক্রিয়া।

৬। পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির সমত।

চতুর্থত, আচরণের সমতা থেকেই পোষাক-পরিচ্ছদ, হাবভাব, জীবনধারণ-প্রণালী প্রভৃতির মধ্যেও সমতা এবং মিল ধীরে ধীরে দেখা দেয়। কোন গোষ্ঠীকে সুসংবদ্ধ রাখতে হলে এই সমতাগুলি অপরিহার্য।

৭। সঙ্গকামিতা

পঞ্চমত, গোষ্ঠীর সৃষ্টির মূলে যে শক্তিটি বিশেষভাবে কাজ করে থাকে সেটি

হল আমাদের সঙ্গকামিতা বা দলবদ্ধতার আকাঙ্ক্ষা। অনেক মনোবিজ্ঞানী একে যৌথ প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করে থাকেন। তাঁদের মতে এই আকাঙ্ক্ষা প্রাণীর মধ্যে জন্ম থেকেই সহজাত প্রবৃত্তিরূপে বর্তমান থাকে এবং এই সহজাত প্রবৃত্তির বশেই মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী দলবদ্ধ হয়ে ওঠে। সঙ্গকামিতা বা দল বাঁধার আকাঙ্ক্ষা সহজাত প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করায় যদিও অনেক মনোবিজ্ঞানীর আপত্তি আছে তবু এই স্পৃহাটি যে প্রাণীমাত্রেরই মধ্যে একটি প্রবল শক্তি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। দেখা গেছে যে সাধারণভাবে মানুষ নির্জনতা বা একাকিত্ব পছন্দ করে না এবং অপরের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাস করতে চায়। এই সঙ্গের আকাঙ্ক্ষাই সকল প্রকার দল সংগঠন তৈরী করার মূলে আছে।

৮। পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

আধুনিককালে দলবদ্ধতার আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। দলের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তিদের সুখ-সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য প্রভৃতি পরস্পরের সহযোগিতা ও সাহায্যের উপর প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে। এই উপলব্ধি বিভিন্ন দল গঠনে যে বিশেষ শক্তিরূপে কাজ করে থাকে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দলের শ্রেণীবিভাগ

এই পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে দলকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন :—

(১) প্রত্যক্ষ দল (Primary Group)

(২) পরোক্ষ দল (Secondary Group)

(৩) প্রান্তীয় দল (Marginal or Tertiary Group)

প্রত্যক্ষ দল

যে দলের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষভাবে বা সরাসরি সম্পন্ন হয় তার নাম প্রত্যক্ষ দল (Primary Group)। এই ধরনের দলে ব্যক্তিরা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে কথাবার্তা বলে, মেলামেশা করে, পরস্পরের সুখ দুঃখে অংশ গ্রহণ করে এবং পরস্পরের সঙ্গে গভীর অনুভূতি ও অনুরাগের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরিবার, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর দল প্রভৃতি হল এই ধরনের প্রত্যক্ষ দলের উদাহরণ। প্রত্যক্ষ দলের অন্তর্গত ব্যক্তিদের মধ্যে একতার বন্ধন একান্ত আন্তরিক এবং সকল দলের মধ্যে প্রত্যক্ষ দলের ভিত্তিই হল সবচেয়ে সুদৃঢ় এবং স্থায়ী।

পরোক্ষ দল

যে দলের ব্যক্তিদেব মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া পবোক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেই দলকে পরোক্ষ দল বলা হয়। যেমন, বাঙালী সমাজ, বৈষ্ণব সমাজ, ক্যাথলিক সমাজ, রোটারিয়ানদের দল, সমাজতন্ত্রী দল, ব্রাহ্ম সমাজ ইত্যাদি। এই ধবনের দলের সদস্যদের মধ্যে সাক্ষাৎভাবে কোন সম্পর্ক থাকে না। এই সব দলে কোন বিশেষ মতবাদ, আদর্শ বা লক্ষ্যেব মাধ্যমে দলেব সদস্যেবা পবোক্ষভাবে পবস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান সম্পন্ন করে থাকে। যেমন, যদিও সমস্ত বাঙালী পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে পবিচিত নয়, তবুও প্রতিটি বাঙালী নিজেকে বাঙালী সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে। এই ধরনের দলগুলি সাধারণত আকারে খুব বড হয়ে থাকে এবং সদস্যদেব মধ্যে সাক্ষাৎ আদান-প্রদান না থাকাব ফলে প্রত্যেক দলের তুলনায় এই দলেব ভিত্তি অপেক্ষাকৃত কম সুদৃঢ হয়।

প্রান্তীয় দল

এছাডা আবও এক ধরনেব দল আছে যেগুলি স্বল্পক্ষণ স্থায়ী এবং যেগুলির সদস্যদেব মধ্যে পারস্পবিক প্রতিক্রিয়া অসংবদ্ধ ও অনিয়ন্ত্রিত। প্রকৃতিতে সবচেয়ে দুর্বল এবং অস্থায়ী হওয়াব জন্য এ দলগুলিকে প্রান্তীয় দল বলা হয়। যেমন, পথে হঠাৎ কোন ব্যাপারে যে জনতার সৃষ্টি হয় বা বাসে অফিস যাবার সময় যে দলেব সৃষ্টি হয়, সেগুলিকে প্রান্তীয় দল বলা হয়ে থাকে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে উপরের তিন ধবনের দলের মধ্যে প্রত্যক্ষ দল স্থায়িত্ব ও দৃঢতার দিক দিয়ে অন্যান্য সকল দলেব চেয়ে অনেক উন্নত। তার পরে আসে পরোক্ষ দল এবং সবচেয়ে দুর্বল ও অস্থায়ী দল হল প্রান্তীয় দল।

ব্যক্তিগত আচরণ ও দলগত আচবণেব মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়। শুধু আচবণে নয়, দলে থাকাকালীন চিন্তা ও অনুভূতিব রাজ্যেও যথেষ্ট পবিবর্তন আসে। ব্যক্তির আচবণের বৈশিষ্ট্যকেই তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individuality) বলা হয়। যখন ব্যক্তি কোন আচরণ করে তখন তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা সেই আচরণের প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। কিন্তু যখন সে কোন দলের অন্তর্ভুক্ত হয় তখন তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য দলগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা অবদমিত হয়ে পডে এবং তার আচবণের নিজস্বতা সম্মিলিত আচরণের মধ্যে লুপ্ত হয়ে যায়। এই জন্যই দলের মধ্যে ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় না, সে তখন দলেব একটি অংশমাত্র হয়ে দাঁডায়।

দল গঠনে বিভিন্ন শক্তি

দল গঠনের পিছনে কি ধরনের শক্তিগুলি কাজ করে থাকে এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা হয়েছে। বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে এ সম্পর্কে অনেক মতভেদও দেখা যায়। এই ধরনের কয়েকটি শক্তি সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল।

ক। যৌথ-প্রবৃত্তি

প্রবৃত্তিবাদী মনোবিজ্ঞানীদের মতে দল গঠনের পেছনে আছে যৌথ প্রবৃত্তি (Gregarious Instinct)। ম্যাক্‌ডুগাল তাঁর প্রসিদ্ধ প্রবৃত্তির তালিকাটিতে যৌথ প্রবৃত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তার সহগামী প্রক্ষোভরূপে একাকিত্বের অনুভূতির (Feeling of loneliness) উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে প্রাণীমাত্রেই দল গঠন করে এই বিশেষ প্রবৃত্তিটির তাড়নায়। মানুষের মধ্যে একা থাকার অনুভূতিটিই এই প্রবৃত্তিটিকে সক্রিয় করে তোলে অর্থাৎ মানুষ যখন একা থাকে তখন তার মধ্যে একটি নির্জনতা বা একাকিত্বের প্রক্ষোভ জেগে ওঠে এবং তার প্রেরণাতেই সে দল গঠন করতে সচেষ্ট হয়। বলা বাহুল্য ম্যাক্‌ডুগালের এই তত্ত্বটি দল গঠন প্রক্রিয়াটির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে পারে না। মানুষের মধ্যে দল বাঁধার যে একটি জন্মগত প্রবণতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মানবীয় দল প্রকৃতি ও সংগঠনের দিক দিয়ে এত বিচিত্র ও বিবিধ হয়ে থাকে যে নিছক যৌথ প্রবৃত্তির দ্বারা সেগুলির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে কোন দলের সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কতকগুলি মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার সন্ধান পাই। বস্তুত এই মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াগুলি দল গঠনের পিছনে প্রধান শক্তিরূপে কাজ করে থাকে।

খ। সমানুভূতি

বিচ্ছিন্ন ও অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দলবদ্ধ করার প্রধানতম শক্তিটি হল সমানুভূতি। যখন কোন বিষয়, বস্তু, ব্যক্তি বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে একই অনুভূতির সৃষ্টি হয় তখন সেই ব্যক্তিদের মধ্যে দলবদ্ধতা দেখা দেয়। অন্যান্য দিক দিয়ে এই ব্যক্তিদের মধ্যে নানারকম পার্থক্য থাকলেও এই সমানুভূতি তাদের একতার সূত্রে বেঁধে দেয়। রাস্তায় হঠাৎ জমা হওয়া একটা ভীড় থেকে সুরু করে পরিবার, ক্লাব, সংঘ, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র, জাতি প্রভৃতি সকল রকম দলের ভিত্তিই হল এই সমানুভূতি। রাস্তায় জনতার

প্রত্যেকটি ব্যক্তিই হয় দুঃখ, নয় রাগ, নয় কৌতূহল দলের আর সকলের সঙ্গে সমানভাবে অনুভব করে বলেই ঐ দলটি তৈরী হতে পেরেছে। তেমনই সংঘ, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার প্রভৃতি সংগঠনের প্রত্যেকেই সমানভাবে পরস্পরের অনুভূতির অংশগ্রহণ করে থাকে। দল যত স্থায়ী ও সুসংবদ্ধ হয় এই সমানুভূতিও সংখ্যা এবং মাত্রার দিক দিয়ে ততই বেড়ে চলে। সাধারণ একটি জনতার মধ্যে এই অনুভূতি সংখ্যায় মাত্র একটি এবং স্থায়িত্বের দিক দিয়ে অত্যন্ত সাময়িক। একটি কলামূলক বা সাংস্কৃতিক সংঘের মধ্যে এই সমানুভূতির সংখ্যা একের চেয়ে বেশী এবং সংঘটির স্থায়িত্বও তুলনায় অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী। একটি সুসংবদ্ধ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সমানুভূতি সংখ্যাতেও যেমন অজস্র তেমনই সেগুলি একরকম চিরস্থায়ী বললেও চলে। একটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যই সমানভাবে এবং অত্যন্ত গভীরভাবে পরস্পরের প্রায় প্রতিটি অনুভূতির অংশগ্রহণ করে থাকে।

বস্তুত ছোট হোক, বড় হোক স্থায়ী হোক, অস্থায়ী হোক সমস্ত দলেরই মৌলিক ধর্ম হল সমানুভূতি। যখনই একজন অপরের অনুভূতির অংশ গ্রহণ করে তখনই সে অপরের সঙ্গ কামনা করে এবং এইভাবেই দলের উৎপত্তি হয়। কেবলমাত্র দলের সৃষ্টিতেই যে সমানুভূতির অবদান আছে তা নয়, দলের পুষ্টি, প্রসার এবং স্থায়িত্ব সবই নির্ভর করে সদস্যদের পারস্পরিক সমানুভূতির মাত্রার উপর।

গ। অনুকরণ

দলের সৃষ্টি ও সংরক্ষণে আর একটি মনোবিজ্ঞানমূলক প্রক্রিয়া বিশেষভাবে কাজ করে থাকে। সেটি হল অনুকরণ প্রক্রিয়া। অপরের আচরণের অনুসরণে আচরণ করাকে অনুকরণ বলে। অনুকরণপ্রবণতা মানুষের প্রকৃতিজাত এবং জীবনযাত্রার সকল স্তরে এটি দেখতে পাওয়া যায়। শৈশবে শিশু তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অতি প্রয়োজনীয় আচরণগুলি শেখে অনুকরণের মাধ্যমে। সামাজিক দল গঠনে অনুকরণ প্রক্রিয়ার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। দলের অন্তর্গত সদস্যেরা কখনও নিজেদের জ্ঞাতসারে কখনও বা অজ্ঞাতসারে অপরের আচরণ অনুকরণ করে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তি এমন অনেক আচরণ করে, যা সে অপরকে দেখে সম্পন্ন করতে শিখেছে। এই জন্যই একটি দলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের আচরণের মধ্যে প্রচুর মিল দেখা যায়। বস্তুত যে কোন দলের গঠন সম্ভব হয় সদস্যদের মধ্যে এই অনুকরণ প্রবণতা আছে বলে এবং সদস্যদের এই অনুকরণপ্রবণতাই তাদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সমতার কারণ।

ব্যক্তির মধ্যে এই অনুকরণ-প্রবণতা এত গভীর ও দৃঢ়বদ্ধ যে ম্যাক্‌ডুগাল প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা একে একটি সহজাত প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও অনুকরণ প্রবণতা যে আমাদের সামাজিক আচরণের স্বরূপ নির্ণয়ে একটি শক্তিশালী উপাদান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

ঘ। অনুভাবন

দলের সংহতি ও ঐক্য সৃষ্টি করতে বিশেষভাবে সাহায্য করে আর একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া। সেটিকে আমরা অনুভাবন (Suggestion) বলে বর্ণনা করতে পারি। অনুভাবনও হল এক ধরনের অনুকরণ। যখন আমরা অপরের চিন্তা, ভাবধারা, আদর্শ প্রভৃতি নিজস্ব করে নিই, তখন তাকে অনুভাবন বলে বর্ণনা করা হয়। অনুভাবন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য হল যে আমরা যে চিন্তা বা ধারণা অপরের কাছ থেকে গ্রহণ করি সেগুলি আমরা আমাদের অজ্ঞাতসারেই গ্রহণ করে থাকি। আমরা অপরের এই ভাব বা ধারণাগুলিকে অপরের বলে জানতে পারি না বা অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আমরা সেগুলি গ্রহণ করছি বলে মনে করি না। আমরা মনে করি যে ঐ ভাব বা ধারণাগুলি আমাদের নিজেদের মধ্যে থেকেই জন্মেছে। এক কথায় অনুভাবন প্রক্রিয়াটি একটি অচেতন প্রক্রিয়া। তবে যে অনুভাবিত হয় তার কাছেই সব সময়ে অনুভাবন প্রক্রিয়াটি অচেতন থাকে কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যকে অনুভাবিত করে তার কাছে অনুভাবন প্রক্রিয়াটি সচেতন বা অচেতন দুইই হতে পারে।

আমাদের জীবনে অনুভাবনের প্রভাব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে দলগত জীবনযাত্রায়, পরস্পরের মধ্যে ভাবের সঞ্চালন, চিন্তাধারার একতা এবং আদর্শগত সমতা সৃষ্টি করার ব্যাপারে অনুভাবনের অবদান গুরুত্বপূর্ণ। বস্তুত যে কোন দলের জ্ঞানমূলক বা চিন্তামূলক দিকটির সংগঠন এই অনুভাবন প্রক্রিয়ার উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দলের অন্তর্গত বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে চিন্তামূলক সংহতি দেখা দেয়। একই গোষ্ঠী বা পরিবারের অন্তর্গত বা একই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে বৈষম্য ও পার্থক্য এই প্রক্রিয়াটির মাধ্যমে দূর হয়ে যায়।

অনুভাবন প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এর মূলে আছে একটি বশ্যতার অনুভূতি। যখন আমরা অপর কোন ব্যক্তিকে আমাদের চেয়ে কোন দিক দিয়ে বড় বলে মনে করি তখনই তার চিন্তা বা ধারণার কাছে নতি স্বীকার করি। এই বশ্যতার অনুভূতি থেকেই আমরা অপরের চিন্তা বা ভাবধারা

আমাদের অজ্ঞাতসারেই নিজের করে নিই। যেখানে এই বশ্যতার অনুভূতি নেই সেখানে অনুভাবন প্রক্রিয়া বিশেষ কার্যকর হয় না। এই জন্য দল বা গোষ্ঠীতেই অনুভাবন প্রক্রিয়া বিশেষ ভাবে কার্যকর হয় এবং অনুভাবন প্রক্রিয়ার উপরই আবার দল বা গোষ্ঠীর সংহতি এবং সমৃদ্ধি নির্ভর করে। সাধারণত দলের মধ্যে যারা প্রবীণ, জ্ঞানী, গুণী ও অভিজ্ঞ বলে পরিচিত হন তাঁদের মতামত, চিন্তা এবং ধারণা সহজেই দলের অপর সদস্যেরা গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া যার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি বা অনুরাগ থাকে তার চিন্তা, ধারণা বা বিশ্বাস গ্রহণ করতে আমাদের দেরী হয় না। স্বাভাবিক অনুভাবন ছাড়াও অস্বাভাবিক অনুভাবনের দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া যায়। সম্মোহনের সাহায্যে ব্যক্তিকে বিশেষ কোন কাজে বা ব্যাপারে অনুভাবিত করা যেতে পারে। দেখা গেছে যে সম্মোহনের পর ব্যক্তি যখন জেগে ওঠে তখনও সে ঐ অনুভাবনের প্রভাব অনুযায়ী আচরণ করে থাকে। এই ধরনের অনুভাবন অবশ্য মানসিক রোগের চিকিৎসায় প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। দলের সংগঠনে যে তিনটি প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা হল সেই প্রক্রিয়া তিনটি মূলত একই। সমানুভূতি বা অনুভাবন এ দুটিও এক ধরনের অনুকরণ প্রক্রিয়া। সমানুভূতির অর্থ হল অপরের অনুভূতির অনুকরণ করা এবং অনুভাবনের অর্থ হল অপরের চিন্তা বা ভাবের অনুকরণ করা। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে অনুভূতির অনুকরণ, চিন্তার অনুকরণ এবং আচরণের অনুকরণ, এই তিন শ্রেণীর অনুকরণ প্রক্রিয়াই দল বা গোষ্ঠীর সংগঠনে প্রধানতম শক্তি। যদি ধরে নেওয়া যায় যে সঙ্গকামিতা বা দলবদ্ধতা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি, তাহলে এই ত্রিবিধ অনুকরণ প্রক্রিয়া সেই প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করার প্রকৃতিদত্ত উপকরণ বিশেষ।

গণমন (Group Mind)

কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যখন একত্রিত হয়ে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে একটি সামাজিক সংগঠনের সৃষ্টি করে তখন তাদের বিচ্ছিন্ন বহু সত্তা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায় এবং তাদের স্থানে একটি সমষ্টিগত একক সত্তা দেখা দেয়। এই একক সত্তাটির চিন্তাধারার মধ্যে কোন বিভেদ বা বৈষম্য থাকে না এবং তার উদ্দেশ্য, প্রচেষ্টা ও আচরণ সবই একটিমাত্র পথ ধরে অগ্রসর হয়। অনেক মনোবিজ্ঞানীর মতে যখন এই ধরনের একটি দলের সৃষ্টি হয় তখন বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত মনগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি সমষ্টিগত একক মনের সৃষ্টি করে। এই সমষ্টিকে তাঁরা সমষ্টিগত মন (Collective Mind) বা গণমন

(Group Mind) নাম দিয়েছেন। এই মনোবিজ্ঞানীদের মতে যখন একটি সত্যকারের সুসংবদ্ধ দল তৈরি হয় তখন বিভিন্ন ব্যক্তিগত মনগুলির নিজস্ব কোন প্রভাব থাকে না। তখন সমস্ত মনগুলিকে পরিব্যাপ্ত করে একটি একক মনের সৃষ্টি হয়ে যায়। এই গণমনের কাছে ব্যক্তিগত মনগুলি তাদের নিজস্ব সত্তা ও স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে এবং গণমনের চিন্তা, লক্ষ্য, প্রয়োজন প্রভৃতির দ্বারাই দলের প্রত্যেকটি লোকের আচরণ ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যেহেতু গণমনের মধ্যে ব্যক্তিগত মন তার নিজস্ব সত্তা হারিয়ে ফেলে সেহেতু ব্যক্তির নিজস্ব চিন্তা, লক্ষ্য, ইচ্ছা, পছন্দ, অপছন্দ কোন কিছুরই মূল্য থাকে না। ব্যক্তিমন তখন পরিপূর্ণভাবে গণমনের অধীনস্থ হয়ে পড়ে এবং গণমনের লক্ষ্যকে নিজের লক্ষ্য, তার চিন্তাকে নিজের চিন্তা, তার প্রক্ষোভ, পছন্দ, অপছন্দকে নিজের প্রক্ষোভ, পছন্দ, অপছন্দে পরিণত করে। এই জন্যই দেখা যায় যে একটি সত্যকারের সুসংবদ্ধ দলের সদস্যদের মধ্যে চিন্তা, লক্ষ্য এবং আচরণ প্রায় একই রকমের হয়ে যায়।

কোন দলের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের চিন্তা, আচরণ প্রভৃতির দিক দিয়ে একতা সম্বন্ধে কারও দ্বিমত না থাকলেও গণমন বা সমষ্টিগত মন নামে কোন একটি স্বতন্ত্র মনের অস্তিত্ব সকলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে দলের প্রভাবে দলের অন্তর্গত প্রতিটি সদস্যের মনে একটি সাময়িক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং যতক্ষণ সে দলের মধ্যে থাকে ততক্ষণ সমষ্টিগত লক্ষ্য, চিন্তা ও চাহিদা তার সমস্ত কাজকে নিয়ন্ত্রিত করে। অর্থাৎ সমষ্টিগত সচেতনতাই সমস্ত যৌথ আচরণের কারণ, কোনরূপ গণমন বা সমষ্টিগত মনের পরিকল্পনাকে তাঁরা অতিরঞ্জন বলে বর্ণনা করেন।

কিন্তু যাঁরা গণমনের অস্তিত্বে বিশ্বাসী তাঁরা বলেন যে দলের মধ্যে থাকার সময় ব্যক্তির চিন্তা, আচরণ ও অনুভূতিতে এমন আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় যে একটি সর্বব্যাপী গণমনের পরিকল্পনা ছাড়া তার যথাযথ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। সর্বব্যাপী একনায়ক একটি মাত্র গণমনের প্রভাবেই বিভিন্ন ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্য এইভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়া সম্ভব হয়।

দলের গঠনের ফলে গণমন বলে সত্যকারের একটি স্বতন্ত্র মন সৃষ্ট হয় কিনা, এ বিষয়ে মতভেদ থাকলেও এ কথা অনস্বীকার্য যে দলের সংহতি ও ঐক্য নির্ভর করে এই ধরনের একটি সমষ্টিমূলক অনুভূতি বা সচেতনতার উপর। যেখানেই এই গণচেতনা যত সুদৃঢ় সেখানেই দলের ঐক্য, শৃঙ্খলা ও সাফল্য তত বেশী।

এই জন্য যখনই কোন দল গঠন করা হয় তখনই দেখতে হয় যে সদস্যদের মধ্যে গণমন বা গণচেতনা কতটা সৃষ্ট হয়েছে।

বিদ্যালয় ও গণমন

বিদ্যালয়ও প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীদের একটি দল এবং বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা, সংহতি ও সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের দলের ঐক্য ও সংহতির উপর। যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দলের মধ্যে সংহতি বেশী, সে বিদ্যালয়ের শিক্ষার কাজও সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়। আর যে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দলের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতি কম সে বিদ্যালয়ের শিক্ষার কাজ আয়াসবহুল ও কষ্টকর হয়ে ওঠে। এই জন্য বিদ্যালয়ে গণমন বা গণচেতনা সৃষ্টি করাই শিক্ষার উৎকর্ষের দিক দিয়ে প্রথম কাম্য।

বিদ্যালয়ে গণচেতনা সৃষ্টির পন্থা

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই গণমন বা গণচেতনা সৃষ্টি করার জন্য কয়েকটি উপায় অবলম্বন করা যেতে পারে। সেগুলি হল—

প্রথমত, প্রত্যেক দলেরই সংহতির জন্য প্রয়োজন তার অস্তিত্বের মধ্যে একটি ছেদহীনতা। দলের অস্তিত্ব নিতান্ত সাময়িক বা অস্থায়ী হলে গণচেতনা সৃষ্টি হতে পারে না।

বিদ্যালয়ে বস্তুগত ও আকারগত, দু'ধরনের ছেদহীনতাই আছে। সেজন্য সেখানে গণচেতনা জাগানো সহজ। বিশেষ করে আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে এই ছেদহীনতা আরও স্থায়ী ও সুদৃঢ়। সেজন্য আবাসিক বিদ্যালয়গুলিতে সুসংহত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক জীবন গড়ে তোলা বিশেষ কষ্টকর কাজ নয়।

দ্বিতীয়ত, গণচেতনা সৃষ্টি করার আর একটি উপায় হল দলের ব্যক্তিদের মধ্যে দল সম্পর্কে ভাল জ্ঞান বা ধারণার সৃষ্টি করা। অর্থাৎ দলটির প্রকৃতি, সংগঠন, কাজ, শক্তি-সামর্থ্য ও বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে দলের প্রত্যেকের যথোপযুক্ত জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। এই জ্ঞানই ব্যক্তির মধ্যে দল সম্পর্ক সচেতনতা এনে দেয় এবং তাদের মধ্যে দলগত সেন্টিমেন্টের সৃষ্টি করে। যে শিশু বিদ্যালয়ের স্বরূপ, কাজ ইত্যাদি সম্পর্কে উদাসীন সে শিশু কোনদিনই বিদ্যালয় সমাজের সার্থক সদস্যরূপে গড়ে উঠতে পারে না।

তৃতীয়ত, প্রতিটি দলের সঙ্গে বাইরের সমপ্রকৃতির দলের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া থাকা অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে প্রচুর পরিমাণে আদর্শ ও লক্ষ্যগত বিভিন্নতা এবং ঐতিহ্য ও প্রথাগত বৈষম্য থাকে। তার ফলে বিভিন্ন দলের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হলে নিজের দল সম্পর্কে

সচেতনতা আরও গভীর হয়ে ওঠে। এই দলচেতনা সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতার রূপ নিয়ে প্রকাশ পায় এবং বিভিন্ন দলের পুষ্টি ও সমৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই জন্যই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যাতে অন্যান্য বিদ্যালয়, অন্যান্য সমাজ ও বিদেশের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায় তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। ভ্রমণ, গ্রাম পরিদর্শন, সমাজসেবা, প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক মেলামেশা, খেলাধূলা প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে এক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদলের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দিতে হয়।

চতুর্থত, প্রতিটি দলেরই নিজস্ব কতকগুলি আচার ব্যবহার, প্রথা ও অভ্যাস আছে এবং দলের সদস্যেরা সেগুলি সম্পর্কে অবহিত থাকে। এই আচার ব্যবহার, প্রথা ও অভ্যাসগুলি সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের স্বরূপ নির্ধারণ করে এবং এগুলির সচেতনতাই দল সম্পর্কে ব্যক্তিদের সচেতন করে রাখে। প্রতিটি বিদ্যালয়েই এই রকম নিজস্ব প্রথা ও নিয়মকানুন প্রভৃতি প্রচলিত থাকে এবং এগুলিই শিক্ষার্থীদের মধ্যে একতাবোধ সব সময় জাগিয়ে রাখে। বিদ্যালয়ের নানাবিধ অনুষ্ঠান, প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলন ইত্যাদি বিদ্যালয়ের সমাজকে পরিপুষ্ট করে তোলে।

পঞ্চমত, গণমন সৃষ্টিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে দলের মধ্যে সুপরিকল্পিত কার্যসূচীর প্রবর্তন। প্রত্যেক দলেরই অস্তিত্ব ও গতিশীলতা নির্ভর করে সুনির্ধারিত এবং সুসংগঠিত কর্মপন্থার অনুশীলনের উপর। এই কাজগুলির নির্বাচন এমন হবে যার মধ্যে দিয়ে সদস্যদের নিজস্ব প্রতিভা ও সম্ভাবনা অভিব্যক্তি লাভ করবে। বিদ্যালয়েতেও সেরকম সুচিন্তিত কর্মসূচী প্রবর্তন করতে হবে যাতে সেগুলির মাধ্যমে বিদ্যার্থীদের ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ সম্ভবপর হয়।

ষষ্ঠত, শিক্ষার্থীদের মধ্যে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের একতা আনতে হবে। তারা সকলেই যে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য বিদ্যালয়ে সমবেত হয়েছে এই বোধটি তাদের মধ্যে প্রথমেই জাগাতে হবে। যদি তাদের প্রত্যেকে একই লক্ষ্য এবং আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে সংহতি এবং ঐক্য দেখা যাবে।

সপ্তমত, তাদের মধ্যে বাহ্যিক চিহ্নের দিক দিয়েও নানাভাবে সমতা আনা যেতে পারে। একই স্কুলের ছেলেমেয়েদের সমান ইউনিফর্ম বা পোষাক, কোনও বিশেষ ধরনের স্কুলব্যাজ বা প্রতীক, স্কুলের নিজস্ব সঙ্গীত, স্কুলের নিজস্ব পতাকা ইত্যাদি প্রবর্তনের মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গণচেতনা বা গণমন তৈরী

করা যেতে পারে। এক ধরনের পোষাক, ব্যাজ, প্রতীক প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ছেলেমেয়েরা তাদের স্বতন্ত্র সত্তা ভুলে যায় এবং নিজেদের একই গোষ্ঠীর বা দলের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে।

অষ্টতম, যৌথ কর্মসূচীই হল দলের সংহতি সৃষ্টি করার পক্ষে সব চেয়ে বড় শক্তি। সম্মিলিতভাবে কোন কাজ করার মধ্যে দিয়েই ব্যক্তির মধ্যে দল সম্পর্কে চেতনা আসে এবং দলের প্রতি তার আসক্তি জন্মায়। তাই থেকে তার মধ্যে সহযোগিতা, দায়িত্বজ্ঞান, স্বার্থত্যাগ, দল-বিশ্বস্ততা প্রভৃতি মূল্যবান বৈশিষ্ট্যগুলি সৃষ্ট হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজধর্মী পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য প্রচুর পরিমাণে যৌথ অভিজ্ঞতা কর্মসূচীতে প্রবর্তন করা প্রয়োজন; খেলাধূলা, ভ্রমণ থেকে সুরু করে বিতর্ক, প্রদর্শনীর আয়োজন, সংস্কৃতিমূলক এবং সাহিত্যমূলক অধিবেশন, সামাজিক সম্মেলন, সমাজ-উন্নয়নমূলক কাজকর্ম ইত্যাদির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈষম্য দূর করে তাদের মধ্যে একতা ও সংহতি সৃষ্টি করা যায়।

পঁচিশ

যৌনশিক্ষা (Sex Education)

যৌনতা মানবজীবনের গঠন ও নির্বাহে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। জীব-তত্ত্বের দিক দিয়ে প্রাণীর বংশপ্রবাহকে অব্যাহত রাখার জন্য যৌনতার সৃষ্টি হলেও প্রাণীর ব্যক্তিসত্তা সংগঠনে এবং তার অন্যান্য দিকগুলির পরিপুষ্টির ক্ষেত্রে যৌনতা একটি অতি প্রভাবশালী শক্তিরূপে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে মানবের ক্ষেত্রে তাব ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবন, তার প্রক্ষোভমূলক সংগঠন তার জীবনাদর্শের বিকাশ প্রভৃতি প্রতিটি দিকই যৌনতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে থাকে।

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে শৈশবে শিশুর মধ্যে কোনরকম যৌন সচেতনতা থাকে না এবং যৌবনপ্রাপ্তিব আগে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্কে কোনরূপ আগ্রহ ও প্রবণতা দেখা দেয় না। কিন্তু প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষক ফ্রয়েডের গবেষণা থেকে,একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে জন্মেব পর থেকেই শিশুর মধ্যে যৌন চেতনা দেখা দেয়। শুধু তাই নয় তার যে সব আচরণকে আমরা নির্দোষ বা অর্থহীন বলে মনে করি সেগুলির মধ্যে অনেক আচরণই প্রকৃতপক্ষে তার যৌন তৃপ্তির প্রচেষ্টা বলে প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য পরিণত নরনারীর স্বাভাবিক যৌন অনুভূতি ও প্রচেষ্টাব সঙ্গে শিশুব এই যৌন অনুভূতি ও প্রচেষ্টার প্রকৃতিব দিক দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। বস্তুত স্বাভাবিক এবং সমাজস্বীকৃত মানের দিক দিয়ে শিশুর এই যৌন অনুভূতি ও প্রচেষ্টাকেও বিকৃত এবং অস্বাভাবিক বলা যেতে পারে। শৈশবকালের পর যে বাল্যকাল আসে তাকে যৌনতার দিক দিয়ে সুপ্তকাল বলা হয়। এই সময়ে শিশুর মধ্যে কোন যৌনতার অনুভূতি বা যৌনপ্রচেষ্টা প্রকাশ্যভাবে দেখা যায় না। কিন্তু বাল্যকালেব শেষে যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে যৌনতা তার পূর্ণরূপ নিয়ে দেখা দেয় এবং ব্যক্তির জীবননির্বাহের ক্ষেত্রে একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। এই সময় ব্যক্তির জীবনে সব দিক দিয়েই পূর্ণ পরিণতি দেখা দেয় এবং তার এই পরিণতি প্রাপ্তির প্রচেষ্টায় যৌনতা একটি শক্তিশালী উপাদানরূপে কাজ করে থাকে।

যৌনতা মানবজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলেও সাধারণ সভ্যসমাজে যৌনতাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে গোপন রাখা হয়ে থাকে। যৌনতা সম্পর্কে

সভ্যমানুষের মনে একটা লজ্জা ও সংকোচের মনোভাব দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার যৌনতাকে ঘৃণার চোখেও দেখা হয়। তার ফলে শিশু যখন বড় হয়ে ওঠে এবং যখন তার মধ্যে যৌনতার উন্মেষণ দেখা দেয় তখন তাকে সে সম্বন্ধে উপযুক্ত শিক্ষা দেবার কোন ব্যবস্থা আমাদের সমাজে নেই। যৌবনপ্রাপ্তির সময়ে প্রত্যেক ছেলেমেয়েই যৌন সম্পর্কিত তথ্যগুলি জানার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। অথচ আমাদের সমাজব্যবস্থাতে শিশুর এই যৌন কৌতূহল তৃপ্ত করার কোন সুষ্ঠু আয়োজন না থাকায় শিশুরা নানা অবাঞ্ছিত ও অনুপযোগী সূত্র থেকে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে। এই তথ্যগুলি যেমন একদিকে তাদের কৌতূহল পূর্ণভাবে তৃপ্ত করতে পারে না তেমনই তাদের কাছে অসত্য ও অর্ধসত্য পরিবেশন করে তাদের মধ্যে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের সৃষ্টি করে। এই বিকৃত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞান যে নানা দিক দিয়ে শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে একথা সকল আধুনিক মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করে থাকেন।

যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

(Need for Sex Education)

দেখা গেছে যে আধুনিক সভ্যসমাজে শিশুদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অপরাধপ্রবণতার একটি বড় কারণ হল তাদের অসম্পূর্ণ ও বিকৃত যৌনজ্ঞান। ছেলেমেয়ে নারী পুরুষের মধ্যে প্রকৃত সম্পর্কের পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট জ্ঞান না থাকার ফলে নানা ধরনের অপরাধপ্রবণতা ও নৈতিক অসংযমতা প্রায়ই দেখা দেয়। কেবল ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রেই নয় বিকৃত যৌনজ্ঞানের কুফল গুরুতরভাবে পরিণত বয়সের জীবনযাত্রাকেও প্রভাবিত করে। দাম্পত্য জীবনের শান্তি অনেকখানি নির্ভর করে নির্ভুল ও সুসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের উপর। বিকৃত যৌনজ্ঞান থেকে শিশুদের মধ্যে অস্বাভাবিক যৌনপ্রচেষ্টা ও প্রবণতা জন্ম নেয় এবং বহুক্ষেত্রে পরিণত বয়সে তা থেকে ভগ্নস্বাস্থ্য, যৌনব্যাধি ও নানা বিকৃত যৌন অভ্যাসের সৃষ্টি হয়।

এই সব কারণে বর্তমানে শিশুদের যৌন শিক্ষা দেওয়ার স্বপক্ষে প্রবল আন্দোলন দেখা দিয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে মানবজীবনের একটি বড় দিককে শিশুর কাছে অজ্ঞাত বা অর্ধজ্ঞাত রেখে তার ব্যক্তিসত্তাকে কখনই সুষ্ঠুভাবে বিকশিত করা সম্ভব হয় না। আজকাল অধিকাংশ প্রগতিশীল বিদ্যালয়েই যৌন শিক্ষাকে পাঠক্রমের একটি অপরিহার্য অঙ্গ করা হয়েছে। যৌন শিক্ষাদানের স্বপক্ষে নীচের যুক্তিগুলির উল্লেখ করা যায়।

প্রথমত- যৌবন প্রাপ্তির সময় শিশুদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে যৌন সচেতনতা দেখা দেয়। এই যৌন সচেতনতার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যৌন কৌতূহল। আগে বিশ্বাস করা হত যে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে সক্রিয় যৌন আচরণের প্রতি আকর্ষণ বেশী থাকে। কিন্তু আধুনিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে যৌবনপ্রাপ্তির সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে সক্রিয় যৌন প্রচেষ্টার প্রতি আকর্ষণের চেয়ে যৌন ব্যাপার সম্পর্কে কৌতূহলই অনেক প্রবল হয়ে দেখা দেয়। অতএব প্রাপ্তযৌবনদের যৌনমূলক চাহিদা তৃপ্ত করার একটি প্রধান পন্থা হল তাদের এই যৌন কৌতূহল পরিতৃপ্ত করার ব্যবস্থা করা। এক কথায় যৌন রহস্য সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে বিভিন্ন তথ্য পরিবেশন করলে শিশুদের যৌনমূলক চাহিদা অনেকাংশে তৃপ্ত হয়। এই জন্য বিদ্যালয় পাঠস্তর থেকেই যৌনশিক্ষা সুরু করা উচিত, বিশেষ করে নবম দশম শ্রেণীতে যে সময়ে যৌবনের প্রথম প্রকাশ হয় সে সময় যাতে ছেলেমেয়েরা প্রধান প্রধান যৌন তথ্যগুলির সঙ্গে পরিচিত হয় তার আয়োজন করা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত- সুষ্ঠু ব্যক্তিসত্তার সংগঠন নির্ভর করে সুস্থ যৌনজীবনের উপর। যৌনজীবনকে বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন করে তুলতে হলে যৌন বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা অপরিহার্য। পরবর্তীকালে যৌনজীবনের সাফল্যের জন্য শিশুর শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর মধ্যে যৌন শিক্ষা অবশ্য অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।

তৃতীয়ত, প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে যাতে বিকৃত ও অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের সৃষ্টি না হয় সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। বিকৃত সত্য, অর্ধসত্য, ও অসত্য যৌনজ্ঞানের অধিকারী হয়ে অল্পবয়সের ছেলেমেয়েরা নানা অবাঞ্ছিত যৌন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। বিশেষ করে আমাদের সমাজে যৌন চাহিদা ও যৌন অনুভূতি সম্পর্কে একটি প্রতিকূল মনোভাব থাকার ফলে শিশুদের মধ্যে যৌনতা সম্পর্কে একটি ভীতি ও লজ্জার মনোভাব দেখা দেয়। তার জন্য হয় তারা তাদের যৌন প্রবণতাকে অবদমিত করতে বাধ্য হয়, নয় অপরাধ বোধ-সঞ্জাত আত্মগ্লানি থেকে সারাজীবন কষ্ট পায়। এই অবাঞ্ছিত পরিণতি দূর করতে হলে সুপরিকল্পিত যৌন শিক্ষার আয়োজনই হল একমাত্র উপায়।

চতুর্থত, পরিণত জীবনের অধিকাংশ অভ্যাসেরই প্রাথমিক সংগঠনটি অতি শৈশবেই তৈরী হয়ে যায়। শিশুর যৌন অভিজ্ঞতার প্রকৃতি তার বিভিন্ন অভ্যাস গঠনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। বলা বাহুল্য বিকৃত বা অসম্পূর্ণ যৌনজ্ঞানের অধিকারী হলে শিশুর মধ্যে নানা অবাঞ্ছিত অভ্যাসের

সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে তার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনটি এই ধরনের অভ্যাসের প্রভাবে অসাফল্য ও অতৃপ্তির বোঝায় ভাবাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

পঞ্চমত, যৌন অনুভূতি শিশুর ক্রমবিকাশমান প্রক্ষোভমূলক সংগঠনে একটি বড় অংশ অধিকার করে থাকে। শিশুর যৌনমূলক অভিজ্ঞতাগুলিকে যদি সুষ্ঠু ও সুষম বিকাশের পথে পরিচালিত করা না হয় তাহলে তার সম্পূর্ণ প্রক্ষোভমূলক সংগঠনটি বিপর্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। শিশুর যৌনমূলক অভিজ্ঞতাগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করার প্রকৃষ্ট পন্থা হল যৌনসম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যগুলি তাকে পরিষ্কারভাবে জানতে দেওয়া।

ষষ্ঠত, যৌনশিক্ষা বলতে নিছক জীবতত্ত্বমূলক বা শরীরতত্ত্বমূলক তথ্য পরিবেশনকেই বোঝায় না। সার্থক যৌনশিক্ষার যথার্থ লক্ষ্য হল ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌনতা সম্পর্কে বলিষ্ঠ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করা এবং অপর পক্ষের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ সশ্রদ্ধ মনোভাব গঠন করা। এই কারণেই যৌনশিক্ষা সুষম ব্যক্তিসত্তা গঠনের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

সপ্তমত, সুখী দাম্পত্যজীবন ও সন্তানপালনের শিক্ষাও যৌনশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত। দেখা গেছে যে জীবনের এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলি সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা না পাওয়ার ফলে বহু ব্যক্তির পরিণত জীবনে নানা জটিল সমস্যা ও নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। অতএব এই অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলিও ব্যক্তির জীবন গঠনের পক্ষে অপরিহার্য।

যৌনশিক্ষার প্রকৃতি

বিকাশমান শিশুমাত্রেরই প্রক্ষোভমূলক জীবনের একটি প্রধান শক্তি হল যৌনতা। সেই জন্য যৌনশিক্ষা বলতে কেবলমাত্র যৌনতার জীবতত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা কিংবা যৌনতার সংগঠন-বৈশিষ্ট্য বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি শিক্ষা দেওয়াকে বোঝায় না। ব্যক্তির সমগ্র প্রক্ষোভমূলক জীবনে যৌনতার অসীম প্রভাব থাকার জন্য যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে প্রক্ষোভ নিয়ন্ত্রণের অভ্যাসগঠন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নগ্রহণ, সন্তোষজনক শৈশব অভিজ্ঞতা, অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যথাযথভাবে মেলামেশা করা, ভালবাসা, বিবাহ, পিতামাতা-সন্তানের সম্পর্কের প্রতি বলিষ্ঠ মনোভাব প্রভৃতি শিক্ষাকেও যৌন শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ বলে গ্রহণ করতে হবে। সাধারণত দেখা যায় যে নানা কারণে পিতামাতারা শিশুদের যৌনশিক্ষা দেবার পক্ষপাতী নন। কোন কোন পিতামাতা ছেলেমেয়েদের যৌনশিক্ষা দিতে ভয় পান। কেউ কেউ আবার যৌনশিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ ও তাৎপর্য সম্পর্কে ভালভাবে

অবহিত থাকেন না। আবার কোন কোন পিতামাতা নিজেদের যৌনজীবনে অসঙ্গতি থাকার ফলে ছেলেমেয়েদের যৌনশিক্ষাদানের বিরোধিতা করেন। কিন্তু শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তা এবং বর্তমান সমাজের পরিস্থিতির দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে যৌন শিক্ষাদানের অপরিহার্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহই থাকে না। বর্তমানে প্রত্যেক সুবিবেচক পিতামাতার পক্ষে নিজেদের ছেলেমেয়ের জন্য যৌনশিক্ষাদানের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

যৌন শিক্ষাদানের তিনটি স্তর

(Three Stages of Sex Education)

যৌনশিক্ষাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। যথা, বাল্যকালের স্তর, কৈশোর স্তর ও যৌবনপ্রাপ্তির স্তর। বাল্যকালের স্তর বলতে সাধারণভাবে ৩ বৎসর বয়স থেকে ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বোঝায়। কৈশোরের স্তর বলতে ১০ বৎসর বয়স থেকে ১৪—১৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বোঝায় এবং যৌবনপ্রাপ্তির স্তর বলতে ১৪—১৫ বৎসর বয়স থেকে ১৮—২০ বৎসর বয়স পর্যন্ত বোঝায়। এই বয়সগত স্তরবিভাগকে অবশ্য একেবারে সুনির্দিষ্ট বলা যায় না। বিভিন্ন শিশুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক ও পারিবেশিক বৈষম্যের জন্য এই বয়সগত বিভাগের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা যেতে পারে। শিক্ষাগত পর্যায়ের দিক দিয়ে বাল্যকালকে কিণ্ডারগার্টেন ও প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সমকালীন, কৈশোরকে মাধ্যমিক শিক্ষার প্রথম পর্যায়ের সমকালীন এবং যৌবনপ্রাপ্তিকে মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ের সমকালীন বলে বর্ণনা করা যেতে পারে। অতএব এই তিনটি স্তরের জন্য যৌনশিক্ষারও তিনটি বিভিন্ন পাঠক্রম থাকবে।

বাল্যকালে যৌনশিক্ষার পাঠক্রম

এই স্তরে যৌনশিক্ষা দেওয়া হবে অন্যান্য শিক্ষার মধ্যে দিয়ে প্রাসঙ্গিক শিক্ষা রূপে। এই স্তরে যৌনশিক্ষা প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিশুর যৌন অনুভূতিকে সুনিয়ন্ত্রিত করাই হবে এই স্তরের পাঠক্রমের প্রধানতম লক্ষ্য।

প্রথমত, যাতে ছোট শিশুর মধ্যে সুষম ও স্বাস্থ্যময় শারীরিক ও মানসিক অভ্যাস গড়ে ওঠে সে বিষয়ে যত্ন নিতে হবে। পরিবারের অন্যান্য সদস্য, ছোট ছেলেমেয়ে, পোষা পশু পাখী প্রভৃতির প্রতি ভালবাসা ও সাধারণ বিবেচনা শক্তি যাতে শিশুর মনে গড়ে ওঠে তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

যৌন বিষয় সম্পর্কে এই সময় শিশুর দুরন্ত কৌতূহল দেখা দেয়। শিশুর মাকে দেখতে হবে যে শিশু যেন তার যৌন কৌতূহল বিনা সঙ্কোচে প্রকাশ করতে শেখে। ছ'বছর বয়স থেকেই শিশু তার দেহের প্রতিটি অঙ্গের নির্ভুল নাম শিখবে। এই সময় নিজের যৌনাঙ্গগুলির নামও শিশু জানবে এবং সাধারণভাবে দেহের বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে তার মনে একটি ধারণার সৃষ্টি করতে হবে।

ছোট শিশুর জীবনে মায়ের স্থানই সব চেয়ে বড। মাকেই সে বেশীর ভাগ প্রশ্ন করে থাকে। একটু বড হলে বাবাক কাছেও সে তার প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয। শিশুর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার জন্য মা বাবা উভয়কেই প্রস্তুত থাকতে হবে। অনেক সময় ছোট ছেলেমেয়েরা বাইরেব কোন জায়গা থেকে কোন আলোচনা বা মন্তব্য শুনে মা বাবাকে যৌনবিষয়ক প্রশ্ন কবে। তখন পিতা-মাতাব উচিত শিশুর মনে সত্যকাবের কোন্ ধরনের চিন্তার উদয় হয়েছে তা নির্ণয় করা এবং সেইমত তার কৌতূহল তৃপ্তির চেষ্টা করা। মনে রাখতে হবে যে ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে কখনও কোন প্রশ্নের উত্তর বিশদ-ভাবে দেওয়া দরকার হয় না। উত্তব অতি বিশদ হলে তাদের চিন্তাধারা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় এবং তারা তাদেব আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

এর চেয়ে একটু বড় হলে বাড়ীর কাজ-কর্মে পরিবারের আর সকলের সঙ্গে শিশুদেব অংশগ্রহণ করতে দেওয়া উচিত এবং ছেলে ও মেয়ে উভয়ের সঙ্গে যাতে তারা স্বাস্থ্যকর খেলা ও কাজে অংশগ্রহণ করে সে দিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। এই সময় শিশুরা পিতামাতাব কাছ থেকে বিনা সঙ্কোচে যৌনবিষয় সম্পর্কে নানা তথ্য আহরণ করতে শিখবে। সেই সঙ্গে যাতে শিশু কোনরূপ অবাঞ্ছিত যৌন-প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতে না পাবে সেদিকে পিতামাতার বিশেষ যত্ন নিতে হবে। এই বয়স থেকেই প্রত্যেক ছেলেমেয়ে তার নিজের দেহের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম নিখুঁতভাবে জানবে। যখন তার বয়স দশ বছর হবে তখন থেকেই জনন প্রক্রিয়ার অর্থ ও পদ্ধতিব নির্ভুল প্রাথমিক জ্ঞান যাতে প্রতি শিশু আহরণ করতে পারে তারও আয়োজন করতে হবে।

আট বৎসর বয়সের আগে শিশু বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে ছেলে বা মেয়ের বিচার করে না। আট বৎসর বয়স থেকেই দেখা যায় ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে এবং মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে খেলতে ভালবাসে। দশ এগার বৎসর বয়স থেকেই ছেলেরা ও মেয়েরা পরস্পরের সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে সুরু করে

যৌন সচেতনতার এই ক্রমবিকাশের কথা মনে রাখলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-মেয়েদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বয়স্করা তাঁদের আচরণও নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন।

বিকাশমান শিশুর উপর পরিবারের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্নেহ ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে ছেলেমেয়েদের মানুষ করার চেষ্টা করলে তাদের ব্যক্তিসত্তার সংগঠন সুষ্ঠু ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে। এই সময় ছেলে ও মেয়ের মধ্যে সম্পর্ক এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে নানা প্রশ্ন শিশুদের মনে দেখা দেয়। এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর যাতে তারা পেতে পারে পিতা-মাতাদের সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে।

একথা অনস্বীকার্য যে বিদ্যালয়ই হল যৌনশিক্ষাদানের প্রকৃষ্ট স্থান। শৈশব স্তরে অবশ্য যৌন বিষয়ক কোন তথ্য প্রত্যক্ষভাবে পড়ান বা শেখান সম্ভব নয়। তবে শরীরতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বের সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে শিশুদের পরিচিত করবার আয়োজন এই স্তরের পাঠক্রমে রাখা দরকার। ক্লাশের ভিতরে এবং বাইরে শিক্ষার্থীদের কাজকর্মগুলি এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে কাজ করা এবং খেলাধূলার সুযোগ পায়। তার ফলেও মেয়েদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটি আন্তরিক বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধার ভাব গড়ে উঠবে।

কিশোর স্তরের যৌনশিক্ষার পাঠক্রম

সাধারণভাবে বলা চলে যে যৌবনপ্রাপ্তির আগে ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোনরূপ যৌনমূলক আচরণ দেখা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে বাল্যকালের যে সব আচরণকে যৌনমূলক বলে মনে হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি যৌনতা-বর্জিত ও নির্দোষ প্রকৃতির হয়ে থাকে। কিন্তু যৌনতাপ্রাপ্তির ঠিক আগের সময় থেকেই যৌনতার প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের যৌবনপ্রাপ্তি কিছু আগে ঘটে বলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কিশোর বয়সে মেয়েরা যতটা ছেলেদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে ছেলেরা মেয়েদের প্রতি ততটা আকর্ষণ বোধ করে না। এই জন্য এই সময় ছেলেদের প্রতি অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং তাদের যথাযথ পরিচালনা করা একান্ত আবশ্যক। দেখতে হবে যে ছেলে-মেয়েদের মনে যেন এ বিশ্বাস জন্মায় যে তাদের মা-বাবারাই সবচেয়ে ভালভাবে তাদের যৌনঘটিত সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

যৌবনপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মনেই একটি প্রবল প্রক্ষোভমূলক আলোড়ন দেখা দেয়। তাদের শরীরে এই সময়ে যে সব পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করে সেগুলিকে তারা যদি যথাযথ বুঝতে এবং ব্যাখ্যা করতে না পারে তাহলে তাদের প্রক্ষোভমূলক অসংগতি থেকে যায়। যৌনমূলক শরীরতত্ত্ব এবং মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পরিচিত করার দায়িত্ব প্রধানত পিতামাতারই। অবশ্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও উপদেষ্টারা যে ছেলেমেয়েদের বিশেষ বিশেষ জটিল সমস্যার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিশোর বয়সে মেয়েদের ক্ষেত্রে যৌনমূলক সঙ্গতিসাধন বেশ সহজ হয়ে উঠতে পারে যদি রজঃসৃষ্টি রহস্য এবং সন্তান জন্মদানের প্রয়োজনীয়তা তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া যায়। সাধারণত এই মূল্যবান কাজটি মা'রাই করে থাকেন। আর যে সব ক্ষেত্রে মেয়েরা তাদের এই গুরুত্বপূর্ণ দৈহিক পরিবর্তনের প্রকৃত অর্থ না জেনেই জীবনযাত্রা সুরু করে সে সব ক্ষেত্রে তাদের নানা ভ্রান্তি, সংশয় ও সমস্যার সন্মুখীন হতে হয়। সেই জন্য যৌনশিক্ষা পরিকল্পনার এইটি অতি মূল্যবান স্তর বা সোপান।

রজঃসৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে ছেলেমেয়েদেরও পরিষ্কার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কেননা দৈহিক পরিবর্তনগুলি মেয়েদের কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং মাতৃত্বের সঙ্গে সেগুলির কি সম্পর্ক এই প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি ছেলেদের জানা থাকলে তারা এই ঘটনাগুলিকে উপযুক্ত দৃষ্টি দিয়ে দেখতে শিখবে। আর যদি এই সব দৈহিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের মনে ভুল ধারণা জন্মায় তাহলে যৌনতার প্রতিই তাদের মনে একটি অস্বাস্থ্যকর মনোভাব গড়ে উঠবে। মোট কথা কিশোর স্তরের যৌনশিক্ষার পাঠসূচীতে থাকবে যৌনমূলক প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান এবং যৌনঘটিত নানা দৈহিক পরিবর্তন সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যাদির আহরণ। সেই সঙ্গে ছেলেদের মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েদের ছেলেদের প্রতি যাতে একটি বলিষ্ঠ ও উদার মনোভাব গড়ে ওঠে তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

প্রাপ্তযৌবন স্তরের যৌনশিক্ষার পাঠক্রম

সাধারণত বাল্যকালে বা কৈশোরে শিশু প্রয়োজনীয় যৌন তথ্যগুলি সংগ্রহে অসমর্থ হলেও যৌবন প্রাপ্তির সময় সে নানা সূত্র থেকে নানা উপায়ে যৌনসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যগুলি আহরণ করে থাকে। স্বাস্থ্য বিকাশ ও জীবতত্ত্ব বিষয়ে বহু মূল্যবান তথ্য সে তার বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক থেকে লাভ করে থাকে।

অতএব এই সময়ে যৌন বিষয়ক সকল ব্যাপার সম্পর্কেই যাতে তার নির্ভুল জ্ঞান জন্মায় সেদিকে সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সেই জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে যৌন শিক্ষার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও আয়োজন এই স্তরের পাঠক্রমে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে।

নারী পুরুষের যৌন সম্পর্কের পূর্ণ পরিণতি যৌবনাগমের দ্বারাই সূচিত হয়ে থাকে। এই সময় ছেলেমেয়েরা সব দিক দিয়ে পরিণত মনের অধিকারী হয়ে ওঠে। তখন সে বিশেষ কোন ছেলে বা বিশেষ কোন মেয়েকে ভালবাসতে শেখে, নিজের বিবাহিত জীবনের কথা চিন্তা করে এবং ভবিষ্যৎ দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে নানা জল্পনা কল্পনায় মগ্ন হয়। কিন্তু যৌন বিষয়ক সমস্যাগুলি এই সময় তাদের কাছে খুব তীব্র হয়ে দেখা দেয়। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে নিজেদের অসম্পূর্ণ ধারণা অনুযায়ী অগ্রসর হতে গিয়ে ছেলেরা অনেক সময় অতি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়। তেমনই মেয়েরাও ছেলেদের সঙ্গে কিভাবে আচরণ করবে সে সম্বন্ধে গুরুতর সমস্যা অনুভব করে। অনভিজ্ঞতা ও যৌন-শিক্ষার অভাবে বহু ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে সহজ সুস্থ যৌন সম্পর্ক দুষ্ট হয়ে ওঠে। তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে নানা বিকৃত যৌন-প্রবণতা দেখা যায়। সমরতিপ্রবণতা (Homosexuality) এই ধরনের একটি অস্বাভাবিক যৌনপ্রবণতা যা প্রায়ই প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে দেখা দিয়ে থাকে। অবশ্য সাধারণত এই প্রবণতা স্বল্পকালের জন্যই থাকে এবং স্বাভাবিক যৌনবোধ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লুপ্ত হয়ে যায়। স্বাভাবিক যৌনবোধ বলতে নারী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি সহজ যৌন আকর্ষণকেই বোঝায়। প্রাপ্তযৌবনের যৌন আকর্ষণ স্বাভাবিক পরিণতিতে গিয়ে না পৌঁছলে তার ভবিষ্যৎ যৌনজীবন অস্বাভাবিক ও ব্যর্থতাময় হয়ে ওঠে। কোন রকম বিকৃত যৌনপ্রবণতা যদি প্রাপ্তযৌবনদের মধ্যে থেকে যায় তাহলে তাদের পরিণত বয়সের স্বাভাবিক দাম্পত্যজীবন একেবারেই সাফল্য লাভ করে না। এই সব অবাঞ্ছিত পরিণতি দূর করতে হলে সুপরিকল্পিত যৌনশিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। প্রাপ্তযৌবনদের যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত হবে।

(ক) যৌন বিষয়ক তথ্যাদির আলোচনা এবং সংশ্লিষ্ট জীবতত্ত্বমূলক ও শরীরতত্ত্বমূলক প্রক্রিয়াদি সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের পরিবেশন।

(খ) বিভিন্ন যৌন বিকৃতি সম্পর্কে ধারণা ও সেগুলির কুফল সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা।

(গ) যৌনঘটিত ব্যাপারে স্বাস্থ্যময় ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর গঠন এবং ছেলে-

মেয়েদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সশ্রদ্ধ এবং সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের সৃষ্টি।

(ঘ) দাম্পত্যজীবনের গুরুত্ব ও স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক কর্তব্য সম্পর্কে সুসংহত বিবরণ। নারী-পুরুষের সুষ্ঠু সম্পর্কের ব্যক্তিগত ও সমাজগত প্রয়োজনীয়তার আলোচনা।

(ঙ) সন্তান পালনের প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন শিক্ষা।

(চ) যৌথ কাজকর্ম, সাহিত্যমূলক ও সংস্কৃতিমূলক অনুষ্ঠান, সৃজনমূলক প্রয়াস, সামাজিক মেলামেশা, ভ্রমণ প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলী।

ছাবিবশ

অনুকরণ (Imitatian)

প্রাণীর সকল স্তরের আচরণের স্বরূপ ও সংগঠন প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে অনুকরণ প্রক্রিয়ার উপর। ছোট বড, উন্নত অনুন্নত সকল প্রকার প্রাণীর অনুষ্ঠিত আচরণের একটি বড অংশই তাদের সমাজের অন্যান্য সদস্যদের আচরণের অনুকরণে শেখা। যে কোন ছোট শিশুর আচরণের সংগঠন, স্বরূপ ও গতিধারা পর্যবেক্ষণ করলে আমরা অনুকরণের অসীম গুরুত্ব এবং ব্যাপকতার পরিচয় পাই।

অনুকরণের এই সর্বজনীন ও পরিব্যাপক প্রভাবের জন্য বহু মনোবিজ্ঞানী অনুকরণকে সহজাত প্রবৃত্তির গোষ্ঠিভুক্ত করেছেন। ম্যাক্‌ডুগাল, ড্রেভার প্রভৃতি প্রবৃত্তিবাদীরা অনুকরণকে পলায়ন, খাদ্য-অন্বেষণ প্রভৃতির মত একটি সহজাত প্রবৃত্তি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁদের মতে শিশু জন্ম থেকেই অনুকরণের প্রবণতা নিয়ে জন্মায় এবং সেই জন্যই সে অপরকে অনুকরণ করে থাকে। কিন্তু থর্নডাইক প্রভৃতি আর একদল মনোবিজ্ঞানী অনুকরণকে সহজাত প্রবৃত্তি বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে যে সকল আচরণকে অনুকরণজাত বলে আমরা বর্ণনা করে থাকি সেগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মাধ্যমে শেখা আচরণ এবং প্রাণীর অভ্যাসের ফল থেকে সৃষ্ট হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাঁদের মতে শিশু বার বার প্রচেষ্টা-ও-ভুলের মধ্যে দিয়ে আচরণগুলি শেখে এবং শেষ পর্যন্ত সেগুলি তার অভ্যাসে পরিণত হয়। ঐগুলিকেই সাধারণত অনুকরণজাত আচরণ বলা হয়।

অনুকরণের গুরুত্ব (Significance of Imitation)

অনুকরণকে একটি সহজাত প্রবৃত্তিই বলা হোক্ আর অভ্যাসজাত আচরণই বলা হোক্ একথা অনস্বীকার্য যে প্রাণীমাত্রের অধিকাংশ প্রাথমিক আচরণই অনুকরণজাত। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে পরিবেশের সঙ্গে সার্থক এবং কার্যকর সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা থেকেই অনুকরণের জন্ম। কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে সঙ্গতিবিধানের জন্য যে বিশেষ আচরণটি কোন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সম্পন্ন করে খুব স্বাভাবিকভাবেই শিশু সেই পরিস্থিতিতে পড়লে সঙ্গতিবিধানের জন্য সেই তৈরী আচরণটি সম্পন্ন করে। এদিক দিয়ে সমাজের বয়স্কদের আচরণগুলি শিশুর কাছে তার সঙ্গতিবিধানের জন্য পূর্ব-গঠিত ও

কার্যকর পন্থা বিশেষ। সেই জন্য কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে নতুন কোন আচরণ উদ্ভাবনের চেয়ে বয়স্কদের ঐ আরচণটি সম্পন্ন করা শিশুর পক্ষে অনেক সহজ ও সাধ্যায়ত্ত। তাছাড়া সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিস্থিতিতে শিশুর পক্ষে উপযোগী নতুন আচরণ উদ্ভাবন করাও সম্ভব নয়। তার সামনে যদি বয়স্কদের অনুসৃত তৈরী আচরণগুলি না থাকত এবং যদি অপরের আচরণ অনুকরণ করার সহজাত সামর্থ্য নিয়ে সে না জন্মাত তাহলে তার পক্ষে অপরিচিত পরিবেশে অস্তিত্ব বজায় রাখাই অসম্ভব হয়ে পড়ত। সমস্ত অনুকরণের অন্তর্নিহিত মূল রহস্যটিই হল এই। অর্থাৎ অনুকরণ প্রচেষ্টা প্রাণীমাত্রেরই অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রাথমিক ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সোপান বিশেষ। মানবশিশু তার জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য আচরণগুলি বয়স্কদের কাছ থেকে এই অনুকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আহরণ করে থাকে।

অনুকরণের সর্বব্যাপকতা সম্বন্ধে উইলিয়াম জেমসের একটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। সেটি হ'ল 'অনুকরণ ও উদ্ভাবন—এই দুটি প্রক্রিয়ার উপর ভর দিয়েই মানবজাতি ইতিহাসের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে'। অর্থাৎ মানবজাতির ক্রমোন্নতির মূলে আছে দুটি প্রক্রিয়া, 'অনুকরণ ও উদ্ভাবন,—অনুকরণ মানবজাতিকে তার পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অভিজ্ঞতারাশি অর্জনে সাহায্য করে আর উদ্ভাবন তাকে নতুন আচরণ শেখায়। এভাবে অনুকরণ ও উদ্ভাবনের মধ্যে দিয়ে মানবজাতি অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।

জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে ব্যক্তিমাত্রেই তার চতুষ্পার্শ্বের পারিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা সর্বদাই করে চলেছে। সেজন্য যখন সে তার চেয়ে বড় এবং অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে কোন বিশেষ একটি আচরণ সম্পন্ন করতে দেখে তখন সেও অনুরূপ পরিস্থিতিতে ঐ আচরণটি অনুষ্ঠান করে, অর্থাৎ এক কথায় সে ঐ আচরণটির অনুকরণ করে। এই জন্য আমরা আমাদের চেয়ে ছোট বা কোন কম অভিজ্ঞ ব্যক্তির আচরণ অনুকরণ করি না। যার আচরণের উৎকর্ষ ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা ভাল তারই আচরণ আমরা অনুকরণ করে থাকি। শিশুর ক্ষেত্রে সকলের আচরণই উৎকৃষ্ট ও কার্যকর, অতএব অনুকরণীয় এবং সেজন্য সে ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলের আচরণই অনুকরণ করে থাকে।

কিন্তু যত সে বড় হতে থাকে ততই তার এই নির্বিচার অনুকরণ করার অভ্যাসটি কমে যায় এবং পরে বিশেষ এবং সুনির্দিষ্ট ব্যক্তির আচরণ ছাড়া

আর কারও আচরণ সে অনুকরণ করে না। পরিণত বয়সে তার অনুকরণীয় ব্যক্তি ও আচরণের সংখ্যা আরও কমে যায়।

অনুকরণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Imitation)

অনুকরণ দু'শ্রেণীর হতে পারে অচেতন অনুকরণ এবং সচেতন অনুকরণ। বহু আচরণ আছে যা শিশু সম্পূর্ণ তার অজ্ঞাতসারেই অপরকে অনুকরণ করে শেখে। তার এই অনুকরণের মধ্যে কোন ইচ্ছাজাত প্রচেষ্টা নেই। এমন কি সে যে অনুকরণ করছে তাও তার কাছে অজ্ঞাত থাকে। শিশুর ভাষা, আচার-ব্যবহার, বাচনভঙ্গী, অঙ্গভঙ্গী ইত্যাদি বহু আচরণই অবিকল বড়দের অনুকরণে শেখা এবং তার এই অনুকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অচেতন প্রকৃতির। সচেতন অনুকরণের দৃষ্টান্তও শিশুর আচরণের মধ্যে অজস্র পাওয়া যায়। তবে মানসিক ও দৈহিক শক্তির দিক দিয়ে শিশু যত পরিণত হয়ে ওঠে ততই তার মধ্যে সচেতন অনুকরণ দেখা যায়। পোষাক পরার পদ্ধতি, কথা বলার ভঙ্গী, চলাফেরার কায়দা ইত্যাদি বহু আচরণ শিশু তার সঙ্গীসাথী বা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের নকল করে শেখে।

অনুকরণকে আবার আর এক দিক দিয়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন, দৈহিক আচরণের অনুকরণ, চিন্তা বা ভাবের অনুকরণ ও অনুভূতির অনুকরণ। প্রচলিত ভাষণে দৈহিক আচরণকেই আমরা অনুকরণ বা সমাচরণ (Imitation) বলে থাকি। চিন্তা বা ভাবের অনুকরণের নাম দেওয়া হয়েছে অনুভাবন (Suggestion) এবং অনুভূতির অনুকরণের নাম দেওয়া হয়েছে সমানুভূতি (Sympathy)।

দৈহিক অনুকরণ বা সমাচারণ (Physical Imitation)

দৈহিক প্রতিক্রিয়ার অনুকরণ সর্বজনীন। ছোট বড় সকলের মধ্যেই দৈহিক অনুকরণের দৃষ্টান্তপ্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। দৈহিক অনুকরণ আবার সচেতন ও অসচেতন দুই প্রকারেরই হতে পারে। যখন কোন চলচ্চিত্র, খেলা-ধূলা, বক্সিং প্রভৃতি আমরা সম্পূর্ণ আমাদের অজ্ঞাতসারেই অনুকরণ করে চলেছি। এগুলি হল অচেতন দৈহিক অনুকরণের দৃষ্টান্ত। এগুলিকে আমরা সমাচারণ নাম দিতে পারি। খুব ছোট শিশুর ক্ষেত্রেই সমাচারণের দৃষ্টান্ত সব চেয়ে বেশী দেখা যায়। তার কথা বলা, খেলাধূলা, চলাফেরা প্রভৃতি আচরণের প্রায় সবই বড়দের এবং তার সঙ্গীসাথীদের দেখে সম্পূর্ণ অচেতন-ভাবে অনুকরণ করা।

চিন্তার অনুকরণ বা অনুভাবন (**Suggestion**)

অপরের দৈহিক আচরণের যেমন অনুকরণ করা যায় তেমনই অপরের চিন্তা, ধারণা, ভাবনা, আদর্শ, বিশ্বাস প্রভৃতিরও অনুকরণ করা যায়। এরই নাম দেওয়া হয়েছে অনুভাবন। দৈহিক অনুকরণের মত শিশুর জীবনে অনুভাবনের প্রভাবও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর মানসিক সংগঠন, বিশ্বাস, আদর্শ সবই গড়ে ওঠে এই অনুভাবন প্রক্রিয়ার দ্বারা।

দৈহিক আচরণের মত অনুভাবনও অচেতন হতে পারে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ব্যক্তি অপরের চিন্তা ও ভাবধারাকে নিজস্ব করে নিতে পারে। তবে অচেতন অনুভাবনের শক্তিই সব চেয়ে গভীর ও ব্যাপক। শিশুর ক্রমবর্ধমান মানসিক সংগঠনটির বিকাশ ও পুষ্টির পেছনে থাকে এই অচেতন অনুভাবন প্রক্রিয়াটি।

অনুভূতির অনুকরণ বা সমানুভূতি (**Sympathy**)

দৈহিক আচরণের অনুকরণ এবং চিন্তার অনুকরণের মত আমরা অপরের অনুভূতিও অনুকরণ করতে পারি। অপরের রাগ, দুঃখ, আনন্দ, বিরক্তি, শ্রম প্রভৃতি আমাদের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে আমাদের মধ্যেও অনুভূতির সৃষ্টি করতে পারে। একেই সমানুভূতিও বলা হয়। সমানুভূতি অন্যান্য অনুকরণ-প্রক্রিয়ার মত অচেতন ও সচেতন হতে পারে। আমরা যেমন জ্ঞাতসারে অপরের দুঃখে দুঃখিত বা সুখে সুখী হতে পারি, তেমনই আবার আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অপরের অনুভূতি আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চালিত হতে পারে।

শিশুর জীবনে অনুকরণের প্রভাব

এই ত্রিবিধ অনুকরণ প্রক্রিয়াই শিশুর জীবনে অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তবে বাহ্যিক আচরণ, চিন্তা, ধারণা, বিশ্বাস, আনন্দ, রাগ, দুঃখ প্রভৃতি সকল রকম বৈশিষ্ট্যই অনুকরণ প্রক্রিয়ার দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বাহ্যিক আচরণের অনুকরণ শিশুর ব্যক্তিসত্তা গঠনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শক্তিরূপে কাজ করে থাকে। বিশেষ করে তার অজ্ঞাতসারে সে বহু আচরণ অপরের দেখাদেখি শেখে ও সম্পন্ন করে। এই সময়ে শিশুর আচরণ সংগঠনে অনুকরণ প্রয়াসের মূল্য অসীম। জীবনধারণের বহু অত্যাবশ্যক ও অপরিহার্য আচরণও সে এই সময় অচেতন অনুকরণের মাধ্যমে শেখে।

শিশু কিছুটা বড হলে তার মধ্যে সচেতন অনুকরণ কার্যকর হয়। স্কুল জীবনে সচেতন অনুকবণের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। এই সময় তাব মধ্যে বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও শ্রদ্ধা দেখা দেয় এবং প্রায়ই দেখা যায় যে শিশু সেই বিশেষ ব্যক্তির আচরণ ও চিন্তাধারা অনুকরণ করে চলেছে। শিশু মাত্রেরই প্রথম অনুকরণের পাত্র হল পিতামাতা। কিন্তু যত সে বড হয় তত সে নতুন নতুন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসে এবং তার আসক্তি পিতামাতাকে ত্যাগ করে শিক্ষক বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি উদ্দিষ্ট হয়ে যায় এবং তখন সেই ব্যক্তির আচরণধারা শিশু নির্বিচারে অনুকরণ করে।

তবে পিতামাতা ও পরিবারস্থ অন্যান্য বয়স্কদের আচরণের অনুকরণেই শিশু অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ আচরণগুলি শিখে থাকে। সেজন্য পিতামাতা শিক্ষক প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তির আচরণ শিশুর পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভবপর, শিশুর আচরণধারার সংগঠনে তাঁদের দায়িত্ব যে অসীম সে কথা বলাই বাহুল্য। তাঁরা যেন এ বিষয়ে পূর্ণ সচেতন থাকেন যে শিশুর সামনে এমন আচরণ দৃষ্টান্তস্বরূপ কখনও তাঁরা স্থাপন করবেন না, যা তার ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশের পরিপন্থী হয়ে উঠতে পারে।

শিশুর অনুকরণ প্রয়াস শিক্ষার পক্ষে অনুকূল কি প্রতিকূল এবং তার সে প্রয়াসকে উৎসাহ দেওয়া উচিত কি অনুচিত এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। একদল মনোবিজ্ঞানী আছেন যাঁরা শিশুর অনুকরণ প্রয়াসকে শিক্ষার পরিপন্থী বলে মনে করেন এবং কোন দিক দিয়েই তার পরিপোষণ বা উৎসাহদানকে তাঁরা সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে অনুকরণ-মাত্রেই যান্ত্রিক ও অন্ধ আচরণ এবং তার ফলে অনুকরণকারী শিশুর নিজস্ব সৃজনমূলক প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়ে যায় এবং সে আত্মনির্ভর হয়ে নিজে থেকে কিছুই করতে পারে না। যদি শিশু কেবলমাত্র অপরের অনুকরণ করেই তার সমস্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে তাহলে তার নিজস্ব মানসিক প্রচেষ্টা কোন-দিনই বিকশিত হয়ে উঠবে না এবং সে অপরের আচরণের উপর চিরকালই নির্ভরশীল থেকে যাবে। তবে যদি নিজস্ব কোন প্রতিভা বা উদ্ভাবনশক্তি থাকে তা হলে তা স্বাধীন প্রচেষ্টার অভাবে অভিব্যক্ত হতে পারবে না। অতএব শিশুর অনুকরণ প্রয়াসকে অবরুদ্ধ করা এবং তার স্বাধীন আচরণ প্রয়াসকে অভিব্যক্ত হতে দেওয়াকেই তাঁরা শিক্ষার প্রধান কর্তব্য বলে বর্ণনা করেন।

এই মনোবিজ্ঞানীদের যুক্তির সারবত্তা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু শিশুর স্বাধীন প্রচেষ্টার সংগঠনে অনুকরণের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেটি তাঁরা এখানে

উপেক্ষা করেছেন। সৃজনমূলক প্রয়াসমাত্রেরই সুরু অনুকরণে, যদিও তার পরিসমাপ্তি স্বাধীন আচরণে ঘটে থাকে। কোন স্রষ্টা যতই প্রতিভাবান হোন না কেন, প্রথম হতেই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হয়ে তিনি নতুন বস্তুর সৃষ্টি করতে পারেন না। তাঁর প্রাথমিক সৃজন প্রয়াস কোন না কোন পূর্বাগামীর প্রদর্শিত পথ ধরে প্রথমে অগ্রসর হয় কিন্তু কিছুটা অগ্রসর হবার পর তাঁর প্রয়াস সেই পুরাতন পথ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নিজস্ব ও নতুন পথ আবিষ্কার করে নেয় এবং তার পূর্ণ পরিণতি ঘটে নতুন এবং অভিনব কিছুর সৃষ্টিতে। অতএব অনুকরণ-প্রযাস স্বাধীন প্রয়াসের বিরোধী নয়, বরং তার সহায়ক ও অপরিহার্য সোপান বিশেষ।

কিন্তু যেখানে শিশুর আচরণ তার প্রাথমিক অনুকরণের গণ্ডী পার হয়ে নিজস্ব স্বাধীন পথ খুঁজে নিতে পারে না সেখানে অনুকরণ ব্যক্তিসত্তার সুগঠনের বিরোধী হয়ে ওঠে। সেখানে আচরণ সত্যই যান্ত্রিক ও অন্ধ হয়ে যায় এবং শিশুর অন্তর্নিহিত স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করতে পারে না। অতএব সুশিক্ষার কার্যকর কর্মসূচী হচ্ছে শিশুর আচরণধারাকে ধীরে ধীরে অনুকরণের গণ্ডী থেকে মুক্ত করে নতুন বস্তুর উদ্ভাবন বা নতুন চিন্তার সৃষ্টির পথে পরিচালিত করা। প্রথম থেকে শিশুর অনুকরণ-প্রযাসকে রুদ্ধ করা কখনই উচিত নয় বরং তাকে বিচক্ষণতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত করে নতুন ও সৃজনমূলক আচরণের পথে পরিচালিত করাই হল শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য।

কিন্তু এর জন্য শিক্ষক ও পিতামাতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে সতর্কতা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন। যথাসময়ে যদি শিশুর অনুকরণ প্রয়াসকে রুদ্ধ করা না যায় তাহলে তার সমস্ত আচরণই গতানুগতিক পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে এবং অপরের প্রদর্শিত পথ ছাড়া সে নিজে নতুন কোনও পন্থা বা আচরণের উদ্ভাবন করতে পারবে না। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিশুর এই স্বাভাবিক অনুকরণ প্রক্রিয়া থেকে স্বাধীন আচরণে সঞ্চালনের সময় সম্পর্কে শিক্ষক সচেতন থাকেন না এবং প্রয়োজনমত তাকে স্বাধীন প্রচেষ্টার পথে সুপরিচালিত করতে পারেন না। তার ফলে শিশুর আচরণ চিরকালের জন্য অনুকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় নতুন উদ্ভাবনমূলক প্রচেষ্টায় বিকশিত হয়ে ওঠে না। এই জন্য শিশুর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠসূচীটি যথেষ্ট বিচক্ষণতার সঙ্গে সুপরিকল্পিত ও সুগঠিত করতে হবে। বিভিন্ন বয়সের পাঠস্তরে যেমন অনুকরণমূলক কাজের সাহায্যে শিশুর প্রাথমিক অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারটি সমৃদ্ধ করে তুলতে হবে তেমনই সেই সঙ্গে নতুন কিছু সৃষ্টি করার জন্য তাকে সর্বদাই উৎসাহ দিয়ে যেতে হবে। এই উদ্দেশ্যে অঙ্কন, লিখন, মূর্তিগঠন, কার্ডবোর্ড, মাটি, বালি ইত্যাদি দিয়ে নতুন জিনিষ তৈরী করা কবিতা-সাহিত্য রচনা

আবৃত্তি, অভিনয় প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে শিশুর স্বাধীন কর্মপ্রয়াসকে, পরিপুষ্ট হবার পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে হবে।

অনুভবান (Suggestion)

একজনের ভাব বা চিন্তাধারা অপরের মনে সঞ্চালিত হওয়ার নাম অনুভাবন। দেখা গেছে যে মানুষমাত্রেরই মনে অল্পবিস্তর অপরের দ্বারা প্রভাবিত হবার প্রবণতা আছে। একে আমরা মানবমনের অনুভাবনীয়তা (Suggestibility) বলতে পারি। অনুভাবনও এক প্রকারের অনুকরণ। অপরের ভাষা বা চিন্তার অনুকরণকেই অনুভাবন নাম দেওয়া হয়েছে। ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণে অনুভাবনের গভীর প্রভাব আছে। ব্যক্তিমাত্রেরই বিশ্বাস, ধারণা, সংস্কার প্রভৃতির অধিকাংশই অনুভাবনের প্রভাব থেকে প্রসূত। মানব মনের একটি অতি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে অপরের চিন্তা ও ভাবধারা ব্যক্তি অজ্ঞাতসারেই এবং অনেক সময় নির্বিচারে নিজস্ব করে নেয়। এক মন থেকে অপর মনে ভাব বা চিন্তার সঞ্চালন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ভাষার মাধ্যমে ঘটে থাকে। তবে দৈহিক অংগভঙ্গী, আকার-ইঙ্গিত বা অন্যান্য পন্থাতেও এই সঞ্চালন ঘটতে পারে।

শিশুর বিকাশমান মনে অনুভাবনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। তার চতুষ্পার্শ্বের পরিণত ব্যক্তিদের মতবাদ, আদর্শ ও চিন্তাধারা তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই তার চিন্তাধারার গতি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে দেয়। আরও বড় হলে শিশু কোন বিশেষ ব্যক্তিকে তার আদর্শ মানুষ বলে ধরে নেয় এবং তখন সেই ব্যক্তির চিন্তা ও ভাবধারা তার মানসিক সংগঠনের প্রধানতম উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণত স্কুলজীবনে দেখা যায় যে কোনও বিশেষ শিক্ষক বা শিক্ষিকা শিশুর আদর্শ মানুষের স্থানটি অধিকার করে থাকেন এবং শিশু তাঁর বাচনভংগী, চলন-বৈশিষ্ট্য, আদব-কায়দা প্রভৃতি থেকে সুরু করে তাঁর চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও জীবনদর্শন হুবহু অনুকরণ করে। প্রাপ্তযৌবনদের ক্ষেত্রে এই ধরনের অনুকরণ তাদের আচরণমূলক প্রাক্ষোভিক, চিন্তামূলক প্রভৃতি সকল প্রকার সংগঠনেরই প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

অনুভাবন আর সকল অনুকরণ প্রক্রিয়ার মতই অচেতন ও সচেতন হতে পারে। আমরা যখন সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে অপরের কোন চিন্তা, আদর্শ, বিশ্বাস মতবাদ, কুসংস্কার প্রভৃতি নিজস্ব করে নিই তখন তাকে অচেতন অনুভাবন বলা হয়। আবার কখনও কখনও আমরা আমাদের জ্ঞাতসারেই অপরের মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ি। তখন তাকে সচেতন অনুভাবন বলা যায়। যেমন, কারও

কোনও আলোচনা শুনে বা যুক্তিতে প্রভাবিত হয়ে আমরা তার মতবাদ বা ধারণাটি জেনে শুনেই গ্রহণ করতে পারি।

অচেতন অনুভাবন প্রক্রিয়াটি মনোবিকারের চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দেখা গেছে যে রোগীকে সম্মোহিত করে তাকে সেই সময় কোন একটি বিশেষ উপদেশ বা নির্দেশ দিলে সে পরে জেগে উঠে ঠিক সেই উপদেশ বা নির্দেশমত কাজ করে। যেমন কোন মনোব্যাধির রোগী হয়ত হাতের ব্যথা বা মাথার যন্ত্রণা থেকে কষ্ট পাচ্ছে বা কোন অস্বাভাবিক আচরণ অনুষ্ঠান করছে। তাকে সম্মোহিত করে চিকিৎসক বললেন যে ঘুম থেকে জেগে সে দেখবে যে তার ঐ ব্যথা বা অস্বাভাবিকতা আর নেই, সম্পূর্ণ সেরে গেছে। দেখা গেছে যে সম্মোহন থেকে জেগে উঠে রোগীটি সত্য সত্যই আর ঐ ব্যথা অনুভব করে না বা অস্বাভাবিক আচরণও সম্পন্ন করে না। ফ্রয়েড প্রভৃতি মনঃসমীক্ষকেরা মনোব্যাধির চিকিৎসায় অনুভাবন প্রক্রিয়ার ব্যাপক প্রয়োগের বহু নিদর্শন রেখে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে অচেতন অনুভাবনের প্রক্রিয়াটিই সব দিক দিয়ে শক্তিশালী, ব্যাপক ও সর্বজনীন। ব্যক্তিমাত্রই কিছু না কিছু পরিমাণে অনুভাবনের প্রভাবাধীন। তবে মানসিক শক্তির পার্থক্যের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই অনুভাবনীয়তা বিভিন্ন মাত্রার হতে পারে।

অনুভাবন প্রবণতার পেছনে একটা বশ্যতা বা হীনমন্যতার বোধ আছে। যখনই আমরা অপরকে আমাদের চেয়ে বুদ্ধিতে, জ্ঞানে বা বিচক্ষণতায় বড় বলে মনে করি তখনই তার মতবাদ বা চিন্তাকে আমরা আমাদের নিজস্ব করে নিই। যাকে আমরা আমাদের চেয়ে হেয় বলে মনে করব তার দ্বারা আমরা কখনই অনুভাবিত হব না। এই কারণেই আমরা মহৎ, মানী, গুণী, প্রতিভাশালী ও শক্তিমান ব্যক্তিদের দ্বারা সহজে অনুভাবিত হয়ে থাকি।

ভাষা অনুভাবন সৃষ্টির একটি বড় মাধ্যম। ভাষার আবেদন আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রভাবশালী বলেই আমরা সহজে ভাষার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উঠি। এই কারণে কোন বক্তব্য সুন্দর করে আমাদের কাছে বলা হলে আমরা সহজেই সেটা বিশ্বাস করি অর্থাৎ আমরা তার দ্বারা অনুভাবিত হয়ে পড়ি। জার্মানীর বিখ্যাত যুদ্ধকালীন প্রচারবিদ্ গোয়েবল্‌সের ভাষায় মিথ্যা কথাও যদি বার বার এবং বেশ জোরের সঙ্গে বলা যায় তবে সেটিকে মানুষ সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়। এটি মানব মনের অনুভাবনীয়তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এই সব কারণে অনুভাবনের প্রভাব প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত সাহিত্যিক, সমালোচক, জননায়ক, সমাজ-সংস্কারক প্রভৃতি ব্যক্তিদের চিন্তাধারা আমরা অজ্ঞাতসারেই আমাদের নিজস্ব করে নিই। সময় সময় দেখা যায় যে কোন বিশেষ চিন্তানায়ক বা জননেতার ভাবধারা একটি সমগ্র জাতিকে প্রভাবিত করে তোলে। জনমত সৃষ্টিতেও অনুভাবনের অবদান যথেষ্ট। দেশের জনমণ্ডলীর মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারার সঞ্চালন থেকেই জনমতের সৃষ্টি হয়। এই একই কারণে বিজ্ঞাপন ও প্রচারকার্য আমাদের এতটা প্রভাবিত করে থাকে। পত্রপত্রিকায় যে সব বিজ্ঞাপন ও বিজ্ঞপ্তি বেরোয় সেগুলি যে আমাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার জন্যই পরিকল্পিত তা জেনেও আমরা বিজ্ঞাপনের ভাষা, বক্তব্য, আবেদন, উপস্থাপন-শৈলী প্রভৃতির দ্বারা বক্তব্যটির প্রতি আমাদের অজ্ঞাতসারেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ি।

শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুভাবনের প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক সংগঠন প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করে শিক্ষকমণ্ডলী ও শিক্ষার সমগ্র পরিবেশটি কি ধরনের চিন্তা ও আদর্শ তাদের মনে সৃষ্টি করে তার উপর। কথাবার্তা, আলোচনা, পঠন, ব্যক্তিগত মত প্রকাশ প্রভৃতির দ্বারা শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীর মধ্যে যে ধরনের চিন্তা ও ধারণার সৃষ্টি করবেন তাদের মনের মৌলিক সংগঠনটিও সেই আকৃতি ধারণ করবে। অতএব শিক্ষকমাত্রকেই নিজের আচরণ, কথাবার্তা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকতে হবে। যে সব চিন্তা বা মতবাদ শিক্ষার্থীর সুষ্ঠু মানসিক সংগঠনের পরিপন্থী বলে মনে হবে সেগুলি যাতে শিক্ষকের কোন রকম ভাবে ভঙ্গীতে ব্যক্ত না হয় সেদিকে বিশেষ যত্ন নিতে হবে। শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে তার মধ্যে সবল দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তুলতে পারে এমন চিন্তাধারাই যাতে তার মধ্যে সঞ্চালিত হয় সে সম্বন্ধে পিতামাতা ও শিক্ষককে সচেতন হতে হবে।

সমানুভূতি (Sympathy)

অপরের অনুভূতির অনুকরণের নাম হল সমানুভূতি। অপরের দুঃখে দুঃখ অনুভব করা বা অপরের সুখে সুখ অনুভব করা বা অপরের ঘৃণা, বিরক্তি ভালবাসা সমানভাবে অনুভব করা প্রভৃতি হল সমানুভূতির উদাহরণ। সমানুভূতিও অচেতন এবং সচেতন দু'শ্রেণীর হতে পারে। অর্থাৎ আমরা যেমন জ্ঞাতসারে অপরের অনুভূতির অংশ গ্রহণ করতে পারি তেমনই আবার আমরা

আমাদের অজ্ঞাতসারেই অপরের অনুভূতিকে নিজস্ব করে নিতে পারি। পরিচিত বা প্রিয়জনের দুঃখে দুঃখিত হওয়ার পেছনে মনের একটা সক্রিয়তা আছে। কিন্তু অনেক সময় সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির প্রক্ষোভও আমাদের মধ্যে সঞ্চালিত হতে পারে। যেমন, দুঃখী বা যন্ত্রণাকাতর ব্যক্তিকে দেখলে আমরাও দুঃখ বা যন্ত্রণা বোধ করতে পারি। ভিক্ষুক বা দরিদ্র ব্যক্তি দেখলে দয়া অনুভব করার পেছনেও আছে এই সমানুভূতি। এই কারণে সমস্ত সমাজসংগঠনের মৌলিক উপাদানই হল সমানুভূতি।

সমানুভূতির একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে সমানুভূতি মাত্রেই সামাজিক প্রতিক্রিয়ার ফল। একের বেশী ব্যক্তি না হলে সমানুভূতির সৃষ্টি হতে পারে না। একজনের দুঃখে আর একজনের দুঃখিত হওয়া, একজনের সুখে সুখী হওয়া বা একজন বিরক্ত হলে আর একজনের বিরক্ত হওয়া ইত্যাদিই হল সমানুভূতির দৃষ্টান্ত। এই সমানুভূতির জন্যই একজনের মধ্যে কোন একটি প্রক্ষোভ দেখা দিলে সেই প্রক্ষোভ অপরের মধ্যে সঞ্চালিত হয়ে পড়ে। স্পষ্টত, সামাজিক পরিবেশ ছাড়া সমানুভূতি সম্ভবই নয়।

সমানুভূতির ক্ষেত্রে যে সব সময়েই অপরের অনুভূতিটি ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে তা নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে না বুঝেই ব্যক্তি অপরের কোন প্রক্ষোভ অনুকরণ করে এবং সেই প্রক্ষোভটি পরে নিজের মনে অনুভব করে। যেমন কাউকে কাঁদতে দেখে যদি কেউ কাঁদে বা কাউকে হাসতে দেখে যদি কেউ হাসে তখন যে সে সব সময় অপরের কান্না বা হাসির প্রক্ষোভটি অনুভব করে তা নয়, বহু ক্ষেত্রেই অনেকটা যান্ত্রিকভাবেই সে অপরের অনুকরণ করে কাঁদে বা হাসে।

ভয়ের ক্ষেত্রেও অনুভূতির এই স্বতঃপ্রণোদিত সঞ্চালন দেখা যায়। অপরকে ভীত হতে দেখলে কেন সে ভীত হল তা চিন্তা করবার বা তা যুক্তি দিয়ে বোঝার সময় সে পায় না। সম্পূর্ণ যন্ত্রের মত সে নিজেও সঙ্গে সঙ্গে ভীত হয়ে পড়ে। এই জন্যই জনসমষ্টির একটি বিশেষ অংশ কোন কারণে ভয়গ্রস্ত হয়ে উঠলে অন্যান্য অংশেও দেখতে দেখতে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। একেই আমরা আতঙ্ক (Panic) নাম দিয়ে থাকি। ভয়ের মত রাগ, ঘৃণা, প্রতিহিংসা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলিও জনসমষ্টির এক অংশকে প্রভাবিত করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে বাকী অংশটিকেও প্রভাবগ্রস্ত করে ফেলে। দাঙ্গা হাঙ্গামা, বিক্ষোভ, আন্দোলন, বিপ্লব প্রভৃতির মূলে এই ধরনের সামগ্রিক সমানুভূতি বা প্রক্ষোভমূলক সঞ্চালনই প্রধান শক্তি জুগিয়ে থাকে।

বিদ্যালয়ে সার্থক সমাজজীবন গঠনের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সমানুভূতি জাগিয়ে তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্মীয়তাবোধ ও ঐক্য সৃষ্টি করার একটি বড় উপকরণ হল তাদের পরস্পরের মধ্যে সমানুভূতি সৃষ্টি করা। শিক্ষার্থীদের পরস্পরের মধ্যে এই অনুভূতির সঞ্চালন যত ব্যাপক ও গভীর হবে বিদ্যালয়সমাজও তত সুদৃঢ় এবং সুসংহত হবে। যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রক্রিয়ায় শাস্তিদান, ভীতি প্রদর্শন, উৎপীড়ন প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয় সে বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষার্থীর মধ্যেই একটা ভীতি ও নিরাপত্তার অভাববোধ সঞ্চালিত হয়ে যায় এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যময় বিকাশ ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে আন্তরিকতা, প্রীতি ও সহযোগিতার মাধ্যমে যে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হয় সেখানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাস্থ্যময় ও আনন্দসিক্ত পরিবেশ গড়ে ওঠে।

বস্তুত সমানুভূতি বিদ্যালয়সমাজের সুষ্ঠু কার্যনির্বাহের বিশেষ সহায়ক। বিচক্ষণ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এই স্বাভাবিক প্রবণতাটিকে উপযুক্তভাবে পরিচালিত করে বিদ্যালয় সমাজকে উন্নত ও কার্যকর করে তুলতে পারেন।

কেবল বিদ্যালয় সমাজেরই নয় সমানুভূতি আমাদের সমস্ত সামাজিক সংগঠনেরই প্রাণস্বরূপ। মানুষে মানুষে অনুভূতির ঐক্যই আমাদের সমাজ-জীবনকে এক গ্রন্থিতে বেঁধে রেখেছে এবং একজনকে অপরের জন্য স্বার্থত্যাগ ও দুঃখবরণে অনুপ্রাণিত করেছে।

১

শিক্ষায় পরিমাপ (Measurement in Education)

মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য হল অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে পরিবর্তিত ও নতুন পরিবেশে সঙ্গতিবিধানের জন্য নতুন আচরণ শেখান। কিন্তু কেবল শিক্ষা দান করেই শিক্ষকের কাজ শেষ হয়ে যায় না। তার পরের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ হল শিক্ষার্থী সে শিক্ষা সত্যই গ্রহণ করতে পেরেছে কি না এবং যদি পেরে থাকে তাহলে কি পরিমাণে বা কত মাত্রায় সে শিক্ষা সে গ্রহণ করেছে তা দেখা। শিক্ষক যদি এটুকু জানতে না পারেন তাহলে তাঁর প্রচেষ্টার ফলাফল ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে তিনি সব সময়েই অন্ধকারে থাকবেন এবং সমগ্র শিক্ষাপ্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যই অনিশ্চিত থেকে যাবে। কেবল ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষকই যে শিক্ষার ফলাফল জানতে আগ্রহশীল তা নয়। শিক্ষার্থী যে সমাজে বাস করে সে সমাজও শিক্ষার্থীর শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেতন, কেন না, সমাজের অস্তিত্ব বজায় থাকাটা সমাজের অপরিণত নাগরিকদের শিক্ষার উপরই সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল।

এই সব কারণেই যে দিন থেকে মানবসমাজে সচেতন শিক্ষা দেবার প্রথা প্রচলিত হয়েছে সেদিন থেকেই পাশাপাশি দেখা দিয়েছে শিক্ষা পরিমাপের পদ্ধতিটি। সব দেশের বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষাগ্রহণের পদ্ধতিটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে এবং পিতামাতা, শিক্ষক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, জনসমাজ সকলেই মনে করেন যে শিক্ষার পূর্ণতা বা পরিসমাপ্তি পরীক্ষা গ্রহণেই ঘটে।

শিক্ষায় পরীক্ষা গ্রহণকে অপরিহার্য বলে স্বীকার করা হলেও প্রচলিত পরীক্ষা গ্রহণের পদ্ধতিটি নানা দিক দিয়ে গুরুতরভাবে ত্রুটিপূর্ণ বলে বর্তমানে প্রমাণিত হয়েছে।[১] সেজন্য গতানুগতিক পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিটির পরিবর্তে আধুনিক কালে নতুন ও উন্নত ধরনের পরিমাপ পদ্ধতির প্রচলন করা হয়েছে। এগুলিকে বিষয়মুখী বা নৈর্ব্যক্তিক (Objective) অভীক্ষা নাম দেওয়া হয়েছে। গতানুগতিক পরীক্ষাগুলি রচনাধর্মী অর্থাৎ এই সব পরীক্ষায় প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হয় দীর্ঘ রচনার আকারে। ফলে যিনি পরীক্ষক তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাব,

---

১। গতানুগতিক পরীক্ষার ত্রুটির বিশদ আলোচনার জন্য লেখকের 'শিক্ষা বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব' শীর্ষক পুস্তকটি দ্রষ্টব্য।

রুচি, পছন্দ, অপছন্দ এমন কি শারীরিক অবস্থা এবং মেজাজও পরীক্ষার ফলাফলকে নানা দিক দিয়েই প্রভাবিত করে। সেজন্য এই রচনাধর্মী পরীক্ষাগুলি কোন দিক দিয়েই নির্ভরযোগ্য হতে পারে না। কিন্তু আধুনিক অভীক্ষাগুলিকে এমনভাবে গঠন করা হয়েছে যে সেগুলির উত্তর সব সময় একই এবং সুনির্দিষ্ট থাকে। তার ফলে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত প্রভাব কোন দিক দিয়েই পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে না। এজন্যই এগুলিকে নৈর্ব্যক্তিক বা ব্যক্তিগত প্রভাবশূন্য অভীক্ষা বলা হয়। তবে গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতি অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ হলেও শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সেটিকে নানা কারণে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়া এখনও সম্ভব হয় নি। তবে আধুনিক অভীক্ষা যেভাবে দ্রুত উন্নতির পথে, আশা করা যায় যে অদূর ভবিষ্যতে এই নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাগুলি শিক্ষামূলক পরিমাপের সমগ্র ক্ষেত্রটিই অধিকার করতে পারবে।

ব্যক্তির পরিমাপ (Assessment of the Individual)

সাধারণভাবে বলতে গেলে সমস্ত পরিমাপের বিষয়বস্তু হল শক্তি বা কর্মক্ষমতা। অর্থাৎ কোনও ব্যাপারে বা কাজে একজনের কতটা শক্তি বা দক্ষতা আছে তা নিরূপণ করাই পরিমাপের উদ্দেশ্য। যেমন, কোন ব্যক্তি কত ভারি জিনিষ একবারে তুলতে পারে বা কত তাড়াতাড়ি দৌড়তে পারে বা কত নির্ভুলভাবে অঙ্ক কষতে পারে বা কত নিখুঁত ও দ্রুত টাইপ করতে পারে বা নির্দিষ্ট সময়ে কতটা পড়া শেখে বা কত শক্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে কিংবা কতটা সাফল্যজনকভাবে পরিবর্তিত পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে—এই ধরনের বিশেষ বিশেষ কাজে ব্যক্তির উৎকর্ষ বা দক্ষতা নির্ণয় করাই আধুনিক অভীক্ষাগুলির উদ্দেশ্য। এই শ্রেণীর অভীক্ষাগুলিতে একটি বা একাধিক দৈহিক বা মানসিক শক্তির পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এখানে একটি বিষয় বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে এই সব পরিমাপের বিষয়বস্তু একটি শক্তি হলেও সরাসরি শক্তিটিকে পরিমাপ করার মত কোন যন্ত্র বা উপকরণ আমাদের নেই। কোন একটি বিশেষ কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে ব্যক্তির শক্তিটির পরিমাপ করাই হল আমাদের পরিমাপের একমাত্র পদ্ধতি। ধরা যাক, আমরা একজনের বুদ্ধির পরিমাপ করতে চাই। সরাসরি ব্যক্তিটির বুদ্ধির পরিমাপ করার কোন উপায় আমাদের জানা নেই। সেইজন্য প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষায় ব্যক্তিকে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ সমস্যার সমাধান করতে বা কতকগুলি বিশেষধর্মী প্রশ্নের উত্তর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তার ঐ সমস্যাগুলির সমাধান বা ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর দানের উৎকর্ষের বিচার করে নির্ণয়

করা হয় যে তার কতটা বুদ্ধি আছে। অর্থাৎ এক কথায় বুদ্ধির পরিমাপ সরাসরি করা চলে না, বুদ্ধির পরিমাপ করা হয় কতকগুলি আচরণ সম্পাদনের মধ্যে দিয়ে। বুদ্ধির মত আর সমস্ত মানসিক শক্তি পরিমাপের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এক কথায় সমস্ত শক্তি বা দক্ষতার পরিমাপ প্রত্যক্ষভাবে করা যায় না, পরোক্ষভাবেই করা হয়ে থাকে।

শক্তি বা কর্মক্ষমতাকে মোটামুটিভাবে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, অর্জিত (Acquired) এবং সহজাত (Inherited)। সেদিক দিয়ে পরিমাপযন্ত্র বা অভীক্ষাগুলিকে আমরা মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করতে পারি, প্রথম, অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার অভীক্ষা এবং দ্বিতীয়, সহজাত শক্তির অভীক্ষা।

আর এক ধরনের অভীক্ষা আছে যেগুলির দ্বারা কোন দৈহিক বা মানসিক শক্তির পরিমাপ করা হয় না। সেগুলির দ্বারা প্রধানত কোন বিশেষধর্মী মানসিক বা প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ করা হয়ে থাকে। এই শ্রেণীর অভীক্ষার মধ্যে পড়ে আগ্রহের অভীক্ষা (Interest Test), মনোভাবের অভীক্ষা (Attitude Test), ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা (Personality Test) ইত্যাদি।

১। *অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার অভীক্ষা* (Test of Acquired Knowledge or Skill)

যে সব শক্তি বা কর্মক্ষমতা আমাদের অর্জিত সেগুলি পরিমাপের যে সব উপকরণ সেগুলিকে আমরা অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার অভীক্ষা (Attainment Test or Achievement Test) বলে থাকি। সাধারণত স্কুল-কলেজ প্রভৃতি শিক্ষায়তনে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা এই ধরনের অভীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করা হয় বলে এগুলিকে শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা (Educational Test) নামও দেওয়া হয়ে থাকে।

শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা (Educational Test)

মনে করা যাক কোন বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রেরা ইতিহাস বা ইংরাজীতে কতটা জ্ঞান আহরণ করল তা জানার জন্য একটি অভীক্ষা তৈরী হল। এটিকে আমরা অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা বলব। অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা সাধারণত বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের উপর তৈরী হয়ে থাকে এবং শ্রেণী (Class or Grade) অনুযায়ী সেগুলিকে নানা বিভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন, সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাসের অভীক্ষা বা নবম শ্রেণীর ইংরাজীর অভীক্ষা বা কলেজের ডিগ্রী কোর্সের মনোবিজ্ঞানের অভীক্ষা ইত্যাদি। তবে অনেক

সময় স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর অভীক্ষা একসঙ্গে সামগ্রিকভাবে অর্থাৎ পর পর কতকগুলি শ্রেণী মিলিয়েও করা হয়ে থাকে।

যদিও তত্ত্বের দিক দিয়ে সহজাত শক্তি ও অর্জিত শক্তি পৃথকধর্মী তবু বাস্তব ক্ষেত্রে এই দুটি কখনও পৃথকভাবে অভিব্যক্ত হয় না এবং পরিমাপ করাও সম্ভব হয় না। কেননা সহজাত শক্তিকে কোন ক্ষেত্রেই অর্জিত দক্ষতা বা জ্ঞানের মাধ্যম ছাড়া প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তার কারণ হল যে কোনও প্রকার কাজকর্ম করতে না শিখলে কোন শক্তিকেই বাইরে ব্যক্ত করা সম্ভব হয় না। তেমনই আবার অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতা মাত্রেই সহজাত শক্তির প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। কারণ বিভিন্ন সহজাত শক্তির সাহায্য ছাড়া কোন জ্ঞান বা দক্ষতা অর্জন করাই যায় না। অতএব সমস্ত অভীক্ষাই আংশিক সহজাত ও আংশিক অর্জিত শক্তির মিশ্রিত ফল। অর্জিত জ্ঞানের পরিমাপ আবার দু'রকমের হতে পারে, প্রথম প্রচলিত গতানুগতিক পরীক্ষা অর্থাৎ যে সব রচনাধর্মী পরীক্ষা স্কুল কলেজে বহুদিন ধরে শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও বিদ্যা পরিমাপ করার জন্য প্রয়োগ করে আসছেন। দ্বিতীয়, আধুনিক বিষয়মুখী বা নৈর্ব্যক্তিক (Objective) অভীক্ষা যেগুলি মনোবিজ্ঞানীরা আধুনিককালে তৈরী করেছেন প্রচলিত গতানুগতিক পরীক্ষার দোষত্রুটিগুলি দূর করার জন্য। গতানুগতিক পরীক্ষাগুলির মধ্যে নানা পার্থক্য থাকলেও গঠন ও প্রকৃতির দিক দিয়ে সেগুলি সর্বত্রই এক প্রকার। এগুলির দ্বারা সাধারণ পাঠক্রমের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়গুলির উপর কতটা জ্ঞান বা পারদর্শিতা শিক্ষার্থী অর্জন করল তার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। যেমন, ইংরাজী ভাষার পরীক্ষা, ইতিহাসের পরীক্ষা ইত্যাদি।

গতানুগতিক পরীক্ষাগুলির নানা দোষ থাকায় এবং সেগুলির দ্বারা পরিমাপের ফলাফল অসম্পূর্ণ ও মারাত্মকভাবে ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় মনোবিজ্ঞানীরা নতুন ধরনের আধুনিক বিষয়মুখী অভীক্ষা (New-Type Objective Test) তৈরী করেছেন। গতানুগতিক পরীক্ষা ও আধুনিক অভীক্ষার মধ্যে উদ্দেশ্য বা প্রকৃতির দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের দ্বারাই ব্যক্তির অর্জিত জ্ঞান বা দক্ষতার পরিমাপ করা হয়। পার্থক্য যা তা হল পদ্ধতি এবং সংগঠনের। এই সমস্ত অভীক্ষাই আবার দু'প্রকারের হতে পারে মাননির্ণীত বা আদর্শায়িত (Standardised) এবং অ-মাননির্ণীত (Unstandardised)। মাননির্ণীত বা আদর্শায়িত অভীক্ষা বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাটির এমন একটি মান বা নর্ম (Norm) নির্ণয় করা হয়েছে যার সাহায্যে সমস্ত অভীক্ষার্থীরই কৃতিত্বের

একটি তুলনামূলক বিচার করা সম্ভব হতে পারে। অভীক্ষাটি যদি মাননির্ণীত বা আদর্শায়িত না হয় তাহলে তা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের মান বিশেষ একটি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে কিন্তু সর্বজনীন ভাবে তা সত্য হয় না। আর আদর্শায়িত বা মাননির্ণীত অভীক্ষার সুবিধা হল এই যে এর সর্বজনীন মান বা নর্মের সঙ্গে যে কোন অভীক্ষার্থীর ফলাফলের তুলনা করা চলে এবং ঐ তুলনায় দ্বারা তার সাফল্য বা কৃতিত্বের যথাযথ সংব্যাখ্যান দেওয়া সম্ভব হয়। আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাগুলির প্রধানতম বৈশিষ্ট্যই হল যে এগুলি আদর্শায়িত বা মাননির্ণীত।

শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষার শ্রেণীবিভাগ

আধুনিক আদর্শায়িত শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাগুলি নানা প্রকৃতির হতে পারে। প্রথমত, স্কুল-কলেজের বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের উপর অভীক্ষা গঠিত হতে পারে, যেমন ইংরাজীর অভীক্ষা বা বাংলার অভীক্ষা ইত্যাদি। এছাড়া পঠন অভীক্ষা (Reading Test), শব্দমালা অভীক্ষা (Vocabulary Test), সংবোধন অভীক্ষা (Comprehension Test), বানানের অভীক্ষা (Spelling Test), হস্তলিপি অভীক্ষা (Handwriting Test) প্রভৃতি পাঠক্রমের অন্তর্গত নানা বিষয়ের উপরে শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষা তৈরী হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আধুনিক শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাগুলিকে আবার ব্যক্তিগত (Individual) এবং যৌথ (Group) অভীক্ষা—এই দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।[১] ব্যক্তিগত অভীক্ষা বিভিন্ন অভীক্ষার্থীর উপর ব্যক্তিগতভাবে বা স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং যৌথ অভীক্ষা একসঙ্গে অনেকের উপর প্রয়োগ করা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তির উপর স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োগ করতে হয় বলে ব্যক্তিগত অভীক্ষায় অনেক সময় এবং পরিশ্রম লাগে। কিন্তু একসঙ্গে বহুসংখ্যক অভীক্ষার্থীর উপর যৌথ অভীক্ষা প্রয়োগ করা যায় বলে যৌথ অভীক্ষায় সময় ও শ্রম উভয়েরই প্রচুর পরিমাণে সাশ্রয় হয়। যেমন, যদি একটি ব্যক্তিগত অভীক্ষা একজন অভীক্ষার্থীর উপর প্রয়োগ করতে ১ ঘণ্টা সময় লাগে তবে ৩০ জন অভীক্ষার্থীকে পরীক্ষা করতে ৩০ ঘণ্টা সময় লাগবে। কিন্তু যৌথ অভীক্ষার ক্ষেত্রে ৩০ জন অভীক্ষার্থীর উপর একসঙ্গে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা সম্ভব বলে ৩০ ঘণ্টার কাজটি ২ ঘণ্টায় শেষ করা যায়। যৌথ-অভীক্ষার এই বিরাট সুবিধার জন্য আধুনিক কালে অধিকাংশ শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাই যৌথ অভীক্ষাধর্মী।

১। প্রথম খণ্ডে 'বুদ্ধির পরিমাপ' পর্যায়টি দ্রষ্টব্য (পৃঃ ১০১)।

২। সহজাত শক্তির অভীক্ষা

(Test of Inherited Ability)

সহজাত শক্তিকে আমরা মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করতে পারি, সাধারণ (General) শক্তি ও বিশেষ (Specific) শক্তি। সাধারণ শক্তি বলতে বোঝায় সেই শক্তি যা আমাদের সমস্ত কাজের পেছনেই কিছু না কিছু পরিমাণে নিয়োজিত হয়ে থাকে। একেই আমরা সাধারণ ভাষণে বুদ্ধি নাম দিয়ে থাকি। সেই জন্যই সহজাত সাধারণ শক্তির অভীক্ষাগুলি বুদ্ধির অভীক্ষা (Intelligence Test) নামে পরিচিত।

বিনে সাইমন স্কেল (Binet-Simon Scale)

সার্থক বুদ্ধির অভীক্ষা প্রথম সৃষ্টি করার কৃতিত্ব আলফ্রেড বিনে (Alfred Binet) নামে একজন ফরাসী মনোবিজ্ঞানীর। তাঁর অভীক্ষাটি বিনে-সাইমন স্কেল (Binet-Simon Scale) নামে খ্যাত। বিনের তৈরী অভীক্ষাটিই প্রথম সাফল্যজনকভাবে বুদ্ধির পরিমাপ করতে সমর্থ হয় এবং কালক্রমে বিভিন্ন দেশে তাঁর অভীক্ষাটিই বুদ্ধি পরিমাপের আদর্শ উপকরণরূপে গৃহীত হয়।

১৯৩৭ সালে আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী টারমান ও মেরিল বিনের স্কেলটির ইংরাজী অনুবাদ করে একটি বিশেষভাবে পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করেন। এই নতুন অভীক্ষাটির নাম বিনে-সাইমন স্কেলের ষ্ট্যানফোর্ড সংস্করণ (Stanford Revision)। বর্তমানে এই সংস্করণটি ইংরাজী ভাষাভাষী দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১]

বিনের স্কেলটি প্রকাশিত হবার পর নানা দেশের মনোবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রকৃতির বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করতে থাকেন। তবে সেগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই বিনের অভীক্ষার মৌলিক নীতি ও পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে একথা অনস্বীকার্য যে এই সব মনোবিজ্ঞানীর গবেষণা ও প্রচেষ্টার ফলে আধুনিক বুদ্ধির অভীক্ষার যথেষ্ট উন্নতি সংঘটিত হয়েছে।

ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা ও ভাষাবর্জিত অভীক্ষা

(Verbal Test & Non-Verbal Test)

বর্তমানে প্রচলিত বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে সংগঠনের দিক দিয়ে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—যথা, ভাষাভিত্তিক (Verbal) এবং ভাষাবর্জিত (Non-

---

১। বিনে-স্কেলের বিস্তারিত বর্ণনার জন্য 'প্রথম খণ্ডে' বুদ্ধির অভীক্ষা শীর্ষক পরিচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য (পৃঃ ৮৭—পৃঃ ৯৯)।

Verbal) অভীক্ষা। ভাষাভিত্তিক অভীক্ষাতে নানাভাবে ভাষার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথমত, সেগুলিতে প্রশ্ন বা সমস্যাগুলি ভাষার মাধ্যমেই প্রকাশ করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, নির্দেশ যা দেওয়া হয় তাও ভাষার সাহায্যেই দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, এমন অনেক প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে যেগুলির সমাধান অনেকাংশে বা পূর্ণভাবে ভাষামূলক জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে। ফলে এই ধরনের অভীক্ষায় সাফল্যলাভ করতে হলে অভীক্ষার্থীর যথেষ্ট পরিমাণে ভাষামূলক দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। বিনে-সাইমন স্কেল এবং তার বিভিন্ন অনুবাদ ও সংস্করণগুলি এই ধরনের ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা।

কিন্তু এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে ভাষাভিত্তিক অভীক্ষা প্রয়োগ করে উপযুক্ত ফল পাবার আশা করা যায় না। যেমন, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, বিদেশী ব্যক্তি বা ভাষামূলক দক্ষতার দিক দিয়ে যারা দুর্বল তাদের ক্ষেত্রে ভাষাভিত্তিক অভীক্ষার দ্বারা সুবিচার করা যেতে পারে না। সেইজন্য আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এক ধরনের ভাষাবর্জিত বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করেছেন। এই শ্রেণীর অভীক্ষায় সমস্যাগুলি ভাষার দ্বারা গঠিত হয় না। অসম্পূর্ণ নক্সা, আংশিক ছবি বা নানা আকৃতির চিহ্ন দিয়ে তৈরী সারি (Series) সম্পূর্ণ-করণের সমস্যা দিয়েই এই ধরনের অভীক্ষাগুলি মূলত তৈরী হয়ে থাকে। ভাষাবর্জিত অভীক্ষাগুলিতে ভাষার ব্যবহারকে অনেকাংশে বাদ দেওয়া সম্ভব হলেও নির্দেশ দানের ক্ষেত্রে ভাষাকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। সমস্যাগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া এবং অভীক্ষককে কি করতে হবে তা জানান ভাষার সাহায্য ছাড়া সম্ভব হয় না। একথা সত্য যে এই সব ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার একান্তই অপরিহার্য এবং সেই জন্য এই ধরনের অভীক্ষায় যতটা অল্প ও সহজবোধ্য ভাষার ব্যবহার করা যায় সেদিকে অভীক্ষককে বিশেষ মনোযোগ দিতে হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে আমেরিকার সৈন্যবাহিনীতে যে সব ইংরাজী ভাষায় অনভিজ্ঞ বিদেশীদের ভর্তি করা হয়েছিল তাদের বুদ্ধির পরিমাপের জন্য আর্মি বিটা (Army Beta) নামে একটি ভাষাবর্জিত (Non-Verbal) যৌথ অভীক্ষা (Group Test) তৈরী করা হয়েছিল।

আর্মি বিটা (Army Beta) অভীক্ষা

সেই অভীক্ষাটিতে নীচের সাতরকম ভাষাবর্জিত সমস্যা দেওয়া হয়েছিল।

(ক) গোলকধাঁধা: কাগজে আঁকা গোলকধাঁধায় পেন্সিলের সাহায্যে পথ বার করা।

(খ) ঘনক্ষেত্র বিশ্লেষণ (Cube Analysis): একস্তূপ ঘনক্ষেত্রের মধ্যে কটি ঘনক্ষেত্র আছে তা নির্ণয় করা।

(গ) ×—O সারিঃ ×এবং O'র নানা সম্মেলনের অসম্পূর্ণ সারি সম্পূর্ণ করা।

(ঘ) সংখ্যা-প্রতীক (Digit Symbol): সঙ্কেতলিপি (Code) প্রণয়ন বা বিশেষ একটি সাংকেতিক নির্দেশ (Key) অনুযায়ী কতকগুলি সংখ্যাকে প্রতীক দিয়ে প্রকাশ করা।

(ঙ) সংখ্যা মিল করা: ৩ থেকে ২২ সংখ্যা দিয়ে তৈরী অনেকগুলি অঙ্কের মধ্যে কোন্‌টির সঙ্গে কোন্‌টির মিল আছে তা নির্ণয় করা।

(চ) চিত্র সম্পূর্ণকরণ: অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ করা।

(ছ) জ্যামিতিক অঙ্কন: কতকগুলি রেখাকে এমনভাবে টানতে হবে যাতে চিত্রটি একটি প্রদত্ত বিশেষ ক্ষেত্রের আকার ধারণ করে।

আর্মি বিটা ছাড়াও উল্লেখযোগ্য ভাষাবর্জিত্‌ অভীক্ষার মধ্যে পিন্‌টনার নন-ল্যাঙ্গুয়েজ টেষ্ট (Pintner Non-Language Test), চিকাগো ননভার্বল এগ্‌জামিনেসান (Chicago Non-Verbal Examination) ইত্যাদির নাম করা যায়।

এ ছাড়াও মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলিকে আবার আর এক দিক দিয়ে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা, কাগজ-কলম-নির্ভর অভীক্ষা (Paper-Pencil Test) ও সম্পাদনী অভীক্ষা (Performance Test)। যে সব অভীক্ষার উত্তর নিছক কাগজে কলমে লিখে দেওয়া যায় এবং যেগুলিতে কোন কাজ সম্পন্ন করবার প্রয়োজন হয় না, সেগুলিকে কাগজ-কলম-নির্ভর অভীক্ষা নাম দেওয়া হয়েছে। বিনে সাইমন স্কেল, আর্মি আলফা টেস্ট ইত্যাদি অভীক্ষা-গুলি কাগজ-কলম-নির্ভর অভীক্ষা।

সম্পাদনী অভীক্ষা (Performance Test)

আধুনিক কালে আর এক ধরনের নতুন অভীক্ষা গড়ে উঠেছে যেগুলিতে কাগজ কলমে লেখার কোন প্রয়োজন হয় না। এই অভীক্ষাগুলিতে মূর্ত বস্তুর সাহায্যে কোন কিছু তৈরী করা, কোন অসম্পূর্ণ বস্তু সম্পূর্ণ করা কিংবা কোন মূর্তধর্মী সমস্যা সমাধান করা প্রভৃতি কাজের মধ্যে দিয়ে অভীক্ষার্থীর সাফল্যের বা কৃতিত্বের পরিমাপ করা হয়ে থাকে। সেই জন্য এগুলির সম্পাদনী অভীক্ষা (Performance Test) নাম দেওয়া হয়েছে।

প্রাচীনতম সম্পাদনী অভীক্ষাগুলির মধ্যে ইটালিয়ান মনোবিজ্ঞানী সেগুঁইর (Seguin) তৈরী ফর্মবোর্ডের নাম করতে হয়। তিনি ক্ষীণবুদ্ধি (Feebleminded) ছেলেমেয়েদের ইন্দ্রিয়মূলক ও সঞ্চালনমূলক শিক্ষার জন্য এই ফর্ম বোর্ডের (Form Board) উদ্ভাবন করেন। পরে তাঁর এই ফর্ম-

বোর্ড সম্পাদনী অভীক্ষার একটি প্রধান অঙ্গরূপে গৃহীত হয়। সেগুঁইর ফর্মবোর্ড অভীক্ষাটিতে একটি কাঠের বোর্ডের উপরে দশটি বিভিন্ন নক্সার গর্ত আছে এবং সেগুলির মধ্যে ঠিক ঐ নক্সাগুলির আকৃতি-বিশিষ্ট দশটি কাঠের টুকরো খাপে খাপে বসিয়ে দেওয়া যায়। অভীক্ষার্থীকে দশটি কাঠের টুকরো দিয়ে বলা হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে যেন ঐ টুকরাগুলি যথাস্থানে বসিয়ে দেয়। পরপর তিনবার তাকে চেষ্টা করতে দেওয়া হয় এবং তিনবারের মধ্যে স্বল্পতম সময়টিই অভীক্ষার্থীদের স্কোর বলে ধরা হয়। সেগুঁইর ফর্ম বোর্ডটি সব চেয়ে সরল ও সহজ। পরে সেগুঁইর বোর্ডের অনুকরণে অনেক জটিল ও উন্নত ধরনের ফর্মবোর্ড বহু মনোবিজ্ঞানী তৈরী করেছেন।

ফর্মবোর্ড ছাড়া আরও অনেক রকমের সম্পাদনী অভীক্ষার প্রচলন আছে। তার মধ্যে হিলির চিত্র-সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষাটিও (Healy Picture-Completion Test) খুব প্রাচীন। এই অভীক্ষায় কতকগুলি ছবি থেকে চৌকো চৌকো টুকরো কেটে আলাদা করে রাখা হয় এবং অভীক্ষার্থীকে ঐ কাটা অংশগুলি ছবিগুলির যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে ছবিটি সম্পূর্ণ করতে বলা হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঐ চৌকো অংশটি ঠিকমত বসাতে গেলে ছবিতে বর্ণিত ব্যাপারটি বা ঘটনাটি অভীক্ষার্থীকে ভাল করে বুঝতে হয়।

হিলির পাজল (Healy Puzzle) নামে আর একটি সম্পাদনী অভীক্ষাও বহুদিন ধরে প্রচলিত। এই অভীক্ষায় কতকগুলি বিভিন্ন আকৃতির কাঠের টুকরো দিয়ে অভীক্ষার্থীকে ত্রিভুজ, আয়তক্ষেত্র প্রভৃতির মধ্যে বিশেষ একটি জ্যামিতিক ক্ষেত্র তৈরী করতে বলা হয়। নকস্ সিপ টেষ্ট (Knox Ship Test) নামে আর একটি সম্পাদনী অভীক্ষায় শিক্ষার্থীকে জাহাজের ছবির কতকগুলি টুকরো দিয়ে একটি পুরো জাহাজ তৈরী করতে বলা হয়।

নক্স কিউব টেষ্টে (Knox Cube Test) পর পর সাজান চারটি কিউবের উপর অভীক্ষক আঙ্গুল দিয়ে টোকা দেন এবং অভীক্ষার্থীকেও সেইভাবে টোকা দিতে বলেন। নানাভাবে উল্টোপাল্টা টোকা দিয়ে অভীক্ষার্থীর কাজটিকে বেশ জটিল করে তোলা যেতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই অভীক্ষায় অভীক্ষার্থীর অনন্তর স্মৃতিরই (Immediate Memory) পরিমাপ হয়ে থাকে।

প্রথম আদর্শায়িত (Standardised) পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনী অভীক্ষার নাম হল পিণ্টনার-প্যাটারসন পার্ফর্ম্যান্স স্কেল (Pintner-Patterson Performance Scale)। এই স্কেলটির মধ্যে সেগুঁই, হিলি, নক্স প্রভৃতির উদ্ভাবিত সম্পাদনী অভীক্ষাগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই স্কেলটি মোট ১৫টি অভীক্ষা নিয়ে

গঠিত। পিণ্টনার-প্যাটারসন স্কেলের অনুকরণে পরে আরও অনেক সম্পাদনী অভীক্ষার স্কেল তৈরী করা হয়েছে। তার মধ্যে কর্নেল-কক্স পার্ফর্ম্যান্স এবিলিটি স্কেল (Cornell-Cox Performance Ability Scale), আর্মি পার্ফর্ম্যান্স স্কেল (Army Performance Scale), আর্থার পার্ফর্ম্যান্স স্কেল (Arthur Performance Scale) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এর প্রত্যেকটি স্কেলই আদর্শায়িত বা মাননির্ণীত।

পোর্টিয়াসের আবিষ্কৃত পোর্টিয়াস মেজ টেষ্টগুলি (Porteus Maze Tests) সম্পাদনী অভীক্ষারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এই অভীক্ষাগুলিতে কতকগুলি রেখাঙ্কিত গোলকধাঁধা (Maze) দেওয়া থাকে। অভীক্ষার্থীকে ঐ গোলকধাঁধাগুলিতে পেন্সিল দিয়ে নির্ভুল পথটি বার করতে বলা হয়।

কোহ্‌স ব্লক ডিজাইন (Kohs Block Design) নামক আর এক শ্রেণীর সম্পাদনী অভীক্ষায় এক ইঞ্চি ঘনক্ষেত্রের আকারের কতকগুলি কাঠের ব্লক বা টুকরো দেওয়া হয়। ব্লকগুলির ছ'দিকে লাল, নীল, হলদে, সাদা, হলদে-এবং-নীল এবং লাল-এবং-সাদা এই ছ'রকম রঙ দেওয়া থাকে। ঐ ছ'রকম রঙ দিয়ে তৈরী কতকগুলি রঙীন নক্সা অভীক্ষার্থীর সামনে ধরা হয় এবং নক্সাগুলি অনুযায়ী ব্লকগুলি তাকে সাজাতে বলা হয়।

আলেকজাণ্ডারের পাশ-এ্যালংগ (Pass-Along) টেষ্টটিও আর একটি নতুন ধরনের সম্পাদনী অভীক্ষা। এই অভীক্ষায় একটি ছোট বাক্সের মধ্যে কাঠের বা প্লাষ্টিকের কতকগুলি বিভিন্ন আকৃতির টুকরো রাখা থাকে। সেগুলিকে বাক্স থেকে না তুলে কেবল উপরে, নীচে এবং পাশের দিকে সরিয়ে প্রদত্ত নক্সা অনুযায়ী সাজাতে হয়। কত কম সময়ের মধ্যে অভীক্ষার্থী নক্সা অনুযায়ী টুকরোগুলিকে নির্ভুলভাবে সাজাতে পারল তার উপর অভীক্ষার্থীর স্কোর নির্ভর করে। ডিয়ারবর্নের (Dearborn) ফর্ম বোর্ড, কোহ'র (Koh) ব্লক ডিজাইন এবং আলেকজাণ্ডারের পাশ-এ্যালংগ—এই তিনটি সম্পাদনী অভীক্ষাকে এক করে আলেকজাণ্ডারের প্রসিদ্ধ পার্ফর্ম্যান্স স্কেলটি (Alexander's Performance Scale) তৈরী করা হয়েছে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য আর এক ধরনের সম্পাদনী অভীক্ষার প্রচলন আছে। এই অভীক্ষাটির নাম মানবমূর্তির অভীক্ষা (Manikin Test)। এই অভীক্ষায় একটি কাঠের বা প্লাষ্টিকের তৈরী ছোট মানবমূর্তি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অংশে ভাগ করা থাকে। ঐ অংশগুলি শিশুকে দেওয়া হয় এবং সেগুলিকে ঠিকমত সাজিয়ে পূর্ণ মানুষের মূর্তিটি তাকে তৈরী করতে বলা হয়।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ভাষাবর্জিত বুদ্ধির অভীক্ষার নাম হল গুডএনাফের মানুষ-আঁকার অভীক্ষা (Goodenough's Man Drawing Test)। এতে অভীক্ষার্থীকে নিজের মন থেকে একটি মানুষের ছবি আঁকতে বলা হয়। শিল্প-নৈপুণ্য বা সৌন্দর্যের দিক দিয়ে ছবিটির বিচার করা হয় না। কেবল দেখা হয় যে মানুষের দেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে কতগুলি অভীক্ষার্থী ছবিতে আঁকতে পারল এবং সেগুলির পরস্পরের মধ্যে অনুপাতমূলক সম্পর্ক সম্বন্ধে তার ধারণাই বা কতটা নির্ভুল। চার থেকে দশ বৎসর বয়সের শিশুদের বুদ্ধির অভীক্ষা হিসাবে এই অভীক্ষাটির ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে।

এখন একটি প্রশ্ন হল যে সম্পাদনী অভীক্ষার দ্বারা ব্যক্তির কি ধরনের শক্তি বা কর্মক্ষমতার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। স্পীয়ারম্যান প্রভৃতি একদল মনোবিজ্ঞানী সম্পাদনী অভীক্ষাকে এক ধরনের বুদ্ধির অভীক্ষা বলেই বর্ণনা করেছেন। আলেকজাণ্ডার তাঁর প্রসিদ্ধ পরীক্ষণের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে সম্পাদনী অভীক্ষাগুলি মূর্ত বুদ্ধির (Concrete intelligence) পরিমাপ করে থাকে। দেখা যাচ্ছে যে আলেকজাণ্ডার বুদ্ধিকে মূর্ত (Concrete) ও অমূর্ত (Abstract) এই দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। অবশ্য সকল মনোবিজ্ঞানী আলেকজাণ্ডারের এই শ্রেণীবিভাগকে মেনে নেননি। ভার্নন প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা সম্পাদনী অভীক্ষাকে বুদ্ধির অভীক্ষা বলে মানতেই রাজী নন। তাদের মতে সম্পাদনী অভীক্ষার দ্বারা উপলব্ধিমূলক ও অবস্থানমূলক বিশেষ-ধর্মী শক্তিগুলিরই পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

আজকাল অবশ্য সম্পাদনী অভীক্ষা বুদ্ধির পরিমাপের উপকরণ রূপে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, স্বল্পভাষাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, বিদেশী প্রভৃতির ক্ষেত্রে বুদ্ধি পরিমাপের উপকরণরূপে প্রায়ই কোন না কোনরূপ সম্পাদনী অভীক্ষার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

বিশেষ শক্তির অভীক্ষা (Tests of Special Abilities)

বুদ্ধিকে মনোবিজ্ঞানীরা মনের সাধারণ শক্তি বলে ধরে নিয়েছেন এবং বুদ্ধির অভীক্ষাগুলি এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যার দ্বারা কেবলমাত্র ব্যক্তির সাধারণ মানসিক কর্মক্ষমতার পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ বুদ্ধির অভীক্ষা থেকে আমরা জানতে পারি যে সাধারণভাবে সকলপ্রকার মানসিক কাজে অভীক্ষার্থী কেমন ফল দেখাবে। কিন্তু কোন বিশেষধর্মী কাজে তার কুশলতা বা দক্ষতার পরিচয় বুদ্ধির অভীক্ষা থেকে পাওয়া যাবে না। এইজন্য আধুনিক

কালে বুদ্ধির অভীক্ষাগুলিকে সাধারণ শ্রেণীবিন্যাসের অভীক্ষা (General Classification Test) নাম দেওয়া হয়ে থাকে। এর অর্থ হল যে বুদ্ধির অভীক্ষার দ্বারা কেবলমাত্র সাধারণ শক্তি বা কর্মক্ষমতার দিক দিয়ে ব্যক্তিদের বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা চলে।

পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষা (Differntial Aptitude Test)

কিন্তু জীবনে সাফল্যলাভ কেবলমাত্র সাধারণ কর্মক্ষমতার উপর নির্ভর করে না, ব্যক্তি যে সব বিশেষ শক্তি নিয়ে জন্মেছে সেগুলির উপরও বহুলাংশে নির্ভর করে। সেই জন্য আধুনিক কালে নানা ধরনের বিশেষ শক্তির অভীক্ষা (Test for Special Ability) প্রস্তুত হয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এগুলির নাম দিয়েছেন পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষা (Differential Aptitude Test)। এর দ্বারা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিশেষ শক্তি বা দক্ষতার দিক দিয়ে কোথায় কোথায় পার্থক্য আছে তা জানা যায়।

বিশেষ শক্তির অভীক্ষাগুলিতে বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট অথচ বিশেষধর্মী কাজগুলির দিক দিয়ে অভীক্ষার্থীর দক্ষতাকে স্বতন্ত্রভাবে পরিমাপ করা হয়। যেমন, কেবলমাত্র ভাষামূলক উৎকর্ষ পরিমাপ করার জন্য যদি একটি অভীক্ষা তৈরী করা হয় তবে সেটি হবে এই ধরনের বিশেষ শক্তির অভীক্ষা বা পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষা। নানা পরীক্ষণের দ্বারা বিশেষ করে আধুনিক পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে যে ভাষামূলক দক্ষতার পেছনে একটি বিশেষ শক্তি কাজ করে থাকে। এটিকে সংক্ষেপে v বলা হয়। অতএব ভাষামূলক দক্ষতার অভীক্ষার দ্বারা ব্যক্তির এই শক্তি বা ফ্যাক্টরটির (Factor) পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

যেমন, স্মৃতির (Memory or M) পরিমাপের জন্য স্বতন্ত্র অভীক্ষা তৈরী করা হয়েছে। এগুলিকে স্মৃতির অভীক্ষা (Memory Test) বলা হয় এবং এগুলির দ্বারা বিভিন্ন শ্রেণীর স্মৃতি, যেমন যান্ত্রিক স্মৃতি, অনুষঙ্গমূলক স্মৃতি ইত্যাদির পরিমাপ করা যায়।

এই একইভাবে গাণিতিক দক্ষতা (Numerical Ability or N), বিচারকরণ দক্ষতা (Reasoning Ability or R), অবস্থানমূলক দক্ষতা (Spatial Ability or S) ইত্যাদি নানা বিশেষধর্মী শক্তির উপর আজকাল অভীক্ষা তৈরী করা হয়েছে। যান্ত্রিক দক্ষতার (Mechanical Ability or m) উপর একটি প্রাচীনতম অভীক্ষার নাম হল ষ্টেনকুইষ্ট মেকানিকাল টেষ্ট (Stenquist

Mechanical Test)। সেইরকম সঙ্গীতমূলক দক্ষতার (Musical Ability) উপর প্রচলিত একটি অভীক্ষার নাম হল সিশোর মিউজিক্যাল এবিলিটি টেষ্ট (Seashore Musical Ability Test)।

সাম্প্রতিককালে পূর্ণাঙ্গ পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষা বলতে থার্ষ্টোনের প্রাথমিক শক্তির অভীক্ষাটির (Thurstone's Primary Ability Test) নাম করতে হয়। থার্ষ্টোনের এই অভীক্ষাটিকে মানবমনের সাতটি বিশেষধর্মী কর্মক্ষমতার পরিমাপ করা হয়। এগুলিকে থার্ষ্টোন প্রাথমিক শক্তি বলে বর্ণনা করেছেন। এগুলি হল ভাষাবোধ শক্তি (Verbal Comprehension or V), সংখ্যা ব্যবহার (Number Facility or N), স্মৃতি (Memory বা M), আগমনমূলক বিচারকরণ (Inductive Reasoning বা R), উপলব্ধিমূলক শক্তি (Perceptual Ability or P), অবস্থানমূলক ধারণা (Space or S), ভাষা ব্যবহারের উৎকর্ষ (Word Fluency or W)।

আর একটি সাম্প্রতিক পার্থক্যমূলক দক্ষতার অভীক্ষার নাম হল সাইকোলজিক্যাল কর্পোরেশনের (Psychological Corporation) তৈরী ডিফারেন্সিয়াল এ্যাপটিচিউড টেষ্ট (Differential Aptitude Test or DAT)। এতেও থার্ষ্টোনের অভীক্ষার মত ভাষামূলক, গাণিতিক, বিচারকরণমূলক, অবস্থানমূলক ইত্যাদি বিশেষধর্মী কাজগুলির উপর অভীক্ষা দেওয়া হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জনিয়োগ বিভাগের তৈরী জেনারেল এ্যাপটিচিউড টেষ্ট ব্যাটারিটিও (General Aptitude Test Battery or GATB) এই ধরনের বিশেষধর্মী শক্তি পরিমাপের অভীক্ষা বিশেষ।

বিশেষ দক্ষতার অভীক্ষা (Special Aptitude Test)

এ ছাড়া আরও এক ধরনের বিশেষ দক্ষতার অভীক্ষা বহুদিন ধরেই প্রচলিত আছে এবং বর্তমানে শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞানে সেগুলির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে। এগুলিকে বিশেষ দক্ষতার অভীক্ষা (Special Aptitude Test) নাম দেওয়া হয়েছে।

এগুলির মধ্যে প্রথমে ইন্দ্রিয়মূলক দক্ষতার অভীক্ষাগুলির (Sensory Tests) উল্লেখ করতে হয়। যেমন, দর্শনমূলক অভীক্ষা (Visual Test), শ্রবণমূলক অভীক্ষা (Auditory Test) ইত্যাদি। এই অভীক্ষাগুলির সাহায্যে অভীক্ষার্থীর কোন বিশেষ ইন্দ্রিয়ের শক্তি বা দক্ষতার পরিমাপ করা হয়। এছাড়া সঞ্চালনমূলক দক্ষতার (Motor Dexterity) অভীক্ষারও আজকাল বহুল প্রচার হয়েছে। এই অভীক্ষায় হাত পা নাড়া, চলা-ফেরা, শরীরকে বিভিন্নভাবে হেলান,

স্থিরতা, মাংসপেশীর ক্ষমতা প্রভৃতির পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কাজে কর্মী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই অভীক্ষাটির উপযোগিতা যথেষ্ট।

যন্ত্রমূলক দক্ষতার (Mechanical Apititude) অভীক্ষারও আজকাল বিশেষ উন্নতি হয়েছে। প্রাচীনতম যন্ত্রমূলক দক্ষতার অভীক্ষাটির নাম ষ্টেনকুইষ্ট মেকানিকাল টেষ্ট (Stenquist Mechanical Test)। বর্তমান যন্ত্রশিল্পের যুগে যান্ত্রিক দক্ষতা পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর বহু উন্নত ধরনের অভীক্ষার উদ্ভাবন করা হয়েছে। যেমন, কেন্ট স্যাকোর (Kent Shakow) শিল্পমূলক ফর্মবোর্ড (Industrial Form Board), ম্যাক্কোয়ারির (McQuarric) যান্ত্রিক দক্ষতার অভীক্ষা, মিন্নেসোটা (Minnesota) মেকানিকাল এ্যাসেম্বলী টেষ্ট ইত্যাদি।

করণিক দক্ষতা (Clerical Aptitude) পরিমাপের অভীক্ষাগুলিও আধুনিক কালে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই অভীক্ষাগুলিতে সংখ্যা এবং নামের তুলনা করা, কাগজপত্রের শ্রেণীবিভাগ করা, ফাইল করা, কাগজ বাছা, খাম আঁটা ইত্যাদি নানা বিভিন্ন প্রকারের অফিসের কাজকর্ম অভীক্ষার্থীকে করতে দেওয়া হয়। মিন্নেসোটা ক্লারিকাল টেষ্ট (Minnesota Clerieal Test), জেনারেল ক্লারিকাল টেষ্ট (General Clerical Test or GCT) প্রভৃতি বহু প্রচলিত অভীক্ষাগুলিরও নাম এই পর্যায়ে করা যায়।

আগ্রহের পরিমাপ (Measurement of Interest)

কোন কাজ করা বা কিছু শেখার পেছনে যে বস্তুটি থাকা একান্ত অপরিহার্য সেটি হল প্রেষণা (Motive)। প্রেষণাই ব্যক্তিকে বিশেষ একটি কাজ করতে প্রয়োচিত করে, তার কর্মক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ করে এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার উদ্যমকে অব্যাহত রাখে। প্রেষণার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে আর একটি বস্তু। তার নাম আগ্রহ। আগ্রহ বলতে বোঝায় ব্যক্তির এক ধরনের তৃপ্তি বা আনন্দের অনুভূতি যা ঐ কাজটি সম্পন্ন করার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। এই জন্যই যে কাজে ব্যক্তির আগ্রহ থাকে না সে কাজ সম্পাদনে ব্যক্তি তৃপ্তিবোধ করে না, ফলে তার মধ্যে ঐ কাজের জন্য কোন প্রেষণা জন্মায় না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির সুশিক্ষা ও সুপরিচালনার জন্য তার কোন্ কোন্ বিষয় বা কাজে আগ্রহ আছে তা জানা একান্ত

প্রয়োজন। বিশেষ করে শিক্ষামূলক ও পরিচালনামূলক কাজের ক্ষেত্রে ব্যক্তির আগ্রহের স্বরূপটি অপরিহার্য বললেই চলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শিক্ষার্থী যে বিষয়ে আগ্রহ অনুভব করে সে বিষয়টি সে খুব সহজেই শিখতে পারে। অবশ্য সমস্ত শিক্ষাই সহজাত শক্তি ও আগ্রহের মিলিত ফল, কিন্তু কোন বিষয়ে কেবলমাত্র শক্তি বা কর্মক্ষমতা থাকলেই শিক্ষা ঘটে না যদি না সেই বিষয়ে শিক্ষার্থীর যথেষ্ট পরিমাণে আগ্রহ থাকে। তেমনই বৃত্তির ক্ষেত্রেও এই একই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। এই জন্যই আধুনিক কালে মনোবিজ্ঞানীরা আগ্রহ পরিমাপের নানা পন্থার উদ্ভাবন করেছেন।

আগ্রহের অভীক্ষা (Interest Test)

আগ্রহ পরিমাপের সবচেয়ে সহজ উপায় হল শিক্ষার্থীকে সোজাসুজি নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা এবং সেই সব উত্তর থেকে তার আগ্রহের স্বরূপ নির্ণয় করা। কিন্তু নানা কারণে এই ধরনের উত্তরগুলি বাস্তবধর্মী ও নির্ভরযোগ্য হয় না। বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে এবং অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সোজাসুজি প্রশ্নের দ্বারা প্রকৃত উত্তর পাওয়া যায় না। প্রথমত, তাদের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হওয়ায় তাদের আগ্রহের পরিধিও নিতান্ত সঙ্কীর্ণ থাকে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বিষয় ও বৃত্তি সম্বন্ধে সমাজে প্রচলিত এবং আর দশজনের পরিপোষিত ধারণা বা মতবাদের দ্বারা তারা এতই প্রভাবিত হয় যে নিজেদের আগ্রহ সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা তারা গড়ে তুলতে পারে না। এই সব কারণেই প্রত্যক্ষ প্রশ্ন ও উত্তরের সাহায্যে আগ্রহ পরিমাপের পদ্ধতি পরিত্যাগ করে পরোক্ষ এবং প্রচ্ছন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। কার্নেগী ইনষ্টিটিউট অব টেকনোলজির এক আলোচনা সভায় আগ্রহ পরিমাপের পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়। কিন্তু সবচেয়ে সাফল্যজনক আগ্রহের অভীক্ষা তৈরী করেন ই কে স্ট্রং (E. K Strong) নামক এক মনোবিজ্ঞানী। তাঁর অভীক্ষাটির নাম ভোকেসানাল ইণ্টারেষ্ট ব্ল্যাঙ্ক (Vocational Interest Blank বা VIB).

কার্নেগী ইনষ্টিটিউটের অভীক্ষাটির দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথম, বহু বিচিত্র প্রকারের কাজ, বস্তু, ব্যক্তি প্রভৃতি সম্পর্কে অভীক্ষার্থীর পছন্দ বা অপছন্দ জানা যায় এমন ধরনের প্রশ্ন অভীক্ষাটিতে দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়, বিভিন্ন শ্রেণীর বৃত্তি অনুযায়ী উত্তরগুলির শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছিল। তার ফলে দেখা গেল যে বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে আগ্রহের দিক দিয়ে বেশ মিল আছে।

স্ট্রং'র VIB অভীক্ষাটিতে মোট চারশটি প্রশ্ন আছে এবং সেগুলি আটটি অংশে বিভক্ত। প্রথম পাঁচটি অংশে পাঁচটি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে অভীক্ষার্থীর আগ্রহ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই পাঁচটি বিষয় হল, বৃত্তি, স্কুলপাঠ্য বিষয়-সমূহ, আমোদ প্রমোদ, নানারকম কাজকর্ম এবং অপরের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যসমূহ। প্রত্যেকটি প্রশ্ন বা উক্তির পাশে লেখা থাকে পছন্দ, উদাসীন এবং অপছন্দ। অভীক্ষার্থীকে ঐ তিন ধরনের উত্তরের মধ্যে একটিতে দাগ দিতে বলা হয়। যেমন—

	পছন্দ	উদাসীন	অপছন্দ
১। যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজকর্ম করা			
২। অঙ্ক কষা			
৩। সিনেমায় যাওয়ায়			

অভীক্ষাটির শেষ তিনটি ভাগে কতকগুলি বৃত্তিমূলক কাজকে অভীক্ষার্থীর পছন্দ অনুযায়ী সাজাতে এবং নিজের বর্তমান কর্মক্ষমতা এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির পরিমাপ করতে বলা হয়। এই অভীক্ষাটিতে প্রত্যেকটি বৃত্তির (Occupation) স্বতন্ত্র স্কোরের তালিকা আছে। কোন বিশেষ ব্যক্তির স্কোরটিকে ঐ নির্দিষ্ট স্কোরের তালিকার সঙ্গে তুলনা করে দেখা যেতে পারে যে সে সাধারণ পুরুষ বা সাধারণ নারী থেকে ঐ বৃত্তিটিতে আগ্রহের দিক দিয়ে কতটা দূরে সরে আছে।

আর একটি বহুল ব্যবহৃত আগ্রহের অভীক্ষার নাম হল কুডের প্রেফারেন্স রেকর্ড (Kuder Preference Record)। এই অভীক্ষাটি খুবই সম্প্রতি তৈরী হয়েছে এবং স্ট্রং'র অভীক্ষার সঙ্গে এটির অনেক দিক দিয়ে প্রচুর পার্থক্য আছে। এতে কোন একটি বিশেষ বৃত্তিতে আগ্রহ নির্ণয় না করে কতকগুলি ব্যাপক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আগ্রহ আছে কি না তারই পরিমাপ করা হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্র বা বিষয়ের উপযোগী বিভিন্ন ফর্মে (Form) বা আকারে এই অভীক্ষাটি পাওয়া যায়।

উদাহরণস্বরূপ এর বৃত্তিমূলক ফর্মটিতে ১৬৮টি পদ (Item) আছে। এমন ধরনের তিনটি করে পদ এক সঙ্গে দেওয়া থাকে যেগুলির দ্বারা একই শ্রেণীর

অথচ প্রকৃতির দিক দিয়ে বিভিন্ন তিনটি কাজকে বোঝান হয়। অভীক্ষার্থী ঐ তিনটি কাজের মধ্যে যে কাজটি সব চেয়ে বেশী পছন্দ করে এবং যে কাজটি সব চেয়ে কম পছন্দ করে সেই দুটি কাজের পাশে তাকে দাগ দিতে বলা হয়। যেমন—

নীচে তিনটি কাজের নাম দেওয়া আছে। এর মধ্যে কোন্ কাজটি তোমার সব চেয়ে পছন্দ আর কোন্‌টি সবচেয়ে অপছন্দ বল।

১। অটোগ্রাফ সংগ্রহ করা

২। মুদ্রা সংগ্রহ করা

৩। প্রজাপতি সংগ্রহ করা

কুডার প্রেফারেন্স রেকর্ডের বৃত্তিমূলক ফর্মটিতে নানারকম বৃত্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেমন,—কৃষিমূলক, যন্ত্রপাতিমূলক, গণনামূলক, বিজ্ঞানমূলক, চারুকলামূলক, সাহিত্যমূলক, কারণিক, সামাজিক ইত্যাদি।

স্ট্রং এবং কুডারের আগ্রহ পরিমাপের অভীক্ষা ছাড়াও আজকাল আরও অনেকগুলি আগ্রহের অভীক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে থার্ষ্টোন ইণ্টারেষ্ট সিডিউল (Thurstone Interest Schedule) এবং গিলফোর্ড-স্নিড-ম্যান-জিমারম্যান ইণ্টারেষ্ট সার্ভে (Guilford-Sneidman-Zimmerman Interest Survey) ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

সু-অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যাবলী

(Characteristics of a Good Test)

যে কোন ভাল অভীক্ষায় নীচের বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা একান্ত প্রয়োজন। এগুলির একটিরও যদি অভাব থাকে তবে অভীক্ষাটিকে নিখুঁত বলতে পারা যাবে না। যথা—

১। নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity)

২। নির্ভরযোগ্যতা (Reliability)

৩। যাথার্থ্য (Validity)

৪। প্রয়োগশীলতা (Administrability)

৫। সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়তা (Interpretation and Comparability)

৬। পরিমিততা (Economy)

নৈর্ব্যক্তিকতা (Objectivity) বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাটির গঠন, প্রয়োগ

বা ফল নির্ণয়ের উপর অভীক্ষকের কোনরূপ প্রভাব থাকবে না। অভীক্ষাটি সব দিক দিয়ে ব্যক্তিগত প্রভাববর্জিত হবে। এর অর্থ হল যে অভীক্ষাটি সম্পূর্ণভাবে বিষয়মুখী হবে, ব্যক্তিমুখী হবে না।

গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতিতে এ বৈশিষ্ট্যটি একেবারেই নেই। সেখানে যে ধরনের প্রশ্ন দেওয়া হয় অভীক্ষার্থীকে সেগুলির উত্তর দিতে হলে বড় বড় রচনা লেখা ছাড়া উপায় থাকে না। যেমন, 'শিক্ষার লক্ষ্য কি?' বা 'কোন্ কোন্ শক্তির দ্বারা বাজারে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়?' ইত্যাদি প্রকৃতির প্রশ্নের উত্তরে অভীক্ষার্থী বিরাট বিরাট রচনা লিখতে বাধ্য হয়। এই জন্য এই ধরনের প্রশ্নগুলিকে রচনাধর্মী প্রশ্ন বলা হয়। এই শ্রেণীর প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষা করে নম্বর দেবার সময় অভীক্ষকের ব্যক্তিগত মতামত, পছন্দ অপছন্দ এমন কি খেয়াল খুশী, মেজাজ ইত্যাদি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আধুনিক অভীক্ষায় এই ব্যক্তিকতা (Subjectivity) দূর করার জন্য সুনির্দিষ্ট ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করা হয় এবং সেগুলির উত্তর মাত্র একটিই হয়, একটি ছাড়া দুটি হয় না। যেমন—

১। নীচের তিনটি উত্তরের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক বল।

প্রাচীন ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য ছিল

(ক) স্বাস্থ্যচর্চা (খ) সমাজ-উন্নয়ন (গ) আত্ম-উপলব্ধি।

২। বাক্যটির শূন্যস্থানগুলি পূর্ণ কর।

জেমস্-ল্যাংগ মতবাদ অনুযায়ী দৈহিক অনুভূতি জাগে———-প্রক্ষোভের অনুভূতি দেখা দেয়———।

৩। উক্তিটি সত্য কিংবা মিথ্যা বল।

পৃথিবী আকারে বৃহস্পতি গ্রহের চেয়ে বড়। সত্য—মিথ্যা

এই ধরনের সংক্ষিপ্ত এবং এক-উত্তর-বিশিষ্ট প্রশ্নগুলির সাহায্যে আধুনিক অভীক্ষা তৈরী করা হয়ে থাকে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এই ধরনের প্রশ্নগুলির উত্তর পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকতাদোষের দ্বারা দুষ্ট হবার সম্ভাবনা এক প্রকার থাকেনা বললেই চলে।

নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) বলতে বোঝায় অভীক্ষাটি কতটা নিখুঁত বা নির্ভুল। সাধারণত যদি একটি অভীক্ষা একই দলের উপর কিছুদিনের ব্যবধানে পর পর দু'বার প্রয়োগ করা হয় এবং যদি দেখা যায় যে অভীক্ষার্থীদের এই দু'বারের স্কোরের মধ্যে বেশ মিল আছে তা হলে অভীক্ষাটিকে নির্ভরযোগ্য বলা হয়। সাধারণত দলটির এই দু'বারের স্কোরের মধ্যে মিল বা সমতা মাপা

হয় সহপরিবর্তনের মান নির্ণয়ের দ্বারা। এ ছাড়া অন্যান্য পন্থাতেও অভীক্ষাটির নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয় করা হয়ে থাকে। গতানুগতিক পরীক্ষাগুলি এই দিক দিয়ে একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়।

যাথার্থ্য (Validity) বলতে বোঝায় অভীক্ষাটি যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার জন্য তৈরী করা হয়েছে প্রকৃতপক্ষে সেটি পরিমাপ করছে কি না। গতানুগতিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইতিহাস বা ভূগোলের জন্য তৈরী পরীক্ষা ইতিহাস বা ভূগোলের জ্ঞান ছাড়াও হাতের লেখা, ভাষামূলক দক্ষতা, রচনাশৈলী, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বা গুণগুলিও পরিমাপ করে থাকে। সেজন্য আমরা বলতে পারি যে এই পরীক্ষাগুলির যাথার্থ্য নেই। প্রকৃতপক্ষে যাথার্থ্যসম্পন্ন অভীক্ষা যে বৈশিষ্ট্য বা গুণ পরিমাপের জন্য তৈরী সেটি ছাড়া অন্য কোন বৈশিষ্ট্য বা গুণ পরিমাপ করবে না। কোন অভীক্ষার যাথার্থ্য নির্ণয় করার নিয়ম হল, অভীক্ষাটি প্রস্তুত করার পর অপর কোন যাথার্থ্যসম্পন্ন ও সুপ্রতিষ্ঠিত অভীক্ষার সঙ্গে সেটিকে তুলনা করা। সাধারণত এই দুটি অভীক্ষাকে একই দলের উপর প্রয়োগ করে তাদের মধ্যে সহ-পরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হয়। যদি দেখা যায় যে এই সহপরিবর্তনের মান বেশ উন্নত তবে নতুন অভীক্ষাটির যাথার্থ্য আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

প্রয়োগশীলতা (Administrability) বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাটি অভীক্ষার্থীদের উপর সহজ ও বিনা আয়াসে প্রয়োগ করা যাবে। অভীক্ষার ফলাফল অনেকাংশে নির্ভর করে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করার উপর। কোনও অভীক্ষা অন্যান্য গুণ ও বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে উন্নত হলেও যদি তার প্রয়োগ-পদ্ধতি কষ্টসাধ্য বা জটিল হয় তাহলে অভীক্ষাটির কোনও সার্থকতা থাকে না। এই জন্য আধুনিক অভীক্ষাগুলির প্রয়োগবিধি যতটা সম্ভব সহজ ও স্পষ্ট করা যায় সেদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে।

সংব্যাখ্যান (Interpretation) ও তুলনীয়তা (Comparability) বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাটি থেকে যে স্কোরগুলি পাওয়া যায় সেগুলিকে যথাযথ ব্যাখ্যা করা এবং সেগুলির পরস্পরের মধ্যে নির্ভরযোগ্যভাবে তুলনা করা যাবে। সাধারণত প্রাচীন পরীক্ষাপদ্ধতিতে খেয়ালখুশীমত ধরে নেওয়া একটা পাশ মার্কের সঙ্গে তুলনা করে বিশেষ কোন অভীক্ষার্থীর সাফল্যের পরিমাপ করা হয়। ফলে এই ধরনের পরিমাপের প্রকৃতপক্ষে কোন মূল্যই থাকে না। সেজন্য আধুনিক অভীক্ষাগুলির এমন একটি মান বার করা হয় যেটিকে সর্বজনীনভাবে প্রয়োগ করা যায়, এবং যেটির সঙ্গে যে কোন বিশেষ অভীক্ষার্থীর

কৃতিত্বের তুলনা করা চলতে পারে। একেই সর্বজনীন মান বা নর্ম (Norm) বলা হয়।

পরিমিততা (Economy) বলতে বোঝায় যে অভীক্ষাটির রচনা, প্রয়োগ, বিচার ইত্যাদি ব্যাপারে যতটা সম্ভব কম সময়, অর্থ ও পরিশ্রম লাগবে। প্রশ্নপত্র রচনা ও প্রয়োগের দিক দিয়ে গতানুগতিক পরীক্ষাগুলিতে অবশ্য সময় ও পরিশ্রম বেশী লাগে না। সেদিক দিয়ে আধুনিক অভীক্ষাগুলি তৈরী করা ও প্রয়োগ করা উভয় কাজেই যথেষ্ট সময় এবং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু তেমনই প্রশ্নপত্র দেখা এবং নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে গতানুগতিক অভীক্ষায় প্রচুর সময় ও শ্রম লাগে, কিন্তু আধুনিক অভীক্ষাগুলিতে প্রশ্নপত্র পরীক্ষা করার কাজটিকে এত সরল ও সহজ করে তোলা হয়েছে যে যে কোন স্বল্প-বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিও সেগুলি নির্ভুলভাবে পরীক্ষা করতে পারে।

আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardised Test)

আধুনিক অভীক্ষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল যে এগুলি আদর্শায়িত। আদর্শায়িত হওয়ার জন্যই আধুনিক অভীক্ষা প্রাচীন পরীক্ষা পদ্ধতির তুলনায় অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য, ত্রুটিহীন ও কার্যকর। আদর্শায়িত বলতে কি বোঝায় এখন তাই দেখা যাক।

কোন অভীক্ষার আদর্শায়ন (Standardisation) বলতে এক কথায় বোঝায় যে অভীক্ষাটির প্রয়োগ পদ্ধতি এবং স্কোরিং (Scoring) পদ্ধতির মধ্যে যতদূর সম্ভব সমতা (Uniformity) আনা।

প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্যে সমতা আনার অর্থ হল যে, যে পরিস্থিতিতে অভীক্ষাটি প্রয়োগ করা হচ্ছে সেই পরিস্থিতিটির বিভিন্ন দিক বা অঙ্গগুলি যেন বিভিন্ন সময় বা ক্ষেত্রে অপরিবর্তিত থাকে। সকল প্রকার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণের ক্ষেত্রেই পরিস্থিতির অপরিবর্তনীয়তা একটি অপরিহার্য উপকরণ। মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রেও পরিস্থিতির এই সমতা একান্ত আবশ্যক। এর জন্য যে যে বিষয়গুলির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হয় সেগুলি হল—অভীক্ষাটির প্রয়োগকালীন মৌখিক বা লিখিত নির্দেশগুলি, অভীক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তরদানের পদ্ধতি, অভীক্ষাটির স্বরূপ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝান অভীক্ষাপ্রয়োগের সময়সীমা, অভীক্ষায় ব্যবহার করার বিভিন্ন উপকরণ এবং পরিবেশের অন্যান্য উপাদানগুলি। অভীক্ষাটি থেকে সন্তোষজনক ফললাভের জন্য এই

বিষয়গুলি সব ক্ষেত্রে অভিন্ন হওয়া অপরিহার্য। এই জন্য যখনই কোন নতুন অভীক্ষা তৈরী করা হয় তখনই সেটি কেমন করে প্রয়োগ করতে হয় সে সম্বন্ধে অভীক্ষককে বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন ও নির্দেশ দিয়ে দিতে হয়। নইলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভীক্ষাটির প্রয়োগের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য দেখা দেবে এবং তার ফলে তা থেকে লব্ধ ফলাফল সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না।

আধুনিক অভীক্ষায় অভীক্ষাটির প্রয়োগের সময়, অভীক্ষকের বাচনভঙ্গী, হাবভাব, মুখের অভিব্যক্তি ইত্যাদি সম্বন্ধেও সুনির্দিষ্ট নির্দেশাবলী দেওয়া থাকে। কেননা অভীক্ষার্থীদের উপর এগুলির প্রভাবও কম দেখা যায় না। এমন কি যেখানে অভীক্ষা দেওয়া হবে সেখানকার পর্যাপ্ত আলো এবং বায়ু-চলাচলের উপযুক্ত ব্যবস্থা, অভীক্ষার্থীর বসার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্যের যথাযথ আয়োজন প্রভৃতি যাতে সব ক্ষেত্রে অভিন্ন হয় তার প্রতিও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হয়। সবশেষে অভীক্ষক ও অভীক্ষার্থীর মধ্যে একটি সম্প্রীতিমূলক বোঝাপড়া (Rapport) সৃষ্টি করাটা অভীক্ষার সাফল্যের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন এবং সে সম্বন্ধেও অভীক্ষাটিতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে।

কোন অভীক্ষার আদর্শায়নের দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় সোপান হল অভীক্ষাটির নর্ম (Norm) বা মান বার করা। আমরা দেখেছি যে কোন সু-অভীক্ষার একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সংব্যাখ্যান ও তুলনীয়তা (Interpretation and Comparability)। এর অর্থ হল যে অভীক্ষাটির ফলাফলের ঠিকমত ব্যাখ্যা করা যাবে এবং একজন অভীক্ষার্থীর প্রাপ্ত স্কোরের সঙ্গে অপর অভীক্ষার্থীর প্রাপ্ত স্কোরের নির্ভুল তুলনা করা সম্ভব হবে। এর জন্য অভীক্ষাটির একটি বিজ্ঞানসম্মত মান বা নর্ম থাকা প্রয়োজন।

সাধারণত স্কুল কলেজে যে সব পরীক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে সেগুলির এ ধরনের কোন বিজ্ঞানসম্মত মান নেই। ফলে এই সব পরীক্ষায় যদি কেউ ২০ বা ৬০ বা ৯০ পায় তবে তার সেই স্কোরের কোন বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত একটা পাশ মার্ক (যেমন ৩০ বা ৩৬) ঠিক করে দেওয়া হয় কিন্তু সেটিও সম্পূর্ণ খেয়ালখুশীমত এবং তার কোন যুক্তিনির্ভর ভিত্তি নেই। ফলে এর দ্বারা পরীক্ষার্থীর সাফল্যের কোনরূপ প্রকৃত পরিমাপ সম্ভব হয় না এবং পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একটা অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ তুলনা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় না।

সেজন্য প্রয়োজন এমন একটি মান বা নর্মের (Norm) যেটির সঙ্গে কোন বিশেষ পরীক্ষার্থীর পাওয়া স্কোরের তুলনা করে আমরা পরীক্ষার্থীর সাফল্যের

ঠিকমত বিচার করতে পারি। এ ধরনের মানকেই সর্বজনীন মান বা নর্ম (Population Norm) বলা হয়ে থাকে। আধুনিক আদর্শায়িত অভীক্ষার (Standardised Test) ক্ষেত্রে এই সর্বজনীন মান বা নর্ম থাকাটা একটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। যেমন ধরা যাক সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জন্য ইতিহাসের একটি আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরী করা হল। অর্থাৎ দেশে যত ছেলেমেয়ে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ে তাদের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে তাদের সাফল্যের একটি মান বা নর্ম ঠিক করা হল; মনে করা যাক, এই নর্মটি হল ৪২। এখন যদি বিশেষ একটি ছেলে ঐ পরীক্ষায় ৫০ পায়, তাহলে আমরা তৎক্ষণাৎ বলতে পারি যে সারা দেশের সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ছেলেটির স্থান কোথায়। যেমন, এক্ষেত্রে নর্ম হল ৪২। অতএব এই বিশেষ ছেলেটির ইতিহাসের স্থান সপ্তম শ্রেণীর সাধারণ ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশ কিছুটা বেশী এবং কতটা বেশী তাও আধুনিক পরিসংখ্যান-পদ্ধতির সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। কোন বিশেষ পরীক্ষার সর্বজনীন নর্ম বা মান নির্ণয় করার পন্থা হল সমস্ত অভীক্ষার্থীর স্কোরের সমষ্টিকে অভীক্ষার্থীদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা। এখন কোন অভীক্ষার সর্বজনীন মান নির্ণয় করতে গেলে প্রকৃতপক্ষে সেই বিশেষ শ্রেণীভুক্ত প্রত্যেকটি ব্যক্তির উপর অভীক্ষাটির প্রয়োগ করতে হয়। অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাসের অভীক্ষার মান নির্ণয় করতে হলে দেশে যত সপ্তম শ্রেণীর ছেলেমেয়ে আছে তাদের সকলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে তাদের সমগ্র স্কোরের যোগফলকে তাদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হয়। কিন্তু এ প্রক্রিয়াটি বাস্তবে সম্ভব নয় বলে সপ্তম শ্রেণীভুক্ত সমস্ত ছেলেমেয়েদের একটি বাছাই করা দলের (Sample Group) উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে তাদের স্কোর থেকেই সাধারণত এই সর্বজনীন মান বা নর্ম নির্ণয় করা হয়ে থাকে। অবশ্য দেখতে হবে যে এই বাছাই করা দলটি যেন সমগ্র দলের প্রতিনিধিস্বরূপ হয়। অর্থাৎ পরিবেশ, স্কুলে শিক্ষার মান, পিতামাতার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ইত্যাদির দিক দিয়ে সমগ্র দলটিতে যত বিভিন্ন শ্রেণীর ছেলেমেয়ে আছে তাদের সকলেরই কিছু কিছু এই বাছাই করা দলটিতে থাকবে। বলা বাহুল্য এই বাছাই করার (Sampling) প্রক্রিয়াটি যত নিখুঁত হবে, নর্মও তত নির্ভুল হবে।

আদর্শায়িত অভীক্ষা গঠনের পদ্ধতি

একটি আদর্শায়িত অভীক্ষা তৈরীর সময় নীচের সোপানগুলি অনুসরণ করা

হয়ে থাকে। অভীক্ষাটি বুদ্ধির অভীক্ষাই হোক্, বা বিশেষ শক্তি বা দক্ষতার অভীক্ষাই হোক্ কিংবা কোন পাঠ্যবিষয়ের উপর শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষাই হোক্ সর্বত্রই এই নীচের সোপানগুলি অনুসরণ করতে হবে। যথা—

প্রথম, যে শক্তি, বৈশিষ্ট্য বা বিষয়ের উপর অভীক্ষাটি গঠন করা হবে সে সম্বন্ধে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ধারণা প্রথমেই গড়ে নিতে হবে। অর্থাৎ বুদ্ধির অভীক্ষা তৈরী করতে হলে কাকে বুদ্ধি বলে, কিংবা ইতিহাসের অভীক্ষা তৈরী করতে হলে ইতিহাসের জ্ঞান বলতে অভীক্ষক কি বোঝেন ইত্যাদি ধরনের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট একটি ধারণা আগে তৈরী করে নিয়ে অভীক্ষককে অভীক্ষা তৈরীর কাজে হাত দিতে হবে।

দ্বিতীয়, এইবার ঐ নির্দিষ্ট ধারণা অনুযায়ী প্রশ্ন বা সমস্যা বা পদ (Item) প্রস্তুত করতে হবে। যতগুলি পদ সম্পূর্ণ অভীক্ষাটিতে থাকবে তার প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক পদ প্রথমে গঠন করা প্রয়োজন। যেমন ১০০টি পদ-বিশিষ্ট অভীক্ষা তৈরী করতে হলে প্রথমে অন্তত ২০০টি পদ গঠন করতে হবে।

তৃতীয়, এবার যে দলটির জন্য অভীক্ষাটি তৈরী হবে তাদের একটি ছোটখাট প্রতিনিধিমূলক দলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে যে পদগুলি অনুপযোগী বলে প্রমাণিত হবে সেগুলিকে বাদ দিতে হবে। এই পদ্ধতিকে ট্রাই-আউট (Try-out) করা বলে। অনুপযোগী পদ বলতে সেই পদগুলিকে বোঝায় যেগুলি হয় খুব শক্ত বা খুব সহজ কিংবা একাধিক অর্থসম্পন্ন হয়। যেমন, যে পদটির উত্তর ৮০% বা তার বেশী সংখ্যক অভীক্ষার্থী দিতে পারল সেটি খুব সহজ। তেমনই যে পদটির উত্তর মাত্র ২০% বা তার কম সংখ্যক অভীক্ষার্থী দিতে পারল সেটি খুব শক্ত। আর যে পদটির একের বেশী অর্থ হয় সেটি দ্ব্যর্থবোধক। এই পদগুলিকে প্রকৃত অভীক্ষা থেকে বাদ দিতে হবে।

চতুর্থ, তারপর অবশিষ্ট প্রশ্নগুলি থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশ্ন নিয়ে অভীক্ষাটি গঠন করতে হবে এবং সমগ্র দলের একটি যথেষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি-মূলক দলের উপর অভীক্ষাটি প্রয়োগ করে অভীক্ষাটির নর্ম বা মান নির্ণয় করতে হবে। এই সোপানটি অভীক্ষাটির আদর্শায়নে একান্ত প্রয়োজন। কেননা এই প্রক্রিয়ার দ্বারাই অভীক্ষাটির সর্বজনীন মান পাওয়া যায়।

সবশেষে, পরিসংখ্যান পদ্ধতির সাহায্যে অভীক্ষাটির নির্ভর-যোগ্যতা (Reliability) ও যাথার্থ্যের (Validity) মান নির্ণয় করতে হবে।

একটি বুদ্ধির অভীক্ষার উদাহরণ

প্রসিদ্ধ বিনে-সাইমন স্কেলের ষ্ট্যানফোর্ড রিভিসনের M ফর্মের ১১ বছর বয়সের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষাটি উদাহরণস্বরূপ নীচে দেওয়া হল। এই অভীক্ষা-টিতে মোট ৬টি প্রশ্ন বা সমস্যা অভীক্ষার্থীদের সমাধান করতে দেওয়া হয়।

বিনে-সাইমন স্কেল ঃঃ ষ্ট্যানফোর্ড রিভিসন
ফর্ম M—*বৎসর* 11

১। কারণ নির্ণয় (Finding Reasons)

প্রশ্ন করা হল :—

(ক) কেন ছেলেমেয়েরা তাদের পিতামাতার বাধ্য হবে তার দুটি কারণ দেখাও।

(খ) কেন বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর রেলপথ থাকা উচিত তার দুটি কারণ দেখাও।

২। স্মৃতি থেকে একটি পুঁতির মালার পুনর্গঠন

প্রথমে অভীক্ষক অভীক্ষার্থীর সামনে ১১টি পুঁতিসম্পন্ন একটি পুঁতির মালা তৈরী করবেন এবং অভীক্ষার্থীকে সেটি ভাল করে দেখতে বলবেন। তারপর সেটি তার সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে অনুরূপ আর একটি মালা তাকে তৈরী করতে বলবেন।

৩। ভাষামূলক অসঙ্গতি (Verbal Absurdities)

নীচের উক্তিগুলি একটির পর একটি অভীক্ষার্থীকে শোনান হল এবং প্রশ্ন করা হল "এর মধ্যে কোথায় বোকার মত কথা বা অসম্ভব ব্যাপার বলা হয়েছে ?"

(ক) আমি একটি সুসজ্জিত যুবককে হাত দুটো তার পকেটে পুরে একটি আনকোরা নতুন বেতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে যেতে দেখলাম !

(খ) বাবা ছেলেকে লিখছেন, "চিঠির মধ্যে দশটি টাকা পাঠালাম। যদি এই চিঠি না পাও তবে একটা টেলিগ্রাম কোরো।"

(গ) মার্চ করতে করতে একজন সৈনিক অভিযোগ করল যে সে ছাড়া সৈন্যদলের আর সকলেই ভুল পা ফেলছে।

(ঘ) একজন সহৃদয় লোক ঘোড়ায় করে এক বস্তা শস্য সহরে নিয়ে

যাচ্ছিল। ঘোড়ার ভার লাঘব করার জন্য সে নিজে ঘোড়ার পিঠে বসে নিজের কাঁধে বস্তাটা তুলে নিল।

(ঙ) এক ব্যক্তি তার বন্ধুকে বলল, "আমি কামনা করি যে তোমার কবরের মাটি আঁচড়ায় এমন মুরগীগুলি খাওয়া পর্যন্ত তুমি বেঁচে থাক।"

৪। অমূর্তধর্মী শব্দ (Abstract Word)

প্রশ্ন করা হল :—নীচের শব্দগুলির অর্থ কি ?

(ক) সম্পর্ক (খ) তুলনা করা (গ) জয় করা (ঘ) বাধ্যতা (ঙ) প্রতিহিংসা

৫। তিনটি বস্তুর মধ্যে মিল

প্রশ্ন করা হল :—

কোন্ দিক দিয়ে নীচের বস্তুগুলির মধ্যে মিল আছে ?

(ক) সাপ, গরু ও চড়াইপাখী

(খ) গোলাপ, আলু ও গাছ

(গ) পশম, তুলো ও চামড়া

(ঘ) ছুরির ফলা, পয়সা ও তারের টুকরো

(ঙ) বই, শিক্ষক ও খবরের কাগজ

৬। বাক্য মনে রাখা

বলা হল :—ভাল করে শুনে যা বললাম অবিকল তাই বল।

(ক) গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণাবাসে ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটতে যাবার জন্য ভোরে ওঠে।

(খ) সেতুর উপর দিয়ে যে পথটা গেছে তাই ধরে কাল আমরা আমাদের গাড়ী করে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

ব্যক্তিসত্তার পরিমাপ[১] (Measurement of Personality)

আধুনিককালে ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে নানা প্রকারের অভীক্ষা গঠন করা হয়েছে। এগুলির দ্বারা ব্যক্তিসত্তার সংলক্ষণের (Trait) প্রকৃতি ও মাত্রার পরিমাপ করা হয়ে থাকে। তাছাড়া আর এক

১। ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষাগুলির পূর্ণ বিবরণের জন্য দ্বিতীয় খণ্ডে 'ব্যক্তিসত্তা' শীর্ষক পরিচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য। পৃঃ২৮০—পৃঃ ২৯১।

ধরনের ব্যক্তিসত্তার অভীক্ষা আছে যেগুলির দ্বারা বিশেষ করে ব্যক্তির মনের অব্যক্ত দিকগুলির প্রকৃতি জানা যায়। সেগুলির নাম প্রতিফলনমূলক অভীক্ষা (Projective Test)[১]

২

মানসিক স্বাস্থ্যবিধি (Mental Hygiene)

দেহের যেমন স্বাস্থ্য আছে তেমনই মনেরও স্বাস্থ্য আছে। দেহের কোন যন্ত্রপাতি যদি ঠিকমত কাজ না করে তাহলে যেমন দেহের স্বাস্থ্য বিকল হয় তেমনই মনেরও কোন প্রক্রিয়া যদি কোন কারণে স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন না হয় তবে মনের স্বাস্থ্যও ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। মনের স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মকানুনের শাস্ত্রকেই মানসিক স্বাস্থ্যবিধি বলা হয়।

মানসিক স্বাস্থ্যবিধির প্রকৃতি

মনের কাজকে তখনই আমরা স্বাস্থ্যসম্মত ও স্বাভাবিক বলব যখন বাইরের বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতিবিধানের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। ব্যক্তিকে প্রতিনিয়তই নানা বিভিন্ন প্রকৃতির পারিবেশিক শক্তির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলতে হয়। এই খাপ খাইয়ে নেওয়ার সাফল্যের উপর নির্ভর করে ব্যক্তির সুষ্ঠু জীবনধারণ, প্রাক্ষোভিক তৃপ্তি, এমনকি তার অস্তিত্ব বজায় রাখা। যখন ব্যক্তি এই সঙ্গতিবিধানের কাজটি সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন করতে পারে না তখন নানা উপসর্গ দেখা দেয়। তার জীবনধারণ সঙ্কটাপন্ন হয়ে ওঠে, মানসিক শান্তি ও প্রাক্ষোভিক তৃপ্তি বিপন্ন হয়, ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির বিকাশ ব্যাহত হয় এবং গুরুতর ক্ষেত্রে তার অস্তিত্ব বজায় রাখাই শক্ত হয়ে উঠে। এই সুষ্ঠু এবং সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের অভাবেরই নাম দেওয়া হয়েছে অপসঙ্গতি (Maladjustment)। যখন ব্যক্তির জীবনে এই অপসঙ্গতি দেখা দেয় তখন তার মানসিক স্বাস্থ্য বিপন্ন হয়ে ওঠে।

অতএব মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health) বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তির দেহমনের সেই অবস্থা, যখন তার পক্ষে পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করা সম্ভব হয়ে ওঠে এবং তার ফলে তার ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন দিকগুলির সুষম বিকাশে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি হয় না। আর মানসিক স্বাস্থ্য-বিধি (Mental Hygiene) বলতে বুঝি সেই সব নিয়মকানুন ও সর্তাদি যা অনুসরণ করলে ব্যক্তির পক্ষে এই সঙ্গতিবিধানে কোনরূপ বিঘ্ন দেখা দেয় না এবং তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সুষমভাবে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্য

মানসিক স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্য হল ব্যক্তিকে যথাযথভাবে তার পরিবেশকে

বুঝতে এবং সেইভাবে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য করা। . ব্যক্তির মনের জটিল প্রক্রিয়াগুলিকে সহজ ও ঈপ্সিত পথে পরিচালিত করা এবং সমস্যা দেখা দিলে সেগুলির সমাধানের পথ নির্দেশ করাই হল মানসিক স্বাস্থ্যবিধির মুখ্য কাজ' এই কাজের দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্যবিধি কেবলমাত্র ব্যক্তির নিজস্ব তৃপ্তি ও শান্তিলাভের পথই প্রশস্ত করে না, ব্যক্তি যাতে সমাজের আর দশজনের সঙ্গে মিলে মিশে স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যময় সামাজিক জীবনযাপন করতে পারে তারও ব্যবস্থা করে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যক্তিকে বাইরের জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে শেখায় এবং তার আচরণকে যতটা সম্ভব কার্যকর, তৃপ্তিদায়ক, আনন্দময় ও সমাজ-অনুকূল করে তোলে। প্রকৃতিদত্ত সম্ভাবনাগুলিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করে এবং স্বল্পতম সংঘর্ষ ও বিক্ষোভ ভোগ করে যাতে ব্যক্তি নিজের এবং তার সমাজের চরমতম তৃপ্তি আনতে পারে মানসিক স্বাস্থ্যবিধির লক্ষ্যই হল তাই। মানসিক স্বাস্থ্যবিধির সহায়তায় ব্যক্তি আপত্তিকর ও অসামাজিক আচরণ থেকে বিরত থাকে এবং বিচারশক্তি, বিবেচনা ও প্রক্ষোভমূলক অনুভূতির দিক দিয়ে নিজের মানসিক সাম্য বজায় রাখতে পারে। এক কথায় মানসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যক্তিকে সব দিক দিয়ে অধিকতর পূর্ণ, সুখময়, সুষম ও কার্যকর জীবনযাপনে সাহায্য করে থাকে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিধির কর্মপরিধি

মানসিক স্বাস্থ্যবিধির কর্মপরিধি বেশ সুপ্রসারিত। ব্যক্তির সঙ্গে তার বাইরের জগতের সম্পর্কের প্রকৃতি ও সমস্যা নিয়ে পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা মানসিক স্বাস্থ্যবিধির প্রধান কাজ। ফলে ব্যক্তির জীবনের সমস্ত স্তরের দিকগুলির সঙ্গেই মানসিক স্বাস্থ্যবিধি অতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ব্যক্তির শৈশব থেকে সুরু করে তার ক্রমবিকাশের প্রতিটি স্তর ও সেগুলির বৈশিষ্ট্য, তার বাড়ী, স্কুল আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, প্রতিবেশী, কর্মস্থল, অবসর বিনোদনের আয়োজন এ সব পর্যবেক্ষণ করাই মানসিক স্বাস্থ্যবিধির কর্মসূচীর মধ্যে পড়ে। অর্থাৎ এক কথায় ব্যক্তি এবং তার সমগ্র পরিবেশই মানসিক স্বাস্থ্যবিধির কর্মপরিধির অন্তর্গত।

মানসিক স্বাস্থ্যবিধি ও শিক্ষা

শিক্ষার সঙ্গে মানসিক স্বাস্থ্যবিধির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শিক্ষাকে যদি

সার্থক ও কার্যকর করে তুলতে হয় তাহলে মানসিক স্বাস্থ্যবিধির নির্দেশগুলি যথাযথ মেনে চলা সর্বাগ্রে দরকার।

শিক্ষা এবং মানসিক স্বাস্থ্যবিধি উভয়েরই লক্ষ্য এক। উভয়েরই লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তির সুষম বিকাশসাধন করা যাতে সে সমাজে কার্যকর এবং সন্তোষজনক জীবন যাপন করতে পারে। প্রাচীন শিক্ষাবিদ্‌দের মতে শিক্ষা বলতে নিছক জ্ঞান অর্জনকে বোঝাত এবং শিক্ষার কার্যকারিতা নির্ভর করত কে কতটা জ্ঞান লাভ করল তার উপর। কিন্তু আধুনিককালে প্রকৃত শিক্ষা বলতে কেবলমাত্র কতকগুলি বিশেষ জ্ঞান বা কৌশলের আয়ত্তীকরণকে বোঝায় না, জীবনধারণের সমস্যাগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে সমাধান করতে পারে এমন মনোভাবের গঠনকে এবং সেই সঙ্গে সাধারণধর্মী তত্ত্বাবলীর আহরণকে বোঝায়। তাছাড়া আধুনিক মত অনুযায়ী শিক্ষা বা স্কুলের কাজ নিছক শিশুর জ্ঞানমূলক দিকেতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, তার প্রক্ষোভমূলক দিকটির সুষ্ঠু বিকাশের উপরও সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। কেননা, স্কুলে যে শিক্ষার্থী পড়তে আসে, সে তার সমগ্র সত্তা নিয়েই আসে। তার জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়াগুলিকে কোনভাবেই তার প্রক্ষোভ বা তার ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে পৃথক করা যেতে পারে না। আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে সেই জন্য নিছক জ্ঞান বা কৌশলের শিক্ষাদান ছাড়াও বহু বিভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা অর্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রথমত, কোন বিশেষ পাঠ্যবিষয়কে কেন্দ্র করে বা সাধারণভাবে স্কুলকে ঘিরে শিক্ষার্থীর মনে যে সব দুশ্চিন্তা জন্মায় তা তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয়ত, কোন পাঠ্য বিষয়ে প্রথম দিকে পড়া না পারলে যদি তাকে বকাবকি করা বা শাস্তি দেওয়া হয় তাহলে সেই বিষয়টি ঘিরে তার মধ্যে ভয়, ঘৃণা ইত্যাদি প্রতিকূল প্রক্ষোভ দেখা দেবে। তৃতীয়ত, স্কুল থেকে শিক্ষার্থীকে যে সব কাজ বাড়ীতে করতে দেওয়া হয় সেগুলি সম্বন্ধে বাড়ীতে থাকাকালীন তার মধ্যে যে সব দুশ্চিন্তা জন্মায় সেগুলিও বিশেষ করে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষুণ্ণ করে তোলে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে সাধারণ ছেলেমেয়েদের পাঠশিক্ষায় অসাফল্যের মূলে আছে এই তিনটি কারণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই তিনটি কারণ একসঙ্গেই বর্তমান থাকে।

যে সব ছেলেমেয়ে স্কুলে ভাল পড়াশোনা পারে না, তাদের মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে। তাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান গুরুতরভাবে

ক্ষুণ্ণ হয় এবং তাদের মধ্যে প্রবল হীনমন্যতা দেখা দেয়। তারা নিজেদের অপরের বিদ্রূপ ও অবহেলার পাত্র বলে মনে করে এবং কালক্রমে তাদের ব্যক্তিসত্তা দুর্বল ও ভীরু হয়ে গড়ে ওঠে। এই সব ছেলেমেয়ের যদি পাঠ্য-বিষয়গত অসামর্থ্য দূর করা যায় তবে তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরে আসবে এবং তাদের মানসিক স্বাস্থ্য সবল ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

মানসিক স্বাস্থ্য এবং গৃহ ও বিদ্যালয়

স্কুল যেমন শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে তেমনই করে তার গৃহ। গৃহ বলতে বোঝায় তার মা-বাবা-ভাই-বোন কিংবা যাদের সঙ্গে শিশু বাস করে তাদের নিয়ে গঠিত সমগ্র পরিবেশটিকে। গৃহেও শিশুকে নানা নতুন নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় এবং যদি শিশুর কোন ক্ষেত্রে সঙ্গতিবিধান ঠিকমত না হয় তাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। শিশুর প্রতি বাড়ীর সকলের মনোভাব ও আচরণই শিশুর মানসিক সংগঠনে সব চেয়ে বড় শক্তি। অতিরিক্ত আদর, উদাসীনতা, অবহেলা, শাসনধর্মী আবহাওয়া, স্থায়ী নীতি বা শৃঙ্খলার অভাব ইত্যাদি নানা কারণে শিশুর মানসিক সংগঠন স্বাস্থ্যময় হয়ে ওঠে না।

তেমনই বিদ্যালয় পরিবেশের নানা বিভিন্নধর্মী ও বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শিশু কেবলমাত্র জ্ঞান ও কৌশলই অর্জন করে না, তার প্রক্ষোভ-মূলক, সামাজিক ও নৈতিক দিকগুলিরও সমানভাবে পুষ্টিসাধন হয়। আধুনিক স্কুলের শিক্ষার পরিধি যখন এতই ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী, তখন শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী। এমন কি শিক্ষার্থীর মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার দায়িত্বও অনেকাংশে স্কুলের উপর পড়ে।

মানসিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের উপর। এদিক দিয়ে স্কুলের পরিবেশ শিশুর কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তার শিক্ষক, সহপাঠী, ব্যক্তিগত বন্ধু প্রভৃতিদের নিয়ে স্কুলের বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি তার কাছে নিত্যনতুন পরিবেশ সৃষ্টি করে। সেগুলি তার বিকাশোন্মুখ মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এবং কোন দিক দিয়ে যদি সেখানে সে সঙ্গতিবিধান করতে না পারে তাহলে তার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়। বলা বাহুল্য এই ধরনের অপসঙ্গতিসম্পন্ন (Maladjusted) ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ নানাদিক দিয়ে ব্যাহত হয়,

তারা প্রক্ষোভমূলক অতৃপ্তিতে ভোগে এবং ভবিষ্যতে সমাজের অনুপযোগী সদস্যরূপে বড় হয়ে ওঠে। সেই জন্য স্কুলের ব্যবস্থাপকদের থেকে সুরু করে প্রতিটি শিক্ষকের এদিক দিয়ে দায়িত্ব অপরিসীম। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ব্যক্তিগত আচরণ বা স্কুলের সাধারণ পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে গুরুতর ত্রুটির ফলে শিশুর মধ্যে প্রচুর অপসঙ্গতি দেখা দেয়। তার ফলেও শিশুর শিক্ষা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশ নানাভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে প্রায় সকল স্কুলেই এমন ছাত্রছাত্রী দেখা যায় যাদের উপযুক্ত মানসিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ পাঠ্যবিষয়ে প্রত্যাশিত ফল দেখাতে পারে না। বকাবকি, শাস্তির ভয়, বোঝান ইত্যাদি নানা পন্থা অবলম্বন করেও কোন ফল হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকেরা এগুলিকে অসম্ভব ক্ষেত্র বলে মনে করে হাল ছেড়ে দেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা হল মানসিক অসুস্থতার রোগী।

মনোবিজ্ঞানীদের দীর্ঘ অনুসন্ধান ও পরীক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে এই ধরনের বিষয়গত অসামর্থ্যের কারণ তিন রকমের হতে পারে। প্রথমত, অপরিবর্তনীয় পাঠক্রম, যা সকল ছাত্রছাত্রীর পক্ষে উপযোগী নয়। ফলে ক্লাশের কিছু ছেলেমেয়ে সব সময়েই পিছিয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত, বাড়ীর বয়স্কদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শিশুর মনে প্রতিফলিত হয় এবং তার মধ্যে অনুরূপ দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। ভাইবোন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে অনেক সময় শিশু নানা কারণে নিজেকে ঠিকমত খাপ খাইয়ে নিতে পারে না এবং তার মধ্যে দেখা দেয় দুশ্চিন্তা, ভয় হিংসা প্রভৃতি অবাঞ্ছিত প্রক্ষোভ। পিতামাতা অভিভাবকেরা শিশুর এই মানসিক দ্বন্দ্বের প্রকৃত কারণটি খুঁজে পান না এবং সেগুলিকে দূর করার জন্য নানা অবাস্তব উপায় অবলম্বন করেন। তার ফলে শিশুর অপসঙ্গতির মাত্রা আরও বেড়ে যায় এবং তার শিক্ষা, মানসিক স্থৈর্য ও প্রক্ষোভমূলক বিকাশ নানাভাবে ব্যাহত হয়। অতএব শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের উপর তার বাড়ীর প্রভাব তার স্কুলের প্রভাবের চেয়ে কোন অংশ কম নয়।

মানসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা কেবলমাত্র শিশুদেরই ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের জীবনের সমস্ত স্তরেই মানসিক স্থৈর্য ও সমতা অপরিহার্য এবং তা নির্ভর করে তার পরিপার্শ্বের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সন্তোষজনক সঙ্গতিবিধানের উপর। এইজন্য ব্যক্তি যাতে তার পরিবার, কর্মক্ষেত্র, বৃহত্তর সমাজ

প্রভৃতির সঙ্গে যথাযথ সঙ্গতিবিধান করতে পারে, তার জন্য আধুনিক মানসিক স্বাস্থ্যবিধিতে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মানসিক স্বাস্থ্যবিধির তিনটি দিক

মানসিক স্বাস্থ্যবিধির তিনটি দিক আছে। যথা, ১। সংরক্ষণমূলক (Conservative), ২। প্রতিরোধমূলক (Preventive) এবং ৩। প্রতিকার-মূলক (Curative)।

সংরক্ষণমূলক দিক

অধিকাংশ সাধারণ শিশু যেমন স্বাভাবিক স্বাস্থ্যসম্পন্ন দেহ নিয়ে জন্মায় তেমনই সে একটি স্বাস্থ্যবান্ মন নিয়েও জন্মায়। স্বাভাবিক পরিবেশে পড়লে এই মন স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে ওঠে। কিন্তু যখনই পরিবেশের মধ্যে অস্বাভাবিক শক্তির সৃষ্টি হয় তখনই মনের বিভিন্ন দিকগুলি সেই শক্তির সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না এবং শিশুর মনের মধ্যে নানা ব্যাধি দেখা দেয়। একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে অস্বাভাবিক ক্ষেত্র ছাড়া প্রত্যেক শিশুই তার পরিবেশের সঙ্গে মেলামেশা করতে, সমাজ-নির্দিষ্ট আচরণগুলি সম্পন্ন করতে, স্কুলে যেতে ও পড়াশুনা করতে যথেষ্ট স্বাভাবিক আগ্রহ বোধ করে থাকে, কিন্তু নানা অস্বাভাবিক ঘটনার চাপে তার মধ্যে অসামাজিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, পড়াশোনায় অমনোযোগ ও অন্যান্য সমস্যা দেখা দেয়। অতএব শিশুর এই সহজাত মানসিক সংগঠনটি যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে এবং প্রতিকূল পরি-বেশের চাপে যাতে সেটি বিকৃত না হয়ে ওঠে সেটা দেখাই মানসিক স্বাস্থ্যবিধির প্রথম কাজ। এর জন্য প্রয়োজন বাড়ী, স্কুল, খেলার মাঠ এক কথায় শিশুর সমগ্র পরিবেশের বিভিন্ন শক্তিগুলি যাতে প্রতিকূল না হয়ে ওঠে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া। বাড়ীতে শিশুর প্রতি বয়স্কদের মনোভাব ও আচরণ, স্কুলে ক্লাশের সংগঠন, শিক্ষণপদ্ধতি, শিক্ষকশিক্ষার্থীর সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়গুলির প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়াটাই হল মানসিক স্বাস্থ্যবিধির সংরক্ষণমূলক কর্মসূচীর অন্তর্গত।

প্রতিরোধমূলক দিক

সংরক্ষণমূলক দিকটি হল সামগ্রিক প্রকৃতির। এতে ব্যক্তিগত সমস্যা বা চাহিদার প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয় না, কেবল সমষ্টিমূলকভাবে মানসিক স্বাস্থ্য সংরক্ষণের বিধিনিষেধগুলি পালন করা হয়। কিন্তু প্রতিরোধমূলক দিকটিতে ব্যক্তির নিজস্ব চাহিদা, সমস্যা ও বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হয় এবং সেগুলির উপযোগী

ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। বিশেষ করে যাদের মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হবার সম্ভাবনা দেখা দেয় তাদের ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি অনুধাবন করা এবং সেগুলিকে প্রতিরোধ করার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বন করাই হল প্রতিরোধ-মূলক দিকটির প্রধান কাজ। মানসিক স্বাস্থ্য সত্যকারের বিপন্ন হবার আগেই তার কারণটি খুঁজে বার করে সেটিকে দূর করার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। উদাহরণস্বরূপ, দেখা যাচ্ছে যে একটি ছেলে মাঝে মাঝে স্কুল পালায়। তার এই আচরণটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে একটি স্থায়ী মানসিক ব্যাধি রূপে দাঁড়াবার আগেই যদি তার এই আচরণটির কারণ খুঁজে বার করা যায় এবং সেটিকে দূর করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে ছেলেটিকে একটি মানসিক ব্যাধি থেকে রক্ষা করা হবে।

প্রতিকারমূলক দিক (Curative Aspect)

প্রতিরোধমূলক দিকের পরেই আসে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা। উপযুক্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার অভাব হলে অনেক সময় ব্যক্তির মানসিক সংগঠনে এমন ত্রুটি দেখা যায় যা সাধারণ উপায়ে দূর করা সম্ভব হয় না। তখন তার জন্য বিশেষ প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতেই হয়। শিক্ষকদের এই সময়ে যথেষ্ট বিবেচনা ও সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হয়। কেননা শিক্ষার্থীর মানসিক ব্যাধির গুরুত্বের উপর নির্ভর করছে যে শিক্ষক নিজেই তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী তার ব্যবস্থা করবেন, না বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেবেন। যদি শিক্ষার্থীর রোগ তেমন গুরুতর না হয় তাহলে শিক্ষক তাঁর নিজের বিবেচনা অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারেন। কিন্তু যদি ব্যাধি জটিল আকার ধারণ করে থাকে তাহলে শিক্ষকের নিজের পক্ষে কোন কিছু করা মোটেই সঙ্গত নয়। তখন তাঁর উচিত অবিলম্বে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেওয়া। জটিল মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য উন্নত জ্ঞান ও বিশেষধর্মী পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজন এবং সেটা সাধারণ শিক্ষক বা পিতামাতার কাছ থেকে আশা করা যায় না। অসাবধানতা বা অজ্ঞতাবশত যদি ভুল পন্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে শিশুর মানসিক ব্যাধিকে বাড়িয়েই দেওয়া হবে এবং শেষ পর্যন্ত বিপর্যয় ডেকে আনা হবে।

অপসঙ্গতির ক্রমবিকাশ (Development of Maladjustment)

মানুষমাত্রেই জন্মায় কতকগুলি চাহিদা নিয়ে। সেগুলির নাম দেওয়া হয়েছে জৈবিক চাহিদা (Organic Needs)। যেমন,—অক্সিজেন, উত্তাপ,

খাদ্য, জল, ঘুম প্রভৃতির চাহিদা। এগুলি তৃপ্ত না হলে ব্যক্তির দেহগত অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে ওঠে এবং তার পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব হয় না।

জৈবিক চাহিদার চেয়ে অনেক শক্তিশালী এবং সংখ্যাতেও অনেক বেশী হল মানসিক বা মনোবিজ্ঞানমূলক চাহিদা। এগুলির মধ্যে কতকগুলি চাহিদা ব্যক্তির নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রয়োজনের উপর প্রতিষ্ঠিত, আবার কতকগুলি হল তার সুষ্ঠু সামাজিক জীবনযাপনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। ব্যক্তির বিভিন্ন নিজস্ব চাহিদার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নিরাপত্তার চাহিদা, কৌতূহল তৃপ্তির চাহিদা, সক্রিয়তার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা, আত্মতৃপ্তির চাহিদা ইত্যাদি। এই চাহিদাগুলির তৃপ্তির উপর নির্ভর করছে ব্যক্তির নিজস্ব প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিবিধান ও ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ। মানসিক চাহিদার দ্বিতীয় পর্যায়ে পড়ে ব্যক্তির সামাজিক চাহিদাগুলি। যেমন, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, ভালবাসার চাহিদা, সঙ্গলাভের চাহিদা ইত্যাদি। ব্যক্তির সুষ্ঠু সমাজজীবন যাপনের জন্য এই চাহিদাগুলির তৃপ্তি অপরিহার্য।

ব্যক্তির এই বিভিন্ন প্রকৃতির চাহিদাগুলি যদি যথাযথ তৃপ্ত হয় তবেই তার মানসিক সংগঠনের বিকাশ বাঞ্ছিত পথে অগ্রসর হবে এবং তার ব্যক্তিসত্তার সুষম পরিণতিতে কোন বাধার সৃষ্টি হবে না। এক কথায় সে তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধান করতে সমর্থ হবে। কিন্তু যদি কোন কারণে তার কোন চাহিদার তৃপ্ত না হয় তাহলে তার মধ্যে দেখা দেবে প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি এবং মানসিক দ্বন্দ্ব। সেই প্রক্ষোভমূলক অসঙ্গতি এবং মানসিক দ্বন্দ্ব ব্যক্তির বাহ্যিক আচরণকে প্রভাবিত করবে এবং তার ফলে সে নানা অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক আচরণ করবে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে অপসঙ্গতি (Maladjustment)। অতএব সাধারণভাবে বলা চলতে পারে যে অপসঙ্গতি মাত্রেরই কারণ হল ব্যক্তির কোন চাহিদার তৃপ্তি না হওয়া। অবশ্য ব্যক্তির কোন চাহিদার তৃপ্তি না হলেই যে সকল সময়েই অপসঙ্গতি দেখা দেবে তা নয়। এমন বহু চাহিদা আমাদের আছে যা অনেক সময়েই অতৃপ্ত থেকে যায়। অথচ সব সময়েই তার জন্য অপসঙ্গতি দেখা দেয় না বা আমরা অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর আচরণ সম্পন্ন করি না।

চাহিদার বিভিন্ন পরিণতি

ব্যক্তির মধ্যে যখন কোন বিশেষ চাহিদা দেখা দেয় তখন সেই চাহিদাটির পরিণতি বিভিন্ন রূপ নিতে পারে।

প্রথমত, চাহিদাটি পূর্ণভাবে তৃপ্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি পূর্ণ-

প্রক্ষোভমূলক তৃপ্তি লাভ করে। ফলে তার মানসিক সমতা অক্ষুণ্ণ থাকে এবং তার মধ্যে কোনরকম অপসঙ্গতি দেখা দেয় না। মানসিক স্বাস্থ্যবিধির দিক দিয়ে এটি মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা।

দ্বিতীয়ত, চাহিদাটি একেবারেই তৃপ্ত না হতে পারে। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির মধ্যে গুরুতর প্রাক্ষোভিক বিক্ষোভ দেখা দিতে পারে এবং তার ফলে ব্যক্তির মানসিক সমতার মধ্যে বিপর্যয় আসতে পারে এবং সে নানা অবাঞ্ছিত ও ক্ষতিকর আচরণে লিপ্ত হতে পারে। অবশ্য চাহিদাটি যদি গুরুতর না হয় তাহলে ব্যক্তির এই মানসিক দ্বন্দ্ব স্বল্পস্থায়ী হয় এবং কিছুদিন পরে সে আবার তার মানসিক স্বাস্থ্য ফিরে পেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত ব্যক্তি তার ব্যর্থতা বা অতৃপ্তিকে ভুলে গেলেও চাহিদাটি তার অচেতন মনে অবদমিত হয়ে বাস করে এবং সুযোগ পেলেই তার বাহ্যিক আচরণকে তার অজ্ঞাতসারেই নানাভাবে প্রভাবিত করে। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রকাশ্য আচরণ দেখে তার মধ্যে কোন অপসঙ্গতি খুঁজে না পাওয়া গেলেও তার মনের গভীর তলদেশে গুরুতর অপসঙ্গতি বিস্ফোরকের শক্তি নিয়ে সুপ্ত হয়ে থাকে। এই অপসঙ্গতি এক দিকে যেমন তার মনে প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে তেমনই সুযোগ পেলে তার বাহ্যিক আচরণকে বিপথগামী করে তোলে।

তৃতীয়ত, এই দুটি চরম সম্ভাবনার পরিবর্তে চাহিদাটির আংশিক পরিতৃপ্তি ঘটতে পারে। ব্যক্তি যদি তার এই আংশিক পরিতৃপ্তিকে মেনে নেয় তাহলে তার মধ্যে বিশেষ অপসঙ্গতি দেখা দেয় না। কিন্তু যদি সে তা না করে তাহলে তার চাহিদাটির বাকিটুকুর তৃপ্তির জন্য তার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। তবে বলা বাহুল্য পূর্ণ অতৃপ্তির চেয়ে আংশিক অতৃপ্তির ক্ষেত্রে অপসঙ্গতির মাত্রা অনেক কম।

অতএব দেখা যাচ্ছে অপসঙ্গতি নির্ভর করছে ব্যক্তির চাহিদার অতৃপ্তির উপর এবং অতৃপ্তি হলে কি পরিমাণ অতৃপ্তি হল তার উপর। চাহিদাটি ব্যক্তির কাছে কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তার অতৃপ্তি তার মধ্যে কতটা প্রাক্ষোভিক বিপর্যয় আনবে এই দুটি ব্যাপারের দ্বারাই অপসঙ্গতির প্রকৃতি ও মাত্রা নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূরক আচরণ
(Substituted Goal and Compensatory Behaviour)

ব্যক্তির মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিলে তা তার মনের মধ্যে প্রাক্ষোভিক বিপর্যয় ও অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে এবং বাইরে বিশেষ এক ধরনের আচরণের আ

নেয়। এই আচরণকে আমরা পরিপূরক আচরণ নাম দিতে পারি। চাহিদাটি তৃপ্ত না হওয়ার ফলে ব্যক্তি যে ঈপ্সীত মানসিক তৃপ্তি থেকে বঞ্চিত হল সেই মানসিক তৃপ্তি পেতে সে চেষ্টা করে অন্য এক ধরনের আচরণ সম্পন্ন করে। সেই বিশেষ আচরণটি যদিও তার পূর্বের প্রকৃত লক্ষ্যে বা উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে যেতে পারে না এবং অনেক সময় তাকে সম্পূর্ণ বিপরীত পথে নিয়ে যায়। তবু যে মানসিক তৃপ্তি সে তার প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছলে পেত, সেই তৃপ্তিই সে পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে এই নতুন বা পরিবর্তিত লক্ষ্যে পৌছানর মধ্যে দিয়ে লাভ করে। অর্থাৎ সে তার প্রকৃত লক্ষ্যের স্থানে আর একটি নতুন বা বিকল্প লক্ষ্য (Substituted Goal) স্থাপন করে এবং এই বিকল্প লক্ষ্যে পৌছানর প্রচেষ্টার দ্বারা প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছানর অক্ষমতাকে পূরণ করে।

অতএব অপসঙ্গতির কোন ক্ষেত্র বিশ্লেষণ করলে আমরা তিনটি স্তর পাই। যথা, (ক) ব্যক্তির প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছানর পূর্ণ বা আংশিক অক্ষমতা। এই অক্ষমতার কারণ ব্যক্তির নিজস্ব অসামর্থ্য হতে পারে, আবার পারিবেশিক শক্তির প্রতিকূলতাও হতে পারে। (খ) প্রকৃত লক্ষ্যের স্থানে একটি বিকল্প লক্ষ্য স্থাপন। (গ) সেই বিকল্প লক্ষ্যে পৌছানর জন্য বিশেষ কোনও পরিপূরক আচরণ (Compensatory Behaviour) সম্পাদন। এদিক দিয়ে অপসঙ্গতি-মূলক আচরণ মাত্রেই হচ্ছে কোন বঞ্চিত তৃপ্তি অন্য পথে পাবার প্রচেষ্টা এবং অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বলতে সেই উদ্দেশ্যসম্পন্ন পরিপূরক আচরণকেই বোঝায়।

উদাহরণস্বরূপ, একটি ছেলে ক্লাশে ভাল ফল করে সকলের কাছে তার কৃতিত্বের স্বীকৃতি পেতে চায়। এখানে সকলের কাছে নিজের স্বীকৃতি বা পরিচিতি লাভের ইচ্ছাই হল তার চাহিদা। গতানুগতিক বিদ্যালয়ে এই চাহিদাটির তৃপ্তি হতে পারে একমাত্র পরীক্ষায় ভাল ফল দেখালে বা প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি স্থান অধিকার করলে। অতএব ছেলেটির প্রকৃত লক্ষ্য হল পরীক্ষায় ভাল ফল দেখান। এখন মনে করা যাক ছেলেটি তার সামর্থ্যের অভাবের জন্য পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাতে পারল না, ফলে তার পরিচিতি লাভের চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে গেল। তখন সে পরীক্ষায় ভাল ফল দেখিয়ে আত্মস্বীকৃতি লাভের পরিবর্তে তার চেয়ে কম বয়সী ছেলেদের উপর অত্যাচার করা, উৎপীড়ন করা, সহপাঠীদের বই খাতা চুরি করা প্রভৃতি অন্যান্য উপায়ে নিজের বঞ্চিত আত্মতৃপ্তি লাভের চেষ্টা করতে লাগল। অর্থাৎ সে তার চাহিদার প্রকৃত লক্ষ্যের পরিবর্তে একটি বিকল্প লক্ষ্য স্থাপন করল এবং সেই লক্ষ্যে

পৌঁছানর জন্য অত্যাচার, উৎপীড়ন, চুরি ইত্যাদি পরিপূরক আচরণ সম্পন্ন করতে সুরু করল। অর্থাৎ এক কথায় ছেলেটির মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিল।

বিকল্প লক্ষ্য এবং এই পরিপূরক আচরণ যে সব সময়েই অবাঞ্ছিত এবং অসামাজিক রূপ নেবে তার কোন অর্থ নেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে প্রকৃত লক্ষ্যের পরিবর্তে ব্যক্তি যে সব বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূরক আচরণ গ্রহণ করে সেগুলি সমাজের দিক দিয়ে বাঞ্ছিত প্রকৃতির এবং ব্যক্তির পক্ষেও মঙ্গলকর। যেমন, উপরের দৃষ্টান্তের ছেলেটি লেখাপড়ায় ভাল ফল দেখাতে না পেরে খেলাধূলা, অঙ্কন, সঙ্গীত বা অভিনয় ইত্যাদির কোন একটিতে পারদর্শিতা দেখিয়ে দশজনের কাছ থেকে তার কাম্য স্বীকৃতি আদায় করল। এখানে তার বিকল্প লক্ষ্য ও পরিপূরক আচরণ দুইই কাম্য ও মঙ্গলপ্রসূ হয়ে দাঁড়াল। তত্ত্বের দিক দিয়ে যদিও এও এক ধরনের অপসঙ্গতি তবু আমরা একে অপসঙ্গতি বলব না। কেবলমাত্র সেই সব পরিপূরক আচরণকেই আমরা অপসঙ্গতির পর্যায়ে ফেলব যেগুলি সমাজ-অনুমোদিত নয় কিংবা যেগুলি ব্যক্তির নিজের পক্ষে ক্ষতিকর। আবার ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর বলতে আমরা সেইসব আচরণ-গুলিকে ধরব যেগুলি ব্যক্তির মনের দ্বন্দ্বের স্থায়ী মীমাংসা আনতে পারে না এবং তার মানসিক স্বাস্থ্যকে ক্ষুন্ন করে তোলে। সাধারণত অপসঙ্গতিমূলক আচরণগুলি সাময়িকভাবে এবং আংশিকভাবে ব্যক্তির চাহিদার তৃপ্তি আনতে সক্ষম হলেও তার মনের স্থায়ী শান্তি বা সমতা আনতে সক্ষম হয় না।

চাহিদামাত্রেরই অতৃপ্তি কিন্তু অপসঙ্গতির সৃষ্টি করে না। এমন অনেক চাহিদা আছে যেগুলির অতৃপ্তি মানসিক দ্বন্দ্ব ও প্রক্ষোভমূলক বিক্ষোভের সৃষ্টি করে বটে কিন্তু সেগুলি নিতান্তই সাময়িক ধরনের এবং ব্যক্তির মনে কোন স্থায়ী প্রভাব রেখে যায় না। তবে এমন বিশেষ কতকগুলি চাহিদা আছে যেগুলির প্রভাব প্রায় সকল মানুষের উপরই বেশ উল্লেখযোগ্য এবং সেগুলির অতৃপ্তি ব্যক্তির মনের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করে এবং তার মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি ঘটায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সুসঙ্গতির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। বিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে ছেলেমেয়েরা কৈশোর পার হয়ে যৌবনের তোরণদ্বারে প্রবেশ করে। এই সময়ে তাদের মধ্যে কতকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার সৃষ্টি হয়। এই সব চাহিদা যদি যথাযথভাবে তৃপ্ত না হয় তাহলে প্রাপ্তযৌবনদের জীবনে গুরুতর প্রতিবন্ধক দেখা দেয় এবং তাদের শিক্ষা, প্রাক্ষোভিক সংগঠন, ব্যক্তিসত্তার সুষ্ঠু বিকাশ সবই বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে।

অপসঙ্গতির কারণাবলী (Causes of Maladjustment)

অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির মধ্যে নানা কারণে অপসঙ্গতি ঘটতে পারে। মনোবিজ্ঞানীরা সেগুলির মধ্যে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে অপসঙ্গতির প্রধান কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। এই কারণগুলির যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করার জন্য সযত্ন মনঃসমীক্ষণমূলক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ অপরিহার্য হয়ে ওঠে। অপসঙ্গতির কয়েকটি প্রধান কারণের বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

১। নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি (Sense of Insecurity)

(নিরাপত্তার অভাববোধ অপসঙ্গতির একটি বড় কারণ। এই অনুভূতিটি দেখা দেয় যখন ব্যক্তি নিজেকে সকলের কাছে অবাঞ্ছিত বা পরিত্যক্ত বলে মনে করে এবং তার মধ্যে এই ধারণা হয় যে তার পরিবেশের শক্তিগুলি তার নিরাপত্তা এবং মঙ্গলকে বিপন্ন করে তুলেছে) এইরকম মনোভাবের দ্বারা পীড়িত ব্যক্তি স্কুল, কলেজ, কর্মক্ষেত্র সর্বত্রই দেখা যায়। (এই ধরনের ব্যক্তিরা সব সময়েই সঙ্কুচিত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকে এবং নতুন কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে ভয় পায়) স্কুলে এই ধরনের ছেলেমেয়েরা ক্লাশে পড়া বলতে ইতস্তত করে এবং সব সময়ই অপরের বিদ্রূপ বা নিন্দার ভয়ে নিজে থেকে কিছু করতে সাহস করে না। (অতি শৈশবে সাধারণত এই নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি বেশী মাত্রায় থাকে) অবশ্য যে সব পিতামাতা শিশুর চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং সেগুলির যথাযথ পরিতুষ্টির ব্যবস্থা করেন তাঁদের ছেলেমেয়েরা নিজেদের পরিত্যক্ত বা অবহেলিত বলে মনে করে না এবং তাদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার বোধ জন্মায় না। (কিন্তু যেখানে পিতামাতা এবং বয়স্করা শিশুর প্রতি প্রতিকূল বা বৈষম্যমূলক আচরণ করেন সেখানে শিশু নিজেকে পরিত্যক্ত এবং অবাঞ্ছিত বলে মনে করে। তার ফলে তার মধ্যে গুরুতর অপসঙ্গতি দেখা দেয় এবং তার মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে।)

(স্কুলে নানা কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ দেখা দেয়) সেগুলির মধ্যে বিশেষ কয়েকটির নাম করা যেতে পারে। যেমন—কঠিন কাজের চাপ, কড় মন্তব্য, কঠোর বা নিষ্ঠুর শাস্তিদান, সহানুভূতির অভাব, অবহেলা, বিদ্রূপ ইত্যাদি। (এছাড়াও পিতামাতাদের নিজেদের মধ্যে কলহ, জাতিগত বা ধর্মগত কারণ, বৃহত্তর সমাজ কর্তৃক প্রত্যাখ্যান প্রভৃতি কারণেও শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার অভাববোধ জাগে)

/ নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতিকে দূর করতে হলে এই অনুভূতির মৌলিক

কারণটি খুঁজে বার করতে হবে। স্কুলে বাড়ীতে উভয় স্থানেই এর চিকিৎসার আয়োজন করতে হবে। শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে সে সত্য সত্য অবহেলিত বা অবাঞ্ছিত নয় এবং তার কাজের যথাযোগ্য সমাদর যাতে সে পায় তা দেখতে হবে। বিদ্রূপ, শ্লেষোক্তি, লজ্জা দেওয়া, ব্যক্তিগত সমালোচনা ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে অতি সতর্কতার সঙ্গে বর্জন করতে হবে। তার নিরুদ্ধ প্রক্ষোভ যাতে মুক্তি পায় তার পর্যাপ্ত সুযোগ তাকে দিতে হবে। খেলাধূলা, আঁকা, লেখা, নতুন নতুন জিনিষ তৈরী করা, বেড়ানো ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তার নিরাপত্তাহীনতার বোধকে যোগ্যতা ও আত্মবিশ্বাসের বোধে রূপান্তরিত করতে হবে।

১। আক্রমণমূলক মনোভাব (Sense of Hostility)

অপসঙ্গতির আর একটি কারণ হল আক্রমণমূলক অনুভূতি। দেখা গেছে যে ব্যক্তির মধ্যে নানা কারণে বিভিন্ন প্রকৃতির আক্রমণাত্মক মনোভাব জন্মলাভ করে এবং তার ফলে তার আচরণের মধ্যে প্রচুর বৈষম্য দেখা দেয়। তার এই আক্রমণাত্মক মনোভাব যে অন্যায় সে সম্বন্ধে ব্যক্তি যথেষ্ট সচেতন থাকে এবং যাতে তার এই মনোভাব তার আচরণে প্রকাশ না পায় সে সম্বন্ধে সে সচেষ্টও হয়। তার ফলে তার মধ্যে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বের দ্বারা তার বাহ্যিক আচরণ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। কারেন হর্নির (Karen Horney) পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে মনোবিজ্ঞানমূলক দুশ্চিন্তা অনেক ক্ষেত্রে এই আক্রমণাত্মক অনুভূতি থেকে জন্ম লাভ করে থাকে।

ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই আক্রমণাত্মক মনোভাব নানা আচরণের রূপ নিয়ে দেখা দেয়। ছোট ভাইবোনদের বা ক্লাশের অপেক্ষাকৃত দুর্বল ছেলেমেয়েদের আঘাত করা বা উত্যক্ত করা এই মনোভাবের একটি সাধারণ অভিব্যক্তি। যাদের মধ্যে এই মনোভাব খুব বেশী তাদের প্রায়ই সমবয়সীদের সঙ্গে ঝগড়া, মারামারি করতে দেখা যায়। পশুপাখীদের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করাটাও অনেক সময় এই মনোভাব থেকেই জন্মায়। উৎপীড়ক এ সব ক্ষেত্রে জানে যে পশুপাখীরা নিতান্তই অসহায় এবং তারা কোনরূপ প্রতিশোধ নিতে পারবে না। অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে জড় বস্তুর প্রতিও আক্রমণমূলক মনোভাব দেখা দিয়ে থাকে। ডেস্কে নাম লেখা বা খোদাই করা, জানালা দরজা ভাঙা, চেয়ারের গদি ছুরি দিয়ে কাটা, স্কুল, লাইব্রেরী বা সভাগৃহের সম্পত্তি বিনষ্ট করা প্রভৃতি ধ্বংসমূলক আচরণগুলি এই আক্রমণমূলক মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ।

শিশুর মধ্যে আক্রমণমূলক অনুভূতি জন্মাবার প্রধানতম কারণ হল তার

প্রতি তার পিতামাতা প্রভৃতির বৈষম্যমূলক আচরণ। যে সব পিতামাতা নিজেরাই মানসিক বিপর্যয়ে ভোগেন বা সে সব পিতামাতার নিজেদের মধ্যেই নিরাপত্তাবোধের অভাব থাকে তাঁরা তাঁদের শিশুদের মধ্যে এই অতি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার মনোভাবটি কখনই সৃষ্টি করতে পারেন না এবং তার ফলে স্বভাবতই তাঁদের ছেলেমেয়েরা আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে।

যে সব পিতামাতা স্বার্থপর, সঙ্কীর্ণচেতা, পক্ষপাতপূর্ণ এবং ছেলেমেয়েদের আন্তরিকভাবে ভালবাসতে জানেন না, তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এই আক্রমণমূলক মনোভাব তীব্রভাবে জেগে থাকে। কোন বিশেষ ছেলে বা মেয়েকে অন্যান্য ছেলেমেয়েদের চেয়ে বেশী ভালবাসলে অবহেলিত শিশুর মনে প্রায়ই আক্রমণমূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় দেখা যায় যে ছেলেমেয়েদের প্রতি পিতামাতার আচরণ কখনও খুব কঠোর কখনও খুব নরম অর্থাৎ তাদের আচরণের মধ্যে কোন রকম সামঞ্জস্য বা সংহতি নেই। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এই ধরনের সামঞ্জস্যহীন বৈষম্যধর্মী আচরণের ফল নিছক কঠোর বা অন্যান্য আচরণের চেয়েও অনেক বেশী ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এ ছাড়া শিশুদের বন্ধু নির্বাচনে বাধাদান, তাদের কোন কাজকে বিদ্রূপ করা, তাদের আচরণ বা লক্ষ্যের সমালোচনা করা ইত্যাদি আচরণগুলিও তাদের মধ্যে এই ধরনের বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলে।

শিশুদের মধ্যে থেকে এই আক্রমণমূলক মনোভাব দূর করার সবচেয়ে প্রশস্ত পন্থা হল তাঁদের মনের নিরুদ্ধ প্রক্ষোভকে সহজ ও স্বাভাবিক পথে অভিব্যক্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া। অবশ্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন হল শিশুর মধ্যে যে পরিত্যক্ততার মনোভাব জেগেছে সে মনোভাবটিকে দূর করা এবং আন্তরিক ভালবাসা ও সহানুভূতির দ্বারা তাকে আপন করে নেওয়া। শিশুকে তার কাজের প্রাপ্য প্রশংসা দান করে এবং তাকে কাজে উৎসাহিত করে তার আত্মবিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনতে পারলে তার এই আক্রমণমূলক মনোভাব নিজে নিজেই চলে যাবে। সব শেষে তাকে স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার সুযোগ দিতে হবে এবং যতটা সম্ভব তার কাজে বাধা না দেওয়া হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। যেমন, তার নিজের বন্ধু-নির্বাচন, কোন বিশেষ কাজে মনোযোগ দান, কোন বিশেষ রুচির অনুসরণ ইত্যাদি ব্যাপারেও যতটা সম্ভব স্বাধীনতা তাকে দিতে হবে।

৩। অপরাধের অনুভূতি (Sense of Guilt)

অপসঙ্গতির আর একটি বড় কারণ হল অপরাধের অনুভূতি। ব্যক্তি অনেক সময় তার আচরণের জন্য নিজেকে অপরাধী বা দোষী বলে মনে করে

এবং তার জন্য সর্বদা সন্ত্রস্ত ও সঙ্কুচিত হয়ে থাকে। এর মূলে আছে ব্যক্তির নিজের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে নিকৃষ্টতার ধারণা। অতি সাধারণ ও নির্দোষ কাজের ক্ষেত্রেও এই সব ব্যক্তিরা নিজেদের অপরাধী বলে মনে করে এবং এক ধরনের বিবেকের দংশন অনুভব করে থাকে। তারা সব সময়েই মনে মনে এই ভেবে ভীত বা সঙ্কুচিত হয়ে থাকে যে এই বুঝি তাদের আচরণে অপরে অসন্তুষ্ট বা অপমানিত হল।)

(ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই অপরাধের বোধ নানা ভাবে অভিব্যক্ত হয়। আত্মগ্লানি বা আত্মনিন্দা এই অনুভূতির একটি প্রধান রূপ। এই মনোভাব-সম্পন্ন ছেলেমেয়েরা মনে করে এবং অনেক সময় মুখেও প্রকাশ করে যে তারা কোন একটা অন্যায় অপরাধ বা পাপ কাজ করছে) অনেক সময় আবার প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তারা সেই অপরাধের জন্য নিজেদেরই শাস্তি দেয় এবং সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্য আরাম আনন্দ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করে রাখে। (আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তারা তাদের এই অপরাধবোধ অপরের উপর প্রতিফলিত করে এবং নিজেদের দোষত্রুটির জন্য অপরকে দোষী বা দায়ী করে) একে মনোবিজ্ঞানে প্রতিফলন বলে।

(অপরাধবোধের সব চেয়ে বড় কারণ হল নিজের সম্বন্ধে নিম্নতাবোধ। সাধারণত বয়স্কদের তীব্র সমালোচনা, নিন্দা, বিদ্রূপ, ভাল ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তুলনা ইত্যাদি থেকেই শিশুদের মধ্যে অপরাধবোধ জন্মায়। তাছাড়া শিশু অনেক সময় কোন একটা দুর্ঘটনা বা অন্যায় কাজ হঠাৎ করে ফেলার পর থেকে যদি তাকে সব সময়ে সেই কাজের জন্য দোষী করে যাওয়া হয় তাহলেও তার মধ্যে অপরাধবোধের সৃষ্টি হয়।)

(আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে পিতামাতার ক্ষেত্রে দুটি ভ্রমাত্মক আচরণ শিশুদের মধ্যে প্রায়ই অপরাধবোধ সৃষ্টি করে থাকে। প্রথমটি হল তাদের যৌনঘটিত জ্ঞান অর্জনে বাধা দেওয়া। আর দ্বিতীয়টি হল তাদের ধর্মীয় অনুশাসনগুলি মানতে বাধ্য করা।) শিশুদের মধ্যে যৌন সচেতনতা জাগার সময় থেকে তাদের মধ্যে নিজেদের দেহের যৌনাঙ্গগুলি পর্যবেক্ষণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। এই সময় যদি তাদের বকাবকি, মারধোর বা লজ্জা দেওয়া যায় তাহলে তাদের মধ্যে ঐ ইচ্ছা আরও প্রবল কৌতূহলের আকার নিয়ে দেখা দেয়। ফলে তারা ঐ কাজগুলি গোপনে সম্পন্ন করতে সুরু করে এবং তাই থেকে তাদের মধ্যে তীব্র অপরাধের অনুভূতি জাগে। যৌবনপ্রাপ্তির সময় থেকে এই সব যৌন প্রবণতা স্বাভাবিকভাবেই বাড়তে থাকে। কিন্তু

আমাদের সাধারণ সমাজে যৌন প্রবণতা এবং যৌন আচরণকে এতই মন্দ ও দুর্নীতিমূলক বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে যে প্রাপ্তযৌবনের মনে অতি তীব্র মাত্রায় অপরাধবোধ সৃষ্ট হয় এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে ওঠে।

ছেলেমেয়েদের মনে অপরাধবোধ সৃষ্টির আর একটি বড় কারণ হল তাদের কাছে ধর্মসম্বন্ধীয় অনুশাসনগুলি উপস্থাপিত করা। এই সব অনুশাসন মূলত অপরাধ ও পাপ সম্বন্ধে সচেতনতা এবং তার জন্য শাস্তি ও প্রায়শ্চিত্তের ভীতি-প্রদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য এগুলি ছেলেমেয়েদের মনে সুতীব্র অপরাধবোধ, ভীতি, দুশ্চিন্তা, আত্মগ্লানি প্রভৃতি জাগিয়ে তোলে এবং তাদের ব্যক্তিসত্তার ভিত্তিকে দুর্বল করে তোলে।

অপরাধবোধ হল জটিল অপসঙ্গতির একটি উদাহরণ। সাধারণ প্রচেষ্টায় একে দূর করা যায় না এবং অধিকাংশক্ষেত্রেই অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকদের (Psychiatrist) সাহায্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। শিশুর মন থেকে অপরাধ-বোধ দূর করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন শিশুর আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা এবং তার অহংসত্তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে দেওয়া। তার জন্য শিশুর স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিসত্তার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হবে, তার উদ্দেশ্য, মতামত ও কাজের প্রতি সমর্থন জানাতে হবে এবং তাকে বুঝতে দিতে হবে যে সেও আর দশজনের মত স্বাভাবিক ও সহজ একজন মানুষ। নিজের যৌনাঙ্গ পর্যবেক্ষণ শিশুদের ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং যথাসময়ে এ অভ্যাসটি চলে যায়। অতএব এ ব্যাপারটিকে অনর্থক অতিরঞ্জিত করে শিশুদের মধ্যে ভুল ধারণা ও অপরাধবোধ সৃষ্টি না করা উচিত। ধর্মমূলক শিক্ষা সম্বন্ধেও সেই একই কথা। ধর্মের নামে অনর্থক ভীতি প্রদর্শন করে শিশুর অপরাধবোধ, পাপ সম্পর্কে সচেতনতা ইত্যাদি সৃষ্টি না করে উচ্চ আদর্শ, নীতিবোধ, ক্ষমা, ভালবাসা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি ধর্মশিক্ষার মধ্যে দিয়ে শিশুর মধ্যে জাগিয়ে তোলা উচিত। অপরাধবোধ হঠাৎ বা একটি দুটি ঘটনার দ্বারা শিশুর মধ্যে সৃষ্ট হয় না, বহুদিনের পুঞ্জীভূত আত্মগ্লানি বা অন্যায়ের সচেতনতা থেকে ধীরে ধীরে জন্মায়। অতএব এর চিকিৎসার জন্য দীর্ঘ সময়, সতর্ক প্রয়াস ও সযত্ন পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন হয়ে থাকে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব (Conflict)

সকল প্রকার অপসঙ্গতিরই সাধারণ লক্ষণ হল অন্তর্দ্বন্দ্ব। যে কোন কারণ থেকেই অপসঙ্গতি জন্ম নিক না কেন, তা প্রথমে ব্যক্তির মনে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি

করবেই এবং তাই থেকেই শেষে অপসঙ্গতি দেখা দেবে। এই দিক দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বকে অপসঙ্গতির বিশেষ কারণ না বলে সাধারণ বা সর্বজনীন কারণ বলাই সঙ্গত।

অন্তর্দ্বন্দ্ব বলতে বোঝায় একটি অপ্রীতিকর প্রক্ষোভধর্মী মনোভাব। এই মনোভাব দুটি কারণে ব্যক্তির মনে সৃষ্টি হতে পারে, প্রথম, যখন ব্যক্তির মধ্যে একাধিক পরস্পরবিরোধী ইচ্ছা জাগে, আর দ্বিতীয়, যখন ব্যক্তির ইচ্ছাটি পূর্ণ বা আংশিকভাবে অতৃপ্ত থেকে যায়। উভয় ক্ষেত্রেই ব্যক্তির মধ্যে একটা আশাভঙ্গ বা ব্যর্থতার মনোভাব দেখা দেয় এবং এই ব্যক্তিগত ব্যর্থতার বোধ থেকেই মনের মধ্যে প্রক্ষোভমূলক দ্বন্দ্ব আত্মপ্রকাশ করে। অন্তর্দ্বন্দ্বকে আমরা দু'শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি, সচেতন ও অচেতন। সব সময়ে যে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যক্তির কাছে জ্ঞাত থাকে তা নয়। মনঃসমীক্ষকদের মতে অনেক ক্ষেত্রে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব ব্যক্তির অচেতন মনে নিহিত থাকে এবং ব্যক্তির সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞান থাকে না। অথচ তার সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব তার বাহ্যিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

ব্যক্তিমাত্রকেই তার শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়তই তার পরিবেশের বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলতে হয়। এই সঙ্গতিবিধান যাতে সে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে তার জন্য তার মধ্যে দেখা দেয় নিজস্ব চাহিদা এবং বহুবিধ আচরণ-প্রচেষ্টা। কিন্তু পৃথিবীতে আমাদের স্বাধীন আচরণের পথে রয়েছে অসংখ্য বাধা ও বিঘ্ন। ফলে প্রায়ই আমাদের আচরণের স্বাভাবিক সম্পাদন বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং অনেক ইচ্ছা বা চাহিদাই অপূর্ণ থেকে যায়। অবশ্য এই ইচ্ছাপূরণের পথে বাধাটি বাস্তবও হতে পারে আবার বহুক্ষেত্রে ব্যক্তির কল্পনা-প্রসূতও হতে পারে। ইচ্ছা পূরণের এই অসামর্থ্য থেকে ব্যক্তির মনে জাগে প্রক্ষোভমূলক উত্তেজনা এবং তাই থেকে সৃষ্ট হয় অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই ধরনের চাহিদার অতৃপ্তি সকলের মধ্যে প্রায়ই ঘটে থাকে কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তা অন্তর্দ্বন্দ্বের রূপ নেয় না। ব্যক্তির কাছে চাহিদাটির গুরুত্ব এবং তার অতৃপ্তি তাকে কতখানি বিক্ষুব্ধ করল তার উপরই নির্ভর করে অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ ও তীব্রতা। অনেক সময় আবার দেখা গেছে যে অন্তর্দ্বন্দ্বটির একটি সুষ্ঠু মীমাংসা ব্যক্তি নিজেই উদ্ভাবন করে নিতে সমর্থ হয়েছে এবং তার ফলে তার মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছে।

অন্তর্দ্বন্দ্ব নির্ভর করে ব্যক্তির সমস্যার প্রকৃতি ও সংখ্যার উপর। ছোট

একটি ছেলে স্কুলে ভর্তি হবার পর থেকে ক্রমশ তার সমস্যার পরিমাণ বাড়তে থাকে। স্কুলের পড়া তৈরী করা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মানিয়ে চলা, শিক্ষকদের সঙ্গে যথাযথ সম্পর্ক বজায় রাখা ইত্যাদি নানা ধরনের সমস্যা ক্রমশ তাকে ঘিরে দাঁড়ায়। এই সময় প্রায়ই তাকে পরস্পরবিরোধী অনেক ইচ্ছার সম্মুখীন হতে হয়। এই বিরোধী ইচ্ছাগুলির মধ্যে যদি সে ঠিকমত মীমাংসা করে নিতে না পারে তাহলেই তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। যেমন, সে স্কুলে পড়া তৈরী করবে, না বাইরে খেলতে যাবে, এ দুটি বিরোধী ইচ্ছা যখন শিশুর মধ্যে দেখা দেয় তখন তা থেকে তার মধ্যে মানসিক দ্বন্দ্ব জাগে। এখন যদি ছেলেটি দু'য়ের মধ্যে একটা মীমাংসা করে নিতে পারে তাহলে তার দ্বন্দ্ব আর থাকে না। কিন্তু মনে কর যাক ছেলেটি স্কুলের পড়া না করে শুধু খেলেই কাটাল তাহলে তার মধ্যে স্কুলের পড়া না করার জন্য জাগল দুশ্চিন্তা, ভীতি এবং অপরাধবোধ এবং তা থেকে কালক্রমে তার মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠল। এ ত গেল সাধারণ স্তরের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা। পরিস্থিতি অনুযায়ী শিশুর মনে আরও অনেক গুরুতর ও জটিল অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগতে পারে এবং প্রায়ই সেগুলি সহজে মীমাংসা করা শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না এবং ফলে সে সব ক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুতর অবনতি ঘটে থাকে।

অতিরিক্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের যেমন অপকারিতা আছে তেমনই স্বাভাবিক অন্তর্দ্বন্দ্বেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। বহুদিক দিয়ে সীমাবদ্ধ আমাদের সমাজ-জীবনে অন্তর্দ্বন্দ্বের আবির্ভাব একটি স্বাভাবিক ঘটনা। পরিবেশের সঙ্গে ঠিকমত সঙ্গতিবিধান করতে না পারলে স্বাভাবিকভাবেই অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্যই শিশু উন্নততর ও অধিকতর কার্যকর আচরণ করতে উৎসাহিত হয়। এ দিক দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বকে সুষ্ঠু ও উন্নত সঙ্গতিবিধানের সোপানবিশেষ বলে বর্ণনা করা যায়। কিন্তু যখন তার পক্ষে সেই অন্তর্দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসা করা সম্ভব হয় না তখনই তার ফল ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। প্রকৃতপক্ষে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছাড়া শিশুর অবিকশিত ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হওয়া সম্ভব হয় না. যে শিশুর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব জাগে না, বুঝতে হবে যে তার নিজস্ব স্বতন্ত্র চাহিদা বলে বিশেষ কিছু সৃষ্টি হয়নি এবং সে পরিবেশকে যতটা পারে এড়িয়ে চলে। ফলে তার ব্যক্তিসত্তা দুর্বল, সঙ্কীর্ণ ও অপরিণত হয়ে গড়ে ওঠে। অতএব সেদিক দিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি মানসিক স্বাস্থ্যবিধির বিচারে সব সময় অবাঞ্ছিত বা প্রতিকূল ঘটনা নয়। শিশু তার অন্তর্দ্বন্দ্বের সুষ্ঠু মীমাংসা করতে পারল কিনা সেটা দেখাই মানসিক স্বাস্থ্যবিধির প্রকৃত কাজ।

কোন চাহিদা বা ইচ্ছা পূর্ণ না হলে ব্যক্তি একটি বিকল্প লক্ষ্য বেছে নেয় এবং সেই লক্ষ্যে পৌছানর মাধ্যমে তার সেই চাহিদাটি পূর্ণ করার চেষ্টা করে। প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছানোর অসামর্থ্য থেকে তার মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল তা দূর হয়ে যায় এ বিকল্প লক্ষ্যটি বেছে নেওয়ার ফলে। এভাবেই সাধারণত অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়ে থাকে। কিন্তু যদি বিকল্প লক্ষ্যটি অবাঞ্ছিত বা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তার মধ্যে আবার নতুন করে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

শিশুর ক্ষেত্রে নানা পরিস্থিতি থেকে অন্তর্দ্বন্দ্ব জন্মায়। অনেক সময় শিশু এমন একটি সমস্যার সম্মুখীন হয় যখন তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বিশেষ করে শিশুর পরিবেশের অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তির প্রতি আনুগত্যের মধ্যে যখন সংঘাত দেখা দেয় তখন অন্তর্দ্বন্দ্ব এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ, স্কুলে ছেলেটির একটি সহপাঠী কোন অন্যায় কাজ করেছে। শিক্ষক ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন যে ঐ অন্যায় কাজটি কে করেছে। এখানে ছেলেটির মনে শিক্ষকের প্রতি আনুগত্য এবং সহপাঠীর প্রতি বন্ধুত্ববোধ এ দু'য়ের মধ্যে সংঘাত দেখা দিল। তার ফলে শিশু যে আচরণই করুক না কেন তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগবেই। এই ধরনের অন্তর্দ্বন্দ্ব কেবল শিশুর মধ্যে নয়, বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যেও প্রচুর দেখা দিয়ে থাকে।

এতক্ষণ যে অন্তর্দ্বন্দ্বের আলোচনা করা হল তা হল সচেতন অন্তর্দ্বন্দ্ব। অন্তর্দ্বন্দ্ব বহুক্ষেত্রে অচেতন অবস্থায় থাকে। অচেতন অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার নিজের সমস্যা এবং তা থেকে সঞ্জাত অন্তর্দ্বন্দ্ব সম্বন্ধে একটুও সচেতন থাকে না। এই ধরনের অচেতন অন্তর্দ্বন্দ্ব সচেতন অন্তর্দ্বন্দ্বের চেয়ে অনেক বেশী জটিল ও গুরুতর হয়। অচেতন অন্তর্দ্বন্দ্বের একটি সাধারণ লক্ষণ হল যে শিশুর মনে একই ব্যক্তির প্রতি পরস্পরবিরোধী মনোভাব সৃষ্ট হয় অর্থাৎ একই ব্যক্তিকে সে একই সময় ভালবাসে আবার ঘৃণা করে। শৈশবে সাধারণত বাবার প্রতি ছেলের এবং মায়ের প্রতি মেয়ের এই ধরনের যুগ্ম-অনুভূতি (Ambivalence) জন্মে থাকে। অথচ শিশু তার এই মনোভাব সম্বন্ধে মোটেই সচেতন থাকে না এবং এ থেকে সঞ্জাত অন্তর্দ্বন্দ্ব তার মানসিক স্বাস্থ্যকে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ করে তোলে। এ ছাড়া অন্তর্দ্বন্দ্ব আরও নানা কারণে সৃষ্টি হয়ে থাকে। অতি শৈশবে ভয় বা কষ্টঘটিত কোন গুরুতর প্রকৃতির অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা—যা হয়ত শিশু পরে ভুলে গেছে অর্থাৎ যেটিকে সে তার অচেতন মনে অবদমিত করেছে,—তা তার মধ্যে অচেতন অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে।

সেই অভিজ্ঞতাটি শিশু সম্পূর্ণ ভুলে গেলেও একটা ভীতি বা গভীর বেদনার অনুভূতি তার অচেতন মনে বাসা বেঁধে থাকে। বদ্ধ স্থানের ভীতি, মুক্ত-স্থানের ভীতি, জন্তু জানোয়ারের ভীতি, উচ্চ শব্দের ভীতি এই রকম বিভিন্ন ধরনের ভীতি অতীতের বিস্মৃত অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নিয়ে থাকে। এই ধরনের অচেতন মনের ভীতিগুলির কারণ চেতন মনে খুঁজে পাওয়া যায় না।

অচেতন অন্তর্দ্বন্দ্বের চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া অপরিহার্য। কেননা অতীতের যে ঘটনা বা অভিজ্ঞতা থেকে অন্তর্দ্বন্দ্বটি সৃষ্টি হয়েছে অচেতন মনে সেটিকে খুঁজে বার করাটাই অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার পক্ষে অপরিহার্য এবং অনেক সময় একমাত্র পন্থা।

বাস্তবকে গ্রহণ করা এবং পরাজয় ও অসাফল্যকে মেনে নেওয়াই হল অন্তর্দ্বন্দ্ব দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়। সকলেরই কল্পনা বা ইচ্ছা অনুযায়ী বাস্তব পরিস্থিতি গঠিত হয় না এবং তার ফলে হতাশা, ব্যর্থতা, অসাফল্য সকলের ক্ষেত্রেই অবশ্যম্ভাবী। এই সত্যটুকু যদি শিশুকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে নিজেই নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে নিতে পারে।

শিশুর মধ্যে যাতে অন্তর্দ্বন্দ্ব গুরুতর আকার ধারণ না করে তার জন্য স্কুলে এবং বাড়ীতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। শিশুর মধ্যে যাতে কোন অন্যায় অসম্ভব চাহিদার সৃষ্টি না হয় সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে। অনেক স্কুলে শিশুদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতার আবহাওয়া গড়ে তোলা হয়। তার ফলে যে অল্প কয়েকজন প্রতিযোগিতায় সাফল্যলাভ করে তারা ছাড়া আর সকলেই ব্যর্থতা বরণ করতে বাধ্য হয় এবং তাই থেকে তাদের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব জাগে। যদি স্কুলের আবহাওয়াটি সহযোগিতামূলক হয় এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজনের সাফল্যের পরিবর্তে যদি সকলের যৌথসাফল্যকে মূল্য দেওয়া হয় তাহলে সেখানে শিশুদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব অনেক কম মাত্রায় দেখা দেয়।

অপসঙ্গতির কয়েকটি রূপ

(Some Forms of Maladjusment)

যে শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে না, অর্থাৎ যার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিয়েছে, তার আচরণ সহজ ও স্বাভাবিক পথ ত্যাগ করে অবাঞ্ছিত ও অসামাজিক পথে অগ্রসর হয়। একেই আমরা

অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বলে থাকি। এই অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। কয়েকটি প্রচলিত ও সাধারণ অপসঙ্গতির উদাহরণ নীচে দেওয়া হল।

ভীরুতা (Timidity)

যে সব ছেলেমেয়ে ক্লাশে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকে, কোনরকম গোলমাল করে না, তাদের এতদিন শিক্ষকেরা ভাল ছেলেমেয়ের পর্যায়ে ফেলে এসেছেন এবং নিতান্ত সুনজরেই দেখে এসেছেন। কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণের ফল থেকে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের মধ্যে অনেকেই প্রকৃতপক্ষে গুরুতর অপসঙ্গতির শোচনীয় উদাহরণ। এই সব ছেলেমেয়ে বাস্তবের সংস্পর্শে এসে সন্তোষজনকভাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে নি। ফলে তাদের বিশেষ কোন চাহিদা অপূর্ণ থেকে গেছে এবং তারা সেই ব্যর্থতাকে মেনে নিয়েছে। যাতে তাদের অধিকতর ব্যর্থতাকে মেনে নিতে না হয়, সেইজন্য তারা বাস্তব থেকে নিজেদের অপসৃত করে নিয়েছে। এই আচরণ নিঃসন্দেহে এক ধরনের সঙ্গতিবিধানের প্রচেষ্টা। কিন্তু এ প্রচেষ্টা নিতান্তই অসার্থক ও অমঙ্গলকর। এর দ্বারা তাদের মনের অন্তর্দ্বন্দ্ব যেমন তেমনই থেকে যায়, তার কোন মীমাংসা হয় না। উপরন্তু বাস্তব থেকে নিজেদের সরিয়ে নেওয়ার ফলে তাদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে। অবহেলিত ও অনাদৃত ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে এই ধরনের ভীরুতা প্রায়ই গড়ে উঠতে দেখা যায়। যখন তারা বুঝতে পারে যে তাদের ইচ্ছা-পূরণের সম্ভাবনা নিতান্ত অল্প তখন তারা ব্যর্থতার দুঃখ এড়াবার জন্য নিজেদের বাস্তব থেকে প্রত্যাহৃত করে নেয়। আবার যে সব ছেলেমেয়ে নিপীড়নমূলক বা অতিরিক্ত শৃঙ্খলা-শাসিত আবহাওয়ায় মানুষ হয় তাদের স্বাধীন ইচ্ছা বার বার বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে, ফলে তারাও নিজেদের বাইরের জগৎ থেকে সরিয়ে আনে এবং কালক্রমে ভীরু ও দুর্বলচিত্ত হয়ে ওঠে। ইউঙ'র ব্যক্তিসত্তার শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী এদের অন্তর্বৃত্ত (introvert) বলা হয়। এদের অহংসত্তা বাইরের জগৎ থেকে সরে এসে অন্তর্মুখী হয়ে ওঠে।

বলা বাহুল্য এই ধরনের ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিসত্তার বিকাশ অস্বাভাবিক ও গুরুতররূপে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এদের ভীরুতা দূর করতে হলে এদের অবলুপ্ত আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। এদের মনের মধ্যে সঞ্চিত অবহেলার গ্লানি দূর করে এদের মধ্যে সাহস ও ভরসার সৃষ্টি করতে হবে। এরা

যাতে কাজে সাফল্য লাভ করে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে এবং যে বাস্তবকে এরা ভয়ে এড়িয়ে যেত সেই বাস্তবকে যাতে সাহস ও আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে তারা মেনে নিতে পারে, সে শিক্ষা তাদের দিতে হবে। তবে যে বিশেষ ঘটনা বা কারণের জন্য এদের মধ্যে ভীরুতার সৃষ্টি হয়েছে সেটিকে সর্বাগ্রে খুঁজে বার করা এবং সেটিকে দূর করে তাদের মানসিক সমতা ফিরিয়ে আনাই এদের চিকিৎসার প্রথম সোপান।

অবশ্য ক্লাশে শান্তশিষ্ট এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকলেই যে কোন শিশুকে অপসঙ্গতির ক্ষেত্র বলে মনে করতে হবে তা নয়। অনেক সময় দেখা গেছে যে ক্লাশে যা পড়ানো হচ্ছে তা হয়ত শিশুটি কোন কারণে ঠিকমত অনুসরণ করতে পারছে না, ফলে বাধ্য হয়ে সে নিষ্ক্রিয় হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে তার ঐ অসুবিধাটুকু দূর করতে পারলেই তার নিষ্ক্রিয়তা দূর হবে। সেই জন্য আধুনিক মনশ্চিকিৎসকগণ শিশুর ভীরুতা সত্যকারের অপসঙ্গতিমূলক কিনা তা জানবার জন্য দেখেন যে ভীরুতার সঙ্গে অন্য কোন অস্বাভাবিক উপসর্গ আছে কিনা। উদাহরণস্বরূপ, যদি তাঁরা দেখেন যে দাঁতে নখকাটা, তোৎলামি, অস্থিরতা, স্নায়বিক দৌর্বল্য ইত্যাদি উপসর্গগুলিও ভীরুতার সঙ্গে রয়েছে তাহলে তাঁরা সেটিকে প্রকৃত অপসঙ্গতির ক্ষেত্র বলে ধরে নেন। আর ভীরুতার সঙ্গে তেমন কোন উপসর্গ না দেখা গেলে সেটিকে তাঁরা সাধারণ ভীরুতার ক্ষেত্র বলে মনে করেন।

আক্রমণধর্মিতা (Aggressiveness)

সুষ্ঠু সঙ্গতিবিধানের অভাব যেমন শিশুকে ভীরু করে তোলে তেমনই আবার ক্ষেত্রবিশেষে শিশুর মধ্যে আক্রমণধর্মিতা জাগায়। এই ধরনের ছেলেমেয়ে তাদের সহপাঠী, ভাইবোন প্রভৃতির উপর অকারণে অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে। এদের ইংরাজিতে বুলি (Bully) বলা হয়।

নিরাপত্তার অভাববোধই আক্রমণধর্মিতার প্রধান কারণ। যে শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার বোধ নেই এবং যে নিজেকে অবহেলিত ও পরিত্যক্ত বলে মনে করে সে তার লুপ্ত আত্মবিশ্বাসকে ফিরে পাবার জন্য অপরের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করে। আত্মস্বীকৃতি ও অপরের কাছ থেকে পরিচিতি পাবার জন্য অনেক শিশু আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে। বাড়ীতে বা স্কুলে স্বাভাবিক পন্থায় পরিচিতি বা স্বীকৃতি লাভ করতে অক্ষম হয়ে শিশু এই অস্বাভাবিক পন্থা গ্রহণ করে। এই ভাবে সে বাড়ীর বয়স্কদের বা স্কুলে শিক্ষক-সহপাঠীদের কাছ থেকে আত্মস্বীকৃতি আদায় করার চেষ্টা করে।

আক্রমণধর্মিতা দূর করতে হলে প্রথমে শিশুর অতৃপ্ত চাহিদাটি কি তা দেখতে হবে। যে চাহিদার অপূর্ণতার ফলে সে আক্রমণধর্মী হয়ে উঠেছে সেটিকে অনুসন্ধান করে তার তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যদি নিরাপত্তা-হীনতার বোধই তার অপসঙ্গতির কারণ হয়ে থাকে, তবে যাতে তার মন থেকে এই অবহেলার ক্ষোভটি চলে যায় তা দেখতে হবে। একমাত্র আন্তরিক ভালবাসাই শিশুর মধ্যে প্রকৃত নিরাপত্তার বোধ আনতে পারে। অতএব তার রুক্ষ মনকে ভালবাসা দিয়ে সিক্তি করে তুলতে হবে এবং যাতে সে তার আত্মবিশ্বাসকে পুনপ্রতিষ্ঠা করতে পারে সে ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে হবে।

আর যদি আত্মস্বীকৃতি ও পরিচিতিই তার অতৃপ্ত চাহিদা হয়ে থাকে তবে সে যাতে ঈপ্সিত পথে সেগুলি পেতে পারে তার আয়োজন করতে হবে। খেলাধুলা, অভিনয়, বিতর্ক, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন মাধ্যমের সাহায্যে যাতে সে তার অহংসত্তাকে সকলের কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ ও সাহায্য তাকে দিতে হবে।

অনেকে শিশুর আক্রমণধর্মী আচরণকে অবদমিত করার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞগণের অভিমত হল যে আক্রমণধর্মী আচরণকে অবদমিত করার ফল মন্দই হয়। তার চেয়ে ভাল পন্থা হল ঐ আচরণগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে ঈপ্সিত পথে পরিচালিত করা। এই পদ্ধতিকে উন্নীতকরণ (Sublimation) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, যে ছেলে মারামারি করতে অভ্যস্ত তাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধূলায় নিযুক্ত করলে ধীরে ধীরে ঐ আচরণটি সংযত ও গঠনধর্মী হয়ে ওঠে।

গুরুত্বের দিক দিয়ে ভীরুতা আক্রমণধর্মিতার চেয়ে কঠিনতর ব্যাধি। কেন না ভীরুতার ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে কোন আচরণই থাকে না, তার মধ্যে নতুন করে আচরণের সৃষ্টি করতে হয়। আক্রমণধর্মিতার ক্ষেত্রে আচরণ আগে থেকেই থাকে, কেবল প্রয়োজন হয় তাকে পরিবর্তিত করে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত করা।

ক্লাশপালানো (Truancy)

ক্লাশপালানো একটি অতি সাধারণ অপসঙ্গতির উদাহরণ। ক্লাশ পালানোর অভ্যাস নানা কারণে ছেলেমেয়েদের মধ্যে গড়ে ওঠে। ক্লাশ পালানোর সব চেয়ে বড় কারণ হল শিশুর শিক্ষামূলক প্রয়োজনীয়তা ক্লাশে পূর্ণ না হওয়া। তার ফলে ক্লাশে থাকার কোন প্রয়োজনীয়তা সে আর অনুভব করে না এবং সুযোগ সুবিধা পেলেই ক্লাশ থেকে পালায়।

ক্লাশে শিক্ষার্থীর প্রয়োজন না মেটায় তিন রকম কারণ আছে। প্রথম, শিক্ষকের শিক্ষণ পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে যার ফলে হয় শিক্ষার্থীর কাছে ক্লাশের পড়া দুরূহ ঠেকে, নয় তা তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। এই জন্য আধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষণপদ্ধতিকে নানা শিক্ষণসহায়ক সাজসরঞ্জামের সাহায্যে আকর্ষণীয় করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তাছাড়া শিক্ষণপদ্ধতিটিকেও মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

দ্বিতীয়, শিক্ষার্থী যদি উন্নতধীসম্পন্ন শিশু হয় তবে তার কাছে ক্লাশের পড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগে থেকে জানা থাকে বা অতি সাধারণ বলে মনে হয়। ফলে তার মধ্যে সে নতুনত্ব কিছুই খুঁজে পায় না এবং ক্লাশে থাকার কোনও আগ্রহ বোধ করে না। এই কারণেই উন্নত মানসিক শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে ক্লাশ পালানোর দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখতে পাওয়া যায়। এইসব ছেলেমেয়েদের ক্লাশ পালানো বন্ধ করতে হলে ক্লাশে তাদের বিশেষ উন্নত ধরনের কাজ দিতে হবে, যাতে তারা তাদের মানসিক শক্তির সত্যকারের প্রয়োগ করতে পারে।

তৃতীয়, যে সব ছেলেমেয়ে বিশেষধর্মী মানসিক শক্তি নিয়ে জন্মায় তারাও সাধারণ ক্লাশের পড়ার প্রতি কোন আগ্রহ বোধ করে না। সনাতন প্রকৃতির স্কুলগুলিতে সাহিত্যধর্মী এবং ভাষাভিত্তিক বিষয় পাঠের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়, ফলে বিশেষধর্মী শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের শক্তির প্রকৃত ব্যবহার এই সব ক্লাশে হয় না এবং তারা বাধ্য হয়ে ক্লাশে অনুপস্থিত থাকে। কিন্তু যদি তাদের প্রকৃতিদত্ত শক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পাঠদানের আয়োজন করা হয় তাহলে তারা সেই সব কাজ করে তৃপ্তি ও সাফল্য দুইই পায়। আধুনিক বিদ্যালয়-গুলিতে এই জন্য নানা বিভিন্ন প্রকৃতির কাজের ব্যবস্থা আছে যাতে সকল রকম বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েই তাদের রুচি ও সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ পেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ যন্ত্রঘটিত শক্তিসম্পন্ন একটি ছেলেকে যদি সাধারণ স্কুলের ক্লাশে পড়তে দেওয়া হয় তাহলে সে মোটেই সেখানে আগ্রহ বোধ করবে না এবং সুযোগ পেলেই ক্লাশ পালাবে। কিন্তু যদি তাকে যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে তখন তার উৎসাহ ও আগ্রহের কোন অভাবই নেই।

ক্লাশ পালানোর এ ছাড়া আরও কতকগুলি কারণ আছে। অনেক সময় অতিরিক্ত নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার জন্য ছেলেমেয়েরা ক্লাশ পালায়। বিশেষ করে বাড়ীতে সম্পন্ন করার জন্য স্কুল থেকে যে সব কাজ দেওয়া হয় সেগুলির প্রতি প্রায়ই ছেলেমেয়েরা সত্যকারের আগ্রহ বোধ করে না এবং অনেক ক্ষেত্রে এই

সব কাজ করে উঠতে না পারলে শিক্ষকের বকুনি বা সহপাঠীদের উপহাসের ভয়ে তারা স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে। এ ছাড়াও নিজের নিম্নজাতিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা, নিকৃষ্ট পোষাক ইত্যাদি কারণেও অনেক সময় ছেলেমেয়েরা ক্লাশ থেকে পালায়।

ক্লাশপালানোর কারণগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে এ ব্যাধির চিকিৎসা বিশেষ শক্ত নয়। এমন কি ক্লাশপালানোকে আমরা গুরুতর অপসঙ্গতি বলে না ধরতেও পারি। তবে ক্লাশপালানো নিজে একটি গুরুতর অপসঙ্গতি না হলেও এটি যে অনেক ক্ষেত্রে গুরুতর অপসঙ্গতি, এমন কি অপরাধপরায়ণতার পূর্ব সোপান সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অধিকাংশ যুব অপরাধীর ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে ক্লাশপালানো তাদের স্কুলজীবনের একটি অপরিহার্য লক্ষণ ছিল। ক্লাশপালানোর কারণটি প্রথম অবস্থায় দূর করা শক্ত নয়, কিন্তু যদি সেটিকে অবহেলা করা হয় বা প্রাথমিক অবস্থায় দূর না করা হয় তবে ঐ কারণটি জটিল আকার ধারণ করে এবং পরবর্তীকালে শিশুর মধ্যে গভীর মানসিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে। সেই জন্য মনোবিজ্ঞানীদের অভিমত যে শিশুর মধ্যে ক্লাশপালানোর প্রবণতা দেখলেই অবিলম্বে তার কারণটি খুঁজে বার করতে হবে এবং যতটা সম্ভব তা দূর করতে হবে।

ক্লাশপালানোর প্রবণতা দূর করতে হলে প্রথমেই ক্লাশের পাঠটিকে শিশুর কাছে মনোরম করে তুলতে হবে। স্কুলের সমগ্র পরিবেশটি শিশুর কাছে চিত্তাকর্ষক করতে হবে, শিক্ষণপদ্ধতিটি মনোবিজ্ঞানসম্মত করতে হবে এবং অর্থহীন নিপীড়নমূলক শৃঙ্খলার প্রয়োগে শিশুর মন যাতে বিদ্রোহী না হয়ে ওঠে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি দিতে হবে। শিশুর ব্যক্তিগত প্রয়োজন কতটা ক্লাশের পাঠে পরিতৃপ্ত হল সেটার উপর নির্ভর করছে শিশুর কাছে ক্লাশ কতটা আকর্ষণীয় হবে। অতএব শিশুর নিজস্ব চাহিদার স্বরূপ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং ক্লাশের পাঠের মধ্যে দিয়ে তার মানসিক শক্তির যাতে যথাযথ ব্যবহার হয় সেদিকে যত্ন নিতে হবে।

মিথ্যাভাষণ (Lying)

মিথ্যা কথা বলাও একটি অতি সাধারণ অপসঙ্গতির উদাহরণ। নানা কারণে শিশু মিথ্যাভাষণের আশ্রয় নেয়। অনেক ক্ষেত্রে কারণটি নিতান্ত নির্দোষ প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং প্রকৃত অপসঙ্গতির পর্যায়ে পড়ে না। যেমন উচ্ছ্বাসের মাথায় কোন কিছু অতিরঞ্জন করে বলা বা বানিয়ে বলা, ভয়ে কোন

কিছু গোপন করা বা মিথ্যা বলা ইত্যাদি আচরণগুলির পেছনে কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব না থাকার ফলে এগুলিকে প্রকৃত অপসঙ্গতি বলা চলে না, যদিও আচরণগুলি অভ্যাসে পরিণত হলে ভবিষ্যতে গুরুতর অপসঙ্গতির সৃষ্টি হতে পারে।

কিন্তু অনেক সময় শিশু তার কোন বিশেষ অতৃপ্ত চাহিদার তৃপ্তি মিথ্যা ভাষণের মধ্যে দিয়ে পাবার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু হয়ত নিজের অসামর্থ্যবশত লেখাপড়া বা অন্যান্য প্রচলিত পথে তার কাম্য আত্মস্বীকৃতি বা পরিচিতি পেল না। সে তখন তার বন্ধুবান্ধব এবং সহপাঠীদের কাছে তার কল্পিত সাফল্য ও মিথ্যা কীর্তির নানা কাহিনী রচনা করে বলতে লাগল এবং এভাবে তার বন্ধুবান্ধব ও সহপাঠীদের কাছ থেকে তার কাম্য প্রশংসা ও পরিচিতি আদায় করল। এই ধরনের মিথ্যাভাষণ প্রকৃতপক্ষে তার অতৃপ্ত আত্মস্বীকৃতির চাহিদা থেকে জাত অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল এবং অপসঙ্গতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের মিথ্যাভাষণে তার চাহিদা সত্যকারের তৃপ্ত হয় না এবং ফলে তার অন্তর্দ্বন্দ্ব অমীমাংসিতই থেকে যায়। ঐ সাময়িক এবং আংশিক তৃপ্তি লাভের জন্য সে ক্রমশ মিথ্যার মাত্রা ও পরিমাণ বাড়িয়ে যায় এবং শেষে প্রচণ্ড অপরাধবোধ তার মনকে দুর্বল ও পঙ্গু করে তোলে বাইরের জগতের কাছেও শীঘ্রই তার এই মিথ্যাভাষণ ধরা পড়ে এবং সমাজে সে মিথ্যাবাদী, অনির্ভরযোগ্য, দায়িত্বহীন লোক বলে বিবেচিত হয়। শেষ পর্যন্ত সে বাঞ্ছিত প্রশংসা ও স্বীকৃতি আর পায় না এবং তার ফলে তার অপসঙ্গতির মাত্রা আরও বেড়ে চলে। এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই তার মিথ্যাভাষণের প্রকৃত কারণটি কি তা খুঁজে বার করতে হবে এবং যে চাহিদার অতৃপ্তির জন্য সে এই প্রতিপূরক আচরণ গ্রহণ করেছে তার তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। শিশুদের বিভিন্ন কর্মশক্তির বিকাশের পর্যাপ্ত আয়োজন যে শিক্ষাব্যবস্থায় থাকে সেখানে কোন না কোন উপায়ে সে তার আত্মস্বীকৃতি পায় এবং মিথ্যাভাষণ বা অন্য কোন অপসঙ্গতিমূলক আচরণের সাহায্য তাকে আর নিতে হয় না।

বহু ক্ষেত্রে শিশু মিথ্যাভাষণকে প্রতিরক্ষামূলক পন্থা রূপে ব্যবহার করে থাকে। শিশু কোন অন্যায় কাজ করে ফেললে শাস্তি বা নিন্দা থেকে বাঁচার জন্য সে মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে। এই ধরনের আচরণের ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় যদি যথাযোগ্য প্রতিকারের ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে পরে তা অভ্যাসে পরিণত হয় এবং শিশুর ব্যক্তিসত্তার সুষম বিকাশকে বিশেষভাবে ব্যাহত করে তোলে।

অপহরণ (Stealing)

অপহরণ বা চুরি করাও মিথ্যা ভাষণের মত একটি অপসঙ্গতির উদাহরণ। কোন গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার তৃপ্তির অভাবকে শিশু অপরের জিনিষপত্র অপহরণের মাধ্যমে আংশিকভাবে মেটাবার চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি শিশু স্কুলে ভাল পড়া পারে না এবং তার ফলে তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা বিশেষভাবে বিপন্ন হয়ে ওঠে। তখন সে তার চাহিদা মেটাবার জন্য সহপাঠীদের বই, খাতা, পেনসিল, ছুরি ইত্যাদি চুরি করতে সুরু করে। তার এই কাজের জন্য বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও দুশ্চিন্তা দেখে সে মনে মনে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে থাকে এবং তার আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা কিছুটা তৃপ্তিলাভ করে। বলা বাহুল্য এই তৃপ্তি তার সমস্যার সত্যকারের সমাধান আনতে পারে না এবং তার অন্তর্দ্বন্দ্বেরও কোন মীমাংসা এ থেকে হয় না।

এই ধরনের অপসঙ্গতিমূলক চৌর্য-আচরণ ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ করে এবং শিশু তার সামাজিক মানমর্যাদা সবই হারাতে থাকে। এতে তার অপ-সঙ্গতির মাত্রা আরও বেড়ে যায় এবং কালক্রমে সে একটি অপরাধপ্রবণ (Delinquent) শিশু হয়ে দাঁড়ায়। বস্তুত অপহরণের অভ্যাস গুরুতর ভবিষ্যৎ অপরাধপ্রবণতার প্রাথমিক সোপান ছাড়া আর কিছুই নয়।

আবার কোন কোন শিশুর মধ্যে গভীর প্রকৃতির মনোবিকারমূলক চুরির (Pathological Stealing) প্রবণতা দেখা যায়। অনেক সময় কোন বিশেষ একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব শিশুর গভীর অচেতনে নিহিত থাকে এবং কোন একটি মনোবিকারমূলক চিন্তা বা ধারণাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ তা বেড়ে ওঠে। সেই অচেতনের অন্তর্দ্বন্দ্বটি তখন বিশেষ বিশেষ বস্তু চুরি করার মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

মনোবিকারমূলক চুরির ক্ষেত্রে ব্যক্তি যে বস্তুগুলি চুরি করে সেগুলিকে সে কোন কিছুর প্রতীক বলে ধরে নেয় এবং ঐ বস্তুগুলির উপর অধিকারলাভের মধ্যে দিয়ে সে তার বিশেষ কোন চাহিদা তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। বলা বাহুল্য এই ক্ষেত্রগুলি অস্বাভাবিক মনোবিকারমূলক এবং অভিজ্ঞ মনশ্চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়া এ সব ক্ষেত্রে প্রকৃত চিকিৎসা করা সম্ভব নয়।

অপসঙ্গতিমূলক অপহরণের অভ্যাস প্রাথমিক অবস্থাতেই দূর করা একান্ত প্রয়োজন। শিশু যাতে নিজের অহংসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, নিজের কাজের প্রাপ্য পরিচিতি আর সকলের কাছ থেকে পেতে পারে এবং তার অবলুপ্ত আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে পারে তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। যে সব

ছেলেমেয়ে লেখাপড়ার দিক দিয়ে তাদের যোগ্যতা প্রমাণিত করতে পারে না, তারা যাতে অন্যান্য ক্ষেত্রে নিজেদের উৎকর্ষ দেখাতে পারে তারও পর্যাপ্ত আয়োজন রাখতে হবে। এই জন্য স্কুলে খেলাধূলা, অঙ্কন, অভিনয়, বিতর্ক ইত্যাদির আয়োজন থাকলে শিক্ষার্থীরা তাদের বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তির ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ পায় এবং তার ফলে তাদের অতিপ্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাগুলিও তৃপ্ত হয়।

অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই অপহরণ-প্রবণতা যে অপসঙ্গতি থেকে জন্মায় তা নয়। নিছক মানসিক অপরিণতির জন্যও অনেক ছেলেমেয়ে মিথ্যা কথা বলার মতই একটা দুটা চুরি করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে চুরি করাটা যে অনুচিত একথা বোঝার মত বয়সই তখন তাদের হয় না। তাছাড়া অনেক ছেলেমেয়ে নিছক কৌতূহল তৃপ্তির জন্যও চুরি করে থাকে। আবার কেউ কেউ তাদের পিতামাতার অস্বচ্ছলতার জন্য ভাল বা মূল্যবান কিছু দেখে সাময়িক লোভের বশে চুরি করে থাকে। এই ক্ষেত্রগুলি প্রকৃত অপসঙ্গতির দৃষ্টান্ত নয় এবং সহানুভূতিপূর্ণ আচরণের সাহায্যে বুঝিয়ে এদের নিবৃত্ত করা যায়। কিন্তু যদি এই ধরনের চুরিকেও যথাসময়ে নিবৃত্ত করা না হয় তাহলে তা অভ্যাসে দাঁড়াতে পারে এবং ভবিষ্যতে গুরুতর অপসঙ্গতির সৃষ্টি করতে পারে।

নেতিমনোভাব (Negativism)

নেতিমনোভাব বলতে বোঝায় আদেশ বা নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করা, অনুরোধ অগ্রাহ্য করা এবং প্রচলিত আইনকানুনের বিরুদ্ধে নিজের ইচ্ছামত কাজ করা। এই মনোভাবসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের মধ্যে সব সময়েই একটি প্রতিবাদ বা বিদ্রোহের প্রবণতা দেখা যায় এবং যা কিছু নির্দিষ্ট ও সুপ্রতিষ্ঠিত, তারই বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহী হয়ে দাঁড়ায়। এই মনোভাবের ফলে কি বাড়ীতে কি স্কুলে সর্বত্রই শৃঙ্খলা বিপন্ন হয়ে ওঠে। বিশেষ করে স্কুলের সুসংগঠিত রূপ ও আবহাওয়াটি এই সব ছেলেমেয়ের জন্য ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে এবং শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড বিরক্তির সৃষ্টি হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কর্তৃপক্ষেরা এই সব ছেলেমেয়েকে বিদ্রোহী বা অসামাজিক বলে গণ্য করেন এবং শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে তাদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু এই ধরনের নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ভুল এবং ক্ষতিকর। নেতিমনোভাব শিশুমনের বৃদ্ধিপ্রক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতি ছাড়া আর কিছুই নয়। এই সময় শিশু স্বাধীনভাবে কাজকর্ম করার চেষ্টা করে এবং সেই জন্যই সে অপরের অনুশাসন বা কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে।

সে দেখাতে চায় যে সে নিজেই নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করবে এবং নিজের স্বাধীন মত অনুযায়ী চলবে। অতএব সাধারণভাবে বলতে গেলে নেতি-মনোভাব কোন প্রকার অপসঙ্গতি নয় বরং স্বাভাবিক বৃদ্ধিপ্রক্রিয়ারই বহিঃপ্রকাশ।

কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে এই নেতিমনোভাব গুরুতর অপসঙ্গতির আকার ধারণ করতে পারে। শিশুর ক্রমবর্ধমান মনের এই স্বাধীনতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্খাকে যদি অবদমিত করা হয় বা ভুল বুঝে তার আচরণকে শৃঙ্খলাভঙ্গ, বিদ্রোহ ইত্যাদি নামে অভিযুক্ত করা হয় তাহলে শিশুর মনের ঐ গুরুত্বপূর্ণ চাহিদাটি অতৃপ্ত থেকে যায় এবং তাই থেকে গুরুতর অপসঙ্গতি দেখা দিয়ে থাকে। শিশুর এই স্বাধীনতার চাহিদাটি অতৃপ্ত থাকলে তার মধ্যে নেতি-মনোভাব তীব্র আকার ধারণ করে এবং হয় সে আত্মকেন্দ্রিক ও বস্তুজগৎ থেকে আত্ম-প্রত্যাহৃত ব্যক্তি হয়ে দাঁড়ায়, নয় আক্রমণধর্মী ও অপরাধপ্রবণ সমাজ-বিদ্বেষী রূপে বড় হয়ে ওঠে।

যৌন অপরাধ (Sex Offences)

শিশুর যখন কৈশোর ছেড়ে যৌবনে পা দেয় তখন তার নবজাগ্রত যৌন সচেতনতা ধীরে ধীরে যৌন কৌতূহল ও সক্রিয় যৌন আচরণের রূপ ধারণ করে। বিভিন্ন যৌন ব্যাপার সম্পর্কে জানবার জন্য শিশুর মধ্যে প্রবল কৌতূহল দেখা দেয় এবং তার সেই কৌতূহল সুস্থ উপায়ে তৃপ্ত না হলে সে অসুস্থ ও অসামাজিক পন্থা অবলম্বন করে। গুরুতর ক্ষেত্রে এই বিপথগামী যৌন-চাহিদা নানা রকম যৌন অপরাধের রূপ নেয়। বিকৃত যৌন আচরণ, যৌনধর্মী নিপীড়ন, যৌনমূলক আঘাত, অশ্লীল আচরণ, অশ্লীল সাহিত্য পাঠ ও অশালীন ভাষার ব্যবহার ইত্যাদি বহু রকমের অবাঞ্ছিত আচরণ শিশুর মধ্যে দেখা দেয়। এই ধরনের অপসঙ্গতিগুলি যদি অবিলম্বে দূর করা না হয় তাহলে শীঘ্রই সেগুলি গুরুতর অপরাধপ্রবণতায় পর্যবসিত হয়।

যৌন অপরাধ গুরুতর অপসঙ্গতির ফল। যৌবনাগমে স্বাভাবিক যৌন-চাহিদার তৃপ্তি না হলে তা যৌন অপরাধের রূপ নেয়। অতএব যৌন অপরাধ দূর করার উপায় হল যাতে শিশুর যৌন চাহিদা বিকৃত পথে না যায় তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা। দেখা গেছে যে প্রাপ্তযৌবনদের যৌন চাহিদার একটি বড় অঙ্গ হল যৌন কৌতূহল। অতএব যৌন ব্যাপারগুলি সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের কৌতূহল তৃপ্তি করা এবং যৌন রহস্যগুলি সম্পর্কে তাদের

বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা দেওয়াই যৌন চাহিদাকে অনেকখানি তৃপ্ত করে এবং তাদের যৌন প্রচেষ্টাকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুপরিচালিত করে। তাছাড়া জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের অবহিত করে কি উপায়ে সার্থক ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনযাপন করা যায় সে সম্বন্ধে তাদের সঙ্গে যুক্তিধর্মী আলোচনা করলে এই ধরনের অপরাধপ্রবণতার দিকে তাদের মন আর যায় না।

অপসঙ্গতির অন্যান্য রূপ

এছাড়াও অপসঙ্গতি আরও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করতে পারে। যেমন স্বার্থ-পরতা, বদমেজাজ, একগুঁয়েমী, অবাধ্যতা ইত্যাদি। এগুলি সবই অপসঙ্গতির লক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে আগের মত কোন না কোন মৌলিক চাহিদার তৃপ্তির অভাব থেকেই এগুলি জন্মলাভ করেছে। এগুলিকে দূর করতে হলে যে সকল অতৃপ্ত কামনা থেকে অপসঙ্গতি জন্মলাভ করেছে সেই কামনা-গুলিকে খুঁজে বার করতে হবে এবং তাদের তৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

অপসঙ্গতির প্রকৃতি নির্ণয় ও চিকিৎসার পদ্ধতি সম্পর্কে পরের পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যাবে।

তিন

অপসংগতির প্রকৃতি নির্ণয় ও চিকিৎসা

(Diagnosis and Therapy of Maladjustment)

অপসঙ্গতির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করাটা অপসঙ্গতি নিরাময়ের জন্য অপরিহার্য। অপসঙ্গতির বাহ্যিক অভিব্যক্তি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে থাকে। একই মানসিক সমস্যা বা অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে বিভিন্ন প্রকৃতির অপসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। তেমনই আবার একই অপসঙ্গতিমূলক আচরণের মূলে থাকতে পারে বিভিন্ন মানসিক কারণ। অতএব নিছক বাহ্যিক অভিব্যক্তি দেখেই অপসঙ্গতির কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। যেমন, কোন ছেলের যদি মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস হয় কিংবা কোন মেয়ে যদি ক্লাশে তার সহপাঠিনীদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা না করে, তাহলে তাদের মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিয়েছে বুঝতে হবে। কিন্তু তাদের এই অপসঙ্গতির কারণ তাদের এই বাহ্যিক আচরণ থেকে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। কেননা ছেলেটির চুরি করার প্রবণতা কিংবা মেয়েটির লাজুকতার মূলে আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদা থেকে সুরু করে আত্ম-স্বীকৃতির চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা প্রভৃতি বহু রকম মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তি থাকতে পারে। অতএব অপসঙ্গতির যথাযথ চিকিৎসা করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন তার স্বরূপ বা প্রকৃতি নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা।

সাধারণত অপসঙ্গতির স্বরূপ নির্ণয় করার দুটি সোপানের উল্লেখ করা যায়। যথা, তথ্যসংগ্রহ ও সংব্যাখ্যান।

১। তথ্যসংগ্রহ : সাক্ষাৎকার ও অবাধ অনুষঙ্গ

অপসঙ্গতির স্বরূপ নির্ণয় করতে হলে প্রথমে শিশুর সমস্যাটি সম্বন্ধে চিকিৎসককে বিশদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এই তথ্য সংগ্রহের নানা পদ্ধতি আছে। তার মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য হল সাক্ষাৎকার (Interview)। অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশুটির সঙ্গে চিকিৎসক প্রত্যক্ষভাবে সাক্ষাৎ করেন এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপের মধ্যে দিয়ে তার সমস্যাটির স্বরূপ নির্ণয় করেন। সমস্যাটি কি প্রকৃতির, কবে থেকে সুরু হয়েছে এবং তার সৃষ্টির প্রকৃত কারণ কি—এই মূল্যবান তথ্যগুলি চিকিৎসক শিশুর সঙ্গে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে সংগ্রহ করেন। বলাবাহুল্য এই সাক্ষাৎকার একবারে বা একদিনেই শেষ হয়

না। বহুদিন ধরে ও বহু ধৈর্যপূর্ণ ঘণ্টা কাটানোর পর প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি তিনি সংগ্রহ করতে পারেন। অপসঙ্গতির চিকিৎসায় এই সাক্ষাৎকারের ভূমিকা সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শিশুর মনে যদি চিকিৎসক যথেষ্ট বিশ্বাস সৃষ্টি করতে না পারেন তাহলে তার কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি কখনই তিনি সংগ্রহ করতে পারেন না। ধৈর্য, আত্মবিশ্বাস, সহানুভূতি ও বিচক্ষণতা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে কোন চিকিৎসকই সাক্ষাৎকারকে সফল করে তুলতে পারেন না।

(তথ্যসংগ্রহের ব্যাপারে সাধারণ মনোবিজ্ঞানীরা সাক্ষাৎকারের উপর নির্ভর করলেও মনঃসমীক্ষণ গোষ্ঠিভুক্ত চিকিৎসকেরা এই ধরনের সাক্ষাৎকারকে মোটেই কার্যকর বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে অবাধ অনুষঙ্গের[১] পদ্ধতিটি (Free Association) হল শিশুর কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের একমাত্র কার্যকর পন্থা। প্রসিদ্ধ মনঃসমীক্ষণবিদ্ ফ্রয়েড এই অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিটির উদ্ভাবক। তাঁর মতে শিশুর সমস্যা বা মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রকৃত কারণ খুঁজে বার করতে হলে তার মনের গভীর তলদেশে অনুসন্ধান চালান অপরিহার্য। সাধারণ সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিশুর সেই অজ্ঞাত মনের সন্ধান পাওয়া যায় না এবং সেই জন্য অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি অবলম্বন করা ছাড়া অন্য কোন পন্থা নেই) ফ্রয়েডের অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিটির কার্যকারিতা সম্পর্কে সন্দেহের কোন কারণ না থাকলেও এই পদ্ধতিটি শিশুদের ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে সর্বত্র প্রয়োগ করা যথেষ্ট অসুবিধাজনক, সময়সাপেক্ষ ও শ্রমসাধ্য। সেই জন্য অনেক আধুনিক মনোবিজ্ঞানীই সাধারণভাবে খোলাখুলি প্রত্যক্ষ আলোচনার উপর নির্ভর করে থাকেন।

২। *সংব্যাখ্যান* (Interpretation)

(তথ্য সংগ্রহের পরবর্তী সোপান হল সংব্যাখ্যান। ব্যক্তির কাছ থেকে যে সব তথ্য চিকিৎসক সংগ্রহ করেন সেগুলির যথাযথ সংব্যাখ্যানের উপরই চিকিৎসার সাফল্য নির্ভর করে) সাধারণভাবে দেখা গেছে যে শিশু এমন বহু অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করে থাকে যেগুলির প্রকৃত সমস্যার সঙ্গে কোন দিক দিয়ে সম্পর্ক তো নেইই, উপরন্তু সেগুলি নানাভাবে প্রকৃত সমস্যাটিকে আবৃত করে রাখে। (চিকিৎসকের কাজ হল এই অজস্র তথ্যের মধ্যে থেকে প্রকৃত ও প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি খুঁজে বার করা এবং সেগুলির নির্ভুল সংব্যাখ্যান দেওয়া।) মনঃসমীক্ষণের অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতিতেও স্তূপীকৃত তথ্য মনঃসমীক্ষকের

১। পৃঃ ২১১ : দ্বিতীয় খণ্ড

হাতে এসে পৌঁছয় এবং সেগুলির মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয় ঘটনা বা চিন্তাটি তাঁকে খুঁজে বার করে নিতে হয়।

সংব্যাখ্যানের কাজটিই অবশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই চিকিৎসকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, অন্তর্দৃষ্টি ও প্রতিভার পরিচয় মেলে। বস্তুত সমস্যাটির যথাযথ সংব্যাখ্যান পেলে তার সমাধান আর দূরবর্তী থাকে না। প্রত্যেক চিকিৎসকেরই এই সংব্যাখ্যানের নিজস্ব পদ্ধতি ও রীতি আছে। মনঃসমীক্ষণবাদী চিকিৎসক-দের সংব্যাখ্যানের পদ্ধতি অনেক গভীর ও ব্যাপক। তাঁদের মতে মানসিক সমস্যার মূলেই আছে অচেতন মনের প্রভাব। মানুষের সচেতন মনে তার জটিল সমস্যাগুলির কোনও প্রকৃত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না। এই জন্যই তাঁরা কেবলমাত্র সাক্ষাৎকারে বিশ্বাসী নন। (মনঃসমীক্ষকেরা সমস্ত অপসঙ্গতির সংব্যাখ্যানই অচেতন মনের দ্বারা দেবার চেষ্টা করে থাকেন এবং তাঁদের চিকিৎসার পদ্ধতিও অচেতন মনের দ্বন্দ্ব বা বৈষম্য দূরীকরণের উপর প্রতিষ্ঠিত)

যে সব মনোবিজ্ঞানী মনঃসমীক্ষণ দলভুক্ত নন তাঁরাও অচেতন মনের অপরিসীম শক্তি ও প্রভাবের কথা স্বীকার করেন। যদিও তাঁরা মনঃসমীক্ষক-দের মত সমস্ত মানসিক সমস্যার মূলেই একমাত্র অচেতনের প্রভাবের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন না তবু মানসিক সমস্যার সৃষ্টিতে অচেতন মন যে প্রধানতম শক্তিরূপে কাজ করে সে বিষয়ে তাঁরা কোনরূপ সন্দেহ পোষণ করেন না। এই জন্য সাক্ষাৎকারের মধ্যে দিয়ে যে সব তথ্য তাঁদের হাতে পৌঁছয় সেগুলির সাহায্যে তাঁরা অচেতন মনের কার্যকলাপ অনুমানের চেষ্টা করে থাকেন। (তাঁদের মতে সাধারণ ও সরাসরি আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে অচেতন মনের কার্যকলাপের সন্ধান পাওয়া যায় এবং সেই সব তথ্যের দ্বারাই সমস্যাটির যথাযথ সমাধান করা সম্ভবপর হয়।)

চিকিৎসা (Therapy)

(অপসঙ্গতির সমস্যাটির স্বরূপ ও কারণ নির্ণয়ের পরবর্তী সোপান হল তার নিরাময়ের ব্যবস্থা করা। এখানে বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। শিশুর মানসিক ব্যাধির কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক বিভিন্ন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন এবং তাঁদের সেই বিভিন্ন তত্ত্ব অনুযায়ী তাঁদের চিকিৎসা ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে থাকে)

ক। অচেতন উদ্ঘাটন

(মানসিক অপসঙ্গতি সম্পর্কে যে চিকিৎসা পদ্ধতিটি সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ

করেছে সেটি হল ফ্রয়েডের মনঃসমীক্ষণভিত্তিক পদ্ধতি। ফ্রয়েডের পূর্বে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় সম্মোহনপদ্ধতির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করা হত। মনোবিজ্ঞানীরা চিরকালই এ সিদ্ধান্ত করে এসেছেন যে ব্যক্তির মনের মধ্যে কোন গুপ্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব বা কোন অবদমিত অতৃপ্তি থেকেই মানসিক ব্যাধি বা অপসঙ্গতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। কিন্তু মনের গভীর তলদেশে নিহিত এই মানসিক দ্বন্দ্ব বা অপসঙ্গতির সন্ধান সোজাসুজি বা প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় না। তার জন্য বিশেষ পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়।

এই অবদমিত চিন্তা, ধারণা বা অভিজ্ঞতা থেকে মানসিক অপসঙ্গতির সৃষ্টি হয়ে থাকে। সেজন্য মনঃসমীক্ষক চিকিৎসকেরা একথা বিশ্বাস করেন যে শিশুর অবদমিত চিন্তা, ইচ্ছা বা অভিজ্ঞতাটি তার সামনে উদ্ঘাটিত করে তুলতে পারলেই তার মানসিক অপসঙ্গতি দূর হয়ে যাবে। তাঁদের মতে অপসঙ্গতির চিকিৎসার প্রধান অঙ্গই হল অচেতন থেকে অবদমিত দ্বন্দ্বটিকে খুঁজে বার করা। যখন চিকিৎসক শিশুর অবচেতনের রহস্যটি উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন তখন তাঁর চিকিৎসার কাজও শেষ হয়ে যায়। মনোবিজ্ঞানী শিশুকে তার মনের এই অজ্ঞাত রহস্যটির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ দেন এবং যাতে সে ভবিষ্যতে আর অপসঙ্গতিমূলক আচরণ না করে সে সম্পর্কে যথাযথ পরামর্শ দেন। মনঃসমীক্ষণবাদী চিকিৎসকদের ক্ষেত্রে এই পরামর্শদানই মনোবিকারের চিকিৎসার মূল্যবান অঙ্গ।

যাঁরা মনঃসমীক্ষণবাদে বিশ্বাসী নন তাঁরা তথ্য আহরণের জন্য যেমন অবাধ অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ার ব্যবহার করেন না তেমনি অচেতনের কার্যকলাপের দ্বারা সমস্ত মানসিক অপসঙ্গতির ব্যাখ্যাও তাঁরা দেন না। ফ্রয়েডের প্রাক্তন সহকর্মী ইয়ুঙ এবং অ্যাডলার ফ্রয়েডের কাছ থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে স্বতন্ত্র চিকিৎসা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন। এঁদের মধ্যে ইয়ুঙ ফ্রয়েডের মতই অচেতনের প্রভাবে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তাঁর অনুসৃত চিকিৎসা পদ্ধতিতে অচেতনের কার্যকলাপের অনুসন্ধানকেই সর্বপ্রধান স্থান দিয়েছেন। কিন্তু অ্যাডলার তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিতে অচেতনের ভূমিকাকে মোটেই স্বীকার করেন নি এবং ব্যক্তির নিজস্ব প্রত্যাশা ও বাস্তবের মধ্যে অসামঞ্জস্যকেই মনোবিকারের প্রধান কারণ বলে বর্ণনা করেছেন। অ্যাডলার শিশুর মানসিক অপসঙ্গতির চিকিৎসার সময় অবাধ অনুষঙ্গের পদ্ধতিটি অনুসরণ করেন না। তিনি শিশুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সামনাসামনি আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে তার মনের দ্বন্দ্বটির প্রকৃত

স্বরূপ জানবার চেষ্টা করেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে অ্যাডলারের ব্যাখ্যায় শিশুর মধ্যে মনোবিকার তখনই আসে যখনই তার নিজস্ব শক্তি সম্পর্কে ধারণা এবং তার প্রকৃত সামর্থ্যের মধ্যে ব্যবধান বা বৈষম্য অলঙ্ঘনীয় হয়ে দেখা দেয়।

সাম্প্রতিক কালে ইউরোপ ও আমেরিকায় মনোবিকারের বহু চিকিৎসক দেখা দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে বেশ বড় একটি দলই ফ্রয়েডীয় পন্থায় পুরোপুরি বিশ্বাসী নন। কিন্তু তাঁরা সকলেই ফ্রয়েডের অচেতন মনের তত্ত্বটি মোটামুটি স্বীকার করে নিয়েছেন এবং অচেতন উদ্ঘাটনকে মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার প্রধানতম অঙ্গ বলে গ্রহণ করেছেন।

খ। আচরণের নিয়ন্ত্রণ

(বহু মনোবিকারের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পরামর্শদানের দ্বারাই ব্যাধির নিরাময় করা সম্ভব হয় না। সেই সঙ্গে শিশুর আচরণকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করারও প্রয়োজন দেখা যায়। অনেক সময় শিশু তার মানসিক ব্যাধির প্রকৃত কারণটি উপলব্ধি করতে পারলেও বাঞ্ছিত বা উপযুক্ত আচরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না) বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে নিজে থেকে কোন সুপরিকল্পিত আচরণধারা অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। (এই সব ক্ষেত্রে চিকিৎসককে শিশুর আচরণ সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় এবং সে যাতে সুনির্দিষ্ট একটি আচরণধারা অনুসরণ করে চলে তার উপযুক্ত ব্যবস্থাও তাঁকেই অবলম্বন করতে হয়। অবশ্য চিকিৎসকের একার পক্ষে শিশুর আচরণধারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। তার জন্য শিশুর পিতামাতা, শিক্ষক এবং আর সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে অপরিহার্য।)

(মনে করা যাক কোন শিশুর লেখাপড়ায় উৎকর্ষ প্রদর্শনের মত যথেষ্ট মানসিক শক্তি নেই। তার ফলে তার মধ্যে যে ব্যর্থতা আসে তা থেকে তার মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় এবং সে অপসঙ্গতিমূলক আচরণের আশ্রয় নেয়)। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে যে আত্মপ্রতিষ্ঠা সে লাভ করতে পারল না সেই কাম্য প্রতিষ্ঠা সে আদায় করল প্রচুর মিথ্যা গর্ব বা আস্ফালন করে বা নানা অবাস্তব কাহিনীর বর্ণনা করে। (চিকিৎসক তার এই অপসঙ্গতিমূলক আচরণের যথার্থ কারণকে যদি তার সামনে প্রকাশ করেন তাহলে তার অপসঙ্গতি কিছু পরিমাণে দূর হবে) সন্দেহ নেই কিন্তু তার মানসিক দ্বন্দ্ব বা ব্যর্থতা তার দ্বারা লোপ পাবে না। (এর জন্য প্রয়োজন লেখাপড়া ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে সে যাতে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে তার জন্য উপযোগী পথটি তাকে দেখিয়ে দেওয়া) শিশুটির

প্রকৃতিদত্ত শক্তি পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে যে লেখাপড়া ছাড়া আর অন্য কোন্ ক্ষেত্রে তার দক্ষতা আছে এবং তাকে সেই পথে পরিচালিত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ যদি দেখা যায় যে শিশুটির খেলাধূলায় পারদর্শিতা দেখাবার ক্ষমতা আছে বা অভিনয় বা অন্য কোন শিল্পে সহজাত নৈপুণ্য আছে তাহলে তাকে সেই পথে পরিচালিত করে তাকে আর সকলের কাছে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে সাহায্য করতে হবে। (এই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই শিশুটির অপসঙ্গতি চলে যাবে। এভাবে আচরণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে দিয়ে তার অপসঙ্গতির প্রকৃত নিরাময় দেখা দেবে।)

খেলাভিত্তিক চিকিৎসা (Play Therapy)

(ছোট শিশুর ক্ষেত্রে মনশ্চিকিৎসার সাধারণ পদ্ধতিগুলি সব সময় প্রয়োগ করা যায় না। তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেও তাদের মানসিক দ্বন্দ্বের স্বরূপ জানা সম্ভব নয়) খুব ছোট ছেলেমেয়েরা ভাষার সাহায্যে তাদের মনের ভাব ব্যক্ত করতেই পারে না, আলাপ আলোচনা করা ত দূরের কথা। অথচ (মানসিক দ্বন্দ্ব বা অপসঙ্গতি দেখা দেয় খুব অল্প বয়স থেকেই। সে জন্য খুব অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের মানসিক অপসঙ্গতি নিরাময়ের জন্য আধুনিক মনশ্চিকিৎসকেরা খেলাভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতিতে চিকিৎসক শিশুর খেলার মধ্যে দিয়ে তার মানসিক দ্বন্দ্বটির স্বরূপ নির্ধারণ করে থাকেন।)

(সকল মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন যে শিশুর ক্ষেত্রে খেলা একটি গুরুত্বপূর্ণ আচরণ। তার মনোভাব, রুচি, আকাঙ্ক্ষা, আশা, চাহিদা সবই তার খেলার মধ্যে দিয়ে বাইরের রূপ গ্রহণ করে। মনশ্চিকিৎসকগণ অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশুকে নানারকম খেলার সুযোগ দেন এবং তার সেই খেলার প্রকৃতি ও ধরন দেখে তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বটির স্বরূপ ধরতে পারেন এবং সেইমত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন) প্রখ্যাত শিশু মনশ্চিকিৎসক মেলানে ক্লিন ও ফ্রয়েড-কন্যা আনা ফ্রয়েড শিশুদের মানসিক চিকিৎসার পদ্ধতিরূপে খেলার বহুল ব্যবহার করে থাকেন।

(সাধারণত খেলাভিত্তিক চিকিৎসায় অপসঙ্গতিসম্পন্ন শিশুকে বহু বিভিন্ন প্রকৃতির খেলার সামগ্রী দেওয়া হয়। বিশেষ করে বিভিন্ন ধরনের পুতুল, বাড়ী গাড়ী প্রভৃতি খেলনা, ছবি আঁকার সরঞ্জাম, নানা রকম জিনিষ তৈরী করার উপযোগী মাটি, বালি, কার্ডবোর্ড, কাঁচি, কাগজ প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে শিশুর সামনে ধরা হয় এবং সেগুলি নিয়ে তাকে যেমন খুশী খেলতে বলা হয়।)

খেলাভিত্তিক চিকিৎসার পদ্ধতি

নানারকম খেলার সামগ্রী দিয়ে সাজান চিকিৎসাগারের খেলাঘরটিতে শিশুকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তাকে বলা হয়, তুমি এগুলির মধ্যে যে কোন জিনিষ নিয়েই খেলতে পারো।(সেই মুহূর্ত থেকেই চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণের কাজ সুরু হয়ে গেল। প্রথমেই চিকিৎসক দেখেন যে তাঁর এই কথার উত্তরে শিশুর মধ্যে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল। শিশু উৎসাহের সঙ্গে খেলা সুরু করে, না সে খেলতে ইতস্তত বোধ করে। চিকিৎসক আরও পর্যবেক্ষণ করেন যে শিশুর খেলা উদ্দেশ্যহীন না উদ্দেশ্যসম্পন্ন, সৃজনমূলক না ধ্বংসমূলক। সবশেষে শিশুর খেলা থেকে চিকিৎসক নির্ণয় করার চেষ্টা করেন যে শিশুর কোন অন্তর্নিহিত মানসিক দ্বন্দ্ব বা দুশ্চিন্তা তার খেলার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হচ্ছে কিনা। শিশুর খেলার মাঝে মাঝে চিকিৎসক ছোট ছোট উক্তি বা মন্তব্য করে শিশুকে তার মনোভাবটি আরও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করতে সাহায্য করেন। অনেক সময় চিকিৎসক নিজেও শিশুর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে খেলায় যোগ দিয়ে থাকেন।)

বয়স্কদের চিকিৎসার সময় যেমন আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে চিকিৎসক ব্যক্তির মানসিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য আবিষ্কার করতে পারেন তেমনই শিশুর খেলার মধ্যে দিয়েও শিশুর সম্পর্কে চিকিৎসক অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। শিশু অবশ্য বয়স্কদের ভাষায় কথা বলতে পারে না, কিন্তু তবু খেলার মধ্যে দিয়া সে যা ব্যক্ত করে তা যেমন প্রচুর, তেমনই তাৎপর্যপূর্ণ। শিশুর ভাষা হল প্রতীক বা চিহ্নের ভাষা। তার বিভিন্ন আচরণের মধ্যে দিয়ে শিশু তার বক্তব্যটি চিকিৎসকের সামনে তুলে ধরে এবং অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন চিকিৎসকের পক্ষে সেই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝতে অসুবিধা হয় না। নীচের একটি উদাহরণ থেকে খেলাভিত্তিক চিকিৎসার পদ্ধতিটি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে।

ডিক নামে পাঁচ বছরের একটি ছেলেকে চিকিৎসকের কাছে আনা হল। ছেলেটি সব সময় বিমর্ষ, গম্ভীর ও আত্মকেন্দ্রিক প্রকৃতির। প্রথম প্রথম সে চিকিৎসকের সঙ্গে একটিও কথা বলত না। লক্ষ্যহীনভাবে বালি নিয়ে খেলা করত কিংবা বক্সিংএর ব্যাগে এক নাগাড়ে ঘুসী মেরে যেত। পরের বারে সে আঙ্গুল দিয়ে ছবি আঁকতে সুরু করল এবং কাগজের উপর উজ্জ্বল রঙ দিয়ে বড় বড় দাগ টানতে লাগল। এইবার সে চিকিৎসকের সঙ্গে কিছু কিছু কথাবার্তা বলতে সুরু করল, কিন্তু তাও অত্যন্ত অল্প এবং সীমাবদ্ধ প্রকৃতির।

কিন্তু আরও কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল যে তার ভাবভঙ্গী বদলে গেছে।

সে ভালভাবেই চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে সুরু করল। চিকিৎসক তার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় যোগ দিলেন এবং তাকে তার নিজের খুসীমত খেলতে উৎসাহিত করতে লাগলেন।

ডিক হঠাৎ একটি খেলাঘরের বাড়ীর কাছে গেল এবং তার ভেতরে থেকে পুতুলগুলি টেনে টেনে বার করতে লাগল আর ভীষণ উত্তেজিতভাবে নিজের মনে মনে কি বলতে লাগল। তারপর এক সময় মা'র পোষাক পরা পুতুলটি টেনে বার করে খেলার বাড়ীর দেওয়ালে সজোরে ছুঁড়ে মেরে চীৎকার করে বলে উঠল, এইবার যাও। তার সমস্ত শরীর প্রবল উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল।

চিকিৎসক ডিককে তার কাছে সস্নেহে টেনে নিয়ে বললেন, সময় সময় তোমার মার উপর খুব রাগ হয় তাই না, ডিক। ডিক কান্নায় ফেটে পড়ে চিকিৎসকের কোলে মুখ লুকাল।

উপরের দৃষ্টান্তটি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে শিশুর মনের অবদমিত চিন্তাকে তার খেলার মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্ত করাই হচ্ছে এই পদ্ধতিটির প্রধানতম চেষ্টা। শিশু যাতে বিনা দ্বিধায় তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে এবং তার মনের দুশ্চিন্তা, ক্ষোভ বা ক্রোধাত্মক চিন্তা চিকিৎসককে অকপটে জানাতে পারে তার জন্য তাকে উৎসাহিত করা হয়। এর জন্য যে বস্তুটির বিশেষ করে প্রয়োজন হয় সেটি হল শিশুর সঙ্গে চিকিৎসকের একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন। শিশু যদি চিকিৎসকের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে শেখে এবং তাঁকে সত্যকারের হিতৈষী বন্ধু বলে মনে করে তাহলে তার মনের অবদমিত চিন্তা ও প্রক্ষোভ তাঁর কাছে উদ্ঘাটিত করতে সে দ্বিধা করে না।

শিশুর মনের অবদমিত চিন্তা ও রুদ্ধ কামনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ফলে শিশুর অপসঙ্গতির চিকিৎসা করা চিকিৎসকের পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। খেলাভিত্তিক চিকিৎসার উপকারিতা দ্বিবিধ। প্রথমত, শিশুর অবদমিত প্রক্ষোভ ও আবেগ বাইরে অভিব্যক্ত হওয়ার ফলে শিশুর মনের মধ্যে সমতা ও স্থৈর্য ফিরে আসে এবং তার অপসঙ্গতি অনেকখানি সেখানেই দূর হয়ে যায়। বস্তুত খেলাভিত্তিক চিকিৎসায় এই বদ্ধ প্রক্ষোভের বহিঃপ্রকাশই চিকিৎসার প্রধানতম অঙ্গ। দ্বিতীয়ত, এই অভিব্যক্ত মনোভাব ও প্রক্ষোভের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে চিকিৎসক তাঁর যথাযথ চিকিৎসার আয়োজন করতে পারেন।

খেলাভিত্তিক চিকিৎসা পদ্ধতি আধুনিক শিশু মনোবিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বহু পরীক্ষণের মাধ্যমে বর্তমানে এর কার্যকারিতা সপ্রমাণিত হয়েছে।

চার

অপসঙ্গতি নিরাময়ের উপায় (Cure of Maladjustment)

(অপসঙ্গতি হল শিশুর কোন মৌলিক চাহিদার অতৃপ্তির ফল। চাহিদাটি অতৃপ্ত থাকার ফলে মনের মধ্যে দেখা দেয় অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তারই বহিঃপ্রকাশ হল অপসঙ্গতিমূলক আচরণ।) অতএব ভীরুতা, আক্রমণধর্মিতা, ক্লাশপালানো, মিথ্যাভাষণ, অপহরণ, যৌন-অপরাধ প্রভৃতি যে সব আচরণকে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ বলে অভিহিত করা হয়, সেগুলির কোনটিই প্রকৃতপক্ষে ব্যাধি নয়, সেগুলি হল ব্যাধির বাহ্যিক লক্ষণমাত্র। প্রকৃত ব্যাধি নিহিত থাকে মনের মধ্যে অতৃপ্ত চাহিদার রূপে। অতএব অপসঙ্গতির চিকিৎসা করতে গেলে ঐ লক্ষণগুলির কেবলমাত্র চিকিৎসা করলে চলবে না। অর্থাৎ শিশুর ভীরুতা বা আক্রমণধর্মিতাকে পরিবর্তিত করা কিংবা তার ক্লাশপালান, মিথ্যাভাষণ, অপহরণ প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে দমন করার চেষ্টা করলেই হবে না। তার মনের গভীর স্তরে নিহিত অতৃপ্ত কামনাকে তৃপ্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে। এক কথায় অপসঙ্গতির চিকিৎসা নিছক লক্ষণমূলক হবে না, হবে উৎসমূলক। চিকি . করতে হবে অপসঙ্গতির লক্ষণের নয়, অপসঙ্গতির প্রকৃত উৎসের।

(যে সব মৌলিক চাহিদার তৃপ্তি শিশুর প্রাক্ষোভিক ও সামাজিক প্রয়োজনগুলি মেটানোর পক্ষে অপরিহার্য সেগুলি যাতে ব্যাহত না হয় তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে সর্বাগ্রে। আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, নিরাপত্তার চাহিদা, প্রশংসা ও সমর্থনের চাহিদা, স্নেহ-ভালবাসার চাহিদা, স্বাধীনতা ও দায়িত্ব-পালনের চাহিদা, সামাজিক পরিচিতির চাহিদা, সঙ্গলাভের চাহিদা—প্রভৃতি শিশুর প্রাথমিক চাহিদাগুলি যাতে অবশ্যই স্কুলে ও বাড়ীতে, সর্বত্র তৃপ্তিলাভের সুযোগ পায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এ সম্পর্কে পিতামাতা ও শিক্ষকদের কি করা উচিত সে সম্বন্ধে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হল।)

১। সুষম খাদ্য

মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্যের অতি নিকট সম্পর্ক। শরীর যদি সুস্থ বা যথোচিত পুষ্ট না থাকে তাহলে প্রক্ষোভমূলক সাম্য বজায় থাকে না। অজীর্ণ, ক্ষুধার অভাব, খাদ্যে বিরাগ ইত্যাদি উপসর্গ দেখা দিলে, বিরক্তি ও অপ্রীতিকর মনোভাবের সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে পরে ক্রমে অপসঙ্গতির

প্রবণতা। এজন্য সুষম খাদ্য হল মানসিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখার সর্বপ্রথম উপকরণ। দেহের প্রয়োজনমত খাদ্যের ব্যবস্থা করলে শিশুদের শরীর সুস্থ ও সুপুষ্ট থাকবে এবং অপসঙ্গতি সহজে দেখা দেবে না।

২। ব্যায়াম

কেবল খাদ্য হলেই হবে না, শরীরের সুপুষ্টির জন্য প্রয়োজন ব্যায়াম। নিয়মিত ব্যায়ামের অভ্যাস থাকলে পরিপাচনে কোন ত্রুটি দেখা দেবে না এবং স্বাস্থ্য সবল হয়ে উঠবে। তার ফলে শিশুদের প্রক্ষোভমূলক সাম্য অক্ষুণ্ণ থাকবে এবং সহজে অপসঙ্গতি দেখা দেবে না। তাছাড়া ব্যায়ামের মধ্যে দিয়ে অপসঙ্গতিমূলক অস্থিরতা বা চঞ্চলতা উপশমিত হয়ে থাকে।

৩। বিশ্রাম

পর্যাপ্ত বিশ্রামও শিশুর মানসিক সমতা রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজন। সারাদিনের পরিশ্রমে শরীরের যে সব ক্ষয় হয় তার পূরণের জন্য যেমন প্রয়োজন সুষম খাদ্যের, তেমনই প্রয়োজন বিশ্রামের। রাত্রে পর্যাপ্ত ঘুম ছাড়াও কাজের মধ্যে মধ্যে শিশু যাতে শারীরিক ও মানসিক বিশ্রাম পায় তার উপযুক্ত আয়োজন রাখতে হবে।

৪। ইন্দ্রিয়মূলক উৎকর্ষ

কোন কোন ছেলেমেয়ের মধ্যে নানা কারণে ইন্দ্রিয়মূলক দোষ দেখা যায়; বিশেষ করে চোখের এবং কানের দোষ অনেকেরই মধ্যে থাকে এবং ফলে তারা ভালভাবে দেখতে বা শুনতে পায় না। এই সব ছেলেমেয়ের পক্ষে ক্লাশে বোর্ডের লেখা দেখায় বা শিক্ষকদের পাঠ শোনায় প্রচুর অসুবিধা হয়। তার ফলে এদের মধ্যে একটা বিরক্তি ও ব্যর্থতার মনোভাব সৃষ্ট হয়। এই থেকে শিশুর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জন্ম নেয় এবং তা থেকে পরে অপসঙ্গতি দেখা দিতে পারে।

সেজন্য ছেলেমেয়েরা যাতে কোন রকম ইন্দ্রিয়ঘটিত অসামর্থ্য থেকে না ভোগে সেদিকে যত্ন নেওয়া তাদের মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। উপযুক্ত চিকিৎসককে দিয়ে প্রতিটি ছেলেমেয়েকে পরীক্ষা করিয়ে দেখতে হবে তাদের চোখ, কান বা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার দোষ আছে কিনা এবং থাকলে সে দোষ যে ভাবে দূর করা যায় তার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫। স্বাস্থ্যকর পরিবেশ

স্কুলে বা বাড়ীতে সর্বত্রই ছেলেমেয়েরা যে পরিবেশে বাস করে তা যাতে স্বাস্থ্যকর হয় সেদিকে যতটা সম্ভব মনোযোগ দিতে হবে। বিশেষ করে শিশুর বিকাশমান দেহমনের জন্য পর্যাপ্ত আলো ও হাওয়ার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে দেখা দেয় প্রক্ষোভমূলক অসমতা এবং তা অপসঙ্গতির সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলে।

৬। জানার আগ্রহ ও কৌতুহলের তৃপ্তি

বিকাশমান শিশুর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল যে তার বাইরের জগতের বস্তুগুলিকে সে ভাল করে চিনতে এবং জানতে চায়। তার কৌতূহল একরকম অসীম বললেই চলে। নতুন কিছু দেখলেই সে নানারকম প্রশ্ন করে, হাত দিয়ে বস্তুটি নাড়াচাড়া করে, বস্তুটি কি তা সে বলতে চায়। শিশুর কৌতূহলের পরিতৃপ্তি হওয়া তার মানসিক বিকাশের দিক দিয়ে যেমন প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন তার প্রক্ষোভমূলক সুসঙ্গতির জন্য। তাছাড়া তার এই কৌতূহলকে গঠনমূলক পথে পরিচালিত করে তাকে বাঞ্ছিত আচরণ ও জ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে।

৭। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান

প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিবিধানের আর একটি উপায় হল শিশুদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মেলামেশা ও তাদের আদান প্রদানের সুযোগ দেওয়া। বিভিন্ন সামাজিক ও কৃষ্টিমূলক দলের সংযোগে এসে শিশুর জ্ঞানের পরিধি প্রসারিত হয়, মনের উদারতা বাড়ে, মানসিক সাম্য বজায় থাকে এবং ছোটখাট ঘটনা বা বিশ্বাস তাদের মনকে বিক্ষুব্ধ করতে পারে না।

সামাজিক মেলামেলা অপসঙ্গতিকে দূরে রাখার একটি প্রশস্ত উপায়। বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শিশুদের প্রাক্ষোভিক সাম্য বজায় রাখা প্রভৃতি সুপরিচালিত কর্মসূচীর অন্তর্গত হওয়া উচিত।

৮। পরিচিতি ও স্বীকৃতি লাভ

শিশু একটু বড় হলেই তার মধ্যে অপরের কাছ থেকে পরিচিতি বা স্বীকৃতি-লাভের ইচ্ছা জাগতে থাকে। এই ইচ্ছার তৃপ্তির উপর নির্ভর করে তার নিরাপত্তাবোধ। যদি শিশু কোন না কোন দিক দিয়ে নিজের মূল্য প্রতিষ্ঠা করতে না পারে তাহলে তার মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার বোধ সৃষ্টি হয়। অথচ

সকল ছেলেই লেখা-পড়ায় ভাল হতে পারে না। অতএব স্কুলের পাঠক্রমে লেখাপড়া ছাড়াও খেলাধূলা, অঙ্কন, সঙ্গীত, অভিনয়, বিভিন্ন শিল্প প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়েও পর্যাপ্ত আয়োজন রাখতে হবে যাতে শিশু তার নিজস্ব প্রকৃতি-দত্ত শক্তির বিকাশের ক্ষেত্রটি খুঁজে পায় এবং তার অহংসত্তাকে কোন বিশেষ দিক দিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

৯। ভালবাসা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা

শিশুদের প্রক্ষোভমূলক সঙ্গতিবিধানের জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হল ভালবাসা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা। সে যে সমাজের আর দশজনের মত একজন এবং অন্যান্য সকলের মত তারও স্থান যে স্বীকৃত ও সুপ্রতিষ্ঠিত এটা শিশু যদি বুঝতে পারে তাহলে সহজে তার মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দেয় না। এর জন্য প্রয়োজন শিশুকে ভালবাসা, তাকে আপন করে নেওয়া এবং তাকে কখনও মনে করতে না দেওয়া যে সে অবহেলিত বা পরিত্যক্ত। এ থেকেই শিশুর মধ্যে দেখা দেবে অতি-প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং তার ফলে তার ব্যক্তিসত্তা স্বাভাবিক পন্থায় ও সুষমভাবে গড়ে উঠবে।

১০। অন্যান্য চাহিদার পরিতৃপ্তি

এ ছাড়া শিশুদের বিভিন্ন চাহিদাগুলির যাতে পূর্ণ তৃপ্তি হয় তার আয়োজন করাই অপসঙ্গতি নিবারণের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পন্থা। এগুলির মধ্যে নিরাপত্তার চাহিদা, আত্মস্বীকৃতির চাহিদা, সক্রিয়তার চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা ইত্যাদি চাহিদাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির যথাযথ পরিতৃপ্তির উপর নির্ভর করছে শিশুর প্রাক্ষোভিক সমতা ও অপসঙ্গতির নিরাময়।

এক

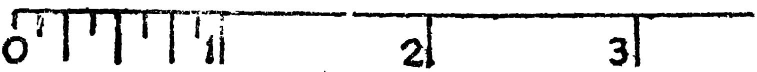
পরিমাপের স্বরূপ (Nature of Measurement)

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন বস্তু পরিমাপ করার প্রয়োজনীয়তা আমরা প্রতি পদেই অনুভব করে থাকি। যেমন, কতকগুলি বস্তুর মধ্যে কোন্‌টি বেশী ভারী, কোন্‌টি কম ভারী, বা কতকগুলি ছেলের মধ্যে কে বেশী লম্বা, কে কম লম্বা ইত্যাদি ধরনের পরিমাপ করাটা প্রায়ই আমাদের দরকার হয়ে পড়ে। এই পরিমাপ করার একটা সহজ পন্থা হল পরিমাপের বস্তুগুলিকে তাদেব বিশেষ গুণ বা ধর্ম অনুযায়ী সারি (rank) করে সাজান। একে **সারিবিন্যাস** (ranking) বলা হয়। যেমন, কতকগুলি ছেলেকে তাদেব উচ্চতা অনুযায়ী সারিবিন্যাস করা হল, অর্থাৎ সবচেয়ে লম্বা ছেলেটিকে সর্বপ্রথম, তারপর তার চেয়ে যে কম লম্বা, এইভাবে সব শেষে উচ্চতায় সবচেয়ে ছোট ছেলেটিকে রাখা। ঠিক এইভাবেই আমরা সবচেয়ে ভারী জিনিষটাকে প্রথম, তারপর তার চেয়ে কম ভারী, তারপর তারচেয়ে আর একটু কম ভারী, এইভাবে ওজনের দিক দিয়ে কতকগুলি জিনিষকে সারিবিন্যাস করতে পারি। সারিবিন্যাস থেকে আমরা সম্পূর্ণ সারিতে বিশেষ একটি বস্তু বা ব্যক্তির অবস্থান জানতে পারি এবং অন্যান্য বস্তু বা ব্যক্তির অবস্থানের সঙ্গে তার অবস্থানের একটি তুলনামূলক ধারণাও পেতে পারি। কিন্তু সারি থেকে বস্তু বা ব্যক্তির প্রকৃত পরিমাপ আমরা পাই না। যেমন, ছেলেদের উচ্চতার সারি থেকে আমরা জানতে পারি যে উচ্চতার দিক দিয়ে একটি দলের মধ্যে বিশেষ একটি ছেলের অবস্থান কোথায়, কিন্তু জানতে পারি না যে সে প্রকৃতপক্ষে কত লম্বা। ব্যক্তির পরিমাপ আমরা সাধারণত প্রকাশ করে থাকি বিশেষ সংখ্যার সাহায্যে। একে আমরা ব্যক্তির **স্কোর** (score) বলে থাকি। স্কোর নানা রকমের হতে পারে। যেমন, উচ্চতার বেলায় ব্যক্তির স্কোর গজ, ফুট, ইঞ্চি দিয়ে প্রকাশ করা হয়। ওজনের বেলায় গ্রাম, কিলোগ্রাম ইত্যাদি দিয়ে। তেমনই পরীক্ষার সাফল্যের স্কোর প্রকাশ করা হয় 30, 40, 50 ইত্যাদি সংখ্যা দিয়ে। বুদ্ধির অভীক্ষার সাফল্যের স্কোর হল বুদ্ধ্যঙ্ক। ব্যক্তির যে সকল গুণ, বৈশিষ্ট্য বা কর্মক্ষমতা পরিবর্তনশীল সেগুলিকেই আমরা স্কোর দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। কিন্তু

যে বৈশিষ্ট্যগুলি সকলের ক্ষেত্রে সমান সেগুলিকে স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। যেমন, মানুষের কটা হাত আছে, বা শরীরের কটা হাড় আছে, এগুলির ক্ষেত্রে ব্যক্তির কোন বিশেষ স্কোর নেই। এগুলি সকলের ক্ষেত্রেই এক ও অপরিবর্তনীয়। যে সকল গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে স্কোর দিয়ে প্রকাশ করা যায় সেগুলিকে সেইজন্য **বিষম বৈশিষ্ট্য** (variable) বলা হয়।

স্কেল (Scale) ও একক (Unit)

সাধারণত ব্যক্তির স্কোর কতকগুলি সম দূরত্ব-বিশিষ্ট সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। 1, 2, 3, 4, 5 বা 30, 40, 50, 60 এই সারি দুটিতে সংখ্যাগুলি পরস্পরের সঙ্গে সমদূরত্ব-সম্পন্ন। এই ধরনের সমদূরত্ব-সম্পন্ন সংখ্যাগুলি যখন পাশাপাশি সাজান যায় তখন তাকে স্কেল (scale) বলা হয়। কোন স্কেলের দুটি পাশাপাশি সংখ্যার মধ্যে বিয়োগ করলে সেই স্কেলের একক (unit) পাওয়া যায়। যেমন উপরের প্রথম সারিটির একক হল 1, দ্বিতীয় সারিটির একক হল 10;



[ইঞ্চির স্কেল]

সাধারণত প্রত্যেক স্কেলের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে, প্রথম, এর সংখ্যাগুলির দূরত্ব জ্ঞাপন করে একটি নির্দিষ্ট একক এবং দ্বিতীয়, স্কেলটির সুরু 0 বিন্দু থেকে। যে কোন একটি ইঞ্চি-ফুটের রুলার বা ফিতা পরীক্ষা করলে এ তথ্য দুটির প্রমাণ পাওয়া যাবে।

কিন্তু মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাগুলির ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। সেখানে স্কেলটির সুরু 0 থেকে হয় না। ফলে আমরা বলতে পারি যে 60 স্কোরটি 30 স্কোরের চেয়ে দ্বিগুণ ভাল। কিন্তু যে সব স্কেল 0 থেকে সুরু সে সব ক্ষেত্রে আমরা এ ধরনের কথা বলতে পারি, যেমন আমরা বলতে পারি যে 60 ইঞ্চি 30 ইঞ্চির ঠিক দ্বিগুণ।

অবিচ্ছিন্ন (Continuous) ও বিচ্ছিন্ন (Discrete) সারি

কোন পরিমাপ থেকে আমরা স্কোরের যে সারিটি পাই সেটি দু'রকমের হতে পারে, অবিচ্ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন। অবিচ্ছিন্ন সারির ক্ষেত্রে দুটি স্কোরের মধ্যে বিরাম বা ছেদটিকে আমরা প্রয়োজন হলে ক্ষুদ্রতর অংশে ভাগ করতে পারি। যেমন 1 টাকা, 2 টাকা, 3 টাকা—এই সারিটির ক্ষেত্রে আমরা 1 টাকা ও

2 টাকার মধ্যে ক্ষুদ্রতর অংশের কল্পনা করতে পারি এবং আমরা সেগুলিকে সংখ্যায় প্রকাশ করতেও পারি, যেমন 1·25 টাকা, 1·75 টাকা ইত্যাদি। কিন্তু বিচ্ছিন্ন সারির ক্ষেত্রে দুটি স্কোরের মধ্যে ব্যবধানকে ক্ষুদ্রতর কোন অংশে প্রকাশ করা যায় না। যেমন 1টি মানুষ, 2টি মানুষ, 3টি মানুষ—এই সারিতে 1টি মানুষ ও 2টি মানুষের মধ্যে কোন বিভাজন চলে না। অর্থাৎ 1·25 বা 1·75 মানুষ সত্যকারের হয় না।

অবিচ্ছিন্ন সারের ক্ষেত্রে স্কোরের অর্থ

অবিচ্ছিন্ন সারের স্কেলে পর পর দুটি সংখ্যার মাঝে যে ব্যবধানটি দেখা যায় সেটি প্রকৃতপক্ষে শূন্য স্থান নয়। প্রত্যেকটি স্কোরকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে যাতে এই ফাঁকটা ঢাকা পড়ে যায়। যেমন, কেউ যদি কোন কাজে 140 স্কোর পেয়ে থাকে, তবে তার প্রকৃত স্কোর ধরতে হবে 139·5 থেকে 140·5 পর্যন্ত। সেই রকম 141 স্কোরকে ব্যাখ্যা করতে হবে 140·5 থেকে 141·5 পর্যন্ত। ফলে দেখা যাবে যে 140 এবং 141 এর মধ্যে যে শূন্যস্থান ছিল সেটি এই ব্যাখ্যায় আর রইল না। অর্থাৎ 140, 141, 142 এই সারিটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হবে 139·5—140·5, 140·5—141·5, 141·5—142·5। এই ব্যাখ্যায় 140 স্কোরের মধ্যবিন্দু হল 140·0।



[অবিচ্ছিন্ন স্কোর ও তার মধ্য বিন্দু]

এছাড়া আরও এক প্রথায় স্কোরের ব্যাখ্যার প্রচলন আছে। সেখানে 140 স্কোরের অর্থ হল 140 থেকে 141 পর্যন্ত, কিন্তু 141 নয়। এই ব্যাখ্যার 140 স্কোরের মধ্যবিন্দু হল 140·5। তেমনই 141 স্কোরের অর্থ হল 141 – 142।

বিন্যস্ত (Grouped) ও অবিন্যস্ত (Ungrouped) স্কোর

কোন অভীক্ষার প্রয়োগ বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষণ থেকে আমরা এই ধরনের কতকগুলি স্কোর পেয়ে থাকি। যখন স্কোরগুলি সংখ্যায় অল্প হয় সেগুলির মধ্যে তুলনা করা বা তাদের সম্বন্ধে একটা সমগ্র ধারণা তৈরী করা সম্ভব হয়। কিন্তু যখন স্কোরগুলি সংখ্যায় অনেক হয়ে দাঁড়ায় তখন সেই স্কোরগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে না সাজালে সেগুলি আমাদের কাছে অর্থহীন থেকে যায় এবং বিশেষ কোন স্কোর সম্বন্ধে কোন রকম তুলনামূলক ধারণা গঠন করাও যায় না। যেমন, একটি কলেজের 100 ছেলেকে সাধারণ জ্ঞানের উপর একটি পরীক্ষা

দেওয়া হল এবং পাওয়া গেল 100টি স্কোর। কিম্বা কোন সহরের কত লোক-সংখ্যা ঠিক করতে গিয়ে পৃথিবীর বড় বড় 100টি সহরের লোকসংখ্যার সূচক-রূপে পাওয়া গেল 100টি সংখ্যা। এই স্কোরগুলির তাৎপর্য ঠিকমত ধরতে গেলে এদের আগে সাজিয়ে নিতে হবে। স্কোরগুলিকে পরিসংখ্যানে সাধারণত যে-ভাবে সাজান হয় তাকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন (Frequency Distribution) বলা হয়। এক গুচ্ছ স্কোরকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে গুচ্ছের মধ্যে কোন স্কোরটি মাত্র একবার এসেছে, কোনটি আবার একের বেশী বার এসেছে, কোনটি এক-বারও আসেনি। কোন একটি স্কোরের এই আবির্ভাবের বার বা সংখ্যাকে ফ্রি-কোয়েন্সী বলা হয়। যেমন, স্কোর-গুচ্ছের মধ্যে যে স্কোরটি মাত্র একবার এসেছে তার ফ্রিকোয়েন্সী 1; যেটি 5 বার এসেছে তার ফ্রিকোয়েন্সী 5, আর যে স্কোরটি এক বারও আসেনি তার ফ্রিকোয়েন্সী 0। স্কোরগুলিকে তাদের ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী সাজানোকেই ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন বলা হয়।

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন গঠনের নিয়ম

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে স্কোরগুলিকে তাদের ফ্রিকোয়েন্সী বা আবির্ভাবের বার বা সংখ্যা অনুযায়ী সাজান হয়ে থাকে। এভাবে যখন অবিন্যস্ত (ungrouped) স্কোরগুচ্ছকে ফ্রিকোয়েন্সীবণ্টনে সাজান হয় তখন তাকে **বিন্যস্ত** (grouped) স্কোর বলে। ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন তৈরী করার সময় নীচের নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হয়।

১। প্রথমেই স্কোরগুলির প্রসার বা রেঞ্জ নির্ণয় করতে হয়। বৃহত্তম স্কোর এবং ক্ষুদ্রতম স্কোরের মধ্যে যে ব্যবধান তাকে **প্রসার বা রেঞ্জ** বলে। বৃহত্তম স্কোর থেকে ক্ষুদ্রতম স্কোরকে বিয়োগ করলে রেঞ্জ বা প্রসার (Range) পাওয়া যায়।

২। স্কোরগুলিকে সাজানর জন্য সেগুলিকে কতকগুলি সুনির্দিষ্ট দল বা শ্রেণীতে ভাগ করতে হয়। এগুলিকে **শ্রেণী-ব্যবধান** বা ক্লাশ ইণ্টারভ্যাল (Class interval) নাম দেওয়া হয়েছে। মোট কতগুলি শ্রেণী-ব্যবধান হবে এবং প্রত্যেকটি শ্রেণী-ব্যবধানের আয়তন কত হবে সেটা আগেই নিরূপণ করে নিতে হবে। শ্রেণী-ব্যবধানের সংখ্যা ও আয়তন সাধারণত নির্ভর করে স্কোরের প্রসার বা রেঞ্জের উপর এবং কিছু পরিমাণে স্কোরগুলির প্রকৃতির উপর।

৩। এইবার প্রত্যেকটি স্কোর যে শ্রেণী-ব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত সেই শ্রেণী-ব্যবধানে সেটিকে তালিকাভুক্ত করতে হবে।

নীচে ফ্রিকোয়েন্সী-বণ্টন গঠনের একটি উদাহরণ দেওয়া হল।

উদাহরণ ঃ—50-জন কলেজের প্রবেশপ্রার্থীকে একটি সাধারণ জ্ঞানের পরীক্ষা দেওয়া হল। পাওয়া গেল নীচের স্কোরগুলি ঃ—

85	66	51	4	66	91	77	64	71	74
47	78	58	†42	70	58	71	67	80	78
73	48	68	87	81	72	65	69	73	79
*97	81	76	87	56	72	62	93	73	84
75	56	76	61	53	72	62	78	88	83

* সর্বোচ্চ স্কোর † সর্বনিম্ন স্কোর

প্রথমে, এই স্কোরগুলির প্রসার বা রেঞ্জ বার করা হল। এর বৃহত্তম স্কোর 97 থেকে এর ক্ষুদ্রতম স্কোর 42 বাদ দিয়ে এর রেঞ্জ পাওয়া গেল 55।

দ্বিতীয় ধাপে এর শ্রেণীব্যবধান বা ক্লাশ ইন্টারভ্যাল নির্ণয় করতে হবে। দেখা যাচ্ছে প্রসার বা রেঞ্জ হচ্ছে 55। সাধারণত নিয়ম হচ্ছে যে শ্রেণীব্যবধান এমনভাবে নির্ণয় করতে হবে যাতে সেগুলি সংখ্যায় দশের কম বা কুড়ির বেশী না হয়। অতএব এখানে যদি শ্রেণী ব্যবধান 5 নেওয়া হয়, তবে শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা দাঁড়ায় 12টি। 55কে 5 দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় 11, এর উপর আর একটি শ্রেণী বেশী করে নিতে হয়। তেমনই যদি শ্রেণীব্যবধান নেওয়া হত 3 তবে শ্রেণীর সংখ্যা হত 19টি (18+1) এবং যদি শ্রেণীব্যবধান নেওয়া হত 10 তবে শ্রেণীর সংখ্যা হত 6টি (5+1)। এখানে আমরা 5কে ব্যবধান হিসেবে ধরে নিয়ে ফ্রিকোয়েন্সী-বণ্টন গঠন করলাম।

শ্রেণীব্যবধান	ট্যালি	ফ্রিকোয়েন্সী (f)
95—99	/	1
90—94	//	2
85—89	////	4
80—84	/////	5
75—79	///// ///	8
70—74	///// /////	10
65—69	///// /	6
60—64	////	4
55—59	////	4
50—54	//	2
45—49	///	3
40—44	/	1
		$N=50$

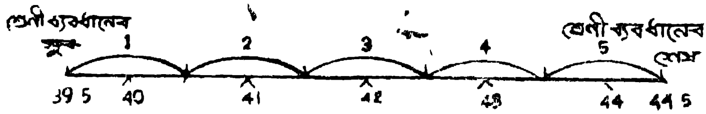
[উপরের 50টি স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের বিন্যস্ত রূপ]

এইবার আমরা স্কোরগুলিকে তাদের নিজেদের শ্রেণীব্যবধান অনুযায়ী তালিকাভুক্ত করলাম। উপরের ছবিতে বাঁদিকের প্রথম সারিটি হল শ্রেণী-ব্যবধানের। সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্কোরটি আছে সব নীচে, তার উপরে তার চেয়ে বড়, এইভাবে সব উপরে আছে সবচেয়ে বড় স্কোরটি। প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যে আছে 5টি করে স্কোর যেমন, 40—44 এই শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যে আছে 40, 41, 42, 43 এবং 44 এই 5টি স্কোর। তার উপরের শ্রেণীব্যবধান 45—49টির মধ্যে আছে 45, 46, 47, 48 এবং 49 এই 5টি স্কোর। সব চেয়ে উপরের শ্রেণীব্যবধান 95—99র মধ্যে আছে 95, 96, 97, 98 এবং 99 এই 5টি স্কোর। 5'র পাতার ছবির দ্বিতীয় সারিতে যে দাগগুলি দেওয়া হয়েছে এগুলিকে ট্যালি (tally) বলে। যখনই কোন একটি বিশেষ শ্রেণীব্যবধানের মধ্যে একটি বিশেষ স্কোরকে অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা গেল তখনই সেই শ্রেণী-ব্যবধানটির পাশে একটি ট্যালির দাগ দেওয়া হল। যেমন, এখানে প্রথম স্কোর 85 বণ্টনের নীচে থেকে দশম শ্রেণীব্যবধান (85—89)টির অন্তর্গত, অতএব এই স্কোরটির জন্য ঐ শ্রেণীব্যবধানটির পাশে একটি ট্যালি দাগ দেওয়া হল। তেমনই দ্বিতীয় স্কোর 47 নীচে থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীব্যবধান (45—49)টির অন্তর্গত। অতএব স্কোরটির জন্য ঐ শ্রেণীব্যবধানটির পাশে একটি ট্যালি দাগ দেওয়া হল। এইভাবে সবগুলি স্কোরের জন্য যে যে শ্রেণীব্যবধানের তারা অন্তর্গত সেই সেই শ্রেণীব্যবধানের পাশে একটি করে ট্যালির দাগ দেওয়া হল। যখন 50টি স্কোরই এভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে যে ট্যালির সংখ্যাও 50 হয়েছে। উপরের ছবির তৃতীয় সারিতে আছে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত স্কোরগুলির ফ্রিকোয়েন্সীর মোট সংখ্যা। বিভিন্ন শ্রেণীব্যবধানের ট্যালি-গুলি যোগ করলে সেই শ্রেণীব্যবধানের মোট ফ্রিকোয়েন্সী পাওয়া যাবে। যেমন 75—79 শ্রেণীব্যবধানটির ট্যালিগুলি যোগ করে এই শ্রেণীব্যবধানটির মোট ফ্রিকোয়েন্সী পাওয়া গেল 8; সেইরকম 70—74 শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী হল 10; 65—69 শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী হল 6 ইত্যাদি। ফ্রিকেয়েন্সীর যোগফল থেকে পাওয়া যাবে বণ্টনের মোট সংখ্যা (Number) বা N; এখানে N = 50.

শ্রেণীব্যবধানের প্রান্ত বা সীমা (Limits) নির্ণয়

ফ্রিকোয়েন্সী-বণ্টনে স্কোরগুলিকে তালিকাভুক্ত করার সময় শ্রেণীব্যবধান-গুলির প্রকৃত প্রান্ত বা সীমা নির্ণয় করে নিতে হয়। নইলে স্কোরটিকে যে ঠিক

কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে সেটা নির্ণয় করতে অসুবিধা হবে। প্রত্যেকটি শ্রেণীরই দুটি প্রান্ত আছে—ঊর্ধ্বপ্রান্ত (Upper limit) এবং নিম্নপ্রান্ত (Lower limit)। যেমন, 40—44 এই শ্রেণীটির সব নীচে আছে 40 স্কোরটি এবং সব



উপরে আছে 44 স্কোরটি। এখন 40 বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় 39·5 থেকে 40·5। অতএব এই শ্রেণীর সুরু 39·5 থেকে। তেমনই 44'র প্রকৃত ব্যাখ্যা হল 43·5 থেকে 44·5। অতএব 40—44 এই শ্রেণীটির প্রকৃত নিম্নপ্রান্ত হল 39·5 এবং ঊর্ধ্বপ্রান্ত হল 44·5।

সেই রকম 45—49 শ্রেণীটির সংব্যাখ্যান করলে দাঁড়ায় 44·5—49·5। 50—54 শ্রেণীটির 49·5—54·5 ইত্যাদি। এখন প্রশ্ন হতে পারে 44 স্কোরটি কোন্ শ্রেণীতে পড়বে? 40—44তে, না 45—49তে। এর উত্তর হল যে আমরা এ ধরনের দুটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবর্তী স্কোরটিকে নীচের বা উপরের যে কোন শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। তবে যে নিয়মটা একটি বিশেষ বণ্টনে একবার গ্রহণ করা হবে পরে সেই নিয়মটাই সেই বণ্টনে সব সময় অনুসরণ করতে হবে। বর্তমান বইতে আমরা এই ধরনের স্কোরগুলিকে নীচের শ্রেণী-ব্যবধানে অন্তর্ভুক্ত করব। অর্থাৎ 44 স্কোরটিকে 40—44র শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করব, 45 স্কোরটিকে 45—49 শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করব ইত্যাদি।

শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু (Midpoint) নির্ণয়

ফ্রিকোয়েন্সী-বণ্টন গঠনের সময় প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানে কতকগুলি করে স্কোর তালিকাভুক্ত হয়। যেমন 5'র পাতার দৃষ্টান্তে 45—49 শ্রেণীতে 3টি স্কোর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখন এই 3টি স্কোরেরই প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন একটি মানের দরকার পড়ে। সাধারণত শ্রেণীটির প্রতিনিধিমূলক মানরূপে ঐ শ্রেণীটির মধ্যবিন্দুকে গ্রহণ করা হয়। যে কোন শ্রেণীর অন্তর্গত স্কোরগুলি প্রত্যেকটির মান ঐ শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর সমান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। যেমন 45—49 শ্রেণীর অন্তর্গত 3টি স্কোরেরই মান হল ঐ শ্রেণীর মধ্যবিন্দু 47। মধ্যবিন্দু নির্ণয়ের সূত্র হল—

$$\text{মধ্যবিন্দু} = \text{শ্রেণীর নিম্নপ্রান্ত} + \frac{\text{ঊর্ধ্বপ্রান্ত} - \text{নিম্নপ্রান্ত}}{2}$$

এই সূত্রটি উপরের দৃষ্টান্তে প্রয়োগ করে আমরা পাই

$$45-49 \text{ শ্রেণীটির মধ্যবিন্দু} = 44{\cdot}5 + \frac{49{\cdot}5 - 44{\cdot}5}{2} = 44{\cdot}5 + 2{\cdot}5 = 47.$$

শ্রেণীব্যবধান লিখনের তিনটি পন্থা

একটি শ্রেণীব্যবধানকে কিভাবে লিখতে হয় উপরে তার একটি পদ্ধতির বর্ণনা করা হল। এছাড়াও আরও দু' উপায়ে একটি শ্রেণীব্যবধান লেখা যেতে পারে। যেমন, 40—45 এই শ্রেণীব্যবধানটিকে আমরা (ক) 40 থেকে 45, (খ) 39·5 থেকে 44·5 এবং (গ) 40 থেকে 44 এই তিন উপায়ে লিখতে পারি। এর মধ্যে (খ)'র পন্থাটি সবচেয়ে নিখুঁত, কিন্তু লিখতে সময় এবং শ্রম বেশী লাগে বলে (ক) এবং (গ)'র পন্থা দুটি সাধারণত অনুসৃত হয়। আমরা (গ) পদ্ধতিটিই এ বইতে অনুসরণ করব। নীচে তিন রকম পন্থা ব্যবহার করে একটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন গঠন করা হল।

(ক) শ্রেণী ব্যবধান	মধ্য বিন্দু	f	(খ) শ্রেণী ব্যবধান	মধ্য বিন্দু	f	(গ) শ্রেণী ব্যবধান	মধ্য বিন্দু	f
95—100	97	1	94·5—99·5	97	1	95—99	97	1
90—95	92	2	89·5—94·5	92	2	90—94	92	2
85—90	87	4	84·5—89·5	87	4	85—89	87	4
80—85	82	5	79·5—84·5	82	5	80—84	82	5
75—80	77	8	74·5—79·5	77	8	75—79	77	8
70—75	72	10	69·5—74·5	72	10	70—74	72	10
65—70	67	6	64·5—69·5	67	6	65—69	67	6
60—65	62	4	59·5—64·5	62	4	60—64	62	4
55—60	57	4	54·5—59·5	57	4	55—59	57	4
50—55	52	2	49·5—54·5	52	2	50—54	52	2
45—50	47	3	44·5—49·5	47	3	45—49	47	3
40—45	42	1	39·5—44·5	42	1	40—44	42	1
	$N=50$			$N=50$			$N=50$	

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের চিত্ররূপ—পলিগন ও হিস্টোগ্রাম

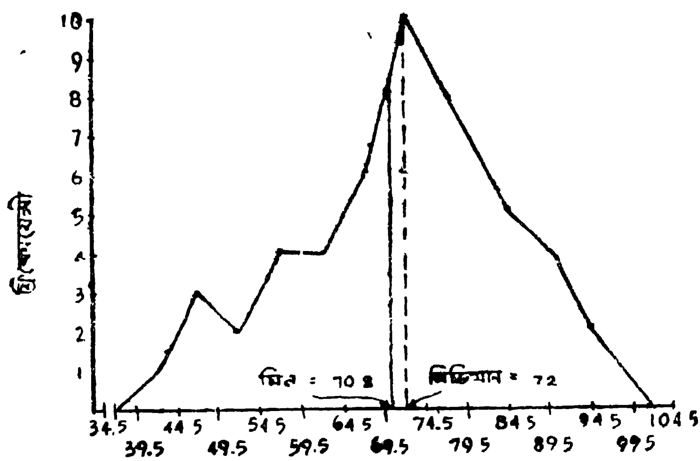
অবিন্যস্ত স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী সাজিয়ে যে ফ্রিকোয়েন্সী-বণ্টন গঠন করা হয় তাকে নানা উপায়ে চিত্রে রূপান্তরিত করা যায়। তার মধ্যে দুটি সুপ্রচলিত পদ্ধতির নাম হল, ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন বা বহুভুজ (Frequency Polygon) এবং হিস্টোগ্রাম বা স্তম্ভচিত্র (Histogram)।

ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন (Frequency Polygon) গঠনের নিয়ম

পলিগন বা হিষ্টোগ্রাম, যে কোন চিত্র আঁকতে গেলে প্রথমে একটি অধঃরেখা (base line) ঠিক করে নিতে হবে। এই অধঃরেখার সর্ববাম প্রান্তে লম্বভাবে আর একটি রেখা টানতে হবে। বীজগণিতের চিত্র আঁকার সময় যাকে X-অক্ষরেখা এবং Y-অক্ষরেখা বলা হয় আমাদের অধঃরেখা ও লম্বরেখাটিও তাদের সঙ্গে অভিন্ন।

এখন নীচের অধঃরেখা বা X-অক্ষরেখার উপর শ্রেণীব্যবধানগুলি পর পর বসাতে হবে এবং লম্বরেখা বা Y-অক্ষরেখার উপর ফ্রিকোয়েন্সীগুলি ছকতে হবে। শ্রেণীব্যবধানগুলি অধঃরেখায় বসাবার সময় সেগুলির প্রকৃত প্রান্তগুলির উল্লেখ করতে হবে।

এর পরের ধাপে চিত্রটিতে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সীর অবস্থান নির্ণয় করতে হবে এবং সেইমত সেইগুলিকে ছকে নিতে হবে। যেমন, দেখা যাচ্ছে 40—44 (অর্থাৎ 39.5—44.5) শ্রেণীটির ফ্রিকোয়েন্সী হল 1 ; এটিকে আঁকতে হলে প্রথমে X-অক্ষরেখায় ঐ শ্রেণীটির মধ্যবিন্দু অর্থাৎ 42 স্কোরে



পৌঁছতে হবে। তারপর ঐ বিন্দুটির উপর লম্বভাবে Y-অক্ষরেখার সমান্তরাল করে 1 একক ঘর উপরের দিকে গুনতে হবে এবং তার ফলে যে বিন্দুটি পাওয়া যাবে সেইটি হবে এই শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সীর চিত্ররূপ। সেইভাবে পরের শ্রেণীব্যবধানটি 45—49 (অর্থাৎ 44·5—49·5)'র অন্তর্গত হল 3টি স্কোর। এইবার ঐ শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু 47'র ঠিক উপরে Y-অক্ষরেখার সমান্তরাল

করে 3টি একক ঘর গুনে ঐ ফ্রিকোয়েন্সীটির অবস্থান ছকতে হবে। এ ভাবে আমাদের সব কটি শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সীর অবস্থানগুলি ছকে ফেলতে হবে এবং প্রত্যেকটি ফ্রিকোয়েন্সীর জন্য আমরা চিত্রটিতে একটি করে বিন্দু পাব। তারপর সেই বিন্দুগুলিকে সরলরেখা দিয়ে যোগ করলে ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনটি পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে যে ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুকেই ঐ শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থচক বিন্দু বলে ধরে নেওয়া হয় এবং ঐ মধ্যবিন্দুর উপর অঙ্কিত লম্বরেখাতেই ফ্রিকোয়েন্সীর বিন্দুটি ছকতে হয়।

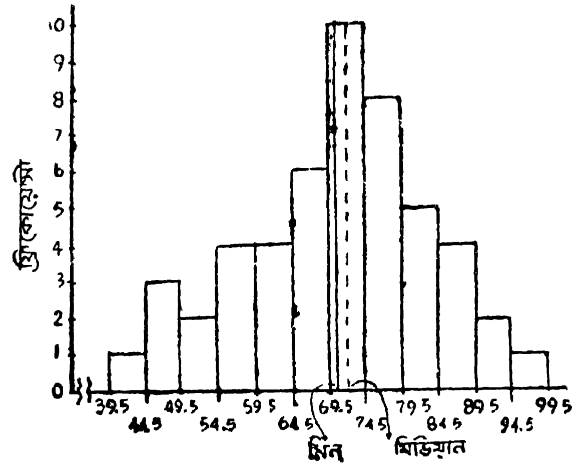
ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনের ক্ষেত্রে ফ্রিকোয়েন্সীস্থচক বিন্দুগুলিকে সরলরেখা দিয়ে যোগ করলে যে চিত্রটি পাওয়া যায় সেটি অধঃরেখা বা X-অক্ষরেখাকে স্পর্শ করে না এবং কিছুটা উপরে শূন্যে ঝুলে থাকে। চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করার জন্য X-অক্ষরেখার বাম প্রান্তে একটি শ্রেণীব্যবধান এবং ডানপ্রান্তে একটি শ্রেণীব্যবধান বেশী নেওয়া হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত দুটি শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী স্বভাবত 0 বলে এদের মধ্যবিন্দুগুলি X-অক্ষরেখার উপরেই অবস্থিত। ফলে এদের সঙ্গে চিত্রটিকে সংযুক্ত করলেই একটি পূর্ণাঙ্গ ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন পাওয়া যাবে।

যাতে ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনটি আকৃতিতে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সুষম হয় সেজন্য শ্রেণীব্যবধানের দূরত্ব এবং ফ্রিকোয়েন্সীর সর্বোচ্চ মান—এ দুটি বিবেচনা করে X-অক্ষরেখা ও Y-অক্ষরেখার এককগুলি নির্বাচিত করতে হয়। যেমন, যদি X-অক্ষরেখার একক ছোট হয় এবং সে অনুপাতে Y-অক্ষরেখার একক খুব বড় হয় তবে পলিগনটি অস্বাভাবিকভাবে লম্বা হয়ে যাবে। আবার যদি X-অক্ষরেখার একক বড় হয় এবং সেই অনুপাতে Y-অক্ষরেখার একক ছোট হয় তবে পলিগনটি ছোট ও উপরের দিকে চ্যাপ্টা দেখাবে। সেজন্য X-অক্ষরেখার অঙ্কিত শ্রেণীব্যবধানগুলির দৈর্ঘ্য ও Y-অক্ষরেখার অঙ্কিত ফ্রিকোয়েন্সীর সর্বোচ্চ উচ্চতা—এ-দুয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুপাত আনার চেষ্টা করা হয় এবং সাধারণভাবে দেখা হয় যে পলিগনটির উচ্চতা যেন তার নিম্নভূমির মোট দৈর্ঘ্যের 75% বা তার কাছাকাছি হয়। একে 75% নিয়ম বলা হয়।

হিষ্টোগ্রাম (Histogram) বা স্তম্ভচিত্র গঠনের নিয়ম

ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের আর একটি চিত্ররূপকে হিষ্টোগ্রাম বা স্তম্ভচিত্র বলা হয়। 5'র পাতার ঐ একই বণ্টনের একটি হিষ্টোগ্রাম বা স্তম্ভচিত্র পরের পাতায় আঁকা হয়েছে। হিষ্টোগ্রামের অধঃরেখা বা X-অক্ষরেখায় শ্রেণীব্যবধানগুলিকে

ছকে নেওয়া হয়। বামপ্রান্তের লম্বরেখায় বা Y-অক্ষরেখায় ফ্রিকোয়েন্সীগুলি ছকা হয়। এইবার প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সীসূচক বিন্দুটি Y অক্ষরেখায় গুনে বার করতে হয় এবং সেই বিন্দুটিকে ঊর্ধ্বসীমা ধরে X-রেখায়



ঐ শ্রেণীব্যবধানটির উপর একটি আয়তক্ষেত্র আঁকতে হয়। প্রত্যেকটি আয়ত-ক্ষেত্রের বিস্তার হবে শ্রেণীব্যবধানের দূরত্বের সমান এবং যেহেতু সমস্ত শ্রেণী-ব্যবধানের দূরত্ব একই, ক্ষেত্রগুলির প্রস্থ বা প্রসার সব ক্ষেত্রেই এক। কিন্তু আয়তক্ষেত্রগুলির উচ্চতা হবে সেই বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত স্কোরের সংখ্যা বা ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী। ফলে বিভিন্ন আয়তক্ষেত্রের উচ্চতা বিভিন্ন হবে।

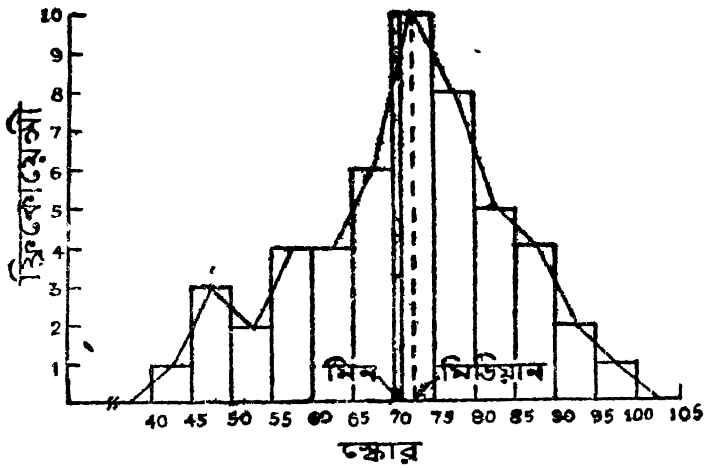
উপরের দৃষ্টান্তে প্রথম শ্রেণীব্যবধান 40—44 (অর্থাৎ 39.5 -44.5)'র ফ্রিকোয়েন্সী হল 1। অতএব ঐ শ্রেণীব্যবধানের উপরে Y-অক্ষরেখায় এক একক ঘর গুনে নিয়ে এই উচ্চতা পর্যন্ত একটি আয়তক্ষেত্র আঁকা হল। সেইরকম 45—49 (44.5—49.5) শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী হল 3, অতএব ঐ শ্রেণীব্যবধানের উপর Y-অক্ষরেখায় 3 একক ঘর গুনে আয়তক্ষেত্র আঁকা হল। এইভাবে সব কটি শ্রেণীব্যবধানের উপর আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করলেই এই বণ্টনটির হিস্টোগ্রাম বা স্তম্ভচিত্রটি পাওয়া যাবে।

ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন ও হিস্টোগ্রাম উভয়ের বেলাতেই চিত্রের মধ্যবর্তী ক্ষেত্রটির দ্বারা বণ্টনের সমগ্র ফ্রিকোয়েন্সীকে (যার নাম আমরা N দিয়েছি) বোঝায়। তবে ফ্রিকোয়েন্সী পলিগনে প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সীকে বোঝাবার কোন ব্যবস্থা নেই. কিন্তু হিস্টোগ্রামের প্রত্যেকটি

আয়তক্ষেত্র এক একটি শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্গত ফ্রিকোয়েন্সীকে বুঝিয়ে থাকে। সে দিক দিয়ে সমগ্র ফ্রিকোয়েন্সীর সঙ্গে বিভিন্ন শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সীর অনুপাতের নিখুঁত ধারণা হিষ্টোগ্রাম থেকেই পাওয়া যায়।

পলিগন ও হিষ্টোগ্রামের অভিস্থাপন

একই অক্ষরেখার উপর একই বা বিভিন্ন বণ্টনের দুটি পলিগন বা দুটি হিষ্টোগ্রাম বা একটি পলিগন এবং অপরটি হিষ্টোগ্রাম আঁকা যেতে পারে। সাধারণত দুটি বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মধ্যে তুলনার সময় একটির পলিগন ও অপরটির হিষ্টোগ্রাম একই অক্ষরেখার উপর এঁকে তাদের মধ্যে মিল ও অমিল



[5 পাতার 50টি স্কোরের বণ্টনের পলিগন ও হিষ্টোগ্রাম একই অক্ষরেখায় অভিস্থাপন করা হয়েছে]

পর্যবেক্ষণ করা হয়ে থাকে। এই ধরনের অভিস্থাপনের দ্বারা দুটি বণ্টনের অতি চমৎকার একটি তুলনামূলক সামগ্রিক ধারণা পাওয়া যায়।

দশমিক সংখ্যার সংবৃতকরণ

দশমিক বিশিষ্ট সংখ্যাগুলিকে প্রায়ই সংক্ষিপ্ত বা সংবৃত করার দরকার পড়ে। যেমন, 7.8456 সংখ্যাকে দু'ঘর দশমিকে সংবৃত করলে দাঁড়ায় 7.85, তেমনই একঘর দশমিকে 7.8। সংবৃতকরণের সাধারণ নিয়ম হল যে যদি পরে 5 বা 5'র বেশী সংখ্যা থাকে তাহলে ঠিক পুরোবর্তী সংখ্যাটি এক অঙ্ক বেড়ে

যাবে আর যদি পরবর্তী সংখ্যাটি 5'র কম হয় তাহলে কোন রকম পরিবর্তন করার দরকার নেই। যেমন, 8·6453 বা 8·6473 কে দু'ঘর দশমিকে সংবৃত্ত করলে দাঁড়াবে 8·65, কিন্তু 8·6443-কে দু'ঘর দশমিকে সংবৃত করলে দাঁড়াবে 8·64।

প্রশ্নমালা

1. Indicate which of the following variables fall into continuous and which into discrete series (a) time (b) salaries in a large business firm (c) sizes of classes in a college (d) age (e) census data (f) distance travelled by a train (g) cricket scores (h) weight (i) number of pages in 100 books (j) I. Q.

2. Give the upper and lower limits of the following scores, 64, 8, 365, 1, 86, 165.

3. Below are shown the ranges of some sets of scores. Indicate how large an interval and how many intervals you will suggest in drawing up a frequency distribution of each set.

Range	Size of interval	No. of intervals
15 to 87		
0 to 46		
110 to 211		
65 to 152		
3 to 13		

4. Write down (a) the exact lower and upper limits of the following class intervals and (b) the midpoint of each interval.

45—47	160—164	63—67	0—9
1—4	80—89	15—16	26—29

5. Tabulate the following 15 scores into a frequency distribution using an interval of three. Begin the first interval with 60.

72	75	67	81	60
82	67	75	85	62
75	64	65	79	61

6. Tabulate the following scores into three frequency

distributions with (i) an interval of three and (ii) an interval of five. Begin the first interval with 45.

63	78	76	58	95
46	78	92	86	88
74	65	73	72	91
78	70	75	84	99
87	86	93	89	76

7. Plot frequency polygons and histograms of the two distributions in 5 and 6.

8. Tabulate the following 100 scores into three frequency distribution using intervals of 3, 5 and 10 units. Begin the first interval with 45.

90	85	85	96	72
81	84	81	83	92
80	86	96	78	71
85	103	81	78	98
92	83	72	98	110
73	75	85	74	95
89	76	81	105	73
82	86	83	63	56
95	84	90	73	75
73	86	82	71	94
63	78	76	58	95
78	86	80	96	94
46	78	92	৬ 6	88
82	101	102	70	50
74	65	73	72	91
103	90	87	74	83
78	75	70	84	98
86	73	85	99	93
103	90	79	81	83
87	86	93	89	76

9. Recast the following scores into a frequency distribution.

64	72	70	73	72
69	72	76	86	67
84	63	76	65	77
67	71	82	78	75
61	83	67	81	72

10. Tabulate the following two sets of scores into frequency distributions using an interval of 5. Begin the first with 45 and the second set with 50.

First set (*N*=*64*)

70	71	67	90	51	70	90
67	79	8'	81	58	76	72
51	76	76	90	71	72	62
89	90	76	71	88	66	81
91	91	65	63	65	76	
79	80	71	76	54	80	
72	63	87	91	90	45	
69	66	80	79	71	75	
58	50	47	67	67	52	
64	88	54	70	80	92	

Second set (*N*=*46*)

84	73	78	58	84
80	74	86	52	74
90	87	92	78	62
82	76	85	85	90
84	79	54	94	81
70	97	65	66	77
89	69	56	57	
7/	78	71	63	
62	95	65	71	
79	85	70	71	

11. Draw a histogram of frequency distribution of the following marks obtained by 45 students in an examination.

22	23	29	21	19
25	26	30	26	25
29	30	30	23	20
21	31	20	28	28
30	24	24	24	20
28	26	28	26	24
24	22	25	26	27
31	32	35	21	17
27	23	25	34	15

12. Tabulate the following 25 scores into a frequency distribution using an interval of three. Let the first interval begin with the score 60. Plot the data graphically.

72	83	78	67	75	67	72	
81	61	82	77	63	86	69	70
67	75	71	65	84	76	72	72

13. Draw frequency polygons of the two above distributions on the same axis.

14. Draw frequency polygons and histograms of the scores found in 8 and 2.

15. Plot a frequency polygon of the 100 scores in No. 8 using an interval of 10 score units. Superimpose a histogram upon the polygon using the same axis.

16. Round off the following numbers to two decimals.

3 5872	74·168	126·83500
67·9223	25·193	81·72558

দুই

কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central Tendency)

কোন পরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া অবিন্যস্ত স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে সাজানোর পর তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতার (Central Tendency) একটা পরিমাপ বার করা হয়। কোন বণ্টনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে বোঝায় এমন একটি অঙ্ক যেটি সমস্ত স্কোরের প্রতিনিধিরূপে কাজ করতে পারে। ধরে নেওয়া হচ্ছে যে স্কোরগুলির মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও যখন তারা একটি বণ্টনের অন্তর্গত তখন তাদের বিশেষ একটা কেন্দ্রের দিকে যাবার প্রবণতা আছে। একেই কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলা হয়। কেন্দ্রীয় প্রবণতার কোন একটা পরিমাপ পেলে দুটি উপকার হয়। প্রথমত, যে দলটির কাছ থেকে স্কোরগুলি পাওয়া গেছে তাদের কাজের একটি সামগ্রিক অথচ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত, কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের সাহায্যে দুই বা তার বেশী দলের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব হয়। সাধারণত পরিসংখ্যানশাস্ত্রে কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের তিন শ্রেণীর পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যথা, (১) গাণিতিক মিন (Arithmetic Mean) (২) মিডিয়ান (Median) এবং (৩) মোড (Mode)।

১। মিন নির্ণয়ের নিয়ম (Calculation of Mean)

কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের পদ্ধতিগুলির মধ্যে মিনই সব চেয়ে বেশী প্রচলিত। মিন বার করার নিয়ম হল সমস্ত স্বতন্ত্র স্কোরগুলিকে যোগ করে তাদের যোগফলকে মোটসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা। সূত্রটি হল—

$$M = \frac{\Sigma X}{N}$$

[এখানে M = মিন, N = স্কোরগুলির মোটসংখ্যা; X = স্কোর; Σ = যোগফল]।

উদাহরণ : এক ভদ্রলোক পর পর পাঁচ মাসে আয় করলেন যথাক্রমে 400, 350, 500, 625, 525 টাকা।

অতএব তাঁর আয়ের মিন $= \frac{400+350+500+625+525}{5} = 480$ টাকা।

মিন নির্ণয়ের উপরের সূত্রটি প্রয়োগ করা যাবে যখন স্কোরগুলি অবিন্যস্ত অবস্থায় থাকবে। কিন্তু যখন স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের রূপে সাজানো হয়ে যাবে, তখন উপরের সূত্রটি প্রয়োগ করা সম্ভব হবে না। কেননা ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে স্কোরগুলিকে কতকগুলি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন শ্রেণীব্যবধানের অন্তর্ভুক্ত স্কোরের সংখ্যাকে ফ্রিকোয়েন্সী (f) নাম দেওয়া হয়। তাছাড়া প্রত্যেকটি শ্রেণীর অন্তর্গত স্কোরকে বোঝান হয় ঐ শ্রেণীটির মধ্যবিন্দুর দ্বারা। অতএব প্রত্যেকটি শ্রেণীর মোট স্কোরের যোগফল পেতে হলে তার মধ্যবিন্দুটিকে তার ফ্রিকোয়েন্সী (f) দিয়ে গুণ করতে হবে। এভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের fX নির্ণয় করা হবে। তারপর fX গুলির যোগফলকে মোট সংখ্যা বা N দিয়ে ভাগ করলে বণ্টনটির মিন পাওয়া যাবে। অতএব ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের ক্ষেত্রে মিন বার করার সূত্র হল,

$$N=\frac{\Sigma fX}{N}$$

5'র পাতার 50টি স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মিন বার করতে হলে প্রত্যেক শ্রেণীবণ্টনের fX বার করতে হবে। যেমন 40—44 শ্রেণীটির fX হল হল 42, 45—49 শ্রেণীটির fX হল 141 ইত্যাদি। এই fXগুলির যোগফল 3540 এবং এই fX'র যোগফলকে মোটসংখ্যা বা N দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যাবে মিন। এখানে মিন হল $\frac{3540}{50}=70{\cdot}80$

উদাহরণ : 5'র পাতার 50টি স্কোরের ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মান নির্ণয়।

শ্রেণীব্যবধান	মধ্যবিন্দু	f		fX
95—99	97	1		97
90—94	92	2		184
85—89	87	4		348
80—84	82	5		410
75—79	77	8	20	616
70—74	72	10		720
65—69	67	6	20	402
60—64	62	4		248
55—59	57	4		228
50—54	52	2		104
45—49	47	3		141
40—44	42	1		42
		N = 50		3540
		N/2 = 25		

মিন $= \frac{\Sigma fX}{N} = \frac{3540}{50} = 70 \cdot 80$

মিডিয়ান $= 69 \cdot 5 + \frac{5}{10} \times 5 = 72 \cdot 00$;

স্থূল মোড = 70—74'র শ্রেণী ব্যবধানটির মধ্যবিন্দু $= 72 \cdot 00$;

প্রকৃত মোড $= 74 \cdot 40$

মিডিয়ান নির্ণয়ের পন্থা (Calculation of Median)

স্কোরগুলি যখন অবিন্যস্ত থাকে অর্থাৎ যখন স্কোরগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে সাজান হয় না তখন স্কোরগুলির মিডিয়ান বার করার নিয়ম হল নিম্নরূপ :—

স্কোরগুলিকে তাদের আয়তন বা মান অনুযায়ী সাজিয়ে নিলে সারির মধ্যবিন্দুটি হবে স্কোরগুলির মিডিয়ান। উদাহরণস্বরূপ 6, 8, 7, 10, 11, 7, 9, — এই স্কোরগুলির মিডিয়ান বার করতে হলে এগুলিকে প্রথমে এদের আয়তন অনুযায়ী সাজিয়ে নিতে হবে, যেমন,

6   7   7   (8)   9   10   11

এবার এই সারিতে 8 স্কোরটির উপরে আছে তিনটি স্কোর, নীচে আছে তিনটি স্কোর। অতএব 8 হল এই স্কোরগুলির মধ্যবিন্দু বা মিডিয়ান।

বিজোড় সংখ্যাসম্পন্ন সারিতে মিডিয়ান বার করা সহজ। কিন্তু জোড় সংখ্যাসম্পন্ন সারিতে মিডিয়ান বার করতে হলে মধ্যবিন্দুটি গণনা করে নিতে হয়। যেমন, নীচের জোড় সংখ্যক সারিতে।

8·5

6   7   8   ↑   9   10   11

মিডিয়ান বা মধ্যবিন্দু হবে 8 এবং 9—এই দুটি স্কোরের ঠিক মাঝখানের বিন্দুটি। এখন স্কোর 8 হল 7·5 থেকে 8·5 আর স্কোর 9 হল 8·5 থেকে 9·5 (3 পাতা দেখ)। অতএব মিডিয়ান হল 8 এবং 9'র বা 7· —9·5'র মধ্যবিন্দু অর্থাৎ 8·5।

অবিন্যস্ত স্কোরের মিডিয়ান বার করার সূত্রটি হল—

মিডিয়ান $= \frac{(N+1)}{2}$ তম স্কোরটি [আয়তন অনুযায়ী সাজানো সারিতে]

যেমন, উপরের প্রথম উদাহরণটিতে

মিডিয়ান $= \frac{7+1}{2}$ তম স্কোরটি অর্থাৎ 4র্থ স্কোরটি অর্থাৎ 8।

তেমনই দ্বিতীয় উদাহরণটিতে

মিডিয়ান হল $=\frac{6+1}{2}$ তম স্কোরটি অর্থাৎ 3·5 তম স্কোরটি অর্থাৎ 8·5 .

বিন্যস্ত স্কোর বা ফ্রিকোয়েন্সী বন্টনে সাজানো স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে মিডিয়ান বার করার সূত্র হল—

$$Mdn=l+\left\{\frac{\frac{N}{2}-F}{f_m}\right\}\times i$$

[এখানে Mdn = মিডিয়ান ;

l = যে শ্রেণীব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়ে তার নিম্নপ্রান্ত ;

$\frac{N}{2}$ = মোট সংখ্যার অর্ধেক ;

F = l'র নীচে শ্রেণীব্যবধানগুলিতে যত স্কোর আছে সেগুলির যোগফল।

f_m = যে শ্রেণীব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়ে সেই শ্রেণীব্যবধানটির স্কোরের সংখ্যা ;

i = শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য ।]

এই সূত্রটি প্রয়োগ করে মিডিয়ান বার করতে হলে নীচের সোপানগুলি অনুসরণ করতে হবে।

১। প্রথমে N/2 বার করতে হবে। অর্থাৎ মোট সংখ্যার অর্ধেক কত দেখতে হবে।

২। এবার বন্টনের নীচ থেকে N/2 সংখ্যক স্কোর গুনে উপরে উঠতে হবে এবং বার করতে হবে কোন্ শ্রেণীব্যবধানে N/2 সংখ্যক স্কোর শেষ হচ্ছে। বুঝতে হবে সেই শ্রেণীব্যবধানেই মিডিয়ানটি পড়েছে। তারপর সেই শ্রেণীব্যবধানের নিম্নপ্রান্তটি বার করতে হবে। এরই নাম দেওয়া হয়েছে l এবং l'র নীচে যত স্কোর পাওয়া গেল সেগুলির যোগফলকে F বলা হয়েছে।

৩। এবার $\frac{N}{2}$ থেকে F বাদ দিতে হবে। পাওয়া যাবে $\frac{N}{2}-F$

৪। তারপর এই সংখ্যাকে ভাগ করতে হবে f_m দিয়ে। যে শ্রেণীব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়েছে তার ফ্রিকোয়েন্সী বা স্কোরসংখ্যা হল f_m। এবার এই ভাগফলকে শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য বা i দিয়ে গুণ করতে হবে।

৫। এবার যে সংখ্যাটি পাওয়া গেল তার সঙ্গে l অর্থাৎ যে শ্রেণীব্যবধানে

মিডিয়ানটি পড়েছে তার নিম্নপ্রান্তটি যোগ করতে হবে। যোগ করে যা পাওয়া গেল সেটি হল মিডিয়ান।

উদাহরণ: 5'র পাতার ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনটির মিডিয়ান বার করা হচ্ছে। এখানে N/2 হল 25। নীচ থেকে উপরের দিকে ফ্রিকোয়েন্সী গুনে দেখা গেল N/2 হল 25, পড়েছে 70—74 শ্রেণীব্যবধানের মধ্যে। তবে l হল এই শ্রেণীব্যবধানটির নিম্নপ্রান্ত অর্থাৎ 69·5। F হল এই শ্রেণীব্যবধানটির নীচে যত ফ্রিকোয়েন্সী আছে তাদের যোগফল অর্থাৎ $1+3+2+4+4+6=20$, এইবার $N/2-F$ হল $25-20=5$; তারপর f_m হল 70—74 শ্রেণীটির ফ্রিকোয়েন্সী অর্থাৎ 10। তাহলে,

$$\frac{\frac{N}{2}-F}{f_m} \text{ হল } \frac{5}{10}=\cdot 50$$

এবার এই সংখ্যাকে i অর্থাৎ শ্রেণীব্যবধানের দূরত্ব বা 5 দিয়ে গুণ করে পাওয়া গেল $\cdot 50\times 5=2\cdot 50$। তার পরের ধাপে এই সংখ্যাটি যোগ করা হল l বা যে শ্রেণীব্যবধানে মিডিয়ানটি পড়েছে তার নিম্নসীমার সঙ্গে এবং পাওয়া গেল $69\cdot 5+2\cdot 50=72\cdot 00$; অতএব এই বণ্টনের মিডিয়ান হল 72·00 (17—18 পাতা দেখ।)

মোড নির্ণয়ের পন্থা (Calculation of Mode)

কোন স্কোরগুচ্ছের দু'প্রকারের মোড নির্ণয় করা যেতে পারে—**অভিজ্ঞতা-নির্ভর মোড** (Empirical Mode) বা **স্থূল মোড** (Crude Mode) এবং **বিজ্ঞানসম্মত বা প্রকৃত মোড** (True Mode)।

অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের স্থূল মোড হল প্রদত্ত স্কোরগুলির মধ্যে যে স্কোরটি সবচেয়ে বেশী বার এসেছে সেটি যেমন 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14—এই সারিটিতে সব চেয়ে বেশী বার এসেছে 14 সংখ্যক স্কোরটি। অতএব 14 হল এই সারিটির অভিজ্ঞতা-নির্ভর বা স্থূল মোড।

বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে সাজান স্কোরগুচ্ছের স্থূল মোড বার করবার নিয়ম হল—যে শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী সব চেয়ে বেশী সে শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু নেওয়া। যেমন 5'র পাতার উদাহরণটিতে 70—74

শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী সবচেয়ে বেশী। অতএব এই বণ্টনটির স্থূল মোড হল এই শ্রেণীটির মধ্যবিন্দু অর্থাৎ 72·00.

কোন ফ্রিকোয়েন্সীর বণ্টনের প্রকৃত মোড বলতে বোঝায় সেই বিন্দুটি যেখানে স্কোরের বণ্টনে সব চেয়ে বেশী পরিমাণে স্কোর কেন্দ্রীভূত হয়েছে। একে স্কোরের কেন্দ্রীভবনের শীর্ষ বলা চলে। স্থূল মোড হল এই শীর্ষবিন্দুটি সম্বন্ধে একটি মোটামুটি ধারণা। প্রকৃত মোড হল সূক্ষ্ম গণনা করে পাওয়া বণ্টনের এই শীর্ষ বিন্দুটির পরিমাপ। প্রকৃত মোড নির্ণয়ের সূত্র হল—

মোড = 3 মিডিয়ান − 2 মিন (Mode = 3 Mdn − 2M)

অর্থাৎ মিডিয়ানের 3 গুণ থেকে মিনের 2 গুণ বাদ দিলে প্রকৃত মোড পাওয়া যায়। 5'র পাতার বণ্টনটির প্রকৃত মোড হল $= (3 \times 72 \cdot 00) - (2 \times 70 \cdot 80)$

$= 216 \cdot 00 - 141 \cdot 60$

$= 74 \cdot 40$

মিন নির্ণয়ের সংক্ষিপ্ত পন্থা

(Short Method of Mean Calculation)

মিন নির্ণয় করার সাধারণ পন্থা হল মোট স্কোরগুলির যোগফলকে তাদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করা। ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি শ্রেণী-ব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে সেই শ্রেণীর ফ্রিকোয়েন্সী দিয়ে গুণ করে, যে গুণফলগুলি পাওয়া যায় সেই গুণফলগুলিকে (fX) যোগ করে সেই যোগফলকে (ΣfX) স্কোরের মোট সংখ্যা N দিয়ে ভাগ করতে হয়। কিন্তু যখন স্কোরের সংখ্যা অনেক হয়ে দাঁড়ায় তখন এই পন্থায় মিন বার সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। সেই জন্য মিন বার করার একটি সংক্ষিপ্ত পন্থার উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই পন্থায় আমরা একটি কল্পিত মিন আগেই ধরে নিই বা অনুমান করে নিই। একে আমরা অনুমিত মিন (Assumed Mean or AM) নাম দিতে পারি। নানা ভাবে এই 'মিন' ধরে নেওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক পন্থাটি হল বণ্টনের মাঝামাঝি একটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুটি নেওয়া। তবে যে শ্রেণীব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী সবচেয়ে বেশী সেটির মধ্যবিন্দু নিতে পারলে ভাল হয়।

সংক্ষিপ্ত উপায়ে মিন নির্ণয়ের উদাহরণ

(5'র পাতার ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টন)

(1) শ্রেণীব্যবধান	(2) মধ্যবিন্দু (X)	(3) (f)	(4) (d')	(5) (fd')
95—99	97	1	5	5
90—94	92	2	4	8
85—89	87	4	3	12
80—84	82	5	2	10
75—79	77	8	1	8
70—74	72	(10)	0	+43
65—69	57	6	−1	−6
60—64	62	4	−2	−8
55—59	57	4	−3	−12
50—54	52	2	−4	−8
45—49	47	3	−5	−15
40—44	42	1	−6	−6
		N=50		−55

AM=72·00 $c = -\frac{12}{50} = -\cdot240$

ci= − 1·20 i=5

M=70·80 ci= −·240×5=−1·20

উপরের বণ্টনটিতে সবচেয়ে বেশী ফ্রিকোয়েন্সী হল 70—74 শ্রেণী-ব্যবধানটির এবং সেটির অবস্থানও বণ্টনের মাঝামাঝি। অতএব এই শ্রেণী-ব্যবধানটির মধ্যবিন্দুটিকে 'অনুমিত মিন' নেওয়া হল অর্থাৎ 72, কিন্তু অনুমিত মিনটি কখনই নির্ভুল নয়, তার জন্য প্রয়োজন এটিকে সংশোধন করা। সুতরাং আমাদের পরের কাজ হচ্ছে অনুমিত মিনটির সংশোধন (Correction) কতটা হবে তা বার করা এবং অনুমিত মিনের সঙ্গে সেই সংশোধনটি যোগ করে বণ্টনটির প্রকৃত মিন নির্ণয় করা। তার জন্য আমাদের নীচের ধাপগুলি অনুসরণ করতে হবে।

ক। প্রথমে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দু আমাদের অনুমিত মিন থেকে কতটা সরে আছে তা নির্ণয় করতে হবে। যেমন, 70—74 শ্রেণী-ব্যবধানের মধ্যবিন্দু (72) হল অনুমিত মিন। অতএব 75—79 শ্রেণীব্যবধানের

মধ্যবিন্দু (77) এই অনুমিত মিন থেকে 1 শ্রেণীব্যবধান দূরে সরে আছে। অনুমিত মিন থেকে কোন বিশেষ শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুর সরে থাকাকে বিচ্যুতি (Deviation) বলে। সাধারণত d' অক্ষর দিয়ে এ বিচ্যুতিটিকে চিহ্নিত করা হয়। এ বিচ্যুতি মাপা হয় শ্রেণীগত ব্যবধানের এককের দ্বারা। অর্থাৎ অনুমিত মিন থেকে একটি বিশেষ মধ্যবিন্দু কটি শ্রেণীব্যবধান দূরে আছে তা গণনা করে। ঐ বিশেষ মধ্যবিন্দুটি অনুমিত মিন থেকে যতগুলি শ্রেণীব্যবধান দূরে থাকবে তত সংখ্যক হবে সেই বিশেষ মধ্যবিন্দুটির d' বা বিচ্যুতি। যেমন, প্রদত্ত বণ্টনটিতে অনুমিত মিন থেকে 75—79'র মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি 1, 80 84'র মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি 2, 84—89'র বিচ্যুতি 3। যে শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুকে অনুমিত মিনরূপে নেওয়া হয়েছে তার বিচ্যুতি সব সময়ে 0, অতএব d' স্তম্ভে 70—74'র সারিতে বসানো হয়েছে 0, 75—79'র সারিতে 1, 80—84'র সারিতে 2 ইত্যাদি। অনুমিত মিনের নীচে যে সব মধ্যবিন্দু থাকবে সেগুলির বিচ্যুতি হবে ঋণাত্মক এবং সেগুলির পূর্বে বিয়োগচিহ্ন দিতে হবে। অতএব 65—69'র মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি হল −1, 60—64'র মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি হল −2, 55—59'র মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি হল −3 ইত্যাদি।

খ। d'র স্তম্ভ পূরণ করার পর আমাদের fd' নির্ণয় করতে হবে। যে কোন শ্রেণীব্যবধানের d'র সঙ্গে তার f বা ফ্রিকোয়েন্সী গুণ করলেই fd' পাওয়া যাবে। যেমন 70—74 শ্রেণীর fd' হল $10\times0=0$; 75—79'র fd' হল $8\times1=8$; 65—69'র fd' হল $6\times-1=-6$ ইত্যাদি।

গ। এবার অনুমিত মিনের উপরের ধনাত্মক fd'গুলি যোগ করে এবং অনুমিত মিনের নীচে ঋণাত্মক fd'গুলি যোগ করে যথাক্রমে পাওয়া গেল +43 এবং −55। এই দুটি সংখ্যার যোগফল হচ্ছে $+43-55=-12$; অনুমিত মিনের সংশোধন (correction বা c) পাওয়া যাবে এই fd'র মোট যোগফলকে ($\Sigma fd'$) মোট স্কোর সংখ্যা বা N দিয়ে ভাগ করে। অর্থাৎ এখানে $c=-\frac{12}{50}=-\cdot240$। এবার এই সংশোধনকে ($c$) শ্রেণীগত ব্যবধান ($i$) দিয়ে গুণ করতে হবে, ফলে পাওয়া যাবে $ci=-\cdot240\times5=-1\cdot20$।

ঘ। অনুমিত মিন থেকে প্রকৃত মিন নির্ণয়ের পন্থা হল অনুমিত মিনের সঙ্গে শ্রেণীগত ব্যবধান ও সংশোধনের গুণফল অর্থাৎ ci যোগ করা

এখানে অনুমিত মিন 72.00'র সঙ্গে *ci* (−1·20) যোগ করে পাওয়া গেল 70·80 ; অতএব এই বণ্টনটির প্রকৃত মিন হল 70·80। (22'র পাতার তালিকা দ্রষ্টব্য)

মিন, মিডিয়ান ও মোডের তুলনামূলক প্রয়োগ

দেখা গেল যে কেন্দ্রীয় প্রবণতা তিন রকমের হতে পারে। এখন কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ কেন্দ্রীয় প্রবণতাটি ব্যবহার করা উচিত সেটি জানা দরকার। বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রবণতার তুলনামূলক প্রয়োগের একটি মোটামুটি বিবরণী দেওয়া হল।

মিন ব্যবহার করতে হয়

(ক) যখন আমরা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতা পেতে চাই। দেখা গেছে যে তিন শ্রেণীর কেন্দ্রীয় প্রবণতার মধ্যে মিনই সবচেয়ে নির্ভুল ও দোষশূন্য।

(খ) যখন বণ্টনটি থেকে (আদর্শ বিচ্যুতি বা SD), সহপরিবর্তনের মান (বা *r*) ইত্যাদি নির্ণয় করতে হয়। এই পরিমাপগুলি বার করতে হলে আগেই মিন বার করার দরকার হয়।

(গ) যখন বণ্টনটি প্রায় নর্মাল বা স্বাভাবিক হয়ে থাকে।

(ঘ) যখন আমরা প্রত্যেকটি স্কোরের ওজন একই বলে ধরে নিতে চাই। যেহেতু সমস্ত স্কোরগুলির যোগফলকে তাদের মোট সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে মিন বার করা হয়, সেহেতু মিন নির্ণয়ে প্রত্যেকটি স্কোরের সমান ওজন আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

মিডিয়ান ব্যবহার করতে হয়

(ক) যখন দীর্ঘ গণনা বা হিসাব করার সময়ের অভাব থাকে। মিডিয়ান সহজে এবং দ্রুত নির্ণয় করা যায়।

(খ) যখন বণ্টনটি খুব বেশী মাত্রায় স্কুড (skewed) থাকে অর্থাৎ যখন বণ্টনের প্রান্তসীমায় খুব উচ্চমানের বা নিম্নমানের স্কোর অধিক সংখ্যায় থাকে। বণ্টনটির কোন প্রান্তে খুব চরম প্রকৃতির অর্থাৎ খুব ছোট বা খুব বড় স্কোর যদি বেশী সংখ্যায় থাকে তবে মিনটি তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এবং অস্বাভাবিক ভাবে খুব ছোট বা খুব বড় হয়ে উঠতে পারে। মিডিয়ান কিন্তু বণ্টনটির প্রান্তে অবস্থিত চরম প্রকৃতির স্কোরের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয় না।

(গ) যখন আমরা মোটামুটিভাবে জানতে চাই যে বণ্টনের মধ্যে দৃষ্টান্ত বা

ক্ষেত্রগুলি উপরের অর্ধে আছে না নীচের অর্ধে আছে এবং যখন সেগুলি কেন্দ্রীয় বিন্দু থেকে কত দূরে আছে তা বিশদভাবে জানার দরকার পড়ে না।

(ঘ) যখন বণ্টনটি অসম্পূর্ণ থাকে এবং মিন বার করা সম্ভব হয় না।

(ঙ) যখন গৃহীত এককটি যে সর্বত্র সমান সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত নই।

মোড ব্যবহার করতে হয়

(ক) যখন সব চেয়ে দ্রুত নির্ণয় করা যায় এমন একটি কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপের দরকার পড়ে।

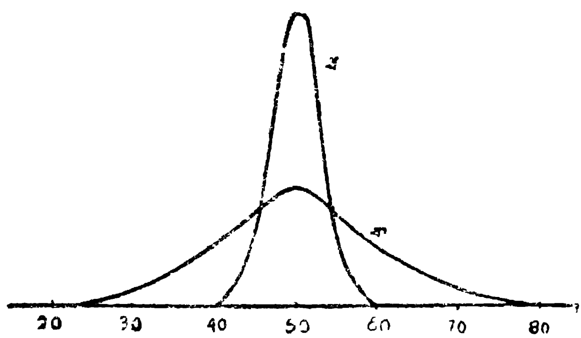
(খ) যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার মোটামুটি বা চলতি একটি পরিমাপ হলেই কাজ চলে যায়।

(গ) যখন আমরা জানতে চাই কোন্ স্কোরটি বা দৃষ্টান্তটি সব চেয়ে বেশী বার বণ্টনের মধ্যে দেখা দিয়েছে।

তিন

বিষমতার পরিমাপ (Measuring Variability)

কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central tendency) হল বিশেষ কোন স্কোরগুচ্ছের প্রতিনিধিস্বরূপ এবং সেই স্কোরগুলির একটি সামগ্রিক রূপ বা ধারণা দেয়। কিন্তু কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় প্রবণতা জানলেই স্কোরগুচ্ছটির সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্য জানা হয় না। যেমন, ধরা যাক 50টি ছেলেকে এবং 50টি মেয়েকে একটি বিশেষ অভীক্ষা দেওয়া হল। ছেলেদের মিন স্কোর পাওয়া গেল 34·8 এবং মেয়েদের হল 34·6। এখানে মিনের দিক দিয়ে এই দুটি স্কোরগুচ্ছে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু ধরা যাক ছেলেদের স্কোর 16 থেকে সুরু করে 52 পর্যন্ত উঠল, কিন্তু মেয়েদের স্কোর হল 18 থেকে 44। এদিক দিয়ে দুটি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে বেশ



[একই মিনসম্পন্ন অথচ বিভিন্ন বিষমতা-বিশিষ্ট দুটি ফ্রিকোয়েন্সী পলিগন। দুটি পলিগনেরই মিন 50, কিন্তু বিষমতার পার্থক্য থাকায় আকৃতিতে পার্থক্য দেখা দিয়েছে।]

পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। ছেলেদের স্কোরগুলি মেয়েদের স্কোরগুলির চেয়ে অনেকখানি বেশী জায়গা জুড়ে আছে। কিংবা পরিসংখ্যানের ভাষায় ছেলেদের স্কোর মেয়েদের স্কোরের চেয়ে অধিকতর বৈষম্যপূর্ণ (Variable)। কোন স্কোরগুচ্ছের এই বৈশিষ্ট্যটি জানতে হলে তার স্কোরগুলির এই বিষমতার (Variability) একটি পরিমাপ করা প্রয়োজন অর্থাৎ জানা প্রয়োজন যে স্কোরগুলি তাদের কেন্দ্রীয় প্রবণতার চারপাশে কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত বা ছড়িয়ে রয়েছে।

সাধারণত যদি দলটি সমজাতীয় ব্যক্তি বা বস্তু দিয়ে গঠিত হয় তবে তাদের

মধ্যে বিষমতার পরিমাণ কম হয়। আর দলের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যত পার্থক্য থাকবে তত তাদের বিষমতার পরিমাণ বেশী হয়ে দাঁড়াবে। যেমন, 26 পাতার ছবিটিতে একই অক্ষরেখায় দুটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের দুটি পলিগন টানা হয়েছে। দুটি বণ্টনেরই মিন এক, অর্থাৎ 50। কিন্তু দুটির বিষমতার (Variability) প্রকৃতি বেশ বিভিন্ন। যেমন, ক দলটির স্কোর 20 থেকে 80 পর্যন্ত বিস্তৃত কিন্তু খ দলটির স্কোর 40 থেকে 60 পর্যন্ত বিস্তৃত। দুটির মিন এক হলেও প্রথমটির বিষমতা দ্বিতীয়টির বিষমতার তিন গুণ।

বিষমতার পরিমাপ নির্ণয়ের পন্থা
(Method of Measuring Variability)

বিষমতার পরিমাপ নানা উপায়ে বার করা হয়। যথা (1) রেঞ্জ (Range) (2) মিন বিচ্যুতি (Mean Deviation or MD) বা গড় বিচ্যুতি (Average Deviation or AD), (3) আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation or SD) এবং (4) চতুর্থাংশ বিচ্যুতি। (Quartile Deviation or Q)।

১। রেঞ্জ (Range)

রেঞ্জ হল কোন স্কোরগুচ্ছের বিষমতার সহজতম পরিমাপ। গুচ্ছের বৃহত্তম স্কোরটি থেকে নিম্নতম স্কোরটি বাদ দিলে রেঞ্জ পাওয়া যায়। 26 পাতার উদাহরণে ছেলেদের স্কোরগুচ্ছের রেঞ্জ হল 52—16=36 এবং মেয়েদের স্কোরগুচ্ছের রেঞ্জ হল 44—18=26 ; রেঞ্জের ক্ষেত্রে আমরা কেবলমাত্র দুই প্রান্তের চরম স্কোর দুটিকে হিসাবে ধরি। সেজন্য যদি মাঝখানে লম্বা ফাঁক থেকে যায় কিংবা মোট সংখ্যা (N) যদি অল্প হয়, তবে বিষমতার নির্ণয়ে রেঞ্জ খুব কাযকর হয়।

২। গড় বা মিন বিচ্যুতি
(Average or Mean Deviation : AD or MD)

কোন স্কোরগুচ্ছের কেন্দ্রীয় প্রবণতা (সাধারণত মিনই নেওয়া হয়) থেকে তার প্রত্যেকটি স্কোরের যে বিচ্যুতি, সেই বিচ্যুতির গড় বা মিনকে গড় বিচ্যুতি (Average Deviation or AD) বা মিন বিচ্যুতি (Mean Deviation or

MD) বলা হয়। গড় বা মিন বিচ্যুতি নির্ণয়ের সময় বিচ্যুতিটি ঋণমূলক (Negative), কি ধনমূলক (Positive) তা দেখা হয় না এবং সব বিচ্যুতিগুলিকেই ধনমূলক (Positive) সংখ্যা বলে ধরে নিয়ে তাদের মিন বার করা হয়। যেমন 8, 10, 12, 14, 16 এই ক'টি স্কোরের গড়বিচ্যুতি নির্ণয় করতে হবে। এদের মিন হল 12 ; এখন মিন থেকে এই স্কোরগুলির বিচ্যুতি বার করার নিয়ম হল মিন থেকে প্রত্যেকটি স্কোরকে বিয়োগ করা। যেমন, 8 স্কোরটির বিচ্যুতি হল 8—12=—4 ; 10 স্কোরটির বিচ্যুতি হল 10—12=—2 ; তেমনই 12 স্কোরটির বিচ্যুতি 12—12=0 ; 14 স্কোরটির বিচ্যুতি 14—12=2; এবং 16 স্কোরটির বিচ্যুতি 16—12=4 ; অতএব এই ক'টি স্কোরের বিচ্যুতি হল যথাক্রমে —4, —2, 0, 2, 4 ; এই সংখ্যাগুলির চিহ্নগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এদের যোগ করে পাওয়া গেল 12 এবং 12কে মোট সংখ্যা 5 (N) দিয়ে ভাগ করে পাওয়া গেল 2·4। এটি হল এই স্কোরগুলির গড়বিচ্যুতি (বা AD) কিংবা মিনবিচ্যুতি (বা MD)।

অতএব AD বা MD নির্ণয় করার সূত্রটি হল।

$$AD\ (\text{বা } MD) = \frac{\Sigma|d|}{N}$$

এখানে Σ=যোগফল, $|d|$=মিন থেকে প্রতিটি স্কোরের বিচ্যুতি, | |—এই বার (Bar) চিহ্ন দুটি বোঝাচ্ছে যে এই বিচ্যুতির সংখ্যাগুলিকে চিহ্নিনিরপেক্ষ ভাবে নেওয়া হবে। অর্থাৎ সেগুলিকে সব ধনমূলক বলে ধরা হবে। N=মোট স্কোরগুলির সংখ্যা।

বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের AD (বা MD) নির্ণয়

অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি স্কোরের মিন থেকে বিচ্যুতিগুলিকে যোগ করে সেই যোগফলকে মোটসংখ্যা দিয়ে ভাগ করা হয়। কিন্তু বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটি স্কোরের স্বতন্ত্রভাবে বিচ্যুতি বার করতে পারি না। সেজন্য তার পরিবর্তে মিন থেকে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতিটি গ্রহণ করা হয়। এ ছাড়া বাকী পদ্ধতিগুলি একই রকম। যেমন 17'র পাতার ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে 95—99 শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু হল 97·00 এবং মিন হল 70·80। অতএব

এই শ্রেণীব্যবধানটি বিচ্যুতি (d) হল $97 \cdot 00 - 70 \cdot 80 = 26 \cdot 20$; এভাবে 70—74 শ্রেণীব্যবধান পর্যন্ত বিচ্যুতি হবে ধনাত্মক (Positive) ; কিন্তু তার পর থেকেই বিচ্যুতি হবে ঋণাত্মক (Negative)। যেমন, 65—69 শ্রেণীব্যবধানটির বিচ্যুতি (d) হল $67 \cdot 0 - 70 \cdot 80 = 3 \cdot 80$ এবং সব চেয়ে নীচের শ্রেণীব্যবধানটি (40—44)'র d হল $-28 \cdot 80$।

এভাবে প্রত্যেকটি মধ্যবিন্দুর বিচ্যুতি (d) বার করার পর আমরা সেগুলিকে তাদের ফ্রিকোয়েন্সী দিয়ে গুণ করলাম। যেমন 95—99'র বিচ্যুতি হল 26·20 এবং ফ্রিকোয়েন্সী (f) হল 1 ; অতএব তার fd হল 26·20 ; সেইরকম 90—94 শ্রেণীর d হল 21·20 এবং f হল 2 ; অতএব তার fd হল $21 \cdot 20 \times 2 = 42 \cdot 40$; 65—69 শ্রেণীটির d হল $-3 \cdot 80$ এবং f হল 6 ; অতএব এই শ্রেণীটির fd হল $-3 \cdot 80 \times 6 = 22 \cdot 80$; এভাবে আমরা সব কটি শ্রেণী-ব্যবধানের fd স্থির করে ফেলতে পারি।

এর পরের ধাপে এই fdগুলিকে একসঙ্গে যোগ করে ফেলতে হবে তাদের গাণিতিক চিহ্নগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। এখানে যোগফল পাওয়া গেল 502·00। এইবার এই যোগফলকে মোট সংখ্যা (N) 50 দিয়ে ভাগ করে পাওয়া গেল 10·04 ; অতএব এই বণ্টনটির AD বা MD হল 10·04।

অতএব বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে AD বা MD বার করার সূত্র হল

$$\text{AD বা MD} = \frac{\Sigma|fd|}{\text{N}}$$

এখানে $\Sigma|fd|$ =(প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর মিন থেকে বিচ্যুতি × ফ্রিকোয়েন্সী)'র চিহ্নিনিরপেক্ষভাবে মোট যোগফল।

৩। আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation or SD)

আদর্শ বিচ্যুতি কিংবা SD সাধারণভাবে বিষমতার পরিমাপ রূপে অন্যান্য বিষমতার পরিমাপের চেয়ে বহুল পরিমাণে নিখুঁত ও নির্ভরযোগ্য। AD (বা MD)'র নির্ণয়ে আমরা গাণিতিক চিহ্নকে বাদ দিয়ে থাকি এবং সমস্ত বিচ্যুতিকেই ধনাত্মক সংখ্যা হিসাবে গ্রহণ করি। এর ফলে আমাদের এই পরিমাপটি ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য।

কিন্তু SD'র নির্ণয়নে আরও বিজ্ঞানসম্মত পন্থা অনুসরণ করা হয়। সেখানে গাণিতিক চিহ্নের অসুবিধা দূর করার জন্য সমস্ত বিচ্যুতি বা dকে বর্গ করে

নেওয়া হয়। ফলে বিভিন্ন গাণিতিক চিহ্নগুলি দূর হয়ে গিয়ে সব d^2ই ধনাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। তারপর সেগুলিকে যোগ করে যোগফলকে মোট সংখ্যা (N) দিয়ে ভাগ করা হয়। তারপর এই ভাগফলের বর্গমূল (Square root) বার করা হয় এবং তা থেকে যে সংখ্যাটি পাওয়া যায় তাকেই আদর্শ বিচ্যুতি বা SD বলে। SDকে সাধারণত গ্রীক চিহ্ন সিগ্‌মা (σ) দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়।

অতএব আদর্শ বিচ্যুতি বা σ হল বণ্টনের মিন থেকে নেওয়া বিচ্যুতিগুলির বর্গীকৃত (Squared) রূপের মিনের বর্গমূল। একটি ছোট অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছ উদাহরণ হিসাবে নেওয়া যাক। যথা—

স্কোরগুচ্ছ : 8, 10, 12, 14, 16 [মিন $= \frac{60}{5} = 12 \cdot 00$]

মিন থেকে বিচ্যুতি (d) :—4, —2, 0, 2, 4

বিচ্যুতির বর্গ (d^2) : 16, 4, 0, 4, 16

বিচ্যুতির বর্গের যোগফল (Σd^2) : $16+4+0+4+16=40$

বর্গীকৃত বিচ্যুতির যোগফল (Σd^2) ÷ মোট সংখ্যা (N) $= \frac{40}{5} = 8$

এই ভাগফলের বর্গমূল $= \sqrt{8} = 2 \cdot 83$

অতএব এই স্কোর সারিটির $\sigma = 2 \cdot 83$

এই থেকে আমরা অবিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে SD বা σ নির্ণয়ের নীচের সূত্রটি তৈরী করতে পারি।

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma d^2}{N}}$$

বিন্যস্ত স্কোরের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্বতন্ত্র স্কোরের বিচ্যুতি (d) না বার করে প্রতি শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দু ও মিনের মধ্যে ব্যবধান বার করা হয় এবং সেই বিচ্যুতির বর্গ করে নেওয়া হয়। যেমন 17'র পাতার বণ্টনটিতে 95—99 শ্রেণীটির বিচ্যুতি (d) হল 26·20 এবং তার বর্গ (d^2) হল 686·44। এই শ্রেণীটির ফ্রিকোয়েন্সী (f) 1 হওয়াতে এই শ্রেণীটির fd^2 হল 686·44; তেমনই 90—94 শ্রেণীটির বিচ্যুতি 21·20 এবং তার বর্গ (d^2) হল 449·44। এই শ্রেণীটির ফ্রিকোয়েন্সী (f) 2 হওয়াতে এই শ্রেণীটির fd^2 হল 898·88। সেইরকম 65—69 শ্রেণীটির বিচ্যুতি বা d হল —3·80; অতএব d^2 হল 14·44; এই শ্রেণীটির ফ্রিকোয়েন্সী (f) হল 6; অতএব fd^2 দাঁড়াল $14 \cdot 44 \times 6 = 86 \cdot 64$। এভাবে সমস্ত শ্রেণীগুলির fd^2 বার করার পর সেগুলি

যোগ করা হল এবং যোগফল (Σfd^2) পাওয়া গেল 7978·00। এই যোগফলকে N অর্থাৎ 50 দিয়ে ভাগ করে পাওয়া গেল 159·56 এবং এর বর্গমূল হল 12 63। অতএব এই বণ্টনটির SD বা σ হল 12·63। এই থেকে আমরা বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছ বা ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের σ নির্ণয়ের নীচের সূত্রটি পাচ্ছি।

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma fd^2}{N}}$$

সংক্ষিপ্ত পন্থায় SD বা সিগ্‌মা (σ) নির্ণয়

উপরে SD বা σ নির্ণয়ের যে পন্থাটির বর্ণনা দেওয়া হল সেটি বৃহৎ বণ্টনের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। কেননা অনেক সময় বিচ্যুতিগুলির বর্গরূপ বেশ বড় হয়ে দাঁড়ায় এবং সেগুলি নিয়ে কাজ করা অসুবিধাজনক হয়ে পড়ে। সেজন্য SD নির্ণয়ের একটি সংক্ষিপ্ত পন্থা অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

এই পন্থায় প্রথমে একটি অনুমিত মিন ধরে নেওয়া হয়। অনুমিত মিন ধরে নেওয়ার পন্থা সম্বন্ধে 21 পাতায় আলোচনা করা হয়েছে। পরে সেই অনুমিত মিন থেকে প্রত্যেকটি শ্রেণীব্যবধানের বিচ্যুতি (d') নির্ণয় করা হয় তারপর সেই

(1) স্কোর	(2) মধ্যবিন্দু	(3) f	(4) d'	(5) fd'	(6) fd'^2
95—99	97	1	5	5	25
90—94	92	2	4	8	32
85—89	87	4	3	12	36
80—84	82	5	2	10	20
75—79	77	8	1	8 (+43)	8
70—74	72	10	0		
65—69	67	6	−1	−6	6
60—64	62	4	−2	−8	16
55—59	57	4	−3	−12	36
50—54	52	2	−4	−8	32
45—49	47	3	−5	−15	75
40—44	42	1	−6	−6(−55)	36
		N = 50		−12	322

$c = -\frac{12}{50} = -.240$

অনুমিত মিন বা AM = 72·00 $ci = -.240 \times 5 = -1.20$

$c^2 = .0576$

প্রকৃত মিন বা M = 72·00 + (– 1·20) = 70·80

$$SD = i\sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N} - c^2} = 5\sqrt{\frac{322}{50} - .0576} = 12.36$$

বিচ্যুতিটির বর্গ করে তাকে ফ্রিকোয়েন্সী (f) দিয়ে গুণ করা হয়। ফলে পাওয়া যায় fd'^2। এখন fd'^2 গুলির যোগফল বা $\Sigma fd'^2$কে N দিয়ে ভাগ করে যা হয় তা থেকে অনুমিত মিনের সংশোধনের বর্গ (c^2) বিয়োগ করা হয়। এই বিয়োগফলের বর্গমূল নির্ণয় করলে যা পাওয়া যাবে তাকে শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা (i) দিয়ে গুণ করলে SD বা σ পাওয়া যাবে।

বিন্যস্ত স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রে σ বার করার সূত্র হল

$$\sigma = i\sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N} - c^2}$$

[এখানে $\Sigma fd'^2$ হল প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যবিন্দুর অনুমতি মিন থেকে বিচ্যুতির বর্গরূপের যোগফল; c^2 = অনুমিত মিনের সংশোধনের বর্গ; N = মোট সংখ্যা; i = শ্রেণীব্যবধানের সংখ্যা]

উদাহরণস্বরূপ নীচে 17'র পাতার বন্টনটির SD সংক্ষিপ্ত পন্থায় বার করা হচ্ছে। এই বন্টনটিতে 70—74 শ্রেণীব্যবধানটির মধ্যবিন্দু 72·00কে অনুমিত মিন রূপে ধরা হল। অতএব এই শ্রেণীব্যবধানটির d' হচ্ছে 0; তার উপরের শ্রেণীব্যবধান 75—79'র d' হল 1; 80—84 শ্রেণীব্যবধানের d' হল 2 ইত্যাদি। তেমনই নীচের দিকে 65—69 শ্রেণীটির d' হল –1, 60 – 64 শ্রেণীটির d' হল –2 ইত্যাদি। এভাবে প্রত্যেকটি শ্রেণীর d' নির্ণয় করার পর fd' নির্ণয় করা হল, প্রত্যেকটি d''র সঙ্গে fকে গুণ করে। তার পরের স্তম্ভে fd'^2 নির্ণয় করা হল d' গুলিকে বর্গ করে এবং পরে সেই বর্গগুলিকে f দিয়ে গুণ করে। তারপর সেই fd'^2 গুলিকে যোগ করে $\Sigma fd'^2$ পাওয়া গেল। এখানে $\Sigma fd'^2$ হল 322। এবার আমাদের অনুমিত মিনের সংশোধন বা c বার করতে হবে; fd' গুলিকে যোগ করে সেই যোগফলকে N দিয়ে ভাগ করে c পাওয়া যায়। (23'র পাতা দেখ)। এখানে c

গেল—$\frac{12}{50}$=·240 ; c'র বর্গ করে পাওয়া গেল ·0576। অতএব এক্ষেত্রে

$$\sigma = i\sqrt{\frac{\Sigma fd'^2}{N} - c^2} = 5\sqrt{\frac{322}{50} - \cdot0576} = 12\cdot63$$

4. চতুর্থাংশ বিচ্যুতি (Quartile Deviation) বা Q

একটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের বিচ্যুতি গণনা করার আর একটি পন্থা হল তার চতুর্থাংশ বিচ্যুতি বা Q বার করা। Q বলতে বোঝায় বণ্টনটির 75তম পার্সেণ্টাইল (P_{75}) এবং 25তম পার্সেণ্টাইলের (P_{25}) অন্তর্বর্তী দূরত্বের ঠিক মধ্যবিন্দুটি। 25তম পার্সেণ্টাইল বা P_{25} বলতে বোঝায় স্কোরের স্কেলেতে সেই বিন্দু যার নীচে 25% স্কোর আছে। এই বিন্দুকে প্রথম চতুর্থাংশ (first quartile) বা Q_1 বলা হয়। 75তম পার্সেণ্টাইল হল স্কোরের স্কেলেতে সেই বিন্দু যার নীচে 75% স্কোর আছে। এই বিন্দুকে তৃতীয় চতুর্থাংশ (third quartile) বা Q_3 বলা হয়। কোন বণ্টনে এ দুটি বিন্দু পাওয়া গেলে Q বার করার সূত্রটি হল—

$$Q = \frac{Q_3 - Q_1}{2}$$

অতএব দেখা যাচ্ছে যে চতুর্থাংশ বিচ্যুতি বার করতে হলে প্রথমে Q_1 (বা P_{25}) এবং Q_3 (বা P_{75}) বার করে নিতেই হবে। এ প্রসঙ্গে জানা দরকার যে Q_2 হল P_{50} বা মিডিয়ান অর্থাৎ স্কোরের স্কেলে সেই বিন্দু যার নীচে 50% স্কোর আছে। 17 পাতার ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের Q_1 হল 62·62 এবং Q_3 হল 79·19 ; অতএব এই বণ্টনের

$$Q = \frac{79\cdot19 - 62\cdot62}{2} = \frac{16\cdot57}{2} = 8\cdot285 = 8\cdot28$$

পার্সেণ্টাইল Q_1 ও Q_3 গণনা করার পন্থা 47 পৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হয়েছে।

বিভিন্ন বিষমতার পরিমাপের প্রয়োগবিধি

আমরা দেখলাম যে বিভিন্ন পন্থায় একটি বণ্টনের বিষমতার পরিমাপ করা যায়। কোন্ সময় কোন্ পরিমাপটির ব্যবহার করতে হয় তার কতকগুলি সূত্র নীচে দেওয়া হল।

রেঞ্জ ব্যবহার করতে হয়

(ক) যখন স্কোরগুলি সংখ্যায় খুব অল্প এবং ছড়ানো থাকে এবং যখন উন্নত ধরনের কোন বিষমতার পরিমাপ নির্ণয় করার প্রয়োজন হয় না।

(খ) যখন বণ্টনের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ স্কোরগুলি এবং বণ্টনেতে অবস্থিত স্কোরগুলির একটা মোটামুটি বিস্তৃতি জানলেই কাজ চলে।

(গ) যখন দ্রুততম বিষমতার পরিমাপটি জানার দরকার হয়।

চতুর্থাংশ বিচ্যুতি বা Q ব্যবহার করতে হয়

(ক) যখন কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপরূপে কেবলমাত্র মিডিয়ানটিই জানা থাকে।

(খ) যখন বণ্টনটির নীচের দিকটা বা উপরের দিকটা অজ্ঞাত বা অসমাপ্ত থাকে।

(গ) যখন চরম বা ছড়ানো স্কোরের সংখ্যা অনেক থাকে বা বণ্টনটিতে স্কুনেশ (Skewness) খুব বেশী পরিমাণে থাকে।

(ঘ) যখন বণ্টনটির ঠিক মধ্যবর্তী 50% স্কোরের দু'প্রান্তের স্কোর দুটি জানার দরকার হয়।

মিন বিচ্যুতি বা MD ব্যবহার করতে হয়

(ক) যখন বণ্টনটিতে খুব চরমবিচ্যুতিসম্পন্ন স্কোর থাকে এবং যার ফলে সেগুলিকে দ্বিগুণ করলে (SD বা সিগমা বার করলে দ্বিগুণ করতেই হয়) SD'র পরিমাপটি অযথা প্রভাবিত হয়ে ওঠে।

(খ) যখন খুব পরিশ্রম না করে মোটামুটি নির্ভরযোগ্য একটা বিচ্যুতির পরিমাপ প্রয়োজন হয়।

(গ) যখন মিন থেকে প্রত্যেকটি বিচ্যুতিকেই তাদের আয়তন অনুযায়ী ওজন করার দরকার পড়ে।

আদর্শ বিচ্যুতি বা SD ব্যবহার করতে হয়

(ক) যখন বিষমতার নিখুঁততম পরিমাপটি চাওয়া হয়।

(খ) যখন SD'র উপর নির্ভরশীল এমন সব পরিসংখ্যান (যেমন সহ-পরিবর্তনের মান বা r) নির্ণয় করার দরকার পড়ে।

(গ) যখন স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্রের সংশ্লিষ্ট নানা সংব্যাখ্যানের প্রয়োজন হয়।

(ঘ) যখন চরম বিচ্যুতিগুলিরও যথাযথ প্রভাব বিষমতার পরিমাপে থাকাটা কাম্য বলে মনে করা হয়।

বিষমতার বিভিন্ন পরিমাপগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ

যখন বণ্টনটিকে স্বাভাবিক প্রকৃতির বলে ধরে নেওয়া হয় তখন একটি বিষমতার পরিমাপ থেকে আর একটি বিষমতার পরিমাপে নীচের পন্থায় যাওয়া যায়।

$$Q = 8{\cdot}845 \quad MD = {\cdot}6745\sigma$$

$$MD = 1{\cdot}183Q = {\cdot}798\sigma$$

$$\sigma = 1{\cdot}483Q = 1{\cdot}253MD$$

৪

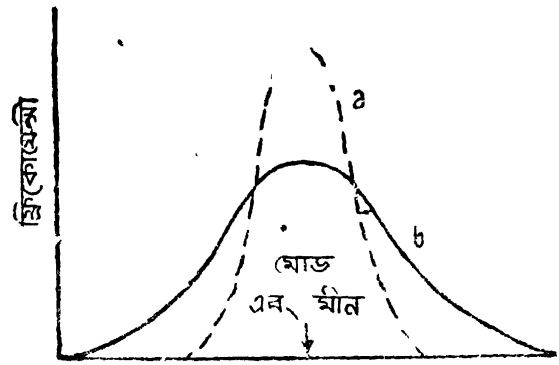
স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্র

(Normal Probability Curve)

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে একদল ছেলের উপর বুদ্ধির অভীক্ষা দিয়ে যা ফল পাওয়া যায় সেটিকে পলিগনের চিত্রের আকারে নিয়ে গেলে অনেকটা উপুড় করা একটি ঘণ্টার আকৃতি নেয়। বিস্তারিত পরীক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে মনোবিজ্ঞান, শিক্ষাবিজ্ঞান, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি ঘটিত পরিমাপের ফলাফলগুলিকে সাজালে চিত্রগুলি একই ধরনের ঘণ্টার আকার গ্রহণ করে। এই চিত্রটির বৈশিষ্ট্য হল যে মাঝখানের অংশটি ফোলা এবং উঁচু আর শীর্ষবিন্দুর দু'ধার থেকে রেখাটি ধীরে ধীরে নেমে এসে দু'পাশে সরু হয়ে গেছে। চিত্রটি ব্যাখ্যা করলে এই দাঁড়ায়—বামদিকের প্রান্ত থেকে নীচু স্কোরগুলি এবং তাদের সংখ্যা স্বল্পতম। ক্রমশ যতই মধ্যভাগের দিকে এগোতে থাকে স্কোরগুলি আয়তনে তত বাড়তে থাকে এবং তাদের সংখ্যাও ক্রমশ বেশী হতে থাকে। চিত্রটির ঠিক মাঝখানটা ও তার আশেপাশে থাকে মাঝারি আয়তনের স্কোরগুলি এবং তাদের সংখ্যা বণ্টনের মধ্যে সব চেয়ে বেশী হওয়ায় চিত্রটির মাঝখানটা ফোলা ও উঁচু। তারপর স্কোরগুলি আয়তনে আরও বাড়তে থাকে, যদিও সেগুলি সংখ্যায় তখন কমতে থাকে। এইভাবে ডানদিকের শেষপ্রান্তে থাকে সর্বোচ্চ স্কোরগুলি এবং তাদের সংখ্যা বাঁদিকের সর্বনিম্ন স্কোরগুলির মতই সবচেয়ে কম।

সাধারণ পরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ থেকে আমরা যে সব চিত্র পাই সেগুলি সম্পূর্ণ নিখুঁত বা ঘণ্টার আকৃতিসম্পন্ন হয় না। প্রায়ই দেখা যাবে যে একটা দিক অপর দিকের চেয়ে বেশী উঁচু বা নীচু এবং মাঝখানটা সমানভাবে ফোলা বা উন্নত নয়। প্রকৃতপক্ষে চিত্রের এই ধরনের অসমঞ্জসতার কারণ হল যথেষ্ট সংখ্যক ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ না করা, পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে ত্রুটি থাকা ইত্যাদি। এই ধরনের আকৃতিগত বণ্টনের একটি আদর্শ চিত্ররূপ আছে যার সঙ্গে সমস্ত পরীক্ষণলব্ধ চিত্রেরই আকৃতিগত মিল আছে যদিও পুরোপুরি মিল নেই। একেই স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র (Normal Distribution Curve) বা স্বাভাবিক সম্ভাবনার

চিত্র (Normal Probability Curve) বলা হয়। নীচে স্বাভাবিক বণ্টনের একটি চিত্র দেওয়া হল। চিত্রটির অধঃরেখার (X-অক্ষরেখা) ঠিক মধ্যবিন্দু হচ্ছে মিন। মিডিয়ান এবং মোডও স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে অভিন্ন



হবে, অর্থাৎ অধঃরেখার মধ্যবিন্দুতে মিন, মিডিয়ান, মোড তিনটি মিলে যাবে যেমন দেখা যাচ্ছে উপরের বণ্টনটির ক্ষেত্রে। অসমঞ্জস বণ্টনে অর্থাৎ যেখানে বণ্টনটি পুরোপুরি স্বাভাবিক বণ্টনের রূপ গ্রহণ করে নি, সেখানে মিন, মিডিয়ান এবং মোড তিনটি ভিন্ন হয়ে থাকে (পৃঃ 40)। স্বাভাবিক বণ্টনে মিনের উপর যদি একটি লম্ব টানা হয় তবে চিত্রটি সমান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে। এইটি হল মিনের রেখা। এই রেখাটির বাঁ পাশে থাকবে 50% স্কোর আর ডানপাশে থাকবে 50%। 39 পৃষ্ঠার চিত্র দ্রষ্টব্য।

সম্ভাবনার মৌলিক নীতি

স্বাভাবিক সম্ভাবনার চিত্রটি বুঝতে হলে সম্ভাবনার প্রাথমিক নীতিটি বোঝা দরকার। একই ধরনের ঘটনার মধ্যে একটি বিশেষ ঘটনা যতবার ঘটবে বলে প্রত্যাশা করা যায় তাকেই ঐ ঘটনাটির সম্ভাবনা (Probability) বলে। এই সম্ভাবনাকে গাণিতিক অনুপাতের সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে। একটি মুদ্রাকে উপরের দিকে ছুঁড়লে হয় অশোকস্তম্ভের দিকটি, নয় সংখ্যার দিকটি পড়বে। অতএব অশোকস্তম্ভের দিকটির পড়ার সম্ভাবনা হল 2 বারে 1 বার বা $\frac{1}{2}$। তেমনই একটি ছ-দিক-সম্পন্ন পাশার ছকের যে-কোন বিশেষ দিকটির পড়ার সম্ভাবনা 6 বারে 1 বার বা $\frac{1}{6}$। এই সম্ভাবনার অনুপাত সবচেয়ে কম হলে ·00 হবে এবং সবচেয়ে বেশী হলে 1·00 হবে। যেমন,

মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ার সম্ভাবনা হল ·00 এবং কোন মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনা হল 1·00।

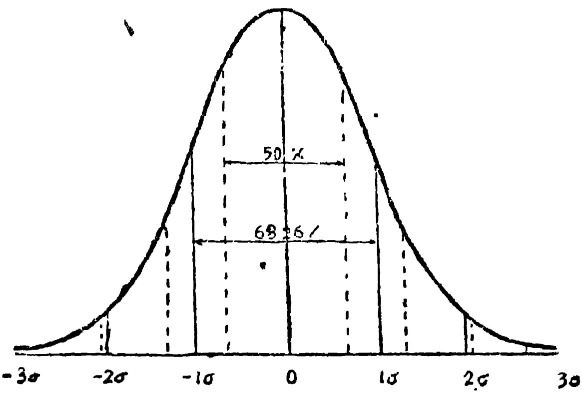
এখন দুটি মুদ্রাকে যদি উপর দিকে বার বার ছোঁড়া যায় তাহলে আমরা কি ধরনের ফল পাই দেখা যাক। প্রত্যেক মুদ্রার ক্ষেত্রেই হয় অশোকস্তম্ভ (অ), নয় সংখ্যার (স) দিকটি পড়তে পারে। ফলে দুটি মুদ্রার পিঠগুলির আবির্ভাবের সম্মেলনটি বিচ্ছিন্নতার দিক নিয়ে নীচের চার রকম হতে পারে। প্রথম মুদ্রাটি (ক) ও দ্বিতীয় মুদ্রাটি (খ) অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হল।

1	2	3	4
(ক) (খ)	(ক) (খ)	(ক) (খ)	(ক) (খ)
অ-অ	অ স	স অ	স স

এখানে উপরের প্রত্যেক সম্মেলনেরই সম্ভাবনা হল 4 বারে 1 বার বা $\frac{1}{4}$। অতএব দেখা যাচ্ছে দুটিই অশোকস্তম্ভ (অ-অ) পড়তে পারে 4 বারে 1 বার, দুটিই সংখ্যার দিক (স স) পড়তে পারে 4 বারে 1 বার এবং একটি অশোকস্তম্ভ ও একটি সংখ্যার দিক পড়তে পারে 4 বারে 2 বার (অ-স+স-অ)। অর্থাৎ অ-অ'র সম্ভাবনা $\frac{1}{4}$, স-স'র সম্ভাবনা $\frac{1}{4}$ এবং অ-স এবং স-অ মিলিয়ে পড়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{2}$। এইবার যদি দুটি মুদ্রাকে বহুবার উপরের দিকে এইভাবে ছোড়া যায় এবং তারপর তাদের বিভিন্ন দিকের পতনের সম্মেলনের একটি ছবি আঁকা যায়, তবে দেখা যাবে যে বণ্টনটি একটি ঘণ্টাকৃতি চিত্রের আকার ধারণ করেছে।

সমস্ত বণ্টনেরই বিষমতার (variability) পরিমাপ করা হয় ঐ বণ্টনটির কোন কেন্দ্রীয় প্রবণতা থেকে। সাধারণত গাণিতিক মিনকেই কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করা হয়। স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্রে মিন থেকে ডানদিকে (অর্থাৎ উচ্চ স্কোর-সম্পন্ন দিকে) অক্ষরেখার উপর 1σ পর্যন্ত মেপে নিলে যে বিন্দুটি পাওয়া যায় তাকে 1σ'র বিন্দু বলা হয় এবং গণনা করে দেখা গেছে যে চিত্রটির যতটুকু স্থান ঐ বিন্দু ও মিনের মধ্যে পড়বে তাতে থাকবে মোট স্কোরের 34·13%। (39 পাতার চিত্র দ্রষ্টব্য)। তেমনই চিত্রের বাঁদিকে (অর্থাৎ নিম্ন স্কোরসম্পন্ন দিকে) অক্ষরেখার উপর 1σ মেপে নিলে আমরা -1σ'র বিন্দু পাব এবং এই বিন্দু পর্যন্ত স্থানটির মধ্যেও মোট স্কোরের 34·13% থাকবে। অর্থাৎ -1σ থেকে $+1\sigma$ পর্যন্ত স্থানের মধ্যে থাকবে 34·13%+34·13%=68·26% স্কোর। ঠিক

এইভাবে মিনের বাঁদিকে -1σর পর -2σ এবং ডানদিকে $+1\sigma$র পর $+2\sigma$ অক্ষরেখার উপর মেপে নেওয়া যেতে পারে। দেখা গেছে -2σ এবং -1σ'র



মধ্যে থাকে 13.59% স্কোর। তেমনই $+2\sigma$ এবং $+1\sigma$'র মধ্যে থাকে 13.59%। অর্থাৎ -2σ থেকে $+2\sigma$'র মধ্যে থাকে মোট 68.26% + 13.59% + 13.59% = 95.44% স্কোর। এইভাবে অক্ষরেখার 2σর পরে 3σ এবং -2σর পরে -3σ মেপে নেওয়া যায় এবং দেখা যাবে যে -3σ থেকে $+3\sigma$'র মধ্যে থাকবে 99.73% স্কোর। $\pm 3\sigma$'র পর আর সাধারণত যাওয়া হয় না, কেননা বণ্টনের অধিকাংশ স্কোরই এই দুটি প্রান্তবিন্দুর মধ্যে এসে যায়।

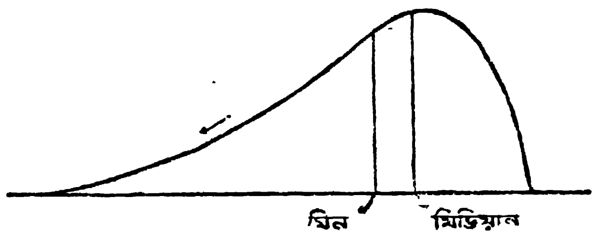
আজকাল বিভিন্ন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা গেছে যে নানা শ্রেণী ও প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য বা ঘটনা এই স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্ররূপ অনুসরণ করে থাকে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কোন দেশের বা কোন জাতির নারী ও পুরুষের জন্মের অনুপাত, গাছপালা বা প্রাণীদের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্মের হার। উচ্চতা ও ওজন; জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদির হার। কোন ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের বেতন বা উৎপাদন; বুদ্ধির অভীক্ষার ফল, প্রতিক্রিয়া-কাল (Reaction Time); শিক্ষামূলক পরীক্ষার ফলাফল ইত্যাদি।

অসমঞ্জসতার পরিমাপ (Measuring Asymmetry)

যখন কোন বণ্টনের চিত্র আদর্শ চিত্ররূপ অনুসরণ করে না তখন তাকে অসমঞ্জস (Asymmetrical) চিত্র বলে। এই অসমঞ্জসতা দু'শ্রেণীর হয়। তির্যকতা বা স্কুনেশ (Skewness) ও কার্টোসিস (Curtosis)।

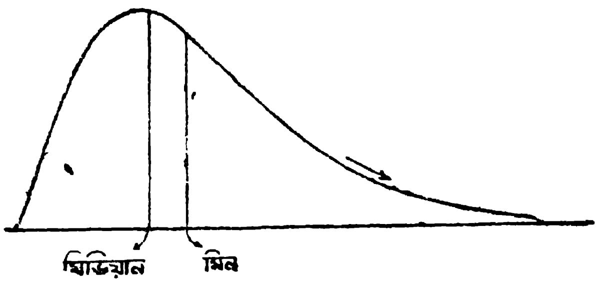
তির্যকতা বা স্কুনেশ (Skewness)

একটি বণ্টনকে তির্যক বা স্কুড (Skewed) বলা হয় যখন তার মিন, মিডিয়ান ও মোড একই বিন্দুতে পড়ে না। আমরা জানি স্বাভাবিক বণ্টনে মিন,



[ঋণাত্মকভাবে স্কুড (Negatively skewed)]

মিডিয়ান ও মোড একই বিন্দুতে মিশে যায়। তির্যকতা বা স্কুনেশ আবার দু'শ্রেণীর হতে পারে ঋণাত্মক (negative) ও ধনাত্মক (positive)। একটি



[ধনাত্মকভাবে স্কুড (Positively Skewed)]

চিত্রকে ঋণাত্মকভাবে স্কুড (negatively skewed) বলা হয় যখন অধিকাংশ স্কোর ডানদিকে জমা হয়ে যায়, ফলে বাঁদিকটি যায় নীচু হয়ে এবং ডানদিকটি বেশী পরিমাণে ফুলে যায়। আবার একটি চিত্রকে ধনাত্মকভাবে স্কুড (positively skewed) বলা হয় যখন অধিকাংশ স্কোরই বাঁদিকে এসে জমা হয়, ফলে ডানদিকটি যায় নীচু হয়ে, বাঁদিক ওঠে বেশী পরিমাণে ফুলে। ঋণাত্মক স্কুনেশের ক্ষেত্রে প্রথম থাকে মিন, পরে মিডিয়ান। আর ধনাত্মক স্কুনেশের প্রথমে থাকে মিডিয়ান, পরে থাকে মিন। স্কুনেশ নির্ণয় করার একটি সূত্র হল।

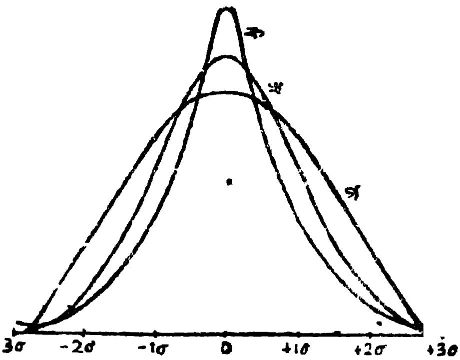
$$SK = \frac{3(\text{মিন} - \text{মিডিয়ান})}{\sigma}$$

17 পাতার বণ্টনে এই সূত্রটি প্রয়োগ করে বণ্টনটির স্কুনেশ পাওয়া গেল :

$$SK = \frac{3(70{\cdot}10 - 72{\cdot}00)}{12{\cdot}63} = -{\cdot}28$$

কার্টোসিস (Curtosis)

কার্টোসিস বলতে বোঝায় চিত্রটি মাথায় স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্রের তুলনায় কতটুকু ছুঁচালো বা চ্যাপ্টা। নীচের ছবিটিতে খ-চিহ্নিত রেখাচিত্রটি হল স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্র। ক-চিহ্নিত রেখাচিত্রটি স্বাভাবিক বণ্টনের ছবির



[কার্টোসিসের পরিমাপ]

চেয়ে উচ্চশীর্ষসম্পন্ন বা ছুঁচালো। একে বলা হয় লেপ্টোকার্টিক (Lepto-kurtic)। গ-চিহ্নিত রেখাচিত্রটি স্বাভাবিক বণ্টনের চেয়ে নিম্নশীর্ষসম্পন্ন বা চ্যাপ্টা। একে বলা হয় প্ল্যাটিকার্টিক (Platikurtic)।

অসমঞ্জস বা অস্বাভাবিক বণ্টন (Non-normal Distributions)

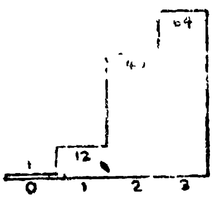
আমরা দেখেছি যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণ (traits) আছে যেগুলিকে ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী সাজালে চিত্রটি স্বাভাবিক বণ্টনের আকার ধারণ করে যেমন বুদ্ধি, উচ্চতা, জন্ম-মৃত্যুর হার ইত্যাদি।

তেমনই আবার এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলির বণ্টন মোটেই স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক বণ্টনের ক্ষেত্রে কোন কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব সম্ভাবনার (chance) প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে। কিন্তু কোন বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যদি একটি উপাদান অত্যন্ত শক্তিশালী বা তীব্র হয়, তাহলে ঐটির আবির্ভাব সম্ভাবনার প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলবে না। সেখানে বণ্টনের আকৃতি তখন স্বাভাবিক রূপ ধারণ করবে না। ফলে বণ্টনের চিত্রটিতে স্কুনেশ বা কার্টোসিস বা দুইই থাকতে পারে।

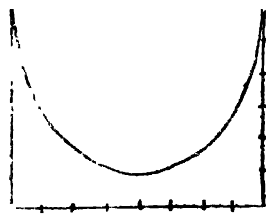
আমরা এর আগে জেনেছি যে যদি দুটি মুদ্রা বার বার উপরের দিক ছোঁড়া যায় তাহলে তাদের অশোকস্তম্ভের দিকটা এবং সংখ্যার দিকটার পতনের বিভিন্ন সম্মেলনের রেখারূপটি স্বাভাবিক বণ্টনের চিত্রের আকৃতি

ধারণ করবে। কিন্তু যদি মুদ্রা দুটির বিশেষ একটি দিক অপর দিকের চেয়ে ভারী করে তৈরী করা হয় তাহলে তাদের দুটি পিঠের পতনের বিভিন্ন সম্মেলনের রেখাচিত্রটি অসমঞ্জস বা অস্বাভাবিক বণ্টনের আকৃতি ধারণ করবে। মনে করা যাক এই ধরনের দুটি মুদ্রায় অশোকস্তম্ভের দিকটার পড়ার সম্ভাবনা এবং সংখ্যার দিকটার পড়ার সম্ভাবনার মধ্যে অনুপাত 4 : 1 ; তাহলে এই দুটি মুদ্রার উৎক্ষেপণে তার দু'পিঠের পতনের বিভিন্ন সম্মেলনের যদি রেখাচিত্র আঁকা হয় তাহলে চিত্রটি ভীষণভাবে স্কুড হয়ে যাবে এবং নীচের বাঁদিকের প্রথম চিত্রটির আকৃতি নেবে। এই ধরনের চিত্রটি অনেকটা J'র মত দেখতে বলে একে J-রেখাচিত্র (J-curve) বলা হয়।

আর এক ধরনের অস্বাভাবিক বা অসমঞ্জস বণ্টনকে অনেকটা ইংরাজী U অক্ষরের মত দেখতে হয়। মনে করা যাক এমন একটা রোগ পাওয়া গেল যেটা ছেলে বয়সে এবং বৃদ্ধ বয়সে খুব বেশী হয় কিন্তু মধ্যবতী বয়সে বেশ কম



J-চিত্র



U-চিত্র

দেখা যায়। এখন এই রোগের আবির্ভাবের বণ্টনের যদি একটি রেখাচিত্র আঁকা যায় তাহলে তা U-র আকৃতি নেবে। এই ধরনের চিত্রকে U-চিত্র (U-curve) বলা হয়। উপরের ডানদিকের ছবিটি একটি U-বণ্টনের উদাহরণ।

৫

ক্রমসমষ্টিমূলক বা কিউমুলেটিভ বণ্টন ও অন্যান্য চিত্রমূলক পদ্ধতি (Cumulative Distribution & Other Graphic Methods)

প্রথম অধ্যায়ে আমরা পলিগন এবং হিস্টোগ্রামের সাহায্যে একটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের চিত্ররূপ দেবার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। বর্তমানে আমরা আরও দুটি চিত্রমূলক পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করব। একটি হল ক্রমসমষ্টিমূলক বা কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সী চিত্র (Cumulative Frequency Graph) এবং অপরটি হল ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা চিত্র বা কিউমুলেটিভ পার্সেন্টেজ কার্ভ (Cumulative Percentage Curve) বা ওজাইভ (Ogive)।

ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী চিত্র

(Cumulative Frequency Graph)

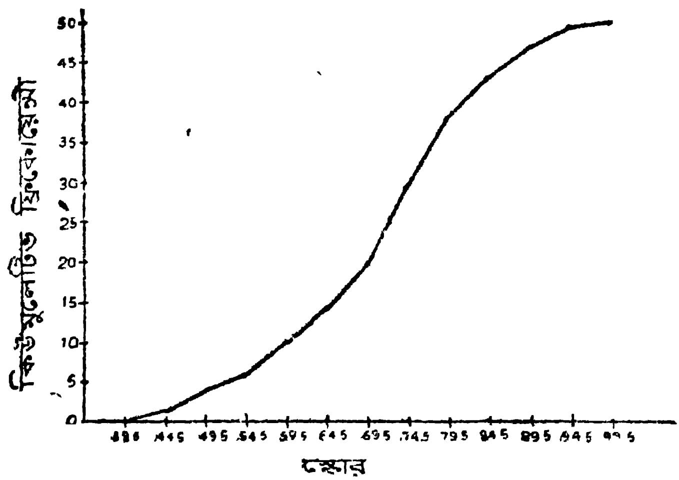
ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী চিত্রও একটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনকে চিত্রের আকারে নিয়ে যাবার আর একটি পদ্ধতি বিশেষ। এই চিত্রে ফ্রিকোয়েন্সী-গুলিকে পর পর যোগ করে যেতে হয়। এই জন্যই এই ধরনের চিত্ররূপকে কিউমুলেটিভ (Cumulative) বা ক্রমসমষ্টিমূলক চিত্র বলা হয়।

17 পাতায় ব্যবহৃত বণ্টনটির ফ্রিকোয়েন্সীগুলিকে ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীতে নিয়ে গেলে দাঁড়ায়।

স্কোর	ফ্রিকোয়েন্সী (*f*)	ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী (*cum. f*)
95—99	1	50
90—94	2	49
85—89	4	47
80—84	5	43
75—79	8	38
70—74	10	30
65—69	6	20
60—64	4	14
55—59	4	10
50—54	2	6
45—49	3	4
40—44	1	1
	N = 50	

এই বণ্টনে ফ্রিকোয়েন্সীগুলিকে নীচে থেকে উপর দিকে পর পর যোগ করে যাওয়া হয়েছে। যেমন, প্রথম শ্রেণীব্যবধানের ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী হল 1, দ্বিতীয় শ্রেণীব্যবধানের 1+3=4, তৃতীয়টির 4+2=6, চতুর্থটির 6+4=10, এইভাবে সর্বোচ্চ শ্রেণীব্যবধানের ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী দাঁড়াচ্ছে 50। এইবার ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী অনুযায়ী বণ্টনটিকে যদি চিত্রের আকারে নিয়ে যাওয়া যায় তবে আমরা নীচের রেখাচিত্রটি পাব।

এই চিত্রে বণ্টনটির শ্রেণীব্যবধানগুলি X-অক্ষে এবং ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী Y-অক্ষে বসান হয়েছে। মোট শ্রেণী ব্যবধানের সংখ্যা হল 12, অতএব 75%'র সূত্র অনুযায়ী চিত্রটির উচ্চতা 12'র $\frac{3}{4}$ অর্থাৎ 9 শ্রেণী-ব্যবধানের সমান হবে। এখানে সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সী হল 50। অতএব



[43 পাতার বণ্টনের কিউমুলেটিভ ফ্রিকোয়েন্সী গ্রাফ বা ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী চিত্র]

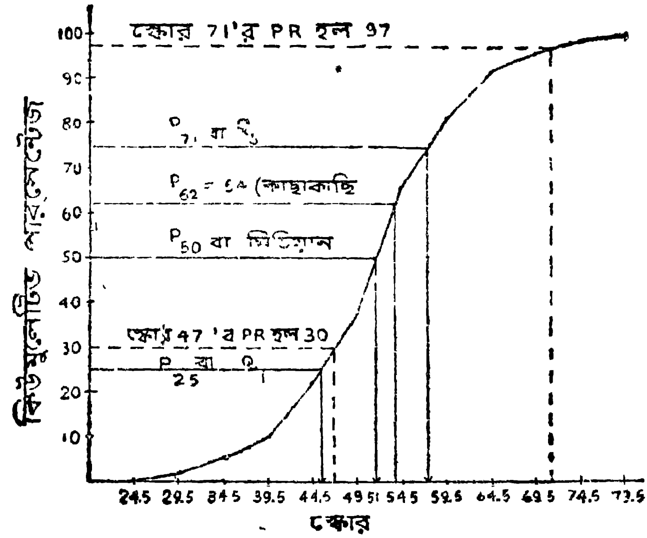
50 ÷ 9 = 6 স্কোর (কাছাকাছি) হল Y-অক্ষের এককের দৈর্ঘ্য। অঙ্কনের সুবিধার জন্য উপরের চিত্রে Y-অক্ষের এককের দৈর্ঘ্য 5 এবং মোট এককের সংখ্যা 10 ধরে নেওয়া হয়েছে।

ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী চিত্র অঙ্কনে একটি কথা মনে রাখতে হবে। পলিগন-অঙ্কনে আমরা প্রত্যেকটি শ্রেণী ব্যবধানের মধ্যবিন্দু নিয়েছিলাম। কিন্তু এখানে প্রত্যেকটি ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী ঐ শ্রেণীব্যবধানের ঊর্ধ্বসীমায় বসাতে হবে। ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে একেবারে নীচে

থেকে সুরু করে প্রত্যেক শ্রেণীব্যবধানের শেষ সীমা পর্যন্ত যত স্কোর আছে সবগুলিকে যোগ করে ঐ ব্যবধানের ফ্রিকোয়েন্সী নির্ণয় করা হয়।

ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্র বা ওজাইভ (Cumulative Percentage Curve or Ogive)

ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্রে ফ্রিকোয়েন্সীগুলিকে সাধারণ ক্রমসমষ্টি-মূলক ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মত পর পর যোগ করে যাওয়া ত হয়ই, উপরন্তু



[43 পাতার বণ্টনের ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা রেখাচিত্র বা ওজাইভ]

প্রত্যেকটি ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের মোটসংখ্যা N'র শতকরা রূপে প্রকাশ করা হয়। যেমন 43 পাতার ক্রমসমষ্টিমূলক বণ্টনে 45—49 শ্রেণীব্যবধানটির ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী হল 4। এখানে মোট সংখ্যা (N) হল 50 ; অতএব যদি এই ফ্রিকোয়েন্সীটিকে ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরায় নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে এটি দাঁড়াবে 8। তেমনই 60—64 শ্রেণীব্যবধানটির শতকরা ক্রমসমষ্টি-মূলক ফ্রিকোয়েন্সী হবে 28, 80—84'র ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ফ্রিকোয়েন্সী হবে 86 ইত্যাদি। পরের পাতায় একটি নূতন ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনের ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী (Cumulative Frequencies) এবং ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ফ্রিকোয়েন্সীর (Cumulative Percentage Frequencies) তালিকা দেওয়া হল।

(1) স্কোর	(2) f	(3) Cum f	(4) Cum % f
75—79	1	125	100·0
70—74	3	124	99 2
65—69	6	121	96·8
60—64	12	115	92·0
55—59	20	103	82·4
50—54	36	83	66·4
45—49	20	47	37 6
40—44	15	27	21·6
35—39	6	12	9 6
30—34	4	6	4·8
25—29	2	2	1·6
	N=125		

উপরের বণ্টনে প্রথম স্তম্ভে শ্রেণীব্যবধানগুলি, দ্বিতীয় স্তম্ভে তাদের ফ্রিকোয়েন্সীগুলি, তৃতীয় স্তম্ভে ঐ ফ্রিকোয়েন্সীগুলির ক্রমসমষ্টিমূলক (cumulative) রূপ এবং চতুর্থ স্তম্ভে ঐ ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীগুলির শতকরা রূপ দেওয়া হয়েছে। শতকরা বলতে অবশ্য বোঝাচ্ছে মোট সংখ্যা N'র শতকরা রূপ। এই শতকরা নির্ণয় করার নিয়ম হল প্রথমে $\frac{1}{N}$ বার করে নিতে হয়। একে হার (Rate) বলা হয়। এইবার প্রত্যেকটি ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সীকে ঐ হার দিয়ে গুণ করে তারপর 100 দিয়ে গুণ করে নিলেই ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, উপরের প্রদত্ত বণ্টনের হার হল $\frac{1}{125} = 008$। এইবার 25—29 শ্রেণীব্যবধানটির ক্রমসমষ্টিমূলক ফ্রিকোয়েন্সী হল 2; অতএব এই ব্যবধানটির ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা হবে $2 \times \cdot 008 \times 100 = 1 \cdot 6$. সেই রকম 30—34 শ্রেণীব্যবধানটির ফ্রিকোয়েন্সী হবে $6 \times \cdot 008 \times 100 = 4.8$ ইত্যাদি।

শতাংশবিন্দু (Percentile Points) নির্ণয়

আমরা দেখেছি যে-কোন ফ্রিকোয়েন্সী বণ্টনে মিডিয়ান হল সেই বিন্দু যার নীচে আছে স্কোরগুলির 50%। তেমনই Q_1 হল সেই বিন্দু যার নীচে আছে 25% স্কোর এবং Q_3 হল সেই বিন্দু যার নীচে আছে 75% স্কোর। সেই রকম বণ্টনের

মধ্যে আমরা আরও অনুরূপ বিন্দু কল্পনা করতে পারি যার নীচে 10%, 47%, 65%, 92%, কিংবা যে কোন শতকরা স্কোর থাকতে পারে। এই ধরনের বিন্দুগুলিকে সাধারণভাবে পার্সেণ্টাইল (Percentile) বা শতাংশ বিন্দু বলা হয় এবং সেগুলিকে P_{10}, P_{47}, P_{65}, ইত্যাদি চিহ্ন দিয়ে বোঝান হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য মিডিয়ান হল P_{50}, Q_1 হল P_{25}, এবং Q_3 হল P_{75}।

শতাংশ বিন্দু বা পার্সেণ্টাইল বার করার সূত্র হল

$$P_p = l + \left(\frac{{}_pN - F}{f_p}\right) \times i$$

এখানে p হল বণ্টনে যে শতকরা চাওয়া হয়েছে সেটি, যথা, 10%, 35% ইত্যাদি।

l হল যে শ্রেণী ব্যবধানে P_p পড়ে তার ঠিক নিম্নসীমা।

${}_pN$ হল P_pতে পৌঁছতে N'র যে অংশটুকু নীচে থেকে গুনে নিতে হবে।

F হল l'র নীচে যতগুলি শ্রেণীব্যবধান আছে তাদের সবগুলির স্কোরের সমষ্টি।

f_p হল P_p যে শ্রেণীব্যবধানে পড়ে তার স্কোরগুলির সংখ্যা।

i হল শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য।

উদাহরণস্বরূপ, 43 পাতার বণ্টনটির P_{10} বার করা হচ্ছে। এখানে N হচ্ছে 50। অতএব এখানে 10% বলতে 50'র 10% বা 5। অতএব P_{10} হল বণ্টনের সেই বিন্দু যার ঠিক নীচে 5টি স্কোর আছে। অতএব নীচে থেকে গুনে দেখা গেল যে 5টি স্কোর গিয়ে শেষ হচ্ছে বা P_{10} গিয়ে পড়ছে 50—54 শ্রেণী ব্যবধানে। অতএব এখানে l হল 50—54'র নিম্নসীমা বা 49.5। ${}_pN$ হল এখানে P_{10}'র নীচে N'র যে অংশটা পড়েছে, এখানে 5। F হল l'র নীচের শ্রেণীব্যবধানগুলির স্কোরের সমষ্টি, এখানে 4। f_p হচ্ছে যে শ্রেণীব্যবধানে P_{10} পড়ছে তার মোট স্কোর, এখানে 2। আর i হল এখানে 5; অতএব উপরের সূত্রটি প্রয়োগ করে আমরা পাচ্ছি—

$$P_{10} = 49.5 + \left(\tfrac{5-4}{2}\right) \times 5 = 52.0$$

এইভাবে আমরা P_{20}, P_{30}, P_{40}, P_{50}, P_{60}, ইত্যাদিও বার করতে পারি। যেমন—

$P_{20} = 59.5 + (\frac{10-10}{4}) \times 5 = 59.5$ [50'র 20% = 10]

$P_{30} = 64.5 + (\frac{15-14}{6}) \times 5 = 65.3$ [50'র 30% = 15]

$P_{40} = 69.5 + (\frac{20-20}{6}) \times 5 = 69.5$ [50'র 40% = 20]

$P_{50} = 69.5 + (\frac{25-20}{10}) \times 5 = 72.0$ [50'র 50% = 25](মিডিয়ান)

$P_{60} = 74.5 + (\frac{30-30}{8}) + 5 = 74.5$ [50'র 60% = 30]

$P_{70} = 74.5 + (\frac{35-30}{8}) \times 5 = 77.6$ [50'র 70% = 35]

$P_{80} = 79.5 + (\frac{40-38}{5}) \times 5 = 81.5$ [50'র 80% = 40]

$P_{90} = 84.5 + (\frac{45-43}{4}) \times 5 = 87.0$ [50'র 90% = 45]

শতাংশ সারি (Percentile Rank or PR) গণনা

শতাংশ বা পার্সেণ্টাইলগুলি সব বণ্টনের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বিন্দু যার নীচে মোট স্কোর বা N'র বিশেষ বিশেষ শতকরা থাকে। P_{10} মানে হল বণ্টনের মধ্যে সেই বিন্দু যার নীচে মোট স্কোরের 10% থাকে।

কিন্তু শতাংশ সারি বা পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক (সংক্ষেপে PR) বলতে একটি বণ্টনে কোন বিশেষ ব্যক্তির অবস্থিতিকে বোঝায়। অর্থাৎ ব্যক্তির নিছক স্কোর অনুযায়ী বণ্টনের মধ্যে তার একটি বিশেষ স্থান আছে; এই স্থানটিকেই ঐ বণ্টনের মধ্যে ব্যক্তির সারি (Rank) বলা যেতে পারে। এই সারিটিকে শতকরা রূপে অর্থাৎ 100'র অংশরূপে প্রকাশ করার জন্য এটিকে পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক বা শতাংশ সারি নাম দেওয়া হয়েছে।

শতাংশ সারি বা পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক (PR) নির্ণয় করার সময় প্রথমে যে ব্যক্তির PR বার করা হয় তার স্কোরটি নিতে হয়। তারপর দেখতে হয় যে মোট স্কোরের শতকরা কত ভাগ সেই স্কোরটির নীচে আছে। এই শতকরাটিই হল ঐ ব্যক্তির শতাংশ সারি বা পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক বা PR।

এইবার শতাংশ সারি বা PR'র সঙ্গে শতাংশবিন্দু বা পার্সেণ্টাইলের পার্থক্যটা বোঝা যাবে। পার্সেণ্টাইল বা শতাংশবিন্দু বার করার সময় আমরা সুরু করেছিলাম মোট স্কোরের একটি বিশেষ শতকরা নিয়ে, যেমন 10% বা 30%। তারপর আমরা বণ্টনটির নীচে থেকে উপর দিকে গণনা করে দেখেছিলাম যে কোন্ বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছলে ঐ বিশেষ শতকরাটি পাওয়া যাবে এবং

গণনার ফলে যে বিন্দুটি পাওয়া গেল সেই বিন্দুটিকেই পার্সেণ্টাইল বা শতাংশ বিন্দু নাম দিয়েছিলাম, যেমন P_{10} বা P_{30}।

কিন্তু শতাংশ সারি বা পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক (PR) বার করার সময় আমরা ঠিক বিপরীত পন্থা অবলম্বন করি। এখানে আমরা ব্যক্তির স্কোর থেকে সুরু করি এবং বণ্টনের মধ্যে ঐ স্কোরের নীচে শতকরা কত স্কোর আছে তা নির্ণয় করি।

উদাহরণস্বরূপ, মনে করা যাক যে 43 পাতার বণ্টনে এক ব্যক্তির স্কোর হল 67, তার PR কত? বণ্টন থেকে দেখা যাচ্ছে যে 67 স্কোরটি পড়ছে 65—69 শ্রেণীব্যবধানে। এই ব্যবধানুটির ঠিক নীচ পর্যন্ত অর্থাৎ এর নিম্নপ্রান্ত 64.5 পর্যন্ত আছে 14টি স্কোর এবং ব্যবধানটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে 6টি স্কোর। এখন এই শ্রেণীব্যবধানের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ 5 দিয়ে 6কে ভাগ করলে আমরা শ্রেণীব্যবধানটির প্রতি এককে পাব 1·2 স্কোর। এখন দেখা যাচ্ছে যে ব্যক্তির স্কোরটি (অর্থাৎ 67) ঐ ব্যবধানটির নিম্নপ্রান্ত 64.5 থেকে (67·0−64.5) 2.5 স্কোর একক দূরে অবস্থিত। 2·5কে 1·2 দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় 3·00 এবং এটাই হল ঐ ব্যবধানের নিম্নপ্রান্ত 64·5 থেকে 67'র স্কোরগত দূরত্ব। এইবার 14'র (64.5'র নীচে মোট স্কোর) সঙ্গে 3.00 যোগ করে পাওয়া গেল 17 এবং 17 হল মোট স্কোর বা N'র সেই অংশ যা 67'র নীচে আছে। এইবার আমরা এই 17কে মোট স্কোরের শতকরায় নিয়ে গেলে পাব 34%। অতএব স্কোর 67'র PR বা শতাংশ সারি হল 34; এইভাবে আমরা বণ্টনের যে কোন স্কোরের PR বা শতাংশ সারি বার করতে পারি। যেমন— 43 পাতার বণ্টনের স্কোর 63'র PR হল 26, 52'র PR হল 10, 72'র (মিডিয়ান) PR হল 50 এবং 87'র PR হল 90।

শতাংশ বিন্দু বা পার্সেণ্টাইল এবং শতাংশ সারি বা পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক —এ দু'টি ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা বণ্টন (46 পাতায় দ্রষ্টব্য) এবং ওজাইভের চিত্র (45 পাতায় দ্রষ্টব্য) থেকে সরাসরি গণনা করা যায় যেমন—

46 পাতার বণ্টনটির ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ফ্রিকোয়েন্সীগুলি থেকে 71-তম শতাংশ বিন্দুটি গণনা করা হচ্ছে। বণ্টনটির (4) নম্বর স্তম্ভে দেখা যাচ্ছে যে

মোট স্কোরের 66·4% আছে 54·5 বিন্দু পর্যন্ত।

মোট স্কোরের 82·4% আছে 59·5 বিন্দু পর্যন্ত।

তাহলে (82·4−66·4)% স্কোর = 16·0% স্কোরের জন্য আছে 5·0 স্কোর।

কিন্তু 71% হচ্ছে 66 4%'র চেয়ে 4·6% উপরে।

তাহলে 16 0%'র জন্য যদি 5 বিন্দু থাকে

তবে 4·6%'র জন্য থাকবে $\frac{5}{16\ 0} \times 4{\cdot}6 = 1{\cdot}4$ বিন্দু।

অতএব 71 তম পার্সেণ্টাইল হল $54{\cdot}5 + 1{\cdot}4 = 55{\cdot}9$

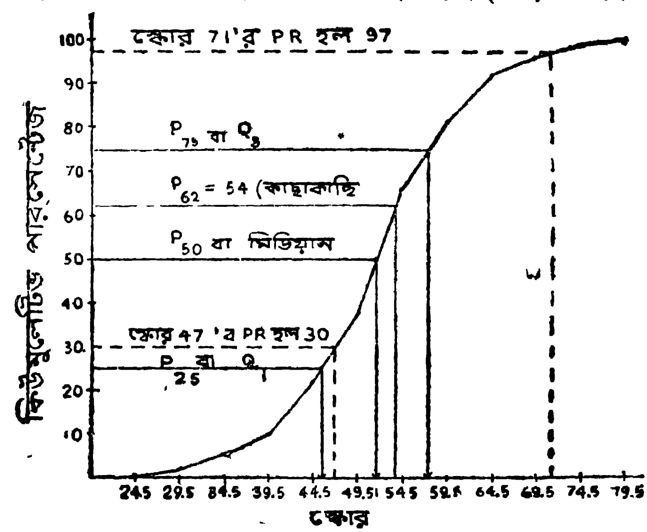
অনেক সময় এভাবে গণনা করারও দরকার পড়ে না এবং আমরা সরাসরি বণ্টন থেকে কতকগুলি পার্সেণ্টাইল গুনে ফেলতে পারি। যেমন, ঐ বণ্টনটিতেই 22তম পার্সেণ্টাইল 44 5'র কাছাকাছি বা 92তম পার্সেণ্টাইল 64·5, 97তম পার্সেণ্টাইল 69·5'র কাছাকাছি ইত্যাদি।

PRও আমরা এভাবে সরাসরি বণ্টন থেকে গণনা করতে পারি। যেমন, মনে করা যাক 48 স্কোরের PR বার করা হচ্ছে। বণ্টনের (4) স্তম্ভ থেকে দেখা গেল যে 44·5 বিন্দুর নীচে আছে মোট স্কোরের 21·6%। স্কোর 48 হল 44·5 থেকে 3·5 বিন্দু দূরে। 48 স্কোর পড়েছে 45—49 শ্রেণী-ব্যবধানেতে যার মধ্যে আছে 5টি স্কোর একক এবং মোট বণ্টনের 16·0% (37·6 – 31·6) পড়েছে এই ব্যবধানেতে। অতএব 5 এককে যদি 16·0% থাকে, তাহলে 3·5 এককে থাকবে $\frac{16\ 0}{5\ 0} \times 3\ 5 = 11{\cdot}2\%$ – 44'র স্কোর দূরত্ব 44·5 থেকে। তাহলে 48 স্কোরের নীচে থাকছে মোট $21{\cdot}6\% + 11{\cdot}2\% = 32{\cdot}8\% - 33\%$। অতএব 48'র PR হল 33। মনে রাখতে হবে যে ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ফ্রিকোয়েন্সীগুলি বণ্টনে দেওয়া থাকে সেগুলি শ্রেণী-ব্যবধানের ঠিক উর্ধ্ব প্রান্তটির PRকে বোঝায়। যেমন 55—59 শ্রেণীব্যবধানের ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ফ্রিকোয়েন্সী হল 82·4। অতএব 59·5 স্কোরের PR হল 82·4। তেমনই 74·5'র PR হল 99·2, 64·5'র PR হল 92·0 ইত্যাদি।

ওজাইভ চিত্র থেকেও পার্সেণ্টাইল ও পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক গণনা করা যায়। যেমন, উদাহরণস্বরূপ পরের পাতার ওজাইভে আমরা P_{50} বা মিডিয়ান বার করতে চাই। Y-অক্ষে যেখানে 50 ফ্রিকোয়েন্সী আছে সেখান থেকে X-অক্ষরেখা.র সঙ্গে সমান্তরাল করে ওজাইভ রেখার উপর একটি রেখা টানা হল। যে বিন্দুতে রেখাটি ওজাইভকে স্পর্শ করল সেখান থেকে X-অক্ষরেখার উপর একটি লম্ব টানা হল। X-অক্ষের উপর যে স্কোরটিতে এই লম্বটি স্পর্শ করল সেইটি হল মিডিয়ান, এখানে 51·5। এইভাবে পাওয়া পার্সেণ্টাইলগুলি সব সময় একেবারে নিখুঁত হয় না, কিন্তু সাধারণভাবে কাজ চালানোর পক্ষে

যথেষ্টই কার্যকর হয়। যেমন, এই বণ্টনটির মিডিয়ান গাণিতিক নিয়মে বার করলে পাওয়া যাবে 51·65, ওজাইভ থেকে পাওয়া গেল 51·5। একইভাবে ঐ চিত্র থেকে আমরা অন্যান্য পার্সেণ্টাইল বার করতে পারি। P_{25} বা Q_1 হল 45·0, P_{75} বা Q_3 হল 57·0। অঙ্ক কষে বার করলে Q_1 পাওয়া যাবে 45·56 এবং Q_3 হবে 57·19।

ওজাইভ থেকে শতাংশ সারি বা পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক (PR) বার করতে হলে



[46 পাতার বণ্টনের ক্রমসমষ্টিমূলক শতকরা ফ্রিকোয়েন্সী চিত্র বা ওজাইভ]

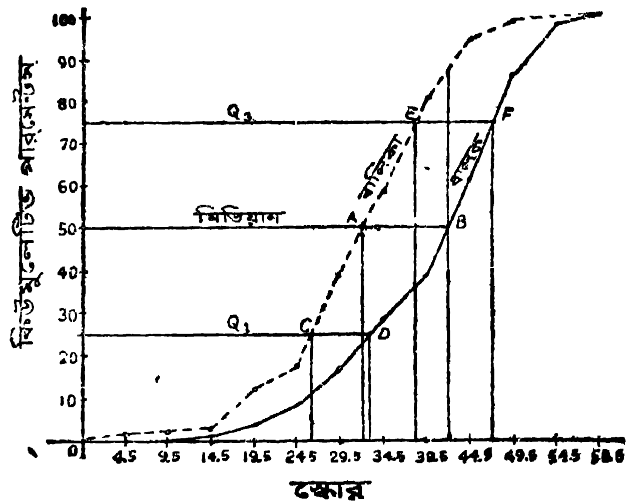
ঠিক উল্টো পথে যেতে হয়। প্রথমে X-অক্ষরেখার ব্যক্তির স্কোরটি বার করতে হয়। এইবার ঐ বিন্দুর উপর একটি লম্ব টানতে হয় এবং ঐ লম্ব যে বিন্দুতে ওজাইভকে স্পর্শ করল সেই বিন্দু থেকে Y-অক্ষরেখার উপর X-অক্ষরেখার সমান্তরাল করে সরলরেখা টানা হল। যে বিন্দুতে এই রেখাটি Y-অক্ষরেখাকে স্পর্শ করছে সে বিন্দুটির শতকরা ফ্রিকোয়েন্সীই হল ঐ স্কোরটির PR। যেমন, 71 স্কোরের PR এভাবে বার করলে পাওয়া যাবে 97; তেমনই 47 স্কোরের PR পাওয়া যাবে 30 ইত্যাদি। পার্সেণ্টাইলের মতই ওজাইভ থেকে বার করা PR সব সময় নিখুঁত হয় না। অবশ্য সাধারণ কাজের পক্ষে এভাবে নির্ণয় করা PRই যথেষ্ট।

ওজাইভের ব্যবহার

ওজাইভের বহুবিধ ব্যবহারপ্রচলিত আছে। প্রথমত, ওজাইভের সাহায্যে আমরা শতাংশ বিন্দু বা পার্সেণ্টাইল এবং শতাংশ সারি বা পার্সেণ্টাইল

র‍্যাঙ্ক (PR) বার করতে পারি। এর দ্বারা গাণিতিক পদ্ধতি অনুসরণ করার সময় ও শ্রম বাঁচে। এ সম্বন্ধে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

দ্বিতীয়ত, ওজাইভের সাহায্যে দুটি দলের কাজের মধ্যে একটি সামগ্রিক তুলনা করা যেতে পারে। মনে করা যাক 200টি দশ বৎসরের ছেলে এবং 200টি দশ বৎসরের মেয়ের উপর একটি অভীক্ষা দেওয়া হল। এই দু'টি দল থেকে দু'প্রস্থ স্কোর পাওয়া গেল এবং সেগুলির সাহায্যে একই অঙ্করেখায়



[একই অঙ্করেখায় একদল ছেলে ও একদল মেয়ের স্কোরের ওজাইভ]

দুটি ওজাইভ টানা হল। এখন এই দুটি ওজাইভ থেকে আমরা দু'দল সম্বন্ধে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে পারি। যেমন, দেখা যাচ্ছে যে ছেলেদের স্কোর মেয়েদের স্কোরের চেয়ে সব দিক দিয়ে বেশী। এই দু'দলের স্কোরের পার্থক্যের পরিমাণ বোঝা যাবে দুটি ওজাইভের মধ্যে বিভিন্ন বিন্দুর দূরত্বের দ্বারা। এই ওজাইভ দুটি থেকে আরও বোঝা যাচ্ছে যে বণ্টনের নীচের ও উপরের দিকের ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে স্কোরের পার্থক্য তেমন বেশী নয়। কিন্তু মধ্যবর্তী ছেলে ও মেয়েদের দলের মধ্যে স্কোরের পার্থক্য বেশ উল্লেখযোগ্য। বণ্টনের দু'চারটি বিন্দু পরীক্ষা করলে এ সিদ্ধান্তটি আরও সমর্থিত হবে। যেমন, মেয়েদের বণ্টনের মিডিয়ান হল 32, ছেলেদের 42 এবং ছবিতে এই দূরত্বটি জানান হয়েছে AB রেখার দ্বারা। সেই রকম দুটি বণ্টনের Q_1 দুটি এবং Q_3 দুটির মধ্যে দূরত্বকে জানান হয়েছে যথাক্রমে CD ও EF রেখা দুটির দ্বারা।

তৃতীয়ত, ওজাইভের সাহায্যে পার্সেণ্টাইল নর্ম (Percentile Norm) বা শতাংশ বিন্দুর মান বার করা যায়। নর্ম বা মান কথাটির অর্থ হল কোন দলের কাজ বা কৃতিত্বের প্রতিনিধিমূলক একটি পরিমাপ। সাধারণত দলটির স্কোরের গাণিতিক মিন বা মিডিয়ানকেই এই মানরূপে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সময় সময় বিভিন্ন পার্সেণ্টাইল পয়েণ্টকেও এই মানের পরিমাপ বলে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, একটি ছেলে অঙ্ক পরীক্ষায় 63 পেয়েছে, ইংরাজীতে পেয়েছে 56। এখন এই স্কোরগুলি থেকে ছেলেটির অঙ্কে বা ইংরাজীতে সত্যকারের জ্ঞানের পরিমাপ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ অঙ্কে 63 স্কোর বা ইংরাজীতে 56 স্কোর তার অন্যান্য সহপাঠীদের তুলনায় ভাল, না খারাপ, না মাঝারি বা কতটুকু ভাল বা খারাপ বা মাঝারি তা জানার উপায় নেই। এখন ধরা যাক এই দুটি স্কোরের পার্সেণ্টাইল র‍্যাঙ্ক (PR) বার করে দেখা গেল যে 63'র PR হচ্ছে 43 এবং 56'র PR হচ্ছে 68। অর্থাৎ অঙ্কে ছেলেটির নীচে তার সহপাঠীদের 43% আছে এবং ইংরাজীতে তার নীচে আছে 68%। অতএব আমরা বলতে পারি যে সে অঙ্কে তেমন ভাল নয় কিন্তু ইংরাজীতে সে বেশ ভালই।

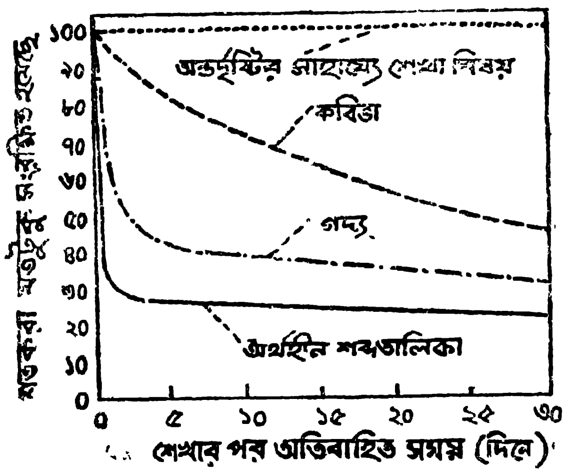
অন্যান্য চিত্রমূলক পদ্ধতি (Other Graphic Methods)

মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ থেকে যে সব মূল্যবান তথ্য আমরা পাই সেগুলিকে চিত্রাকারে সাজাতে পারলে আমাদের বোঝার পক্ষে খুব সুবিধা হয়। মনোবিজ্ঞান ও অন্যান্য বিজ্ঞানে নানা প্রকৃতির চিত্র বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন, রেখাচিত্র (Line Graph), বার চিত্র (Bar Graph), পাই চিত্র (Pie Diagram), ফ্রিকোয়েন্সী বহুভুজ (Frequency Polygon), হিস্টোগ্রাম বা স্তম্ভচিত্র (Histogram) ইত্যাদি। এগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নীচে দেওয়া হল।

১। রেখা চিত্র (Line Graph)

পরের পাতায় ছবিটিতে অর্থহীন শব্দ তালিকা, গদ্য, কবিতা ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শেখা এই চার শ্রেণীর বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা কত সময়ের ব্যবধানে কতটা মনে রাখতে পারি তার একটি রেখাচিত্র দেওয়া হয়েছে। এই চিত্রে

দেখা যাচ্ছে যে 5 দিন পরে অর্থহীন শব্দ তালিকার ক্ষেত্রে 30%, গদ্যের ক্ষেত্রে 42% কবিতার ক্ষেত্রে 82%, এবং অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে শেখা বস্তুর ক্ষেত্র 100% মনে রাখি। এভাবে আমরা 10, 15, 20, 30 দিন পরেও বিভিন্ন



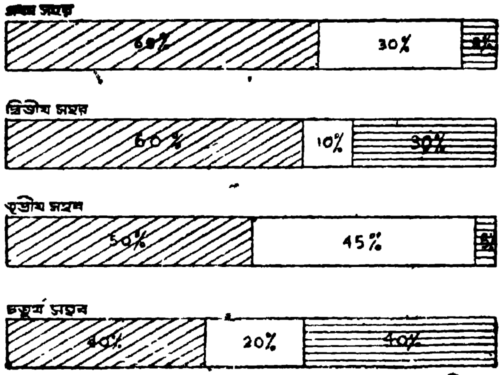
বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখার পরিমাণটি এই চিত্র থেকেই জানতে পারি।

২। বার চিত্র (Bar Graph)

মনোবিজ্ঞানে যখন কোন বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে একের বেশী বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করতে হয় তখন বার গ্রাফ ব্যবহৃত হয়। যেমন, দেখা গেল 4টি সহরের অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ও উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির হার নিম্নরূপ :

	অর্ধশিক্ষিত (শতকরা)	অশিক্ষিত (শতকরা)	উচ্চশিক্ষিত (শতকরা)
১ম সহর	55	30	15
২য় সহর	60	10	30
৩য় সহর	50	45	5
৪র্থ সহর	40	20	40

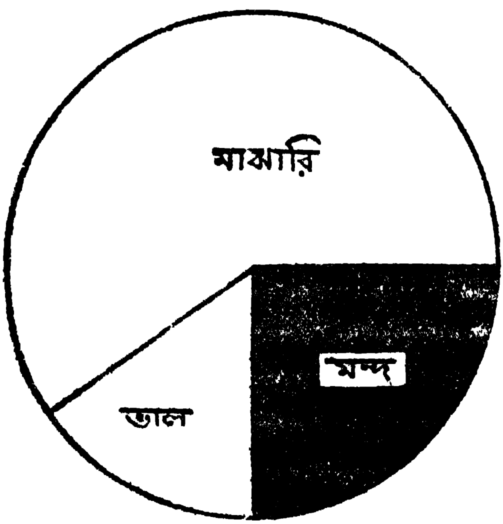
উপরে প্রদত্ত তথ্যগুলিকে আমরা অনায়াসে নীচের চিত্রটিতে রূপান্তরিত করতে



পারি। একেই বার চিত্র বা বার গ্রাফ বলা হয়।

৩। পাই চিত্র (Pie Diagram)

কোন পরিমাপ থেকে পাওয়া তথ্যকে আমরা আবার বৃত্তের আকারে প্রকাশ করতে পারি। একে পাই চিত্র (Pie Diagram) বলে। একটি বৃত্তের কেন্দ্রের চারধারে কোণের সমষ্টি হল 360°; বৃত্তের অন্তর্গত ক্ষেত্রটিকে 360টি কোণে ভাগ করা যায়। এইবার মোট সংখ্যাকে যদি ঐ বৃত্তের অন্তর্গত ক্ষেত্রের সমান বলে ধরা হয় তাহলে প্রত্যেকটি স্কোর বা সংখ্যাকে এই 360°'র অংশরূপে বিভক্ত করা যায়। যেমন, একটি ক্লাশের ছেলেদের উপর



ইংরাজীর একটি অভীক্ষা দিয়ে দেখা গেল যে যারা ইংরাজীতে ভাল (অর্থাৎ যারা 60%'র বেশী মার্কস পেয়েছে) তারা 15%, যারা ইংরাজীতে মন্দ

(অর্থাৎ যারা 30%'র কম মার্কস পেয়েছে) তারা 25%, আর যারা ইংরাজীতে মাঝারি (অর্থাৎ যারা 30% থেকে 60% মার্কস পেয়েছে) তারা 60%। এখন এই ফলাফলটিকে পাই চিত্রে রূপান্তরিত করলে উপরের ছবিটি পাওয়া যায়। বৃত্তের মোট 360°কে 100%'র সমান ধরে নিয়ে 60%'র জন্য 216°, 25%'র জন্য 90° এবং 15%'র জন্য 54°—এইভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা হল।

৪। **পলিগন ও হিষ্টোগ্রাম :** 9—12 পাতা দ্রষ্টব্য।

৬

সহপরিবর্তন (Correlation)

আমাদের আশেপাশে এমন দুটি বস্তু, ঘটনা বা বৈশিষ্ট্যের সংস্পর্শে আমরা প্রায়ই এসে থাকি যেগুলির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটির মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা দিলে অপরটির মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দেয়। এ ধরনের ঘটনার নাম দেওয়া হয়েছে সহপরিবর্তন (Correlation)। যেমন, দেখা গেছে যে বৃষ্টিপাতের কমাবাড়ার সঙ্গে খাদ্যোৎপাদন কমে বাড়ে বা রাজনৈতিক স্থায়িত্বের কমাবাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাহিত্যশিল্পের সৃষ্টি কমে বাড়ে বা ব্যক্তির বুদ্ধি বেশী কম হওয়ার উপর অপরাধপ্রবণতার কমাবাড়া বেশী নির্ভর করে ইত্যাদি। এ সকল ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একটির মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন দেখা দিলে অপরটির মধ্যেও সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেয়। পরিসংখ্যানে এই সহপরিবর্তনের মানকে r অক্ষর দিয়ে জ্ঞাপন করা যায়।

এখন এই পরিবর্তনের পরিমাণ নানা আয়তনের হতে পারে। একটি বৃত্তের ব্যাসের কমাবাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিধি কমে বাড়ে। কিন্তু দেখা গেছে যে ব্যাসের দৈর্ঘ্য যেমন তেমন বাড়ান হোক্ না কেন বৃত্তের পরিধির সঙ্গে ব্যাসের অনুপাত সব সময়েই অপরিবর্তিত থাকে। বৃত্তের পরিধি ব্যাসের দৈর্ঘ্যের 3 গুণের কিছু বেশী হয়ে থাকে এবং এই অনুপাত কখনও বদলায় না। অতএব একটি বৃত্তের ব্যাস এবং পরিধির মধ্যে সহপরিবর্তনকে আমরা নিখুঁত বা পূর্ণ বলতে পারি। সাধারণত এই ধরনের ক্ষেত্রে সহপরিবর্তনের মানকে (বা r'কে) 100 দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

যেখানে দুটি ঘটনার মধ্যে কোন পরিবর্তনগত সম্বন্ধ নেই, অর্থাৎ একটির মধ্যে পরিবর্তন ঘটলে অপরটির ক্ষেত্রে তার কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করে না, সে সকল ক্ষেত্রে সহপরিবর্তনের মান বা r হল ·00 বা শূন্য। এখন নিখুঁত বা পূর্ণ সহপরিবর্তন ($r=1{\cdot}00$) এবং শূন্য সহপরিবর্তন ($r={\cdot}00$)—এ দুই প্রান্তের মধ্যে নানা বিভিন্ন আয়তনের সহপরিবর্তন ঘটতে পারে এবং সেগুলিকে বিভিন্ন সংখ্যা দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়ে থাকে। যেমন, পূর্ণ সহপরিবর্তনের চেয়ে কিছু কম হল ·95 বা ·90 মানসম্পন্ন সহপরিবর্তন, ঠিক মাঝামাঝি সহপরিবর্তনের

সূচক হল ·50 সহপরিবর্তন এবং অল্প সহপরিবর্তনের সূচক মান হল ·30, ·25, ·15 ইত্যাদি। 1·00 থেকে ·00'র মধ্যবর্তী সহপরিবর্তনগুলিকে ধনাত্মক (Positive) বলা হয়। এর অর্থ এই যে দুটি বস্তুর মধ্যে পরিবর্তনটি সমমুখী অর্থাৎ একটির বৃদ্ধির সঙ্গে আর একটির মধ্যে বৃদ্ধি দেখা দেয় এবং একটির হ্রাসের সঙ্গে আর একটির হ্রাস দেখা দেয়। উদাহরণস্বরূপ যারা বুদ্ধির অভীক্ষায় ভাল ফল দেখায় তারা স্কুল কলেজের পরীক্ষাতেও ভাল ফল দেখায় এবং যারা বুদ্ধির অভীক্ষায় মন্দ ফল দেখায় তারা স্কুল কলেজের পরীক্ষাতেও মন্দ ফল দেখায়। এখানে বুদ্ধি এবং পরীক্ষায় সাফল্যের মধ্যে সহপরিবর্তনটা ধনাত্মক বা সমমুখী।

তেমনি সহপরিবর্তন আবার ঋণাত্মকও (Negative) হতে পারে। যেখানে দুটি বস্তুর মধ্যে সহপরিবর্তন বিপরীতমুখী সেখানে ঋণাত্মক সহপরিবর্তন আছে বলা হয়। যেমন, শিক্ষা এবং অপরাধপ্রবণতা—এ দু'য়ের মধ্যে ঋণাত্মক সম্বন্ধ আছে। শিক্ষা বাড়লে দেশে অপরাধপ্রবণতা কমে। শিক্ষা কমলে অপরাধপ্রবণতা বাড়ে। ঋণাত্মক সহপরিবর্তন জ্ঞাপন করা হয় বিয়োগ-চিহ্নের সাহায্যে। পূর্ণ ঋণাত্মক সহপরিবর্তনের মান হল – 1·00 ; ·00 থেকে – 1·00'র মধ্যে নানা বিভিন্ন আয়তনের ঋণাত্মক সহপরিবর্তনের ক্ষেত্র থাকতে পারে। যেমন, – ·82, – ·64, – ·13 ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে পূর্ণ ধনাত্মক সহপরিবর্তনের মান হল 1·00 এবং পূর্ণঋণাত্মক সহপরিবর্তনের মান হল – 1·00। এই দুই চরম প্রান্তের মধ্যে অর্থাৎ + 1·00 এবং – 1·00'র মধ্যে বিভিন্ন পরিমাণ ও বিভিন্ন প্রকৃতির সহ-পরিবর্তন থাকতে পারে। সাধারণত পূর্ণ সহপরিবর্তনের দৃষ্টান্ত বাস্তবে দেখতে পাওয়া যায় না বললেই চলে, যা পাওয়া যায় তা দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী যেমন, – ·79, – ·32, ·50, – ·62 ইত্যাদি মানের সহপরিবর্তন।

সাধারণত মনোবিজ্ঞানে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হয় কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা গুণের দিক দিয়ে দুটি দলের মধ্যে। কিংবা দুটি বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা গুণের দিক দিয়ে একটি দলের মধ্যে। যেমন, সৌন্দর্যবোধের দিক দিয়ে একদল শ্রমিক ও একদল বুদ্ধিজীবীর মধ্যে কি সম্বন্ধ বা অফিস পরি-চালনায় কুশলতার দিক দিয়ে এক দল ছেলে ও একদল মেয়ের মধ্যে কি সম্বন্ধ ইত্যাদি নির্ণয় করা যেতে পারে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয়ের মাধ্যমে। তেমনই একই দল ছেলের মধ্যে ইংরাজীর জ্ঞান এবং ইতিহাসের জ্ঞানের দিক দিয়ে বা

উচ্চতা এবং ওজনের দিক দিয়ে কিংবা বুদ্ধি এবং স্মৃতির দিক দিয়ে কি সম্বন্ধ তাও নির্ণয় করা যেতে পারে সহপরিবর্তন নির্ণয়ের মাধ্যমে।

- দৃষ্টান্ত—১। দশটি ছেলেকে একটি বুদ্ধির অভীক্ষা এবং একটি স্মৃতির অভীক্ষা দেওয়া হল। তারা নিম্নলিখিত স্কোরগুলি পেল, যথা—

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
বুদ্ধির স্কোর	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
স্মৃতির স্কোর	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

এখানে দেখা যাচ্ছে যে 10টি ছেলের মধ্যে বুদ্ধির অভীক্ষায় যে সব চেয়ে বেশী স্কোর পেয়েছে, স্মৃতির অভীক্ষাতেও সে সব চেয়ে বেশী স্কোর পেয়েছে, যে বুদ্ধির অভীক্ষায় সব চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে সে স্মৃতির অভীক্ষাতেও সব চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে। যে বুদ্ধির অভীক্ষায় মাঝারি স্কোর পেয়েছে সে স্মৃতির অভীক্ষাতেও মাঝারি স্কোর পেয়েছে। অর্থাৎ এ দুটি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে সহপরিবর্তনটি সমমুখী এবং নিখুঁত। এক কথায় এক্ষেত্রে সহপরিবর্তনের মান হল পূর্ণ ধনাত্মক বা $r = 1{\cdot}00$।

দৃষ্টান্ত—২। আবার আর দশটি ছেলেকে বুদ্ধির অভীক্ষা ও স্মৃতির অভীক্ষা দিয়ে নীচের স্কোরগুলি পাওয়া গেল।

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
বুদ্ধির স্কোর	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
স্মৃতির স্কোর	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5

এখানে দেখা যাচ্ছে 10টি ছেলের মধ্যে যে বুদ্ধির অভীক্ষায় সব চেয়ে বেশী স্কোর পেয়েছে সে স্মৃতির অভীক্ষায় সব চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে, বুদ্ধির অভীক্ষায় যে সব চেয়ে কম স্কোর পেয়েছে স্মৃতির অভীক্ষায় সে সব চেয়ে বেশী স্কোর পেয়েছে। কেবল তাই নয়, যারা বুদ্ধির অভীক্ষায় উচ্চ স্কোর পেয়েছে তারা স্মৃতির অভীক্ষাতেও ঠিক সমান অনুপাতে নিম্ন স্কোর পেয়েছে। অর্থাৎ এই দুটি স্কোর গুচ্ছের মধ্যে পরিবর্তনটি বিপরীতমুখী কিন্তু নিখুঁত। এক কথায় এক্ষেত্রে সহপরিবর্তন হল পূর্ণ ঋণাত্মক বা $r = -1{\cdot}00$

দৃষ্টান্ত—৩। আবার আর 10টি ছেলেকে বুদ্ধির অভীক্ষা এবং স্মৃতির অভীক্ষা দিয়ে দেখা গেল যে তারা নীচের স্কোরগুলি পেয়েছে।

	ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
বুদ্ধির স্কোর	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
স্মৃতির স্কোর	10	5	13	6	8	14	11	13	7	9

এখানে দেখা যাচ্ছে যে দুটি স্কোরগুচ্ছের মধ্যে কোনরূপ মিল বা সম্পর্ক নেই। যে বুদ্ধির অভীক্ষায় সর্বোচ্চ স্কোর পেয়েছে সে স্মৃতির অভীক্ষায় মাঝামাঝি স্কোর পেয়েছে আবার যে সর্বনিম্ন স্কোর পেয়েছে সেও মাঝামাঝি স্কোর পেয়েছে। অন্যান্য স্কোরগুলির দিক দিয়েও দুটি অভীক্ষার ফলের মধ্যে কোনরূপ যোগসূত্র নেই। এই ক্ষেত্রটিকে আমরা প্রায় শূন্য সহপরিবর্তনের দৃষ্টান্ত বলে বর্ণনা করতে পারি। অর্থাৎ এখানে $r = \cdot 00$'র কাছাকাছি (প্রকৃতপক্ষে ·13)।

সহপরিবর্তনের মান বা r নির্ণয়

সহপরিবর্তনের মানকে (Co-efficient of Correlation) সাধারণত r অক্ষর দিয়ে জ্ঞাপন করা হয়। r নির্ণয় করার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রচলিত পদ্ধতির নাম হল প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি (Product Moment Method)।

১। প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি (Product Moment Method)

এই পদ্ধতিতে প্রথমে অভীক্ষার্থীর প্রতিটি স্কোরের মিন বিচ্যুতি বার করে নিতে হয়। প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে দুটি করে স্কোর থাকে, ফলে প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে দুটি করে মিন-বিচ্যুতি, x এবং y, পাওয়া যায়। তারপর এই মিন-বিচ্যুতি দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে গুণ করে xy পাওয়া যায়। এইভাবে পাওয়া xyগুলিকে যোগ করে Σxy বার করতে হয়।

এবার স্কোরগুচ্ছ দুটির সিগমা বার করে নিতে হয়। তারপর এই সিগমা দুটির গুণফলকে ($\sigma_x \sigma_y$) মোট সংখ্যা N দিয়ে গুণ করতে হয়। পাওয়া যায় $N\sigma_x \sigma_y$। তারপর Σxyকে $N\sigma_x \sigma_y$ দিয়ে ভাগ করলে স্কোরগুচ্ছ দুটির r পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতিতে r নির্ণয়ের সূত্র হল।

$$r = \frac{\Sigma xy}{N\sigma_x \sigma_y}$$

উদাহরণ: 5 জন অভীক্ষার্থীর উপর বুদ্ধির অভীক্ষা ও স্মৃতির অভীক্ষা প্রয়োগ করে পাওয়া গেল দুটি স্কোরগুচ্ছ। তাদের সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হচ্ছে।

(1) অভীক্ষার্থী	(2) বুদ্ধির স্কোর	(3) স্মৃতির স্কোর	(4) x	(5) y	(6) xy
ক	22	30	3	0	0
খ	19	25	0	−5	0
গ	16	10	−3	−20	60
ঘ	20	40	1	10	13
ঙ	18	45	−1	15	−15
					55

বুদ্ধির স্কোরের মিন = 19 ; সিগমা = 2·24

স্মৃতির স্কোরের মিন = 30 ; সিগমা = 13·69

$$r = \frac{\Sigma xy}{N\sigma_x \sigma_y} = \frac{55}{5 \times 2{\cdot}24 \times 13{\cdot}69} = {\cdot}36$$

সারি-পার্থক্যের পদ্ধতি (Rank Difference Method)

প্রোডাক্ট মোমেণ্টের পদ্ধতি ছাড়া আরও একটি পদ্ধতির সাহায্যে সহ-পরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিটিকে সারি পার্থক্যের পদ্ধতি (Rank Difference Method) বলা হয়। এই পদ্ধতিতে অভীক্ষার্থীদিগকে তাদের স্কোর অনুযায়ী সারিবিন্যাস করে নিয়ে তাদের দুটি স্কোরগুচ্ছের সারিগত পার্থক্য থেকে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে নির্ণীত সহপরিবর্তনের মানকে রো (ρ) বলা হয়। এই পদ্ধতিটি প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতির মত নির্ভরযোগ্য ও ত্রুটিহীন না হলেও মোটামুটি কাজ চালানোর পক্ষে খুবই কার্যকর। এই পদ্ধতিতে জটিল গাণিতিক হিসাব-নিকাশ কম এবং অল্পায়াসে সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করা যায় বলে বহুল ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পদ্ধতিটি প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী স্পিয়ারম্যানের আবিষ্কার।

এই পদ্ধতিতে প্রথমে অভীক্ষার্থীদের প্রথম স্কোরগুচ্ছ অনুযায়ী সারিবিন্যাস করা হয়। অর্থাৎ যে সব চেয়ে বেশী স্কোরটি পেয়েছে তার সারি হবে 1 ; তার পরের মানসম্পন্ন স্কোরটি যে পেয়েছে তার সারি হবে 2। তৃতীয় মান-সম্পন্ন স্কোরটি যে পেয়েছে তার সারি হবে 3 ইত্যাদি। যদি দুজ'নে একই স্কোর পায় তবে তাদের প্রত্যেককে দুটি সারির ঠিক মধ্যবর্তী সারিতে ফেলা হয়। যেমন, দেখা গেল যে দু'জনে অষ্টম মানসম্পন্ন স্কোর পেয়েছে। তাহলে এ দু'জনের প্রত্যেকের সারি হবে 8 এবং 9,র মধ্যবর্তী সারি অর্থাৎ 8·5। এ দু'জনের পরের ব্যক্তিটির সারি হবে 10। তেমনই যদি নবম মানসম্পন্ন স্কোরটি

তিনজন পেয়ে থাকে তবে তাদের 3 জনের প্রত্যেকের সারি হবে 9, 10, 11'র মধ্যবর্তী সারিটি অর্থাৎ 10। এই তিনজনের পরের স্কোরসম্পন্ন ব্যক্তিটির সারি হবে 12।

এভাবে দুটি বিভিন্ন স্কোরগুচ্ছের ক্ষেত্রেই অভীক্ষার্থীদের সারি নির্ণয় করতে হবে। তারপর প্রত্যেক অভীক্ষার্থীর সারি দুটির মধ্যে পার্থক্য বার করতে হবে। যেমন, ধরা যাক, কারও যদি প্রথম স্কোরগুচ্ছের সারি হয় 4, দ্বিতীয় স্কোরগুচ্ছের সারি হয় 2, তবে তার সারি-পার্থক্য হবে (4—2=) 2, তেমনি কারও যদি প্রথম স্কোরগুচ্ছের সারি 5 হয় এবং দ্বিতীয় স্কোরগুচ্ছের সারি 8 হয়, তবে তার সারি-পার্থক্য হবে (5—8=) – 3 ; এই সারি পার্থক্যকে D বলা হয়। প্রথম সারির স্কোর যদি দ্বিতীয় সারি স্কোরের চেয়ে বড় হয় তবে D ধনাত্মক বা যোগচিহ্নসম্পন্ন হবে। আর যদি দ্বিতীয় সারির স্কোর প্রথম সারির স্কোরের চেয়ে বড় হয় তবে D ঋণাত্মক বা বিয়োগচিহ্নসম্পন্ন হবে। Dগুলির যোগফল সর্বদাই শূন্য হবে। এইবার প্রত্যেক D'কে বর্গ করে D^2 পাওয়া গেল। বিভিন্ন D^2গুলিকে যোগ করে পাওয়া গেল ΣD^2।

রো (ρ) নির্ণয়ের সূত্র হল।

$$\rho = 1 - \frac{6 \times \Sigma D^2}{N(N^2-1)}$$

রো (ρ) নির্ণয়ের কতকগুলি দৃষ্টান্ত

উদাহরণ—১ : 6 জন ছেলেকে বুদ্ধির অভীক্ষা এবং পরে স্মৃতির অভীক্ষা দেওয়া হল। তারা নিম্নলিখিত স্কোরগুলি পেল।

(1) ছাত্র	(2) বুদ্ধির স্কোর	(3) স্মৃতির স্কোর	(4) বুদ্ধির স্কোরের সারি	(5) স্মৃতির স্কোরের সারি	(6) পার্থক্য (D)	(7) (পার্থক্য)² (D^2)
ক	10	16	4	2	2	4
খ	7	14	5	3	2	4
গ	15	18	2	1	1	1
ঘ	20	12	1	4	−3	9
ঙ	6	8	6	6	0	0
চ	12	10	3	5	−2	4
					0	22

$$\rho=1-\frac{6\times\Sigma D^2}{N(N^2-1)}=1-\frac{6\times 22}{6(36-1)}=1-\frac{132}{210}$$

$$=\frac{78}{210}=\cdot 37$$

এখানে প্রথমে অভীক্ষার্থীদের বুদ্ধির স্কোর অনুযায়ী সারিবিন্যাস করা হল। 'ঘ' পেয়েছে সব চেয়ে বেশী স্কোর 20, অতএব তারি সারি হল 1, তার পরের স্কোর 15 পেয়েছে 'গ', অতএব তার সারি হল 2 ; 'চ' পেয়েছে তারপরের স্কোর 12, অতএব তার সারি হল 3 ; এইভাবে বাকী অভীক্ষার্থীদেরও সারিবিন্যাস করা হল। এইবার অভীক্ষার্থীদের স্মৃতির স্কোর অনুযায়ী একইভাবে সারিবিন্যাস করা হল। এখানে 'খ' পেয়েছে সব চেয়ে বড় স্কোর 18, অতএব তার সারি হল 1 ; 'ক' পেয়েছে তার পরের স্কোর অর্থাৎ 16, অতএব 'ক'র সারি হল 2, এভাবে বাকী অভীক্ষার্থীদেরও স্মৃতির স্কোরের সারিবিন্যাস করা হল। এইবার প্রতিটি অভীক্ষার্থীর এই দুই স্কোরের সারির মধ্যে পার্থক্য বা D নির্ণয় করা হল। যেমন 'ক'-র D হল 4—2=2 ; 'ঘ'-র D হল 1—4=—3 ইত্যাদি। Dগুলির মোট যোগফল দেখা গেল ০ হয়েছে। Dগুলিকে বর্গ করে D^2 পাওয়া গেল এবং D^2র যোগফল বা ΣD^2 পাওয়া গেল 22।

এইবার ρ'র সূত্রটি প্রয়োগ করে আমরা এই স্কোরগুলির সহপরিবর্তনের মান বা 'রো' পেলাম ·37

উদাহরণ—২ : 60 পাতার 10টি অভীক্ষার্থীর বুদ্ধির স্কোর ও স্মৃতির স্কোরের মধ্যে 'রো' বার করা হচ্ছে।

ছাত্র	বুদ্ধির স্কোর	স্মৃতির স্কোর	প্রথম সারি	দ্বিতীয় সারি	সারি-পার্থক্য (D)	(পার্থক্য)^2 $(D)^2$
ক	10	10	10	5	5	25
খ	11	5	9	10	−1	1
গ	12	13	8	2	6	36
ঘ	13	6	7	9	—2	4
ঙ	14	8	6	7	—1	1
চ	15	14	5	1	4	16
ছ	16	11	4	4	0	0
জ	17	12	3	৩	0	0
ঝ	18	7	2	8	—6	36
ঞ	19	9	1	6	—5	25
					0	144

$$\rho = 1 - \frac{6 \times 144}{10(10^2 - 1)} = 1 - \frac{864}{990}$$

$$= \frac{126}{990} = \cdot 13$$

উদাহরণ ঃ 8 জন অভীক্ষার্থীকে দুটি অভীক্ষা দেওয়া হল এবং দুটি স্কোরগুচ্ছ পাওয়া গেল। তাদের মধ্যে "রো" বার করা হচ্ছে।

(1) অভীক্ষার্থী	(2) প্রথম অভীক্ষা	(3) দ্বিতীয় অভীক্ষা	(4) ১ম অভীক্ষার সারি	(5) ২য় অভীক্ষার সারি	(6) পার্থক্য (D)	(7) (পার্থক্য)² (D)²
ক	15	40	8	8	0	0
খ	18	42	5	5	0	0
গ	22	50	1	1	0	0
ঘ	17	45	6	3	3	9
ঙ	19	43	4	4	0	0
চ	20	46	3	2	1	1
ছ	16	41	7	6 5	·5	0.25
জ	21	41	2	6·5	4·5	20·25
						30·50

$$\rho = 1 - \frac{6 \times 30.50}{8(64-1)} = 1 - \frac{300}{504} = \frac{321}{504} = \cdot 64$$

আগের উদাহরণের অনুরূপ পদ্ধতিতে এখানে রো নির্ণয় করা হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে দ্বিতীয় অভীক্ষাটিতে ছ এবং জ দু'জনে একই স্কোর অর্থাৎ 41 পেয়েছে। 41 হচ্ছে এই গুচ্ছে ষষ্ঠ স্কোর এবং ছ ও জ উভয়েরই সারি সংখ্যা হওয়া উচিত ছিল 6 ; কিন্তু তা না হয়ে দু'জনকেই 6 5 সারিতে ফেলা হল। যেহেতু এরা মোট দুটি স্থান অধিকার করেছে, সেহেতু 6 এবং 7 এই দুটি সারি সংখ্যা বাদ দিয়ে পরের অভীক্ষার্থীকে (অর্থাৎ ক'কে) 8'র সারিতে বসান হল। বাকী পদ্ধতি আগের মত।

প্রশ্নাবলী

1. Find by Product Moment Method the co-officients of correlation (r) of the following sets of scores.

(a) Subjects	Score(x)	Score(y)
ক	15	40
খ	18	42
গ	22	50
ঘ	17	45
ঙ	19	43
চ	20	46
ছ	16	41
জ	21	41

(b) Subjects	Test-1	Test-2
ক	50	60
খ	26	40
গ	76	50
ঘ	76	50
ঙ	38	56
চ	42	43
ছ	51	57
জ	63	38
ঝ	37	41
ঞ	78	55

	(c) Test-1	Test-2	(d) Test-3	Test-4	(e) Test-5	Test-6
A	13	11	12	7	13	7
B	12	14	10	3	12	11
C	10	11	9	8	10	3
D	10	7	8	5	8	7
E	18	9	7	7	7	2
F	6	11	7	12	6	12
G	6	3	6	10	6	6
H	5	7	5	9	4	2
I	3	6	4	13	3	9
J	2	1	2	11	1	6

2. Find the correlation between the sets of scores given below

(a) X	Y
22	11
8	5
19	6
32	8
13	2
24	5
22	4
35	1
18	7
13	10

(b) X	Y
2	10
20	4
25	11
14	6
11	2
2	9
38	17
16	6
14	4
23	25

সাত

সিগমা স্কোর বা আদর্শ স্কোর

(Sigma Score or Standard Score)

মনোবিজ্ঞান এবং শিক্ষাবিজ্ঞানে যে সব স্কোর পাওয়া যায় সেগুলিকে অনেক সময় স্কেলের আকারে সাজিয়ে নেওয়ার দরকার পড়ে। স্কেল বলতে বোঝায় এমন একটি ছেদহীন সরল রেখা যার উপর স্কোরগুলিকে 'ছোট থেকে বড়'—এই ভাবে পর পর সাজিয়ে নেওয়া হয়। সাধারণত স্কেলের এককগুলি সম-অর্থবোধক এবং সমদূরত্বসম্পন্ন হয়ে থাকে।

শিক্ষাশ্রয়ী পরিসংখ্যানে কোন বিশেষ অভীক্ষা থেকে পাওয়া স্কোরগুলিকে সিগ্‌মা স্কোর বা আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাওয়া হয়। এইভাবে নিয়ে যাওয়ার ফলে স্কোরগুলি একটি বিশেষ স্কেলের আকারে পরিণত হয় এবং তখন সেগুলির পরস্পরের মধ্যে তুলনা করা সম্ভব হয়ে ওঠে।

মনে করা যাক যে একটি অভীক্ষার মিন ছিল 120 এবং σ হল 24। এখন যদি সুশীল ঐ অভীক্ষায় 144 পেয়ে থাকে তাহলে তার মিন বিচ্যুতি হল $144-120=24$। এইবার সুশীলের এই 24 বিচ্যুতিটিকে যদি অভীক্ষাটির σ দিয়ে ভাগ করা হয় তাহলে সুশীলের σ স্কোর হবে $\frac{24}{24}=1.00$

সেই রকম মোহনের স্কোর যদি 108 হয় তাহলে তার মিন-বিচ্যুতি হবে $108-120= -12$। অতএব তার σ স্কোর হবে $-\frac{12}{24} = -.5$।

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে প্রকৃতপক্ষে যখন মিন থেকে কোন স্কোরের বিচ্যুতিকে ঐ অভীক্ষার σ-র মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয় তখনই তাকে σ-স্কোর বলা হয়। σ-স্কোরকে অনেক সময় z-স্কোরও নাম দেওয়া হয়।

যখন কোন বণ্টনের স্কোরগুলিকে σ-স্কোরে নিয়ে যাওয়া হয় তখন যে নতুন স্কোরগুলি পাওয়া যায় তাদের মিন সব সময়ই হবে 0 এবং σ হবে সব সময় 1·00; যেহেতু বণ্টনে প্রায় অর্ধেক স্কোর মিনের উপরে থাকে আর বাকী অর্ধেক নীচে থাকে সেহেতু σ-স্কোরের প্রায় অর্ধেক হবে ধনাত্মক বা যোগচিহ্ন-সম্পন্ন, বাকী অর্ধেক হবে ঋণাত্মক বা বিয়োগচিহ্নসম্পন্ন। তাছাড়া σ-স্কোরগুলি প্রায়ই ছোট ছোট দশমিক ভগ্নাংশের রূপে থাকে বলে সেগুলি নিয়ে যো

বিয়োগের কাজ করতে অসুবিধা হয়। এজন্য আজকাল σ-স্কোরগুলিকে নতুন একটি বণ্টনে নিয়ে যাওয়ার প্রথা প্রচলিত হয়েছে। এই নতুন বণ্টনের মিন এবং σ এমন আয়তনের নেওয়া হয় যাতে সমস্ত স্কোরগুলি ধনাত্মক বা যোগচিহ্নসম্পন্ন হয়ে ওঠে এবং তার ফলে যোগবিয়োগের সুবিধা হয়। এই ধরনের স্কোরগুলিকে আদর্শ স্কোর (Standard Score) বলা হয়।

আদর্শ স্কোরের সূত্র

কোন অভীক্ষার সাধারণ স্কোরকে আদর্শ স্কোরে নিয়ে যেতে হলে নীচের সূত্রটি প্রয়োগ করতে হয়। এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য হল যে সাধারণ স্কোরকে আদর্শ স্কোরে নিয়ে গেলে বণ্টনটির কোন আকৃতিগত পরিবর্তন হয় না। প্রথম বণ্টনটি যদি স্বাভাবিক বণ্টনের রূপে থাকে তাহলে নতুন বণ্টনটিও স্বাভাবিক রূপ নেবে, আর প্রথম বণ্টনটি স্কুড থাকলে নতুন বণ্টনটিও স্কুড হবে। কেবল পরিবর্তন হবে মিনের এবং সিগ্‌মার। সাধারণ স্কোরে নিয়ে যাওয়ার সূত্রটি হল এই—

$$X' = \frac{\sigma'}{\sigma}(X - M) + M'$$

এখানে X = প্রদত্ত বণ্টনের সাধারণ স্কোর
X' = নতুন বণ্টনের আদর্শ স্কোর
M = প্রদত্ত বণ্টনের মিন
M' = আদর্শ স্কোর বণ্টনের মিন
σ = সাধারণ স্কোরের SD
σ = আদর্শ স্কোরের SD

এইবার উপরের ফরমূলা প্রয়োগ করে যে কোন বণ্টনের স্কোরকে আদর্শ স্কোরে নিয়ে যেতে পারা যায়। যেমন,

উদাহরণ ১ :—একটি বণ্টনে দেওয়া আছে মিন = 64 এবং σ = 15 ; রমেনের স্কোর হল 71 এবং সুনীলের 52 ; এই দুটি সাধারণ স্কোরকে এমন একটি বণ্টনের আদর্শ স্কোরে নিয়ে যেতে হবে যার মিন হল 500 এবং σ হল 100 ;

উঃ—উপরের সূত্রটি প্রয়োগ করে আমরা পাই—

$$X' = \frac{100}{15}(X - 64) + 500$$

এখানে X'র পরিবর্তে রমেনের স্কোর 71 বসালে,

$X' = \frac{100}{12}(71-64)+500$

$= 546.66$

$= 547$

আবার X'র পরিবর্তে সুশীলের স্কোর 52 বসালে

$X' = \frac{100}{12}(52-64)+500 = 400$

আমরা ইচ্ছা করলে যে কোন অন্য মিন ও σ-সম্পন্ন বণ্টনের আদর্শ স্কোরে রমেনের স্কোর এবং সুশীলের স্কোরকে পরিবর্তিত করতে পারি। যেমন, মিন $= 10$ এবং $\sigma = 3$ সম্পন্ন একটি বণ্টনে রমেন ও সুশীলের প্রদত্ত স্কোর দুটিকে পরিবর্তিত করতে পারি। এই বণ্টনটিতে রমেনের স্কোর হবে 11 এবং সুশীলের স্কোর হবে 8; তেমনি যে বণ্টনের মিন $= 100$ এবং $\sigma = 20$ সে বণ্টনের আদর্শ স্কোর হবে 100 এবং সুশীলের স্কোর হবে 84।

উপরের সুবিধা ছাড়াও আদর্শ স্কোরের আর একটি উপকারিতা আছে। দুই বা তার বেশী অভীক্ষা থেকে পাওয়া একই অভীক্ষার্থীর বিভিন্ন স্কোরগুলির মধ্যে সাধারণত কোন তুলনা করা চলে না। তার প্রধান কারণ হল এই যে বিভিন্ন অভীক্ষাগুলির একক সব সময় এক হয় না। উদাহরণস্বরূপ যদি কেউ বুদ্ধির অভীক্ষায় 42 এবং ইংরাজীর অভীক্ষায় 162 পেয়ে থাকে তাহলে দুটি স্কোরের মধ্যে সত্যকারের কোন তুলনা চলতে পারে না। কেননা এই দুটি অভীক্ষায় ব্যবহৃত এককগুলি সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু যদি আমরা এই স্কোর দুটিকে একই বণ্টনের আদর্শ স্কোরে নিয়ে যেতে পারি তাহলে তাদের মধ্যে অতি সন্তোষজনকভাবে তুলনা চলতে পারে। তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে উভয় ক্ষেত্রেই বণ্টনের আকৃতি যদি এক প্রকৃতির হয় তবেই এই ধরনের তুলনা সম্ভব হয়। যেখানে বণ্টন দুটি বিভিন্ন আকারসম্পন্ন সে ক্ষেত্রে স্কোরগুলিকে আদর্শ স্কোরে নিয়ে গিয়ে তুলনা করা চলবে না। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে যে সব বৈশিষ্ট্য বা গুণ নিয়ে পরীক্ষা চালানো হয় সেগুলি প্রায়ই স্বাভাবিক বণ্টনের আকৃতিসম্পন্ন। সেইজন্য শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞানে ব্যাপকভাবে আদর্শ স্কোরের ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে।

উদাহরণ ২ :—দেওয়া আছে পঠন অভীক্ষার মিন $= 71$ এবং $\sigma = 12$ এবং গণিত অভীক্ষার মিন $= 28$ এবং $\sigma = 8$; সুধাংশু পঠন অভীক্ষায় পেয়েছে 62 এবং গণিতে 22, সুধাংশুর এই দুটি সাধারণ স্কোরকে এমন একটি বণ্টনের আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাও যার মিন $= 100$ এবং $\sigma = 20$ এবং তাদের মধ্যে তুলনা কর।

উঃ—সুধাংশুর পঠন অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর $=\frac{20}{12}(62-71)+100=85$

গণিত অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর $=\frac{20}{8}(22-28)+100=85$

দেখা যাচ্ছে যে পঠন অভীক্ষায় সুধাংশুর স্কোর মিনের চেয়ে 9 বিন্দু নীচে এবং গণিত অভীক্ষায় তার স্কোর মিনের চেয়ে 6 বিন্দু নীচে। কিন্তু যখন উভয় স্কোরকেই আদর্শ স্কোরে নিয়ে যাওয়া হল তখন দেখা গেল যে পঠন ও গণিতে সে একই স্কোর 85 পেয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সুধাংশুর পঠন ও গণিতের স্কোরের মধ্যে ভালভাবেই তুলনা করা যাবে।

উদাহরণ ৩ :—দেওয়া আছে ইংরাজী অভীক্ষার মিন $=52$ এবং $\sigma=10$ এবং বাংলা অভীক্ষার মিন $=120$ এবং $\sigma=12$; রমলা ইংরাজীতে পেয়েছে 50 এবং বাংলায় পেয়েছে 168 ; এই দুটি স্কোরকে এমন একটি আদর্শ স্কোরের বণ্টনে নিয়ে যাও যার মিন $=200$ এবং $\sigma=50$ এবং এই নতুন স্কোর দুটির মধ্যে তুলনা কর।

উঃ—রমলার ইংরাজী অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর $=\frac{50}{10}(50-52)+200=190$

রমলার বাংলা অভীক্ষায় আদর্শ স্কোর $=\frac{50}{12}(168-120)+200=400$

এখানে আদর্শ স্কোর দুটির মধ্যে তুলনা করে দেখা যাচ্ছে যে রমলা বাংলায় ইংরাজীর চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত।

আট

অতিরিক্ত প্রশ্নাবলী

The following scores were obtained by applying different tests on different batches of pupils in a university. Arrange them in the form of frequency distributions and find out their means, medians, modes, MD's, Q's and SD's.

1.	19	20	24	21	20	21	20	22	10	20
	23	19	17	20	19	19	21	21	21	22
	11	20	18	18	27	19	20	23	25	19
	18	19	20	19	22	18	23	20	11	21
	13	18	20	16	20	25	22	19	20	21

2.	18	15	10	12	9	13	11	17	8	9
	10	7	15	5	16	8	12	10	12	10
	9	14	21	11	9	18	4	12	11	13
	8	13	6	10	11	8	12	7	14	
	11	10	9	11	10	8	10	9	9	

3.	18	21	23	22	42	19	13	18	27	19
	19	18	17	18	24	10	27	30	21	6
	9	21	16	24	21	20	19	15	28	27
	23	14	7	15	34	13	17	14	15	10
	14	28	17	25	28	16	16	20	24	28

4.	40	22	16	75	11	88	63	16	100	34	33	70	21
	63	34	16	40	7	57	63	39	75	11	8	39	69
	8	51	33	27	58	9	45	21	75	8	40	16	70
	21	23	15	45	9	22	27	7	17	22	39	10	28
	27	40	76	46	34	16	94	28	21	40	64	75	22

5.	25	19	20	16	23	25	20	20	24	23
	21	27	25	19	20	17	16	24	12	12
	15	12	25	18	13	28	28	19	23	22
	21	10	17	21	22	12	15	6	19	16
	27	26	24	15	17	22	21	16	22	12
	24	31	24	23	15	23	18	25	31	21

6.

37	22	21	23	16	27	12	19	22	29
24	26	11	29	10	18	22	23	25	27
27	21	26	21	26	14.	14	18	25	11
17	24	23	14	20	22	16	25	10	35
52	61	56	36	26	46	53	53	49	33
49	55	66	53	57	45	49	45	41	55
18	48	60	51	53	42	48	39	37	52
60	51	58	48	50	36	42	62	36	
62	58	54	46	49	59	33	55	35	

7.

138	125	89	88	94	85	89	79	77	67
109	121	122	85	67	95	78	69	66	61
105	118	110	70	66	81	81	80	72	
101	103	108	101	109	70	85	76	71	
81	99	89	98	102	73	77	68	70	

8.

2	40	53	38	50	54	46	58
36	52	46	56	43	49	44	50
41	51	54	47	42	45	70	70
28	47	52	40	60	64	62	55
44	35	49	59	65	56	61	65

9. Arrange the following scores in Frequency Distributions using the class interval of 5 in (a) and class interval of 3 in (b),

(a)

59	53	57	62	65	57	83
48	76	61	37	51	81	77
71	82	54	61	50	58	57
40	66	61	55	50	59	59
69	66	56	3	47	76	
48	47	64	62	57	81	
65	53	60	51	63	60	
57	66	47	76	57	52	
53	71	61	73	70	50	
67	47	60	54	81	69	

(b)

43	52	46	43	52	57	48
38	44	43	42	45	46	40
47	38	45	51	46	54	41
50	42	56	43	51	50	40
53	31	51	48	43	41	
62	48	65	48	51	48	
42	46	35	45	44	40	
52	51	38	40	45	55	
59	39	44	47	43	34	
42	44	43	41	48	55	

10. Plot frequency polygon and histogram for **each of the** above two sets of scores.

11. Plot frequency polygon and histogram for each of the following distributions.

Scores	f (Group I)	f (Grou
90—94	4	2
85—89	10	0
80—84	14	0
75—79	19	0
70—74	32	2
65—69	31	4
60—64	40	5
55—59	28	12
50—54	29	13
45—49	21	21
40—44	18	21
35—39	10	19
30—34	6	20
25—29	1	14
20—24	3	1
	266	134

12. Superimpose the polygon of the Group I on the histogram of the Group II.

13. The following marks were obtained by 50 (fifty) students in an examination.

31, 13, 20, 31, 33, 45, 38, 42, 30, 30, 30, 46, 36, 2, 41, 44, 18, 26, 14, 30, 19, 5, 44, 15, 9, 13, 7, 25, 12, 30, 6, 22, 24, 31, 15, 6, 39, 32, 21, 20, 42, 31, 19, 14, 23, 28, 17, 53, 22, 21.

Draw a histogram of the frequency distribution. Calculate (a) median, (b) arithmetic mean and (c) standard deviation of the scores.

14. The following marks were obtained by 28 pupils in an Arithmetic Test.

18, 28, 26, 44. 52, 60, 52, 44, 40, 98, 88, 86, 84, 96, 86, 80, 74, 76, 72, 62, 66, 52, 44, 30, 82, 80, 82, 74.

Draw a histogram of the frequency distribution and calculate arithmetic mean and standard deviation of the scores.

15. The following marks were obtained by 45 (forty-five) students in an examination.—

24, 25, 21, 23, 31, 22, 30, 24, 25, 27, [illegible], [illegible], 19, 28, 27, 25, 30, 31, 26, 30, 32, 30, 25, 32, [illegible], [illegible], [illegible], 29, 24, 17, 28, 29, 27, 30, 26, 25, 30, 28, 30, 26, 26, [illegible], 20, 25, 15.

Draw a histogram of the frequency distribution. Calculate (a) median, (b), arithmetic mean and (c) standard deviation of the scores.

16. Find out mean, median, mode and S.D. of the following frequency distributions.

(a)

Score	f
52—53	1
50—51	0
48—49	5
46-47	10
44—45	9
42—43	14
40—41	7
38—39	8
36—37	6
34—35	5
32—33	3
	68

(b)

Score	f
66—71	1
60—65	6
54—59	13
48—53	13
42—47	17
36—41	33
30—35	32
24—29	32
18—23	23
12—17	24
6—11	7
0—5	1
	202

17. Tabulate the following 25 scores into a frequency distribution using an interval of 3 units and calculate the mean and median.

72	75	77	67	72
81	78	65	86	73
67	82	76	76	70
83	71	63	72	72
61	67	84	69	64

18. Indicate the different measures of central tendency. Calculate the mean, median, and SD for the following frequency distribution. (B. A. 1966)

Scores	Frequencies
48-52	1
53-57	4
58-62	5
63-67	10
68-72	13
73-77	28
78-82	20
83-87	8
88-92	4
93-97	2

19. Calculate the mean, median and mode for the following frequency distribution.

Scores	f
120-122	2
117-119	2
114-116	2
111-113	4
108-110	[illegible]
105-107	9
102-104	6
99-101	3
96-98	4
93-95	2
90-92	1

20. What is standard deviation? Demonstrate, by suitable examples, how standard deviation is computed from a number of scores.

21. Find the mean, median and SD from the following distribution of scores:

Score	Frequency
21-25	3
16-20	7
11-15	16
6-10	12
1-5	4

22. What are the different measures of central tendency? Discuss when and where to use them.

The following are scores of 10 students :

5, 2, 7, 3, 6, 5, 4, 3, 4, 5.

Find the measures of their central tendency. (B. Ed. 1965)

23. From the following distribution of scores, compute : (a) Mean and (b) Standard Deviation. Represent the distribution graphically :— (B. Ed. 1966)

Score	Frequency
21-25	3
16-20	7
11-15	20
6-10	6
1-5	4
	40

24. (a) What is a standard score and what are its uses?

(b) What is coefficient of correlations and what are its uses? (B. Ed. 1967)

25. Find the correlations of the following sets of scores.

(a) X	Y	(b) X	Y
11	24	10	29
5	22	4	5
6	44	11	76
8	72	6	4
2	25	2	32
5	30	9	61
4	38	17	56
1	54	6	61
7	37	4	17
10	61	25	61

26. Find the correlations of the following sets of scores

(a) Test-A	Test-B	(b) Test-A	Test-B
72	61	22	30
58	55	40	24
69	56	45	31
82	58	34	26
63	52	31	22
74	55	22	29
72	54	58	31
85	51	36	26
68	57	34	24
63	60	43	54

উত্তরমালা

প্রশ্নাবলী (পৃঃ ১৩)

1. (a) অবিচ্ছিন্ন (b) বিচ্ছিন্ন (c) বিচ্ছিন্ন (d) অবিচ্ছিন্ন (e) বিচ্ছিন্ন (f) অবিচ্ছিন্ন (g) বিচ্ছিন্ন (h) অবিচ্ছিন্ন (i) বিচ্ছিন্ন (j) বিচ্ছিন্ন

2. 63·5, 64·5 7 5, 8·5 ; 364 5, 365·5 ; 0·5, 1 5 ; 85·5, 86 5 ; 164·5, 165·5.

3.

Size of Interval	No. of Interval
5	15
4 or 5	10 or 12
10	11
10	9
1	10

4.

Lower limit	Upper limit	Mid-point
44 5	47·5	46·5
·5	4·5	2·5
159 5	164·5	162 0
79·5	89 5	84·5
62·5	67·5	65·0
14 5	16 5	15 5
— 5	9·5	4·5
25 5	29 5	27·5

14.

3·59	74·17	126 83
46·92	25 19	81·72

প্রশ্নাবলী (পৃঃ ২৫)

3.

M.	73 60	78 80	83·00	73·12	73·17	76·03
Mdn.	76·00	78·25	83·25	73·00	73 59	76·38
Mode	80 80	77 15	83·75	72·76	74·43	77·08

4. (a)

Mean = 67·36
Mdn = 66·77
Mode = 65·59

(b)

Mean = 119·45
Mdn = 119·42
Mode = 119·38

প্রশ্নাবলী (পৃঃ ৩৫)

		Q 5	Q.6	Q.8	Q 9	Q.10	Q 10
1.	MD	7 28	9 62	9 78	5 42	10 15	9 36
	Q	8 00	7·97	8 15	4 78	8 37	8·02
	SD	8·28	13·26	12 31	6 71	12 55	11 54

2. MD = 7·13
SD = 7 64

প্রশ্নাবলী (পৃঃ ৪২)

1. SD = 1·12 2. (a) 34·13, −34·13 (b) 47·72, −47 72
(c) 68·26 (d) 99·73

প্রশ্নাবলী (পৃঃ ৫৬—পৃঃ ৫৭)

1. (c)

	Group A		Group B	
	Ogive	Calculated	Ogive	Calculated
P_{10}	135 00	135·08	136·5	136·56
P_{30}	146 00	145·81	148·5	148·69
P_{60}	156·00	155·77	159·75	159·85
P_{40}	174·00	173·64	175·50	174·81

(d)

	Group A	Group B
PR of 155	58	47
PR of 168	83	78
PR of 170	85	84

(e) nearly 40%